শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

স্বামী সারদানন্দ

১

শ্রীরামকৃষ্ণ পদাশ্রিত পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচারের পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনকথা জানিবার জন্য সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া বর্তমানকালে অনেকে অনেক কথা তৎসম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিলেও ঐ আলোকসামান্য জীবনের সহিত সনাতন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া কেহই এ পর্যন্ত উহার অনুশীলন করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন সনাতন হিন্দুধর্ম হইতে ভিন্ন পৃথক এক ব্যক্তি এবং সাম্প্রদায়িক মত বিশেষের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—এইরূপ বিপরীত কারণই ঐসকল পুস্তকপাঠে মনে উদিত হইয়া থাকে। আবার ঐ সকল গ্রন্থের অনেক-গুলি ঠাকুরের জীবনাখ্যায়িকা সম্বন্ধে নানা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এবং অপরগুলিতে ঐ সকল জীবনঘটনার প্রকৃত অর্থ এবং পূর্বাপর সম্বন্ধেও পারম্পর্য লক্ষিত হয় না। সাধারণের তদ্ভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য ঐ মহাত্মদার জীবন আমাদের নিকটে যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে এবং যে ভাবোপলব্ধি করিয়া শ্রী বিবেকানন্দ প্রমুখ আমরা ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে জীবনোৎসর্গ করিয়াছি, তাহারই কিছু স্বামী বিবেকানন্দের পদানুগ হইয়া বর্তমান গ্রন্থে পাঠককে বলিবার প্রযত্ন করিয়াছি।

—স্বামী সারদানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

প্রথম ভাগ

পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, সাধকভাব ও গুরুভাব—পূর্বার্ধ

স্বামী সারদানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পূর্বকথা ও বাল্যজীবন

পরিশিষ্ট।

পুস্তকস্থ ঘটনাবলীর সময় নিরূপক তালিকা :

সাল	খৃষ্টাব্দ	ঘটনা
১১৮১	১৭৭৫—	শ্রীযুত ক্ষুদিরামের জন্ম।
১১৯৭	১৭৯১—	শ্রীমতী চন্দ্রা দেবীর জন্ম।
১২০৫	১৭৯৯—	শ্রীমতী চন্দ্রা দেবীর সহিত শ্রীযুত ক্ষুদিরামের বিবাহ—ক্ষুদিরামের বয়স ২৪ বৎসর ও চন্দ্রা দেবীর বয়স ৮ বৎসর। [সন ১২৮২ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে চন্দ্রা দেবীর মৃত্যু।]
১২১১	১৮০৫—	শ্রীযুত রামকুমারের জন্ম। অতএব রামকুমার ঠাকুরের অপেক্ষা ৩১ বৎসরের বড়।
১২১৬	১৮১০—	শ্রীমতী কাত্যায়নীর জন্ম।
১২২০	১৮১৪—	শ্রীযুত ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে আসিয়া বাস করা। তখন ক্ষুদিরামের বয়স ৩৯ বৎসর।
১২২৬	১৮২০—	রামকুমারের ও কাত্যায়নীর বিবাহ।
১২৩০	১৮২৪—	শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ৺ রামেশ্বর যাত্রা।
১২৩২	১৮২৬—	শ্রীযুত রামেশ্বরের জন্ম। অতএব তিনি ঠাকুরের অপেক্ষা ১০ বৎসরের বড়।
১২৪০	১৮৩৪—	২৪ বৎসর বয়সে কাত্যায়নীর শরীরে ভূতাবেশ।
১২৪১	১৮৩৫—	শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ৺ গয়া দর্শন। তখন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর।
১২৪২	১৮৩৬—	৬ই ফাল্গুন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে।
১২৪৫	১৮৩৯—	সর্ব্বমঙ্গলার জন্ম।

১২৪৯ ১৮৪৩—শ্রীযুত ক্ষুদিরামের দেহত্যাগ, ৬৮ বৎসর বয়সে। তখন ঠাকুরের বয়স ৭ বৎসর।

১২৫৪ ১৮৪৮—রামেশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ।

১২৫৫ ১৮৪৯—শ্রীযুত রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের জন্মান্তে ৩৬ বৎসর বয়সে তৎপত্নীর মৃত্যু। তখন রামকুমারের বয়স ৪৪ বৎসর।

১২৫৬ ১৮৫০—শ্রীযুত রামকুমারের কলিকাতায় টোল খোলা।

১২৫৯ ১৮৫৩—ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন ও ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে বাস।

১২৬২ ১৮৫৬—দক্ষিণেশ্বর কালিবাটী প্রতিষ্ঠা।

১২৬৩ ১৮৫৭—শ্রীযুত রামকুমারের মৃত্যু (৫২ বৎসর বয়সে)।

ভূমিকা।

ঈশ্বরকৃপায় আবির্ভাবপ্রয়োজনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্য-জীবনের সবিস্তার বিবরণ প্রকাশিত হইল। নানা লোকের মুখ হইতে তাঁহার ঐকালের ঘটনাসমূহ অসম্বদ্ধভাবে শ্রবণ করিয়া আমাদিগের চিত্তে যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে পাঠককে তাহার সহিত পরিচিত করিতেই আমরা ইহাতে সচেষ্ট হইয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগিনেয় শ্রীযুত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আমাদিগকে ঘটনাবলীর সময় নিরূপণে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিলেও কোন কোন স্থলে উহার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া গিয়াছে। কারণ, তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতা ও অগ্রজ প্রভৃতির জন্মকোষ্ঠীসকল প্রদান করিতে পারেন নাই, কিন্তু "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মকালে তাঁহার পিতার বয়স ৬১।৬২ বৎসর ছিল," "তাঁহার অগ্রজ রামকুমার তাঁহা অপেক্ষা ৩১।৩২ বৎসরের বড় ছিলেন," এই ভাবে সময় নিরূপণ করিয়া বলিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম সম্বন্ধে যে সন ও তারিখ আমরা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলাম তৎসম্বন্ধে যে, কোন ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই ইহা পাঠক "মহাপুরুষের জন্মকথা" নামক এই গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায় পাঠ করিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার নিজ উক্তি হইতেই আমরা উহা নিরূপণে সক্ষম হইয়াছি, সুতরাং ঐবিষয়ের জন্য তিনিই স্বরূপতঃ সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থস্থ ঘটনাবলীর অনেক গুলিও আমরা তাঁহার নিজমুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের লীলাবলী লিপিবদ্ধ করিবার প্রারম্ভে আমরা তাঁহার বাল্য ও যৌবনের ঘটনাসমূহকে যে এত বিশদ এবং সম্বদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারিব এরূপ আশা করি নাই। সুতরাং যিনি মূককে [illegible] [illegible]

এবং পঙ্গুকে বিশাল-গিরি-উল্লঙ্ঘন-সামর্থ্য-প্রদানে সক্ষম একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই উহা সম্ভবপর হইল ভাবিয়া আমরা তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিতেছি। উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে পাঠক বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঠ করিবার পরে "সাধকভাব" ও "গুরুভাব" গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মকাল হইতে সন ১২৮৭ সাল বা ইংরাজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনেতিহাস ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। ইতি—

প্রণত

গ্রন্থকার।

সূচী।

বিষয় — পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

ঠাকুরের কামারপুকুরের বাটীর নক্সার পরিচয়।

১। পশ্চিম দিকের দক্ষিণদ্বারী ঘর। কামারপুকুরের অবস্থানকালে ঠাকুর এই ঘরে থাকিতেন। উহার বাহিরের মাপ—দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট ১০ ইঞ্চি; প্রস্থ ১২ ফুট ১০ ইঞ্চি। ভিতরের মাপ—দৈর্ঘ্য ১৩ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি। ঘরের সম্মুখের দাওয়ার মাপ—দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট ১০ ইঞ্চি, প্রস্থ ৫ ফুট।

২। ৺রঘুবীরের পুর্ব্বদ্বারী ঘর। ১ নম্বর চিহ্নিত ঠাকুরের ঘরের দাওয়া হইতে ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি দক্ষিণে এই ঘর অবস্থিত। উহার বাহিরের মাপ—দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ৫ ইঞ্চি, প্রস্থ ৮ফুট ৫ ইঞ্চি। সম্মুখের দাওয়ার মাপ—দৈর্ঘ্য ৯ ফুট ১০ ইঞ্চি, প্রস্থ ৪ ফুট।

৩। ১ নম্বর চিহ্নিত ঘর হইতে ৪ ফুট ৪ ইঞ্চি দুরে পূর্ব্ব দিকে এই দক্ষিণ দ্বারী ঘর অবস্থিত। ইহার বাহিরের মাপ—দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ৮ ইঞ্চি, প্রস্থ ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি। ভিতরের মাপ—দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট ৮ ইঞ্চি, প্রস্থ ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি। সম্মুখের দাওয়ার মাপ—দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ৮ ইঞ্চি, প্রস্থ ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি।

৪। ৩ নম্বর চিহ্নিত ঘরের ৩ ফুট ৭ ইঞ্চি দুরে পূর্ব্ব দিকে বৈঠকখানা ঘর। ইহার বাহিরের মাপ—উত্তর দিকের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ২২ ফুট ৮ ইঞ্চি; দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ১৯ ফুট ৫ ইঞ্চি; পূর্ব্ব পশ্চিম দিকের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি। ভিতরের মাপ মেজের উত্তর দিকের দৈর্ঘ্য ১৮ ফুট ৫ ইঞ্চি; দক্ষিণ দিকের দৈর্ঘ্য ১৭ ফুট ৭ ইঞ্চি; প্রস্থ ৮ ফুট ২ ইঞ্চি। এই ঘরখানি সমচতুষ্কোণ নহে।

৫। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার দ্বার। ইহা বৈটকখানার পশ্চিম দক্ষিণ কোণ হইতে ৯ ফুট দক্ষিণে অবস্থিত। এই দরজা হইতে ১৩ ফুট দক্ষিণে রন্ধন-গৃহের দাওয়ার আরম্ভ। উক্ত দাওয়ার মাপ—দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট, প্রস্থ ৪ ফুট। উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

৬। রন্ধন-গৃহ। ইহা পুর্ব্ব ও পশ্চিম দ্বারী দুইটী ঘরে বিভক্ত। ইহার বাহিরের মাপ—দৈর্ঘ্য ২৩ ফুট ৬ ইঞ্চি, প্রস্থ ১১ ফুট ২ ইঞ্চি।

৭। ৺রঘুবীরের (২ নম্বর চিহ্নিত) ঘরের দক্ষিণে গোলক চিহ্নিত স্থানে কয়েকটী পুষ্পবৃক্ষ।

৮। উঠান—পূর্ব্বে অবস্থিত প্রাচীর হইতে ৺রঘুবীরের গৃহের দাওয়ার নিম্ন পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্যের মাপ ৩২ ফুট এবং রন্ধন-গৃহের দাওয়ার নিম্ন হইতে উত্তরে অবস্থিত দাওয়ার নিম্ন পর্য্যন্ত প্রস্থের মাপ কোন স্থানে ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চি ও কোন স্থানে ১৭ ফুট।

৯। পুর্ব্বদিকের প্রাচীর—বৈঠকখানার নৈঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধন-গৃহের অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ইহার মাপ ৩৮ ফুট ৬ ইঞ্চি।

১০, ১১, ১২, ১৩। বাটীর চতুঃসীমা—উত্তরে ১০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা, পশ্চিম ও দক্ষিণে লাহা বাবুদের পতিত জায়গা, পুর্ব্বে লাহা বাবুদের ছোট পুষ্করিণী।

১৫। বৈঠকখানা ঘরের অগ্নিকোণে গোলক-চিহ্নিত স্থানে ঠাকুরের স্বহস্ত রোপিত আম্রবৃক্ষ।

১৬। রন্ধন-গৃহের উত্তরে গোলকচিহ্নিত স্থানে ঠাকুরের জন্মস্থান। পূর্ব্বে এই স্থানে ঢেঁকিশাল ছিল।

১৬। খিড়কি দরজা।

১৭। রাস্তার দিকে বৈঠকখানা প্রবেশের দরজা।

১৮। বাটীর ভিতরের দিকে বৈঠকখানা প্রবেশের দরজা।

১৯। যুগীদের শিবমন্দির।

☞ প্রতি ঘরের সম্মুখে...চিহ্নিত স্থানে ঐ ঘরের দাওয়া এবং |—| চিহ্নিত স্থানে জানালা বুঝিতে হইবে।

ঠাকুরের বাটীর নক্সা।

স্কেল ১ইঞ্চি=১৬ফুট।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন।

অবতরণিকা।

ধর্ম্মই ভারতের সর্ব্বস্ব।

ভারত ও তদিতর দেশসমূহের আধ্যাত্মিক ভাব ও বিশ্বাস-সকল তুলনায় আলোচনা করিলে, উহাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ উপলব্ধি হয়। দেখা যায়, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুসকলকে ধ্রুবসত্য জ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিতে অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারত নিজ সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছে এবং ঐরূপ সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধিকেই ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বার্থের চরম সীমারূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছে। উহার সমগ্র চেষ্টা এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতায় চিরকালের জন্য রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

মহাপুরুষসকলের ভারতে প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণই ঐরূপ হইবার কারণ।

ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়সকলে ঐরূপ একান্ত অনুরাগ কোথা হইতে উহাতে উপস্থিত হইল, একথার মূল অন্বেষণে বুঝিতে পারা যায়, দিব্যগুণ এবং প্রত্যক্ষসম্পন্ন পুরুষসকলের ভারতে নিয়ত জন্মগ্রহণ করাই উহার একমাত্র কারণ। তাঁহাদিগের বিচিত্র দর্শন ও অসাধারণ শক্তিপ্রকাশ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ এবং আলোচনা করিয়াই সে ঐ সকলে দৃঢ়বিশ্বাস এবং অনুরাগসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের জাতীয় জীবন ঐরূপে, বহু প্রাচীনকাল হইতে আধ্যাত্মিকতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত

হইয়া, প্রত্যক্ষ ধর্ম্মলাভরূপ লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অভিনব সমাজ এবং সামাজিক প্রথাসকল সৃজন করিয়াছিল। জাতি এবং সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ প্রকৃতিগত গুণাবলম্বনে দৈনন্দিন কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া যাহাতে চরমে ধর্ম্ম লাভ বা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিতে পারে, ভারতের সমাজ একমাত্র সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিয়ম এবং প্রথাসকল যন্ত্রিত করিয়াছিল। পুরুষানুক্রমে বহুকাল পর্য্যন্ত ঐসকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসাতেই ভারতে ধর্ম্মভাব-সকল এখনও এতদূর সজীব রহিয়াছে, এবং তপস্যা, সংযম ও তীব্র ব্যাকুলতা-সহায়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই যে জগৎকারণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাঁহার সহিত নিত্য-যুক্ত হইতে পারে, ভারতের প্রত্যেক নরনারী একথায় এখনও দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া রহিয়াছে।

ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শনের উপরে ভারতের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। উহার প্রমাণ।

শ্রীভগবানের দর্শনলাভের উপরেই যে ভারতের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, ঐকথা সহজেই অনুমিত হয়। ধর্ম্মসংস্থাপক আচার্য্য-গণকে বৈদিক যুগ হইতে আমরা যে সকল পর্য্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই সকল বাক্যের অর্থ অনুধাবন করিলেই ঐকথা হৃদয়ঙ্গম হইবে, যথা,—ঋষি, আপ্ত, অধিকারী বা প্রকৃতি-লীন পুরুষ ইত্যাদি। অতীন্দ্রিয় পদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তাঁহারা ঐ সকল নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন, একথা নিঃসন্দেহ। বৈদিক যুগের ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগের অবতারপ্রথিত পুরুষসকলের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই পূর্ব্বোক্ত কথা সমভাবে বলিতে পারা যায়।

ভারতে অবতার বিশ্বাস উপস্থিত হইবার কারণ ও ক্রম। সাংখ্যদর্শনোক্ত 'কল্প নিয়ামক ঈশ্বর।'

আবার বৈদিক যুগের ঋষিই যে, কালে, পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বৈদিক যুগে মানব কতকগুলি পুরুষকে ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থসকল দৃষ্টি করিতে সমর্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলেও, তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঐ বিষয়ের শক্তির তারতম্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে একমাত্র 'ঋষি'-পর্য্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কালে মানবের বুদ্ধি ও তুলনা করিবার শক্তি যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, ততই সে উপলব্ধি করিতে লাগিল, ঋষিগণ সকলেই সমশক্তি-সম্পন্ন নহেন; আধ্যাত্মিক জগতে তাঁহাদিগের কেহ সূর্য্যের ন্যায়, কেহ চন্দ্রের ন্যায়, কেহ উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়, আবার কেহ বা সামান্য খদ্যোতের ন্যায় দীপ্তি প্রদানপূর্ব্বক জ্যোতিষ্মান্ হইয়া রহিয়াছেন। তখন ঋষিগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে মানবের চেষ্টা উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলিকে সে আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশে বিশেষ সামর্থ্যবান্ বা ঐ শক্তির বিশেষভাবে অধিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। ঐরূপে দার্শনিক যুগে কয়েকজন ঋষি 'অধিকারি-পুরুষ'-পর্য্যায়ে অভিহিত হইলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহবান্ সাংখ্যকার আচার্য্য কপিল পর্য্যন্ত ঐরূপ পুরুষসকলের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে পারেন নাই; কারণ, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকে কে কবে সন্দেহ করিতে পারে? সুতরাং শ্রীভগবান্ কপিল ও তৎপদানুসারী সাংখ্যাচার্য্যগণের গ্রন্থে 'অধিকারি-পুরুষ'-সকলকে 'প্রকৃতি-লীন' পর্য্যায়ে অভিহিত হইয়া [illegible] প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে। ঐরূপ অসাধারণ শক্তি[illegible]

পুরুষসকলের উৎপত্তি বিষয়ে কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—

পবিত্রতা, সংযমাদি গুণে ভূষিত হইয়া পূর্ণজ্ঞানলাভে সমর্থ হইলেও ঐরূপ পুরুষসকলের মনে লোককল্যাণসাধনবাসনা তীব্রভাবে জাগরিত থাকে, সেজন্য তাঁহারা অনন্ত মহিমামণ্ডিত স্বস্বরূপে কিয়ৎকাল লীন হইতে পারেন না; কিন্তু ঐ বাসনাবলে সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির অঙ্গে লীন হইয়া তাঁহারা তাঁহার শক্তিসমূহকে নিজ শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, এবং ঐরূপে ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া এক কল্পকাল পর্য্যন্ত অশেষ প্রকারে জনকল্যাণসাধনপূর্ব্বক পরিণামে স্বস্বরূপে অবস্থান করেন।

'প্রকৃতি-লীন' পুরুষসকলের মধ্যে, শক্তির তারতম্যানুসারে, সাংখ্যাচার্য্যগণ আবার দুই শ্রেণীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা— 'কল্পনিয়ামক ঈশ্বর' ও 'ঈশ্বর-কোটি'।

ভক্তিযুগের বিরাট ব্যক্তিত্ববান্ ঈশ্বর।

দার্শনিক যুগের অন্তে ভারতে ভক্তিযুগের বিশেষভাবে আবির্ভাব হইয়াছিল। বেদান্তের তীব্র নির্ঘোষে ভারত-ভারতী তখন সর্বব ব্যক্তির সমষ্টীভূত এক বিরাট ব্যক্তিত্ববান্ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া কেবলমাত্র অনন্যভক্তিসহায়ে তাঁহার উপাসনায় জ্ঞান এবং যোগের পূর্ণতাপ্রাপ্তিবিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্যদর্শনোক্ত 'কল্পনিয়ামক ঈশ্বরকে,' তখন, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাববিশিষ্ট বিরাট ব্যক্তিত্ববান্ ঈশ্বরের আংশিক বা পূর্ণ প্রকাশে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। ঐরূপেই পৌরাণিক যুগে অবতার-বিশ্বাসের উৎপত্তি এবং বৈদিক যুগের বিশিষ্ট গুণশালী ঋষির ঈশ্বরাবতারত্বে পরিণতি অনুমিত হয়। অতএব স্পষ্ট বুঝা

যায়, অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষসকলের আবির্ভাব দর্শনেই ভারত ক্রমে ঈশ্বরাবতারত্বে বিশ্বাসবান হইয়াছিল, এবং ঐরূপ মহাপুরুষসকলের অতীন্দ্রিয় দর্শন ও অনুভবাদির উপরেই ভারতীয় ধর্ম্মের সুদৃঢ় সৌধ ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া তুষারমণ্ডিত হিমাচলের ন্যায় গগন স্পর্শ করিয়াছিল। ঐরূপ পুরুষসকলকে ভারত মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্যলাভে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া 'আপ্ত' সংজ্ঞায় নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগের বাণীসমূহে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া 'বেদ' শব্দে অভিহিত করিয়াছিল।

অবতার বিশ্বাসের অন্য কারণ—গুরূপাসনা।

বিশিষ্ট ঋষিগণের ঈশ্বরাবতারত্বে পরিণতির অন্য প্রধান কারণ—ভারতের গুরূপাসনা। বেদোপনিষদের যুগ হইতেই ভারত-ভারতী বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানদাতা আচার্য্য গুরুর উপাসনা করিতেছিল। ঐ পূজোপাসনাই তাহাদিগকে কালে দেখাইয়া দেয় যে, মানবের ভিতর অতীন্দ্রিয় ঐশী শক্তির আবির্ভাব না হইলে সে কখনও গুরুপদবী গ্রহণে সমর্থ হয় না। সাধারণ মানবজীবনের স্বার্থপরতা এবং যথার্থ গুরুগণের অহেতুক করুণায় লোকহিতাচরণ তুলনায় আলোচনা করিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে প্রথমে এক বিভিন্ন উচ্চশ্রেণীর মানবজ্ঞানে পূজা করিতে থাকে। পরে আস্তিক্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহাদিগের মনে ঘনীভূত হইয়া যথার্থ গুরুগণের অলৌকিক শক্তিপ্রকাশ তাহারা যত প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাঁহাদিগের দেবত্বে তাহারা ততই দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, ভবরোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহারা এতকাল ধরিয়া শ্রীভগবানের করুণাপূর্ণ দক্ষিণামূর্ত্তির নিকট যে সহায়তা প্রার্থনা করিতেছিল—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং

মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং”—গুরুগণের ভিতর দিয়া তাহাই এখন তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, শ্রীভগবানের করুণাই মূর্ত্তিমতী গুরুশক্তিরূপে তাহাদিগের সমক্ষে প্রকাশিত রহিয়াছে।

আবার গুরূপাসনায় মানবমন যখন এতদূর অগ্রসর হইল, তখন যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া ঐ শক্তির বিশেষ লীলা প্রকটিত হইতে লাগিল, তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের জ্ঞানপ্রদা দক্ষিণামূর্ত্তির সহিত অভিন্নভাবে দেখিতে তাহার বিলম্ব হইল না। ঐরূপে আচার্য্যোপাসনা কালে ভারতে অবতারবাদের আনয়নে ও পরিপুষ্টিতে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব অবতারবাদের স্পষ্ট অভিব্যক্তি পৌরাণিক যুগে উপস্থিত হইলেও, উহার মূল যে বৈদিক যুগ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ইহা আর বলিতে হইবে না। বেদ, উপনিষদ্ এবং দর্শনের যুগে মানব ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল পৌরাণিক যুগে সেই সকলই স্পষ্ট আকার ধারণ করিয়া অবতারবিশ্বাসরূপে অভিব্যক্ত হইল। অথবা, সংযমতপস্যাদি-সহায়ে ঔপনিষদিক যুগে মানব ‘নেতি নেতি’ মার্গে অগ্রসর হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় সাফল্য লাভপূর্ব্বক সমাধিরাজ্য হইতে বিলোমমার্গাবলম্বনে অবতরণ করিয়া সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মপ্রকাশ বলিয়া যখন দেখিতে সমর্থ হইল, তখনই সগুণ বিরাট ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রতি তাহার প্রেমভক্তি উপস্থিত হইয়া, সে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল—এবং তখনই সে তাঁহার গুণ কর্ম্ম স্বভাবাদি সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বিশেষভাবে অবতীর্ণ হওয়ায় বিশ্বাসবান্ হইল।

বেদ এবং সমাধি-প্রসূত দর্শনের উপর অবতারবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পৌরাণিক যুগেই ভারতে অবতার-বিশ্বাস বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। ঐ যুগের আধ্যাত্মিক বিকাশে নানা দোষ উপলব্ধ হইলেও, একমাত্র অবতার-মহিমা-প্রকাশে উহার বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। কারণ অবতার-বিশ্বাস আশ্রয় করিযাই মানব সগুণব্রহ্মের নিত্যলীলাবিলাস বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। উহা হইতেই সে বুঝিয়াছে যে, জগৎকারণ ঈশ্বরই আধ্যাত্মিক জগতে তাহার একমাত্র পথপ্রদর্শক; এবং উহা হইতেই তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে. সে যতকাল পয্যন্ত যতই দুর্নীতিপরায়ণ হউক না কেন, শ্রীভগবানের অপার করুণা তাহাকে কখনই চিরদিন বিনাশের পথে অগ্রসর হইতে দিবে না—কিন্তু বিগ্রহবতী হইয়া উহা যুগে যুগে আবির্ভূত হইবে এবং তাহার প্রকৃতির উপযোগী নব নব আধ্যাত্মিক পথসমূহ* আবিষ্কারপূর্ব্বক তাহার পক্ষে ধর্ম্মলাভ সুগম করিয়া দিবে।

ঈশ্বরের করুণার উপলব্ধি হইতেই পৌরাণিক যুগে অবতারবাদ প্রচার।

অমিতগুণসম্পন্ন অবতারপুরুষসকলের দিব্য জন্মকর্ম্মাদি সম্বন্ধে স্মৃতি ও পুরাণসকলে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহার সারসংক্ষেপ এখানে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না। তাঁহারা বলেন, অবতারপুরুষ ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাববান্। জীবের ন্যায় কর্ম্মবন্ধনে তিনি কখনও আবদ্ধ হয়েন না। কারণ, জন্মাবধি আত্মারাম হওয়ায় পার্থিব ভোগসুখ লাভের জন্য জীবের ন্যায় স্বার্থচেষ্টা তাঁহার ভিতর কখনও উপস্থিত হয় না। শরীর ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমগ্র চেষ্টা অপরের কল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়। আবার, অপার

অবতার-পুরুষের দিব্য-স্বভাব সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তির সার সংক্ষেপ।

অজ্ঞানবন্ধনে কখনও আবদ্ধ না হওয়ায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে শরীর পরিগ্রহ করিয়া তিনি যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন সেই সকলের স্মৃতি তাঁহাতে লুপ্ত হয় না।

অবতার-পুরুষের অখণ্ড স্মৃতিশক্তি।

প্রশ্ন হইতে পারে, ঐরূপ অখণ্ড স্মৃতি কি তবে তাঁহাতে আশৈশব বিদ্যমান থাকে? উত্তরে পুরাণকার বলেন, অন্তরে বিদ্যমান থাকিলেও শৈশবে তাঁহাতে উহার প্রকাশ থাকে না; কিন্তু শরীর-মনোরূপ যন্ত্রদ্বয় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইবামাত্র স্বল্প বা বিনায়াসে উহা তাঁহাতে উদিত হইয়া থাকে; তাঁহার প্রত্যেক চেষ্টা সম্বন্ধেই ঐ কথা বুঝিতে হইবে; কারণ, মনুষ্যশরীর ধারণ করায় তাঁহার সকল চেষ্টা সর্ব্বথা মনুষ্যের ন্যায় হয়।

অবতার-পুরুষের নবধর্ম্ম স্থাপন।

ঐরূপে শরীর-মন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবামাত্র অবতারপুরুষ তাঁহার বর্ত্তমান জীবনের উদ্দেশ্য সম্যক্ অবগত হন। তিনি বুঝিতে পারেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই তাঁহার আগমন হইয়াছে। আবার ঐ উদ্দেশ্য সফল করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা কোথা হইতে অচিন্ত্য উপায়ে তাঁহাদিগের নিকট স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। মানবসাধারণের নিকট যে পথ সর্ব্বথা অন্ধকারময় বলিয়া উপলব্ধ হয়, তিনি সেই মার্গে উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইয়া অকুতোভয়ে অগ্রসর হন এবং উদ্দেশ্যলাভে কৃতার্থ হইয়া জনসাধারণকে সেই পথে প্রবর্ত্তিত করেন। ঐরূপে মায়াতীত ব্রহ্মস্বরূপের এবং জগৎকারণ ঈশ্বরের উপলব্ধি করিবার অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন পথসমূহ তাঁহার দ্বারা যুগে যুগে পুনঃ পুনঃ আবিষ্কৃত হয়।

অবতারপুরুষের গুণ কর্ম্ম স্বভাবাদির ঐরূপে নির্ণয় করিয়াই

পুরাণকারেরা ক্ষান্ত হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত স্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সনাতন সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম যখন কালপ্রভাবে গ্লানিযুক্ত হয়, যখন মায়াপ্রসূত অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া মানব ইহকাল এবং পার্থিব ভোগসুখলাভকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞানপূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে, এবং আত্মা, ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় নিত্য পদার্থসকলকে কোন এক ভ্রমান্ধ যুগের স্বপ্নরাজ্যের কবিকল্পনা বলিয়া ধারণা করিয়া বসে—যখন ছলে বলে কৌশলে পার্থিব সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ ও ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করিয়াও সে প্রাণের অভাব দূর করিতে না পারিয়া অশান্তির অন্ধতমসাবৃত অকূল প্রবাহে নিপতিত হয় এবং যন্ত্রণায় হাহাকার করিতে থাকে—তখনই শ্রীভগবান্ স্বকীয় মহিমায় সনাতন ধর্ম্মকে রাহুগ্রাসমুক্ত শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া তুলেন এবং দুর্ব্বল মানবের প্রতি কৃপায় বিগ্রহবান্ হইয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাহাকে পুনরায় ধর্ম্মপথে প্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ না থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি কখন সম্ভবপর নহে—তদ্রূপ সার্ব্বজনীন অভাব দূরীকরণরূপ প্রয়োজন না থাকিলে ঈশ্বরও কখন লীলাচ্ছলে শরীর পরিগ্রহ করেন না। কিন্তু ঐরূপ কোন অভাব যখন সমাজের প্রতি অঙ্গকে অভিভূত করে, শ্রীভগবানের অসীম করুণাও তখন ঘনীভূত হইয়া তাঁহাকে জগদ্গুরুরূপে আবির্ভূত হইতে প্রযুক্ত করে। ঐরূপ প্রয়োজন দূর করিতে ঐরূপ লীলাবিগ্রহের বারংবার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াই যে পুরাণকারেরা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য।

অবতারপুরুষের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি।

অতএব দেখা যাইতেছে, নবীন ধর্ম্মের আবিষ্কর্ত্তা, জগদ্গুরু,

সর্ব্বজ্ঞ অবতারপুরুষ, যুগ-প্রয়োজন সাধনের জন্যই আবির্ভূত হন। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারত নানাযুগে বহুবার তাঁহার পদাঙ্ক হৃদয়ে ধারণ করিয়া পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। যুগপ্রয়োজন উপস্থিত হইলে, অমিতগুণসম্পন্ন অবতারপুরুষের শুভাবির্ভাব এখনও তাহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিঞ্চিদূর্দ্ধ চারিশত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে তাহার ঐরূপে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীর অদৃষ্টপূর্ব্ব মহিমায় শ্রীহরির নামসংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইবার কথা লোকপ্রসিদ্ধ। আবার কি সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে? আবার কি বিদেশীর ঘৃণাস্পদ, নষ্টগৌরব, দরিদ্র ভারতে যুগপ্রয়োজন উপস্থিত হইয়া শ্রীভগবানের করুণায় বিষম উত্তেজনা আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে বর্ত্তমানকালে শরীর পরিগ্রহ করাইয়াছে? হে পাঠক, অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন যে মহাপুরুষের কথা আমরা তোমাকে বলিতে বসিয়াছি, তাঁহার জীবনালোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে, ঘটনা ঐরূপ হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণাদিরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যিনি আবির্ভূত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের যুগপ্রয়োজন সাধিত করিতে তাঁহার শুভাগমন প্রত্যক্ষ করিয়া ভারত পুনরায় ধন্য হইয়াছে!

বর্ত্তমানকালে অবতার-পুরুষের পুনরাগমন।

প্রথম অধ্যায়।

যুগ-প্রয়োজন।

বিদ্যা, সম্পদ্ ও পুরুষকার-সহায়ে, মানবজীবন বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কতদূর প্রসরতা লাভ করিতেছে, তাহা অতি স্থূলদর্শী ব্যক্তিরও সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। মানব যেন কোন ক্ষেত্রেই একটা গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হইয়া এখন আর থাকিতে চাহিতেছে না।

মানব বর্ত্তমানকালে কতদূর উন্নত ও শক্তিশালী হইয়াছে।

স্থলে জলে যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিয়া সুখী না হইয়া সে এখন অভিনব যন্ত্রাবিষ্কারপূর্ব্বক গগণচারী হইয়াছে; তমসাবৃত সমুদ্রতলে ও জ্বালাময় আগ্নেয়গিরিগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া সে নিজ কৌতূহলনিবৃত্তি করিয়াছে; চিরহিমানী-মণ্ডিত পর্ব্বত ও সাগরপারে গমনপূর্ব্বক সে ঐ সকল প্রদেশের যথাযথ রহস্য অবলোকনে সমর্থ হইয়াছে; পৃথিবীস্থ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যাবতীয় লতা, ওষধি ও পাদপের ভিতর সে আপনার ন্যায় প্রাণস্পন্দনের পরিচয় পাইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার প্রাণিজাতকে নিজ প্রত্যক্ষ ও বিচারচক্ষুর অন্তর্ভুক্ত করিয়া জ্ঞানসিদ্ধিরূপ স্বকীয় উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছে। ঐরূপে ক্ষিত্যপ্‌তেজাদি ভূত-পঞ্চের উপর আধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক সে এখন জড় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কথা জানিয়া লইয়াছে এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া সুদূরাবস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদির সম্যক্ সংবাদ লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ক্রমে উহাতেও কৃতকার্য্য হইতেছে। অন্তর্জগৎ পরিদর্শনেও তাহার উদ্যমের অভাব লক্ষিত হইতেছে না। ভূয়োদর্শন এবং গবেষণা-সহায়ে ঐ ক্ষেত্রেও মানব নূতন তত্ত্বসকল এখন নিত্য আবিষ্কার করিতেছে। জীবনরহস্য

অনুশীলন করিতে যাইয়া সে একজাতীয় প্রাণীর অন্য জাতিত্বে পরিণতির বা ক্রমাভিব্যক্তির কথা জানিতে পারিয়াছে; শরীর ও মনের স্বভাব আলোচনাপূর্ব্বক আত্যন্তবান্ সূক্ষ্ম জড়োপাদানে মনের গঠনরূপ তত্ত্ব নির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছে; জড়জগতের ন্যায় অন্তর্জগতের প্রত্যেক ঘটনা অলঙ্ঘ্য নিয়মসূত্রে গ্রথিত বলিয়া জানিতে পারিয়াছে, এবং আত্মহত্যাদি অসম্বদ্ধ মানসিক ব্যাপার-সকলের মধ্যেও সূক্ষ্ম নিয়মশৃঙ্খলের পরিচয় পাইয়াছে। আবার, ব্যক্তিগত জীবনের চিরাস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয় প্রমাণ লাভে সমর্থ না হইলেও, ইতিহাসালোচনায় মানব তাহার জাতিগত জীবনের ক্রমোন্নতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের সার্থকতা ঐরূপে জাতিগত জীবনে দেখিতে পাইয়া সে এখন উহার সাফল্যের জন্য, বিজ্ঞান ও সংহত-চেষ্টা-সহায়ে অজ্ঞানের সহিত চিরসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছে, এবং অনন্ত সংগ্রামে অনন্ত উন্নতি কল্পনাপূর্ব্বক বহিরন্তর্রাজ্যের দুর্লক্ষ্য প্রদেশসমূহে পৌঁছিবার জন্য অনন্ত বাসনাপ্রবাহে আপন জীবনতরী ভাসাইয়া দিয়াছে।

ঐ উন্নতি ও শক্তির কেন্দ্র পাশ্চাত্য হইতে প্রাচ্যে ভাববিস্তার।

পাশ্চাত্য মানবকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত জীবন-প্রসার বিশেষভাবে উদিত হইলেও ভারতপ্রমুখ প্রাচ্য দেশসকলেও উহার প্রভাব স্বল্প লক্ষিত হইতেছে না। বিজ্ঞানের অদম্য শক্তিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশ প্রতিদিন যত নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতেছে, প্রাচ্য মানবের প্রাচীন জীবনসংস্কারসমূহ ততই পরিবর্ত্তিত হইয়া পাশ্চাত্য মানবের ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে। পারস্য, চীন, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশসমূহের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনায় ঐ কথা বুঝিতে পারা যায়। ফলাফল ভবিষ্যতে

যেরূপই হউক না কেন, প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের ঐরূপে ভাববিস্তার সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না, এবং সমগ্র পৃথিবীর, কালে, পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত প্রসারতার ফলাফল নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে পাশ্চাত্যকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য মানবের জীবন দেখিয়া ঐ উন্নতির ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্ণয় করিতে হইবে।

বিচারসহায়ে পাশ্চাত্য মানবের জীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে—ঐ প্রসারের মূল কোথায় এবং উহা কীদৃশ স্বভাববিশিষ্ট, উহার প্রভাবে পাশ্চাত্য জীবনের পূর্ব্বতন উত্তমাধম ভাবসকলের কতদূর উন্নতি এবং বিলোপ সাধিত হইয়াছে, এবং উহার ফলে পাশ্চাত্যে ব্যক্তিগত মানবমনে সুখ ও দুঃখ পূর্ব্বাপেক্ষা কত অধিক বা অল্প পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে। ঐরূপে ব্যষ্টি ও সমষ্টীভূত পাশ্চাত্য জীবনে উহার ফলাফল একবার নির্ণীত হইলে, দেশকালভেদে ঐ বিষয়ের অন্যত্র নির্ণয় করা কঠিন হইবে না।

পাশ্চাত্য মানবের উন্নতির কারণ ও ইতিহাস।

ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে, দুঃসহ শীতের প্রকোপ অতি প্রাচীন কাল হইতে পাশ্চাত্য মানবমনে দেহবুদ্ধির দৃঢ়তা আনয়ন করিয়া, তাহাকে একদিকে যেমন স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি আবার, সংহত-চেষ্টায় স্বার্থসিদ্ধি—একথা সহজে বুঝাইয়া দিয়া উহাতে স্বজাতিপ্রীতির আবির্ভাব করিয়াছিল। ঐ স্বার্থপরতা এবং স্বজাতিপ্রীতিই তাহাকে, কালে অদম্য উৎসাহে অপরজাতিসকলকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের ধনসম্পদে নিজ জীবন ভূষিত করিতে প্ররোচিত করে। উহার

ফলে যখন সে নিজ জীবনযাত্রার কতকটা সুসার করিতে পারিল, তখনই তাহাতে ধীরে ধীরে অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাব হইয়া তাহাকে ক্রমে বিদ্যা ও সদ্‌গুণসম্পন্ন হইতে প্রবৃত্ত করিল। ঐরূপে জীবনসংগ্রাম ভিন্ন উচ্চ বিষয়সকলে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র সে দেখিতে পাইল—ঐ লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার পথে ধর্ম্মবিশ্বাস এবং পুরোহিতকুলের প্রাধান্য তাহার অন্তরায়স্বরূপে দণ্ডায়মান। দেখিল, বিদ্যাশিক্ষায় শ্রীভগবানের অপ্রসন্নতালাভে অনন্তনিরয়গামী হইতে হইবে, কেবলমাত্র ইহা বলিয়াই পুরোহিতকুল নিশ্চিন্ত নহেন, কিন্তু ছলে বলে কৌশলে তাহাকে ঐ পথে অগ্রসর হইতে বাধা প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর। তখন স্বার্থসাধন-তৎপর পাশ্চাত্য মানবের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে বিলম্ব হইল না। সবল হস্তে পুরোহিতকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। ঐরূপে ধর্ম্মযাজকের সহিত শাস্ত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাসকে দূর পরিহার করিয়া, পাশ্চাত্য নবীন পথে নিজ জীবন পরিচালিত করে; এবং পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতারূপ নিশ্চিত প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়া কোন বিষয় কখনও বিশ্বাস বা গ্রহণ করিবে না, ইহাই তাহার নিকট মূলমন্ত্র হইয়া উঠে।

ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিচারানুমানাদিপূর্ব্বক বিষয়-বিশেষের সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া পাশ্চাত্য এখন হইতে যুষ্মদ্‌প্রত্যয়গোচর বিষয়ের উপাসক হইয়া পড়ে এবং অস্মদ্‌প্রত্যয়গোচর বিষয়ীকে বিষয়সকলের মধ্যে অন্যতম ভাবিয়া, উহার স্বভাবাদিও পূর্ব্বোক্ত প্রমাণপ্রয়োগে জানিতে অগ্রসর হয়। গত চারি শত বৎসর সে ঐরূপে জাগতিক প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিষয়কে পঞ্চেন্দ্রিয়সহায়ে পরীক্ষাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ঐকালের ভিতরেই বর্ত্তমান যুগের

জড়বিজ্ঞান শৈশবের জড়তা এবং অসহায়তা হইতে মুক্ত হইয়া যৌবনের উত্তম, আশা, আনন্দ ও বলোন্মত্ততায় উপস্থিত হইয়াছে।

কিন্তু জড়বিজ্ঞানের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারিলেও, পূর্ব্বোক্ত নীতি আত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে পাশ্চাত্যকে পথ দেখাইতে পারে নাই। কারণ, সংযম, স্বার্থহীনতা এবং অন্তর্ম্মুখতাই ঐ বিজ্ঞানলাভের একমাত্র পথ এবং নিরুদ্ধবৃত্তি মনই আত্মোপলব্ধির একমাত্র যন্ত্র। অতএব বহির্ম্মুখ পাশ্চাত্যের ঐ বিষয়ে পথ হারাইয়া দিন দিন দেহাত্মবাদী নাস্তিক হইয়া উঠায় কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নাই। সেজন্য ঐহিকের ভোগসুখই পাশ্চাত্যের নিকট এখন সর্ব্বস্বরূপে পরিগণিত, এবং তল্লাভেই সে সবিশেষ যত্নশীল; এবং তাহার বিজ্ঞানলব্ধ পদার্থজ্ঞান ঐ বিষয়েই প্রধানতঃ প্রযুক্ত হইয়া তাহাকে দিন দিন দাম্ভিক ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। ঐজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্যে সুবর্ণগত জাতিবিভাগ, প্রলয়বিষাণনাদী করাল কামান বন্দুকাদি, অসামান্য শ্রীর পার্শ্বে দারিদ্র্যজাত অসীম অসন্তোষ এবং ভীষণ ধনপিপাসা, পরদেশাধিকার ও পরজাতি-প্রপীড়নাদি। ঐজন্যই আবার দেখিতে পাওয়া যায়, ভোগসুখের চরমে উপস্থিত হইয়াও পাশ্চাত্য নরনারীর আত্মার অভাব ঘুচিতেছে না এবং মৃত্যুর পারে জাতিগত অস্তিত্বে বিশ্বাসমাত্র অবলম্বনে তাহারা কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছে না। বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে পাশ্চাত্য এখন বুঝিয়াছে যে, পঞ্চেন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান তাহাকে দেশকালাতীত বস্তুতত্ত্বাবিষ্কারে কখন সমর্থ করিবে না। বিজ্ঞান তাহাকে ঐ বস্তুর ক্ষণিক আভাসমাত্র প্রদানপূর্ব্বক

আত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মানবের মূর্খতা উহার কারণ; এবং এজন্য তাহার মনের অশান্তি।

উহাকে ধরা বুঝা তাহার সাধ্যাতীত বলিয়া নিবৃত্ত হয়। অতএব যে দেবতার বলে সে আপনাকে এতকাল বলীয়ান্ ভাবিয়াছিল, যাহার প্রসাদে তাহার যাবতীয় ভোগশ্রী ও সম্পদ্, সেই দেবতার অভাবে পাশ্চাত্য মানবের আন্তরিক হাহাকার এখন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে এবং আপনাকে সে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিতেছে।

পাশ্চাত্যের ন্যায় উন্নতি লাভ করিতে হইলে স্বার্থপর ও ভোগলোলুপ হইতে হইবে।

পাশ্চাত্য জীবনের পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসালোচনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, উহার প্রসারভিত্তির মূলে বিষয়প্রবণতা, স্বার্থপরতা এবং ধর্ম্মবিশ্বাসরাহিত্য বিদ্যমান। অতএব ব্যক্তি বা জাতিগত জীবনে পাশ্চাত্যের অনুরূপ ফললাভ করিতে হইলে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অপরকে ঐ ভিত্তির উপরেই নিজ জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, জাপানী প্রভৃতি যে সকল প্রাচ্য জাতি পাশ্চাত্যের ভাবে জাতীয় জীবন গঠনে তৎপর হইয়াছে, স্বদেশ এবং স্বজাতিপ্রীতির সহিত তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দোষসকলেরও আবির্ভাব হইতেছে। পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত হওয়ায় উহাই বিষম দোষ। পাশ্চাত্যসংসর্গে ভারতের জাতীয় জীবনে যে অবস্থার উদয় হইয়াছে, তাহার অনুশীলনে ঐকথা আমরা আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

ভারতের প্রাচীন জাতীয় জীবনের ভিত্তি।

এখানে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে—পাশ্চাত্য সংসর্গে আসিবার পূর্ব্বে 'জাতীয় জীবন' বলিয়া একটা কথা ভারতে বিদ্যমান ছিল কি না। উত্তরে বলিতে হইবে, কথা না থাকিলেও ঐ কথার লক্ষ্য যাহা, তাহা যে একভাবে ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, অখণ্ড সমগ্র ভারত শ্রীগুরু, গঙ্গা, গায়ত্রী এবং গীতায়

শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিল, তখনও গোকুলের পূজা উহার সর্ব্বত্র লক্ষিত হইত, তখনও ভারতের আবালবৃদ্ধ নরনারী রামায়ণ ও মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থসকল হইতে একই ভাবতরঙ্গ হৃদয়ে বহন করিয়া জীবন পরিচালিত করিত এবং উহার বিভিন্ন বিভাগের বুধমণ্ডলী আপন আপন মনোভাব দেবভাষায় পরস্পরের নিকটে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেন। ঐরূপ আরও অনেক একতা-সূত্রের উল্লেখ করা যাইতে পাবে এবং ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মানুষ্ঠান যে ঐ একতার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ছিল, একথা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়।

উহা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ভোগসাধন লইয়া ভারতের সমাজে কখন বিবাদ উপস্থিত হয় নাই।

ভারতের জাতীয় জীবন ঐরূপে ধর্ম্মাবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া উহার সভ্যতা এক অপূর্ব্ব বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে হইলে, সংযমই ঐ সভ্যতার প্রাণস্বরূপ ছিল। ব্যক্তি এবং জাতি উভয়কেই ভারত সংযমসহায়ে নিজ নিজ জীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা প্রদান করিত। ত্যাগের জন্য ভোগের গ্রহণ এবং পরজীবনের জন্য এই জীবনের শিক্ষা—একথা সকলকে সর্ব্বাবস্থায় স্মরণ করাইয়া ব্যক্তি ও জাতির ব্যবহারিক জীবন সে সর্ব্বদা উচ্চতম লক্ষ্যে পরিচালিত করিত। সেজন্যই উহার বর্ণ বা জাতি-বিভাগ এতকাল পর্য্যন্ত কোন শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করিয়া তাহাদিগের বিষম অসন্তোষের কারণ হয় নাই। কারণ, সমাজের যে শ্রেণী বা স্তরে মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই স্তরের কর্ত্তব্য নিষ্কামভাবে করিতে পারিলেই সে যখন অন্যের সহিত সমভাবে মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান ও মুক্তির অধিকারী হইবে, তখন তাহার অসন্তোষের কারণ আর কি হইতে পারে?

শ্রেণীবিশেষের ভোগসুখের তারতম্যকে অধিকার করিয়া পাশ্চাত্যসমাজের ন্যায় ভারতের সমাজে যে প্রাচীনকালে বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, তাহার কারণ—জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সমানাধিকার ছিল বলিয়া। প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি স্মরণে রাখিয়া দেখা যাউক, পাশ্চাত্য-সংসর্গে উহার জীবনে কীদৃশ পরিবর্ত্তনসকল এখন উপস্থিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্যের ভারতাধিকার ও তাহার ফল।

পাশ্চাত্যের ভারতাধিকারের দিন হইতে ভারতের জাতীয় ধনবিভাগপ্রণালীতে যে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনের ঐ ভাগ মাত্র পরিবর্ত্তিত করিয়াই পাশ্চাত্য-প্রভাব নিবৃত্ত হয় নাই। প্রাচীন-কাল হইতে যে সকল মূল সংস্কার লইয়া ভারত-ভারতী ব্যক্তি ও জাতিগত জীবন পরিচালিত করিতেছিল, সেই সকলের মধ্যে ঐ প্রভাব এক অপূর্ব্ব ভাব-পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিল। পাশ্চাত্য বুঝাইল, ত্যাগের জন্য ভোগ, এ কথা পুরোহিতকুলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উদ্ভূত হইয়াছে; পরজীবনের ও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার এক প্রকাণ্ড কবিকল্পনা; সমাজের যে স্তরে মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই স্তরেই সে আমরণ নিবদ্ধ থাকিবে, ইহা অপেক্ষা অযুক্তিকর, অন্যায় নিয়ম আর কি হইতে পারে? ভারতও ক্রমে তাহাই বুঝিল এবং ত্যাগ ও সংযম-প্রধান পূর্ব্ব জীবন-লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর ভোগ লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ঐরূপে উহাতে পূর্ব্ব শিক্ষাদীক্ষার লোপ হইল এবং নাস্তিক্য, পরানুকরণ-প্রিয়তা ও আত্মবিশ্বাসরাহিত্যের উদয় হইয়া উহাকে মেরুদণ্ডহীন

প্রাণীর তুল্য নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য করিয়া তুলিল। ভারত বুঝিল, সে এতকাল ধরিয়া যাহা হৃদয়ে বহন করিয়া যত্নে অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল,—বিজ্ঞানবলে বলীয়ান্ পাশ্চাত্য তাহার সংস্কারসমূহকে অমার্জ্জিত ও অর্দ্ধ বর্ব্বর বলিয়া যেরূপ নির্দ্দিষ্ট করিতেছে, তাহাই বোধ হয় সত্য। ভোগলালসামুগ্ধ ভারত নিজ পূর্ব্বেতিহাস ও পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হইল। স্মৃতিভ্রংশ হইতে তাহার বুদ্ধিনাশ উপস্থিত হইল এবং উহা তাহার জাতীয় অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিবার উপক্রম করিল। আবার ঐহিক ভোগ লাভের জন্য তাহাকে এখন হইতে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হওয়ায়, উহার লাভও তাহার ভাগ্যে দূরপরাহত হইল। ঐরূপে যোগ ও ভোগ উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কর্ণধারশূন্য তরণীর ন্যায় সে পরানুকরণ করিয়া বাসনাবাত্যাভিমুখে যথা ইচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

পাশ্চাত্য ভাবসহায়ে নির্জীব ভারতকে সজীব করিবার চেষ্টা ও তাহার ফল।

তখন চারি দিক্ হইতে রব উঠিল, ভারতের জাতীয় জীবন কোন কালেই ছিল না। পাশ্চাত্যের কৃপায় এতদিনে তাহার ঐ জীবনের উন্মেষ হইতেছে, কিন্তু উহার পূর্ণাবির্ভাবের পথে এখনও অনেক অন্তরায় বিদ্যমান। ঐ যে উহার দুর্নিবার্য্য ধর্ম্মকুসংস্কার, উহাই উহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ঐ যে অসংখ্য দেবদেবীর পূজা—ঐ পৌত্তলিকতাই তাহাকে এতদিন উঠিতে দেয় নাই। উহার বিনাশ কর, উচ্ছেদ কর, তবেই ভারত-ভারতী সজীব হইয়া উঠিবে। ঈশাহি ধর্ম্ম এবং তদনুকরণে একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্যানুকরণে সভাসমিতি গঠিত হইয়া প্রাণহীন ভারতকে রাজনীতি,

সমাজতত্ত্ব, বিধবাবিবাহ ও স্ত্রী-স্বাধীনতার উপকারিতা প্রভৃতি নানা কথা শ্রবণ করান হইল—কিন্তু তাহার অভাববোধ ও হাহাকার নিবৃত্ত না হইয়া প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পাশ্চাত্য সভ্যতার যত কিছু সাজ সরঞ্জাম একে একে ভারতে উপস্থিত করা হইল—কিন্তু বৃথা চেষ্টা—যে ভাবপ্রেরণায় ভারত সজীব ছিল তাহার অনুসন্ধান এবং পুনঃপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা ঐ সকলে কিছুমাত্র হইল না। ঔষধ যথাস্থানে প্রযুক্ত হইল না, রোগের উপশম হইবে কিরূপে? ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের ধর্ম্ম সজীব না হইলে সে সজীব হইবে কিরূপে? পাশ্চাত্যের ভাবপ্রসারে তাহাতে যে ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, নাস্তিক পাশ্চাত্যের তাহা দূর করিবার সামর্থ্য কোথায়? স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য অপরকে সিদ্ধ করিবে কিরূপে?

ভারতের প্রাচীন জাতীয় জীবনের গুণ-দোষ বিচার।

পাশ্চাত্যাধিকারের পূর্ব্বে ভারতের জাতীয় জীবনে যে কিছু-মাত্র দোষ ছিল না, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু জাতীয় শরীর সজীব থাকায় ঐ দোষ নিবারণের স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টাও উহাতে সর্ব্বদা লক্ষিত হইত। জাতি এবং সমাজের ভিতর এখন সেই চেষ্টার বিলোপ দেখিয়া বুঝিতে হইবে, পাশ্চাত্যভাব-প্রসাররূপঔষধ-প্রয়োগ রোগের সহিত রোগীকেও সরাইতে বসিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্যের ধর্ম্মগ্লানি ভারতেও অধিকার বিস্তার করিয়াছে। বাস্তবিক ঐ গ্লানি বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কতদূর প্রবল হইয়াছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ধর্ম্ম বলিয়া যদি কোন বাস্তব পদার্থ থাকে এবং বিধাতার নির্দ্দেশে তল্লাভ যদি মানবের সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগের ভোগপরায়ণ মানবজীবন যে উহা

হইতে বহুদূরে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, একথা নিঃসন্দেহ। বিজ্ঞান-সহায়ে মানবের বর্ত্তমান জীবন-প্রসার মানবকে বিচিত্র ভোগসাধনলাভে সমর্থ করিলেও, তাহাকে যে শান্তির অধিকারী করিতে পারিতেছে না, তাহা ঐজন্য। কে উহার প্রতিকার করিবে? পৃথিবীর ঐ অশান্তি ও হাহাকার কাহার প্রাণে নিরন্তর ধ্বনিত হইয়া তাহাকে সর্ব্বভোগসাধন উপেক্ষাপূর্ব্বক যুগোপযোগী নূতন ধর্ম্মপথাবিষ্কারে প্রযুক্ত করিবে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম্ম-গ্লানি দূর করিয়া শান্তিময় নূতন পথে জীবন পরিচালিত করিতে মানবকে পুনরায় কে শিক্ষা প্রদান করিবে?

পাশ্চাত্যভাববিস্তারে ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্মগ্লানি।

গীতামুখে শ্রীভগবান্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, জগতে ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইলেই তিনি নিজ মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শরীর-ধারী রূপে প্রকাশিত হইবেন এবং ঐ গ্লানি দূর করিয়া পুনরায় মানবকে শান্তির অধিকারী করিবেন। বর্ত্তমান যুগপ্রয়োজন কি তাঁহার করুণায় বিষম উত্তেজনা আনয়ন করিবে না? বর্ত্তমান অভাববোধ ও অশান্তি কি তাঁহাকে শরীর পরিগ্রহ করিতে প্রযুক্ত করিবে না?

ঐ গ্লানি নিবারণের জন্য ঈশ্বরের পুনরায় অবতীর্ণ হওয়া।

হে পাঠক! যুগপ্রয়োজন ঐকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে—শ্রীভগবান জগদ্‌গুরুরূপে সত্য সত্যই পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন! আশ্বস্তহৃদয়ে শ্রবণ কর, তাঁহার পূত আশীর্ব্বাণী,—"যত মত, তত পথ," "সর্ব্বান্তঃকরণে যাহাই অনুষ্ঠান করিবে, তাহা হইতেই তুমি শ্রীভগবানকে লাভ করিবে!" মুগ্ধ হইয়া অবলোকন কর—পরাবিদ্যা পুনরানয়নের জন্য তাঁহার অলৌকিক ত্যাগ ও তপস্যা!—এবং তাঁহার কামগন্ধহীন পুণ্যচরিত্রের যথাসাধ্য আলোচনা ও ধ্যান করিয়া, আইস, আমরা উভয়ে পবিত্র হই!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়।

ঈশ্বরাবতার বলিয়া যে সকল মহাপুরুষ জগতে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন, শ্রীভগবান রামচন্দ্র ও শাক্যসিংহের কথা ছাড়িয়া দিলে, তাঁহাদিগের সকলেরই পার্থিব জীবন দুঃখ-দারিদ্র্য, সংসারের অসচ্ছলতা এবং এমন কি, কঠোরতার ভিতর আরম্ভ হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, ক্ষত্রিয়রাজকুল অলঙ্কৃত করিলেও শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কারাগৃহে জন্ম ও আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে, নীচ গোপকুলমধ্যে বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল; শ্রীভগবান ঈশা পান্থশালায় পশুরক্ষাগৃহে দরিদ্র পিতামাতার ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; শ্রীভগবান্ শঙ্কর দরিদ্র বিধবার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নগণ্য সাধারণ ব্যক্তির গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; ইস্‌লাম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীমৎ মহম্মদের জীবনেও ঐ কথার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐরূপ হইলেও কিন্তু, যে দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতর সন্তোষের সরসতা নাই, যে অসচ্ছল সংসারে নিঃস্বার্থতা ও প্রেম নাই, যে দরিদ্র পিতামাতার হৃদয়ে ত্যাগ, পবিত্রতা এবং কঠোর মনুষ্যত্বের সহিত কোমল দয়াদাক্ষিণ্যাদি ভাবসমূহের মধুর সামঞ্জস্য নাই, সে স্থলে তাঁহারা কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

দরিদ্রগৃহে ঈশ্বরের অবতীর্ণ হইবার কারণ।

ভাবিয়া দেখিলে, পূর্ব্বোক্ত বিধানের সহিত তাঁহাদিগের ভাবী জীবনের একটা গূঢ় সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। কারণ, যৌবন এবং প্রৌঢ়ে যাঁহাদিগকে সমাজের দুঃখী, দরিদ্র ও অত্যাচারিত-

দিগের নয়নাশ্রু মুছাইয়া হৃদয়ে শান্তিপ্রদান করিতে হইবে, তাঁহারা ঐসকল ব্যক্তির অবস্থার সহিত পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ও সহানুভূতিসম্পন্ন না হইলে ঐ কার্য্য সাধন করিবেন কিরূপে? শুদ্ধ তাহাই নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, সংসারে ধর্ম্মগ্লানি নিবারণের জন্যই অবতারপুরুষসকলের অভ্যুদয় হয়। ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পূর্ব্বপ্রচারিত ধর্ম্মবিধানসকলের যথাযথ অবস্থার সহিত প্রথমেই পরিচিত হইতে হয় এবং ঐসকল প্রাচীন বিধানের বর্ত্তমান গ্লানির কারণ আলোচনাপূর্ব্বক তাহাদিগের পূর্ণতা ও সাফল্যস্বরূপ দেশ-কালোপযোগী নূতন বিধান আবিষ্কার করিতে হয়। ঐ পরিচয়-লাভের বিশেষ সুযোগ দরিদ্রের কুটীর ভিন্ন ধনীর প্রাসাদ কখনও প্রদান করে না। কারণ, সংসারের সুখভোগে বঞ্চিত দরিদ্র ব্যক্তিই ঈশ্বর এবং তাঁহার বিধানকে জীবনের প্রধান অবলম্বনস্বরূপে সর্ব্বদা দৃঢ়ালিঙ্গন করিয়া থাকে। আজও এদেশে সর্ব্বত্র ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের যথাযথ কিঞ্চিদাভাস দরিদ্রের কুটীরকে তখনও উজ্জ্বল করিয়া রাখে; এবং ঐজন্যই বোধ হয়, জগদ্গুরু মহাপুরুষসকল জন্ম পরিগ্রহকালে দরিদ্র পরিবারেই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

যে মহাপুরুষের কথা আমরা বলিতে বসিয়াছি, তাঁহার জীবনারম্ভও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অতিক্রম করে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর।

হুগলী জেলার উত্তরপশ্চিমাংশ যেখানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলাদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সন্ধিস্থলের অনতিদূরে তিন খানি গ্রাম ত্রিকোণমণ্ডলে পরস্পরের সন্নিকটে অবস্থিত আছে। গ্রামবাসীদিগের নিকটে ঐ গ্রামত্রয় শ্রীপুর, কামারপুকুর ও

মুকুন্দপুররূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত থাকিলেও, উহারা পরস্পর এত ঘন সন্নিবেশে অবস্থিত যে, পথিকের নিকটে একই গ্রামের বিভিন্ন পল্লী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। সেজন্য চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলে উহারা একমাত্র কামারপুকুর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্থানীয় জমীদারদিগের বহুকাল ঐ গ্রামে বাস থাকাতেই বোধ হয় কামারপুকুরের পূর্ব্বোক্ত সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই কালে কামারপুকুর শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমান মহারাজের গুরুবংশীয়দিগের লাখরাজ জমিদারীভুক্ত ছিল এবং তাঁহাদিগের বংশধর শ্রীযুক্ত গোপীলাল, সুখলাল প্রভৃতি গোস্বামিগণ * ঐ গ্রামে বাস করিতেছিলেন।

কামারপুকুর হইতে বর্দ্ধমানসহর প্রায় বত্রিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। উক্ত সহর হইতে আসিবার বরাবর পাকা রাস্তা আছে। কামারপুকুরে আসিয়াই ঐ রাস্তার শেষ হয় নাই; ঐ গ্রামকে অর্দ্ধবেষ্টন করিয়া উহা দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ৺পুরীধাম পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পাদচারী দরিদ্র যাত্রী এবং বৈরাগ্যবান সাধুসকলের অনেকে ঐ পথ দিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমনাগমন করেন।

কামারপুকুরের প্রায় ৯।১০ ক্রোশ পূর্ব্বে ৺তারকেশ্বর মহাদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত। ঐ স্থান হইতে দারকেশ্বর

* ৺হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে সুখলালের স্থলে অনুপ গোস্বামীর নাম বলিয়াছিলেন; কিন্তু বোধ হয় উহা সমীচীন নহে। গ্রামের বর্ত্তমান জমীদার লাহাবাবুদের নিকটে শুনিয়াছি, উক্ত গোস্বামিজীর নাম সুখলাল ছিল এবং ইঁহার পুত্র কৃষ্ণলাল গোস্বামীর নিকট হইতেই তাঁহারা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কামারপুকুরের অধিকাংশ জমী ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। আবার গ্রামে প্রবাদ আছে, ৺গোপেশ্বর নামক বৃহৎ শিবলিঙ্গ গোপীলাল গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত করেন, অতএব উক্ত গোপীলাল গোস্বামী সুখলালের কোন পূর্ব্বতন পুরুষ ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। অথবা এমনও হইতে পারে,—সুখলালের অন্য নাম গোপীলাল ছিল।

নদের তীরবর্ত্তী জাহানাবাদ বা আরামবাগের মধ্য দিয়া কামারপুকুরে আসিবার একটি পথ আছে। তদ্ভিন্ন উক্ত গ্রামের প্রায় নয় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ঘাটাল হইতে এবং প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত বন-বিষ্ণুপুর হইতেও এখানে আসিবার প্রশস্ত পথ আছে।

কামারপুকুর অঞ্চলের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও বর্ত্তমান অবস্থা।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়াপ্রসূত মহামারীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে কৃষিপ্রধান বঙ্গের পল্লীগ্রামসকলে কি অপূর্ব্ব শান্তির ছায়া অবস্থান করিত, তাহা বলিবার নহে। বিশেষতঃ হুগলি বিভাগের এই গ্রামসকলে বিস্তীর্ণ ধান্যপ্রান্তরসকলের মধ্যগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি বিশাল হরিৎসাগরে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় প্রতীত হইত। জমীর উর্ব্বরতায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব না থাকায় এবং নির্ম্মল বায়ুতে নিত্য পরিশ্রমের ফলে গ্রামবাসীদিগের দেহে স্বাস্থ্য ও সবলতা এবং মনে প্রীতি ও সন্তোষ সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত। বহুজনাকীর্ণ গ্রামসকলে আবার, কৃষি ভিন্ন ছোট খাট নানাপ্রকার শিল্পব্যবসায়েও লোকে নিযুক্ত থাকিত। ঐরূপে উৎকৃষ্ট জিলাপী, মিঠাই ও নবাত প্রস্তুত করিবার জন্য কামারপুকুর এই অঞ্চলে চিরপ্রসিদ্ধ; এবং আবলুষ কাষ্ঠনির্ম্মিত হুঁকার নল নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঐ গ্রাম কলিকাতার সহিত কারবারে এখনও বেশ দুপয়সা অর্জ্জন করিয়া থাকে। সূতা, গামছা ও কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য এবং অন্য নানা শিল্পকার্য্যেও কামারপুকুর এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। বিষ্ণু চাপড়ি, [illegible] কয়েকজন বিখ্যাত লবণব্যবসায়ী এই গ্রামে বাস করিয়া কলিকাতার সহিত অনেক টাকার কারবার করিতেন। [illegible] শনি ও মঙ্গলবারে গ্রামে এখনও হাট বসিয়া থাকে; আশপাশ[illegible]

বদনগঞ্জ, সিহর, দেশরা প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকল হইতে লোকে সূতা, বস্ত্র, গামছা, হাঁড়ি, কলসী, কুলা, চেঙ্গারি, মাদুর, চেটাই প্রভৃতি সংসারে নিত্যব্যবহার্য্য পণ্য ও ক্ষেত্রজ দ্রব্যসকল হাটবারে কামারপুকুরে আনয়নপূর্ব্বক পরস্পরে ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। গ্রামে আনন্দোৎসবের অভাব এখনও লক্ষিত হয় না। চৈত্রমাসে মনসাপূজা ও শিবের গাজনে এবং বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠে চব্বিশ প্রহরীয় হরিবাসরে কামারপুকুর মুখরিত হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন জমীদারবাটীতে বারমাস সকলপ্রকার পাল পার্ব্বণ এবং প্রতিষ্ঠিত দেবালয়সকলে নিত্যপূজা ও পার্ব্বণাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অবশ্য, দারিদ্র্যজনিত অভাব বর্ত্তমানে ঐ সকলের অনেকাংশে লোপ সাধন করিয়াছে।

ঐ অঞ্চলে ৺ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা।

৺ধর্ম্মঠাকুরের পূজায়ও এখানে এককালে বিশেষ আড়ম্বর ছিল। কিন্তু এখন আর সেই কাল নাই; বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম শ্রীধর্ম্ম এখন কূর্ম্মমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া এখানে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলে সামান্য পূজা মাত্রই পাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণকেও সময়ে সময়ে ঐ মূর্ত্তির পূজা করিতে দেখা গিয়া থাকে। উক্ত ধর্ম্মঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন নাম বিভিন্ন গ্রামে শুনিতে পাওয়া যায়। যথা, কামারপুকুরের ধর্ম্মঠাকুরের নাম—'রাজাধিরাজ ধর্ম্ম'; শ্রীপুরে প্রতিষ্ঠিত উক্ত ঠাকুরের নাম—'যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্ম্ম'; এবং মুকুন্দপুরের সন্নিকটে মধুবাটী নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের নাম 'সন্ন্যাসীরায় ধর্ম্ম'। কামারপুকুরে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের রথযাত্রাও এককালে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। নবচূড়া-সমন্বিত সুদীর্ঘ রথখানি তখন তাঁহার মন্দিরপার্শ্বে নিত্য নয়ন-গোচর হইত। ভগ্ন হইবার পরে ঐ রথ আর নির্ম্মিত হয়

নাই। ধর্ম্মমন্দিরটিও সংস্কারাভাবে ভূমিসাৎ হইতে বসিয়াছে দেখিয়া, ধর্ম্মপণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর তাঁহার নিজ বাটীতে ঠাকুরকে এখন স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

হালদারপুকুর, ভূতীর খাল, আম্রকানন প্রভৃতির কথা।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, সদ্গোপ, কামার, কুমার, জেলে, ডোম প্রভৃতি উচ্চ নীচ সকল প্রকার জাতিরই কামারপুকুরে বসতি আছে। গ্রামে তিনচারিটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। তন্মধ্যে হালদারপুকুরই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র পুষ্করিণী অনেক আছে। তাহাদিগের কোন কোনটি আবার শতদল কমল, কুমুদ ও কহ্লারশ্রেণী বক্ষে ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। গ্রামে ইষ্টকনির্ম্মিত বাটীর ও সমাধির অসদ্ভাব নাই। পূর্ব্বে উহার সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। রামানন্দ শাঁখারির ভগ্ন দেউল, ফকির দত্তের জীর্ণ রাসমঞ্চ, জঙ্গলাকীর্ণ ইষ্টকের স্তূপ এবং পরিত্যক্ত দেবালয়সমূহ নানা স্থলে বিদ্যমান থাকিয়া ঐ বিষয়ের এবং গ্রামের পূর্ব্বসমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রামের ঈশান ও বায়ুকোণে 'বুধুই মোড়ল' ও 'ভূতীর খাল' নামক দুইটি শ্মশান বর্ত্তমান। শেষোক্ত স্থানের পশ্চিমে গোচর প্রান্তর, মাণিকরাজা-প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য আম্রকানন এবং আমোদর নদ বিদ্যমান আছে। ভূতীর খাল, দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া গ্রামের অনতিদূরে উক্ত নদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

ভূরসুবোর মাণিক-রাজা।

কামারপুকুরের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে ভূরসুবো নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তির তথায় বাস ছিল। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম-সকলে ইনি 'মাণিকরাজা' নামে পরিচিত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত আম্রকানন ভিন্ন 'সুখসায়ের', 'হাতিসায়ের',

প্রভৃতি বৃহৎ দীর্ঘিকাসকল এখনও ইঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। শুনা যায়, ইঁহার বাটীতে লক্ষ ব্রাহ্মণ অনেকবার নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিয়াছিলেন।

কামারপুকুরের দক্ষিণপূর্ব্ব বা অগ্নিকোণে মান্দারণ গ্রাম। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে কোন কালে এখানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্রকায় আমোদর নদের গতি কৌশলে পরিবর্ত্তিত করিয়া উক্ত গড়ের পরিখায় পরিণত করা হইয়াছিল।

গড় মান্দারণ।

মান্দারণ দুর্গের ভগ্ন তোরণ, স্তূপ ও পরিখা এবং উহার অনতিদূরে শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া পাঠানদিগের রাজত্বকালে এই সকল স্থানের প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিতেছে। গড়মান্দারণের পার্শ্ব দিয়াই বর্দ্ধমানে গমনাগমন করিবার পূর্ব্বোক্ত পথ প্রসারিত রহিয়াছে। ঐ পথের দুই ধারে অনেকগুলি বৃহৎ দীর্ঘিকা নয়নগোচর হয়। উক্ত গড় হইতে প্রায় নয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত উচালন নামক স্থানের দীর্ঘিকাই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উক্ত পথের এক স্থানে একটি ভগ্ন হস্তিশালাও লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ সকল দর্শনে বুঝিতে পারা যায়, যুদ্ধবিগ্রহের সৌকর্য্যার্থেই এই পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মোগলমারির প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র পথিমধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

উচালনের দীঘি ও মোগলমারির যুদ্ধক্ষেত্র।

কামারপুকুরের পশ্চিমে প্রায় এক ক্রোশ দূরে সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে নামক তিনখানি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত আছে। এই গ্রামসকল এককালে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। দেরের

দীর্ঘিকা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেবালয় এবং অন্য নানা বিষয় দেখিয়া ঐ কথা অনুমিত হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে উক্ত গ্রামত্রয় ভিন্ন জমীদারীভুক্ত ছিল এবং উহার জমীদার রামানন্দ রায় সাতবেড়ে নামক গ্রামে বাস করিতেছিলেন। এই জমীদার বিশেষ ধনাঢ্য না হইলেও বিষম প্রজাপীড়ক ছিলেন। কোন কারণে কাহারও উপর কুপিত হইলে, ইনি ঐ প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ইঁহার কন্যাপুত্রাদির মধ্যে কেহই জীবিত ছিল না। লোকে বলে, প্রজাপীড়ন অপরাধেই ইনি নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর পরে ইঁহার বিষয়সম্পত্তি অপরেব হস্তগত হইয়াছিল।

দেবে গ্রামেব জমীদার রামানন্দ বায়ের কথা।

প্রায় দেড় শত বৎসব পূর্ব্বে মধ্যবিৎ অবস্থাসম্পন্ন, ধর্ম্মনিষ্ঠ এক ব্রাহ্মণপরিবারের দেরে গ্রামে বাস ছিল। ইঁহারা সদাচারী, কুলীন এবং শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। ইঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত শিবালয়সমন্বিত পুষ্করিণী এখনও 'চাটুর্য্যে পুকুর' নামে খ্যাত থাকিয়া ইঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উক্তবংশীয় শ্রীযুক্ত মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের তিন পুত্র এবং এক কন্যা হইয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ক্ষুদিরাম সম্ভবতঃ সন ১১৮১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে রামশীলা নাম্নী কন্যার এবং নিধিরাম ও কানাইরাম নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম হইয়াছিল।

দেরে গ্রামেব মাণিক-রাম চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত অর্থকরী কোনরূপ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, ক্ষমা এবং ত্যাগ প্রভৃতি যে গুণসমূহ সদ্ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আছে,

বিধাতা তাঁহাকে ঐ সকল গুণ প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘ এবং সবল ছিলেন, কিন্তু স্থূলকায় ছিলেন না; গৌরবর্ণ এবং প্রিয়দর্শন ছিলেন। বংশানুগত শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তির তাঁহাতে বিশেষ প্রকাশ ছিল এবং তিনি নিত্যকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া প্রতিদিন পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক ৺রঘুবীরের পূজান্তে জলগ্রহণ করিতেন। শূদ্রের নিকট হইতে দান গ্রহণ দূরে থাকুক, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ তিনি কখনও গ্রহণ করেন নাই; এবং যে সকল ব্রাহ্মণ পণ গ্রহণ করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিত, তাহাদিগের হস্তে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করিতেন না। ঐরূপ নিষ্ঠা ও সদাচারের জন্য গ্রামবাসীরা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মানের চক্ষে দর্শন করিত।

তৎপুত্র ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কথা।

পিতার মৃত্যুর পরে সংসার ও বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের স্কন্ধেই পতিত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মপথে অবিচলিত থাকিয়া তিনি ঐ সকল কার্য্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলেও, তাঁহার পত্নী অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং আন্দাজ পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পুনরায় দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার এই পত্নীর নাম শ্রীমতী চন্দ্রমণি ছিল; কিন্তু বাটীতে ইঁহাকে সকলে 'চন্দ্রা' বলিয়াই সম্বোধন করিত।

ক্ষুদিরাম-গৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী।

শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর পিত্রালয় সরাটিমায়াপুর নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল। তিনি সুরূপা, সরলা এবং দেবদ্বিজপরায়ণা ছিলেন। কিন্তু হৃদয়ের অসীম শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসাই তাঁহার বিশেষ গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, এবং ঐ সকলের জন্যই

তিনি সংসারে সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সন ১১৯৭ সালে শ্রীমতী চন্দ্রমণি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সন ১২০৫ সালে বিবাহের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র ছিল। সম্ভবতঃ সন ১২১১ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র রামকুমার জন্মগ্রহণ করে। উহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে শ্রীমতী কাত্যায়নী নাম্নী কন্যার এবং সন ১২৩২ সালে দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বরের মুখাবলোকন করিয়া তিনি আনন্দিতা হইয়াছিলেন।

জমীদারের সহিত বিবাদে ক্ষুদিরামের সর্ব্বস্বান্ত হওয়া।

ধর্ম্মপথে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যে কতদূর কঠিন কার্য্য, তাহা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের হৃদয়ঙ্গম হইতে বিলম্ব হয় নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার কন্যা কাত্যায়নীর জন্মপরিগ্রহের কিঞ্চিৎকাল পরে তিনি বিষম পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছিলেন। গ্রামের জমীদার রামানন্দ রায়ের প্রজাপীড়নের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দেরেপুরের কোন ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি এখন মিথ্যাপবাদে আদালতে মোকদ্দমা আনয়ন করিলেন এবং বিশ্বস্ত সাক্ষীর প্রয়োজন দেখিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষুদিরাম আইন আদালতকে সর্ব্বদা ভীতির চক্ষে দেখিতেন এবং ঘটনা সত্য হইলেও ইতিপূর্ব্বে কখন কাহারও বিরুদ্ধে উহাদিগের আশ্রয় লইতেন না। সুতরাং জমীদারের পূর্ব্বোক্ত অনুরোধে আপনাকে বিশেষ বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। কিন্তু মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান না করিলে জমীদারের বিষম কোপে পতিত হইতে হইবে, একথা স্থির জানিয়াও তিনি উহাতে কিছুতেই সম্মত হইতে পারিলেন না। অগত্যা এস্থলে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল; জমীদার তাঁহারও বিরুদ্ধে মিথ্যা-

অপবাদ প্রদানপূর্ব্বক নালিশ রুজু করিলেন এবং মোকদ্দমায় জয়ী হইয়া তাঁহার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি নিলাম করিয়া লইলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দেরেপুরে থাকিবার বিন্দুমাত্র স্থান রহিল না। গ্রামবাসী সকলে তাঁহার দুঃখে যথার্থ কাতর হইলেও তাঁহাকে জমীদারের বিরুদ্ধে কোনই সহায়তা করিতে পারিল না।

ক্ষুদিরামের দেরে গ্রাম পরিত্যাগ।

ঐরূপে প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম এককালে নিঃস্ব হইলেন। পিতৃপুরুষদিগের অধিকারি-স্বত্বে এবং নিজ উপার্জ্জনের ফলে যে সম্পত্তি * তিনি এতকাল ধরিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বায়ুতাড়িত ছিন্নাভ্রের ন্যায় উহা এখন কোথায় এককালে বিলীন হইল। কিন্তু ঐ ঘটনা তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সক্ষম হইল না। তিনি ৺রঘুবীরের শ্রীপাদ-পদ্মে একান্ত শরণ গ্রহণ করিলেন এবং স্থিরচিত্তে নিজ কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক দুর্জ্জনকে দূর পরিহার করিবার নিমিত্ত পৈতৃক ভিটা ও গ্রাম হইতে চিরকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সুখলাল গোস্বামীর আমন্ত্রণে ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে আগমন ও বাস।

কামারপুকুরের শ্রীযুক্ত সুখলাল গোস্বামিজীর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সমস্বভাববিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সহিত ইঁহার পূর্ব্ব হইতে বিশেষ সৌহৃদ্য উপস্থিত হইয়াছিল। বন্ধুর ঐরূপ বিপদের কথা শুনিয়া ইনি বিশেষ বিচলিত হইলেন এবং নিজ বাটীর একাংশে কয়েকখানি চালা ঘর চিরকালের জন্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে কামারপুকুরে আসিয়া বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া

* হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছি, দেরেপুরে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের প্রায় দেড়শত বিঘা জমী ছিল।

পাঠাইলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম উহাতে অকূলে কূল পাইলেন; এবং শ্রীভগবানের অচিন্ত্য লীলাতেই পূর্ব্বোক্ত অনুরোধ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া, কৃতজ্ঞহৃদয়ে কামারপুকুরে আগমন-পূর্ব্বক তদবধি ঐ স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। বন্ধুপ্রাণ সুখলাল উহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষুদিরামের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য এক বিঘা দশ ছটাক ধান্যজমী তাঁহাকে চিরকালের জন্য প্রদান করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

কামারপুকুরে ধর্ম্মের সংসার।

দশ বৎসরের পুত্র রামকুমার ও চারি বৎসরের কন্যা কাত্যায়নীকে সঙ্গে লইয়া সস্ত্রীক ক্ষুদিরাম যে দিন কামারপুকুরে আসিয়া পর্ণকুটীরে বাস করিলেন, তাঁহাদিগের সেদিনকার মনোভাব বলিবার নহে। ঈর্ষাদ্বেষ-পূর্ণ সংসার সেদিন তাঁহাদিগের নিকট অন্ধতমসাবৃত বিকট শ্মশানতুল্য; স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় তথায় মধ্যে মধ্যে ক্ষীণালোক বিস্তার করিয়া হৃদয়ে সুখাশার উদয় করিলেও, পরক্ষণেই উহা কোথায় বিলীন হয় এবং যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই সেখানে বিরাজ করিতে থাকে। পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া ঐরূপ নানা কথা যে তাঁহাদিগের মনে এখন উদিত হইয়াছিল একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কারণ, দুঃখ-দুর্দ্দিনে পড়িয়াই মানব সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি করে। অতএব শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের প্রাণে এখন যে বৈরাগ্যের উদয় হইবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। আবার, পূর্ব্বোক্ত অযাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবে আশ্রয়-লাভের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ অন্তর যে এখন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও নির্ভরতায় পূর্ণ হইয়াছিল, একথা বলিতে হইবে না। সুতরাং ৺রঘুবীরের হস্তে পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক সংসারের পুনরায় উন্নতিসাধনে উদাসীন হইয়া

কামারপুকুরে আসিয়া ক্ষুদিরামের বানপ্রস্থের ন্যায় জীবন যাপন করিবার কারণ।

তিনি যে এখন শ্রীভগবানের সেবাপূজাতে দিন কাটাইতে থাকিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? বাস্তবিক সংসারে থাকিলেও তিনি এখন হইতে অসংসারী হইয়া প্রাচীন কালের বানপ্রস্থসকলের ন্যায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

অদ্ভুত উপায়ে ক্ষুদিরামের ⁄রঘুবীর শিলা লাভ।

এই সময়ের একটি ঘটনায় শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ধর্ম্মবিশ্বাস অধিকতর গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। কার্য্যবশতঃ একদিন তাঁহাকে গ্রামান্তরে যাইতে হইয়াছিল। তথা হইতে ফিরিবার কালে তিনি শ্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে বৃক্ষতলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। জনশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর তাঁহার চিন্তাভারাক্রান্ত মনে শান্তি প্রদান করিল এবং নির্ম্মল বায়ু ধীরে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার শরীর স্নিগ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহার শয়নেচ্ছা বলবতী হইল এবং শয়ন করিতে না করিতে তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বপ্নাবেশে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার অভীষ্টদেব নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম-তনু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যেন দিব্য বালকবেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন এবং স্থানবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, 'আমি এখানে অনেক দিন অযত্নে অনাহারে আছি, আমাকে তোমার বাটীতে লইয়া চল, তোমার সেবা গ্রহণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে!' ঐ কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে বারংবার প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, 'প্রভু, আমি ভক্তিহীন ও নিতান্ত দরিদ্র, আমার গৃহে আপনার যোগ্য সেবা কখনই সম্ভবে না, অধিকন্তু সেবাপরাধী হইয়া আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে, অতএব ঐরূপ অন্যায় অনুরোধ কেন করিতেছেন?' বালক-বেশী

শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে প্রসন্নমুখে তাঁহাকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভয় নাই, আমি তোমার ত্রুটি কখনও গ্রহণ করিব না, আমাকে লইয়া চল!' ক্ষুদিরাম শ্রীভগবানের ঐরূপ অযাচিত কৃপায় আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, প্রাণের আবেগে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

জাগরিত হইয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ভাবিতে লাগিলেন, এ কি অদ্ভুত স্বপ্ন, হায় হায় কখনও কি তাঁহার সত্য সত্য ঐরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইবে? ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার দৃষ্টি নিকটবর্ত্তী ধান্যক্ষেত্রে পতিত হইল এবং বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ঐ স্থানটিই তিনি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন। কৌতূহলপরবশ হইয়া তিনি তখন গাত্রোত্থান করিলেন এবং ঐ স্থানে পৌঁছিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, একটি সুন্দর শালগ্রাম শিলার উপরে এক ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে! তখন শিলা হস্তগত করিতে তাঁহার মনে প্রবল বাসনা উপস্থিত হইল এবং তিনি দ্রুতপদে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভুজঙ্গ অন্তর্হিত হইয়াছে ও তাহার বিবরমুখে শালগ্রামটি পড়িয়া রহিয়াছে। স্বপ্ন অলীক নহে ভাবিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের হৃদয় তখন বিষম উৎসাহে পূর্ণ হইল এবং আপনাকে দেবাদিষ্ট জ্ঞানে তিনি ভুজঙ্গদংশনের ভয় না রাখিয়া 'জয় রঘুবীর' বলিয়া চীৎকারপূর্ব্বক শিলা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষুদিরাম শিলার লক্ষণসকল নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, বাস্তবিকই উহা 'রঘুবীর' নামক শিলা! তখন আনন্দে বিস্ময়ে অধীর হইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং যথাশাস্ত্র সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া উহাকে নিজ গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন। ৺রঘুবীরকে ঐরূপ অদ্ভুত উপায়ে পাইবার পূর্ব্বে

শ্রীযুত ক্ষুদিরাম নিজ অভীষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা ভিন্ন, ঘট প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ৺শীতলাদেবীকে নিত্য পূজা করিতেছিলেন।

একের পর এক করিয়া ত্রুদ্দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, ক্ষুদিরামও সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্টে উদাসীন থাকিয়া একমাত্র ধর্ম্মকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কাল কাটাইতে লাগিলেন। সংসারে কোন কোন দিন এককালে অন্নাভাব হইয়াছে; পতিপ্রাণা চন্দ্রাদেবী ব্যাকুলহৃদয়ে ঐ কথা স্বামীকে নিবেদন করিয়াছেন; শ্রীযুত ক্ষুদিরাম কিন্তু তাহাতেও বিচলিত না হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিয়াছেন, "ভয় কি, যদি ৺রঘুবীর উপবাসী থাকেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার সহিত উপবাসী থাকিব।" সরলপ্রাণা চন্দ্রাদেবী তাহাতে স্বামীর ন্যায় ৺রঘুবীরের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া গৃহকর্ম্মে নিরতা হইয়াছেন—আহার্য্যের সংস্থানও সেদিন কোনরূপে হইয়া গিয়াছে।

সাংসারিক কষ্টের মধ্যে ক্ষুদিরামের অবিচলতা ও ঈশ্বর নির্ভরতা।

ঐরূপ একান্ত অন্নাভাব কিন্তু শ্রীযুত ক্ষুদিরামকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার বন্ধু শ্রীযুত সুখলাল গোস্বামী তাঁহাকে লক্ষ্মীজলা নামক স্থানে যে এক বিঘা দশ ছটাক ধান্য-জমী প্রদান করিয়াছিলেন, ৺রঘুবীরের প্রসাদে তাহাতে এখন হইতে এত ধান্য হইতে লাগিল যে, উহাতে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের অভাব সংবৎসরের জন্য নিবারিত হওয়া ভিন্ন কিছু কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া অতিথি-অভ্যাগতের সেবাও চলিয়া যাইতে লাগিল। কৃষাণদিগকে পারিশ্রমিক দিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম উক্ত জমীতে চাষ করাইতেন এবং ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া বপনকাল উপস্থিত

লক্ষ্মীজলায় ধান্যক্ষেত্র।

হইলে, ৺রঘুবীরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং কয়েক গুচ্ছ ধান উহাতে প্রথমে রোপণ করিতেন, পরে কৃষকদিগকে ঐ কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে বলিতেন।

ক্ষুদিরামের ঈশ্বর-ভক্তির বৃদ্ধি ও দিব্যদর্শন লাভ। প্রতিবেশিগণের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা।

দিন মাস অতীত হইয়া ক্রমে দুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল এবং ৺রঘুবীরের মুখ চাহিয়া প্রায় আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিলেও শ্রীযুত ক্ষুদিরামের সংসারে মোটা অন্নবস্ত্রের অভাব হইল না। কিন্তু ঐ দুই তিন বৎসরের কঠোর শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে এখন যে শান্তি, সন্তোষ ও ঈশ্বর-নির্ভরতা নিরন্তর প্রবাহিত থাকিল, তাহা স্বল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। অন্তর্মুখ অবস্থায় থাকা তাঁহার মনের স্বভাব হইয়া উঠিল এবং উহার প্রভাবে তাঁহার জীবনে নানা দিব্য-দর্শন সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে সন্ধ্যা করিতে বসিয়া যখন তিনি ৺গায়ত্রী দেবীর ধ্যানাবৃত্তিপূর্ব্বক তচ্চিন্তায় মগ্ন হইতেন, তখন তাঁহার বক্ষঃস্থল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত এবং মুদিত নয়ন অবিরল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিত। প্রত্যূষে যখন তিনি সাজিহস্তে ফুল তুলিতে যাইতেন তখন দেখিতেন তাঁহার আরাধ্যা ৺শীতলা দেবী যেন অষ্টবর্ষীয়া কন্যারূপিণী হইয়া রক্তবস্ত্র ও নানা অলঙ্কার ধারণ-পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন এবং পুষ্পিত বৃক্ষের শাখাসকল নত করিয়া ধরিয়া তাঁহাকে ফুল তুলিতে সহায়তা করিতেছেন! ঐ সকল দিব্যদর্শনে তাঁহার অন্তর এখন সর্ব্বদা উল্লাসে পূর্ণ হইয়া থাকিত এবং তাঁহার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি বদনে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে এক অপূর্ব্ব দিব্যাবেশে নিরন্তর পরিবৃত করিয়া রাখিত। তাঁহার

সৌম্য শান্ত মুখ দর্শনে গ্রামবাসীরা উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাঁহাকে ক্রমে ঋষির ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিলে তাহারা বৃথালাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে উত্থান ও সম্ভাষণ করিত; তাঁহার স্নানকালে সেই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতে তাহারা সঙ্কোচ বোধ করিয়া সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করিত; তাঁহার আশীর্ব্বাণী নিশ্চিত ফলদান করিবে ভাবিয়া তাহারা বিপদে সম্পদে উঁহার প্রত্যাশী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত।

শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীকে প্রাতবেশিগণ যে চক্ষে দেখিত।

স্নেহ ও সরলতার মূর্ত্তি শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীও নিজ দয়া ও ভালবাসায় তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের মাতৃভক্তির যথার্থই অধিকারিণী হইলেন। কারণ সম্পদ্ বা আপৎকালে তাঁহার ন্যায় হৃদয়ের সহানুভূতি তাহারা আর কোথাও পাইত না। দরিদ্রেরা জানিত, শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর নিকট তাহারা যখনই উপস্থিত হইবে, তখন শুদ্ধ যে এক মুঠা খাইতে পাইবে, তাহা নহে; কিন্তু উহার সহিত এত অকৃত্রিম যত্ন ও ভালবাসা পাইবে যে, তাহাদিগের অন্তর পরম পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। ভিক্ষুক সাধুরা জানিত, এ বাটীর দ্বার তাহাদিগের নিমিত্ত সর্ব্বদা উন্মুক্ত আছে। প্রতিবেশী বালকবালিকারা জানিত চন্দ্রাদেবীর নিকটে তাহারা যে বিষয়ের জন্য আবদার করুক না কেন তাহা কোন না কোন উপায়ে পূর্ণ হইবেই হইবে। ঐরূপে প্রতিবেশীদিগের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শ্রীযুত ক্ষুদিরামের পর্ণকুটীরে যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হইত এবং দুঃখদারিদ্র্য বিদ্যমান থাকিলেও উহা এক অপূর্ব্ব শান্তির আলোকে নিরন্তর উদ্ভাসিত হইয়া থাকিত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীযুত ক্ষুদিরামের রামশীলা নাম্নী এক ভগিনী এবং নিধিরাম ও কানাইরাম বা রামকানাই নামক দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। দেরেপুরের জমীদারের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইয়া যখন তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, তখন তাঁহার উক্ত ভগিনীর বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বৎসর এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের ত্রিশ ও পঁচিশ বৎসর হইবে। তাঁহারা সকলেই তখন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন। কামারপুকুরের প্রায় ছয় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত ছিলিমপুরের ৺ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী রামশীলার বিবাহ হইয়াছিল এবং রামচাঁদ নামক এক পুত্র ও হেমাঙ্গিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত বিপদের সময় রামচাঁদের বয়স আন্দাজ একুশ বৎসর এবং হেমাঙ্গিনীর ষোল বৎসর ছিল। শ্রীযুক্ত রামচাঁদ তখন মেদিনীপুরে মোক্তারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীর দেরেপুরে মাতুলালয়েই জন্ম হইয়াছিল এবং ভ্রাতা অপেক্ষাও তিনি মাতুলদিগের অধিকতর স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ইঁহাকে কন্যা-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া, বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, কামারপুকুরের প্রায় আড়াই ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত সিহর গ্রামের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বয়ং সম্প্রদান করিয়াছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া ইনি ক্রমে রাঘব, রামরতন, হৃদয়রাম ও রাজারাম নামে চারি পুত্রের জননী হইয়াছিলেন।

ক্ষুদিরামের ভগিনী শ্রীমতী রামশীলার কথা

শ্রীযুত ক্ষুদিরামের নিধিরাম নামক ভ্রাতার কোন সন্তান হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই; কিন্তু

সর্ব্বকনিষ্ঠ কানাইরামের রামতারক ওরফে হলধারী এবং কালিদাস নামে তুই পুত্র হইয়াছিল। কানাইরাম ভক্তিমান্ ও ভাবুক ছিলেন। এক সময়ে কোন স্থানে ইনি যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলেন। শ্রীরাম-চন্দ্রের বনগমনের অভিনয় হইতেছিল। উহা শুনিতে শুনিতে তিনি এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে কৈকেয়ীর শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠাইবার মন্ত্রণা ও চেষ্টাদিকে সত্য জ্ঞান করিয়া ঐ ভূমিকার অভিনেতাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পৈতৃক সম্পত্তি হারাইবার পরে নিধিরাম ও কানাইরাম দেরেপুর পরিত্যাগ করিয়া সম্ভবতঃ যে যে গ্রামে তাঁহাদিগের শ্বশুরালয় ছিল, সেই সেই গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্ষুদিরামের ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা।

শ্রীমতী রামশীলার পুত্র শ্রীযুক্ত রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেদিনীপুরে মোক্তারি করিবার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ব্যবসায়সূত্রে ইনি ক্রমে মেদিনী-পুরে বাস করিয়া বেশ তুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন মাতুলদিগের তুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া ইনি শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে মাসিক পনর টাকা এবং নিধিরাম ও কানাইরামের প্রত্যেককে মাসিক দশ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম, ভাগিনেয়ের কিছুকাল সংবাদ না পাইলেই চিন্তিত হইয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হইতেন এবং তুই চারি দিন তাঁহার আলয়ে কাটাইয়া কামার-পুকুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। একবার ঐরূপে মেদিনীপুর আগমনকালে তাঁহার সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ঘটনাটি শ্রীযুত ক্ষুদিরামের আন্তরিক দেবভক্তির পরিচায়ক বলিয়া আমরা উহার এখানে উল্লেখ করিলাম।

ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় রামচাঁদ।

কামারপুকুরের প্রায় চল্লিশ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে মেদিনীপুর অবস্থিত। রামচাঁদ ও তাঁহার পরিবারবর্গের কুশল-সংবাদ অনেক দিন না পাওয়ায় চিন্তিত হইয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম একদিন ঐ স্থানে যাইবার জন্য বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন মাঘ বা ফাল্গুন মাস হইবে। বিল্ববৃক্ষের পত্রসকল এই সময় ঝরিয়া পড়ে এবং যতদিন না নবপত্রোদগম হয় ততদিন লোকের ৺শিবপূজা করিবার বিশেষ কষ্ট হয়। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ঐ কষ্ট কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছিলেন।

ক্ষুদিরামের দেবভক্তির পরিচায়ক ঘটনা।

অতি প্রত্যূষে বহির্গত হইয়া তিনি প্রায় দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া একটি গ্রামে পৌঁছিলেন এবং তথাকার বিল্ববৃক্ষসকল নবীন পত্রাভরণে ভূষিত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠিল। তখন মেদিনীপুর যাইবার কথা এককালে বিস্মৃত হইয়া তিনি গ্রাম হইতে একটি নূতন ঝুড়ি ও একখানি গামছা ক্রয় করিয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীর জলে বেশ করিয়া ধৌত করিলেন। পরে নবীন বিল্বপত্রে ঝুড়িটি পূর্ণ করিয়া ভিজা গামছাখানি উহার উপর চাপা দিয়া অপরাহ্ণ প্রায় তিন ঘটিকার সময় কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটী পৌঁছিয়াই শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম স্নান সমাপনপূর্ব্বক ঐ পত্রসকল লইয়া মহানন্দে ৺মহাদেব ও ৺শীতলা মাতার বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পূজা করিলেন; পরে স্বয়ং আহারে বসিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তখন অবসর লাভ করিয়া তাঁহাকে মেদিনীপুর না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আদ্যোপান্ত [illegible] [illegible] করিয়া বিল্বপত্রে দেবার্চ্চনা করিবার লোভে [illegible] [illegible] অতিবাহন করিয়াছেন জানিয়া বার বার [illegible]

পরদিন প্রত্যুষে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম পুনরায় মেদিনীপুরে যাত্রা করিলেন।

বামকুমাব ও কাত্যায়নীর বিবাহ।

এক দুই করিয়া ক্রমে কামারপুকুরে শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল। তাহার পুত্র রামকুমার এখন ষোড়শ বর্ষে এবং কন্যা কাত্যায়নী একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে দেখিয়া তিনি এখন পাত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কামারপুকুরের উত্তর-পশ্চিম এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত আনুর গ্রামের শ্রীযুক্ত কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে কন্যা সম্প্রদানপূর্ব্বক কেনারামের ভগিনীর সহিত নিজ পুত্র রামকুমারের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। রামকুমার নিকটবর্ত্তী গ্রামের চতুষ্পাঠীতে ইতিপূর্ব্বে ব্যাকরণ ও সাহিত্যপাঠ সমাপ্ত করিয়া এখন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

সুখলাল গোস্বামীর মৃত্যু ইত্যাদি।

ক্রমে আরও তিন চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। ৺রঘুবীরের প্রসাদে শ্রীযুত ক্ষুদিরামের সংসারে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্বচ্ছন্দাবস্থা হইয়াছে এবং তিনিও নিশ্চিন্ত মনে শ্রীভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। ঘটনার মধ্যে ঐ চারি বৎসরে শ্রীযুত রামকুমার স্মৃতি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সংসারের আর্থিক উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুত ক্ষুদিরামের পরম বন্ধু সুখলাল গোস্বামী উহার কোন সময়ে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুত সুখলালের মৃত্যুতে ক্ষুদিরাম যে বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন এ কথা বলা বাহুল্য।

রামকুমার মানুষ হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম নিশ্চিন্ত হইয়া এখন অন্য বিষয়ে মন

দিবার অবসর লাভ করিলেন। তীর্থ-দর্শনের জন্য তাঁহার অন্তর এখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর সম্ভবতঃ সন ১২৩০ সালে তিনি পদব্রজে ৺সেতুবন্ধরামেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশের তীর্থসকলে পর্য্যটন করিয়া প্রায় এক বৎসর পরে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ৺সেতুবন্ধ হইতে এই সময়ে তিনি একটি বাণলিঙ্গ কামারপুকুরে আনয়নপূর্ব্বক নিত্য পূজা করিতে থাকেন। ৺রামেশ্বর নামক ঐ বাণলিঙ্গটিকে এখনও কামারপুকুরে ৺রঘুবীর শিলার ও ৺শীতলা দেবীর ঘটের পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী বহুকাল পরে পুনরায় এই সময়ে গর্ভ ধারণ করিয়া সন ১২৩২ সালে এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ৺রামেশ্বর তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই পুত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ইহার নাম রামেশ্বর রাখিয়াছিলেন।

ক্ষুদিরামের ৺সেতুবন্ধ তীর্থ দর্শন ও রামেশ্বর নামক পুত্রের জন্ম।

ঐ ঘটনার পরে প্রায় আট বৎসর কাল পর্য্যন্ত কামারপুকুরের এই দরিদ্র সংসারে জীবনপ্রবাহ প্রায় সমভাবেই বহিয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামকুমার স্মৃতির বিধান দিয়া এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম্মে এখন উপার্জ্জন করিতেছিলেন। সুতরাং সংসারে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় কষ্ট ছিল না। শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম্মে রামকুমার বিশেষ পটু হইয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি ঐ বিষয়ে দৈবী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে তিনি ইতিপূর্ব্বে আদ্যাশক্তির উপাসনায় বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং উপযুক্ত গুরুর নিকট ৺দেবীমন্ত্রও গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভীষ্ট দেবীকে নিত্য পূজা করিবার কালে একদিন তাঁহার অপূর্ব্ব

রামকুমারের দৈবী শক্তি।

দর্শনলাভ হয় এবং তিনি অনুভব করিতে থাকেন, যেন ৺দেবী নিজ অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার জিহ্বাগ্রে জ্যোতিষশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য কোন মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া দিতেছেন। তদবধি রোগী ব্যক্তিকে দেখিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, সে আরোগ্য হইবে কি না এবং ঐ ক্ষমতাপ্রভাবে তিনি এখন যে রোগীর সম্বন্ধে যাহা বলিতে লাগিলেন, তাহাই ফলিয়া যাইতে লাগিল। ঐরূপে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া তাঁহার এই কালে এতদঞ্চলে সামান্য প্রসিদ্ধি-লাভ হইয়াছিল। শুনা যায়, তিনি এই সময়ে কঠিন পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার নিমিত্ত স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত হইতেন এবং জোর করিয়া বলিতেন, এই স্বস্ত্যয়ন-বেদীতে যে শস্য ছড়াইতেছি, তাহাতে কলার উদ্গম হইলেই এই ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে। ফলেও বাস্তবিক তাহাই হইত। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতার উদাহরণস্বরূপে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শিবরাম চট্টোপাধ্যায় আমাদিগের নিকটে নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন—

ঐ শক্তির পরিচায়ক ঘটনাবিশেষ।

কার্য্যোপলক্ষে রামকুমার কলিকাতায় আগমন করিয়া একদিন গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন। কোন ধনী ব্যক্তি ঐ সময়ে সপরিবারে তথায় স্নান করিতে আসিলেন এবং উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর স্নানের জন্য শিবিকা গঙ্গাগর্ভে লইয়া যাওয়া হইলে, উহার মধ্যে বসিয়াই ঐ যুবতী স্নান সমাপন করিতে থাকিলেন। পল্লীগ্রামবাসী রামকুমার স্নানকালে স্ত্রীলোকদিগের ঐরূপে আবরু রক্ষা কখন নয়নগোচর করেন নাই। সুতরাং বিস্মিত হইয়া উহা দেখিতে দেখিতে শিবিকামধ্যে অবস্থিত যুবতীর মুখকমল ক্ষণেকের নিমিত্ত দেখিতে পাইলেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত দৈবী

শক্তিপ্রভাবে তাঁহার মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—'আহা! আজ যাহাকে এত আদব কায়দায় স্নান করাইতেছে, কাল তাহাকে সর্ব্বজনসমক্ষে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিবে!' ধনী ব্যক্তি ঐ কথা শুনিতে পাইয়া ঐ বাক্য পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীযুত রামকুমারকে নিজালয়ে সাগ্রহে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল, ঘটনা সত্য না হইলে রামকুমারকে বিশেষরূপে অপমানিত করিবেন। যুবতী সম্পূর্ণ সুস্থ থাকায় ঐরূপ ঘটনা হইবার কোন লক্ষণও বাস্তবিক তখন দেখা যায় নাই। কিন্তু ফলে শ্রীযুত রামকুমার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছিল এবং ঐ ব্যক্তিও তাঁহাকে মান্যের সহিত বিদায় দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নিজ স্ত্রীর ভাগ্য দর্শন করিয়াও শ্রীযুত রামকুমার এক সময়ে বিষম ফল নির্ণয় করিয়াছিলেন, এবং ঘটনাও কিছুকাল পরে ঐরূপ হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার স্ত্রী বিশেষ সুলক্ষণসম্পন্না ছিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২২৬ সালে শ্রীযুত রামকুমার পাণিগ্রহণ করিয়া যেদিন তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া পত্নীকে কামারপুকুরে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তাঁহার ভাগ্যচক্র উন্নতির পথে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার পিতার দরিদ্র সংসারেও সেই দিন হইতে ঐরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, শ্রীযুত ক্ষুদিরামের মেদিনীপুরনিবাসী ভাগিনেয় শ্রীযুত রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাসিক সাহায্য ঐ সময় হইতে আসিতে আরম্ভ হয়। স্ত্রী বা পুরুষ, কোন ব্যক্তির সংসারে প্রথম প্রবেশকালে ঐরূপ শুভফল উপস্থিত হইলে, হিন্দুপরিবারে সকলে তাহাকে

ঐ শক্তির পরিচায়ক রামকুমারের স্ত্রীর সম্বন্ধীয় ঘটনা।

বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া থাকে, একথা বলিতে হইবে না। বিশেষতঃ রামকুমারের বালিকা পত্নী তখন আবার এই দরিদ্র সংসারে একমাত্র পুত্রবধূ। সুতরাং বালিকা যে, সকলের বিশেষ আদরের পাত্রী হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। আমরা শুনিয়াছি, ঐরূপ অতিমাত্রায় আদর যত্ন পাইয়া তাহার নানা সদ্‌গুণের সহিত অভিমান ও অনাশ্রবতারূপ দোষদ্বয় প্রশ্রয় পাইয়াছিল। ঐ দোষ সকলের চক্ষে পড়িলেও কেহ কিছু বলিতে বা সংশোধনের চেষ্টা করিতে সাহসী হইত না। কারণ, সকলে ভাবিত সামান্য দোষ থাকিলেও তাহার আগমনকাল হইতেই কি সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই? সে যাহা হউক, কিছু কাল পরে শ্রীযুত রামকুমার তাঁহার প্রাপ্তযৌবনা স্ত্রীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'সুলক্ষণা হইলেও গর্ভ-ধারণ করিলেই ইহার মৃত্যু হইবে!' পরে বহুকাল গত হইলেও যখন পত্নীর গর্ভ হইল না, তখন তিনি তাঁহাকে বন্ধ্যা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সকালে তাঁহার পত্নী প্রথম ও শেষ বার গর্ভবতী হইয়া সন ১২৫৫ সালে ছত্রিশ বৎসরে এক পরম রূপবান্ পুত্র-প্রসবান্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। এই পুত্রের নাম অক্ষয় রাখা হইয়াছিল। উহা অনেক পরের ঘটনা হইলেও সুবিধার জন্য পাঠককে এখানেই বলিয়া রাখিলাম।

ক্ষুদিরামের পরিবারস্থ সকলের বিশেষত্ব।

শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ধর্ম্মের সংসারে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই একটা বিশেষত্ব ছিল। অনুধাবন করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের অন্তর্গত ঐ বিশেষত্ব আধ্যাত্মিক রাজ্যের সূক্ষ্ম শক্তিসকলের অধিকার হইতে সর্ব্বথা সমুদ্ভূত হইত। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও

তাঁহার পত্নীর ভিতর ঐরূপ বিশেষত্ব অসাধারণভাবে প্রকাশিত ছিল বলিয়াই বোধ হয় উহা তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততিসকলে অনুগত হইয়াছিল। শ্রীযুত ক্ষুদিরামের সম্বন্ধে উক্ত বিষয়ক অনেক কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। শ্রীমতী চন্দ্রমণি সম্বন্ধে এখন ঐরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ অযোগ্য হইবে না। ঘটনাটিতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্বামীর ন্যায় শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীতেও দিব্যদর্শনশক্তি সময়ে সময়ে প্রকাশিত থাকিত। ঘটনাটি রামকুমারের বিবাহের কিছু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। পঞ্চদশ-বর্ষীয় রামকুমার তখন চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন ভিন্ন যজমানবাটী-সকলে পূজা করিয়া সংসারে যথাসাধ্য সাহায্য করিত।

চন্দ্রাদেবীর দিব্যদর্শন-সম্বন্ধী ঘটনা।

আশ্বিন মাসে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিনে রামকুমার ভূরসুবো নামক গ্রামে যজমানগৃহে উক্ত পূজা করিতে গিয়াছিল। অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলেও পুত্র গৃহে ফিরিতেছে না দেখিয়া শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং গৃহের বাহিরে আসিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ঐরূপে কাটিবার পরে তিনি দেখিতে পাইলেন প্রান্তরপথ অতিবাহিত করিয়া ভূরসুবোর দিক্ হইতে কে একজন কামারপুকুরে আগমন করিতেছে। পুত্র আসিতেছে ভাবিয়া তিনি উৎসাহে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলেন, সে রামকুমার নহে, এক পরমা সুন্দরী রমণী নানালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া একাকিনী চলিয়া আসিতেছেন। পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তখন বিশেষ আকুলিতা; সুতরাং ভদ্রবংশীয়া যুবতী রমণীকে গভীর রজনীতে ঐরূপে পথ অতিবাহন করিতে দেখিয়াও বিস্মিতা হইলেন না। সরলভাবে

তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?' রমণী উত্তর করিলেন, 'ভূরসুবো হইতে।' শ্রীমতী চন্দ্রা তখন ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার পুত্র রামকুমারের সঙ্গে কি তোমার দেখা হইয়াছিল ? সে কি ফিরিতেছে ?' অপরিচিতা রমণী তাঁহার পুত্রকে চিনিবেন কিরূপে, একথা তাঁহার মনে একবারও উদিত হইল না। রমণী তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, 'হাঁ, তোমার পুত্র যে বাটীতে পূজা করিতে গিয়াছে, আমি সেই বাটী হইতেই এখন আসিতেছি। ভয় নাই, তোমার পুত্র এখনই ফিরিবে।' শ্রীমতী চন্দ্রা এতক্ষণে আশ্বস্তা হইয়া অন্য বিষয় ভাবিবার অবসর পাইলেন এবং রমণীর অসামান্য রূপ, বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও নূতন ধরণের অলঙ্কারসকল দেখিয়া এবং মধুর বচন শুনিয়া বলিলেন, 'মা, তোমার বয়স অল্প ; এত গহনা গাঁটি পরিয়া এত রাত্রে কোথা যাইতেছ ? তোমার কানে ও কি গহনা ?' রমণী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'উহার নাম কুণ্ডল, আমাকে এখনও অনেক দূর যাইতে হইবে।' শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী তখন তাঁহাকে বিপন্না ভাবিয়া সস্নেহে বলিলেন, 'চল মা, আমাদের ঘরে আজ রাত্রের মত বিশ্রাম করিয়া, কাল যেখানে যাইবার, যাইবে এখন।' রমণী বলিলেন, 'না মা, আমাকে এখনি যাইতে হইবে ; তোমাদের বাড়ীতে আমি অন্য সময়ে আসিব।' রমণী ঐরূপ বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীমতী চন্দ্রা দেবীর বাটীর পার্শ্বেই লাহা বাবুদের অনেকগুলি ধান্যের মরাই ছিল, তদভিমুখে চলিয়া যাইলেন। রাস্তা না ধরিয়া লাহা বাবুদের বাটীর দিকে তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া চন্দ্রা দেবী বিস্মিতা হইলেন এবং রমণী পথ ভুলিয়াছে ভাবিয়া, ঐ স্থানে

উপস্থিত হইয়া চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না! তখন রমণীর বাক্যসকল স্মরণ করিতে করিতে সহসা তাঁহার প্রাণে উদয় হইল, স্বয়ং লক্ষ্মী-দেবীকে দর্শন করিলাম না কি? অনন্তর কম্পিতহৃদয়ে স্বামীর পার্শ্বে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম সমস্ত শ্রবণ করিয়া 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-দেবীই তোমাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্তা করিলেন। রামকুমারও কিছুক্ষণ পরে বাটীতে ফিরিয়া জননীর নিকটে ঐ কথা শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন।

ক্রমে সন ১২৪১ সাল সমাগত হইল। শ্রীযুত ক্ষুদিরামের জীবনে এই সময়ে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

ক্ষুদিরামের ৺গয়াতীর্থে গমন।

তীর্থদর্শনে তাঁহার অভিলাষ পুনরায় প্রবল ভাব ধারণ করায়, পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধার-কল্পে তিনি এখন গয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। যাট বৎসরে পদার্পণ করিলেও তিনি পদব্রজে ঐ ধামে গমন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। তাঁহার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীযুত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় তাঁহার গয়াধাম যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ঘটনা আমাদিগের নিকটে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

নিজ দুহিতা শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবীর বিশেষ পীড়ার সংবাদ পাইয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম এই সময়ে একদিন আনুর গ্রামে তাঁহাকে দেখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ক্ষুদিরামের গয়া গমন-সম্বন্ধে হৃদয়রাম-কথিত ঘটনা।

শ্রীমতী কাত্যায়নীর বয়স তখন আন্দাজ পঁচিশ বৎসর হইবে। পীড়িতা কন্যার হাব-ভাব ও কথাবার্ত্তায় তাঁহার নিশ্চয় ধারণা হইল, তাহার শরীরে কোন ভূতযোনির আবেশ হইয়াছে। তখন সন্তানহিতচিকীর্ষু

শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া তিনি কন্যাশরীরে প্রবিষ্ট জীবের উদ্দেশে বলিলেন, 'তুমি দেবতা বা উপদেবতা যাহাই হও, কেন আমার কন্যাকে এইরূপে কষ্ট দিতেছ? অবিলম্বে ইহার শরীর ছাড়িয়া অন্যত্র গমন কর।' তাঁহার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া উক্ত জীব ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া শ্রীমতী কাত্যায়নীর শরীরাবলম্বনে উত্তর করিল, 'গয়ায় পিণ্ডদানে প্রতিশ্রুত হইয়া যদি আপনি আমার বর্ত্তমান কষ্টের অবসান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার দুহিতার শরীর এখনি ছাড়িতে স্বীকৃত হইতেছি। আপনি যখনি ঐ উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইবেন, তখন হইতে ইহার আর কোন অসুস্থতা থাকিবে না, একথা আমি আপনার নিকটে অঙ্গীকার করিতেছি।' অনন্তর শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ঐ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'আমি যত শীঘ্র পারি ৺গয়াধামে গমনপূর্ব্বক তোমার অভিলাষ সম্পাদন করিব; এবং পিণ্ডদানের পরে তুমি যে নিশ্চয় উদ্ধার হইলে, ঐ সম্বন্ধে কোনরূপ নিদর্শন পাইলে বিশেষ সুখী হইব।' তখন প্রেত বলিল, 'ঐ বিষয়ের নিশ্চিত প্রমাণ স্বরূপে সম্মুখস্থ নিম্ববৃক্ষের বৃহত্তম ডালটি আমি ভাঙ্গিয়া যাইব, জানিবেন।' হৃদয়রাম বলিতেন, উক্ত ঘটনাই শ্রীযুত ক্ষুদিরামকে ৺গয়াধামে যাত্রা করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল এবং উহার কিছুকাল পরে উক্ত বৃক্ষের ডালটি সহসা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, সকলে ঐ প্রেতের উদ্ধার হইবার কথা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়াছিল। শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবীও তদবধি সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হইয়াছিলেন। হৃদয়রাম-কথিত পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটি কতদূর সত্য বলিতে পারি না; কিন্তু শ্রীযুত ক্ষুদিরাম যে এই সময়ে ৺গয়া দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, একথায় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সন ১২৪১ সালের শীতের কোন সময়ে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম বারাণসী* ও ৺গয়াধাম দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন।

গয়াধামে ক্ষুদিরামের দেব-স্বপ্ন।

প্রথমোক্ত স্থানে ৺বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া যখন তিনি গয়াক্ষেত্রে পৌঁছিলেন, তখন চৈত্র মাস পড়িয়াছে। মধু মাসে ঐ ক্ষেত্রে পিণ্ড প্রদানে পিতৃপুরুষসকলের অক্ষয় পরিতৃপ্তি হয় জানিয়াই বোধ হয় তিনি ঐ মাসে গয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। প্রায় এক মাস কাল তথায় অবস্থানপূর্ব্বক তিনি যথাবিহিত ক্ষেত্র-কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিয়া, পরিশেষে ৺গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করিলেন। ঐরূপে যথাশাস্ত্র পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরামের বিশ্বাসী হৃদয়ে ঐ দিন যে কতদূর তৃপ্তি ও শান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। পিতৃঋণ যথাসাধ্য পরিশোধ করিয়া তিনি যেন আজ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; এবং শ্রীভগবান্ তাঁহার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে ঐ কার্য্য সমাধা করিতে শক্তি প্রদান করিয়াছেন ভাবিয়া, তাঁহার কৃতজ্ঞ অন্তর অভূতপূর্ব্ব দীনতা ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। দিবাভাগের ত কথাই নাই, রাত্রিকালে নিদ্রার সময়েও ঐ শান্তি ও উল্লাস তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইতে না যাইতে তিনি স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন, তিনি যেন শ্রীমন্দিরে ৺গদাধরের শ্রীপাদপদ্মসম্মুখে পুনরায় পিতৃপুরুষসকলের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিতেছেন এবং তাঁহারা যেন দিব্য জ্যোতির্ম্ময়

* কেহ কেহ বলেন, শ্রীযুত ক্ষুদিরাম বহুপূর্ব্বে এক সময়ে দেরেপুর হইতে তীর্থগমন-পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন, ৺অযোধ্যা এবং ৺বারাণসী দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন; এবং উহার কিছুকাল পরে তাঁহার পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে তিনি ঐ তীর্থযাত্রার কথা স্মরণ করিয়া, তাহাদিগের রামকুমার ও কাত্যায়নী নামকরণ করিয়াছিলেন। শেষ বারে তিনি কেবলমাত্র ৺গয়াধাম দর্শন করিয়াই বাটী ফিরিয়াছিলেন।

শরীরে উহা সানন্দে গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। বহুকাল পরে তাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিয়া তিনি যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছেন না ; ভক্তিগদ্গদচিত্তে রোদন করিতে করিতে তাহাদিগের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। পরক্ষণেই আবার দেখিতে লাগিলেন, যেন অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিতে মন্দির পূর্ণ হইয়াছে এবং পিতৃ-পুরুষগণ সসম্ভ্রমে, সংযতভাবে দুই পার্শ্বে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া মন্দিরমধ্যে বিচিত্র সিংহাসনে সুখাসীন এক অদ্ভুত পুরুষের উপাসনা করিতেছেন! দেখিলেন, নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম, জ্যোতির্মণ্ডিততনু ঐ পুরুষ স্নিগ্ধপ্রসন্নদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে অবলোকনপূর্ব্বক হাস্যমুখে তাহাকে নিকটে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া তিনি যেন তখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিবিহ্বলচিত্তে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক হৃদয়ের আবেগে কত প্রকার স্তুতি ও বন্দনা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ঐ দিব্য পুরুষ যেন তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া বীণানিস্যন্দী মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 'ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে পরম প্রসন্ন হইয়াছি, পুত্ররূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আমি তোমার সেবা গ্রহণ করিব!' স্বপ্নেরও অতীত ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার যেন আনন্দের অবধি রহিল না, কিন্তু পরক্ষণেই চিরদরিদ্র তিনি তাঁহাকে কি খাইতে দিবেন, কোথায় রাখিবেন ইত্যাদি ভাবিয়া গভীর বিষাদে পূর্ণ হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন, 'না, না প্রভু, আমার ঐরূপ সৌভাগ্যের প্রয়োজন নাই ; কৃপা করিয়া আপনি যে আমাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিলেন এবং ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, ইহাই আমার

পক্ষে যথেষ্ট; সত্য সত্য পুত্র হইলে দরিদ্র আমি আপনার কি সেবা করিতে পারিব!' ঐ অমানব পুরুষ যেন তখন তাঁহার ঐরূপ করুণ বচন শুনিয়া অধিকতর প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, 'ভয় নাই ক্ষুদিরাম, তুমি যাহা প্রদান করিবে, তাহাই আমি তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিব; আমার অভিলাষ পূরণ করিতে আপত্তি করিও না।' শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ঐ কথা শুনিয়া যেন আর কিছুই বলিতে পারিলেন না; আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি পরস্পর বিপরীত ভাবসমূহ তাঁহার অন্তরে যুগপৎ প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে এককালে স্তম্ভিত ও জ্ঞানশূন্য করিল। এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কামারপুকুরে প্রত্যাগমন।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম কোথায় রহিয়াছেন তাহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলেন না। পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নের বাস্তবতা তাঁহাকে এককালে অভিভূত করিয়া রাখিল। পরে ধীরে ধীরে তাঁহার যখন স্থূল জগতের জ্ঞান উপস্থিত হইল তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি ঐ অদ্ভুত স্বপ্ন স্মরণ করিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন। পরিণামে তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয় স্থিরনিশ্চয় করিল, দেবস্বপ্ন কখনও বৃথা হয় না—নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ তাঁহার গৃহে শীঘ্র জন্ম পরিগ্রহ করিবেন—বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয় তাঁহাকে পুনরায় পুত্রমুখ অবলোকন করিতে হইবে। অনন্তর ঐ অদ্ভুত স্বপ্নের সাফল্য পরীক্ষা না করিয়া কাহারও নিকট তদ্বিবরণ প্রকাশ করিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প তিনি মনে মনে স্থির করিলেন এবং কয়েক দিন পরে ৺গয়াধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সন ১২৪২ সালের বৈশাখে কামারপুকুরে উপস্থিত হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

চন্দ্রা দেবীর বিচিত্র অনুভব।

জগৎ পাবন মহাপুরুষসকলের জন্ম পরিগ্রহ করিবার কালে তাঁহাদিগের জনক-জননীর জীবনে অসাধারণ আধ্যাত্মিক অনুভব ও দর্শনসমূহ উপস্থিত হইবার কথা পৃথিবীস্থ সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ, মায়াদেবীতনয় বুদ্ধ, মেরীনন্দন ঈশা, শ্রীভগবান্ শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভৃতি যে সকল মহামহিম পুরুষপ্রবর মানব মনের ভক্তি শ্রদ্ধাপূত পূজার্ঘ্য অদ্যাবধি প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত হইতেছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জনক-জননীর সম্বন্ধেই ঐরূপ কথা শাস্ত্রনিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমাণস্বরূপে নিম্ন-লিখিত কয়েকটি কথা এখানে স্মরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে—

অবতার পুরুষের আবির্ভাবকালে তাঁহার জনক জননীর দিব্য অনুভবাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রকথা।

যজ্ঞাবশিষ্ট পাত্রাবশেষ বা চরু ভোজন করিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রপ্রমুখ ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জননীগণের গর্ভধারণের কথা কেবলমাত্র রামায়ণপ্রসিদ্ধ নহে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে ও পরে তাঁহারা যে, বহুবার উক্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে জগৎপাতা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অংশসম্ভূত ও দিব্যশক্তিসম্পন্ন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন একথাও উহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী তাঁহার গর্ভপ্রবেশকালে এবং ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরে তাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বররূপে অনুভব করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন তাঁহার জন্ম-

গ্রহণের পরক্ষণ হইতে প্রতিদিন তাঁহাদিগের জীবনে নানা অদ্ভুত উপলব্ধির কথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণসকলে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেবের গর্ভপ্রবেশকালে শ্রীমতী মায়াদেবী দর্শন করিয়াছিলেন, জ্যোতির্ম্ময় শ্বেতহস্তীর আকার ধারণপূর্ব্বক কোন পুরুষপ্রবর যেন তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছেন এবং তাঁহার সৌভাগ্যদর্শনে ইন্দ্রপ্রমুখ যাবতীয় দেবগণ যেন তাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ ঈশার জন্মগ্রহণকালে তজ্জননী শ্রীমতী মেরী অনুভব করিয়াছিলেন, নিজ স্বামী শ্রীযুত যোষেফের সহিত সঙ্গতা হইবার পূর্ব্বেই যেন তাঁহার গর্ভ উপস্থিত হইয়াছে—অনন্নুভূতপূর্ব্ব দিব্য আবেশে আবিষ্ট ও তন্ময় হইয়াই তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীভগবান্ শঙ্করের জননী অনুভব করিয়াছিলেন দেবাদিদেব মহাদেবের দিব্যদর্শন ও বরলাভেই তাঁহার গর্ভধারণ হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জননী শ্রীমতী শচীদেবীর জীবনেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার নানা দিব্য অনুভব উপস্থিত হইবার কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপ্রমুখ গ্রন্থসকলে লিপিবদ্ধ আছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম, ঈশ্বরের সপ্রেম উপাসনাকে মুক্তিলাভের সুগম পথ বলিয়া মানবের নিকট নির্দ্দেশ করিয়াছে; তাহাদিগের সকলেই ঐরূপে ঐবিষয়ে এক-মত হওয়ায় নিরপেক্ষ বিচারকের মনে স্বতঃই প্রশ্নের উদয় হয়, উহার ভিতর বাস্তবিক কোন সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কি না, এবং মহাপুরুষগণের জীবনেতিহাসে বর্ণিত ঐ সকল আখ্যায়িকার ভিতর কতটা গ্রহণ এবং কতটাই বা ত্যাগ করা বিধেয়।

যুক্তি, অন্য পক্ষে, মানবকে ইঙ্গিত করিয়া থাকে যে, কথাটার ভিতর কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। কারণ, বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান যখন উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন পিতামাতারই উদারচরিত্রবান্ পুত্রোৎপাদনের সামর্থ্য স্বীকার করিয়া থাকে, তখন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও ঈশাদির ন্যায় মহাপুরুষগণের জনক-জননী যে, বিশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন একথা গ্রহণ করিতে হয়। তৎসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ সকল পুরুষোত্তমকে জন্মপ্রদানকালে তাঁহাদিগের মন সাধারণ মানবাপেক্ষা অনেক উচ্চ ভূমিতে অবস্থান করিয়াছিল, এবং ঐরূপে উচ্চ ভূমিতে অবস্থানের জন্যই তাঁহারা ঐকালে অসাধারণ দর্শন ও অনুভবাদির অধিকারী হইয়াছিলেন।

ঐ শাস্ত্রকথার যুক্তিনির্দ্দেশ।

কিন্তু পুরাণেতিহাস ঐ বিষয়ক নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেও, এবং যুক্তি ঐকথা ঐরূপে সমর্থন করিলেও, মানবমন উহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে পারে না। কারণ, উহা সর্ব্বোপরি নিজ প্রত্যক্ষের উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেজন্য আত্মা, ঈশ্বর, মুক্তি, পরকাল প্রভৃতি বিষয়সকলেও অপরোক্ষানুভূতির পূর্ব্বে কখন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারে না। ঐরূপ হইলেও কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি অসাধারণ বা অলৌকিক বলিয়াই কোন বিষয়কে ত্যাজ্য মনে করে না—কিন্তু স্বয়ং স্বাক্ষিস্বরূপ থাকিয়া স্থিরভাবে তদ্বিষয়ের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ প্রমাণসকল সংগ্রহে অগ্রসর হয় এবং উপযুক্ত কালে তদ্বিষয় মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ অথবা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে।

সহজে বিশ্বাসগম্য না হইলেও ঐ সকল কথা মিথ্যা বলিয়া ত্যাজ্য নহে।

সে যাহা হউক, যে মহাপুরুষের জীবনেতিহাস আমরা লিখিতে বসিয়াছি তাঁহার জন্মকালে তাঁহার জনক-জননীর জীবনেও

যে, নানা দিব্যদর্শন ও অনুভবসমূহ উপস্থিত হইয়াছিল একথা আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি। সুতরাং সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই। পূর্ব্ব অধ্যায়ে শ্রীযুত ক্ষুদিরামের সম্বন্ধে ঐরূপ কয়েকটি কথা পাঠককে বলিয়াছি। বর্ত্তমান অধ্যায়ে শ্রীমতী চন্দ্রমণি সম্বন্ধে ঐরূপ সকল কথা আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

গয়া হইতে ফিরিয়া ক্ষুদিরামের চন্দ্রা দেবীর ভাবপরিবর্ত্তন দর্শন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, গয়াধামে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম যে অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, গৃহে ফিরিয়া তাহার কথা কাহাকেও না বলিয়া তিনি নীরবে উহার ফলাফল লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ঐ বিষয় অনুসন্ধান করিতে যাইয়া শ্রীমতী চন্দ্রা দেবীর স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন প্রথমেই তাঁহার নয়নে পতিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন মানবী চন্দ্রা এখন যেন সত্য সত্যই দেবীত্ব পদবীতে আরূঢ়া হইয়াছেন। কোথা হইতে একটা সার্ব্বজনীন প্রেম আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া সংসারের বাসনাময় কোলাহল হইতে তাঁহাকে যেন অনেক উচ্চে তুলিয়া রাখিয়াছে। আপনার সংসারের চিন্তা অপেক্ষা শ্রীমতী চন্দ্রার মনে এখন অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশীসকলের সংসারের চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নিজ সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে তিনি দশবার ছুটিয়া যাইয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া আসেন এবং আহার্য্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুসকলের ভিতর যাহার যে বস্তুর অভাব দেখেন, আপন সংসার হইতে লুকাইয়া লইয়া যাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঐসকল তাহাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। আবার ৺রঘুবীরের সেবা সারিয়া স্বামী পুত্রাদিকে ভোজন করাইয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে স্বয়ং ভোজনে বসিয়া

পূর্ব্বে শ্রীমতী চন্দ্রা পুনরায় তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বাটীতে যাইয়া সংবাদ লইয়া আসেন, তাহাদিগেব সকলের ভোজন হইয়াছে কি না। যদি কোন দিন দেখিতে পান যে, কোন কারণে কাহারও আহার জুটে নাই তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সাদরে বাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক নিজের অন্ন ধরিয়া দিয়া স্বয়ং হৃষ্টচিত্তে সামান্য জলযোগ মাত্র করিয়া দিন কাটাইয়া দেন।

চন্দ্রা দেবীব অপত্য স্নেহেব প্রসার দর্শন।

শ্রীমতী চন্দ্রা প্রতিবেশী বালকবালিকাগণকে চিরকাল অপত্যনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন। ক্ষুদিরাম দেখিলেন, তাঁহার সেই অপত্যস্নেহ এখন যেন দেবতাসকলের উপরেও প্রসারিত হইয়াছে। কুলদেবতা ৺রঘুবীরকে তিনি এখন আপন পুত্রগণের অন্যতমরূপে সত্য সত্যই দর্শন করিতেছেন; এবং ৺শীতলা দেবী ও ৺রামেশ্বর বাণলিঙ্গটিও যেন তাঁহার হৃদয়ে ঐরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ সকল দেবতার সেবা ও পূজাকালে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার অন্তর শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত; ভালবাসা আসিয়া সেই ভয়কে যেন এখন কোথায় অন্তর্হিত করিয়াছে। দেবতাগণের নিকটে তাঁহার এখন আর ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই, লুকাইবার এবং চাহিবার যেন কিছুই নাই! আছে কেবল তৎস্থলে, আপনার হইতে আপনার বলিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান করা, তাঁহাদিগকে সুখী করিবার জন্য সর্ব্বস্ব প্রদানের ইচ্ছা এবং তাঁহাদিগের সহিত চিরসম্বন্ধ হওয়ার অনন্ত উল্লাস।

তদ্দর্শনে ক্ষুদিরামের চিন্তা ও আশঙ্কা।

ক্ষুদিরাম বুঝিলেন ঐরূপ নিঃসঙ্কোচ দেবভক্তি ও নির্ভরপ্রসূত উল্লাসই সরলহৃদয়া চন্দ্রাকে এখন অধিকতর উদারস্বভাবা করিয়াছে। উহাদিগের প্রভাবেই তিনি এখন কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে বা পর ভাবিতে

পারিতেছেন না। কিন্তু স্বার্থপর পৃথিবীর লোক তাঁহার এই অপূর্ব্ব উদারতার কথা কি কখনও যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিবে?—কখনই না। তাঁহাকে অল্পবুদ্ধি বা 'পাগল' বলিবে; অথবা কঠোরতর ভাষায় তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিবে। ঐরূপ ভাবিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন।

ঐরূপ অবসর আসিতে বিলম্বও হইল না। সরলপ্রাণা চন্দ্রা স্বামীর নিকটে নিজ চিন্তাটি পর্য্যন্ত কখনও গোপন করিতে পারিতেন না। বয়স্যাদিগের নিকটেই তিনি অনেক সময় মনের সকল কথা বলিয়া ফেলিতেন, তা পৃথিবীর সকলের অপেক্ষা যাঁহার সহিত তাঁহার নিকট-সম্বন্ধ ঈশ্বর স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নিকট ঐ সকল গোপন করিবেন কিরূপে? অতএব ৺গয়াদর্শন করিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম বাটী ফিরিলেই কয়েক দিন ধরিয়া চন্দ্রা দেবী তাঁহাকে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, দেখিয়াছিলেন অথবা অনুভব করিয়াছিলেন সেই সমস্ত কথা সুবিধা পাইলেই যখন তখন বলিতে লাগিলেন। ঐরূপ অবসরে একদিন বলিলেন, "দেখ, তুমি যখন ৺গয়া গিয়াছিলে তখন একদিন রাত্রিকালে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম, যেন এক জ্যোতির্ম্ময় দেবতা আমার শয্যাধিকার করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তুমি, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, কোন মানবের ঐরূপ রূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। সে যাহা হউক, ঐরূপ দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখনও মনে হইতে লাগিল তিনি যেন শয্যায় রহিয়াছেন। পরক্ষণে মনে হইল মানুষের নিকট দেবতা আবার কোন্ কালে ঐরূপে

চন্দ্রা দেবীর দেব-স্বপ্ন।

আসিয়া থাকেন? তখন মনে হইল তবে বুঝি কোন দুষ্ট লোক কোন মন্দ অভিসন্ধিতে ঘরে ঢুকিয়াছে এবং তাহার পদশব্দাদির জন্য আমি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। ঐকথা মনে হইয়াই বিষম ভয় হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিলাম; দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই, গৃহদ্বার যেমন অর্গলবদ্ধ তেমনি রহিয়াছে। তত্রাচ ভয়ে সে রাত্রে আর নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। ভাবিলাম, কে হয়ত কৌশলে অর্গল খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল এবং আমাকে জাগরিতা হইতে দেখিয়াই পলাইয়া পুনরায় কৌশলে অর্গল বদ্ধ করিয়া গিয়াছে। প্রভাত হইতে না হইতে ধনী কামারণী ও ধর্ম্মদাস লাহার ভগ্নী প্রসন্নকে ডাকাইলাম এবং তাহাদিগকে সকল কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা কি বুঝ বল দেখি, সত্য সত্যই কি কোন লোক আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল? আমার সহিত পল্লীর কাহারও বিরোধ নাই—কেবল মধু যুগীর সহিত সেদিন সামান্য কথা লইয়া কিছু বচসা হইয়াছিল—সেই কি আড়ি করিয়া ঐরূপে গৃহে প্রবেশ কবিয়াছিল?'—তখন তাহারা দুইজনে হাসিতে হাসিতে আমাকে অনেক তিরস্কার করিল। বলিল, 'মর্ মাগি, বুড়ো হয়ে তুই কি পাগল হলি নাকি, যে স্বপ্ন দেখে এইরূপে ঢলাচ্চিস্! অপর লোকে একথা শুন্‌লে বল্‌বে কি বল্ দেখি? তোর নামে একেবারে অপবাদ রটিয়ে দেবে। ফের যদি ওকথা কাউকে বল্‌বি ত মজা দেখ্‌তে পাবি।' তাহারা ঐরূপ বলাতে ভাবিলাম, তবে স্বপ্নই দেখিয়াছিলাম। আর ভাবিলাম, একথা আর কাহাকেও বলিব না, কিন্তু তুমি ফিরিয়া আসিলে তোমাকে বলিব।

"আর একদিন, যুগীদের শিব-মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া

ধনীর সহিত কথা কহিতেছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম, ৺মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হইয়া মন্দির পূর্ণ করিয়াছে এবং বায়ুর ন্যায় তরঙ্গাকারে উহা আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! আশ্চর্য্য হইয়া ধনীকে ঐকথা বলিতে যাইতেছি, এমন সময়ে সহসা উহা নিকটে আসিয়া আমাকে যেন ছাইয়া ফেলিল এবং আমার ভিতরে প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিতা হইয়া এককালে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলাম। পরে, ধনীর শুশ্রূষায় চৈতন্য হইলে তাহাকে সকল কথা বলিলাম। সে শুনিয়া প্রথমে অবাক্ হইল, পরে বলিল, 'তোমার বায়ুরোগ হইয়াছে।' আমার কিন্তু তদবধি মনে হইতেছে ঐ জ্যোতিঃ যেন আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং আমার যেন গর্ভসঞ্চারের উপক্রম হইয়াছে। ঐ কথাও ধনী এবং প্রসন্নকে বলিয়াছিলাম। তাহারা শুনিয়া আমাকে 'নির্ব্বোধ', 'পাগল' ইত্যাদি কত কি বলিয়া তিরস্কার করিল; এবং মনের ভ্রম হইতে অথবা বায়ুগুল্ম নামক ব্যাধি হইতে ঐরূপ অনুভব হইতেছে, এইরূপ নানা কথা বুঝাইয়া ঐ অনুভবের কথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিল। তোমাকে ভিন্ন ঐ কথা আর কাহাকেও বলিব না নিশ্চয় করিয়া তদবধি এতদিন চুপ করিয়া আছি। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়? ঐরূপ দর্শন কি আমার দেবতার কৃপায় হইয়াছে, অথবা বায়ুরোগে হইয়াছে? এখনও কিন্তু আমার মনে হয়, আমার যেন গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।"

শিবমন্দিরে চন্দ্রা দেবীর দিব্যদর্শন ও অনুভব।

শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ৺গয়ায় নিজ স্বপ্নের কথা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীমতী চন্দ্রার সকল কথা শুনিলেন এবং উহা

ঠাকুরের বাটীর সম্মুখে অবস্থিত যুগীদের শিবমন্দির।

রোগ জনিত নাও হইতে পারে, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, 'এখন হইতে ঐরূপ দর্শন ও অনুভবের কথা আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বলিও না ; শ্রীশ্রীরঘুবীর কৃপা করিয়া যাহাই দেখান তাহা কল্যাণের জন্য এই কথা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে ; গয়া-ধামে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীগদাধর আমাকেও অলৌকিক উপায়ে জানাইয়াছেন, আমাদিগকে পুনরায় পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী দেবপ্রতিম স্বামীর ঐরূপ কথা শুনিয়া আশ্বস্তা হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া এখন হইতে পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীরঘুবীরের মুখাপেক্ষিণী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঐ সকল কথা কাহাকেও না বলিতে চন্দ্রা দেবীকে ক্ষুদিরামের সতর্ক করা।

দিনের পর দিন আসিয়া, ব্রাহ্মণদম্পতির পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের পরে, ক্রমে তিন চারি মাস অতীত হইল। তখন সকলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিল, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে ক্ষুদিরামগৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী সত্য সত্যই পুনরায় অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছেন। গর্ভধারণ করিবার কালে রমণীর রূপলাবণ্য সর্ব্বত্র বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। চন্দ্রা দেবীরও তাহাই হইয়াছিল। ধনীপ্রমুখ প্রতিবেশিনীগণ বলিত এইবার গর্ভধারণ করিয়া তিনি যেন অন্যান্য বার অপেক্ষা অধিক রূপ-লাবণ্যশালিনী হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার উহা দেখিয়া জল্পনা [illegible] 'বুড়ো বয়সে গর্ভবতী হইয়া মাগীর এত রূপ!—বোধ হয় [illegible] এবার প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিতা হইবে।'

সে যাহা হউক, গর্ভবতী হইয়া শ্রীমতী চন্দ্রার দিব্য[illegible] অনুভবসকল দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শুনা [illegible] [illegible] তিনি প্রায় নিত্যই দেবদেবীসকলের দর্শন [illegible]

কখন বা অনুভব করিতেন, তাঁহাদিগের শ্রীঅঙ্গনিঃসৃত পুণ্যগন্ধে গৃহ পূর্ণ হইয়াছে ; কখন বা দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিস্মিতা হইতেন। আবার শুনা যায়, সকল দেব-দেবীর উপরেই তাঁহার মাতৃস্নেহ যেন এইকালে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। শুনা যায় এইকালে তিনি প্রায় প্রতিদিন ঐ সকল দর্শন ও অনুভবের কথা নিজ স্বামীর নিকটে বলিয়া কেন তাঁহার ঐরূপ হইতেছে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া ঐ সকলের জন্য শঙ্কিতা হইতে নিষেধ করিতেন। ঐ কালের এক দিনের ঘটনা, আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, এখানে বিবৃত করিতেছি। শ্রীমতী চন্দ্রা তাঁহার স্বামীর নিকটে সেদিন ভয়চকিতা হইয়া এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন,—"দেব, শিবমন্দিরের সম্মুখে জ্যোতিদর্শনের দিন হইতে মধ্যে মধ্যে কত যে দেব-দেবীর দর্শন পাইয়া থাকি তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদিগের অনেকের মূর্ত্তি আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও ছবিতেও দেখি নাই। আজ দেখি হাঁসের উপর চড়িয়া একজন আসিয়া উপস্থিত। দেখিয়া ভয় হইল ; আবার রৌদ্রের তাপে তাহার মুখখানি রক্তবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া মন কেমন করিতে লাগিল। তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, 'ওরে বাপ্ হাঁসে চড়া ঠাকুর, রৌদ্রে তোর মুখখানি যে শুকাইয়া গিয়াছে ; ঘরে আমানি পান্তা আছে, দুটি খাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যা। সে ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গেল! আর দেখিতে পাইলাম না! ঐরূপ কত মূর্ত্তি দেখি। পূজা বা ধ্যান করিয়া নহে—সহজ অবস্থায়, যখন তখন দেখিয়া থাকি। কখন কখন আবার দেখিতে পাই তাহারা যেন মানুষের মত হইয়া সম্মুখে

চন্দ্রা দেবীর পুনরায় গর্ভ-ধারণ ও ঐ কালে তাঁহার দিব্য দর্শন-সমূহ।

আসিতে আসিতে বায়ুতে মিলাইয়া গেল! কেন ঐরূপ সব দেখিতে পাই বল দেখি? আমার কি কোন রোগ হইল? সময়ে সময়ে ভাবি আমাকে গোঁসাইয়ে * পাইল না কি? শ্রীযুত ক্ষুদিরাম তখন তাঁহাকে গয়ায় দৃষ্ট নিজ স্বপ্নের কথা বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, অশেষ সৌভাগ্যের ফলে তিনি এবার পুরুষোত্তমকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পুণ্যসংস্পর্শেই তাঁহার ঐরূপ দিব্য দর্শনসমূহ উপস্থিত হইতেছে। স্বামীর উপর অসীম বিশ্বাসশালিনী চন্দ্রার হৃদয় তাঁহার ঐ সকল কথা শুনিয়া দিব্য ভক্তিতে পূর্ণ হইল এবং নবীন বলে বলশালিনী হইয়া তিনি নিশ্চিন্তা হইলেন।

ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও তাঁহার পূতস্বভাবা গৃহিণী শ্রীশ্রীরঘুবীরের একান্ত শরণাগত থাকিয়া যাঁহার শুভাগমনে তাঁহাদিগের জীবন ঐশী ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে সেই মহাপুরুষ-পুত্রের মুখ নিরীক্ষণের আশায় কাল কাটাইতে লাগিলেন।

---

* শ্রীযুত সুখলাল গোস্বামীর মৃত্যুর পরে নানা দৈব উৎপাত উপস্থিত হওয়ায় পল্লীবাসিগণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে উক্ত গোস্বামী বা তদ্বংশীয় কোন ব্যক্তি মরিয়া প্রেত হইয়া গোস্বামীদিগের বাটীর সম্মুখে যে বৃহৎ বকুল গাছ ছিল তাহাতে অবস্থান করিতেন। ঐ বিশ্বাসপ্রভাবেই লোকে ঐ সময়ে কাহারও কোনরূপ দিব্যদর্শন উপস্থিত হইলে বলিত, 'উহাকে গোঁসাইয়ে পাইয়াছে।' সরলহৃদয়া চন্দ্রা দেবী সেজন্যই এই কথায় ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাপুরুষের জন্মকথা।

শরৎ, হেমন্ত ও শীত অতীত হইয়া ক্রমে ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হইল। শীত ও গ্রীষ্মের সুখসম্মিলনে মধুময় ফাল্গুন স্থাবরজঙ্গমের ভিতর নবীন প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া আজ ষষ্ঠ দিবস সংসারে সমাগত। জীবজগতে একটা বিশেষ উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেমের প্রেরণা সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মানন্দের এক কণা পদার্থসকলের মধ্যে নিহিত থাকিয়া তাহাদিগকে সরস করিয়া রাখিয়াছে—ঐ দিব্যোজ্জ্বল আনন্দ-কণার কিঞ্চিদধিক মাত্রা পাইয়াই কি এই কাল সংসারের সর্ব্বত্র এত উল্লাস আনয়ন করিয়া থাকে ?

চন্দ্রা দেবীর আশঙ্কা ও স্বামীর কথায় আশ্বাস প্রাপ্তি।

৺রঘুবীরের ভোগ রাঁধিতে রাঁধিতে আসন্নপ্রসবা শ্রীমতী চন্দ্রা প্রাণে আজ দিব্য উল্লাস অনুভব করিতেছিলেন; কিন্তু শরীর নিতান্ত অবসন্ন জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে কখন কি হয়; এখনই যদি প্রসবকাল উপস্থিত হয় তাহা হইলে গৃহে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই যে, অদ্যকার ঠাকুরসেবা চালাইয়া লইবে। তাহা হইলে উপায় ? ভীতা হইয়া তিনি ঐ কথা স্বামীকে নিবেদন করিলেন। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভয় নাই, তোমার গর্ভে যিনি শুভাগমন করিয়াছেন তিনি ৺রঘুবীরের পূজাসেবায় বিঘ্নোৎপাদন করিয়া কখনই

সংসারে প্রবেশ করিবেন না—ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস; অতএব নিশ্চিন্তা হও, অদ্যকার মত ঠাকুরসেবা তুমি নিশ্চয় চালাইতে পারিবে; কল্য হইতে আমি উহার জন্য ভিন্ন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি; এবং ধনীকেও বলা হইয়াছে যাহাতে সে অদ্য হইতে রাত্রে এখানেই শয়ন করিয়া থাকে। শ্রীমতী চন্দ্রা স্বামীর ঐরূপ কথায় দেহে নবীন বলসঞ্চার অনুভব করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে পুনরায় গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলেন। ঘটনাও ঐরূপ হইল—৺রঘুবীরের মধ্যাহ্ন ভোগ এবং সান্ধ্য শীতলাদি কর্ম্ম পর্য্যন্ত সে দিন নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়া গেল। রাত্রে আহারাদি সমাপন করিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও রামকুমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং ধনী আসিয়া চন্দ্রা দেবীর সহিত এক কক্ষে শয়ন করিয়া রহিল। ৺রঘুবীরের ঘর ভিন্ন, বাটীতে বসবাসের জন্য দুইখানি চালা ঘর ও একখানি রন্ধনশালা মাত্র ছিল, এবং অপর একখানি ক্ষুদ্র চালা ঘরে এক পার্শ্বে ধান্য কুটিবার জন্য একটি ঢেঁকি এবং উহা সিদ্ধ করিবার জন্য একটি উনান বিদ্যমান ছিল। স্থানাভাবে শেষোক্ত চালাখানিই শ্রীমতী চন্দ্রার সূতিকাগৃহরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিল।

রাত্রি অবসান হইতে প্রায় অর্দ্ধদণ্ড অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে চন্দ্রা দেবীর প্রসবপীড়া উপস্থিত হইল। ধনীর সাহায্যে তিনি পূর্ব্বোক্ত ঢেঁকিশালে গিয়া শয়ন করিলেন এবং অবিলম্বে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রার জন্য ধনী তখন তৎকালোপযোগী ব্যবস্থা করিয়া জাতককে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া দেখিল, ইতিপূর্ব্বে তাহাকে যেখানে রক্ষা করিয়াছিল সেই স্থান হইতে সে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! ভয়ত্রস্তা হইয়া ধনী প্রদীপ

গদাধরের জন্ম।

উজ্জ্বল করিল এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইল, রক্তক্লেদময় পিচ্ছিল ভূমিতে ধীরে ধীরে হড়কাইয়া ধান্য সিদ্ধ করিবার চুল্লীর ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক সে বিভূতিভূষিতাঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ কোন শব্দ করে নাই! ধনী তখন তাহাকে যত্নে উঠাইয়া লইল এবং পরিষ্কৃত করিয়া দীপালোকে ধরিয়া দেখিল, অদ্ভুত প্রিয়দর্শন বালক, 'যেন ছয় মাসের ছেলের মত বড়!' প্রতিবেশী লাহাবাবুদের বাটী হইতে তখন প্রসন্ন-প্রমুখ চন্দ্রা দেবীর দুই চারিজন বয়স্য সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছে—ধনী তাহাদিগের নিকটে ঐ সংবাদ ঘোষণা করিল; এবং পূতগম্ভীর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীযুত ক্ষুদিরামের তপস্বী দরিদ্র কুটীর শুভ শঙ্খারাবে পূর্ণ হইয়া মহাপুরুষের শুভাগমন-বার্ত্তা সংসারে প্রচার করিল।

অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষুদিরাম নবাগত বালকের জন্মলগ্ন নিরূপণ করিতে যাইয়া দেখিলেন, জাতক বিশেষ শুভক্ষণে সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। দেখিলেন—

ঐ দিন সন ১২৪২ সালের অথবা ১৭৫৭ শকাব্দার ৬ই ফাল্গুন, ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী, শুক্লপক্ষ, বুধবার। রাত্রি একত্রিশ দণ্ড অতীত হইয়া অর্দ্ধদণ্ডমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে বালক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। শুভা দ্বিতীয়া তিথি ঐ সময়ে পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের সহিত সংযুক্তা হইয়া সংসারে সিদ্ধিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। বালকের জন্মলগ্নে রবি, চন্দ্র ও বুধ একত্র মিলিত রহিয়াছে এবং শুক্র, মঙ্গল ও শনি তুঙ্গস্থান অধিকারপূর্ব্বক তাহার অসাধারণ জীবনের পরিচায়ক হইয়া রহিয়াছে। আবার মহামুনি পরাশরের মত অবলম্বন-

গদাধরের শুভ জন্ম-মুহূর্ত্ত সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা।

পূর্ব্বক দেখিলে রাহু এবং কেতু গ্রহদ্বয়কেও তাঁহার জন্মকালে তুঙ্গস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তদুপরি, বৃহস্পতি তুঙ্গাভিলাষী-রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া বালকের অদৃষ্টের উপর বিশেষ শুভ-প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

অতঃপর বিশিষ্ট জ্যোতির্ব্বিদগণ, নবজাত বালকের জন্মক্ষণ পরীক্ষাপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, জাতক যেরূপ উচ্চলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তৎসম্বন্ধে জ্যোতিষ-শাস্ত্র নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করে যে, "ঐরূপ ব্যক্তি ধর্ম্মবিৎ ও মাননীয় হইবেন এবং সর্ব্বদা পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন। বহুশিষ্যপরিবৃত হইয়া ঐ ব্যক্তি দেবমন্দিরে বাস করিবেন; এবং নবীন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া নারায়ণাংশসম্ভূত মহাপুরুষ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সকল লোকের পূজ্য হইবেন।" * শ্রীযুত ক্ষুদিরামের মন উহাতে বিস্ময়পূর্ণ হইল। তিনি কৃতজ্ঞহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন, ৺গয়াধামে তিনি যে দেবস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই পূর্ণ হইল। অনন্তর জাতকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক বালকের

গদাধরের রাশ্যাশ্রিত নাম।

* ধর্ম্মস্থানাধিপে তুঙ্গে ধর্ম্মস্থে তুঙ্গখেচরে।
গুরুণা দৃষ্টিসংযোগে লগ্নেশে ধর্ম্মসংস্থিতে।
কেন্দ্রস্থানগতে সৌম্যে গুরৌ চৈব তু কোণগে।
স্থিরলগ্নে যদা জন্ম সম্প্রদায়প্রভুঃ হি সঃ॥
ধর্ম্মবিন্মাননীয়স্তু পুণ্যকর্ম্মরতঃ সদা।
দেবমন্দিরবাসী চ বহুশিষ্যসমন্বিতঃ॥
মহাপুরুষসংজ্ঞোঽয়ং নারায়ণাংশসম্ভবঃ।
সর্ব্বত্র জনপূজ্যশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ইতি ভৃগুসংহিতায়াং সম্প্রদায়প্রভুযোগঃ তৎফলঞ্চ।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ-কৃত ঠাকুরের জন্মকোষ্ঠী হইতে উক্ত বচন উদ্ধৃত হইল।

রাশ্যাশ্রিত নাম শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র স্থির করিলেন এবং গয়াধামে অবস্থানকালে নিজ বিচিত্র স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া তাহাকে সর্ব্বজনসমক্ষে শ্রীযুত গদাধর নামে অভিহিত করিতে মনস্থ করিলেন।

গদাধরের জন্মকুণ্ডলী।

পাঠকের সৌকর্য্যার্থ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিচিত্র জন্মকুণ্ডলীর † সহিত তাঁহার কোষ্ঠীর কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করিতেছি। জ্যোতিষশাস্ত্রাভিজ্ঞ পাঠক তদ্দৃষ্টে বুঝিতে পারিবেন, উহা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদি অবতারপ্রথিত পুরুষসকলের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

"শুভমস্তু। শক-নরপতেরতীতাব্দাদয়ঃ ১৭৫৭।১০।৫।৫৯। ২৮।২৯, সন ১২৪২ সাল, ৬ই ফাল্গুন, বুধবার, রাত্রি অবসানে (অর্দ্ধ দণ্ড রাত্রি থাকিতে) কুম্ভলগ্নে প্রথম নবাংশে জন্ম॥ কুম্ভরাশি, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রথম পাদে জন্ম॥ রাত্রিজাত

† ঠাকুরের জন্মকাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমরা এখানে পাঠককে বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিবার কালে আমরা অনেকে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, তাঁহার "যথার্থ জন্মপত্রিকা হারাইয়া গিয়াছে এবং উহার স্থলে বহুকাল পরে যে জন্মপত্রিকা করান হইয়াছে তাহা ভ্রমপ্রমাদ-পূর্ণ।" তাঁহার নিকটে আমরা এ কথাও বহুবার শুনিয়াছি যে, তাঁহার জন্ম "ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে হইয়াছিল, ঐ দিন বুধবার ছিল," তাঁহার কুম্ভরাশি এবং তাঁহার "জন্মলগ্নে রবি চন্দ্র ও বুধ ছিল।" "লীলাপ্রসঙ্গ" লিখিবার কালে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর যথাযথ সাল তারিখ নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়া আমরা শেষোক্ত জন্মপত্রিকাখানি আনাইয়া দেখি, উহাতে তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে— "শক ১৭৫৬।১০।৯।৫৯।১২ ফাল্গুনস্য দশমদিবসে বুধবাসরে গৌরপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে" তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ঐ সালের পঞ্জিকা আনাইয়া দেখা গেল উক্ত কোষ্ঠীতে উল্লিখিত সালের ঐ দিবসে কৃষ্ণপক্ষ নবমী তিথি এবং শুক্রবার হয়। সুতরাং উক্ত জন্মপত্রিকাখানিকে ঠাকুর কেন ভ্রমপূর্ণ বলিতেন তাহা বুঝিতে পারিয়া উহা

দণ্ডাদিঃ ৩১।০।১৪, সূর্য্যোদয়াদিষ্ট-দণ্ডাদিঃ ৫৯।২৮।২৯, অক্ষাংশ ২২।৩৪, পলভা ৫।১।৫।১০ ॥

<table>
<tr><td>রা ৩
বক্রী
বৃ৬</td><td></td><td>শু ২৬
র২৪ চ২৫
বক্রী অং বু২৪</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>অ মং ২২</td></tr>
<tr><td></td><td>বক্রী শ ১৫</td><td>কে ১৭</td></tr>
</table>

লং৩।১৯' হোরা লং ০।৪৬'

দিবা—২৮।২৮।১৫		
৪	২৪	২০
১	৫১	৪৯
৪৬	২৬	৫৯
৪৪	কিং	৬

জাতাহঃ

দিবা—২৮।৩১		
৫	২৫	২১
২	৫১	৪১
৪৫	৪১	৪৮
১৬	২	৭

পরাহঃ

চান্দ্রফাল্গুনস্য শুক্লপক্ষীয়-দ্বিতীয়া জন্মতিথিঃ।

পূর্ব্বভাদ্রপদ-নক্ষত্র-মানং ৬০।১৫।০

তস্য ভোগদণ্ডাদিঃ ৫২।১২।৩১

ভুক্ত-দণ্ডাদিঃ ৮।২।২৯

(শকাব্দা ১৭৫৭), এতচ্ছকীয়-সৌর-ফাল্গুনস্য ষষ্ঠ-দিবসে, বুধবাসরে, শুক্ল-পক্ষীয়-দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ, পূর্ব্বভাদ্রপদ-নক্ষত্রস্য

পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরাতন পঞ্জিকাসকলে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কোন্ শকের ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় বুধবার এবং রবি, চন্দ্র ও বুধ কুম্ভ রাশিতে একত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে ঐরূপ দুইটি দিন পাওয়া গেল ; একটি ১৭৫৪ শকে এবং দ্বিতীয়টি ১৭৫৭ শকে। তন্মধ্যে প্রথমটিকে আমরা ত্যাগ করিলাম। কারণ, ১৭৫৪ শকে ঠাকুরের জন্মকাল ধরিয়া নির্ণয় করিলে, তাঁহার মুখে তাঁহার বয়স সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি *

প্রথমচরণে, সিদ্ধিযোগে, বালবকরণে, এবং পঞ্চাঙ্গ-সংশুদ্ধৌ, রাত্রি-চতুর্দ্দশবিপলাধিকৈক-ত্রিংশদ্দণ্ড-সময়ে, অয়নাংশোস্তর-শুভ-

---

তদপেক্ষা ৩ বৎসর ২ মাস বাড়াইয়া তাঁহার আয়ু গণনা করিতে হয়। পক্ষান্তরে ১৭৫৭ শককে তাঁহার জন্মকাল বলিয়া নির্ণয় করিলে তাঁহার জীবৎকালে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণ তাঁহার যে জন্মোৎসব করিতেন তৎকালে তিনি নিজ বয়স সম্বন্ধে যেরূপ নির্ণয় করিতেন তাহা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার পরমায়ু গণনা করিতে হয় না। শুদ্ধ তাহাই নহে, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি ঠাকুরের বিবাহকালে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর এবং শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর বয়স ৫ বৎসর মাত্র ছিল—ঐ বিষয়েও কোন ব্যতিক্রম করিতে হয় না। তদ্ভিন্ন, ঠাকুর দেহরক্ষা করিলে সমবেত ভক্তগণ কাশীপুর শ্মশানের মৃত্যু-নির্ণায়ক (রেজেষ্টারি) পুস্তকে তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর লিখাইয়া দিয়াছিলেন—তাহারও কোনরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয় না। ঐ সকল কারণে আমরা ১৭৫৭ শককেই ঠাকুরের জন্মকাল বলিয়া অবধারিত করিলাম।

ঐরূপ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই নাই; কিন্তু কলিকাতা, বহুবাজার, ২ নম্বর লালবিহারী ঠাকুরের লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ভট্টাচার্য্যের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারের অসাধারণ ক্ষমতার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মকুণ্ডলী প্রেরণ করি এবং তদ্দৃষ্টে গণনা করিয়া ঠাকুরের জন্মকুণ্ডলী নির্ণয় করিয়া দিতে অনুরোধ করি। তিনিও ঐ বিষয় গণনা পূর্ব্বক ১৭৫৭ শককেই ঠাকুরের জন্মকাল বলিয়া স্থির করেন।

ঐরূপে ১৭৫৭ শকে বা সন ১২৪২ সালেই ঠাকুরের জন্ম হইয়াছিল এ কথায় দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমরা শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়কে তদনুসারে ঠাকুরের জন্মকোষ্ঠী গণনা করিয়া দিতে অনুরোধ করি এবং তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উহা সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন।

ঠাকুরের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জন্মের কথা আমরা কেবলমাত্র কোষ্ঠীগণনায় স্থির করি নাই; কিন্তু ঠাকুরের পরিবারবর্গের মুখে শ্রুত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেও নির্ণয় করিয়াছি। তাঁহারা বলেন ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরে হড়কাইয়া সূতিকাগৃহে অবস্থিত ধান্য সিদ্ধ করিবার চুল্লীর ভিতর পড়িয়া ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছিলেন। সদ্যোজাত শিশুর যে ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা অন্ধকারে বুঝিতে পারা যায় নাই। পরে আলোক আনিয়া অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে উক্ত চুল্লীর ভিতর হইতে বাহির করা হইয়াছিল।

কুম্ভলগ্নে (লগ্নস্ফুট-রাশ্যাদিঃ ১০।৩।১৯'।৫৩''।২০'''), শনৈশ্চরস্য ক্ষেত্রে, সূর্য্যস্য হোরায়াং, সূর্য্যসুতস্য দ্রেক্কাণে, শুক্রস্য নবাংশে, বৃহস্পতের্দ্বাদশাংশে, কুজস্য ত্রিংশাংশে, এবং ষড়্‌বর্গ-পরিশোধিতে, পূর্ব্বভাদ্রপদ-নক্ষত্রাশ্রিত-কুম্ভরাশিস্থিতে চন্দ্রে, বুধস্য যামার্দ্ধে, জীবস্য দণ্ডে, কোণস্থে গুরৌ, কেন্দ্রস্থে বুধে চন্দ্রে চ, লগ্নস্থে চন্দ্রে, ত্রিগ্রহযোগে, ধর্ম্মকর্ম্মাধিপয়োঃ শুক্রভৌময়োঃ তুঙ্গস্থিতয়োঃ, বর্গোত্তমস্থে লগ্নাধিপে, শনৌ চ তুঙ্গে, পরাশর-মতেন তু রাহুকেত্বোস্তুঙ্গস্থয়োঃ (যতঃ উক্তং, "রাহোস্তু বৃষভং কেতোর্ব্বৃশ্চিকং তুঙ্গসংজ্ঞিতম্" ইত্যাদি-প্রমাণাৎ), অতএব উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে, অসাধারণ-পুণ্যভাগ্য-যোগে, শুক্লপক্ষে নিশিজন্মহেতোঃ বিংশোত্তরী-দশাধিকারে জন্ম, এতেন বৃহস্পতের্দ্দশায়াং, তথা দেশভেদেন দশাধিকারনিয়মাচ্চ অষ্টোত্তরীয়-রাহোর্দশায়াং, অশেষ-গুণালঙ্কৃত-স্বধর্ম্মনিষ্ঠ-ক্ষুদিরাম-চট্টোপাধ্যায়-মহোদয়স্য (সহধর্ম্মিণী-দয়াবতী-চন্দ্রমণি-দেবী-মহোদয়ায়াঃ গর্ভে) শুভঃ তৃতীয়পুত্রঃ সমজনি। তস্য রাশ্যাশ্রিতং নাম শম্ভুরাম-দেবশর্ম্মা। প্রসিদ্ধ-নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়ঃ।

গদাধরের জন্মপত্রিকার কিয়দংশ।

সে যাহা হউক, ১৭৫৭ শকের ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয়ায় ঠাকুরের জন্ম যেরূপ অদ্ভুত লগ্নে হইয়াছিল তাহা শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিভূর্ষণকৃত তাঁহার কোষ্ঠী দেখিয়া সম্যক্ উপলব্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-ঘটনাসমূহ কোষ্ঠীর সহিত মিলাইয়া দেখিয়া ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতের জ্যোতিষ শাস্ত্র যথার্থই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, ঠাকুরের জন্মপূর্ণ পুরাতন কোষ্ঠী, শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র জ্যোতিভূর্ষণ-কৃত তাঁহার বিশুদ্ধ কোষ্ঠী এবং শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ভট্টাচার্য্য শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর জন্মকুণ্ডলী বর্ণনে গণনা পূর্ব্বক ঠাকুরের যে জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া দেন, সে সমস্ত বেলুড় মঠে যত্নে রক্ষিত আছে।

সাধনাসিদ্ধিপ্রাপ্ত-জগদ্বিখ্যাত-নাম শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেব-মহোদয়ঃ।" *

অনন্তর প্রিয়দর্শন পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ এবং তাহার অসাধারণ ভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও শ্রীমতী চন্দ্রমণি আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলেন এবং যথাকালে তাহার নিষ্ক্রামণ ও নামকরণাদি সম্পন্ন করিয়া অশেষ যত্নের সহিত তাহার লালনপালনে মনোনিবেশ করিলেন।

---

* শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিভূর্ষণকৃত ঠাকুরের জন্মকোষ্ঠী হইতে পূর্ব্বোক্তাংশ উদ্ধৃত হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বাল্যকথা ও পিতৃবিয়োগ।

শাস্ত্রে আছে, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-পুরুষসকলের জনক-জননী, তাঁহাদিগের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ও পরে নানারূপ দিব্যদর্শন লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে দেবরক্ষিত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেও পরক্ষণেই অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ কথা ভুলিয়া যাইতেন এবং তাঁহাদিগের পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও তদীয় গৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রা দেবীর সম্বন্ধেও ঐ কথা বলিতে পারা যায়। কারণ, তাঁহারাও প্রিয়দর্শন বালকের মুখকমল দেখিয়া গয়াক্ষেত্রের দেবস্বপ্ন, শিবমন্দিরের দিব্যদর্শন প্রভৃতি কথা এখন অনেকাংশে ভুলিয়া যাইলেন এবং তাহার যথাযথ পালন ও রক্ষণের জন্য চিন্তিত হইয়া নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। উপার্জ্জনক্ষম ভাগিনেয় শ্রীযুত রামচাঁদের নিকটে, মেদিনীপুরে, পুত্রের জন্ম-সংবাদ প্রেরিত হইল। মাতুলের দরিদ্র সংসারে দুগ্ধের অভাব হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি একটি দুগ্ধবতী গাভী প্রেরণ করিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ঐ চিন্তা নিবারণ করিলেন। ঐরূপে নবজাত শিশুর জন্য যখন যে বস্তুর প্রয়োজন হইতে লাগিল, তখনই তাহা নানাদিক হইতে অভাবনীয় উপায়ে পূর্ণ হইলেও শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রা দেবীর চিন্তার বিরাম হইল না। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল।

রামচাঁদের গাভী-দান।

এদিকে নবজাত বালকের চিত্তাকর্ষণ-শক্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া জনক-জননীর উপরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, কিন্তু পরিবারস্থ সকলের এবং পল্লীবাসিনী রমণীগণের উপরেও নিজ আধিপত্য ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া বসিল। পল্লীরমণীগণ অবসরকালে শ্রীমতী চন্দ্রাকে এখন নিত্য দেখিতে আসিতেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন 'তোমার পুত্রটিকে নিত্য দেখিতে ইচ্ছা করে, তা কি করি বল, নিত্যই আসিতে হয়!' নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল হইতে আত্মীয়া রমণীগণও ঐ কারণে শ্রীযুত ক্ষুদিরামের দরিদ্র কুটীরে এখন হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলের আদরযত্নে সুখ-পালিত হইয়া নবাগত শিশু ক্রমে পঞ্চম মাস অতিক্রম করিল এবং তাহার অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত হইল।

গদাধরের মোহিনী শক্তি।

পুত্রের অন্নপ্রাশন কার্য্যে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম নিজ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থাই প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক ৺রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন পুত্রের মুখে প্রদান করিয়া ঐ কার্য্য শেষ করিবেন এবং তদুপলক্ষে দুই চারি জন নিকট আত্মীয়কেই নিমন্ত্রণ করিবেন—কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার পরম বন্ধু গ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস লাহার গুপ্ত প্রেরণায় পল্লীর প্রবীণ ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণ আসিয়া তাঁহাকে সহসা ধরিয়া বসিলেন, পুত্রের অন্ন-প্রাশনদিবসে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। তাঁহাদিগের ঐরূপ অনুরোধে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম আপনাকে বিশেষ বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। কারণ, পল্লীর সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, এখন তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকে রাখিয়া

কাহাকে আমন্ত্রণ করিবেন তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। আবার তাঁহাদিগের সকলকে বলিতে তাঁহার সামর্থ্য কোথায়? সুতরাং 'যাহা করেন ৺রঘুবীর' বলিয়া তিনি শ্রীযুত ধর্ম্মদাসের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ বিষয় স্থির করিতে আসিলেন এবং বন্ধুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই উপর উক্ত কার্য্যভার প্রদান-পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীযুত ধর্ম্মদাসও হৃষ্টচিত্তে অনেকাংশে আপন ব্যয়ে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দিলেন। আমরা শুনিয়াছি, ঐরূপে গদাধরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে পল্লীর ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই শ্রীযুত ক্ষুদিরামের কুটীরে আসিয়া ৺রঘুবীরের প্রসাদ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে অনেক-গুলি দরিদ্র ভিক্ষুকও ঐরূপে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া তাঁহার তনয়ের দীর্ঘজীবন এবং মঙ্গল কামনা করিয়া গিয়াছিল।

অন্নপ্রাশনকালে ধর্ম্মদাস লাহার সাহায্য।

দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গদাধরের বালচেষ্টাসমূহ মধুরতর হইয়া উঠিয়া চন্দ্রা দেবীর হৃদয়কে আনন্দ ও ভয়ের পুণ্যপ্রয়াগে পরিণত করিল। পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে যিনি দেবতাদিগের নিকটে কোন বিষয় প্রার্থনা করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন না, সেই তিনিই এখন প্রতিদিন তনয়ের কল্যাণকামনায় শতবার, সহস্রবার, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে, তাঁহার মাতৃহৃদয়ের সকরুণ নিবেদন তাঁহাদিগের চরণে অর্পণ করিয়াও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তা হইতে পারিতেন না। ঐরূপে তনয়ের কল্যাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ শ্রীমতী চন্দ্রার ধ্যান জ্ঞান হইয়া তাঁহার ইতিপূর্ব্বের দিব্যদর্শন-শক্তিকে যে এখন ঢাকিয়া ফেলিবে, একথা সহজে বুঝিতে পারা যায়। তত্রাপি ঐ শক্তির সামান্য প্রকাশ তাঁহাতে এখনও

মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কখন বিস্ময়ে এবং কখন বা পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় পূর্ণ করিত। ঐ বিষয়ক একটি ঘটনা যাহা আমরা অতি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, এখানে বলিলে পাঠক পূর্ব্বোক্ত কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল—

চন্দ্রা দেবীর দিব্যদর্শন-শক্তির বর্ত্তমান প্রকাশ।

গদাধরের বয়ঃক্রম তখন সাত আট মাস হইবে। শ্রীমতী চন্দ্রা একদিন প্রাতে তাহাকে স্তন্যদানে নিযুক্তা ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুত্রকে নিদ্রিত দেখিয়া মশক দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহাকে মশারির মধ্যে শয়ন করাইলেন; অনন্তর ঘরের বাহিরে যাইয়া গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুকাল গত হইলে প্রয়োজনবশতঃ ঐ ঘরে সহসা প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন মশারির মধ্যে পুত্র নাই, তৎস্থলে এক দীর্ঘকায় অপরিচিত পুরুষ মশারি জুড়িয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে! বিষম আশঙ্কায় চন্দ্রা চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং দ্রুতপদে গৃহের বাহিরে আসিয়া স্বামীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ঐ কথা বলিতে বলিতে উভয়ে পুনরায় গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই, বালক যেমন নিদ্রা যাইতেছিল তেমনি নিদ্রা যাইতেছে! শ্রীমতী চন্দ্রার তাহাতেও ভয় দূর হইল না। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, 'নিশ্চয়ই কোন উপদেবতা হইতে ঐরূপ হইয়াছে; কারণ, আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি পুত্রের স্থলে এক দীর্ঘাকার পুরুষ শয়ন করিয়াছিল; আমার কিছুমাত্র ভ্রম হয় নাই এবং সহসা ঐরূপ ভ্রম হইবার কোন কারণও নাই; অতএব শীঘ্র একজন বিজ্ঞ রোজা আনাইয়া সন্তানকে দেখাও, নতুবা কে জানে এই ঘটনায় পুত্রের কোন

ঐ বিষয়ক ঘটনা—গদাধরকে বড় দেখা।

অনিষ্ট হইবে কি না?' শ্রীযুত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'যে পুত্রের জন্মের পূর্ব্ব হইতে আমরা নানা দিব্য দর্শন লাভে ধন্য হইয়াছি তাহার সম্বন্ধে এখনও ঐরূপ কিছু দেখা বিচিত্র নহে; অতএব উহা উপদেবতা-কৃত একথা তুমি মনে কখনও স্থান দিও না; বিশেষতঃ বাটীতে ৺রঘুবীর স্বয়ং বিদ্যমান; উপদেবতাসকল এখানে কি কখন সন্তানের অনিষ্ট করিতে সক্ষম? অতএব নিশ্চিন্ত হও এবং একথা অন্য কাহাকেও আর বলিও না; জানিও, ৺রঘুবীর সন্তানকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন।' শ্রীমতী চন্দ্রা স্বামীর ঐরূপ বাক্যে তখন আশ্বস্তা হইলেন বটে কিন্তু পুত্রের অমঙ্গল-আশঙ্কার ছায়া তাঁহার মন হইতে সম্পূর্ণ অপসৃত হইল না। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার প্রাণের বেদনা সেদিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কুলদেবতা ৺রঘুবীরকে নিবেদন করিলেন।

ঐরূপে আনন্দে, আবেগে, উৎসাহে, আশঙ্কায় শ্রীযুত গদাধরের জনকজননীর দিন যাইতে লাগিল এবং বালক প্রথম দিন হইতে তাঁহাদিগের এবং অন্য সকলের মনে যে মধুর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা দিন দিন দৃঢ় ও ঘনীভূত হইতে থাকিল। ক্রমে চারি পাঁচ বৎসর অতীত হইল। ঘটনার ভিতর ঐ কালের মধ্যে কোন সময়ে শ্রীযুত ক্ষুদিরামের সর্ব্বমঙ্গলা নাম্নী কনিষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

গদাধরের কনিষ্ঠা ভগ্নী সর্ব্বমঙ্গলা।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বালক গদাধরের অদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার বিকাশ শ্রীযুত ক্ষুদিরাম এই কালে বিস্ময় ও আনন্দে অবলোকন করিয়াছিলেন। কারণ, চঞ্চল বালককে ক্রোড়ে করিয়া তিনি যখন নিজ পূর্ব্বপুরুষদিগের

গদাধরের বিদ্যারম্ভ।

নামাবলী, দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তোত্র ও প্রণামাদি, অথবা রামায়ণ মহাভারত হইতে কোন বিচিত্র উপাখ্যান তাহাকে শুনাইতে বসিতেন, তখন দেখিতেন একবার মাত্র শুনিয়াই সে উহার অধিকাংশ আয়ত্ত করিয়াছে! আবার বহুদিন পরে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতেন সে ঐ সকল সমভাবে আবৃত্তি করিতে সক্ষম! সঙ্গে সঙ্গে তিনি এবিষয়েরও পরিচয় পাইয়াছিলেন যে, বালকের মন কতকগুলি বিষয়কে যেমন আগ্রহের সহিত গ্রহণ ও ধারণা করে অপর কতকগুলি বিষয়ের সম্বন্ধে আবার তেমনি উদাসীন থাকে—সহস্র চেষ্টাতেও ঐ সকলে তাহার অনুরাগ অঙ্কুরিত হয় না। গণিত শাস্ত্রের নামতা প্রভৃতি শিখাইতে যাইয়া তিনি ঐবিষয়ের আভাস পাইয়া ভাবিয়াছিলেন, চপলমতি বালককে এত স্বল্প বয়সে ঐ সকল শিখাইবার জন্য পীড়ন করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু সে অত্যধিক চঞ্চল হইতেছে দেখিয়া পঞ্চম বর্ষেই তিনি তাহার যথাশাস্ত্র বিদ্যারম্ভ করাইয়া দিলেন এবং তাহাকে পাঠশালে পাঠাইতে লাগিলেন। বালক তাহাতে সমবয়স্ক সঙ্গীদিগের সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ সুখী হইল এবং সপ্রেম ব্যবহারে শীঘ্রই তাহাদিগের এবং শিক্ষকের প্রিয় হইয়া উঠিল।

লাহা বাবুদের পাঠশালা।

গ্রামের জমীদার লাহা বাবুদের বাটীর সম্মুখস্থ বিস্তৃত নাট্যমণ্ডপে পাঠশালার অধিবেশন হইত এবং প্রধানতঃ তাঁহাদিগের ব্যয়েই একজন সরকার বা গুরুমহাশয় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদিগের এবং নিকটস্থ গৃহস্থসকলের বালকগণকে অধ্যয়ন করাইতেন। ফলতঃ পাঠশালাটি লাহা বাবুরাই একরূপ পল্লীর বালকগণের কল্যাণার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং উহা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের

কুটীরের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। প্রাতে এবং অপরাহ্ণে দুইবার করিয়া প্রতিদিন পাঠশালা খোলা হইত। ছাত্রগণ প্রাতে আসিয়া দুই তিন ঘণ্টা পাঠ করিয়া স্নানাহার করিতে যে যাহার বাটীতে চলিয়া যাইত, এবং অপরাহ্ণ তিন চারি ঘটিকার সময় পুনরায় সমবেত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত। গদাধরের ন্যায় তরুণবয়স্ক ছাত্রগণকে অবশ্য অত অধিক কাল পাঠাভ্যাস করিতে হইত না, কিন্তু তথায় হাজির থাকিতে হইত। সুতরাং পাঠের সময় পাঠাভ্যাস করিয়া তাহারা সেখানে বসিয়া থাকিত এবং কখন বা সঙ্গীদিগের সহিত ঐ স্থানের সন্নিকটে ক্রীড়ায় রত হইত। পাঠশালার পুরাতন ছাত্রেরা আবার নূতন ছাত্রদিগকে পাঠ বলিয়া দিত এবং তাহারা পুরাতন পাঠ নিত্য অভ্যাস করে কিনা তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিত।

এইরূপে একজন মাত্র শিক্ষক নিযুক্ত থাকিলেও পাঠশালার কার্য্য সুচারুভাবে চলিয়া যাইত। গদাধর যখন পাঠশালে প্রথম প্রবেশ করে তখন শ্রীযুত যদুনাথ সরকার তথায় শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত ছিলেন। উহার কিছুকাল পরে তিনি নানা কারণে ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুত রাজেন্দ্র নাথ সরকার নামক এক ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পাঠশালার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বালকের জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার মহৎ জীবনের পরিচায়ক-স্বরূপে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম যে সকল অদ্ভুত স্বপ্ন ও দর্শনাদি লাভ করিয়াছিলেন সেই সকল তাঁহার মনে চিরকালের নিমিত্ত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বালসুলভ চপলতায় সে এখন কোনরূপ অশিষ্টাচরণ করিতেছে দেখিলেও তিনি তাহাকে

মৃদুবাক্যে নিষেধ করা ভিন্ন কখনও কঠোরভাবে দমন করিতে সক্ষম হইতেন না। কারণ সকলের ভালবাসা পাইয়াই হউক বা নিজ স্বভাবগুণেই হউক তাহাতে তিনি এখন সময়ে সময়ে অনাশ্রবতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐজন্য অপর পিতামাতাসকলের ন্যায় তাহাকে কখনও তাড়ন করা দূরে থাকুক, তিনি ভাবিতেন, উহাই বালককে ভবিষ্যতে বিশেষরূপে উন্নত করিবে। ঐরূপ ভাবিবার যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল। কারণ, তিনি দেখিতেন, দুরন্ত বালক কখন কখন পাঠশালায় না যাইয়া সঙ্গিগণকে লইয়া গ্রামের বহির্ভাগে ক্রীড়ায় রত থাকিলে অথবা কাহাকেও না বলিয়া নিকটবর্ত্তী কোন স্থলে যাত্রা গান শুনিতে যাইলেও যখন যাহা ধরিত, তাহা না সম্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হইত না, মিথ্যাসহায়ে নিজকৃত কোন কর্ম্ম কখনও ঢাকিতে প্রয়াস পাইত না এবং সর্ব্বোপরি তাহার প্রেমিক হৃদয় তাহাকে কখনও কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত করিত না। ঐরূপ হইলেও কিন্তু এক বিষয়ের জন্য শ্রীযুত ক্ষুদিরাম কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, হৃদয় স্পর্শ করে এমন ভাবে কোন কথা না বলিতে পারিলে উহা বিধি বা নিষেধ যাহাই হউক না কেন, বালক উহার কিছুমাত্র গ্রহণ করা দূরে থাকুক সর্ব্বথা তদ্বিপরীতাচরণ করিয়া বসে।

বালকের বিচিত্র চরিত্র সম্বন্ধে ক্ষুদিরামের অভিজ্ঞতা।

উহা তাহার সকল বিষয়ের কারণ-জিজ্ঞাসার পরিচায়ক হইলেও সংসারের সর্ব্বত্র বিপরীত রীতির অনুষ্ঠান দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, কেহই বালককে ঐরূপে সকল বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবে না এবং তজ্জন্য অনেক সময়ে তাহার সদ্বিধিসকল মান্য না করিয়া চলিবার

সম্ভাবনা। এই সময়ের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় শ্রীযুত ক্ষুদিরামের মনে বালকের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত চিন্তাসকল উদিত হইয়াছিল এবং এখন হইতে তিনি তাহার মনের ঐরূপ প্রকৃতি বুঝিয়া তাহাকে সতর্কভাবে শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঘটনাটি ইহাই—

শ্রীযুত ক্ষুদিরামের বাটীর একরূপ পার্শ্বেই হালদারপুকুর নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী বিদ্যমান। পল্লীর সকলে উহার স্বচ্ছ সলিলে স্নান পান ও রন্ধনাদি কার্য্য করিত। অবগাহনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষদিগের নিমিত্ত দুইটি বিভিন্ন ঘাট নির্দ্দিষ্ট ছিল। গদাধরের ন্যায় তরুণবয়স্ক বালকেরা স্নানার্থ স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘাটে অনেক সময়ে গমন করিত। দুই চারি জন বয়স্যের সহিত গদাধর এক দিন ঐ ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া জলে উল্লম্ফন সন্তরণাদির দ্বারা বিষম গণ্ডগোল আরম্ভ করিল। উহাতে স্নানের জন্য সমাগতা স্ত্রীলোকদিগের অসুবিধা হইতে লাগিল। সন্ধ্যাহ্নিক কর্ম্মে নিযুক্তা বর্ষীয়সী রমণীগণের অঙ্গে জলের ছিটা লাগায়, নিষেধ করিয়াও তাঁহারা বালকদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তোরা এ ঘাটে কি করিতে আসিস্? পুরুষদিগের ঘাটে যাইতে পারিস্ না? এ ঘাটে স্ত্রীলোকেরা স্নানান্তে পরিধেয় বসনাদি ধৌত করে—জানিস্ না, স্ত্রীলোকদিগকে উলঙ্গিনী দেখিতে নাই?' গদাধর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন দেখিতে নাই?' তিনি তাহাতে সে বুঝিতে পারে এমন কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া তাহাকে অধিকতর তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন এবং বাটীতে পিতামাতাকে বলিয়া দিবেন ভাবিয়া বালকগণ

তখন অনেকটা নিরস্ত হইল। গদাধর কিন্তু উহাতে মনে মনে অন্যরূপ সঙ্কল্প করিল। সে দুই তিন দিন রমণীগণের স্নানের সময় পুষ্করিণীর পাড়ে বৃক্ষের আড়ালে লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

ঐ বিষয়ক ঘটনা।

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বর্ষীয়সী রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বলিল, 'পরশু চারি জন রমণীকে স্নানকালে লক্ষ্য করিয়াছি, কাল ছয় জনকে এবং আজ আট জনকে ঐরূপ করিয়াছি—কিন্তু কৈ আমার কিছুই ত হইল না?' বর্ষীয়সী রমণী তাহাতে শ্রীমতী চন্দ্রা দেবীর নিকটে আগমনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে ঐ কথা বলিয়া দিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রা তাহাতে গদাধরকে অবসরকালে নিকটে পাইয়া মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন, "ঐরূপ করিলে তোমার কিছু হয় না কিন্তু রমণীগণ আপনাদিগকে বিশেষ অপমানিতা জ্ঞান করেন, তাঁহারা আমার সদৃশা, তাঁহাদিগকে অপমান করিলে আমাকেই অপমান করা হয়। অতএব আর কখনও ঐরূপে তাঁহাদিগের সম্মানের হানি করিও না, তাঁহাদিগের ও আমার মনে পীড়া দেওয়া কি ভাল?" বালকও তাহাতে বুঝিয়া তদবধি ঐরূপ আচরণ আর কখনও করিল না।

সে যাহা হউক, পাঠশালে যাইয়া গদাধরের শিক্ষা মন্দ অগ্রসর হইতে লাগিল না। সে অল্পকালের মধ্যেই সামান্য ভাবে পড়িতে এবং লিখিতে সমর্থ হইল। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাহার বিদ্বেষ চিরদিন প্রায় সমভাবেই রহিল।

গদাধরের শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার।

অন্যদিকে বালকের অনুকরণ ও উদ্ভাবনী শক্তি দিন দিন নানা নূতন দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। গ্রামের কুম্ভকারগণকে দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিতে দেখিয়া বালক তাহাদিগের নিকট যাতায়াত ও জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীতে

ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিল. এবং উহা তাহার ক্রীড়ার অন্যতমরূপে পরিগণিত হইল। পটব্যবসায়িগণের সহিত মিলিত হইয়া সে ঐরূপে চিত্র অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিল। গ্রামের কোথাও পুরাণকথা অথবা যাত্রাগান হইতেছে শুনিলেই সে তথায় গমন করিয়া শাস্ত্রোপাখ্যানসকল শিখিতে লাগিল এবং শ্রোতাদিগের নিকটে ঐ সকল কিরূপে প্রকাশ করিলে তাহাদিগের বিশেষ প্রীতিকর হয় তাহা তন্ন তন্ন ভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল। বালকের অপূর্ব্ব স্মৃতি ও মেধা তাহাকে ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল।

আবার, সদানন্দ বালকের রঙ্গরসপ্রিয়তা তাহার অদ্ভুত অনুকরণশক্তিসহায়ে প্রবৃদ্ধ হইয়া একদিকে যেমন তাহাকে নরনারীর বিশেষ বিশেষ হাবভাব অভিনয় করিতে এই বয়স হইতেই প্রবৃত্ত করিল, অন্যদিকে তেমনি তাহার মনের স্বাভাবিক সরলতা ও দেবভক্তি তাহার জনক-জননীর দৈনন্দিন অনুষ্ঠান-সকলের দৃষ্টান্তে দ্রুতপদে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন ঐ কথা যে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্মরণ ও স্বীকার করিয়াছে তাহা দক্ষিণেশ্বরে আমাদের নিকটে উক্ত নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে পাঠক বিশেষরূপে প্রণিধান করিতে পারিবেন—"আমার জননী মূর্ত্তিমতী সরলতা-স্বরূপা ছিলেন। সংসারের কোন বিষয় বুঝিতেন না, টাকা পয়সা গণনা করিতে জানিতেন না, কাহাকে কোন্ বিষয় বলিতে নাই তাহা না জানাতে আপনার পেটের কথা সকলের নিকটেই বলিয়া ফেলিতেন, সেজন্য লোকে তাঁহাকে 'হাউড়ো' বলিত—এবং সকলকে আহার করাইতে বড় ভালবাসিতেন। আমার জনক কখনই শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নাই, পূজা, জপ, ধ্যানে

দিনের ভিতর অধিক কাল যাপন করিতেন, প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবার কালে 'আয়াহি বরদে দেবি' ইত্যাদি গায়ত্রীর আবাহন উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার বক্ষ স্ফীত ও রক্তিম হইয়া উঠিত এবং নয়নের অশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইত, আবার যখন পূজাদিতে নিযুক্ত না থাকিতেন তখনও তিনি ৺রঘুবীরকে সাজাইবার জন্য সূচ সূতা ও পুষ্প লইয়া মালা গাঁথিয়া সময়-ক্ষেপ করিতেন, মিথ্যাসাক্ষ্য দিবার ভয়ে তিনি পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়াছিলেন, গ্রামের লোকে তাঁহাকে ঋষির ন্যায় মান্য ভক্তি করিত।"

বালকের সাহস।

বালকের অসীম সাহসের পরিচয়ও দিন দিন পাওয়া যাইতেছিল। বয়োবৃদ্ধেরাও যেখানে ভূত-প্রেতাদির ভয়ে জড়সড় হইত, বালক সেখানে অকুতোভয়ে গমনাগমন করিত। তাহার পিতৃস্বসা শ্রীমতী রামশীলার উপর কখন কখন ৺শীতলাদেবীর ভাবাবেশ হইত। তখন তিনি যেন ভিন্ন এক ব্যক্তি হইয়া যাইতেন। কামারপুকুরে ভ্রাতার নিকটে এই সময়ে অবস্থানকালে একদিন তাঁহার সহসা ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া পরিবারস্থ সকলের মনে ভয় ও ভক্তির উদয় করিয়াছিল। তাঁহার ঐরূপ অবস্থা শ্রদ্ধার সহিত সন্দর্শন করিলেও কিন্তু গদাধর উহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই। সে তাঁহার সন্নিকটে অবস্থানপূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল এবং পরে বলিয়াছিল, "পিসিমার ঘাড়ে যে আছে, সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে ত বেশ হয়!"

কামারপুকুরের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ভূরসুবো অথবা ভূরশোভা নামক গ্রামের বিশিষ্ট দাতা ও ভক্ত জমীদার মাণিক-রাজার কথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রীযুত

ক্ষুদিরামের ধর্ম্মপরায়ণতায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার সহিত বিশেষ সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ছয় বৎসরের বালক গদাধর পিতার সহিত এক দিন মাণিকরাজার বাটীতে যাইয়া সকলের প্রতি এমন চিরপরিচিতের ন্যায় নিঃসঙ্কোচ মধুর ব্যবহার করিয়াছিল যে, সেইদিন হইতেই সে তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। মাণিকরাজার ভ্রাতা শ্রীযুত রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বালককে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরামকে বলিয়াছিলেন, "সখা, তোমার এই পুত্রটি সামান্য নহে, ইহাতে দেব-অংশ বিশেষভাবে বিদ্যমান বলিয়া জ্ঞান হয়! তুমি যখন এদিকে আসিবে, বালককে সঙ্গে লইয়া আসিও, উহাকে দেখিলে পরম আনন্দ হয়।" শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ইহার পরে নানা কারণে মাণিকরাজার বাটীতে কিছুদিন যাইতে পারেন নাই। মাণিকরাজা উহাতে নিজ পরিবারস্থ একজন রমণীকে সংবাদ লইতে এবং সুস্থ থাকিলে গদাধরকে কিছুক্ষণের জন্য ভূরসুবো গ্রামে আনয়ন করিতে পাঠান। বালক তাহাতে পিতার আদেশে সানন্দে উক্ত রমণীর সহিত আগমন করিয়াছিল এবং সমস্ত দিবস তথায় থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং কয়েক খানি অলঙ্কার উপহার লইয়া কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। গদাধর ক্রমে এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের এত প্রিয় হইয়া উঠে যে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ভূরসুবো যাইতে কয়েক দিন বিলম্ব করিলেই তাঁহারা লোক পাঠাইয়া তাহাকে লইয়া যাইতেন।

বালকের অপরের সহিত মিলিত হইবার শক্তি।

ঐরূপে দিন, পক্ষ, মাস অতীত হইয়া বালক ক্রমে সপ্তম বর্ষে প্রবেশ করিল এবং শৈশবের মাধুর্য্য ঘনীভূত হইয়া

তাহাকে এখন দিন দিন সকলের অধিকতর প্রিয় করিয়া তুলিল! পল্লীবাসিনী রমণীগণ বাটীতে কোনরূপ সুখাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় তাহাকে উহার কিয়দংশ কেমন করিয়া ভোজন করাইবেন সেই কথাই অগ্রে চিন্তা করিতেন, সমবয়স্ক বালকবালিকাগণ তাহাদিগের ভোজ্যাংশ তাহার সহিত ভাগ করিয়া খাইয়া আপনাদিগকে অধিকতর পরিতৃপ্ত বোধ করিত, এবং প্রতিবাসী-সকলে তাহার মধুর কথা, সঙ্গীত ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহার বালসুলভ দৌরাত্ম্যসকল হৃষ্টচিত্তে সহ্য করিত। এই কালের একটি ঘটনায় বালক তাহার জনকজননী এবং বন্ধুবর্গকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় গদাধর সুস্থ ও সবল শরীর লইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং জন্মাবধি একাল পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ কোনও ব্যাধি হয় নাই। বালক সেজন্য গগনচারী বিহঙ্গের ন্যায় অপূর্ব্ব স্বাধীনতা ও চিত্তপ্রসাদে দিন যাপন করিত। শরীরবোধরাহিত্যই পূর্ণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ভিষক্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বালক জন্মাবধি ঐরূপ স্বাস্থ্যসুখ অনুভব করিতেছিল। তদুপরি তাহার স্বাভাবিক একাগ্র চিত্ত বিষয়বিশেষে যখন নিবিষ্ট হইত তখন তাহার শরীরবুদ্ধির অধিকতর হ্রাস হইয়া তাহাকে যেন এককালে ভাবময় করিয়া তুলিত। বিশুদ্ধ-বায়ু-আন্দোলিত প্রান্তরের হরিৎ-সুন্দর ছবি, নদীর অবিরাম প্রবাহ, বিহঙ্গের কলগান এবং সর্ব্বোপরি সুনীল অম্বর ও তন্মধ্যগত প্রতিক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল অভ্রপুঞ্জের মায়ারাজ্য প্রভৃতি যখন যে পদার্থ আপন রহস্যময় প্রতিকৃতি তাহার মনের সম্মুখে আপন মহিমা প্রসারিত করিয়া উহাকে আকৃষ্ট করিত, বালক তখনই তাহাকে লইয়া আত্মহারা হইয়া ভাবরাজ্যের কোন এক

গদাধরের ভাবুকতার অসাধারণ পরিণাম।

সুদূর নিভৃত প্রদেশে প্রবিষ্ট হইত। বর্ত্তমান ঘটনাটিও তাহার ভাবপ্রবণতা হইতে উপস্থিত হইয়াছিল।* প্রান্তরমধ্যে যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে করিতে বালক নবজলধর-ক্রোড়ে বলাকা-শ্রেণীর শ্বেতপক্ষবিস্তারপূর্ব্বক সুন্দর স্বাধীন পরিভ্রমণ দেখিয়া এতদূর তন্ময় হইয়াছিল যে, তাহার নিজ শরীরের ও জাগতিক অন্য সকল পদার্থের বোধ এককালে লোপ হইয়াছিল এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সে প্রান্তর-পথে পড়িয়া গিয়াছিল। বয়স্যগণ তাহার ঐরূপ অবস্থা দর্শনে ভীত ও বিপন্ন হইয়া তাহার জনক-জননীকে সংবাদ প্রদান করে এবং তাহাকে ধরাধরি করিয়া প্রান্তর হইতে বাটীতে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। চেতনা-লাভের কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু সে আপনাকে পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ বোধ করিয়াছিল। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী যে, এই ঘটনায় বিষম ভাবিত হইয়াছিলেন এবং আর যাহাতে তাহার ঐরূপ অবস্থা না হয়' সেজন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। ফলতঃ তাঁহারা উহাতে বালকের মূর্চ্ছারূপ বিষম ব্যাধির সূচনা অবলোকন করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগে এবং শান্তি স্বস্ত্যয়নাদিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বালক গদাধর কিন্তু তাঁহাদিগকে ঐ ঘটনা-সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিল, তাহার মন এক অভিনব অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ভাবে লীন হইয়াছিল বলিয়াই তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল এবং বাহিরে অন্যরূপ দেখাইলেও তাহার ভিতরে সংজ্ঞা এবং এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দের বোধ ছিল। সে

* ঠাকুর এই ঘটনাসম্বন্ধে নিজমুখে যেরূপ বলিয়াছিলেন তজ্জন্য "সাধকভাব"—২য় অধ্যায়—৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

যাহা হউক, তাহার ঐরূপ অবস্থা তখন আর না হওয়াতে এবং তাহার স্বাস্থ্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম না দেখিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ভাবিয়াছিলেন, উহা কোনরূপ বায়ুর প্রকোপে সাময়িক উপস্থিত হইয়াছিল; এবং শ্রীমতী চন্দ্রা স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, উপদেবতার নজর লাগিয়া তাহার ঐরূপ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ঘটনার জন্য তাঁহারা বালককে পাঠশালায় কিছুকাল যাইতে দেন নাই। বালক তাহাতে প্রতিবেশিগণের গৃহে এবং গ্রামের সর্ব্বত্র যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রীড়া-কৌতুকপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

রামচাঁদের বাটীতে ৺দুর্গোৎসব।

ঐরূপে বালকের সপ্তম বর্ষের অর্দ্ধেক কাল অতীত হইয়া ক্রমে সন ১২৪৯ সালের শারদীয় মহাপূজার সময় উপস্থিত হইল। শ্রীযুত ক্ষুদিরামের কৃতী ভাগিনেয় রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। কর্ম্মস্থল বলিয়া মেদিনীপুরে বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত করিলেও সেলামপুর নামক গ্রামেই তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল; এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ঐ স্থানেই বাস করিত। শ্রীযুত রামচাঁদ ঐ গ্রামে প্রতি বৎসর শারদীয়া মহাপূজার অনুষ্ঠান করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। হৃদয়রামের নিকট শুনিয়াছি পূজার সময় রামচাঁদের সেলামপুরের ভবন অষ্টাহকাল গীতবাদ্যে মুখরিত হইয়া থাকিত এবং ব্রাহ্মণভোজন, পণ্ডিতবিদায়, দরিদ্রভোজন ও তাহাদিগকে বস্ত্রদান প্রভৃতি কার্য্যে তথায় আনন্দের স্রোত ঐ কালে নিরন্তর প্রবাহিত হইত। শ্রীযুত রামচাঁদ এতদুপলক্ষে তাঁহার পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাতুলকে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া এই সময়ে কিছুকাল তাঁহার সহিত আনন্দে অতিবাহিত করিতেন। বর্ত্তমান বৎসরেও

শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও তাঁহার পরিবারবর্গ রামচাঁদের সাদর নিমন্ত্রণ যথাসময়ে প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুত ক্ষুদিরাম এখন অষ্টষষ্টিতম বর্ষ প্রায় অতিক্রম করিতে বসিয়াছেন এবং কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে মধ্যে মধ্যে অজীর্ণ ও গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সুদৃঢ় শরীর এখন বলহীন হইয়াছিল। সেজন্য প্রিয় ভাগিনেয় রামচাঁদের সাদরাহ্বানে তাহার ভবনে যাইতে ইচ্ছা হইলেও তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; নিজ দরিদ্র কুটীর এবং পরিবারবর্গকে, বিশেষতঃ গদাধরকে কয়েক দিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতেও তিনি অন্তরে একটা কারণ-শূন্য অথচ প্রবল অনিচ্ছা অনুভব করিতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন, শরীর যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে তাহাতে এ বৎসর না যাইলে আর কখনও যাইতে পারিবেন কি না তাহা কে বলিতে পারে? অতএব স্থির করিলেন গদাধরকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। পরক্ষণে নিশ্চয় করিলেন, গদাধরকে সঙ্গে লইলে শ্রীমতী চন্দ্রা বিশেষ উদ্বিগ্না থাকিবেন। অগত্যা জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারের সহিত যাইয়া পূজার কয়টা দিন রামচাঁদের নিকটে কাটাইয়া আসিবেন ইহাই স্থির করিলেন এবং ৺রঘুবীরকে প্রণামপূর্ব্বক সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ এবং গদাধরের মুখচুম্বন করিয়া তিনি পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে সেলাম-পুর যাত্রা করিলেন। রামচাঁদও পূজার্হ মাতুল ও ভ্রাতা রাম-কুমারকে নিকটে পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন।

ক্ষুদিরাম ও রাম-কুমারের রামচাঁদের বাটীতে গমন।

এখানে পৌঁছিবার পরেই কিন্তু শ্রীযুত ক্ষুদিরামের গ্রহণী-রোগ পুনরায় দেখা দিল এবং তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর দিন মহানন্দে কাটিয়া গেল। কিন্তু

নবমীর দিনে আনন্দের হাটে নিরানন্দ উপস্থিত হইল, শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ব্যাধি প্রবল ভাব ধারণ করিল। রামচাঁদ উপযুক্ত বৈদ্যগণ আনাইয়া এবং ভগ্নী হেমাঙ্গিনী ও রামকুমারের সাহায্যে সযত্নে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত রোগের উপশম হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নবমীর দিন ও রাত্রি কোনরূপে কাটিয়া যাইয়া হিন্দুর বিশেষ পবিত্র সম্মিলনের দিন বিজয়া দশমী সমাগত হইল। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম অদ্য এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল।

ক্ষুদিরামের ব্যাধি ও দেহত্যাগ।

ক্রমে অপরাহ্ন সমাগত হইলে রামচাঁদ প্রতিমা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সত্বর মাতুলের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিতপ্রায়। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, শ্রীযুত ক্ষুদিরাম অনেকক্ষণ হইতে নির্ব্বাক্ হইয়া ঐরূপ জ্ঞান-শূন্যের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন রামচাঁদ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মামা, তুমি যে সর্ব্বদা 'রঘুবীর রঘুবীর' বলিয়া থাক, এখন বলিতেছ না কেন?" ঐ নাম শ্রবণ করিয়া সহসা শ্রীযুত ক্ষুদিরামের চৈতন্য হইল। তিনি ধীরে ধীরে কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'কে? রামচাঁদ, প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলে? তবে আমাকে একবার বসাইয়া দাও।' অনন্তর রামচাঁদ, হেমাঙ্গিনী ও রামকুমার তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া অতি সন্তর্পণে শয্যায় উপবেশন করাইয়া দিবামাত্র তিনি গম্ভীর স্বরে তিনবার ৺রঘুবীরের নামোচ্চারণ-পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন। বিন্দু সিন্ধুর সহিত মিলিত হইল—৺রঘুবীর ভক্তের পৃথক জীবনবিন্দু নিজ অনন্ত জীবনে

সম্মিলিত করিয়া তাহাকে অমর ও পূর্ণ শান্তির অধিকারী করিলেন! পরে গভীর নিশীথে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুত ক্ষুদিরামের দেহ নদীকূলে আনীত হইলে উহাতে অগ্নিসংস্কার করা হইল। পরদিন ঐ সংবাদ অগ্রসর হইয়া কামারপুকুরের আনন্দধাম নিরানন্দে পূর্ণ করিল।

অনন্তর অশৌচান্তে শ্রীযুত রামকুমার শাস্ত্রবিধানে বৃষোৎ-সর্গ এবং বহু ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ করিলেন। শুনা যায়, মাতুলের শ্রাদ্ধক্রিয়ায় শ্রীযুত রামচাঁদ পাঁচ শত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

গদাধরের কৈশোরকাল।

শ্রীযুত ক্ষুদিরামের দেহাবসানে তাঁহার পরিবারবর্গের জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। বিধাতার বিধানে শ্রীমতী চন্দ্রা দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর সুখে দুঃখে তাঁহাকে জীবন-সহচররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে হারাইয়া তিনি যে এখন জগৎ শূন্য দেখিবেন, এবং প্রাণে একটা চিরস্থায়ী অভাব প্রতিক্ষণ অনুভব করিবেন, ইহা বলিতে হইবে না। সুতরাং শ্রীশ্রীরঘুবীরের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণে চিরাভ্যস্ত তাঁহার মনের গতি এখন সংসার ছাড়িয়া সেই দিকেই নিরন্তর প্রবাহিত থাকিল। কিন্তু মন ছাড়িতে চাহিলেও যতদিন না কালপূর্ণ হয় ততদিন সংসার তাহাকে ছাড়িবে কেন? সাত বৎসরের পুত্র গদাধর এবং চারি বৎসরের কন্যা সর্ব্বমঙ্গলার চিন্তার ভিতর দিয়া প্রবেশ লাভ করিয়া আবার সংসার তাহাকে দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখে ধীরে ধীরে ফিরাইয়া আনিতে লাগিল। সুতরাং ৺রঘুবীরের সেবায় এবং কনিষ্ঠ পুত্রকন্যার পালনে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীমতী চন্দ্রার দুঃখের দিন কোনরূপে কাটিতে লাগিল।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে তৎপরিবারবর্গের জীবনে যে সকল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল।

অন্য দিকে পিতৃবৎসল রামকুমারের স্কন্ধে এখন সংসারের সমগ্র ভার পতিত হওয়ায় তাঁহার বৃথা শোকে কালক্ষেপ করিবার অবসর রহিল না। শোকসন্তপ্তা জননী এবং তরুণবয়স্ক ভ্রাতা ও ভগ্নী যাহাতে কোনরূপ অভাবগ্রস্ত হইয়া কষ্ট না পায়,

অষ্টাদশ বর্ষীয় মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর যাহাতে স্মৃতি ও জ্যোতিষাদি অধ্যয়ন শেষ করিয়া উপার্জ্জনক্ষম হইয়া সংসারে সাহায্য করিতে পারে, স্বয়ং যাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা আয়বৃদ্ধি করিয়া পারিবারিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারেন—ঐরূপ শত চিন্তা ও কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তাঁহার এখন দিন যাইতে লাগিল। তাঁহার কর্ম্মকুশলা গৃহিণীও চন্দ্রা দেবীকে অসমর্থা দেখিয়া পরিবারবর্গের আহারাদি এবং অন্যান্য গৃহকর্ম্মের বন্দোবস্তের অধিকাংশ ভার গ্রহণ করিলেন।

ঐ ঘটনায় গদাধরের মনের অবস্থা।

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, শৈশবে মাতৃবিয়োগ, কৈশোরে পিতৃবিয়োগ এবং যৌবনে স্ত্রীবিয়োগ জীবনে যত অভাব আনয়ন করে এত বোধ হয় অন্য কোন ঘটনা করে না। মাতার আদর যত্নই শৈশবে প্রধান অবলম্বন থাকে, সেজন্য পিতার দেহান্ত হইলেও শিশু তাঁহার অভাব তখন উপলব্ধি করে না।' কিন্তু বুদ্ধির উন্মেষের সহিত কৈশোরে উপস্থিত হইয়া সেই শিশু যখন পিতার অমূল্য ভালবাসার দিন দিন পরিচয় লাভ করিতে থাকে, স্নেহময়ী জননী তাহার যে সকল অভাব পূর্ণ করিতে অসমর্থা পিতার দ্বারা সেই সকল অভাব মোচিত হইয়া তাহার হৃদয় যখন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, সে সময়ে পিতৃবিয়োগ উপস্থিত হইলে তাহার জীবনে অভাববোধের পরিসীমা থাকে না। পিতৃবিয়োগে গদাধরের ঐরূপ হইয়াছিল। প্রতিদিন নানা ক্ষুদ্র ঘটনা তাহাকে পিতার অভাব স্মরণ করাইয়া তাহার অন্তরের অন্তর বিষাদের গাঢ় কালিমায় সর্ব্বদা রঞ্জিত করিয়া রাখিত। কিন্তু তাহার হৃদয় ও বুদ্ধি এই বয়সেই অন্যাপেক্ষা অনেক অধিক পরিপক্ক হওয়ায় মাতার দিকে চাহিয়া সে উহা বাহিরে

কখনও প্রকাশ করিত না। সকলে দেখিত বালক পূর্ব্বের ন্যায় সদানন্দে হাস্য কৌতুকাদিতে কাল যাপন করিতেছে। ভূতির খালের শ্মশান, মানিকরাজার আম্রকানন প্রভৃতি গ্রামের জনশূন্য স্থানসকলে তাহাকে কখন কখন একাকী বিচরণ করিতে দেখিলেও বালসুলভ চপলতা ভিন্ন অন্য কোন কারণে সে তথায় উপস্থিত হইয়াছে এ কথা কাহারও মনে উদয় হইত না। বালক কিন্তু এখন হইতে চিন্তাশীল ও নির্জ্জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে এবং সংসারের সকল ব্যক্তিকে তাহার চিন্তার বিষয় করিয়া তাহাদিগের আচরণ তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।

চন্দ্রা দেবীর প্রতি গদাধরের বর্ত্তমান আচরণ।

সমসমান অভাববোধই মানবকে সংসারে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। সেই জন্যই বোধ হয় বালক তাহার মাতার প্রতি এখন একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। সে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সময় এখন তাঁহার নিকটে থাকিতে এবং দেবসেবা ও গৃহকর্ম্মাদিতে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সে নিকটে থাকিলে জননী নিজ জীবনের অভাববোধ যে অনেকটা ভুলিয়া থাকেন একথা লক্ষ্য করিতে বালকের বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু মাতার প্রতি বালকের আচরণ এখন কিছু ভিন্নাকার ধারণ করিয়াছিল। কারণ, পিতার মৃত্যুর পরে বালক কোন বিষয় লাভের জন্য চন্দ্রা দেবীকে পূর্ব্বের ন্যায় আবদার করিয়া কখনও ধরিত না। সে বুঝিত জননী ঐ বিষয় দানে অসমর্থা হইলে তাঁহার শোকাগ্নি পুনরুদ্দীপিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব করাইবে। ফলতঃ পিতৃবিয়োগে মাতাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবার ভাব তাহার হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিল।

গদাধর পাঠশালায় যাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকিল, কিন্তু পুরাণ কথা ও যাত্রা গান শ্রবণ করা এবং দেব দেবীর মূর্ত্তিসকল গঠন করা তাহার নিকট এখন অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিল। পিতার অভাববোধ ঐ সকল বিষয়ের আনুকূল্যে অনেকাংশে বিস্মৃত হইতে পারা যায় দেখিয়াই বোধ হয় সে উহাদিগকে এখন বিশেষরূপে অবলম্বন করিয়াছিল। বালকের অসাধারণ স্বভাব তাহাকে এই কালে অন্য এক অভিনব বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। গ্রামের অগ্নিকোণে পুরী যাইবার পথের উপর জমীদার লাহা বাবুরা যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য একটি পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ৺জগন্নাথ দর্শনে যাইবার ও তথা হইতে আসিবার কালে সাধু বৈরাগীরা অনেক সময় উহাতে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিত। গদাধর সংসারের অনিত্যতার কথা ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিল এবং পিতার মৃত্যুতে ঐ বিষয়ের সাক্ষাৎ পরিচয়ও এখন লাভ করিয়াছিল। সাধু বৈরাগীরা অনিত্য সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া কালযাপন করে এবং সাধুসঙ্গ মানবকে চরম শান্তিদানে কৃতার্থ করে পুরাণ-মুখে একথা জানিয়া বালক সাধুদিগের সহিত পরিচিত হইবার আশয়ে উক্ত পান্থনিবাসে এখন হইতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতে লাগিল প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে ধুনীমধ্যগত পবিত্র অগ্নি উজ্জ্বল করিয়া তাঁহারা যে ভাবে ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন হন, ভিক্ষালব্ধ সামান্য আহার নিজ ইষ্টদেবতাকে নিবেদনপূর্ব্বক যে ভাবে তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করেন, ব্যাধির প্রবল প্রকোপে পড়িলে যে ভাবে তাঁহারা শ্রীভগবানের মুখাপেক্ষী

গদাধরের এই কালের চেষ্টা ও সাধুদিগের সহিত মিলন।

থাকিয়া উহা অকাতরে সহ্য করিতে চেষ্টা করেন, আপনার বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যও তাঁহারা যে ভাবে কাহাকেও উদ্বিগ্ন করিতে পরাঙ্মুখ হন, আবার তাঁহাদিগের ন্যায় বেশভূষাকারী ভণ্ড ব্যক্তিগণ যে ভাবে সর্ব্বপ্রকার সদাচারের বিপরীতাচরণ করিয়া স্বার্থসুখসাধনের নিমিত্ত জীবনধারণ করে—ঐ সমস্ত বিষয় বালকের এখন অবসরকালে লক্ষ্যের বিষয় হইল। ক্রমে সে যথার্থ সাধুগণকে দেখিলে রন্ধনাদির জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ, পানীয়জল আনয়ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে সহায়তা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল। তাঁহারাও প্রিয়দর্শন বালকের মধুর আচরণে পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে ভগবদ্ভজন শিখাইতে, নানাভাবে সদুপদেশ প্রদান করিতে এবং প্রসাদী ভিক্ষান্নের কিয়দংশ তাহাকে দিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া ভোজন করিতে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশ্য যে সকল সাধু পান্থনিবাসে কোন কারণে অধিক কাল বাস করিতেন তাঁহাদিগের সহিতই বালক ঐভাবে মিশিতে সমর্থ হইল।

সাধুদিগের সহিত মিলনে চন্দ্রা দেবীর আশঙ্কা ও তন্নিরসন।

গদাধরের অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কয়েকজন সাধু অত্যধিক পথশ্রম নিবারণের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে লাহাবাবুদের পান্থনিবাসে ঐরূপে অধিক কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। বালক তাঁহাদিগের সহিত পূর্ব্বোক্তভাবে মিলিত হইয়া শীঘ্রই তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের সহিত তাহার ঐরূপে মিলিত হইবার কথা প্রথম প্রথম কেহই জানিতে পারিল না, কিন্তু বালক যখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের সহিত অধিককাল কাটাইতে লাগিল তখন ঐকথা

কাহারও জানিতে বাকি রহিল না। কারণ, কোন কোন দিন সে তাঁহাদিগের নিকটে প্রচুর আহার করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আর কিছুই খাইল না এবং চন্দ্রা দেবী কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে সমস্ত কথা নিবেদন করিল। শ্রীমতী চন্দ্রা উহাতে প্রথম প্রথম উদ্বিগ্না হইলেন না, বালকের প্রতি সাধুগণের প্রসন্নতা আশীর্ব্বাদ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহাকে দিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু বালক যখন পরে কোন দিন বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ হইয়া কোন দিন তিলক ধারণ আবার কোন দিন বা নিজ পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিয়া সাধুদিগের ন্যায় কৌপীন ও বহির্বাস পরিয়া গৃহে ফিরিয়া "মা, সাধুরা আমাকে কেমন সাজাইয়া দিয়াছেন, দেখ" বলিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল তখন চন্দ্রা দেবীর মন বিষম উদ্বিগ্ন হইল। তিনি ভাবিলেন, সাধুরা তাঁহার পুত্রকে কোনও দিন ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে না ত? উক্ত আশঙ্কার কথা গদাধরকে বলিয়া তিনি একদিন নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বালক উহাতে তাঁহাকে নানাভাবে আশ্বস্তা করিয়াও শান্ত করিতে পারিল না। তখন সাধুদিগের নিকটে আর কখনও যাইবে না বলিয়া সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল এবং জননীকে ঐকথা বলিয়া নিশ্চিন্তা করিল। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে গদাধর শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য সাধুদিগের নিকটে উপস্থিত হইল এবং ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে জননীর আশঙ্কার কথা নিবেদন করিল। তাঁহারা তাহাতে শ্রীমতী চন্দ্রার নিকটে বালকের সহিত আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিলেন যে গদাধরকে

ঐরূপ সঙ্গে লইবার সঙ্কল্প তাঁহাদিগের মনে কখনও উদিত হয় নাই এবং পিতামাতার অনুমতি ব্যতিরেকে ঐরূপ অল্পবয়স্ক বালককে সঙ্গে লওয়া তাঁহারা অপহরণরূপ সাধুবিগর্হিত বিষম অপরাধ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। চন্দ্রা দেবীর মনে তাহাতে পূর্ব্বাশঙ্কার ছায়া মাত্র রহিল না এবং সাধুদিগের প্রার্থনায় তিনি বালককে তাঁহাদিগের নিকটে পূর্ব্বের ন্যায় যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

গদাধরের দ্বিতীয়বার ভাবসমাধি।

এই কালের অন্য একটি ঘটনাতেও শ্রীমতী চন্দ্রা গদাধরের জন্য বিষম চিন্তিতা হইয়াছিলেন। ঐ ঘটনা সহসা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সকলে ধারণা করিলেও বুঝা যায় বালকের ভাবপ্রবণতা এবং চিন্তাশীলতা প্রবৃদ্ধ হইয়াই উহাকে আনয়ন করিয়াছিল। কামারপুকুরের এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে অবস্থিত আনুর নামক গ্রামের সুপ্রসিদ্ধা দেবী ৺ বিশালাক্ষীকে একদিন দর্শন করিতে যাইয়া পথিমধ্যে সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মদাস লাহার পূতস্বভাব কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী সেদিন বালকের ঐরূপ অবস্থা ভাবাবেশে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চন্দ্রা দেবী কিন্তু ঐ কথা বিশ্বাস না করিয়া উহা বায়ুরোগ হইতে বা অন্য কোন কারণে হইয়াছে বলিয়া চিন্তিতা হইয়াছিলেন।* বালক কিন্তু এবারও পূর্ব্বের ন্যায় বলিয়াছিল যে, ৺ দেবীর চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদ পদ্মে মন লয় হইয়াই তাহার ঐরূপ অবস্থার উদয় হইয়াছিল।

---

* এই ঘটনার সবিস্তার বৃত্তান্তের জন্য "সাধকভাব"—২য় অধ্যায়, ৪৫—৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

ঐরূপে দুই বৎসরের অধিক কাল অপগত হইল এবং বালক ক্রমে পিতার অভাব ভুলিয়া নিজ দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখে ব্যাপৃত থাকিতে অভ্যস্ত হইল। গদাধরের পিতৃবন্ধু শ্রীযুত ধর্ম্মদাস লাহার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার পুত্র গয়াবিষ্ণুর সহিত বালকের এইকালে সৌহৃদ্য উপস্থিত হইয়াছিল। একত্র পাঠ ও বিহারে বালকদ্বয় পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া ক্রমে পরস্পরকে স্যাঙাৎ বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিল এবং প্রতিদিন অনেক সময় একত্র কাটাইতে লাগিল এবং পল্লীবাসিনী রমণীগণ গদাধরকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহে বাটীতে আহ্বান ও ভোজন করাইবার কালে সে এখন নিজ স্যাঙাৎকে সঙ্গে লইতে কখন ভুলিত না। বালকের ধাত্রী কামার কন্যা ধনী মিষ্টান্ন মোদকাদি সযত্নে প্রস্তুত করিয়া তাহাকে উপহার প্রদান করিলে সে স্যাঙাৎকে উহার অংশ প্রদান না করিয়া কখনও ভোজন করিত না। বলা বাহুল্য শ্রীযুত ধর্ম্মদাস এবং গদাধরের অভিভাবকেরা বালকদ্বয়ের মধ্যে ঐরূপ সখ্য দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

গদাধরের স্যাঙাৎ গয়াবিষ্ণু।

সে যাহা হউক, গদাধর নবম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া শ্রীযুত রামকুমার এখন তাহার উপনয়নের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কামারকন্যা ধনী ইতিপূর্ব্বে এক সময়ে বালকের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল, সে যেন উপনয়নকালে তাহার নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাকে মাতৃসম্বোধনে কৃতার্থ করে। বালকও তাহাতে তাহার অকৃত্রিম স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। দরিদ্রা ধনী তাহাতে বালকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন

করিয়া তদবধি যথাসাধ্য অর্থাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিয়া সাগ্রহে ঐ কালের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই কাল উপস্থিত দেখিয়া গদাধর এখন নিজ অগ্রজকে ঐকথা নিবেদন করিল। কিন্তু বংশে কখনও ঐরূপ প্রথার অনুষ্ঠান না হওয়ায় শ্রীযুত রামকুমার উহাতে আপত্তি করিয়া বসিলেন। বালকও নিজ অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া ঐ বিষয়ে বিষম জেদ করিতে লাগিল। সে বলিল ঐরূপ না করিলে তাহাকে সত্যভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে এবং মিথ্যাবাদী ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞসূত্র ধারণে কখন অধিকারী হইতে পারে না। উপনয়নের কাল সন্নিকট দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই সকল বিষয়ের আয়োজন করা হইয়াছিল, বালকের পূর্ব্বোক্ত জেদে ঐ কর্ম্ম পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। ক্রমে ঐ কথা শ্রীযুত ধর্ম্মদাস লাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া দিতে যত্নপর হইয়া তিনি শ্রীযুত রামকুমারকে বলিলেন, ঐরূপ অনুষ্ঠান তাঁহাদিগের বংশে ইতিপূর্ব্বে না হইলেও উহা অন্যত্র বহু সদ্ব্রাহ্মণপরিবারে দেখা গিয়া থাকে। অতএব উহাতে তাঁহাদিগের যখন নিন্দাভাগী হইতে হইবে না তখন বালকের সন্তোষ ও শান্তির জন্য ঐরূপ করিতে দোষ নাই। প্রবীণ পিতৃসুহৃৎ ধর্ম্মদাসের কথায় তখন রামকুমার প্রভৃতি ঐ বিষয়ে আর আপত্তি করিলেন না এবং গদাধর হৃষ্ট-চিত্তে যথাবিধানে উপবীত ধারণ করিয়া সন্ধ্যা পূজাদি ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। কামারকন্যা ধনীও তখন বালকের সহিত ঐ ভাবে সম্বদ্ধা হইয়া আপনার জীবন ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল। উহার স্বল্পকাল পরেই বালক দশম বর্ষে পদার্পণ করিল।

গদাধরের উপনয়ন-কালের বৃত্তান্ত।

উপনয়ন হইবার কিছুকাল পরে একটি ঘটনায় গদাধরের অসাধারণ দিব্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া পল্লীবাসী সকলে যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছিল।* গ্রামের জমীদার লাহা বাবুদের বাটীতে কোনও বিশেষ শ্রাদ্ধাবসরে এক মহতী পণ্ডিতসভা আহূত হইয়াছিল এবং পণ্ডিতগণ ধর্ম্মবিষয়ক কোন জটিল প্রশ্নের সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়া সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছিলেন না। বালক গদাধর ঐ সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ের এমন সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছিল যে পণ্ডিতগণ তচ্ছ্রবণে তাহার ভূয়সী প্রশংসা ও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিতসভায় গদাধরের প্রশ্নসমাধান।

সে যাহা হউক, উপনয়ন হইবার পরে গদাধরের ভাবপ্রবণ হৃদয় নিজ প্রকৃতির অনুকূল অন্য এক বিষয় অবলম্বনের অবসর পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিল। পিতাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া জীবন্ত বিগ্রহ ৺রঘুবীর কিরূপে কামারপুকুরের ভবনে প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার শুভাগমনের দিবস হইতে লক্ষ্মীজলার ক্ষুদ্র জমীখণ্ডে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইয়া কিরূপে সংসারের অভাব দূরীভূত হইয়াছিল এবং করুণাময়ী চন্দ্রা দেবী অতিথি অভ্যাগতদিগকেও নিত্য অন্নদানে সমর্থা হইয়াছিলেন, ঐ সকল কথা শুনিয়া বালক পূর্ব্ব হইতেই উক্ত গৃহদেবতাকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। সেই দেবতাকে স্পর্শ ও পূজা করিবার অধিকার এখন হইতে প্রাপ্ত হইয়া বালকের হৃদয় নবানুরাগে পূর্ণ হইয়াছিল। সন্ধ্যা বন্দনাদি

গদাধরের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিণতি ও তৃতীয়বার ভাবসমাধি।

---

* এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য "গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ"—৪র্থ অধ্যায়, ১২৬—১২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

সমাপ্ত করিয়া সে এখন নিত্য তাঁহার পূজা ও ধ্যানে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিতে লাগিল এবং যাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া পিতার ন্যায় তাহাকেও সময়ে সময়ে দর্শন ও আদেশ দানে কৃতার্থ করেন তজ্জন্য বিশেষ নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। রামেশ্বর শিব এবং ৺শীতলামাতাও বালকের ঐ সেবার অন্তর্ভুক্ত হইলেন। ঐরূপ সেবা পূজার ফলও উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। বালকের পূত হৃদয় উহাতে একাগ্র হইয়া স্বল্পকালেই তাহাকে ভাবসমাধি বা সবিকল্প সমাধির অধিকারী করিল। এবং ঐ সমাধিসহায়ে তাহার জীবনে নানা দিব্যদর্শনও সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐরূপ সমাধি ও দর্শনের প্রথম বিকাশ এই বৎসর শিবরাত্রি-কালে তাহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। * বালক সে-দিন যথারীতি উপবাসী থাকিয়া বিশেষ নিষ্ঠার সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিতেছিল। তাহার বন্ধু গয়াবিষ্ণু এবং অন্য কয়েক জন বয়স্যও সেদিন ঐ উপলক্ষে উপবাসী ছিল এবং প্রতিবেশী গৃহস্থ সীতানাথ পাইনদের বাটীতে শিবমহিমা-সূচক যাত্রার অভিনয় হইবে জানিয়া উহা শুনিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে মনস্থ করিয়াছিল। প্রথম প্রহরের পূজা সমাপ্ত করিয়া গদাধর যখন তন্ময় হইয়া বসিয়া ছিল, তখন সহসা তাহার বয়স্যগণ আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, পাইনদের বাটীতে যাত্রায় তাহাকে শিব সাজিয়া কয়েকটি কথা বলিতে হইবে। কারণ যাত্রার দলে যে শিব সাজিত সে পীড়িত হইয়া ঐ ভূমিকা

* "সাধকভাব—"দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫১-৫৫ পৃষ্ঠা দেখ। 'সাধকভাব' পুস্তকের এই ঘটনার সবিস্তার বিবরণে 'গয়াবিষ্ণু'র স্থলে ভ্রমক্রমে 'গঙ্গাবিষ্ণু' নাম এবং পাইনদের বাটীর কর্ত্তার নাম 'রসিক লাল' লিখিত হইয়াছে। পাঠক উহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছে। বালক উহাতে পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেও তাহারা কিছুতেই ছাড়িল না। বলিল, শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিলে তাহাকে সর্ব্বক্ষণ শিবচিন্তাই করিতে হইবে, উহা পূজা করা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে; অধিকন্তু ঐরূপ না করিলে কত লোকের আনন্দের হানি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত; তাহারা সকলেও উপবাসী রহিয়াছে এবং ঐরূপে রাত্রিজাগরণে ব্রত পূর্ণ করিবে, মনস্থ করিয়াছে। গদাধর অগত্যা সম্মত হইয়া শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসরে নামিয়াছিল। কিন্তু জটা, রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি-ভূষিত হইয়া সে শিবের চিন্তায় এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে তাহার কিছুমাত্র বাহ্যসংজ্ঞা ছিল না। পরে বহুক্ষণ অতীত হইলেও তাহার চেতনা হইল না দেখিয়া সেরাত্রির মত যাত্রা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

এখন হইতে গদাধরের ঐরূপ সমাধি মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইতে লাগিল। ধ্যান করিবার কালে এবং দেবদেবীর মহিমা-সূচক সঙ্গীতাদি শুনিতে শুনিতে সে এখন হইতে তন্ময় হইয়া যাইত এবং তাহার চিত্ত স্বল্প বা অধিক ক্ষণের জন্য নিজাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বহির্বিষয়সকল গ্রহণে বিরত থাকিত। ঐ তন্ময়তা যে দিন প্রগাঢ় হইত সেই দিনই তাহার বাহ্যসংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইয়া সে জড়ের ন্যায় কিছুকাল অবস্থান করিত। ঐ অবস্থা নিবৃত্তির পরে কিন্তু সে জিজ্ঞাসিত হইলে বলিত, যে দেব অথবা দেবীর ধ্যান বা সঙ্গীতাদি সে শ্রবণ করিতেছিল তাঁহার সম্বন্ধে অন্তরে কোনরূপ দিব্য দর্শন লাভ করিয়া সে আনন্দিত হইয়াছে। চন্দ্রা দেবী প্রমুখ পরিবারস্থ সকলে উহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত সাতিশয় ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে বালকের স্বাস্থ্যের

গদাধরের পুনঃ পুনঃ ভাব-সমাধি লাভ।

কিছুমাত্র হানি হইতে না দেখিয়া এবং তাহাকে সর্ব্বকর্ম্মকুশল হইয়া সদানন্দে কাল কাটাইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের ঐ আশঙ্কা ক্রমে অপগত হইয়াছিল। বারংবার ঐরূপ অবস্থার উদয় হওয়ায় বালকেরও ক্রমে উহা অভ্যস্ত এবং প্রায় ইচ্ছাধীন হইয়া গিয়াছিল এবং উহার প্রভাবে তাহার সূক্ষ্ম বিষয়সকলে দৃষ্টি প্রসারিত এবং দেবদেবীবিষয়ক নানা তত্ত্ব উপলব্ধি হওয়ায় উহার আগমনে সে আনন্দিত ভিন্ন কখনও শঙ্কিত হইত না। সে যাহা হউক, বালকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এখন হইতে বিশেষভাবে প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল এবং সে হরিবাসর, শিবের ও মনসার গাজন, ধর্ম্মপূজা প্রভৃতি গ্রামের যেখানে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে লাগিল সেখানেই উপস্থিত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে লাগিল। বালকের মহদুদার ধর্ম্মপ্রকৃতি তাহাকে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসকদিগের প্রতি বিদ্বেষশূন্য করিয়া তাহাদিগকে এখন হইতে আপনার করিয়া লইল। গ্রামের প্রচলিত প্রথা তাহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কারণ, বিষ্ণুপাসক, শিবভক্ত, ধর্ম্মপূজক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ অন্য গ্রামসকলের ন্যায় না হইয়া এখানে পরস্পরের প্রতি দ্বেষশূন্য হইয়া বিশেষ সদ্ভাবে বসবাস করিত।

গদাধরের বিদ্যার্জ্জনে উদাসীনতার কারণ।

ঐরূপে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিণতি হইলেও কিন্তু গদাধরের বিদ্যাভাসে অনুরাগ এখন প্রবৃদ্ধ হয় নাই। পণ্ডিত ও ভট্টাচার্য্যাদি উপাধি-ভূষিত ব্যক্তিসকলের ঐহিক ভোগ-সুখ ও ধনলালসা দেখিয়া সে বরং তাঁহাদিগের ন্যায় বিদ্যার্জ্জনে দিন দিন উদাসীন হইয়াছিল। কারণ, বালকের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাহাকে এখন সকল ব্যক্তির কার্য্যের উদ্দেশ্য নিরূপণে প্রথমেই অগ্রসর করিত এবং তাহার পিতার

বৈরাগ্য, ঈশ্বরভক্তি, এবং সত্য, সদাচার ও ধর্ম্মপরায়ণতাদি গুণসকলকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগের আচরণের মূল্য নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত করিত। ঐরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বালক সংসারে প্রায় সকল ব্যক্তিরই অন্যরূপ উদ্দেশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। আবার অনিত্য সংসারকে নিত্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা সর্ব্বদা দুঃখে মুহ্যমান হয় দেখিয়া সে ততোধিক বিমর্ষও হইয়াছিল। ঐরূপ দেখিয়া শুনিয়া ভিন্ন-ভাবে নিজ জীবন পরিচালিত করিতে যে, তাহার মনে সঙ্কল্পের উদয় হইবে ইহা বিচিত্র নহে। পাঠক হয় ত পূর্ব্বোক্ত কথা-সকল শুনিয়া বলিবেন, একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচারশক্তির অতদূর বিকাশ হওয়া কি সম্ভবপর? উত্তরে বলা যাইতে পারে, সাধারণ বালকসকলের ঐরূপ হয় না সত্য; কিন্তু গদাধর ঐ শ্রেণীভুক্ত ছিল না। অসাধারণ প্রতিভা, মেধা ও মানসিক সংস্কারসমূহ লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং অল্প বয়স হইলেও তাহার পক্ষে ঐরূপ কার্য্য বিচিত্র নহে। সেজন্য ঐরূপ হওয়া আমাদিগের নিকটে যেরূপই প্রতীয়মান হউক না কেন, আমরা অনুসন্ধানে ঘটনা যেরূপ জানিয়াছি সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে উহা তদ্রূপই বলিয়া যাইতে হইবে।

সে যাহা হউক, প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসে ক্রমশঃ উদাসীন হইতে থাকিলেও গদাধর এখনও পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিতরূপে পাঠশালায় যাইতেছিল এবং মাতৃভাষায় লিখিত মুদ্রিত গ্রন্থসকল পড়িতে এবং লিখিতে বিশেষ পটু হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ রামায়ণ মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থসকল সে এখন ভক্তির সহিত এমন সুন্দরভাবে পাঠ করিত যে, লোকে তচ্ছ্রবণে মুগ্ধ হইত।

গ্রামের সরলচিত্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেজন্য তাহার মুখে ঐ সকল গ্রন্থ শ্রবণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত। বালকও তাহাদিগের তৃপ্তিসম্পাদনে কখনও পরাঙ্মুখ হইত না। ঐরূপে সীতানাথ পাইন, মধু যুগী প্রভৃতি অনেকে ঐজন্য তাহাকে নিজ নিজ বাটীতে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইত এবং স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলিত হইয়া তাহার মুখে প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবোপাখ্যান অথবা রামায়ণ-মহাভারতাদি হইতে অন্য কোন উপাখ্যান ভক্তি-ভরে শ্রবণ করিত।

গদাধরের শিক্ষা এখন কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল।

রামায়ণ-মহাভারতাদি ভিন্ন কামারপুকুরে, এতদঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেবদেবীদিগের প্রকট কাহিনীসমূহ গ্রাম্য কবিদিগের দ্বারা সরল পদ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচলিত আছে। ঐরূপে ৺ তারকেশ্বর মহাদেবের প্রকট হইবার কথা, যোগাদ্যার পালা, বন-বিষ্ণুপুরের ৺ মদনমোহনজীর উপাখ্যান প্রভৃতি অনেক দেব দেবীর অলৌকিক চরিত্র এবং সাধু ভক্তদিগের নিকট স্বস্বরূপ প্রকাশ করিবার বৃত্তান্ত সময়ে সময়ে গদাধরের শ্রবণ-গোচর হইত। বালক নিজ শ্রুতিধরত্বগুণে ঐ সকল শুনিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখিত এবং ঐরূপ উপাখ্যানের মুদ্রিত গ্রন্থ বা পুঁথি পাইলে কখন কখন উহা স্বহস্তে লিখিয়াও লইত। গদা-ধরের স্বহস্তলিখিত রামকৃষ্ণায়ণ পুঁথি, যোগাদ্যার পালা, সুবাহুর পালা প্রভৃতি আমরা কামারপুকুরের বাটীতে অনুসন্ধানে দেখিতে পাইয়া ঐ বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম। ঐ সকল উপাখ্যানও যে, বালক অনুরুদ্ধ হইয়া গ্রামের সরলচিত্ত নরনারীর নিকটে এই কালে বহুবার অধ্যয়ন ও আবৃত্তি করিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গণিত শাস্ত্রে বালকের উদাসীনতার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পাঠশালায় যাইয়া সে ঐ বিষয়েও উন্নতি সাধন করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, ধারাপাতে কাঠা-কিয়া পর্য্যন্ত এবং পাটীগণিতে তেরিজ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য সামান্য গুণ ভাগ পর্য্যন্ত তাহার শিক্ষা ঐ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু দশম বর্ষে উপনীত হইয়া ধ্যানের পরিণতিতে যখন তাহার মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বোক্তভাবে সমাধি উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন তাহার অগ্রজ রামকুমার প্রমুখ বাটীর সকলে তাহার বায়ুরোগ হইয়াছে ভাবিয়া তাহাকে যখন ইচ্ছা পাঠশালায় যাইতে এবং যাহা ইচ্ছা শিখিতে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং ঐ জন্য কোন বিষয়ে তাহার শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে না দেখিলেও শিক্ষক উহার জন্য তাহাকে কখনও পীড়ন করেন নাই। সুতরাং গদাধরের পাঠশালার শিক্ষা যে, এখন হইতে বিশেষ অগ্রসর হইল না, এ কথা বলিতে হইবে না।

ঐরূপে দুই বৎসর কাল অতীত হইল এবং গদাধর ক্রমে দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইল। তাহার মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর এখন দ্বাবিংশতি বর্ষে এবং কনিষ্ঠা ভগিনী সর্ব্বমঙ্গলা নবমে পদার্পণ করিল। শ্রীযুত রামকুমার রামেশ্বরকে বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী গৌরহাটি নামক

রামেশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ।

গ্রামের শ্রীযুত রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগিনীর সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন এবং রামসদয়কে নিজ ভগিনী সর্ব্বমঙ্গলার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। ঐরূপে রামেশ্বরের পরিবর্ত্তে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় কন্যাপক্ষীয়দিগকে পণ দিবার জন্য শ্রীযুত রামকুমারকে ব্যস্ত হইতে হইল না। রামকুমারের

পারিবারিক জীবনে এই সময়ে অন্য একটি বিশেষ ঘটনাও উপস্থিত হইয়াছিল। যৌবনের অবসানেও তাঁহার সহধর্ম্মিণী গর্ভধারণ না করায় সকলে তাঁহাকে বন্ধ্যা বলিয়া এতকাল নিরূপণ করিয়াছিল। তাঁহাকে এখন গর্ভবতী হইতে দেখিয়া পরিবারবর্গের মনে আনন্দ ও শঙ্কার যুগপৎ উদয় হইল। কারণ, গর্ভধারণ করিলেই তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইবে একথা তাঁহাদিগের কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বে রামকুমারের নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গর্ভবতী হইয়া রামকুমারপত্নীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন।

সে যাহা হউক, পত্নীর গর্ভধারণের কাল হইতে শ্রীযুত রামকুমারের ভাগ্যচক্রে বিশেষ পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। যে সকল উপায়ে তিনি এতদিন বেশ অর্জ্জন করিতেছিলেন সে সকলে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাগম হইতে লাগিল না এবং তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্যও এখন হইতে ভঙ্গ হইয়া তিনি আর পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মঠ রহিলেন না। তাঁহার পত্নীর আচরণসকলও এখন যেন ভিন্নাকার ধারণ করিল। তাঁহার পূজ্যপাদ পিতার সময় হইতে সংসারে নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল যে, অনুপনীত বালক এবং পীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন কেহ কখনও ৺রঘুবীরের পূজার পূর্ব্বে জলগ্রহণ করিবে না। তাঁহার পত্নী এখন ঐ নিয়ম ভঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং অমঙ্গলাশঙ্কা করিয়া বাটীর অন্য সকলে ঐবিষয়ে প্রতিবাদ করিলে তিনি তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সামান্য সামান্য বিষয়সকল অবলম্বন করিয়া তিনি পরিবারস্থ সকলের সহিত বিবাদ ও মনোমালিন্য উপস্থিত করিতে লাগিলেন এবং শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী ও নিজ স্বামী রামকুমারের কথাতেও ঐরূপ বিপরীতাচরণসকল হইতে নিরস্তা হইলেন না। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়

ভাবিয়া তাঁহারা ঐ সকল আচরণের বিরুদ্ধে আর কিছু না বলিলেও কামারপুকুরের ধর্ম্মের সংসারে এখন ঐরূপে শান্তির পরিবর্ত্তে অনেক সময়ে অশান্তির উদয় হইতে থাকিল।

আবার, শ্রীযুত রামকুমারের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর এখন কৃতবিদ্য হইলেও বিশেষ উপার্জ্জনক্ষম হইয়া উঠিলেন না। সুতরাং পরিবারবর্গের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত আয়ের হ্রাস হইয়া সংসারে পূর্ব্বের ন্যায় সচ্ছলতা রহিল না। শ্রীযুত রামকুমার ঐজন্য চিন্তিত হইয়া নানা উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত থাকিয়াও ঐ বিষয়ের প্রতীকার করিতে সমর্থ হইলেন না। কে যেন ঐ সকল উপায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া উহাদিগকে ফলবান হইতে দিল না। ঐরূপে চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া রামকুমারের জীবন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল এবং দিন, পক্ষ, মাস অতীত হইয়া ক্রমে তাঁহার পত্নীর প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া তিনি নিজ পূর্ব্ব দর্শন স্মরণপূর্ব্বক অধিকতর বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন।

রামকুমারের সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন।

ক্রমে ঐ কাল সত্যসত্যই উপস্থিত হইল এবং শ্রীযুত রামকুমারের সহধর্ম্মিণী সন ১২৫৫ সালের কোন সময়ে এক পরম রূপবান তনয় প্রসবান্তে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সূতিকাগৃহেই স্বর্গারোহণ করিলেন। রামকুমারের দরিদ্র সংসারে ঐ ঘটনায় শোকের নিবিড় যবনিকা পুনরায় নিপতিত হইল।

রামকুমার-পত্নীর পুত্র-প্রসবান্তে মৃত্যু।

অষ্টম অধ্যায়।

যৌবনের প্রারম্ভে।

পত্নী পরলোকে গমন করিলেন, কিন্তু রামকুমারের দুঃখ-দুর্দ্দিনের অবসান হইল না। বিদায় আদায় কমিয়া যাওয়ায় অর্থের অভাবে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার দিন দিন অবনতি হইতে লাগিল। লক্ষ্মীজলার জমীখণ্ডে পর্য্যাপ্ত ধান্য এখনও উৎপন্ন হইলেও বস্ত্রাদি অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় পদার্থসকলের অভাব সংসারে প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তদুপরি তাঁহার বৃদ্ধা মাতার ও মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ের জন্য এখন নিত্য দুগ্ধের প্রয়োজন। সুতরাং ঋণ করিয়া ঐ সকল প্রয়োজন সাধিত হইতে লাগিল, এবং ঋণজালের প্রতিদিন বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইল না। অশেষ চিন্তা ও নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও রামকুমার উহা প্রতিরোধে অসমর্থ হইলেন। তখন বন্ধুবর্গের

রামকুমারের কলিকাতায় টোল খোলা।

পরামর্শে অন্যত্র গমন করিলে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত মনও উহাতে সাহ্লাদে সম্মতি দান করিল। কারণ, প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল যাঁহাকে জীবন-সঙ্গিনী করিয়া সংসার পাতিয়াছিলেন তাঁহার স্মৃতি যে গৃহের সর্ব্বত্র বিজড়িত রহিয়াছে, সেই গৃহ হইতে দূরে থাকিলেই এখন শান্তিলাভের সম্ভাবনা। সুতরাং কলিকাতা বা বর্দ্ধমান কোথায় যাইলে অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা এই বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল। পরিশেষে স্থির হইল প্রথমোক্ত স্থানে যাওয়াই

কর্ত্তব্য। কারণ, শিহড় গ্রামের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেশড়ার রামধন ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার পরিচিত অনেক ব্যক্তি কলিকাতা যাইয়া উপার্জ্জনের সুবিধা লাভ করিয়া নিজ নিজ সংসারের বেশ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে—একথা তাঁহার বন্ধুগণ নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল ব্যক্তিরা যে তাঁহা অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রবলে অনেকাংশে হীন, একথাও তাঁহারা তাঁহাকে বলিতে ভুলিলেন না। সুতরাং পত্নীবিয়োগের স্বল্পকাল পরেই শ্রীযুত রামকুমার রামেশ্বরের উপর সংসারের ভারার্পণ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং ঝামাপুকুর নামক পল্লীর ভিতর টোল খুলিয়া ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতে নিযুক্ত হইলেন।

রামকুমার-পত্নীর মৃত্যুতে পারিবারিক পরিবর্ত্তন।

রামকুমারের পত্নীর মৃত্যুতে কামারপুকুরের পারিবারিক জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। শ্রীমতী চন্দ্রা ঐ ঘটনায় গৃহকর্ম্মের সমস্ত ভার পুনরায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। রামকুমার-পুত্র অক্ষয়ের লালনপালনের ভারও ঐ দিন হইতে তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল। তাঁহার মধ্যম পুত্র রামেশ্বরের পত্নী তাঁহাকে ঐ সকল কর্ম্মে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিল; কিন্তু সে তখনও নিতান্ত বালিকা, তাহার নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং ৺রঘুবীরের সেবা, অক্ষয়ের লালনপালন এবং রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম, সকলই তাঁহাকে এখন করিতে হইত। ঐ সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে তাঁহার সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত, বিশ্রামের জন্য তিলার্দ্ধ অবসর থাকিত না। আটান্ন বৎসর বয়ঃক্রমে * সংসারের সমস্ত

* শ্রীমতী চন্দ্রা সন ১১৯৭ সালে জন্মগ্রহণ এবং সন ১২৮২ সালে দেহরক্ষা

ভার ঐরূপে স্কন্ধে লওয়া সুখসাধ্য না হইলেও শ্রীশ্রীরঘুবীরের ঐরূপ ইচ্ছা বুঝিয়া চন্দ্রা দেবী উহা বিনা অভিযোগে বহন করিতে লাগিলেন।

অন্য দিকে সংসারের আয়ব্যয়ের ভার শ্রীযুত রামেশ্বরের উপর এখন হইতে নিপতিত হওয়ায় তিনি কিরূপে উপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গকে সুখী করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন। কিন্তু কৃতবিদ্য হইলেও তিনি কোনকালে বিশেষ উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা শ্রবণ করি নাই। তদুপরি পরিব্রাজক সাধু ও সাধকগণকে দেখিতে পাইলে তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে অনেককাল অতিবাহিত করিতেন এবং তাঁহাদিগের কোনরূপ অভাব দেখিলে উহা মোচন করিতে অনেক সময়ে অতিরিক্ত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং আয় বৃদ্ধি হইলেও তাঁহার দ্বারা সংসারের ঋণ পরিশোধ অথবা বিশেষ সচ্ছলতা সম্পাদিত হইল না। কারণ, সংসারী হইলেও তিনি সঞ্চয়ী হইতে পারিলেন না এবং সময়ে সময়ে আয়ের অধিক ব্যয় করিয়া "৶রঘুবীর কোনরূপে চালাইয়া দিবেন" ভাবিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

রামেশ্বরের কথা।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিলেও শ্রীযুত রামেশ্বর তাহার শিক্ষাদি অগ্রসর হইতেছে কি না তদ্বিষয়ে

করিয়াছিলেন। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসরমাত্র হইয়াছিল। "সাধকভাবে"র পরিশিষ্টের ৮ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে লিখিত হইয়াছে—তিনি সন ১২৮২ সালের ১৬ই ফাল্গুন, ৯০।৯৫ বৎসরে দেহত্যাগ করেন। পাঠক উহা এই ভাবে সংশোধন করিয়া লইবেন—সন ১২৮২ সালে ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে চন্দ্রা দেবী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিদিবসে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

কোনকালে লক্ষ্য করিতেন না। কারণ, একে ঐরূপ করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল, তদুপরি অর্থচিন্তায় তাঁহাকে নানা স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। সুতরাং ঐ বিষয় লক্ষ্য করিতে তাঁহার ইচ্ছা এবং সময় উভয় বস্তুরই এখন অভাব হইয়াছিল। আবার এই অল্প বয়সেই বালকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অদ্ভুত পরিণতি দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, তাহার প্রকৃতি তাহাকে সুপথে ভিন্ন কখনও কুপথে পরিচালিত করিবে না। পল্লীর নরনারী-সকলকে তাহার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে এবং তাহাকে পরমাত্মীয় বোধে ভালবাসিতে দেখিয়া তাঁহার ঐ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তিনি বুঝিতেন, বিশেষ সৎ এবং উদারচরিত্র না হইলে কেহ কখন সংসারে সকল ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করিয়া তাহাদিগের প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। সেজন্য বালকের সম্বন্ধে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা-পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠিত এবং তিনি সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। সুতরাং রামকুমারের কলিকাতা গমনকালে গদাধর ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া এক প্রকার অভিভাবকশূন্য হইয়া পড়িল এবং তাহার উন্নত প্রকৃতি তাহাকে যেদিকে ফিরাইতে লাগিল, সে এখন অবাধে সেই পথেই চলিতে লাগিল।

গদাধরের সম্বন্ধে রামেশ্বরের চিন্তা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি গদাধরের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাহাকে এই অল্প বয়সেই প্রত্যেক ব্যক্তির ও কার্য্যের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিতে শিখাইয়াছিল। সুতরাং অর্থলাভে সহায়তা হইবে বলিয়াই যে, পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসে এবং টোলে উপাধিভূষিত হইতে লোকে সচেষ্ট হয় ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই।

গদাধরের মনের বর্ত্তমান অবস্থা ও কার্য্যকলাপ।

আবার, অশেষ আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক সেই অর্থ উপার্জ্জন এবং উহা দ্বারা সাংসারিক ভোগসুখ লাভ করিয়া লোকে তাহার পিতার ন্যায় সত্যনিষ্ঠা. চরিত্রবল এবং ধর্ম্মলাভে সক্ষম হয় না, ইহাও সে দিন দিন দেখিতে পাইতেছিল। গ্রামের কোন কোন পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ স্বার্থসুখে অন্ধ হইয়া বিষয়সম্পত্তি লইয়া পরস্পর বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমা উত্থাপনপূর্ব্বক গৃহ ও ক্ষেত্রাদিতে দড়ি ফেলিয়া "এই দিকটা আমার, ঐ দিকটা উহার" ইত্যাদি অন্ত নিরূপণ করিয়া লইয়া কয়েক দিন ঐ বিষয় ভোগ করিতে না করিতেই শমনসদনে চলিয়া যাইল—ঐরূপ দৃষ্টান্তসকল কখনও কখনও অবলোকন করিয়া বালক বিশেষরূপে বুঝিয়াছিল, অর্থ ও ভোগলালসা মানবজীবনে অনেক অনর্থ উপস্থিত করে। সুতরাং অর্থকরী বিদ্যার্জ্জনে সে যে এখন দিন দিন উদাসীন হইবে এবং পিতার ন্যায় 'মোটা ভাত কাপড়ে' সন্তুষ্ট থাকিয়া ঈশ্বরের প্রীতিলাভকে মনুষ্য-জীবনের সারোদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিবে ইহা বিচিত্র নহে। সেজন্য বয়স্যদিগের প্রতি প্রেমে গদাধর পাঠশালায় প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন সময়ে যাইলেও ৺রঘুবীরের সেবা-পূজায় এবং গৃহকর্ম্মে সাহায্যদানপূর্ব্বক মাতার পরিশ্রমের লাঘব করিয়া এখন হইতে তাহার অধিক কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। ঐ সকল বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তাহাকে এখন প্রায়ই বাটীতে থাকিতে হইত।

গদাধর ঐরূপে বাটীতে অধিক কাল অতিবাহিত করায় পল্লীরমণীগণের তাহার সহিত মিলিত হইবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া তাঁহা-দিগের অনেকে অবসরকালে শ্রীমতী চন্দ্রার নিকটে উপস্থিত

হইতেন এবং বালককে তথায় দেখিতে পাইয়া কখনও গান করিতে এবং কখন ধর্ম্মোপাখ্যানসকল পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন। বালকও তাঁহাদিগের ঐ সকল অনুরোধ যথাসাধ্য পালন করিতে যত্নপর হইত। চন্দ্রা দেবীকে গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য তাহার অবসরের অভাব দেখিলে তাঁহারা আবার সকলে মিলিয়া শ্রীমতী চন্দ্রার কর্ম্মসকল করিয়া দিয়া তাহার মুখে পুরাণ-কথা ও সঙ্গীতাদি শুনিবার অবসর করিয়া লইতেন। ঐরূপে তাঁহাদিগের নিকটে কিছুক্ষণ পাঠ ও সঙ্গীত করা গদাধরের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে অন্যতম হইয়া উঠিয়াছিল। রমণীগণও উহাতে এত আনন্দ অনুভব করিতেন যে, উহা অধিকক্ষণ শুনিবার আশয়ে তাঁহারা এখন হইতে নিজ নিজ গৃহকর্ম্মসকল শীঘ্র শীঘ্র সমাপ্ত করিয়া চন্দ্রা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

পল্লীরমণীগণের নিকটে গদাধরের পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি।

গদাধর ইঁহাদের নিকটে শুদ্ধ পুরাণ পাঠ মাত্রই করিত না। কিন্তু অন্য নানা উপায়ে ইঁহাদিগের আনন্দ সম্পাদন করিত। গ্রামে ঐ সময়ে তিন দল যাত্রা, একদল বাউল এবং দুই এক দল কবি ছিল; তদ্ভিন্ন বহু বৈষ্ণব এখানে বসতি করায় অনেক গৃহেই প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভাগবত পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হইত। বাল্যকাল হইতে শ্রবণ করায় এবং নিজ স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভায় ঐ সকল দলের পালা, গান ও সঙ্কীর্ত্তন সকল গদাধরের আয়ত্ত ছিল। সেজন্য রমণীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে সে কোন দিন যাত্রার পালা, কোন দিন বাউলের গীতা-বলী, কোন দিন কবি এবং কোন দিন বা সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিত। যাত্রার পালা বলিবার কালে সে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে

বিভিন্ন ভূমিকার কথাসকল উচ্চারণপূর্ব্বক একাকীই সকল চরিত্রের অভিনয় করিত। আবার নিজ জননী বা রমণীদিগের মধ্যে কাহাকেও কোন দিন বিমর্ষ দেখিলে সে ঐসকল যাত্রার সঙের পালা অথবা সকলের পরিচিত গ্রামের কোন ব্যক্তির বিচিত্র আচরণ ও হাবভাবের এমন স্বাভাবিক অনুকরণ করিত যে, তাঁহাদিগের মধ্যে হাস্য ও কৌতুকের তরঙ্গ ছুটিত।

পল্লীরমণীগণের গদাধরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস।

সে যাহা হউক, গদাধর ঐরূপে ইঁহাদিগের হৃদয়ে ক্রমে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বালকের জন্মগ্রহণকালে তাহার জনকজননী যে সকল অদ্ভুত স্বপ্ন ও দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন, সে সকলের কথা ইঁহারা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। আবার দেবদেবীর ভাবাবেশে সময়ে সময়ে তাঁহার যেরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব অবস্থান্তর উপস্থিত হয় তাহাও তাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার জ্বলন্ত দেবভক্তি, তন্ময় হইয়া পুরাণ পাঠ, মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত এবং তাঁহাদিগের প্রতি আত্মীয়ের ন্যায় সরল উদার আচরণ যে, তাঁহাদিগের কোমল হৃদয়ে এখন অপূর্ব্ব ভক্তি ভালবাসার উদয় করিবে ইহা বিচিত্র নহে। আমরা শুনিয়াছি, ধর্ম্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নময়ী প্রমুখ বর্ষীয়সী রমণীগণ বালকের ভিতরে বালগোপালের দিব্য প্রকাশ অনুভব করিয়া তাহাকে পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন; এবং তদপেক্ষা স্বল্পবয়স্কা রমণীগণ তাহাকে ঐরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার সহিত সখ্যভাবে সম্বদ্ধা হইয়াছিলেন। রমণীগণের অনেকেই বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সরল কবিতাময় বিশ্বাসই তাঁহাদিগের ধর্ম্মজীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল, সুতরাং অশেষ গুণসম্পন্ন

প্রিয়দর্শন বালককে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিচিত্র ছিল না। সে যাহা হউক, ঐরূপ বিশ্বাসে তাঁহারা এখন গদাধরের সহিত মিলিতা হইয়া তাহাকে নিঃসঙ্কোচে আপনাপন মনের কথা খুলিয়া বলিতেন এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। গদাধরও তাঁহাদিগের সহিত এমন ভাবে মিলিত হইত যে, অনেক সময়ে তাহাকে তাঁহাদিগের রমণী বলিয়া মনে হইত।*

রমণীবেশে গদাধর।

গদাধর কখন কখন রমণীর বেশভূষা ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে বিশেষ বিশেষ নারীচরিত্রের অভিনয় করিত। ঐরূপে শ্রীমতী রাধারাণীর অথবা তাঁহার প্রধানা সখী বৃন্দার ভূমিকা গ্রহণ করিবার কালে তাঁহারা তাহাকে অনেক সময় রমণীর বেশভূষায় সজ্জিত হইতে অনুরোধ করিতেন। বালকও তাঁহাদিগের ঐ অনুরোধ রক্ষা করিত। ঐ সময়ে তাহার হাব ভাব, কথা বার্ত্তা, চাল চলন প্রভৃতি অবিকল নারীর ন্যায় হইত। রমণীগণ উহা দেখিয়া বলিতেন, নারী সাজিলে গদাধরকে পুরুষ বলিয়া কেহই চিনিতে পারে না। উহাতে বুঝিতে পারা যায় বালক নারী-গণের প্রত্যেক কার্য্য কত তন্ন তন্ন করিয়া ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিল। রঙ্গপ্রিয় বালক এই সময়ে কোন কোন দিন রমণীর ন্যায় বেশভূষা করিয়া কক্ষে কলসী ধারণপূর্ব্বক পুরুষ-দিগের সম্মুখ দিয়া হালদারপুকুরে জল আনয়নে গমন করিয়া-ছিল এবং কেহই তাহাকে ঐবেশে চিনিতে পারে নাই।

* সম্পূর্ণরূপে রমণীগণের ন্যায় হইবার বাসনা শ্রীযুত গদাধরের প্রাণে এই কালে কত প্রবল হইয়াছিল তাহা "সাধকভাবে"র চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ২৮৯ ও ২৯০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ কথা হইতে পাঠক সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

গ্রামের ধনী গৃহস্থ সীতানাথ পাইনদের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সীতানাথের সাত পুত্র ও আট কন্যা ছিল; এবং কন্যাগণ বিবাহের পরেও সীতানাথের ভবনে একাশ্রে অবস্থান করিতেছিল। শুনা যায়, সীতানাথের বহু গোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন দশখানি শিলে বাটনা বাটা হইত, রন্ধন-কার্য্যে এত মসলার প্রয়োজন হইত! তদ্ভিন্ন সীতানাথের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের অনেকে আবার তাঁহার বাটীর পার্শ্বে বাটী করিয়া বাস করিয়াছিল। সেজন্য কামারপুকুরের এই অংশ বণিকপল্লী নামে প্রসিদ্ধ ছিল; এবং উহা ক্ষুদিরামের বাটীর সন্নিকটে থাকায় বণিক-রমণীগণের অনেকে চন্দ্রা দেবীর নিকটে অবসরকালে উপস্থিত হইতেন; বিশেষতঃ আবার, সীতানাথের স্ত্রী ও কন্যাগণ। সুতরাং গদাধরের সহিত ইঁহাদিগের এখন বিশেষ সৌহৃদ্য উপস্থিত হইয়াছিল। ইঁহারা বালককে অনেক সময়ে নিজ ভবনে লইয়া যাইতেন, এবং রমণী সাজিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে অভিনয়াদি করিতে অনুরোধ করিতেন। অভিভাবকগণের নিষেধে তাঁহাদিগের আত্মীয়া রমণীগণের অনেকে তাঁহাদিগের বাটী ভিন্ন অন্যত্র যাইতে পারিতেন না এবং সেজন্য গদাধরের পাঠ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করা তাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিত না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা বালককে ঐরূপে নিজ ভবনে যাইতে নিমন্ত্রণ করিতেন। ঐরূপে যাঁহারা চন্দ্রা দেবীর নিকটে যাইতেন না, বণিকপল্লীর ভিতরে এমন অনেক-গুলি রমণীও গদাধরের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সে সীতানাথের ভবনে উপস্থিত হইলে তাঁহারা লোকমুখে সংবাদ পাইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তাহার পাঠ শ্রবণে ও অভি-

সীতানাথ পাইনের পরিবারবর্গের সহিত গদাধরের সৌহৃদ্য।

নয়াদি দর্শনে আনন্দ উপভোগ করিতেন। বাটীর কর্ত্তা সীতানাথ গদাধরকে বিশেষরূপে ভালবাসিতেন, এবং বণিকপল্লীর অন্যান্য পুরুষেরাও তাহার সদ্‌গুণসকলের সহিত পরিচিত ছিলেন। সেজন্য তাঁহাদিগের রমণীগণ তাহার নিকটে ঐরূপে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করে জানিয়াও তাঁহারা উহাতে আপত্তি করিতেন না।

বণিকপল্লীর দুর্গাদাস পাইন নামক এক ব্যক্তি কেবল ঐ বিষয়ে আপত্তি করিতেন এবং গদাধরকে স্বয়ং শ্রদ্ধা ভক্তি করিলেও অন্দরের কঠোর অবরোধ-প্রথা কাহারও জন্য কোন কালে শিথিল হইতে দিতেন না। তাঁহার অন্তঃপুরের কথা কেহ জানিতে সক্ষম নহে এবং তাঁহার বাটীর রমণীগণকে কেহ কখনও অবলোকন করে নাই—বলিয়া তিনি সীতানাথ-প্রমুখ তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট সময়ে সময়ে অহঙ্কারও করিতেন। ফলতঃ সীতানাথপ্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহার ন্যায় কঠোর অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হীন জ্ঞান করিতেন।

দুর্গাদাস একদিন তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকটে ঐরূপে অহঙ্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে গদাধর তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক বলিলেন, "অবরোধপ্রথার দ্বারা রমণীগণকে কখন কি রক্ষা করা যায়, সৎশিক্ষা ও দেবভক্তি প্রভাবেই তাঁহারা সুরক্ষিত হন; ইচ্ছা করিলে আমি তোমার অন্দরের সকলকে দেখিতে ও সমস্ত কথা জানিতে পারি।" দুর্গাদাস তাহাতে অধিকতর অহঙ্কৃত হইয়া বলিলেন, "কেমন জানিতে পার, জান দেখি?" গদাধরও তাহাতে 'আচ্ছা দেখা যাইবে' বলিয়া সেদিন চলিয়া আসিল। পরে একদিন অপরাহ্নে

কাহাকেও কিছু না বলিয়া বালক মোটা মলিন একখানি সাড়ী ও রূপার পৈঁছা প্রভৃতি পরিয়া দরিদ্রা তন্তুবায়-রমণীর ন্যায় বেশ ধারণপূর্ব্বক একটি চুবড়ি কক্ষে লইয়া ও অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে হাটের দিক হইতে দুর্গাদাসের ভবনসম্মুখে উপস্থিত হইল। দুর্গাদাস বন্ধুবর্গের সহিত তখন বহির্ব্বাটীতেই বসিয়া ছিলেন। রমণী-বেশধারী গদাধর তাঁহাকে তন্তুবায়রমণী গ্রামান্তর হইতে হাটে সূতা বেচিতে আসিয়া সঙ্গিনীগণ ফেলিয়া যাওয়ায়, বিপন্না বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিল এবং রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিল। দুর্গাদাস তাহাতে তাহার কোন্ গ্রামে বাস ইত্যাদি দুই একটি প্রশ্ন করিয়া উত্তর শ্রবণানন্তর বলিলেন, "আচ্ছা, অন্দরে স্ত্রীলোকদিগের নিকটে যাইয়া আশ্রয় লও।" গদাধর তাহাতে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল এবং রমণীগণকে পূর্ব্বের ন্যায় আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক নানাবিধ বাক্যালাপে পরিতুষ্টা করিল। তাহার স্বল্প বয়স দেখিয়া এবং মধুর বাক্যে প্রসন্না হইয়া দুর্গাদাসের অন্তঃপুরচারিণীরা তাহাকে থাকিতে দিলেন এবং তাহার বিশ্রামের স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়া জলযোগ করিবার জন্য মুড়ি মুড়কি প্রভৃতি প্রদান করিলেন। গদাধর তখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া উহা ভক্ষণ করিতে করিতে অন্দরের সকল ঘর ও প্রত্যেক রমণীকে তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে এবং তাঁহাদিগের পরস্পরের বাক্যালাপ শ্রবণ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের বাক্যালাপে মধ্যে মধ্যে যোগদান এবং প্রশ্নাদি করিতেও সে ভুলিল না। ঐরূপে প্রায় এক প্রহর রাত্রি অতীত হইল। এদিকে এত রাত্রি হইলেও সে গৃহে ফিরিল

দুর্গাদাস পাইনের অহঙ্কার চূর্ণ হওয়া।

না দেখিয়া চন্দ্রা দেবী রামেশ্বরকে তাহার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন এবং বণিকপল্লীতে সে প্রায় যাইয়া থাকে জানিয়া তাহাকে তথায় অন্বেষণ করিতে বলিয়া দিলেন। রামেশ্বর সেজন্য প্রথমে সীতানাথের বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানিলেন, বালক তথায় আসে নাই। অনন্তর দুর্গাদাসের ভবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর শুনিতে পাইয়া গদাধর অধিক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া দুর্গাদাসের অন্দর হইতে "দাদা, যাচ্চি গো" বলিয়া উত্তর দিয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। দুর্গাদাস তখন সকল কথা বুঝিলেন এবং বালক তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে প্রতারণা করিতে সক্ষম হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে অপ্রতিভ ও কিছু রুষ্ট হইলেও পরক্ষণেই তাহার দরিদ্রা তন্তু-বায়রমণীর বেশ ও চালচলনের অনুকরণ কতদূর স্বাভাবিক হইয়াছে ভাবিয়া হাসিতে লাগিলেন। সীতানাথপ্রমুখ দুর্গাদাসের আত্মীয়েরা পরদিন ঐ কথা জানিতে পারিয়া গদাধরের নিকটে তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। এখন হইতে সীতানাথের ভবনে বালক উপস্থিত হইলে দুর্গাদাসের অন্তঃপুরচারিণীরাও তাহার নিকটে আসিতে লাগিলেন।

বণিকপল্লীর রমণীগণের গদাধরের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস।

সীতানাথের পরিবারবর্গ এবং বণিকপল্লীর অন্যান্য রমণীগণ ক্রমে গদাধরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বালক তাঁহাদিগের নিকটে কিছু দিন না আসিলেই তাঁহারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। সীতানাথের ভবনে পাঠ ও সঙ্গীতাদি করিবার কালে গদাধরের কখন কখন ভাবাবেশ

উপস্থিত হইত। তদ্দর্শনে রমণীগণের তাহার প্রতি ভক্তি বিশেষ প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি ঐরূপ ভাবসমাধিকালে তাঁহাদিগের অনেকে বালককে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণের জীবন্ত বিগ্রহজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন এবং অভিনয়কালে তাহার সহায়তা হইবে বলিয়া তাঁহারা একটি সুবর্ণনির্ম্মিত মুরলী ও স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রের অভিনয়-উপযোগী বিবিধ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

ধর্ম্মপ্রবণ পূতস্বভাব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি, এবং সপ্রেম সরল ও অমায়িক ব্যবহারে গদাধর পল্লীরমণীগণের উপরে এইকালে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার বিবরণ আমরা তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও মুখে সময়ে সময়ে শুনিবার অবসর লাভ করিয়াছিলাম। সন ১২৯৯ সালের বৈশাখের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রমুখ আমরা কয়েক জন কামারপুকুর দর্শনে গমন করিয়া সীতানাথ পাইনের কন্যা শ্রীমতী রুক্মিণীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স তখন আন্দাজ ষাট বৎসর হইয়াছিল। শ্রীযুত গদাধরের পূর্ব্বোক্ত প্রভাব সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার এখানে উল্লেখ করিলে পাঠকের ঐ বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। শ্রীমতী রুক্মিণী বলিয়াছিলেন—

গদাধরের সম্বন্ধে শ্রীমতী রুক্মিণীর কথা।

"আমাদের বাড়ী এখান হইতে একটু উত্তরে—ঐ দেখা যাইতেছে। আজ কাল আমাদের বাড়ীর ভগ্নাবস্থা, পরিবারবর্গ একরূপ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আমার বয়স যখন সতর, আঠার বৎসর ছিল, তখন বাড়ীটি দেখিলে লক্ষ্মীমন্তের বাড়ী বলিয়া বোধ হইত। আমার পিতার নাম ৺সীতানাথ পাইন। খুড়তুতো জাঠ্তুতো

সকলকে ধরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ, আমরা সতর, আঠারটি ভগ্নী ছিলাম এবং বয়সে পরস্পরে দুই পাঁচ বৎসরের ছোট-বড় হইলেও ঐকালে সকলেই যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলাম। গদাধর বাল্যকাল হইতে আমাদিগের সহিত একত্রে খেলা-ধূলা করিতেন। সেজন্য আমাদিগের সহিত তাঁহার খুব ভাব ছিল। আমরা যৌবনে পদার্পণ করিলেও তিনি আমাদের বাড়ীতে যাইতেন এবং ঐরূপে তিনি বড় হইবার পরেও আমাদিগের বাড়ীর অন্দরে যাতায়াত করিতেন। বাবা তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন—আপনার ইষ্টের মত দেখিতেন ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। পাড়ায় কেহ কেহ তাঁহাকে বলিত, 'তোমার বাড়ীতে অতগুলি যুবতী কন্যা রহিয়াছে, গদাধরও এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে এখনও অত বাড়ীর ভিতরে যাইতে দাও কেন?' বাবা তাহাতে বলিতেন, 'তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমি গদাধরকে খুব চিনি।' তাহারা সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে পারিত না। গদাধর বাড়ীর অন্দরে আসিয়া আমাদিগকে কত পুরাণকথা বলিতেন, কত রঙ্গ-পরিহাস করিতেন। আমরা প্রায় প্রতিদিন ঐ সকল শুনিতে শুনিতে আনন্দে গৃহকর্ম্মসকল করিতাম। তিনি যখন আমাদিগের নিকটে থাকিতেন তখন কত আনন্দে যে সময় কাটিয়া যাইত তাহা এক মুখে আর কি বলিব। যেদিন তিনি না আসিতেন সেদিন তাঁহার অসুখ হইয়াছে ভাবিয়া আমাদিগের মন ছট্ ফট্ করিত। সেদিন যতক্ষণ না আমাদিগের কেহ জল আনিবার বা অন্য কোন কর্ম্মের দোহাই দিয়া বামুন মার (চন্দ্রা দেবীর) সহিত দেখা করিয়া তাঁহার সংবাদ লইয়া আসিত ততক্ষণ আমাদিগের কাহারও প্রাণে শান্তি থাকিত না। তাঁহার প্রত্যেক কথাটি আমাদের অমৃতের ন্যায় বোধ হইত। সে জন্য

তিনি যেদিন আমাদিগের বাড়ীতে না আসিতেন, সেদিন তাঁহার কথা লইয়াই আমরা দিন কাটাইতাম।”

পল্লীর পুরুষসকলের গদাধরের প্রতি অনুরক্তি।

কেবলমাত্র রমণীগণের সহিত ঐরূপে মিলিত হইয়াই গদাধর ক্ষান্ত ছিল না। কিন্তু তাহার সর্ব্বতোমুখী উদ্ভাবনী শক্তি এবং সকলের সহিত প্রেমপূর্ণ আচরণ তাহাকে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই সহিত মিলিত করিয়াছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গ্রামের বৃদ্ধ ও যুবকবৃন্দ যে সকল স্থলে মিলিত হইয়া ভাগবতাদি পুরাণপাঠ বা সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনাদিতে আনন্দ উপভোগ করিতেন তাহার সকল স্থলেই তাহার যাতায়াত ছিল। বালক ঐ সকল স্থলের যেখানে যেদিন উপস্থিত থাকিত সেখানে সেদিন আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইত। কারণ, তাহার ন্যায় পাঠ ও ধর্ম্মতত্ত্বসকলের ভক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা আর কেহই করিতে সক্ষম ছিল না। সঙ্কীর্ত্তনকালে তাহার ন্যায় ভাবোন্মত্ততা, তাহার ন্যায় নূতন নূতন ভাবপূর্ণ আখর দিবার শক্তি এবং তাহার ন্যায় মধুর কণ্ঠ ও রমণীয় নৃত্য আর কাহারও ছিল না। আবার, রঙ্গপরিহাস স্থলে তাহার ন্যায় সঙ্ দিতে, তাহার ন্যায় নরনারীর সকল প্রকার আচরণ অনুকরণ করিতে এবং তাহার ন্যায় নূতন নূতন গল্প ও গান যথাস্থলে অপূর্ব্বভাবে লাগাইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে অন্য কেহ সমর্থ হইত না। সুতরাং যুবক ও বৃদ্ধেরা সকলেই তাহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। বালকও সেজন্য কোন দিন এক স্থলে, কোন দিন অন্য স্থলে তাঁহাদিগের সহিত সমভাবে মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধিত করিত।

আবার এই বয়সেই বালক পরিণতবয়স্কের ন্যায় বুদ্ধি ধারণ করায় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ সাংসারিক সমস্যা-সকলের সমাধানের জন্য তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ঐরূপে তাহার পূতস্বভাবে আকৃষ্ট হইয়া এবং ভগবৎ-নাম ও কীর্ত্তনে তাহার ভাবসমাধি হইতে দেখিয়া, তাহার পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন।* কেবল ভণ্ড ও ধূর্ত্তেরা তাহাকে দেখিতে পারিত না। কারণ গদাধরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাহাদিগের উপরের মোহনীয় আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদিগের গোপনীয় উদ্দেশ্যসকল ধরিয়া ফেলিত এবং সত্যনিষ্ঠ স্পষ্টবাদী বালক অনেক সময়ে উহা সকলের নিকটে কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে অপদস্থ করিত। শুদ্ধ তাহাই নহে, রঙ্গপ্রিয় গদাধর অনেক সময়ে অপরের নিকটে তাহাদিগের কপটাচরণের অনুকরণ করিয়াও বেড়াইত। উহার জন্য মনে মনে কুপিত হইলেও সকলের প্রিয়, নির্ভীক বালকের তাহারা কিছুই করিতে পারিত না। সেজন্য অনেক সময়ে শরণাগত হইয়া তাহাদিগকে গদাধরের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইত। কারণ, শরণাগতের উপর বালকের অশেষ করুণা সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, গদাধর এখনও প্রতিদিন কোন না কোন সময়ে পাঠশালায় উপস্থিত হইত এবং বয়স্যদিগের প্রতি প্রেমই তাহার ঐরূপ করিবার কারণ ছিল। বাস্তবিক চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিবার পর হইতে বালকের ভক্তি

---

* শুনা যায় শ্রীনিবাস শাঁখারি প্রমুখ কয়েক জন যুবক শ্রীযুত গদাধরকে এখন হইতে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করিত।

ও ভাবুকতা এত অধিক প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাঠশালার অর্থকরী শিক্ষা তাহার পক্ষে এককালে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহার নিকটে উপলব্ধি হইতেছিল। সে যেন এখন হইতেই অনুভব করিতেছিল, তাহার জীবন অন্য কার্য্যের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে এবং ধর্ম্মসাক্ষাৎকার করিতে তাহাকে তাহার সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। ঐ বিষয়ের অস্পষ্ট ছায়া তাহার মনে অনেক সময়ে উদিত হইত, কিন্তু উহা এখনও পূর্ণাবয়ব না হওয়ায় সে উহাকে সকল সময়ে ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু নিজ জীবন ভবিষ্যতে কি ভাবে পরিচালিত করিবে একথা তাহার মনে যখনই উদিত হইত তাহার বিচারশীল বুদ্ধি তাহাকে তখনই ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাহার কল্পনাপটে গৈরিক বসন, পবিত্র অগ্নি, ভিক্ষালব্ধ ভোজন এবং নিঃসঙ্গ বিচরণের ছবি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিত। তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় কিন্তু তাহাকে পরক্ষণেই মাতা ও ভ্রাতাদিগের সাংসারিক অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া তাহাকে ঐ পথে গমনের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে এবং নিজ পিতার ন্যায় নির্ভরশীল হইয়া সংসারে থাকিয়া তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে উত্তেজিত করিত। ঐরূপে বুদ্ধি ও হৃদয় তাহাকে ভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করায় সে 'যাহা করেন ৺রঘুবীর' ভাবিয়া ঈশ্বরের আদেশলাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। কারণ বালকের প্রেমপূর্ণ হৃদয় একান্ত আপনার বলিয়া তাঁহাকেই ইতিপূর্ব্বে অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং যথাকালে তিনিই ঐ প্রশ্ন সমাধান করিয়া দিবেন ভাবিয়া সে এখন অনেক সময়ে আপনাকে শান্ত করিত। ঐরূপে বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বস্থলে তাহার বিশুদ্ধ হৃদয়ই

গদাধরের অর্থকরী বিদ্যার্জ্জনে উদাসীনতার কারণ।

পরিশেষে জয়লাভ করিত এবং উহার প্রেরণাতেই সে এখন সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছিল।

অসাধারণ সহানুভূতিসম্পন্ন গদাধরের বিশুদ্ধ হৃদয় তাহাকে এখন হইতে অন্য এক বিষয়ও সময়ে সময়ে উপলব্ধি করাইতেছিল। পুরাণপাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি সহায়ে উহা তাহাকে গ্রামের নরনারীসকলের সহিত ইতিপূর্ব্বে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে এত আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখাইয়াছিল যে, তাহাদিগের জীবনের সুখদুঃখাদি সে এখন হইতে সর্ব্বতোভাবে আপনার বলিয়া অনুভব করিতেছিল। সুতরাং তাহার বিচারশীল বুদ্ধি তাহাকে এইকালে যখনই সংসার পরিত্যাগে ইঙ্গিত করিত তাহার হৃদয় তাহাকে তখনই ঐ সকল নরনারীর সরল প্রেমপূর্ণ আচরণের এবং তাহার প্রতি অসীম বিশ্বাসের কথা স্মরণ করাইয়া তাহাকে এমন ভাবে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে বলিত যদ্দর্শনে তাহারা সকলে নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করিবার উচ্চাদর্শ লাভে কৃতার্থ হইতে পারে এবং তাহার সহিত তাহাদিগের বর্ত্তমান সম্বন্ধ যাহাতে সুগভীর পারমার্থিক সম্বন্ধে পরিণত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত অবিনশ্বর হইতে পারে। বালকের স্বার্থগন্ধশূন্য হৃদয় তাহাকে ঐ বিষয়ের স্পষ্ট আভাষ প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে ঐ জন্য বলিতেছিল, 'আপনার জন্য সংসার ত্যাগ করা—সে ত স্বার্থপরতা ; যাহাতে ইহারা সকলে উপকৃত হয় এমন কিছু কর।'

গদাধরের হৃদয়ের প্রেরণা।

পাঠশালায়, এবং পরে, টোলে বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে কিন্তু গদাধরের হৃদয় ও বুদ্ধি এখন মুক্তকণ্ঠে এক কথাই বলিতেছিল, কিন্তু সহসা পাঠশালা পরিত্যাগ করিলে বয়স্যগণ তাহার

সঙ্গলাভে অনেকাংশে বঞ্চিত হইবে বলিয়াই সে ঐ কার্য্য এখনও করিতে পারিতেছিল না। কারণ, গয়াবিষ্ণুপ্রমুখ বালকের সমবয়স্ক সকলে তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, এবং তাহার অসাধারণ বুদ্ধি ও অসীম সাহস তাহাকে এখানেও দলপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই সময়ের একটি ঘটনায় বালক অর্থকরী বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করিবার সুযোগলাভ করিয়াছিল। গদাধরের অভিনয় করিবার শক্তি দেখিয়া তাহার কয়েক জন বয়স্য এখন একটি যাত্রার দল খুলিবার প্রস্তাব একদিন উত্থাপন করিল এবং তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে শিক্ষাদানের ভার গদাধরকে লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। গদাধরও ঐ বিষয়ে সম্মত হইল। কিন্তু অভিভাবকগণ জানিতে পারিলে ঐ বিষয়ে বাধা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া কোন্ স্থানে তাহারা ঐ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবে তদ্বিষয়ে বালকগণ চিন্তিত হইয়া পড়িল। গদাধরের উদ্ভাবনী শক্তি তখন তাহাদিগকে মাণিকরাজার আম্রকানন দেখাইয়া দিল, এবং স্থির হইল পাঠশালা হইতে পলায়ন করিয়া তাহারা প্রতিদিন সকলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হইবে।

গদাধরের পাঠশালা পরিত্যাগ ও বয়স্যদিগের সহিত অভিনয়।

সঙ্কল্প শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইল এবং গদাধরের শিক্ষায় বালকগণ স্বল্প সময়ের ভিতরেই আপন আপন ভূমিকা ও গান সকল কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যাত্রাভিনয়ে আম্রকানন মুখরিত করিয়া তুলিল। অবশ্য, ঐ সকল যাত্রাভিনয়ের সকল অঙ্গই গদাধরকে নিজ উদ্ভাবনী শক্তিবলে সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইত এবং উহাদিগের প্রধান চরিত্রের ভূমিকাসকল তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইত। যাহাই

কামার পুকুরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মানিক রাজার প্রতিষ্ঠিত আম্রকানন।

হউক, যাত্রার দল একপ্রকার মন্দ গঠিত হইল না দেখিয়া বালকেরা পরম আনন্দলাভ করিয়াছিল এবং শুনা যায়, আম্রকাননে অভিনয়কালেও গদাধরের সময়ে সময়ে ভাবসমাধি উপস্থিত হইয়াছিল।

সঙ্কীর্ত্তন ও যাত্রাভিনয়ে গদাধরের অনেক কাল অতিবাহিত হওয়ায় তাহার চিত্রবিদ্যা এখন আর অধিক অগ্রসর হইতে পায় নাই। তবে শুনা যায়, গৌরহাটি গ্রামে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলাকে বালক এই সময়ে একদিন দেখিতে গিয়াছিল এবং বাটীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইয়াছিল তাহার ভগিনী প্রসন্নমুখে তাহার স্বামীর সেবা করিতেছে। উহা দেখিয়া সে অল্প দিন পরে তাহার ভগিনী ও তৎস্বামীর ঐ ভাবের একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, পরিবারস্থ সকলে উহাতে চিত্রগত প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের সহিত শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলার ও তৎস্বামীর নিকটসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

গদাধরের চিত্রবিদ্যা ও মূর্ত্তিগঠনে উন্নতি।

দেবদেবীর মূর্ত্তিসকল সংগঠনে কিন্তু গদাধর বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, তাহার ধর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতি তাহাকে ঐ সকল মূর্ত্তি গঠনপূর্ব্বক বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে যথাবিধি পূজা করিতে অনেক সময়ে প্রযুক্ত করিত।

সে যাহা হউক, পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া গদাধর নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকলে নিযুক্ত থাকিয়া এবং চন্দ্রা দেবীকে গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিয়া কাল কাটাইতে লাগিল। মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ও তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাকে অনেক সময় নিযুক্ত রাখিত। কারণ, চন্দ্রা দেবীকে গৃহকর্ম্মের অবসর দিবার জন্য ঐ শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করা এবং নানা

ভাবে খেলা দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখা এখন তাহার নিত্য-কর্ম্মসকলের অন্যতম হইয়া উঠিয়াছিল। ঐরূপে তিন বৎসরের অধিক কাল অতীত হইয়া গদাধর ক্রমে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। ঐ তিন বৎসরের পরিশ্রমে শ্রীযুত রামকুমারের কলিকাতার চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহারও উপার্জ্জনের পূর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইয়াছিল।

কলিকাতায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিলেও শ্রীযুত রামকুমার বৎসরান্তে একবার কয়েক পক্ষের জন্য কামারপুকুরে আগমনপূর্ব্বক জননী ও ভ্রাতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধান করিতেন।

গদাধরের সম্বন্ধে রামকুমারের চিন্তা ও তাহাকে কলিকাতায় আনয়ন।

গদাধরের বিদ্যার্জ্জনে উদাসীনতা ঐ অবসরে লক্ষ্য করিয়া তিনি এখন চিন্তিত হইয়াছিলেন। সে যেভাবে বর্ত্তমানে কাল কাটাইয়া থাকে তিনি তদ্বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান লইলেন এবং মাতা ও মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে কলিকাতায় নিজ সমীপে রাখাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া নিরূপণ করিলেন। ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত টোলের গৃহ-কর্ম্মও অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল; সেজন্য ঐ সকল বিষয়ে সাহায্য করিতে একজন লোকের অভাবও তিনি ঐ সময়ে বোধ করিতেছিলেন। অতএব স্থির হইল যে, গদাধর কলি-কাতায় আসিয়া তাঁহাকে ঐ সকল বিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য দান করিবে এবং অন্যান্য ছাত্রগণের ন্যায় তাঁহারই নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিবে। গদাধরের নিকটে ঐ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে পিতৃতুল্য অগ্রজকে সাহায্য করিতে হইবে জানিতে পারিয়া সে কলিকাতা গমনে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না। অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীযুত রামকুমার ও গদাধর

৺ রঘুবীরকে প্রণামপূর্ব্বক চন্দ্রা দেবীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। কামারপুকুরের আনন্দের হাট কিছু কালের জন্য ভাঙ্গিয়া যাইল এবং শ্রীমতী চন্দ্রা ও গদাধরের প্রতি অনুরক্ত নরনারীসকলে তাহার মধুময় স্মৃতি ও ভাবী উন্নতির চিন্তা করিয়া কোনরূপে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কলিকাতায় আগমন করিবার পরে শ্রীযুত গদাধর যে সকল অলৌকিক চেষ্টা করিয়াছিলেন পাঠক সে সকল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গের 'সাধকভাব' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন পর্ব্ব
সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সাধকভাব

সূচীপত্র

বিষয়

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিষয় পৃঃ পৃঃ পৃঃ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

অবতরণিকা।

সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন।

আচার্য্যদিগের সাধক-ভাব লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় না।

জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, লোকগুরু বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য ভিন্ন অবতার-পুরুষসকলের জীবনে সাধকভাবের কার্য্যকলাপ বিস্তৃত লিপিবদ্ধ নাই। যে উদ্দাম অনুরাগ ও উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহারা জীবনে সত্যলাভে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে আশা, নিরাশা, ভয়, বিস্ময়, আনন্দ, ব্যাকুলতার তরঙ্গে পড়িয়া তাঁহারা কখনও উল্লসিত এবং কখনও মুহ্যমান হইয়াছিলেন অথচ নিজ গন্তব্যলক্ষ্যে নিয়ত দৃষ্টি স্থির রাখিতে বিস্মৃত হন নাই, তদ্বিষয়ের বিশদ আলোচনা তাঁহাদিগের জীবনেতিহাসে পাওয়া যায় না। অথবা, জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহাদিগের বাল্যাদি কালের শিক্ষা, উদ্যম ও কার্য্যকলাপের একটা স্বাভাবিক পূর্ব্বাপর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে—

বৃন্দাবনের গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাপক দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইলেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। ঈশার মহদুদার জীবনে ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বের কথা দুটা, একটা মাত্রই জানিতে পারা যায়। আচার্য্য শঙ্করের দিগ্বিজয়কাহিনীমাত্রই সবিস্তার লিপিবদ্ধ। এইরূপ, অন্যত্র সর্ব্বত্র।

তাঁহারা কোনও কালে অসম্পূর্ণ ছিলেন এ কথা ভক্ত মানব ভাবিতে চাহে না।

ঐরূপ হইবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ভক্তদিগের ভক্তির আতিশয্যেই বোধ হয় ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। নরের অসম্পূর্ণতা দেবচরিত্রে আরোপ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াই তাঁহারা বোধ হয় ঐ সকল কথা লোক-নয়নের অন্তরালে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন। অথবা হইতে পারে—মহাপুরুষ-চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ মহান্ ভাবসকল সাধারণের সম্মুখে উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া তাহাদিগের যতটা কল্যাণ সাধিত করিবে, ঐ সকল ভাবে উপনীত হইতে তাঁহারা যে অলৌকিক উদ্যম করিয়াছেন, তাহা ততটা করিবে না ভাবিয়া উহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তাঁহারা অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন।

ভক্ত আপনার ঠাকুরকে সর্ব্বদা পূর্ণ দেখিতে চাহেন। নরশরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাতে যে নরসুলভ দুর্ব্বলতা, দৃষ্টি ও শক্তিহীনতা কোনকালে কিছুমাত্র বর্ত্তমান ছিল তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। বালগোপালের মুখগহ্বরে তাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত দেখিতে সর্ব্বদা প্রয়াসী হন এবং বালকের অসম্বদ্ধ চেষ্টাদির ভিতরে পরিণতবয়স্কের বুদ্ধি ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাইবার কেবলমাত্র প্রত্যাশা রাখেন না, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং বিশ্বজনীন উদারতা ও প্রেমের সম্পূর্ণ প্রতি-

কৃতি দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠেন। অতএব, নিজ ঐশ্বরিকস্বরূপে সর্ব্বসাধারণকে ধরা না দিবার জন্যই অবতার-পুরুষেরা সাধনভজনাদি মানসিক চেষ্টা এবং আহার, নিদ্রা, ক্লান্তি, ব্যাধি এবং দেহত্যাগ প্রভৃতি শারীরিক অবস্থানিচয়ের মিথ্যা ভাণ করিয়া থাকেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিচিত্র নহে। আমাদের কালেই আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কত বিশিষ্ট ভক্ত ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি সম্বন্ধে ঐরূপে মিথ্যা ভাণ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন।

ঐরূপ ভাবিলে ভক্তের ভক্তির হানি হয়, এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে।

নিজ দুর্ব্বলতার জন্যই ভক্ত ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে তাঁহার ভক্তির হানি হয় বলিয়াই, বোধ হয় তিনি নরসুলভ চেষ্টা ও উদ্দেশ্যাদি অবতারপুরুষে আরোপ করিতে চাহেন না। অতএব, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তবে এ কথা ঠিক যে, ভক্তির অপরিণত অবস্থাতেই ভক্তে ঐরূপ দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তির প্রথমাবস্থাতেই ভক্ত ভগবানকে ঐশ্বর্য্যবিরহিত করিয়া চিন্তা করিতে পারেন না। ভক্তি পরিপক্ক হইলে, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ কালে গভীর ভাব ধারণ করিলে, ঐরূপ ঐশ্বর্য্য-চিন্তা ভক্তিপথের অন্তরায় বলিয়া বোধ হইতে থাকে, এবং ভক্ত তখন উহা যত্নে দূরে পরিহার করেন। সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র ঐ কথা বারম্বার বলিয়াছেন। দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণমাতা যশোদা গোপালের দিব্য বিভূতিনিচয়ের নিত্য পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে নিজ বালকবোধেই লালন তাড়নাদি করিতে-ছেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে জগৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াও তাঁহাতে কান্তভাব ভিন্ন অন্যভাবের আরোপ করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

ঠাকুরের উপদেশ—ঐশ্বর্য্য উপলব্ধিতে 'তুমি, আমি' ভাবে ভালবাসা থাকে না; কাহারও ভাব নষ্ট করিবে না।

ভগবানের শক্তিবিশেষের সাক্ষাৎ পরিচায়ক কোনরূপ দর্শনাদি লাভের জন্য আগ্রহাতিশয় জানাইলে, ঠাকুর সেজন্য তাঁহার ভক্তদিগকে অনেক সময় বলিতেন—"ওগো ঐরূপ দর্শন করতে চাওয়াটা ভাল নয়; ঐশ্বর্য্য দেখলে ভয় আস্‌বে; খাওয়ান, পরান, ভালবাসায় (ঈশ্বরের সহিত) "তুমি আমি" ভাব, এটা আর থাক্‌বে না।" কত সময়েই না আমরা তখন ক্ষুণ্ণমনে ভাবিয়াছি, ঠাকুর কৃপা করিয়া ঐরূপ দর্শনাদিলাভ করাইয়া দিবেন না বলিয়াই আমাদিগকে ঐরূপ বলিয়া ক্ষান্ত করাইতেছেন! সাহসে নির্ভর করিয়া কোনও ভক্ত যদি সে সময় প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বলিত—"আপনার কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, কৃপা করিয়া আমাকে ঐরূপ দর্শনাদি করাইয়া দিন"—ঠাকুর তাহাতে মধুর নম্রভাবে বলিতেন—"আমি কি কিছু করিয়া দিতে পারি রে—মার যা ইচ্ছা তাই হয়।" ঐরূপ বলিলেও যদি সে ক্ষান্ত না হইয়া বলিত, "আপনার ইচ্ছা হইলেই মার ইচ্ছা হইবে"—ঠাকুর তাহাতে অনেক সময় তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেন, "আমিত মনে করি রে, তোদের সকলের সব রকম অবস্থা, সব রকম দর্শন হোক্, কিন্তু তা হয় কৈ?" ঐরূপ বলিলেও ভক্ত যদি ক্ষান্ত না হইয়া বিশ্বাসের জেদ্ চালাইতে থাকিত তাহা হইলে ঠাকুর তাহাকে আর কিছু না বলিয়া স্নেহপূর্ণ দর্শন ও মৃদুমন্দ হাস্যের দ্বারা তাহার প্রতি নিজ ভালবাসার পরিচয় মাত্র দিয়া নীরব থাকিতেন; অথবা বলিতেন "কি বল্‌ব বাবু, মার যা ইচ্ছা তাই হোক।" ঐরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পড়িয়াও কিন্তু ঠাকুর তাহার ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া তাহার ভাব নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন না। ঠাকুরের ঐরূপ

ব্যবহার আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি—"কারও ভাব নষ্ট কর্‌তে নেই রে, কারও ভাব নষ্ট কর্‌তে নেই।"

ভাব নষ্ট করা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত কাশীপুরের বাগানে শিবরাত্রির কথা।

প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও কথাটী যখন পাড়া গিয়াছে তখন একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দেওয়া ভাল। ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে অপরের শরীরমনে ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করিবার ক্ষমতা আধ্যাত্মিক জীবনে অতি অল্প সাধকের ভাগ্যে লাভ হইয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ কালে ঐ ক্ষমতায় ভূষিত হইয়া প্রভূত লোক-কল্যাণ সাধন করিবেন, ঠাকুর একথা আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত উত্তমাধিকারী সংসারে বিরল। প্রথম হইতে ঠাকুর ঐকথা সম্যক্ বুঝিয়া বেদান্তোক্ত অদ্বৈতজ্ঞানের উপদেশ করিয়া তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন একভাবে গঠিত করিতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীতে দ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপসনায় অভ্যস্ত স্বামিজীর নিকট বেদান্তের সোঽহং ভাবের উপাসনাটা তখন পাপ বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঠাকুর তাঁহাকে তদনুশীলন করাইতে নানাভাবে চেষ্টা করিতেন। স্বামিজী বলিতেন, "দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইবামাত্র ঠাকুর অপর সকলকে যাহা পড়িতে নিষেধ করিতেন, সেই সকল পুস্তক আমায় পড়িতে দিতেন। অন্যান্য পুস্তকের সহিত তাঁহার ঘরে একখানি 'অষ্টাবক্র-সংহিতা' ছিল। কেহ সেখানি বাহির করিয়া পড়িতেছে দেখিতে পাইলে ঠাকুর তাহাকে ঐ পুস্তক পড়িতে নিষেধ করিয়া 'মুক্তি ও তাহার সাধন,' 'ভগবদ্গীতা', বা কোন পুরাণ গ্রন্থ পড়িবার জন্য দেখাইয়া দিতেন। আমি কিন্তু তাঁহার

নিকট যাইলেই ঐ অষ্টাবক্র-সংহিতাখানি বাহির করিয়া পড়িতে বলিতেন! অথবা অদ্বৈতভাবপূর্ণ আধ্যাত্মিক-রামায়ণের কোন অংশ পাঠ করিতে বলিতেন। যদি বলিতাম—কখনও কখনও স্পষ্ট বলিয়াছি—"ও বই পড়ে কি হবে? 'আমি ভগবান্', একথা মনে করাও পাপ। ঐ পাপ কথা এই পুস্তকে লেখা আছে। ও বই পুড়িয়ে ফেলা উচিত।" ঠাকুর তাহাতে হাসিতে হাসিতে বলিতেন—'আমি কি তোকে পড়তে বল্‌ছি? একটু পড়ে আমাকে শুনাতে বল্‌ছি। খানিক পড়ে আমাকে শুনা না। তাতে ত আর তোকে মনে করতে হবে না, তুই ভগবান্। কাজেই অনুরোধে পড়িয়া অল্পবিস্তর পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে হইত।

আবার, স্বামিজীকে ঐভাবে গঠিত করিতে থাকিলেও ঠাকুর, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ তাঁহার অন্যান্য বালকদিগের মধ্যে কাহাকেও সাকারোপাসনা, কাহাকেও নিরাকার সগুণ ঈশ্বরোপাসনা, কাহাকেও শুদ্ধভক্তির ভিতর দিয়া, আবার কাহাকেও বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া, অন্য নানাভাবে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর করাইয়া দিতেছিলেন; এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ বালক ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট একত্র শয়ন উপবেশন, আহার বিহার ও ধর্ম্মচর্চ্চা প্রভৃতি করিলেও ঠাকুর অধিকারিভেদে তাহাদিগকে নানাভাবে গঠিত করিতেছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর গলরোগে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অদম্য উৎসাহে সকল ভক্তদিগের ধর্ম্মজীবন গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের। আবার, স্বামিজীকে সাধনমার্গের উপদেশ দিয়া এবং তদনুযায়ী

অনুষ্ঠানে সহায়তা মাত্র করিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত ছিলেন না। নিত্য সন্ধ্যার পর অপর সকলকে সরাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া একাদিক্রমে দুই তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত অপর বালক ভক্তদিগকে সংসারে পুনরায় ফিরিতে না দিয়া কি ভাবে পরিচালিত ও একত্র রাখিতে হইবে তদ্বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন। ভক্তদিগের প্রায় সকলেই ঠাকুরের কথা ও ব্যবহারে ভাবিতেছিলেন ঠাকুর নিজ সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই গলরোগরূপ একটা মিথ্যা ভাণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন—ঐ কার্য্য সুসিদ্ধ হইলেই আবার পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইবেন। কেবল স্বামী বিবেকানন্দ দিন দিন প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলেন ঠাকুর যেন ভক্তদিগের নিকট হইতে বহুকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিবার মত সকল আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিতেছেন। তিনিও ঐ কথা সকল সময়ে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

সাধনবলে স্বামিজীর ভিতর তখন স্পর্শসহায়ে অপরে ধর্ম্ম-শক্তি-সংক্রমণ করিবার ক্ষমতার ঈষৎ উন্মেষ হইয়াছে। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজের ভিতর ঐরূপ শক্তির উদয় স্পষ্ট অনুভব করিলেও কাহাকেও ঐভাবে স্পর্শ করিয়া ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য এপর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করেন নাই। কিন্তু নানাভাবে প্রমাণ পাইয়া বেদান্তের অদ্বৈতমতে বিশ্বাসী হইয়া, তিনি তর্কযুক্তিসহায়ে ঐ মত বালক ও গৃহস্থ ভক্তদিগের ভিতর প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তুমুল আন্দোলনে ঐ বিষয় লইয়া ভক্তদিগের ভিতর কখন কখন বিষম গণ্ডগোল চলিতেছিল। কারণ স্বামিজীর স্বভাবই ছিল, যখনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তখনি তাহা হাঁকিয়া ডাকিয়া সকলকে বলিতেন এবং তর্কযুক্তিসহায়ে

জোর করিয়া উহা অপরকে গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিতেন। ব্যবহারিক জগতে সত্য যে, অবস্থা ও অধিকারিভেদে নানা আকার ধারণ করে বালক স্বামিজী তাহা তখনও বুঝিতে পারেন নাই।

আজ ফাল্গুনী শিবরাত্রি। বালক-ভক্তদিগের মধ্যে তিন চারিজন স্বামিজীর সহিত স্বেচ্ছায় ব্রতোপবাস করিয়াছে। পূজা ও জাগরণে রাত্রি কাটাইবার তাহাদের অভিলাষ। গোলমালে ঠাকুরের পাছে আরামের ব্যাঘাত হয় এজন্য বসতবাটী হইতে কিঞ্চিদ্দূরে পূর্ব্বে অবস্থিত, রন্ধনশালারূপে নির্ম্মিত একটী গৃহে পূজার আয়োজন হইয়াছে। সন্ধ্যার পরে বেশ এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং নবীন মেঘে সময়ে সময়ে মহাদেবের জটাপটলের ন্যায় বিদ্যুৎপুঞ্জের আবির্ভাব দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইয়াছে।

দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা জপ ও ধ্যান সাঙ্গ করিয়া স্বামিজী পূজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার নিমিত্ত তামাকু সাজিতে বাহিরে গমন করিল এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটীর দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্বামিজীর ভিতর সহসা পূর্ব্বোক্ত দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা অদ্য কার্য্যে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সম্মুখোপবিষ্ট স্বামী অ*—কে বলিলেন—'আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাক্‌ত।' ইতিমধ্যে তামাকু লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বালক দেখিল স্বামিজী স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এবং অ— চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

* অভেদানন্দ।

নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ও তাহার ঐ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। দুই এক মিনিটকাল ঐভাবে অতিবাহিত হইবার পর স্বামিজী চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন—'বস্, হয়েছে। কিরূপ অনুভব করলি ?'

অ। ব্যাটারি (Electric Battery) ধর্‌লে যেমন কি একটা ভিতরে আস্‌ছে জান্‌তে পারা যায় ও হাত কাঁপে ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ অনুভব হতে লাগল। অপর ব্যক্তি অ—কে জিজ্ঞাসা করিল "স্বামিজীকে স্পর্শ ক'রে তোমার হাত আপনা আপনি ঐরূপ কাঁপ্‌ছিল ?"

অ। "হাঁ, স্থির করে রাখতে চেষ্টা করেও রাখতে পার্‌ছিলুম না !"

ঐ সম্বন্ধে অন্য কোন কথাবার্ত্তা তখন আর হইল না। স্বামিজী তামাকু খাইলেন। পরে সকলে দুই প্রহরের পূজা ও ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। অ— ঐকালে গভীর ধ্যানস্থ হইল। ঐরূপ গভীরভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাহাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। তাহার সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য বহির্জ্জগতের সংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল। উপস্থিত সকলের মনে হইল স্বামিজীকে ইতিপূর্ব্বে স্পর্শ করার ফলেই তাহার এখন ঐরূপ গভীর ধ্যান উপস্থিত হইয়াছে। স্বামিজীও তাহার ঐরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জনৈক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিয়া উহা দেখাইলেন।

রাত্রি চারিটায় চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইবার পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামিজীকে বলিলেন

—ঠাকুর ডাকিতেছেন। শুনিয়াই স্বামিজী বসতবাটীর দ্বিতলগৃহে ঠাকুরের নিকট চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য রামকৃষ্ণানন্দও সঙ্গে যাইলেন।

স্বামিজীকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন—"কিরে? একটু জমতে না জমতেই খরচ? আগে নিজের ভিতরে ভাল ক'রে জমতে দে, তখন কোথায় কি ভাবে খরচ করতে হবে তা বুঝতে পারবি—মা-ই বুঝিয়ে দেবেন। ওর ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা কল্লি বল দেখি? ও এতদিন একভাব দিয়ে যাচ্ছিল সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল!—ছমাসের গর্ভ যেন পাত হল! যা হবার হয়েছে; এখন হ'তে হঠাৎ অমনটা আর করিস্ নি। যা হোক ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল।

স্বামিজী বলিতেন—"আমি ত একেবারে অবাক্। পূজার সময় নীচে আমরা যা যা করেছি ঠাকুর সমস্ত জান্তে পেরেছেন! কি করি—তাঁর ঐরূপ ভৎর্সনায় চুপ করে রইলুম্।"

ফলে দেখা গেল অ— যে ভাবসহায়ে পূর্ব্বে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতেছিল তাহার ত একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই, আবার অদ্বৈতভাব ঠিক্ ঠিক্ ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায় বেদান্তের দোহাই দিয়া নাস্তিকের মত অযোগ্য বিপরীত অনুষ্ঠান সকল সে কখনও কখনও করিয়া ফেলিতে লাগিল! ঠাকুর তাহাকে এখন হইতে অদ্বৈতভাবের উপদেশ করিতে ও সস্নেহে তাহার ঐরূপ কার্য্যকলাপের ভুল দেখাইয়া দিতে থাকিলেও অ-র ঐভাবপ্রণোদিত হইয়া জীবনের প্রত্যেক কার্য্যানুষ্ঠানে যথাযথ-ভাবে অগ্রসর হওয়া ঠাকুরের শরীর ত্যাগের বহুকাল পরে সাধিত হইয়াছিল।

সত্যলাভ অথবা জীবনে উহার পূর্ণাভিব্যক্তির জন্য অবতার-পুরুষকৃত চেষ্টা সকলকে মিথ্যা ভাণ বলিয়া যাঁহারা গ্রহণ করেন ঐ শ্রেণীর ভক্তদিগকে আমাদিগের বক্তব্য যে, ঠাকুরকে তাঁহাদিগের ন্যায় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আমরা কখনও শুনি নাই। বরং অনেক সময় তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—'নরলীলায় সমস্ত কার্য্যই সাধারণ নরের ন্যায় হয়; নরশরীর স্বীকার করিয়া ভগবানকে নরের ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগ করিতে এবং নরের ন্যায় উদ্যম, চেষ্টা ও তপস্যা দ্বারা সকল বিষয়ে পূর্ণত্ব লাভ করিতে হয়।' জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসও ঐ কথা বলে এবং যুক্তিসহায়ে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐরূপ না হইলে কৃপায় ঈশ্বরকৃত নরবপুধারণের কোন সার্থকতা থাকে না।

নরলীলায় সমস্ত কার্য্য সাধারণ নরের ন্যায় হয়।

ভক্তগণকে ঠাকুর যে সকল উপদেশ দিতেন তাহার ভিতর আমরা দুই ভাবের কথা দেখিতে পাই। তাঁহার কয়েকটী উক্তির উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। দেখা যায়, একদিকে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে বলিতেছেন, "(আমি) ভাত রেঁধেছি, তোরা বাড়া ভাতে বসে যা," "ছাঁচ তৈয়ারী হয়েছে তোরা সেই ছাঁচে নিজের নিজের মনকে ফ্যাল্ ও গ'ড়ে তোল্," "কিছুই যদি না পার্‌বি ত আমার উপর বকল্‌মা দে," ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে বলিতেছেন, "এক এক ক'রে সব বাসনা ত্যাগ কর্, তবে ত হবে," "ঝড়ের আগে এঁটো পাতার মত হয়ে থাক," "কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরকে ডাক," "আমি ষোল টাং (ভাগ) করেছি, তোরা এক টাং (ভাগ বা অংশ) কর," ইত্যাদি। আমাদের বোধ হয় ঠাকুরের ঐ দুই ভাবের কথার অর্থ অনেক সময় না বুঝিতে

দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে ঠাকুরের মত।

পারিয়াই আমরা দৈব ও পুরুষকার, নির্ভর ও সাধনের কোন্‌টা ধরিয়া জীবনে অগ্রসর হইব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন আমরা জনৈক বন্ধুর* সহিত মানবের স্বাধীনেচ্ছা কিছুমাত্র আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর উহার যথার্থ মীমাংসা পাইবার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। ঠাকুর বালকদিগের বিবাদ কিছুক্ষণ রহস্য করিয়া শুনিতে লাগিলেন, পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন—"স্বাধীন ইচ্ছা ফিচ্ছা কারও কিছু কি আছে রে? ঈশ্বরেচ্ছাতেই চিরকাল সব হচ্চে ও হবে। মানুষ ঐকথা শেষকালে বুঝ্‌তে পারে। তবে কি জানিস্ যেমন গরুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে খোঁটায় বেঁধে রেখেছে। গরুটা খোঁটার এক হাত দূরে দাঁড়াতে পারে, আবার দড়ি গাছটা যত লম্বা ততদূরে গিয়েও দাঁড়াতে পারে—মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাটাও ঐরূপ জান্‌বি। গরুটা এতটা দূরের ভিতর যেখানে ইচ্ছা বসুক, দাঁড়াক্ বা ঘুরে বেড়াক্ মনে করেই মানুষে তাকে বাঁধে। তেমনি ঈশ্বরও মানুষকে কতকটা শক্তি দিয়ে তার ভিতরে সে যেমন ইচ্ছা যতটা ইচ্ছা ব্যবহার করুক বলে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই মানুষ মনে কর্‌চে সে স্বাধীন। দড়িটা কিন্তু খোঁটায় বাঁধা আছে। তবে কি জানিস্ তাঁর কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা কল্লে তিনি নেড়ে বাঁধতে পারেন, দড়িগাছটা আরও লম্বা করে দিতে পারেন, চাই কি গলার বাঁধন একেবারে খুলেও দিতে পারেন।"

কথাগুলি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে মহাশয়,

---

* স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে ইঁহার শরীর ত্যাগ হয়।

সাধন ভজন করাতে ত মানুষের হাত নাই? সকলেই ত বলিতে পারে, "আমি যাহা কিছু করিতেছি সব তাঁহার ইচ্ছাতেই করিতেছি?"

ঠাকুর—মুখে শুধু বল্লে কি হবে রে? কাঁটা নেই খোঁচা নেই মুখে বল্লে কি হবে? কাঁটায় হাত পড়লেই কাঁটা ফুটে 'উঃ' করে উঠতে হবে। সাধন ভজন করাটা যদি মানুষের হাতে থাক্‌ত তবে ত সকলেই তা কর্‌তে পার্‌ত—তা পারে না কেন? তবে কি জানিস্, যতটা শক্তি তিনি তোকে দিয়েছেন ততটা ঠিক্ ঠিক্ ব্যবহার না কর্‌লে তিনি আর অধিক দেন্ না। ঐ জন্যই পুরুষকার বা উদ্যমের দরকার। দেখ্ না, সকলকেই কিছু না কিছু উদ্যম ক'রে তবে ঈশ্বরকৃপার অধিকারী হতে হয়। ঐরূপ কর্‌লে তাঁর কৃপায় দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মেই কেটে যায়। কিন্তু (তাঁর উপর নির্ভর করে) কিছু না কিছু উদ্যম কর্‌তেই হয়। ঐ বিষয়ে একটা গল্প শোন—

ঐ বিষয়ে শ্রীবিষ্ণু ও নারদ সংবাদ।

গোলোক-বিহারী বিষ্ণু একবার নারদকে কোন কারণে অভিশাপ দেন যে, তাকে নরক ভোগ কর্‌তে হবে। নারদ ভেবে আকুল। নানা রূপে স্তব স্তুতি করে তাঁকে প্রসন্ন করে বল্লে—আচ্ছা ঠাকুর নরক কোথায়, কিরূপ, কত রকমই বা আছে আমার জান্‌তে ইচ্ছা হচ্চে, কৃপা করে আমাকে বলুন। বিষ্ণু তখন ভুঁয়ে খড়ি দিয়ে স্বর্গ, নরক, পৃথিবী যেখানে যেরূপ আছে এঁকে দেখিয়ে বল্লেন—'এইখানে স্বর্গ, আর এইখানে নরক।' নারদ বল্লে—'বটে? তবে আমার এই নরক ভোগ হল'—বলেই ঐ আঁকা নরকের উপর গড়াগড়ি দিয়ে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম কল্লে। বিষ্ণু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, 'সেকি? তোমার নরক ভোগ হ'ল

কৈ?' নারদ বল্লে—'কেন ঠাকুর তোমারই সৃজন ত স্বর্গ নরক? তুমি এঁকে দেখিয়ে যখন বল্লে—'এই নরক'—তখন ঐ স্থানটা সত্য সত্যই নরক হ'ল, আর আমি তাতে গড়াগড়ি দেওয়াতে আমার নরক ভোগ হয়ে গেল।' নারদ কথাগুলি প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বল্লে কি না?—বিষ্ণুও তাই 'তথাস্তু' বল্লেন। নারদকে কিন্তু তাঁর উপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস ক'রে ঐ আঁকা নরকে গড়াগড়ি দিতে হ'ল, (ঐ উদ্যমটুকু করে) তবে তার ভোগ কাটল।" এইরূপে কৃপার রাজ্যেও যে উদ্যম ও পুরুষকারের স্থান আছে তাহা ঠাকুর ঐ গল্পটী সহায়ে কখনও, কখনও আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন।

মানবের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিয়া অবতার-পুরুষের মুক্তির পথ আবিষ্কার করা।

নরদেহ ধারণ করিয়া নরবৎ লীলায় অবতারপুরুষদিগকে আমাদিগের ন্যায় অনেকাংশে দৃষ্টিহীনতা, অল্পজ্ঞতা প্রভৃতি অনুভব করিতে হয়। আমাদিগেরই ন্যায় উদ্যম করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ সকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ আবিষ্কার করিতে হয়, এবং যতদিন না ঐ পথ আবিষ্কৃত হয় ততদিন তাঁহাদিগের অন্তরে নিজ দেবস্বরূপের আভাস কখনও কখনও অল্পক্ষণের জন্য উদিত হইলেও উহা আবার প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপে 'বহুজনহিতায়' মায়ার আবরণ স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে আমাদিগেরই ন্যায় আলোক-আঁধারের রাজ্যের ভিতর পথ হাঁতড়াইতে হয়। তবে, স্বার্থসুখচেষ্টার লেশমাত্র তাঁহাদের ভিতরে না থাকায় তাঁহারা জীবনপথে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক আলোক দেখিতে পান এবং অভ্যন্তরীণ সমগ্র শক্তিপুঞ্জ সহজেই একমুখী করিয়া অচিরেই জীবনসমস্যার সমাধানকরতঃ লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত হয়েন।

নরের অসম্পূর্ণতা যথাযথভাবে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া দেব-মানব ঠাকুরের মানবভাবের আলোচনায় আমাদিগের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, এবং ঐ জন্যই আমরা তাঁহার মানব ভাব সকল সর্ব্বদা পুরোবর্ত্তী রাখিয়া তাঁহার দেবভাবের আলোচনা করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। আমাদেরই মত একজন বলিয়া তাঁহাকে না ভাবিলে তাঁহার সাধন কালের অলৌকিক উদ্যম ও চেষ্টাদির কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মনে হইবে, যিনি নিত্য পূর্ণ তাঁহার আবার সত্যলাভের জন্য চেষ্টা কেন? মনে হইবে, তাঁহার জীবনপাতী চেষ্টাটা একটা 'লোক দেখানো' ব্যাপার মাত্র। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরলাভের জন্য উচ্চাদর্শসমূহ নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার উদ্যম, নিষ্ঠা ও ত্যাগ আমাদিগকে ঐরূপ করিতে উৎসাহিত না করিয়া হৃদয় বিষম উদাসীনতায় পূর্ণ করিবে এবং ইহজীবনে আমাদিগের আর জড়ত্বের অপনোদন হইবে না।

মানব বলিয়া না ভাবিলে অবতার-পুরুষের জীবন ও চেষ্টার অর্থ পাওয়া যায় না।

ঠাকুরের কৃপালাভের প্রত্যাশা হইলেও আমাদিগকে তাঁহাকে আমাদিগেরই ন্যায় মানবভাবসম্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, ঠাকুর আমাদিগের দুঃখে সমবেদনাভাগী হইয়াই ত আমাদিগের দুঃখমোচনে অগ্রসর হইবেন? অতএব যে দিক দিয়াই দেখ, তাঁহাকে মানবভাবাপন্ন বলিয়া চিন্তা করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই। বাস্তবিক, যতদিন না আমরা সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্গুণ দেব-স্বরূপে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব ততদিন পর্য্যন্ত জগৎকারণ ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরাবতারদিগকে মানবভাবাপন্ন

বদ্ধ মানব, মানবভাবে মাত্রই বুঝিতে পারে।

বলিয়াই আমাদিগকে ভাবিতে ও গ্রহণ করিতে হইবে। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"—কথাটী ঐরূপে বাস্তবিকই সত্য! তুমি যদি স্বয়ং সমাধিবলে নির্ব্বিকল্প ভূমিতে পৌঁছাইতে পারিয়া থাক, তবেই তুমি ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি ও ধারণা করিয়া তাঁহার যথার্থ পূজা করিতে পারিবে। আর, যদি তাহা না পারিয়া থাক, তবে তোমার পূজা উক্ত দেবভূমিতে উঠিবার ও যথার্থ পূজাধিকার পাইবার চেষ্টামাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে এবং জগৎ-কারণ ঈশ্বরকে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন মানব বলিয়াই তোমার ধারণা হইতে থাকিবে।

দেবত্বে আরূঢ় হইয়া ঐরূপে ঈশ্বরের দেবস্বরূপের যথার্থ পূজা করিতে সমর্থ ব্যক্তি বিরল। আমাদিগের মত দুর্ব্বল অধিকারী উহা হইতে এখনও বহুদূরে অবস্থিত। সেজন্য আমাদিগের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির প্রতি করুণাপরবশ হইয়া আমাদিগের হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিবার জন্যই ঈশ্বরের মানবভূমিতে অবতরণ—মানবীয় ভাব ও দেহ স্বীকার করিয়া দেব-মানব-রূপধারণ! পূর্ব্বপূর্ব্বযুগাবির্ভূত দেব-মানবদিগের সহিত তুলনায় ঠাকুরের সাধনকালের ইতিহাস আলোচনা করিবার আমাদের অনেক সুবিধা আছে। কারণ, ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার জীবনের ঐ কালের কথা সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে আলোচনা করায় সে সকলের জ্বলন্ত চিত্র আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আবার, আমরা তাঁহার নিকট যাইবার স্বল্পকাল পূর্ব্বেই তাঁহার সাধক-জীবনের বিচিত্রাভিনয় দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীর লোক সকলের চক্ষুসম্মুখে সংঘটিত হইয়াছিল। এবং ঐ সকল ব্যক্তিদিগের

ঐজন্য মানবের প্রতি করুণায় ঈশ্বরের মানব-দেহ ধারণ, সুতরাং মানব ভাবিয়া অবতার-পুরুষের জীবনালোচনাই কল্যাণকর।

অনেকে তখনও ঐ স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রমুখাৎ ঐ বিষয়ে কিছু কিছু শুনিবারও আমরা অবসর পাইয়াছিলাম। সে যাহা হউক ঐ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাধনতত্ত্বের মূলসূত্রগুলি একবার সাধারণভাবে আমাদিগের আবৃত্তি করিয়া লওয়া ভাল। অতএব ঐ বিষয়ে আমরা এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রথম অধ্যায়।

সাধক ও সাধনা।

ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের পরিচয় যথাযথ পাইতে হইলে আমাদিগকে সাধনা কাহাকে বলে তদ্বিষয় প্রথমে বুঝিতে হইবে। অনেকে হয়ত এ কথায় বলিবেন, ভারত ত চিরকাল কোনও না কোনও ভাবে ধর্ম্মসাধনে লাগিয়া রহিয়াছে তবে ঐ কথা আবার পাড়িয়া পুঁথি বাড়ান কেন? আবহমানকাল হইতে ভারত আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্যসকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে নিজ জাতীয় শক্তি যতদূর ব্যয় করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে পৃথিবীর অপর কোন্ দেশের কোন্ জাতি এতদূর করিয়াছে? কোন্ দেশে ব্রহ্মজ্ঞ অবতারপুরুষসকলের আবির্ভাব এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে? অতএব সাধনার সহিত চিরপরিচিত আমাদিগকে ঐ বিষয়ের মূলসূত্রগুলি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

কথা সত্য হইলেও ঐরূপ করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, সাধনা সম্বন্ধে অনেক স্থলে জনসাধারণের একটা কিম্ভূতকিমাকার

ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য বা গন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য হারাইয়া তাহারা অনেক সময় কেবলমাত্র শারীরিক কঠোরতায়, দুষ্প্রাপ্য বস্তুসকলের সংযোগে, স্থানবিশেষে ক্রিয়াবিশেষের নিরর্থক অনুষ্ঠানে, শ্বাসপ্রশ্বাসরোধে এবং এমন কি অসম্বন্ধ মনের বিসদৃশ চেষ্টাদিতেও সাধনার বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকে। আবার এরূপও দেখা যায় যে, কুসংস্কার এবং কুঅভ্যাসে বিকৃতপূর্ব্ব মনকে প্রকৃতিস্থ ও সহজভাবাপন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে চালিত করিতে মহাপুরুষগণ কখন কখন যে সকল ক্রিয়া বা উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন সেই সকলকেই সাধনা বলিয়া ধারণা পূর্ব্বক সকলের পক্ষেই ঐ সমূহের অনুষ্ঠান সমভাবে প্রয়োজন বলিয়া অনেক স্থলে প্রচারিত হইতেছে! বৈরাগ্যবান্ না হইয়া—সংসারের ক্ষণস্থায়ী রূপরসাদি ভোগের জন্য সমভাবে লালায়িত থাকিয়াও মন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষের সহায়ে জগৎকারণ ঈশ্বরকে মন্ত্রৌষধি-বশীভূত সর্পের ন্যায় নিজ কর্ত্তৃত্বাধীন করিতে পারা যায়, এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেককে বৃথা চেষ্টায় কালক্ষেপ করিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব যুগযুগান্তরব্যাপী অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে ভারতের ঋষিমহাপুরুষগণ সাধন সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ আলোচনা এখানে বিষয়-বিরুদ্ধ হইবে না।

সাধনা সম্বন্ধে সাধারণ মানবের ভ্রান্ত ধারণা।

ঠাকুর বলিতেন, "সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন শেষকালের কথা"—সাধনার চরম উন্নতিতেই উহা মানবের ভাগ্যে উপস্থিত হয়। হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ প্রামাণ্য শাস্ত্র বেদোপনিষৎ ঐ কথাই বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন জগতে স্থূল সূক্ষ্ম, চেতন অচেতন যাহা কিছু তুমি দেখিতে পাইতেছ—ইট, কাঠ, মাটী, পাথর,

মানুষ, পশু, গাছ পালা, জীব জানোয়ার, দেব উপদেব—সকলই এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু। ঐ ব্রহ্মবস্তুকেই তুমি নানারূপে নানাভাবে দেখিতেছ, শুনিতেছ, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও আস্বাদ করিতেছ। তাঁহাকে লইয়া তোমার সকল প্রকার দৈনন্দিন ব্যবহার আজীবন নিষ্পন্ন হইলেও তুমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেছ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির সহিত তুমি ঐরূপ করিতেছ! কথাগুলি শুনিয়া আমাদের মনে যে সন্দেহপরম্পরার উদয় হইয়া থাকে এবং ঐ সকল নিরসনে শাস্ত্র যাহা বলিয়া থাকেন, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহার মোটামুটি ভাবটী পাঠককে এখানে বলিলে উহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা।

সাধনার চরম ফল, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন।

প্র। ঐ কথা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না কেন?

উ। তোমরা ভ্রমে পড়িয়াছ। যতক্ষণ না ঐ ভ্রম দূরীভূত হয় ততক্ষণ কেমন করিয়া ঐ ভ্রম ধরিতে পারিবে? যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিয়া থাকি। পূর্ব্বোক্ত ভ্রম ধরিতে হইলেও তোমাদের ঐরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন।

প্র। আচ্ছা ঐরূপ ভ্রম হইবার কারণ কি, এবং কবে হইতেই বা আমাদের এই ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হইল?

উ। ভ্রমের কারণ সর্ব্বত্র যাহা দেখিতে পাওয়া যায় এখানেও তাহাই—অজ্ঞান। ঐ অজ্ঞান কখন যে উপস্থিত হইল তাহা কিরূপে জানিবে বল? অজ্ঞানের ভিতর যতক্ষণ পড়িয়া রহিয়াছ ততক্ষণ উহা জানিবার চেষ্টা বৃথা। স্বপ্ন যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই

ভ্রম বা অজ্ঞানবশতঃ সত্য প্রত্যক্ষ হয় না। অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া অজ্ঞানের কারণ বুঝা যায় না।

উহাকে মিথ্যা বলিয়া ধারণা হয়। বলিতে পার—স্বপ্ন দেখিবার কালে কখনও কখনও কোন কোন ব্যক্তির 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি' এইরূপ ধারণা থাকিতে দেখা যায়। সেখানেও জাগ্রদবস্থার স্মৃতি হইতেই তাহাদের মনে ঐ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থায় জগৎ প্রত্যক্ষ করিবার কালে কাহারও কাহারও অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর স্মৃতি ঐরূপে হইতে দেখা যায়।

প্র। তবে উপায় ?

উ। উপায়—ঐ অজ্ঞান দূর কর। ঐ ভ্রম বা অজ্ঞান যে, দূর করা যায় তাহা তোমাদের নিশ্চিত বলিতে পারি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ উহা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া দূর করিতে হইবে তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

প্র। আচ্ছা ; কিন্তু ঐ উপায় জানিবার পূর্ব্বে আরও দুই একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমরা এত লোকে যাহা দেখিতেছি প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাকে তুমি ভ্রম বলিতেছ, আর অল্পসংখ্যক ঋষিরা যাহা বা যেরূপে জগৎটাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই সত্য বলিতেছ—এটা কি সম্ভব হইতে পারে না যে, তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই ভুল ?

জগৎকে ঋষিগণ যেরূপ দেখিয়াছেন তাহাই সত্য। উহার কারণ।

উ। বহুসংখ্যক ব্যক্তি যাহা বিশ্বাস করিবে তাহাই যে সর্ব্বদা সত্য হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই। ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ সত্য বলিতেছি কারণ, ঐ প্রত্যক্ষসহায়ে তাঁহারা সর্ব্ববিধ দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে ভয়শূন্য ও চিরশান্তির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনের সকল প্রকার ব্যবহারচেষ্টাদির একটা উদ্দেশ্যেরও সন্ধান পাইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন যথার্থজ্ঞান, মানবমনে সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা, সন্তোষ, করুণা, দীনতা

প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির বিকাশ করিয়া উহাকে অদ্ভুত উদারতাসম্পন্ন করিয়া থাকে ; ঋষিদিগের জীবনে ঐরূপ অসাধারণ গুণ ও শক্তির পরিচয় আমরা শাস্ত্রে পাইয়া থাকি, এবং তাঁহাদিগের পদানুসরণে চলিয়া যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহাদিগের ভিতরে ঐ সকলের পরিচয় এখনও দেখিতে পাই।

অনেকের একরূপ ভ্রম হইলেও ভ্রম কখনও সত্য হয় না।

প্র। আচ্ছা। কিন্তু আমাদের সকলেরই ভ্রম একপ্রকারের হইল কিরূপে? আমি যেটাকে পশু বলিয়া বুঝি তুমিও সেটাকে পশু ভিন্ন মানুষ বলিয়া বুঝ না ; এইরূপ, সকল বিষয়েই। এত লোকের ঐরূপে সকল বিষয়ে একই কালে একই প্রকার ভুল হওয়া অল্প আশ্চর্য্যের কথা নহে। পাঁচ জনে একটা বিষয়ে ভুল ধারণা করিলেও অপর পাঁচ জনের ঐ বিষয়ে সত্যদৃষ্টি থাকে, সর্ব্বত্র এইরূপই ত দেখা যায়। এখানে কিন্তু ঐ নিয়মের একেবারে ব্যতিক্রম হইতেছে। এজন্য তোমার কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না!

বিরাট মনে জগৎরূপ কল্পনা বিদ্যমান বলিয়াই মানবসাধারণের একরূপ ভ্রম হইতেছে। বিরাট মন কিন্তু ঐজন্য ভ্রমে আবদ্ধ নহে।

উ। অল্পসংখ্যক ঋষিদিগকে জনসাধারণের মধ্যে গণনা না করাতেই তুমি নিয়মের ব্যতিক্রম এখানে দেখিতে পাইতেছ। নতুবা পূর্ব্ব প্রশ্নেই এ বিষয়ের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তবে যে, জিজ্ঞাসা করিতেছ সকলের একপ্রকারের ভ্রম হইল কিরূপে?— তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন— এক অসীম অনন্ত সমষ্টি-মনে জগৎরূপ কল্পনার উদয় হইয়াছে। তোমার আমার এবং জনসাধারণের ব্যষ্টি-মন ঐ বিরাট মনের অংশ ও অঙ্গীভূত হওয়ায় আমাদিগকে ঐ একই প্রকার কল্পনা অনুভব করিতে হইতেছে। এ জন্যই আমরা

প্রত্যেকে পশুটাকে পশু ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া ইচ্ছামত দেখিতে বা কল্পনা করিতে পারি না। ঐজন্যই আবার যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রকার ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেও অপর সকলে যেমন ভ্রমে পড়িয়া আছে সেইরূপই থাকে। আর এক কথা, বিরাট পুরুষের বিরাট মনে জগৎরূপ কল্পনার উদয় হইলেও তিনি আমাদিগের মত অজ্ঞানবন্ধনে জড়ীভূত হইয়া পড়েন না। কারণ সর্ব্বদর্শী তিনি অজ্ঞানপ্রসূত জগৎ-কল্পনার ভিতরে ও বাহিরে অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুকে ওতঃপ্রোতঃভাবে বিদ্যমান দেখিতে পাইয়া থাকেন। উহা করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের কথা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। ঠাকুর যেমন বলিতেন—"সাপের মুখে বিষ রয়েছে; সাপ ঐ মুখ দিয়ে নিত্য আহারাদি কর্‌চে; সাপের তাতে কিছু হচ্চে না! কিন্তু সাপ যাকে কামড়ায় ঐ বিষে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু!"

জগৎরূপ কল্পনা, দেশকালের বাহিরে বর্ত্তমান। প্রকৃতি অনাদি।

অতএব শাস্ত্রদৃষ্টে দেখা গেল বিশ্ব-মনের কল্পনাসম্ভূত জগৎটা একভাবে আমাদেরও মনঃকল্পিত। কারণ, আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-মন, সমষ্টীভূত বিশ্ব-মনের সহিত শরীর ও অবয়বাদির ন্যায় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে নিত্য অবস্থিত। আবার ঐ জগৎ-রূপ কল্পনা যে, এককালে বিশ্বমনে ছিল না পরে আরম্ভ হইল, এ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, নাম ও রূপ বা দেশ ও কালরূপ পদার্থদ্বয়,—যাহা না থাকিলে কোনরূপ বিচিত্রতার সৃষ্টি হইতে পারে না—জগৎরূপ কল্পনারই মধ্যগত বস্তু অথবা ঐ কল্পনার সহিত উহারা অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য বিদ্যমান। স্থিরভাবে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন এবং বেদাদি শাস্ত্র যে কেন সৃজনীশক্তির মূলীভূত কারণ প্রকৃতি বা

মায়াকে অনাদি বা কালাতীত বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইবে। জগৎটা যদি মনঃকল্পিতই হয় এবং ঐ কল্পনার আরম্ভ যদি আমরা 'কাল' বলিতে যাহা বুঝি তাহার ভিতরে না হইয়া থাকে, তবে কথাটা দাঁড়াইল এই যে, কালরূপ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎরূপ কল্পনাটা তদাশ্রয় বিশ্ব-মনে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-মন বহুকাল ধরিয়া ঐ কল্পনা দেখিতে থাকিয়া জগতের অস্তিত্বেই দৃঢ়ধারণা করিয়া রহিয়াছে এবং জগৎরূপ কল্পনার অতীত অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎদর্শনে বহুকাল বঞ্চিত থাকিয়া জগৎটা যে মনঃকল্পিত বস্তুমাত্র এ কথা এককালে ভুলিয়া গিয়া আপনার ভ্রম এখন ধরিতে পারিতেছে না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিতে সর্ব্বদা সক্ষম হই।

দেশকালাতীত জগৎ-কারণের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টাই সাধনা।

এখন বুঝা যাইতেছে যে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা ও অনুভবাদি বহুকাল-সঞ্চিত অভ্যাসের ফলে বর্ত্তমানাকার ধারণ করিয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানে উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে এখন নাম রূপ, দেশ কাল, মন বুদ্ধি প্রভৃতি জগদন্তর্গত সকল বিষয়ের অতীত পদার্থের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। ঐ পরিচয় পাইবার চেষ্টাকেই বেদপ্রমুখ শাস্ত্র 'সাধন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং ঐ চেষ্টা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে স্ত্রী বা পুরুষে বিদ্যমান তাঁহারাই ভারতে সাধক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, জগদতীত বস্তু অনুসন্ধানের পূর্ব্বোক্ত চেষ্টা, দুইটী প্রধান পথে এতকাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। প্রথম শাস্ত্র যাহাকে "নেতি, নেতি" বা জ্ঞান-মার্গ

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং দ্বিতীয়, যাহা 'ইতি, ইতি' বা ভক্তি-মার্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানমার্গের সাধক চরম-লক্ষ্যের কথা প্রথম হইতে হৃদয়ে ধারণা ও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জ্ঞাতসারে তদভিমুখে দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকেন। ভক্তিপথের পথিকেরা চরমে কোথায় উপনীত হইবেন তদ্বিষয়ে অনেক স্থলে অজ্ঞ থাকেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চরমে জগদতীত অদ্বৈতবস্তুর সাক্ষাৎপরিচয় লাভ করিয়া থাকেন। নতুবা জগৎসম্বন্ধে সাধারণ জনগণের যে ধারণা আছে তাহা উভয় পথের পথিকগণকেই ত্যাগ করিতে হয়। জ্ঞানী উহা প্রথম হইতেই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন; এবং ভক্ত উহার কতক ছাড়িয়া কতক রাখিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও পরিণামে জ্ঞানীর ন্যায়ই উহার সমস্ত ত্যাগ করিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তত্ত্বে উপস্থিত হন। জগৎ সম্বন্ধে উল্লিখিত স্বার্থপর, ভোগসুখৈকলক্ষ্য সাধারণ ধারণার পরিহারকেই শাস্ত্র 'বৈরাগ্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'নেতি, নেতি' ও 'ইতি ইতি' সাধনপথ।

নিত্যপরিবর্ত্তনশীল নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনে জগতের অনিত্যতাজ্ঞান সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্য জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা ত্যাগ করিয়া 'নেতি, নেতি'-মার্গে জগৎকারণের অনুসন্ধান করা প্রাচীন যুগে মানবের প্রথমেই উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সে জন্য ভক্তি ও জ্ঞান উভয় মার্গ সমকালে প্রচলিত থাকিলেও ভক্তিপথের সকল বিভাগের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি হইবার পূর্ব্বেই উপনিষদে জ্ঞানমার্গের সম্যক্ পরিপুষ্টি হওয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

'নেতি নেতি'—নিত্যস্বরূপ জগৎকারণ ইহা নহে, উহা নহে— করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়া মানব স্বল্প-কালেই যে, অন্তর্মুখী হইয়া পড়িয়াছিল উপনিষৎ এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। মানব বুঝিয়াছিল বাহিরের অন্য সকল বস্তু অপেক্ষা তাহার নিজ দেহ-মনই তাহাকে সর্ব্বাগ্রে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে; অতএব, অন্য বস্তু সকলের সহায়ে জগৎ কারণের অন্বেষণে অগ্রসর হইলে যতকালে সে উহার সন্ধান পাইবে, নিজ দেহ-মনাবলম্বনে অগ্রসর হইলে তদপেক্ষা অধিক শীঘ্র ঐ বিষয়ের সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা। "হাঁড়ির একটা ভাত টিপিয়া দেখিয়া যেমন বুঝিতে পারা যায়, ভাত-হাঁড়িটা সুসিদ্ধ হইয়াছে কি না," তদ্রূপ আপনার ভিতরে নিত্য-কারণ-স্বরূপের অনুসন্ধান পাইলেই অপর বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অন্তরে উহার অন্বেষণ পাওয়া যাইবে। এজন্য জ্ঞানপথের পথিকের নিকট "আমি কোন্ পদার্থ" এই বিষয়ের অনুসন্ধানই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে।

'নেতি, নেতি' পথের লক্ষ্য. 'আমি' কোন্ পদার্থ তদ্বিষয় সন্ধান করা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা, জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়বিধ সাধককেই ত্যাগ করিতে হয়। ঐ ধারণার একান্ত ত্যাগেই মানব-মন সর্ব্ববৃত্তি-রহিত হইয়া সমাধির অধিকারী হয়। ঐরূপ সমাধিকেই শাস্ত্র নির্ব্বিকল্পসমাধি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞানপথের সাধক, 'আমি বাস্তবিক কোন্ পদার্থ' এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়া কিরূপে নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে উপনীত হন এবং ঐ কালে তাঁহার কীদৃশ অনুভব উপস্থিত হয়, তাহা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।* অতএব ভক্তিপথের পথিক ঐ সমাধির অনুভবে

নির্বিকল্প সমাধি।

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ ২য় অধ্যায় দেখ।

কিরূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন পাঠককে এখন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য।

ভক্তিমার্গকে 'ইতি ইতি'-সাধনপথ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। কারণ, ঐ পথের পথিক জগতের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিলেও জগৎ-কর্ত্তা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া তৎকৃত জগৎরূপ কার্য্য সত্য বর্ত্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভক্ত, জগৎ ও তন্মধ্যগত সর্ব্ব বস্তু ও ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখিয়া আপনার করিয়া লন। ঐ সম্বন্ধ দর্শন করিবার পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হয় তাহাকে তিনি তৎক্ষণাৎ দূর পরিহার করেন। তদ্ভিন্ন, ঈশ্বরের কোন এক রূপের † প্রতি অনুরাগে ও ধ্যানে তন্ময় হওয়া এবং তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বকার্য্যানুষ্ঠান করা ভক্তের আশু লক্ষ্য হইয়া থাকে।

'ইতি ইতি' পথে নিবিকল্প সমাধিলাভের বিবরণ।

রূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কেমন করিয়া জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া নির্ব্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছিতে পারা যায় এইবার আমরা তাহার অনুশীলন করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভক্ত, ঈশ্বরের কোন এক রূপকে নিজ ইষ্ট বলিয়া পরিগ্রহ করিয়া তাহারই চিন্তা ও ধ্যান করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম, ধ্যান করিবার কালে, তিনি ঐ ইষ্টমূর্ত্তির সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি মানস-নয়নের সম্মুখে আনিতে পারেন না; কখন উহার হস্ত, কখন পদ এবং কখন বা মুখখানিমাত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়; উহাও আবার দর্শন মাত্রেই যেন লয়

† ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাকেও আমরা রূপের ধ্যানের মধ্যেই গণনা করিতেছি। কারণ, আকার-রহিত সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তিত্বের ধ্যান করিতে যাইলে আকাশ, জল, বায়ু বা তেজ প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের কোন পদার্থই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে।

হইয়া যায়, সম্মুখে স্থির ভাবে অবস্থান করে না। অভ্যাসের ফলে ধ্যান গভীর হইলে ঐ মূর্ত্তির সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি, মানস-চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ধ্যান ক্রমে গভীরতর হইলে ঐ ছবি, যতক্ষণ না মন চঞ্চল হয় ততক্ষণ, স্থির ভাবে সম্মুখে অবস্থান করে। পরে, ধ্যানের গভীরতার তারতম্যে ঐ মূর্ত্তির চলা ফেরা, হাসা, কথাকহা এবং চরমে উহার স্পর্শ পর্য্যন্তও ভক্তের উপলব্ধি হয়। তখন ঐ মূর্ত্তিকে সর্ব্ব প্রকারে জীবন্ত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভক্ত, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বা খুলিয়া থাকুন না কেন, ধ্যান করিলেই ঐ মূর্ত্তির ঐ প্রকার চেষ্টাদি সমভাবে প্রত্যক্ষ করেন। পরে, "আমার ইষ্টই ইচ্ছামত নানারূপ ধারণ করিয়াছেন"—এই বিশ্বাসের ফলে ভক্ত-সাধক আপন ইষ্টমূর্ত্তি হইতে নানাবিধ দিব্যরূপ সকলের সন্দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর বলিতেন —"যে ব্যক্তি একটী রূপ ঐ প্রকার জীবন্ত ভাবে দর্শন করিয়াছে তাহার অন্য সব রূপের দর্শন সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়।"

ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইল তাহা হইতে একটি বিষয় আমরা বুঝিতে পারি। ঐরূপ জীবন্ত মূর্ত্তিসকলের দর্শন-লাভ যাঁহার ভাগ্যে উপস্থিত হয় তাঁহার নিকট জাগ্রৎকালে দৃষ্ট পদার্থ সকলের ন্যায়, ধ্যানকালে দৃষ্ট ভাবরাজ্যগত ঐ সকল মূর্ত্তির সমান অস্তিত্ব অনুভব হইতে থাকে। ঐরূপে বাহ্য জগৎ ও ভাবরাজ্যের সমানাস্তিত্ববোধ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই তাঁহার মনে, বাহ্য জগৎটাকে মনঃ-কল্পিত বলিয়া ধারণা হইতে থাকে। আবার গভীর ধ্যানকালে ভাবরাজ্যের অনুভব, ভক্তের মনে এত প্রবল হইয়া উঠে যে সেই সময়ের জন্য তাঁহার বাহ্য জগতের অনুভব ঈষন্মাত্রও থাকে না। ভক্তের ঐ অবস্থাকেই শাস্ত্র সবিকল্প-সমাধি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ প্রকার সমাধিকালে মানসিক

শক্তিপ্রভাবে ভক্তের মনে বাহ্য জগতের বিলয় হইলেও ভাব-রাজ্যের বিলয় হয় না। জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের সহিত ব্যবহার করিয়া আমরা নিত্য যেরূপ সুখদুঃখাদির অনুভব করিয়া থাকি, আপন ইষ্টমূর্ত্তির সহিত ব্যবহারে ভক্ত তখন, ঠিক তদ্রূপ অনুভব করিতে থাকেন। কেবলমাত্র ইষ্টমূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার মনে তখন যত কিছু সংকল্প-বিকল্পের উদয় হইতে থাকে। এক বিষয়কে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ভক্তের মনে ঐ সময়ে বৃত্তি-পরম্পরার উদয় হওয়ার জন্য শাস্ত্র, তাঁহার ঐ অবস্থাকে সবিকল্পক বা বিকল্পসংযুক্ত সমাধি বলিয়াছেন।

এইরূপে ভাবরাজ্যের অন্তর্গত বিষয় বিশেষের চিন্তায় ভক্তের মনে স্থূল বাহ্য জগতের, এবং এক ভাবের প্রাবল্যে অন্য ভাবসকলের, বিলয় সাধিত হয়। যে ভক্তসাধক এতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার নিকট নির্ব্বিকল্পভূমি-লাভ অধিক দূরবর্ত্তী নহে। জগতের বহুকালাভ্যস্ত অস্তিত্ব-জ্ঞান যিনি এতদূর দূরীকরণে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহার মন যে সমধিক শক্তিসম্পন্ন ও দৃঢ় সংকল্প হইয়াছে, একথা বলিতে হইবে না। মনকে এককালে নির্ব্বিকল্প করিতে পারিলে ঈশ্বর-সম্ভোগ অধিক ভিন্ন অল্প হয় না, একথা একবার ধারণা হইলেই তাঁহার সমগ্র মন ঐদিকে সোৎসাহে ধাবিত হয় এবং শ্রীগুরু ও ঈশ্বরকৃপায় তিনি অচিরে ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে আরোহণ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থানপূর্ব্বক চিরশান্তির অধিকারী হন। অথবা বলা যাইতে পারে, প্রগাঢ় ইষ্টপ্রেমই তাঁহাকে ঐ ভূমি দেখাইয়া দেয় এবং ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় উহার প্রেরণায় তিনি আপন ইষ্টের সহিত তখন একত্বানুভব করেন।

জ্ঞানী এবং ভক্ত সাধককুলের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার

ঐরূপ ক্রম শাস্ত্রনির্দ্ধারিত। অবতারপুরুষসকলে কিন্তু দেব এবং মানব উভয় ভাবের একত্র সম্মিলন আজীবন বিদ্যমান থাকায় সাধন-কালেই তাঁহাদিগকে কখন কখন সিদ্ধের ন্যায় প্রকাশ ও শক্তি-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দেব এবং মানব উভয় ভূমিতে তাঁহাদিগের স্বভাবতঃ বিচরণ করিবার শক্তি থাকাতে ঐরূপ হইয়া থাকে ; অথবা, ভিতরের দেবভাব তাঁহাদিগের সহজ স্বাভাবিক অবস্থা হওয়ায় উহা তাঁহাদিগের মানব-ভাবের বাহিরাবরণকে সময়ে সময়ে ভেদ করিয়া ঐরূপে স্বতঃ প্রকাশিত হয়। ঐ বিষয়ের মীমাংসা যাহাই হউক না কেন, ঐরূপ ঘটনা কিন্তু অবতারপুরুষ সকলের জীবন মানববুদ্ধির নিকটে দুর্ভেদ্য জটিলতাময় করিয়া রাখিয়াছে। ঐ জটিল রহস্য কখনও যে, সম্পূর্ণ ভেদ হইবে, বোধ হয় না। কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উহার অনুশীলনে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, এ কথা ধ্রুব। প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতার-চরিত্রের মানবভাবটী চাপিয়া ঢাকিয়া দেবভাবটীর আলোচনাই করা হইয়াছিল—সন্দেহশীল বর্ত্তমান যুগে ঐ চরিত্রের দেবভাবটী সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানবভাবটীর আলোচনাই চলিয়াছে—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা ঐ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে তদুভয় ভাব যে একত্র একই কালে বিদ্যমান থাকে এই কথাই পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস করিব। বলা বাহুল্য, দেব-মানব ঠাকুরের পুণ্যদর্শন জীবনে না ঘটিলে অবতারচরিত্র ঐরূপে দেখিতে আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না।

অবতার পুরুষে, দেব ও মানব উভয় ভাব বিদ্যমান থাকায় সাধনকালে তাঁহাদিগকে সিদ্ধের ন্যায় প্রতীতি হয়। দেব ও মানব উভয় ভাবে তাঁহাদিগের জীবনালোচনা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অবতার জীবনে সাধক ভাব।

পুণ্য-দর্শন ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়া আমরা তাঁহার জীবন ও চরিত্রের যতই অনুধ্যান করিয়াছি ততই তাঁহাতে দেব ও মানব উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সম্মিলন দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। মধুর সামঞ্জস্যে ঐরূপ বিপরীত ভাবসমষ্টির একত্র একাধারে বর্ত্তমান যে সম্ভবপর একথা তাঁহাকে না দেখিলে আমাদের কখনই ধারণা হইত না। ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই আমাদিগের ধারণা, তিনি দেব-মানব,—পূর্ণ দেবত্বের ভাব ও শক্তিসমূহ মানবীয় দেহ ও ভাবাবরণে প্রকাশিত হইলে যাহা হয়, তিনি তাহাই। ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, ঐ উভয় ভাবের কোনটীই তিনি বৃথা ভাণ করেন নাই এবং মানব ভাব তিনি লোকহিতায় যথার্থই স্বীকার করিয়া উহা হইতে দেবত্বে উঠিবার পথ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার, ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই একথা বুঝিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সকল অবতার-পুরুষের জীবনেই ঐ উভয় ভাবের ঐরূপ বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চয় উপস্থিত হইয়াছিল।

ঠাকুরে দেব ও মানব ভাবের মিলন।

শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া অবতার প্রথিত পুরুষসকলের মধ্যে কাহারও জীবনকথা আলোচনা করিতে যাইলেই আমরা ঐরূপ দেখিতে পাইব। দেখিতে পাইব, কি এক অদ্ভুত, অজ্ঞাত শক্তিবলে তাঁহারা কখন আমাদের ন্যায় সাধারণ ভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগতস্থ যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তির সহিত আমাদিগেরই ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন—আবার,

কখন বা উচ্চ দিব্য ভাব-ভূমিতে বিচরণ করিয়া আমাদিগের অজ্ঞাত, অপরিচিত ভাব ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া এক নূতন রাজ্যের সংবাদ আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন!—তাঁহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন সকল বিষয়ের যোগাযোগ করিয়া তাঁহাদিগকে ঐরূপ করাইতেছে! আশৈশবই ঐরূপ। তবে, শৈশবে সময়ে সময়ে ঐ শক্তির পরিচয় পাইলেও উহা যে তাঁহাদিগের নিজস্ব এবং অন্তরেই অবস্থিত একথা তাঁহারা অনেক সময়ে ধরিতে বুঝিতে পারেন না; অথবা, ইচ্ছামাত্রেই ঐ শক্তিপ্রয়োগে, উচ্চ-ভাব-ভূমিতে আরোহণ করিয়া দিব্যভাব সহায়ে জগদন্তর্গত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে ও তাহাদিগের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু দিনের পর দিন ঐ শক্তির পরিচয় তাঁহারা জীবনে বারম্বার যত প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, উহার সহিত সম্যক পরিচিত হইতে তাঁহাদের মনোমধ্যে তত প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠে এবং ঐ বাসনাই তাঁহাদিগকে অলৌকিক অনুরাগসম্পন্ন করিয়া সাধনে নিযুক্ত করে।

সকল অবতার পুরুষেই ঐরূপ।

তাঁহাদিগের ঐরূপ বাসনায় কিন্তু স্বার্থপরতার নাম গন্ধ থাকে না। নিজের জন্য কোন প্রকার ভোগ-সুখ লাভ ত দূরের কথা, "পৃথিবীস্থ অপর অপর সকল ব্যক্তির যাহা হইবার হউক আমি নিজে মুক্তিলাভ করিয়া ভূমানন্দে থাকি"—এই প্রকারের ভাবও তাঁহাদিগের ঐ বাসনায় দেখা যায় না। কেবল, যে অজ্ঞাত দিব্য শক্তির নিয়োগে তাঁহারা জন্মাবধি অসাধারণ দিব্যভাব সকল অনুভব করিতেছেন এবং স্থূল জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তি সকলের ন্যায় ভাবরাজ্যগত সকল বিষয়ের সমসমান অস্তিত্ব সময়ে সময়ে

অবতার পুরুষে স্বার্থ-সুখের বাসনা থাকেনা।

প্রত্যক্ষ করিতেছেন সেই শক্তি কি বাস্তবিকই জগতের অন্তরালে অবস্থিত অথবা স্বকপোলকল্পনাবিজৃম্ভিত তদ্বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান তাঁহাদিগের ঐ বাসনার মূলে পরিলক্ষিত হয়। কারণ, অপর সাধারণের প্রত্যক্ষ ও অনুভবাদির সহিত আপনাদিগের প্রত্যক্ষ সকলের তুলনা করিয়া একথা তাঁহাদিগের স্বল্পকালেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তাঁহারা আজীবন জগতস্থ বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন অপরে তদ্রূপ করিতেছে না—ভাব-রাজ্যের উচ্চভূমি হইতে জগৎটা দেখিবার সামর্থ্য তাহাদের এক প্রকার নাই বলিলেই হয়।

তাঁহাদিগের করুণা ও পরার্থে সাধন ভজন।

শুধু তাহাই নহে। পূর্ব্বোক্ত তুলনায় তাঁহাদের আর একটী কথাও সঙ্গে সঙ্গে ধারণা হইয়া পড়ে। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, সাধারণ ও দিব্য দুই ভূমি হইতে জগতটাকে দুই ভাবে দেখিতে পান বলিয়াই প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল দুই দিনের নশ্বর জীবনে আপাতমনোরম রূপরসাদি তাঁহাদিগকে মানব-সাধারণের ন্যায় প্রলোভিত করিতে পারে না, এবং অনিত্য সংসারের নানা অবস্থাবিপর্য্যয়ে, অশান্তি ও নৈরাশ্যের নিবিড় ছায়া তাঁহাদিগের মনকে আবৃত করিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শক্তিকে সম্যকপ্রকারে আপনার করিয়া লইয়া কেমন করিয়া ইচ্ছামাত্র উচ্চ উচ্চতর ভাব-ভূমি সকলে স্বয়ং আরোহণ এবং যতকাল ইচ্ছা তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন, এবং আপামর সাধারণকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া শান্তির অধিকারী করিবেন, এই চিন্তাতেই তাঁহাদের করুণাপূর্ণ মন এককালে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। এজন্যই দেখা যায়, সাধনা ও করুণার দুইটী প্রবল প্রবাহ তাঁহাদিগের জীবনে নিরন্তর পাশাপাশি

প্রবাহিত হইতেছে! বলিতে পার, মানবসাধারণের সহিত আপনাদিগের অবস্থার তুলনায় তাঁহাদিগের অন্তরের করুণা শতধারে বর্দ্ধিত হইতে পারে; কিন্তু ঐরূপ অসাধারণ করুণার উৎপত্তি তাঁহাদিগের অন্তরে কোথা হইতে হইল তাহা ত নির্দ্দিষ্ট হইল না? উত্তরে বলিতে হয়, উহা সঙ্গে লইয়াই তাঁহারা সংসারে জন্মিয়া থাকেন—উহা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক একটী দৃষ্টান্ত স্মরণ কর—

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'তিন বন্ধুর আনন্দ-কানন দর্শন' সম্বন্ধে ঠাকুরের গল্প।

"তিন বন্ধুতে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লে, উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা—তার ভিতর থেকে গান বাজনার মধুর আওয়াজ আস্‌ছে! শুনে মোহিত হয়ে ইচ্ছা হোলো, ভিতরে কি হচ্চে দেখ্‌বে। চারিদিকে ঘুরে দেখ্‌লে, ভিতরে ঢোক্‌বার একটীও দরজা নাই। কি করে?—একজন কোন রকমে একটা মৈ যোগাড় করে পাঁচিলের উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো ও অপর দুই জন নীচে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রথম লোকটী পাঁচিলের উপরে উঠে ভিতরের ব্যাপার দেখে আনন্দে অধীর হয়ে হাঃ হাঃ করে হাস্‌তে হাস্‌তে লাফিয়ে প'ড়্‌লো—কি যে ভিতরে দেখ্‌লে তা নীচের দুজনকে বল্‌বার জন্য একটুও অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না! তারা ভাব্‌লে বাঃ, বন্ধু ত বেশ্, একবার বল্‌লেও না—কি দেখ্‌লে!—যা হোক্ দেখ্‌তে হোলো। ভেবে—আর একজন ঐ মৈ বেয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। উপরে উঠে সেও কিন্তু প্রথম লোকটীর মত হাঃ হাঃ করে হেসে ভিতরে লাফিয়ে পড়্‌লো। তৃতীয় লোকটী তখন কি করে—মৈ বেয়ে উপরে উঠ্‌লো ও ভিতরের আনন্দের মেলা দেখ্‌তে পেলে। দেখে

প্রথমে তার মনে খুব ইচ্ছা হোলো সেও উহাতে যোগ দেয়। পরেই ভাবলে—কিন্তু আমি যদি এখনি উহাতে যোগদান করি তা হোলে বাহিরের অপর দশজনে ত জান্‌তে পার্‌বে না, এখানে এমন আনন্দ উপভোগের জায়গা আছে; একলা এই আনন্দটা ভোগ ক'র্‌বো? ঐ ভেবে, সে জোর ক'রে নিজের মনকে ফিরিয়ে নেবে এলো ও দুচোকে যাকেই দেখ্‌তে পেলে তাকেই হেঁকে বল্‌তে লাগ্‌লো—ওহে এখানে এমন আনন্দের স্থান রয়েছে, চল চল সকলে মিলে ভোগ করি! এইরূপে সকলকে সঙ্গে নিয়ে সেও ঐ স্থানে যোগ দিলে।" এখন বুঝ, তৃতীয় ব্যক্তির মনে দশজনকে সঙ্গে লইয়া একত্র আনন্দোপভোগের ইচ্ছার কারণ যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তদ্রূপ অবতার পুরুষসকলের মনে লোককল্যাণসাধনের ইচ্ছা কেন যে আশৈশব বিদ্যমান থাকে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

অবতার পুরুষদিগকে সাধারণ মানবের ন্যায় সংযম অভ্যাস করিতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত কথায় কেহ কেহ হয়ত স্থির করিবেন যে, তবে বুঝি অবতার পুরুষসকলকে আমাদিগের ন্যায় দুর্দ্ধার ইন্দ্রিয় সকলের সহিত কখনও সংগ্রাম করিতে হয় না; শিষ্ট শান্ত বালকের ন্যায় উহারা বুঝি আজন্ম তাঁহাদিগের বশে নিরন্তর উঠিতে বসিতে থাকে এবং সেই জন্য সংসারের রূপরসাদি হইতে মনকে ফিরাইয়া তাঁহারা সহজেই উচ্চ লক্ষ্যে চালিত করিতে পারেন। উত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে, ঐ বিষয়েও নরবৎ নরলীলা হইয়া থাকে; এখানেও তাঁহাদিগকে সংগ্রামে জয়ী হইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হয়।

মানব মনের স্বভাব সম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্র জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই দেখিতে পাইয়াছেন স্থূল হইতে আরম্ভ হইয়া

সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, অনন্ত বাসনাস্তরসমূহ উহার ভিতরে কত বিদ্যমান রহিয়াছে! একটীকে যদি কোনরূপে অতিক্রম করিতে তুমি সমর্থ হইয়াছ তবে আর একটী আসিয়া তোমার পথরোধকরিল—সেটীকে পরাজিত করিলে ত আর একটি আসিল—স্থূলকে পরাজিত করিলে ত সূক্ষ্ম আসিল—তাহাকে পশ্চাৎপদ করিলে ত সূক্ষ্মতর বাসনাশ্রেণী তোমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইল! যদি কাম ছাড়িলে ত কাঞ্চন আসিল; স্থূলভাবে কাম-কাঞ্চন গ্রহণে বিরত হইলে ত বাহ্যিক সৌন্দর্য্যানুরাগ, লোকৈষণা মান-যশাদি সম্মুখে উপস্থিত হইল; অথবা মায়িক সম্বন্ধ সকল যদি তুমি যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিলে তবে আলস্য বা করুণাকারে মায়ামোহ আসিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিল!

মনের অনন্ত বাসনা।

মনের ঐরূপ স্বভাবের উল্লেখ করিয়া বাসনাজাল হইতে দূরে থাকিতে ঠাকুর আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক করিতেন। নিজ জীবনের ঘটনাবলী* ও চিন্তাপর্য্যন্ত সময়ে সময়ে দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিয়া তিনি ঐ বিষয় আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। পুরুষভক্তদিগের ন্যায় স্ত্রীভক্তদিগকেও তিনি ঐ কথা বারম্বার বলিয়া তাঁহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপিত করিতেন। তাঁহার একদিনের ঐরূপ ব্যবহার এখানে বলিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন।

বাসনা ত্যাগ সম্বন্ধে ঠাকুরের প্রেরণা।

স্ত্রী বা পুরুষ ঠাকুরের নিকট যে কেহই যাইতেন সকলেই তাঁহার অমায়িকতা, সদ্ব্যবহার, ও কামগন্ধরহিত অদ্ভুত ভালবাসার

* "গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ" ১ম অধ্যায় ২৬ পৃষ্ঠা এবং ২য় অধ্যায় ৫৫ ও ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন এবং সুবিধা হইলেই পুনরায় তাঁহার পুণ্যদর্শন ও সঙ্গসুখলাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। ঐরূপে তাঁহারা যে নিজেই তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে, নিজের পরিচিত সকলকে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইয়া তাহারাও যাহাতে তাঁহার দর্শনে বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্য বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করিতেন। আমাদিগের পরিচিতা জনৈকা ঐরূপে একদিন তাঁহার বৈমাত্রেয়া ভগ্নী ও তাহার স্বামীর সহোদরাকে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ঠাকুর তাঁহাদের পরিচয় ও কুশল প্রশ্নাদি করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগবান্ হওয়াই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ এই বিষয়ে কথা পাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

ঐ বিষয়ে স্ত্রী ভক্ত-দিগকে উপদেশ।

"ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা? মহামায়ার এমনি কাণ্ড—হতে কি দেয়? যার তিনকুলে কেউ নেই তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে!—সেও বিড়ালের মাছ, দুধ, ঘুরে ঘুরে জোগাড় করবে; আর বল্‌বে, 'মাছ, দুধ না হলে বিড়ালটা খায় না, কি করি?'

"হয়ত, বড় বনেদি ঘর। পতি পুত্তুর সব মরে গেল—কেউ নেই—রইল কেবল গোটাকতক রাঁড়ি!—তাদের মরণ নাই! বাড়ির এখান্‌টা পড়ে গেছে, ওখান্‌টা ধসে গেছে, ছাদের উপর অশ্বত্থ গাছ জন্মেছে—তার সঙ্গে দুচার গাছা ডেঙ্গো ডাঁটাও জন্মেছে; রাঁড়িরা তাই তুলে চচ্চড়ি রাঁধ্‌চে ও সংসার করচে! কেন? ভগবানকে ডাকুক্ না

কেন ? তাঁর শরণাপন্ন হোক্ না—তার ত সময় হয়েছে। তা হবে না !

"হয়ত বা কারুর বিয়ের পরে স্বামী মরে গেল—কড়ে রাঁড়ি। ভগবানকে ডাকুক্ না কেন ? তা নয়-- ভাইয়ের ঘরে গিন্নি হোল ! মাথায় কাগা খোঁপা, আঁচলে চাবির থোলো বেঁধে, হাত নেড়ে গিন্নিপনা কচ্চেন—সর্ব্বনাশীকে দেখ্‌লে পাড়া শুদ্ধ্‌ লোক ডরায় !—আর বলে বেড়াচ্চেন্—"আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না !"—মর মাগি, তোর কি হোলো তা ছাখ্—তা, না !"

এক রহস্যের কথা—আমাদিগের পরিচিতা রমণীর ভগ্নীর ঠাকুরঝি—যিনি অদ্য প্রথমবার ঠাকুরের দর্শন লাভ করিলেন, ভ্রাতার ঘরে গৃহিনী ভগ্নিদিগের শ্রেণীভুক্তা ছিলেন ! ঠাকুরকে কেহই সে কথা ইতিপূর্ব্বে বলে নাই। কিন্তু কথায় কথায় ঠাকুর ঐ দৃষ্টান্ত আনিয়া বাসনার প্রবল প্রতাপ ও মানব মনে অনন্ত বাসনান্তরের কথা বুঝাইতে লাগিলেন ! বলা বাহুল্য কথাগুলি ঐ স্ত্রীলোকটীর অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দৃষ্টান্তগুলি শুনিয়া আমাদিগের পরিচিতা রমণীর ভগ্নী তাঁহার গা ঠেলিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"ও ভাই,—আজই কি ঠাকুরের মুখ দিয়ে এই কথা বেরুতে হয় !—ঠাকুরঝি কি মনে ক'র্‌বে !" পরিচিতা বলিলেন 'তা কি কোর্‌বো ; ওঁর ইচ্ছা, ওঁকে আরত কেউ শিখিয়ে দেয় নি ?'

মানব প্রকৃতির আলোচনায় স্পস্ট বুঝা যায় যে, যাহার মন যত উচ্চে উঠে, সূক্ষ্ম বাসনারাজি তাহাকে তত তীব্র যাতনা অনুভব করায়। চুরি, মিথ্যা বা লাম্পট্য যে অসংখ্যবার করিয়াছে, তাহার ঐরূপ কার্য্যের পুনরনুষ্ঠান তত কষ্টকর হয় না, কিন্তু উদার উচ্চ

অবতার পুরুষদিগের সূক্ষ্ম বাসনার সহিত সংগ্রাম।

অন্তঃকরণ ঐ সকলের চিন্তামাত্রেই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিষম যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়। অবতার পুরুষ সকলকে আজীবন স্থূলভাবে বিষয় গ্রহণে অনেকস্থলে বিরত থাকিতে দেখা যাইলেও অন্তরের সূক্ষ্ম বাসনাশ্রেণীর সহিত সংগ্রাম যে তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সমভাবেই করিয়া থাকেন এবং মনের ভিতর উহাদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদিগের অপেক্ষা শত সহস্রগুণ অধিক যন্ত্রণা অনুভব করেন, একথা তাঁহারা স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব রূপরসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইতে তাঁহাদিগের সংগ্রামকে ভাণ কিরূপে বলিব?

অবতার পুরুষের মানব ভাব সম্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংসা।

শাস্ত্রদর্শী কোন পাঠক হয়ত এখনও বলিবেন, "কিন্তু তোমার কথা মানি কিরূপে? এই দেখ অদ্বৈতবাদীর শিরোমণি আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার গীতা ভাষ্যের প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও নরদেহ-ধারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাব, সকল জীবের নিয়ামক, জন্মাদিরহিত ঈশ্বর, লোকানুগ্রহ করিবেন বলিয়া নিজ মায়াশক্তি দ্বারা যেন দেহবান হইয়াছেন, যেন জন্মিয়াছেন এই-রূপ পরিলক্ষিত হয়েন।' * স্বয়ং আচার্য্যই যখন ঐ কথা বলিতে-ছেন তখন তোমাদের পূর্ব্বোক্ত কথা দাঁড়ায় কিরূপে?" আমরা বলি আচার্য্য ঐরূপ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমাদিগের দাঁড়া-ইবার স্থল আছে। আচার্য্যের ঐকথা বুঝিতে হইলে আমা-দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি, ঈশ্বরের দেহধারণ বা নামরূপবিশিষ্ট হওয়াটাকে যেমন ভাণ বলিতেছেন, তেমনি

* স চ ভগবান····· অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধমুক্ত-স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাতইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে।
গীতা—শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকা।

সঙ্গে সঙ্গে তোমার, আমার এবং জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির নাম-রূপ-বিশিষ্ট হওয়াটাকে ভাণ বলিতেছেন। সমগ্র জগৎ-টাকেই তিনি ব্রহ্মবস্তুর উপরে মিথ্যাভাণ বলিতেছেন বা উহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিতেছেন না।* অতএব তাঁহার ঐ উভয় কথা একত্রে গ্রহণ করিলে তবেই তৎকৃত মীমাংসা বুঝা যাইবে। অবতারের দেহধারণ ও সুখদুঃখাদি অনুভবগুলিকে মিথ্যা ভাণ বলিয়া ধরিব এবং আমাদিগের ঐ বিষয় গুলিকে সত্য বলিব এরূপ তাঁহার অভিপ্রায় নহে। আমাদিগের অনুভব ও প্রত্যক্ষকে সত্য বলিলে অবতার পুরুষদিগের প্রত্যক্ষাদিকেও সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কথায় আমরা অন্যায় কিছু বলি নাই।

ঐ কথার অন্যভাবে আলোচনা।

কথাটীর আর এক ভাবে আলোচনা করিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে। অদ্বৈত-ভাব-ভূমি ও সাধারণ বা দ্বৈত-ভাব-ভূমি হইতে দৃষ্টি করিয়া জগৎ সম্বন্ধে দুই প্রকার ধারণা আমাদিগের উপস্থিত হয়—শাস্ত্র এই কথা বলেন। প্রথমটীতে আরোহণ করিয়া জগৎরূপ পদার্থটা কতদূর সত্য বুঝিতে যাইলে প্রত্যক্ষ বোধ হয় উহা নাই, বা কোনও কালে ছিল না—একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম-বস্তু ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই; আর দ্বিতীয় বা দ্বৈত-ভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগৎটাকে দেখিলে নানা নাম রূপের সমষ্টি উহাকে সত্য ও নিত্য বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হয়, যেমন আমাদিগের ন্যায় মানবসাধারণের সর্ব্বক্ষণ হইতেছে। দেহস্থ থাকিয়াও বিদেহভাবসম্পন্ন অবতার ও জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের অদ্বৈত-ভূমিতে অবস্থান জীবনের অনেক সময় হওয়ায় নিম্নের দ্বৈত-ভূমিতে অবস্থানকালে জগৎটাকে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা বলিয়া

* শারীরক ভাষ্যে অধ্যাসনিরূপণ দেখ

ধারণা হইয়া থাকে। কিন্তু জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনায় স্বপ্ন, মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইলেও স্বপ্নসন্দর্শনকালে যেমন উহাকে এককালে মিথ্যা বলা যায় না, জীবন্মুক্ত ও অবতার পুরুষদিগের মনের জগদাভাসকেও সেইরূপ এককালে মিথ্যা বলা চলে না।

জগৎরূপ পদার্থটাকে পূর্ব্বোক্ত দুই ভূমি হইতে যেমন দুই ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি আবার, উহার অন্তর্গত কোন ব্যক্তিবিশেষকেও ঐরূপে, দুই ভাবভূমি হইতে দুই প্রকারে দেখা গিয়া থাকে। দ্বৈত-ভাবভূমি হইতে দেখিলে ঐ ব্যক্তিকে বদ্ধমানব এবং পূর্ণ অদ্বৈত-ভূমি হইতে দেখিলে তাহাকে নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হয়। পূর্ণ অদ্বৈত-ভূমি ভাবরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ প্রদেশ। উহাতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে মানব মন উচ্চ উচ্চতর নানা ভাব-ভূমির ভিতর দিয়া উঠিয়া পরিশেষে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হয়। ঐ সকল উচ্চ উচ্চতর ভাব-ভূমিতে উঠিবার কালে জগৎ ও তদন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধকের নিকট প্রতীয়মান হইতে থাকিয়া উহাদের সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব ধারণা নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যথা—জগৎটাকে ভাবময় বলিয়া বোধ হয়; অথবা, ব্যক্তিবিশেষকে শরীর হইতে পৃথক্, অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তিশালী, মনোময় বা দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ইত্যাদি বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

উচ্চতর ভাবভূমি হইতে জগৎ সম্বন্ধে ভিন্ন উপলব্ধি।

অবতার পুরুষদিগের নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তি সম্পন্ন হইয়া উপস্থিত হইলে সাধারণ মানব অজ্ঞাতসারে পূর্ব্বোক্ত উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া থাকে। অবশ্য, তাঁহাদিগের বিচিত্র শক্তিপ্রভাবেই তাহাদিগের ঐ প্রকার আরোহণসামর্থ্য উপস্থিত

অবতার পুরুষদিগের শক্তিতে মানব উচ্চভাবে উঠিয়া তাঁহাদিগকে মানবভাবপরিশূন্য দেখে।

হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে,ঐ সকল উচ্চভূমি হইতে তাঁহাদিগকে ঐরূপ বিচিত্রভাবে দেখিতে পাইয়াই ভক্ত সাধক তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ধারণা করিয়া বসেন যে, বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন দিব্যভাবই তাঁহাদিগের যথার্থ স্বরূপ এবং ইতরসাধারণে তাঁহাদিগের ভিতরে যে মানবভাব দেখিতে পায় তাহা তাঁহারা মিথ্যাভাণ করিয়া তাহা-দিগকে দেখাইয়া থাকেন। ভক্তির গভীরতার সঙ্গে ভক্ত সাধকের প্রথমে, ঈশ্বরের ভক্ত সকলের সম্বন্ধে, এবং পরে, ঈশ্বরের জগৎ সম্বন্ধে, ঐরূপ ধারণা হইতে দেখা গিয়া থাকে।

অবতার পুরুষদিগের মনের ক্রমোন্নতি। জীব ও অবতারের শক্তিরই প্রভেদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়া ভাব-রাজ্যে দৃষ্ট বিষয় সকলে, জগতে প্রতিনিয়ত পরিদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ন্যায় দৃঢ় অস্তিত্বা-নুভব, অবতার পুরুষসকলের জীবনে শৈশব কাল হইতে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে, দিনের পর যতই দিন যাইতে থাকে এবং ঐরূপ দর্শন তাঁহাদিগের জীবনে বারম্বার যত উপস্থিত হইতে থাকে তত তাঁহারা স্থূল,বাহ্য জগতের অপেক্ষা ভাবরাজ্যের অস্তিত্বেই সমধিক বিশ্বাসবান হইয়া পড়েন। পরিশেষে, সর্ব্বোচ্চ অদ্বৈতভাব-ভূমিতে উঠিয়া যে একমেবাদ্বিতীয়ং বস্তু হইতে নানা নাম-রূপময় জগতের বিকাশ হইয়াছে তাহার সন্ধান পাইয়া তাঁহারা সিদ্ধকাম হন। জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ হইয়া থাকে। তবে অবতার পুরুষেরা অতি স্বল্পকালে যে সত্যে উপনীত হন তাহা উপলব্ধি করিতে তাঁহাদিগের আজীবন চেষ্টার আবশ্যক হয়। অথবা—স্বয়ং স্বল্পকালে অদ্বৈত ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিলেও অপরকে ঐ ভূমিতে আরোহণ করাইয়া দিবার শক্তি তাঁহাদিগের ভিতর, অবতার পুরুষদিগের সহিত তুলনায় অতি অল্পমাত্রই

প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক শিক্ষা স্মরণ কর—"জীব ও অবতারে, শক্তির প্রকাশ লইয়াই প্রভেদ।"

অবতার—দেব-মানব, সর্ব্বজ্ঞ।

অদ্বৈত-ভূমিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া জগৎ-কারণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে পরিতৃপ্ত হইয়া অবতার পুরুষেরা যখন পুনরায় মনের নিম্ন ভূমিতে অবরোহণ করেন তখন সাধারণ দৃষ্টিতে মানব মাত্র থাকিলেও তাঁহারা যথার্থই অমানব বা দেবমানব পদবী প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহারা জগৎ ও তৎকারণ উভয় পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনায় বাহ্যান্তর জগৎটার ছায়ার ন্যায় অস্তিত্ব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনুভব করিতে থাকেন। তখন তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া মনের অসাধারণ উচ্চশক্তিসমূহ স্বতঃ লোকহিতায় নিত্য প্রকাশিত হইতে থাকে এবং জগতে পরিদৃষ্ট সকল পদার্থের আদি, মধ্য ও অন্ত সম্যক্ অবগত হইয়া তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। ক্ষুদ্র মানব আমরা, তখনই তাঁহাদিগের অলৌকিক চরিত্র ও চেষ্টাদি প্রত্যক্ষ করি এবং তাঁহাদিগের অমৃতময়ী বাণীতে আশান্বিত হইয়া এ কথার আভাস পাইয়া থাকি যে —বহির্মুখী বৃত্তি লইয়া বাহ্যজগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তি সকলের অবলম্বনে যথার্থ সত্যলাভ, বা জগৎ-কারণের অনুসন্ধান ও শান্তিলাভ, কখনই সফল হইবার নহে।

বহির্মুখী বৃত্তি লইয়া জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় জগৎ-কারণের জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

পাশ্চাত্যবিদ্যা-পারদর্শী পাঠক বলিবেন—এইবারেই মাটি; এইবারেই কূপমণ্ডুকের মত কথাটা বলিয়া আপনার পক্ষটা দুর্ব্বল করিলে, আর কি! বাহ্যজগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে আজকাল মানবের জ্ঞান কতদূর উন্নত হইয়াছে ও প্রতিদিন হইতেছে তাহা যে দেখিয়াছে

সে ঐরূপ কথা কথনই বলিতে পারিত না। উত্তরে আমরা বলি—জড়বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ তাহা সত্য হইলেও উহা দ্বারা পূর্ণ-সত্য লাভ তোমাদের কথনই সাধিত হইবে না। কারণ, জগৎ-কারণকে তোমরা জড় অথবা তোমাদের অপেক্ষাও অধম, নিকৃষ্ট দরের বস্তু, বলিয়া ধারণা করিয়া বসিয়া আছ এবং বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা তোমরা অধিকতর রূপরসাদি ভোগলাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছ। অতএব একমাত্র জড় বস্তু হইতে জগতের অন্যান্য নানা জড় ও চৈতন্যময় বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে একথা যন্ত্রসহায়ে কোনকালে প্রমাণ করিতে পারিলেও অন্তররাজ্যের বিষয়সকল তোমাদিগের নিকট চিরকালই অপ্রমাণিত থাকিবে। ভোগবাসনাত্যাগ, ও অন্তর্মুর্খীবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার ভিতর দিয়াই মানবের মুক্তিলাভের পথ, একথা যতদিন না হৃদয়ঙ্গম হইবে ততদিন তোমাদিগের দেশকালাতীত অখণ্ড সত্যলাভ হইবে না, শান্তিলাভও হইবে না।

অবতার পুরুষদিগের আশৈশব ভাবতন্ময়ত্ব।

ভাবরাজ্যের বিষয় লইয়া আশৈশব সময়ে সময়ে তন্ময় হইয়া যাইবার কথা সকল অবতার পুরুষের জীবনেই শুনিতে পাওয়া যায়। দেখনা—শ্রীকৃষ্ণ, বাল্যকালেই সময়ে সময়ে স্বীয় দেবত্বের পরিচয় নানাভাবে নিজ পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধবদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছেন; বুদ্ধ, বাল্যেই উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া বোধিদ্রুমতলে সমাধিস্থ হইয়া দেবতা ও মানবের নয়নাকর্ষণ করিতেছেন; ঈশা, প্রেমে বন্য পক্ষীদিগকে আকর্ষণ করিয়া বাল্যে, নিজ হস্তে খাওয়াইতেছেন; শঙ্কর, স্বীয় মাতাকে দিব্য-শক্তি প্রভাবে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করিয়া বাল্যেই সংসার ত্যাগ করিতেছেন; এবং চৈতন্য বাল্যেই দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া,

ঈশ্বর-প্রেমিক হেয় উপাদেয় সকল বস্তুর ভিতরেইঈশ্বর-প্রকাশ দেখিতে পান, একথার আভাস দিতেছেন। ঠাকুরের জীবনেও ঐ বিষয়ের অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁহার শৈশবকালের কয়েকটী ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। ঘটনাগুলি ঠাকুরের নিজ মুখেই আমরা শুনিয়াছিলাম, এবং বুঝিয়াছিলাম, ভাবরাজ্যে প্রথম তন্ময় হওয়া তাঁহার অতি অল্প বয়সেই হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন—

ঠাকুরের ছয় বৎসর বয়সে প্রথম ভাবাবেশের কথা।

"ওদেশে (কামারপুকুরে) ছেলেদের ছোট ছোট টেকোয় * করে মুড়ি খেতে দেয়। যাদের ঘরে টেকো নাই তারা কাপড়েই মুড়ি খায়। আবার কেঁউ টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে ছেলেরা পথে মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়। তখন ছয় কি সাত বছর বয়স হবে; একদিন টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠেরআল্-পথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্চি। সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস, আকাশে একটা দিকে কাল সুন্দর একখানা জলভরা মেঘ উঠেছে। তাই দেখ্‌ছি ও খাচ্চি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘখানা আকাশ ছেয়ে ফেল্‌চে, এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মত বক ঐ মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে এমন এক বাহার হোলো!—তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তে অপূর্ব্বভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হোলো যে, আর হুঁস্ রইলো না! পড়ে গেলুম্—মুড়িগুলি আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। লোকে দেখ্‌তে পেয়ে ধরাধরি ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁস্ হয়ে যাই।"

* চুবড়ি।

ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরের এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে আনুড় নামে গ্রাম। আনুড়ের বিষলক্ষ্মী * জাগ্রতাদেবী। চতুঃপার্শ্বস্থ দূর দূরান্তরের গ্রাম হইতে গ্রামবাসিগণ নানা প্রকার কামনা পূরণের জন্য দেবীর উদ্দেশে পূজা মানত্ করে এবং অভীষ্টসিদ্ধি হইলে যথাকালে আসিয়া পূজা বলি প্রভৃতি দিয়া যায়। অবশ্য, আগন্তুক যাত্রীদিগের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক হয়, এবং রোগশান্তির কামনাই অন্যান্য কামনা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোককে এখানে আকৃষ্ট করে। দেবীর প্রথমাবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধীয় গল্প ও গান করিতে করিতে সদ্বংশজাতা গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে প্রান্তর পার হইয়া দেবীদর্শনে আগমন করিতেছেন —এ দৃশ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের বাল্যকালে কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম যে বহুলোকপূর্ণ এবং এখন

৮ বিশালাক্ষী দর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুরের দ্বিতীয় ভাবাবেশের কথা।

* উক্ত দেবীর নাম বিষ-লক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী তাহা স্থির করা কঠিন। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে মনসা দেবীর অন্য নাম বিষহরী দেখিতে পাওয়া যায়। বিষহরী শব্দটী বিষ-লক্ষ্মীতে পরিণত সহজেই হইতে পারে। আবার মনসা-মঙ্গলাদি গ্রন্থে মনসা দেবীর রূপ বর্ণনায় বিশালাক্ষী শব্দেরও প্রয়োগ আছে। অতএব মনসা দেবীই সম্ভবতঃ বিষ-লক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী নামে অভিহিতা হইয়া এখানে লোকের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী দেবীর পূজা রাঢ়ের অন্যত্র অনেক স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়। কামারপুকুর হইতে ঘাটাল আসিবার পথে একস্থলে আমরা উক্ত দেবীর একটী সুন্দর মন্দির দেখিয়াছিলাম। মন্দির সংলগ্ন নাট্য মন্দির, পুষ্করিণী, বাগিচা প্রভৃতি দেখিয়া ধারণা হইয়াছিল, এখানে পূজার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

অপেক্ষা অনেক অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহার নিদর্শন, জনশূন্য জঙ্গলপূর্ণ ভগ্ন ইষ্টকালয়, জীর্ণ পতিত দেবমন্দির ও রাস-মঞ্চ প্রভৃতি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেজন্য আমাদের অনুমান, আনুড়ের দেবীর নিকট তখন যাত্রীসংখ্যাও অনেক অধিক ছিল।

প্রান্তর মধ্যে শূন্য অম্বরতলেই দেবীর অবস্থান, বর্ষাতপাদি হইতে রক্ষার জন্য কৃষকেরা সামান্য পর্ণাচ্ছাদন মাত্র বৎসর বৎসর করিয়া দেয়। ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির যে এককালে বর্ত্তমান ছিল তাহার পরিচয় পার্শ্বের ভগ্নস্তূপে পাওয়া যায়। গ্রামবাসীদিগকে উক্ত মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে—দেবী স্বেচ্ছায় উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন! বলে—

গ্রামের রাখাল বালকগণ দেবীর প্রিয় সঙ্গী; প্রাতঃকাল হইতে তাহারা এখানে আসিয়া গরু ছাড়িয়া দিয়া বসিবে, গল্প গান করিবে, খেলা করিবে, বনফুল তুলিয়া তাঁহাকে সাজাইবে এবং দেবীর উদ্দেশে যাত্রী বা পথিকপ্রদত্ত মিষ্টান্ন ও পয়সা নিজেরা গ্রহণ করিয়া আনন্দ করিবে—এ সকল মিষ্ট উপদ্রব না হইলে তিনি থাকিতে পারেন না! এক সময়ে কোন গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির অভীষ্ট পূরণ হওয়ায় সে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয় এবং দেবীকে উহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা করে। পুরোহিত সকাল সন্ধ্যা, নিত্য যেমন আসে, আসিয়া পূজা করিয়া মন্দির দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল এবং পূজার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে, যে সকল দর্শনাভিলাষী আসিতে লাগিল তাহারা, দ্বারের জাফ্রির রন্ধ্রমধ্য দিয়া দর্শনী প্রণামী মন্দিরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যাইতে থাকিল। কাজেই কৃষাণ বালকদিগের আর পূর্ব্বের ন্যায় ঐ সকল পয়সা আত্মসাৎ করা ও মিষ্টান্নাদি

ক্রয় করিয়া দেবীকে একবার দেখাইয়া ভোজন ও আনন্দ করার সুবিধা রহিল না। তাহারা ক্ষুণ্নমনে মাকে জানাইল—মা মন্দিরে ঢুকিয়া আমাদের খাওয়া বন্ধ করিলি? তোর দৌলতে নিত্য লাড্ডু মোয়া খাইতাম, এখন আমাদের আর ঐ সকল কে খাইতে দিবে?

গ্রামবাসীরা বলে—সরল কৃষাণ বালকদিগের ঐ অভিযোগ দেবী শুনিলেন এবং ঐ রাত্রেই ঐ মন্দির এমন ফাটিয়া গেল যে পরদিন ঠাকুর চাপা পড়িবার ভয়ে পুরোহিত শশব্যস্তে দেবীকে পুনরায় বাহিরে অম্বরতলে আনিয়া রাখিল! তদবধি যে কেহ পুনরায় মন্দির নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছে, তাহা-দিগকেই দেবী স্বপ্নে বা অন্য নানা উপায়ে জানাইয়াছেন ঐ কর্ম্ম তাঁহার অভিপ্রেত নয়। গ্রামবাসীরা বলে—তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও মা ভয় দেখাইয়াও নিরস্ত করিয়াছেন!—স্বপ্নে বলিয়া-ছেন, "আমি রাখাল বালকদের সঙ্গে মাঠের মাঝে বেশ আছি; মন্দির মধ্যে আমায় আবদ্ধ করলে তোর সর্ব্বনাশ কোরবো—বংশে কাহাকেও জীবিত রাখ্‌বো না।"

ঠাকুরের আট বৎসর বয়স—এখনও উপনয়ন হয় নাই। গ্রামের ভদ্রঘরের অনেকগুলি স্ত্রীলোক একদিন দলবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে ৺বিশালাক্ষী দেবীর মানত্ শোধ করিতে মাঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের নিজ পরিবারের দুই একজন স্ত্রীলোক এবং গ্রামের জমিদার ধর্ম্মদাস লাহার বিধবা ভগ্নী প্রসন্নও ইঁহা-দের সঙ্গে ছিলেন। প্রসন্নের সরলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, পবিত্রতা ও অমায়িকতা সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চধারণা ছিল। সকল বিষয় প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পরামর্শ মত চলিতে ঠাকুর, মাতা-ঠাকুরাণীকে অনেকবার বলিয়াছিলেন এবং প্রসন্নের কথা সময়ে সময়ে নিজ স্ত্রীভক্তদিগকেও বলিতেন। প্রসন্নও ঠাকুরকে বালক-

কাল হইতে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহাকে যথার্থ গদাধর বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। সরলা স্ত্রীলোক গদাধরের মুখে ঠাকুর দেবতার পুণ্য কথা এবং ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হইয়া অনেকবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"হাঁ গদাই তোকে সময়ে সময়ে ঠাকুর বলে মনে হয় কেন বল্ দেখি? হাঁরে, সত্যি সত্যিই ঠাকুর মনে হয়!" গদাই শুনিয়া মধুর হাসি হাসিতেন কিন্তু কিছুই বলিতেন না; অথবা অন্য পাঁচ কথা পাড়িয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। প্রসন্ন সে সকল কথায় না ভুলিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন—"তুই যাই বলিস্ তুই কিন্তু মানুষ নোস্।" প্রসন্ন ৺রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিজ হস্তে নিত্য সেবার আয়োজন করিয়া দিতেন। পাল পার্ব্বনে ঐ মন্দিরে যাত্রা গান হইত। প্রসন্ন কিন্তু উহার অল্পই শুনিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"গদাইয়ের গান শুনে আর কোন গান মিঠে (মিষ্ট) লাগেনি—গদাই কান্ খারাপ করে দিয়ে গিয়েছে"—অবশ্য এ সকল অনেক পরের কথা।

স্ত্রীলোকেরা যাইতেছেন দেখিয়া বালক গদাই বলিয়া বসিলেন, 'আমিও যাইব।' বালকের কষ্ট হইবে ভাবিয়া স্ত্রীলোকেরা নানারূপে নিষেধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া গদাধর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। স্ত্রীলোকদিগেরও তাহাতে আনন্দ ভিন্ন বেজার বোধ হইল না। কারণ, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত রঙ্গরসপ্রিয় বালক কাহার না মন হরণ করে? তাহার উপর এই অল্প বয়সে গদাইয়ের ঠাকুর দেবতার গান ছড়া সব কণ্ঠস্থ। পথে চলিতে চলিতে তাঁহাদিগের অনুরোধে তাহার দুই চারিটা সে বলিবেই বলিবে। আর ফিরিবার সময় তাহার ক্ষুধা পাইলেও ক্ষতি নাই, দেবীর প্রসাদী নৈবেদ্য দুগ্ধাদি ত তাঁহাদিগের সঙ্গেই থাকিবে;

তবে আর কি ? গদাইয়ের সঙ্গে যাওয়ায় বিরক্ত হইবার কি আছে বল ? রমণীগণ ঐ প্রকার নানা কথা ভাবিয়া গদাইকে সঙ্গে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পথ বাহিয়া চলিলেন এবং গদাইও তাঁহারা যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর দেবতার গল্প গান করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে চলিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিশালাক্ষী দেবীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রান্তর পার হইবার পূর্ব্বেই এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। বালক গান করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবশ আড়ষ্ট হইয়া গেল, চক্ষে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল এবং 'কি অসুখ করিতেছে' বলিয়া তাঁহাদিগের বারম্বার সস্নেহ আহ্বানে সাড়া পর্য্যন্ত দিল না! পথ চলিতে অনভ্যস্ত, কোমল বালকের রৌদ্র লাগিয়া সর্দ্দি-গর্ম্মি হইয়াছে ভাবিয়া রমণীগণ বিশেষ শঙ্কিত হইলেন এবং সন্নিহিত পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া বালকের মস্তকে ও চক্ষে প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বালকের কোনরূপ সংজ্ঞার উদয় না হওয়ায় তাঁহারা এইবার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ভাবিলেন, এখন উপায় ?—দেবীর মানত্ পূজাই বা কেমন করিয়া দেওয়া হয় এবং পরের বাছা গদাইকে বা ভালয় ভালয় কিরূপে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়; প্রান্তরে জনমানব নাই যে সাহায্য করে—এখন উপায় ? স্ত্রীলোকেরা বিশেষ বিপন্না হইলেন এবং ঠাকুর দেবতার কথা ভুলিয়া বালককে ঘিরিয়া বসিয়া কখন ব্যজন, কখন জলসেক এবং কখন বা তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল এইরূপে গত হইলে প্রসন্নের প্রাণে সহসা উদয় হইল—বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই ত ?—

এইরূপ সরলপ্রাণ পবিত্র দেবভক্ত বালক ও স্ত্রী পুরুষদের উপরেই ত দেবদেবীর ভর হয়, শুনিয়াছি! প্রসন্ন সঙ্গী রমণীগণকে ঐকথা বলিলেন এবং এখন হইতে গদাইকে না ডাকিয়া একমনে ৺বিশালাক্ষীরই নাম করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসন্নের পুণ্যচারিত্রে তাঁহার উপর শ্রদ্ধা রমণীগণের পূর্ব্ব হইতেই ছিল, সুতরাং সহজেই ঐ কথায় বিশ্বাসিনী হইয়া এখন দেবীজ্ঞানে বালককেই সম্বোধন করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন—'মা বিশালাক্ষী প্রসন্না হও, মা রক্ষা কর, মা বিশালাক্ষী মুখ তুলে চাও, মা অকুলে কুল দাও!'

আশ্চর্য্য! রমণীগণ কয়েক বার ঐরূপে দেবীর নাম গ্রহণ করিতে না করিতেই গদাইয়ের মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং বালকের অল্প স্বল্প সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা গেল! তখন আশ্বাসিতা হইয়া তাঁহারা বালকশরীরে বাস্তবিকই দেবীর ভর হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও মাতৃ-সম্বোধনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। *

ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া বালক প্রকৃতিস্থ হইল এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, ইতিপূর্ব্বের ঐ রূপ অবস্থার জন্য তাহার শরীরে কোনরূপ অবসাদ বা দুর্ব্বলতা লক্ষিত হইল না। রমণীগণ তখন তাহাকে লইয়া ভক্তিগদ্গদচিত্তে ৺দেবীস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি পূজা দিয়া গৃহে ফিরিয়া ঠাকুরের মাতার নিকট সকল কথা আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি তাহাতে ভীতা হইয়া গদাইয়ের কল্যাণে সেদিন কুলদেবতা ৺রঘুবীরের বিশেষ পূজা

* কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে ভক্তির আতিশয্যে স্ত্রীলোকেরা বিশালাক্ষীর নিমিত্ত আনীত নৈবেদ্যাদিও বালককে ভোজন করিতে দিয়াছিলেন।

দিলেন এবং ৺বিশালাক্ষীর উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া তাঁহারও বিশেষ পূজা অঙ্গীকার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের আর একটী ঘটনা, বাল্যকাল হইতে তাঁহার মধ্যে মধ্যে উচ্চ ভাব ভূমিতে উঠিবার বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। ঘটনাটী এইরূপ হইয়াছিল—

কামারপুকুরে ঠাকুরের পিত্রালয় হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে কিয়দ্দূরে একঘর সুবর্ণ বণিক বাস করিত। পাইনরা যে, তখন বিশেষ শ্রীমান ছিল তৎপরিচয় তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত ইষ্টকনির্ম্মিত শিবমন্দিরে এখনও পাওয়া যায়। ঐ পরিবারের দুই একজন মাত্র এখন বাঁচিয়া আছে এবং ঘর দ্বার ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়াছে। গ্রামের লোকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় পাইনদের তখন কত শ্রীবৃদ্ধি ছিল, বাটীতে লোক ধরিত না এবং জমী জারাৎ চাষ বাস্ গরু লাঙ্গলও যেমন ছিল নিজেদের ব্যবসায়েও তেমনি বেশ দুপয়সা আয় ছিল। তবে পাইনরা গ্রামের জমিদারদের মত ধনাঢ্য ছিল না, মধ্যবিৎ গৃহস্থ শ্রেণীভুক্ত ছিল।

পাইনদের কর্ত্তা বিশেষ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। সমর্থ হইলেও নিজের বসত বাটীটী ইষ্টকনির্ম্মিত করিতে প্রয়াস পান নাই, বরাবর মাট-কোটাতেই† বাস করিতেন; দেবালয়টী কিন্তু ইষ্টক পোড়াইয়া বিশিষ্ট শিল্পী নিযুক্ত করিয়া সুন্দরভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কর্ত্তার নাম রসিক লাল ছিল, তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না; কন্যা অনেকগুলি ছিল এবং বিবাহিতা হইলেও সকলগুলিই, কি

শিবরাত্রিকালে শিব সাজিয়া ঠাকুরের তৃতীয় ভাবাবেশ।

† বাঁশ, কাঠ, খড়, মৃত্তিকা সহায়ে নির্ম্মিত দ্বিতল বাটীকে পল্লীগ্রামে "মাঠ-কোটা" বলে। ইহাতে ইষ্টকের সম্পর্ক থাকে না।

কারণে বলিতে পারি না, সর্ব্বদা পিত্রালয়েই বাস করিত। শুনিয়াছি, ঠাকুরের যখন দশ বার বৎসর বয়স তখন উহাদের সর্ব্ব-কনিষ্ঠা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কন্যাগুলি সকলেই রূপবতী ও দেবদ্বিজভক্তিপরায়ণা ছিল এবং প্রতিবেশী বালক গদাইকে বিশেষ স্নেহ করিত। ঠাকুর বাল্যকালে অনেক সময় এই ধর্ম্ম-নিষ্ঠ পরিবারের ভিতর কাটাইতেন এবং পাইনদের বাটীতে তাঁহার উচ্চ ভাব-ভূমিতে উঠিয়া অনেক লীলার কথা এখনও গ্রামে শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ঘটনাটী কিন্তু আমরা ঠাকুরের নিকটেই শুনিয়াছিলাম।

কামারপুকুরে বিষ্ণুভক্তি ও শিবভক্তি পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি না করিয়া বেশ পাশাপাশি চলিত বলিয়া বোধ হয়। এখনও শিবের গাজনের ন্যায় বৎসর বৎসর বিষ্ণুর চব্বিশ প্রহরী নাম-সংকীর্ত্তন সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে শিবমন্দির ও শিবস্থানের সংখ্যা, বিষ্ণু মন্দিরাপেক্ষা অধিক। সুবর্ণ বণিকদিগের ভিতর অনেকেই গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া থাকে; নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্ধারণ দত্তকে দীক্ষা দিয়া উদ্ধার করিবার পর হইতে ঐ জাতির ভিতর বৈষ্ণব মত বিশেষ প্রচলিত। কামারপুকুরের পাইনরা কিন্তু শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই ভক্ত ছিল। বৃদ্ধ কর্ত্তা পাইন, একদিকে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা হরিনাম যেমন করিতেন তেমনি আবার অন্যদিকে শিব প্রতিষ্ঠা এবং শিবরাত্রি ব্রত পালন করিতেন। রাত্রি জাগরণে সহায়ক হইবে বলিয়া ঐ ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রা গানের বন্দোবস্ত হইত।

একবার ঐরূপে শিবরাত্রি ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রার বন্দোবস্ত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামেরই দল, শিবমহিমাসূচক পালা গাহিবে, রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিবে। সন্ধ্যার সময়

সংবাদ পাওয়া গেল যাত্রার দলে যে বালক শিব সাজিয়া থাকে, তাহার সহসা কঠিন পীড়া হইয়াছে, শিব সাজিবার লোক বহু সন্ধানেও পাওয়া যাইতেছে না, অধিকারী হতাশ হইয়া অদ্যকার নিমিত্ত যাত্রা বন্ধ রাখিতে মিনতি করিয়া পাঠাইয়াছেন! এখন উপায়? শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণ কেমন করিয়া হয়? বৃদ্ধেরা পরামর্শ করিতে বসিলেন এবং অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, শিব সাজিবার লোক দিলে তিনি অদ্য রাত্রে যাত্রা করিতে পারিবেন কি না। উত্তর আসিল, শিব সাজিবার লোক পাইলে পারিব। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ আবার পরামর্শ জুড়িল, শিব সাঁজিতে কাহাকে অনুরোধ করা যায়। স্থির হইল, গদাইয়ের বয়স অল্প হইলেও সে অনেক শিবের গান জানে এবং শিব সাজিলে তাহাকে দেখাইবেও ভাল, তাহাকেই বলা যাক্। তবে শিব সাজিয়া একটু আধটু কথাবার্ত্তা কহা, তাহা অধিকারী স্বয়ং কৌশলে চালাইয়া লইবে। গদাধরকে বলা হইল, সকলের আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঐ কার্য্যে সম্মত হইলেন। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কথামত রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিল।

গ্রামের জমীদার ধর্ম্মদাস লাহার, ঠাকুরের পিতার সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ থাকায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাবিষ্ণু লাহা ও ঠাকুর উভয়ে 'স্যাঙাৎ' পাতাইয়া ছিলেন। 'স্যাঙাৎ' শিব সাজি-বেন জানিয়া গঙ্গাবিষ্ণু ও তাঁহার দলবল মিলিয়া ঠাকুরের অনুরূপ বেশ ভূষা করিয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শিব সাজিয়া সাজঘরে বসিয়া শিবের কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার আসরে ডাক পড়িল এবং তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে জনৈক পথ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে আসরের দিকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইল। বন্ধুর আহ্বানে ঠাকুর উঠিলেন এবং কেমন উন্মনাভাবে কোনদিকে

লক্ষ্য না করিয়া ধীর মন্থর গতিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ঠাকুরের সেই জটাজটিল বিভূতি-মণ্ডিত বেশ, সেই ধীর স্থির পাদক্ষেপ ও পরে অচল অটল স্থিতি এবং বিশেষতঃ সেই অপার্থিব অন্তর্মুখী নির্নিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখিয়া লোকে কি এক অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় দিব্য ভাব উপলব্ধি করিয়া আনন্দে বিস্ময়ে পল্লীগ্রামের প্রথামত উচ্চরবে হরি ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রমণীগণের কেহ কেহ উলুধ্বনি এবং কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর সকলকে স্থির করিবার জন্য অধিকারী ঐ গোলযোগের ভিতরেই শিবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শ্রোতারা কথঞ্চিৎ স্থির হইল বটে কিন্তু পরস্পরে ইসারা ও গা ঠেলিয়া, 'বাহবা, বাহবা গদাইকে কি সুন্দর দেখাইতেছে, ছোঁড়া শিবের পালাটা এত সুন্দর কর্‌তে পার্‌বে তা কিন্তু ভাবিনি, ছোঁড়াকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদের একটা যাত্রার দল কর্‌লে হয়,' ইত্যাদি—নানা কথা অনুচ্চস্বরে চলিতে লাগিল। গদাধর কিন্তু তখনও সেই একই ভাবে দণ্ডায়মান, অধিকন্তু তাঁহার বক্ষ বহিয়া অবিরত নয়নাশ্রু পতিত হইতেছে! এইরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে গদাধর তখনও স্থান পরিবর্ত্তন বা বলা কহা কিছুই করিতেছেন না দেখিয়া অধিকারী ও পল্লীর বৃদ্ধ দুই এক জন বালকের নিকটে গিয়া দেখেন তাহার হস্ত পদ অসাড়—বালক সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য! তখন গোলমাল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। কেহ বলিল—জল, জল, চোখে মুখে জল দাও; কেহ বলিল, বাতাস কর; কেহ বলিল—শিবের ভর হয়েচে, নাম কর; আবার কেহ বলিল—ছোঁড়াটা রস ভঙ্গ কর্‌লে, যাত্রাটা আর শোনা হোলো না দেখ্‌চি! যাহা হউক, বালকের কিছুতেই সংজ্ঞা হইতেছে না

দেখিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং গদাধরকে কাঁধে লইয়া কয়েক জন কোনরূপে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। শুনিয়াছি, সে রাত্রে গদাধরের সে ভাব বহু প্রযত্নেও ভঙ্গ হয় নাই এবং বাড়ীতে কান্নাকাটি উঠিয়াছিল। পরে সূর্য্যোদয় হইলে তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন।*

* কেহ কেহ বলেন তিনি তিন দিন সমভাবে ঐ অবস্থায় ছিলেন

তৃতীয় অধ্যায়।

সাধকভাবের প্রথম বিকাশ।

ঠাকুরের বাল্যজীবনে ভাবতন্ময়তার পরিচায়ক অন্যান্য দৃষ্টান্ত।

ভাবতন্ময়তা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি ভিন্ন আরও অনেক কথা ঠাকুরের বাল্যজীবনে শুনিতে পাওয়া যায়। ছোট খ অনেক বিষয়ে তাঁহার মনের ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় আমরা সময়ে সময়ে পাইয়া থাকি।

যেমন—গ্রামের কুম্ভকার শিব দুর্গাদি দেবদেবীর প্রতিমা গড়িতেছে, বয়স্যবর্গের সহিত যথা ইচ্ছা বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর তথায় আগমন করিয়া মূর্ত্তিগুলি দেখিতে দেখিতে সহসা বলিলেন—'এ কি হইয়াছে? দেব-চক্ষু কি এইরূপ হয়?—এই ভাবে আঁকিতে হয়'—বলিয়া যে ভাবে টান দিয়া অঙ্কিত করিলে চক্ষে অমানব শক্তি, করুণা অন্তর্মুখীনতা ও আনন্দের একত্র সমাবেশ উপস্থিত হইয়া মূর্ত্তিগুলিকে জীবন্ত দেবভাব-সম্পন্ন করিয়া তুলিবে তাহাকে তদ্বিষয় বুঝাইয়া দিলেন! বালক গদাধর কখনও শিক্ষালাভ না করিয়া কেমন করিয়া ঐ কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইল, সকলে অবাক হইয়া তাহা ভাবিতে থাকিল এবং ঐ বিষয়ের কারণ খুঁজিয়া পাইল না!

যেমন—ক্রীড়াচ্ছলে বয়স্যদিগের সহিত কোন দেববিশেষের পূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুর স্বহস্তে ঐ মূর্ত্তি এমন সুন্দর ভাবে গড়িলেন, বা আঁকিলেন যে লোকে দেখিয়া উহা দক্ষ কুম্ভকার বা পটুয়ার কার্য্য বলিয়া স্থির করিল!

যেমন—অযাচিত অতর্কিতভাবে কোন ব্যক্তিকে এমন কোন কথা বলিলেন যাহাতে তাহার মনোগত বহুকালের সন্দেহ-বিশেষ মিটিয়া গেল বা সে তাহার ভাবী জীবন নিয়মিত করিবার বিশেষ সন্ধান ও শক্তি লাভ করিয়া স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিল, বালক গদাইকে আশ্রয় করিয়া তাহার আরাধ্য দেবতা কি করুণায় তাহাকে ঐরূপে পথ দেখাইলেন!

যেমন—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না, বালক গদাই তাহা এক কথায় মিটাইয়া দিলেন ও সকলকে চমৎকৃত করিলেন।*

ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল ঘটনার ছয় প্রকার শ্রেণীনির্দ্দেশ।

ঠাকুরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে ঐরূপ যে সকল অদ্ভুত ঘটনা আমরা শুনিয়াছি তাহার সকলগুলিই যে তাঁহার অনন্যসাধারণ উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ করিয়া দিব্যশক্তি প্রকাশের পরিচায়ক, তাহা নহে। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ঐরূপ হইলেও অপর সকল গুলিকে আমরা সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। উহাদিগের কতকগুলি তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতির, কতকগুলি প্রবল বিচারবুদ্ধির, কতকগুলি বিশেষ নিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার, কতকগুলি অসীম সাহসের, কতকগুলি রঙ্গরসপ্রিয়তার, এবং কতকগুলি অপার প্রেম বা করুণার পরিচায়ক। পূর্ব্বোক্ত সকল শ্রেণীর সকল ঘটনাবলীর ভিতরেই কিন্তু তাঁহার মনের অসাধারণ বিশ্বাস, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা ওতপ্রোতপ্রভাবে জড়িত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়,—বিশ্বাস, পবিত্রতা ও স্বার্থহীনতা-রূপ উপাদানে তাঁহার মন যেন স্বভাবতঃ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়, ১২৬ পৃষ্ঠা দেখ।

সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাত উহাতে স্মৃতি, বুদ্ধি, প্রতিজ্ঞা, সাহস, রঙ্গরস, প্রেম ও করুণার তরঙ্গসমূহের সময়ে সময়ে উদয় করিতেছে। কয়েকটী দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা সম্যকরূপে ধারণা করিতে পারিবেন।

অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির দৃষ্টান্ত।

পল্লীতে রাম বা কৃষ্ণযাত্রা হইয়াছে, অন্যান্য লোকের সহিত বালক গদাধরও তাহা শুনিয়াছে; ঐসকল পবিত্র পুরাণকথা ও গানের বিষয় ভুলিয়া পরদিন যে যাহার স্বার্থচেষ্টায় লাগিয়াছে। কিন্তু বালক গদাইয়ের মনে উহা যে ভাবতরঙ্গ তুলিয়াছে তাহার বিরাম নাই; বালক ঐ সকলের পুনরাবৃত্তি করিয়া আনন্দোপভোগের জন্য বয়স্যবর্গকে সমীপস্থ আম্রকাননে একত্র করিয়াছে এবং উহাদিগের প্রত্যেককে পালার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা যথাসম্ভব আয়ত্ত করাইয়া ও আপনি প্রধান চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া উহার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে! সরল কৃষাণ পার্শ্বের ভূমিতে চাষ দিতে দিতে বালকদিগের ঐরূপ ক্রীড়া দর্শনে মুগ্ধহৃদয়ে ভাবিতেছে একবার মাত্র শুনিয়া পালাটীর প্রায় সমগ্র কথা ও গানগুলি উহারা এরূপে আয়ত্ত করিল কিরূপে?

দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত।

উপনয়নকালে বালক, আত্মীয় স্বজন এবং সমাজপ্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে ধরিয়া বসিল, কর্ম্মকারজাতীয়া ধনী নাম্নী কামিনীকে ভিক্ষামাতা স্বরূপে বরণ করিবে!* অথবা, ধনীর স্নেহ ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া এবং তাহার হৃদয়ের অভিলাষ জানিতে পারিয়া বালক সামাজিক শাসনের কথা ভুলিয়া ঐ নীচ জাতীয়া রমণীর স্বহস্ত-পক্ক ব্যঞ্জনাদি কাড়িয়া খাইল!—ধনীর ভীতি-প্রসূত

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায় ১৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

সাগ্রহ নিষেধ বালককে ঐ কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিল না।

বিভূতিমণ্ডিত জটাধারী নাগা ফকীর দেখিলে সহর বা পল্লীগ্রামের সকল বালকের হৃদয়ে সর্ব্বদা ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐরূপ ফকীরেরা অল্পবয়স্ক বালকদিগকে নানারূপে ভুলাইয়া অথবা, সুযোগ পাইলে বলপ্রয়োগ করিয়া দূরদেশে লইয়া যাইয়া দলপুষ্টি করে এরূপ কিম্বদন্তি বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত। কামারপুকুরের দক্ষিণ প্রান্তে ৺পুরীধামে যাইবার যে পথ আছে সেই পথ দিয়া তখন তখন নিত্য ঐরূপ সাধু ফকীর বৈরাগী বাবাজীর দল যাওয়া আসা করিত এবং গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আহার্য্য সংগ্রহপূর্ব্বক দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইত। কিম্বদন্তিতে ভীত হইয়া বয়স্যগণ দূরে পলাইলেও বালক গদাই ভীত হইবার পাত্র ছিল না। ঐরূপ ফকীরের দল দেখিলেই তাহাদিগের সহিত মিশিয়া মধুরালাপ ও সেবায় তাহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া তাহাদের আচারব্যবহার তন্ন তন্নভাবে লক্ষ্য করিবার জন্য অনেক কাল তাহাদের সঙ্গে কাটাইত। কোন' কোন দিন তাহাদিগের সপ্রেমাহ্বানে দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত তাহাদিগের অন্ন খাইয়া বালক বাটীতে ফিরিত এবং মাতার নিকট ঐ বিষয়ে গল্প করিত। তাহাদিগের প্রতি অনুরাগবশতঃ বৈরাগীবেশধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া বালক একদিন সর্ব্বাঙ্গ তিলকাঙ্কিত করিয়া পিতা' মাতা প্রদত্ত নূতন বসনখানি ছিঁড়িয়া কৌপীন ও বহির্বাসরূপে ধারণ করিয়া বাটীতে জননীর নিকট আগমন করিয়াছিল!

অসীম সাহসের দৃষ্টান্ত।

গ্রামের নীচ জাতিদের ভিতর অনেকে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে জানিত না! ঐ সকল গ্রন্থ শুনিবার ইচ্ছা

হইলে তাহারা পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এমন কোন ব্রাহ্মণ বা স্বশ্রেণীর লোককে আহ্বান করিত এবং ঐ ব্যক্তি আগমন করিলে ভক্তিপূর্ব্বক পদ ধৌত করিবার জল, নূতন হুঁকায় তামাকু এবং উপবেশন করিয়া পাঠ করিবার জন্য উত্তম আসন বা তদভাবে নূতন একখানি মাদুর প্রদান করিত। ঐরূপে সম্মানিত হইয়া সে ব্যক্তি ঐকালে অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইয়া শ্রোতাদিগের নিকটে কিরূপ উচ্চাসন গ্রহণ করিত এবং কত প্রকার বিসদৃশ অঙ্গভঙ্গী ও সুরে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে আপন প্রাধান্য জ্ঞাপন করিত, তীক্ষ্ণবিচারসম্পন্ন রঙ্গরসপ্রিয় বালক ঐস্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাহা লক্ষ্য করিত এবং সময়ে সময়ে অপরের নিকট গম্ভীরভাবে উহার অভিনয় করিয়া হাস্য কৌতুকের রোল ছুটাইয়া দিত।

রসরঙ্গপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত।

ঠাকুরের বাল্যজীবনের ঐ সকল কথার আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি তিনি কিরূপ মন লইয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুঝিতে পারি যে, ঐরূপ মন, যাহা ধরিবে তাহা করিবেই করিবে, যাহা শুনিবে তাহা কখনও ভুলিবে না এবং অভীষ্টলাভের পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া বুঝিবে সবলহস্তে তাহা তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিতে পারি যে, ঐরূপ হৃদয়, ঈশ্বরের উপর, আপনার উপর এবং মানবসাধারণের অন্তর্নিহিত দেবপ্রকৃতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারের সকল কার্য্যে অগ্রসর হইবে, নীচ অপবিত্র ভাবসমূহ ত দূরের কথা—সঙ্কীর্ণতার স্বল্পমাত্র গন্ধও যে সকল ভাবে অনুভূত হইবে কখনই তাহাকে উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং পবিত্রতা প্রেম ও করুণাই

ঠাকুরের মনের স্বাভাবিক গঠন।

কেবল উহাকে সর্ব্বকাল সর্ব্ব বিষয়ে নিয়মিত করিবে। আবার ঐ সঙ্গে একথাও হৃদয়ঙ্গম হয় যে, আপনার বা অন্যের অন্তরের কোন ভাবই আপন আকার লুক্কায়িত রাখিয়া ছদ্মবেশে ঐরূপ হৃদয়মনকে কখনও প্রতারিত করিতে পারিবে না। ঠাকুরের হৃদয়মনের ঐরূপ গঠনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইলে তবেই আমরা তাঁহার সাধকজীবনের অনুষ্ঠান-সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।

সাধকভাবের প্রথম প্রকাশ—'চাল কলা বাঁধা বিদ্যা শিখিব না, যাহাতে যথার্থ জ্ঞান হয় সেই বিদ্যা শিখিব'।

সাধকভাবের প্রথম বিকাশ ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখিতে পাই কলিকাতায়, তাঁহার ভ্রাতার চতুষ্পাঠীতে—যেদিন বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইবার জন্য অগ্রজ রামকুমারের তিরস্কার ও অনুযোগের উত্তরে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন—"চাল কলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাহি না; আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়!" ঠাকুরের বয়স তখন সতর বৎসর হইবে। গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া অভিভাবকেরা পরামর্শ স্থির করিয়া উহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়াছেন। ঝামাপুকুরে ৺দিগম্বর মিত্রের বাটীর সমীপে জ্যোতিষ এবং স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অগ্রজ তখন টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত মিত্র পরিবার ভিন্ন পল্লীর অপর কয়েকটী বর্দ্ধিষ্ণু ঘরে নিত্য দেবসেবার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক ছাত্রগণকে পাঠ দান করিতেই তাঁহার প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত, সুতরাং অপরের গৃহে দুই সন্ধ্যা নিত্য গমন করিয়া দেব-

সেবা যথারীতি সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে বিষম ভার হইয়া উঠিতেছিল। অথচ সহসা উহা ত্যাগ করিতেও পারিতেছিলেন না। কারণ, বিদায় আদায়ে টোলের যাহা উপসত্ত্ব হইত, তাহা অল্প, এবং দিন দিন হ্রাস ভিন্ন উহার বৃদ্ধি হইতেছিল না; এরূপ অবস্থায় দেবসেবার পারিশ্রমিক স্বরূপে যাহা পাইয়া থাকেন তাহা ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে কিরূপে? অতএব নানা তোলাপাড়ার পর কনিষ্ঠকে আনাইয়া তাহার উপর দেবসেবার ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং অধ্যাপনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। গদাধর এখানে আসিয়া নিজ মনোমত কর্ম্ম পাইয়া উহা সানন্দে সম্পন্ন করিতেছিলেন, এবং অগ্রজের সেবা ভিন্ন কিছু কিছু পাঠাভ্যাসও করিতেছিলেন।

কলিকাতায় ঝামাপুকুরে রামকুমারের টোলে বাসকালে ঠাকুরের আচরণ।

অশেষ গুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালক অল্পকালেই যজমান পবিবারবর্গ সকলের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও ঐ সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীগণ তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা, সরল ব্যবহার, মিষ্টালাপ এবং দেবভক্তি দর্শনে তাঁহার নিকট নিঃসঙ্কোচে আগমন করিতেছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা ছোট খাট 'ফাইফরমাস' করাইয়া লইতে এবং তাঁহার মধুর কণ্ঠের ভজন শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। এইরূপে কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও বালকের একটী আপনার দল বিনা চেষ্টায় গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বালকও অবসর পাইলেই ঐ সকল স্ত্রীপুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। সুতরাং এখানে আসিয়াও বালকের বিদ্যাশিক্ষার যে বড় একটা সুবিধা হইতেছিল না, একথা বুঝিতে পারা যায়।

রামকুমার পূর্ব্বোক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়াও ভ্রাতাকে সহসা কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না। কারণ, একে ত মাতার প্রিয় কনিষ্ঠকে তাঁহার স্নেহসুখে বঞ্চিত করিয়া এক প্রকার, নিজের সুবিধার জন্যই দূরে আনিয়াছেন তাহার উপর ভ্রাতার গুণে আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া সাদরে বাটীতে আহ্বান ও নিমন্ত্রণাদি করিতেছে, বালকও তাহাতে আনন্দিত, এ অবস্থায় বালকের আনন্দে বিঘ্নোৎপাদন করা কি যুক্তি-যুক্ত ?—এবং ঐরূপ করিলে বালকের কলিকাতাবাস কি বনবাস-তুল্য অসহ্য হইয়া উঠিবে না ? সংসারে অভাব না থাকিলে বালককে মাতার নিকট হইতে দূরে আনিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামান্তরে কোন মহো-পাধ্যায়ের নিকটে পড়িতে পাঠাইলেই চলিত। বালক তাহাতে মাতার নিকটে থাকিয়াই বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিত। ঐরূপ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া রামকুমার কয়েক মাস কোন কথা না বলিলেও পরিশেষে কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রেরণায় একদিন বালককে পাঠে মনোযোগী হইবার জন্য মৃদু তিরস্কার করিয়াছিলেন। কারণ—সরল, সর্ব্বদা আত্মহারা বালককে পরে ত সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে ? এখন হইতে যদি সে আপনার সাংসারিক অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয় এমন পথে আপনাকে নিয়মিত করিয়া চলিতে না শিখে তবে ভবিষ্যতে কি আর ঐরূপ করিতে পারিবে ? অতএব ভ্রাতৃবাৎসল্য এবং সংসারের অভিজ্ঞতাই যে, রামকুমারকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল একথা স্পষ্ট।

কিন্তু স্নেহপরবশ রামকুমার সংসারের স্বার্থপর কঠোর প্রথায় ঠেকিয়া শিখিয়া কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও নিজ কনিষ্ঠের অদ্ভুত মানসিক গঠন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। বালক

যে, এই অল্প বয়সেই সংসারী মানবের সর্ব্ববিধ চেষ্টার এবং আজীবন পরিশ্রমের কারণ ধরিতে পারিয়াছে, এবং দুই দিনের প্রতিষ্ঠা ও ভোগসুখলাভকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মানবজীবনের অন্য উদ্দেশ্য নিদ্ধারিত করিয়াছে, একথা তিনি স্বপ্নেও হৃদয়ে আনয়ন করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিরস্কারে বিচলিত না হইয়া সরল বালক যখন তাঁহাকে প্রাণের কথা পূর্ব্বোক্তরূপে খুলিয়া বলিল তখন তিনি বালকের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, পিতামাতার বহু আদরের বালক, জীবনে এই প্রথম তিরস্কৃত হইয়া অভিমান বা বিরক্তিতে ঐরূপ উত্তর প্রদান করিতেছে। সত্যনিষ্ঠ বালক তাঁহাকে আপন অন্তরের কথা বুঝাইতে সেদিন অনেক চেষ্টা পাইল, অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছেনা একথা নানাভাবে প্রকাশ করিল, কিন্তু বালকের সে কথা শুনে কে? বালক ত বালক, বয়োবৃদ্ধ কাহাকেও যদি কোনদিন আমরা স্বার্থচেষ্টায় পরাঙ্মুখ দেখি তবে গম্ভীরভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসি—তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে!

নিজ ভ্রাতার মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধে রামকুমারের অনভিজ্ঞতা।

বালকের ঐ সকল কথা রামকুমার সেদিন বুঝিলেন না। অধিকন্তু ভালবাসার পাত্রকে তিরস্কার করিয়া পরক্ষণে আমরা যেমন অনুতপ্ত হই এবং তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে আদর যত্ন করিয়া স্বয়ং শান্তিলাভ করিতে চেষ্টা করি, কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার প্রতিকার্য্যে ব্যবহার এখন কিছুকাল ঐরূপ হইয়া উঠিল। বালক গদাধর কিন্তু নিজ মনোগত অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য এখন হইতে যে, অবসর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এ বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার পর পর কার্য্য দেখিয়া বিশেষরূপে পাইয়া থাকি।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরের দুই বৎসরে ঠাকুর এবং তাঁহার অগ্রজের জীবনে পরিবর্ত্তনের প্রবাহ কিছু প্রবলভাবে চলিয়াছিল। অগ্রজের আর্থিক অবস্থা দিন দিন অবসন্ন হইতেছিল, এবং নানাভাবে চেষ্টা করিলেও তিনি কিছুতেই ঐ বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছিলেন না। টোল বন্ধ করিয়া অপর কোন কার্য্য স্বীকার করিবেন কি না তদ্বিষয়ে নানা তোলাপাড়াও তাঁহার মনোমধ্যে চলিতেছিল। কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তবে একথা মনে মনে বেশ বুঝিতেছিলেন, যে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের অন্য উপায় শীঘ্র গ্রহণ না করিয়া এরূপে দিন কাটাইলে পরিশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া নানা অনর্থ উপস্থিত হইবে। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন কবিবেন? যজন, যাজন, ও অধ্যাপন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই ত শিখেন নাই, এবং চেষ্টা করিয়া এখন যে, সময়োপযোগী কোন অর্থকরী বিদ্যা শিখিবেন সে উদ্যম উৎসাহই বা প্রাণে কোথায়? আবার, ঐরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথে অগ্রসর হইলে নিজ নিত্যক্রিয়া ও পূজাদি সম্পন্ন করিবার অবসর লাভ যে কঠিন হইবে, ইহাও বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং "যাহা করেন ৺রঘুবীর" বলিয়া ঐরূপ চিন্তা হইতে মনকে ফিরাইয়া যাহা এতকাল করিতেছিলেন তাহাই ভগ্নহৃদয়ে করিয়া যাইতে লাগিলেন। কারণ, ঈশ্বরবিশ্বাসী, সামান্যে সন্তুষ্ট, সাধুপ্রকৃতি রামকুমার বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ উদ্যমী পুরুষ ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সে যাহা হউক ঐরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে একটী ঘটনা ঈশ্বরেচ্ছায় রামকুমারকে পথ দেখাইয়া শীঘ্রই নিশ্চিন্ত করিয়াছিল।

রামকুমারের সাংসারিক অবস্থা।

চতুর্থ অধ্যায়।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী

সম্ভবতঃ সন ১২৫৬ সালে রামকুমার যখন কলিকাতায় চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর ছিল। সংসারের অভাব অনটন ঐ কালের কিছু পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে কিছু কিছু চিন্তিত করিয়াছিল এবং তাঁহার পত্নী একমাত্র পুত্র অক্ষয়কে প্রসবান্তে মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়াছিলেন। কথিত আছে সাধক রামকুমার তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর কথা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং পরিবারস্থ কাহাকেও কাহাকেও বলিয়াছিলেন, 'ও (তাঁহার পত্নী) এবার আর বাঁচিবে না।' ঠাকুর তখন চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। সমৃদ্ধিশালী কলিকাতায় নানা ধনী ও মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোকের বাস; শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়াকলাপে, বিবিধ ব্যবস্থাপত্রদানে এবং টোলের ছাত্রদিগকে বিদ্যালাভে পারদর্শী করিয়া সেখানে সুপণ্ডিত বলিয়া একবার খ্যাতি লাভ করিতে পারিলে সংসারের আয়ব্যয়ের জন্য তাঁহাকে আর চিন্তান্বিত হইতে হইবে না—বোধ হয় এইরূপ একটা কিছু ভাবিয়াই পত্নীবিয়োগবিধুর রামকুমার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। অথবা এমন হইতে পারে, পত্নী-বিয়োগে তিনি জীবনে যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ও অভাব

রামকুমারের কলিকাতায় টোল খুলিবার কারণ ও সময়নিরূপণ।

অনুভব করিতেছিলেন, বিদেশে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার হস্ত হইতে স্বয়ং কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংসারের আয়েরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইবে এইরূপ ধারণাই তাঁহাকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। যাহাই হউক ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীর জন্ম হইবার আন্দাজ তিন চারি বৎসর পরে তিনি ঠাকুরকে যেজন্য কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ১২৫৯ সালে কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুর যে ভাবে তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করেন তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি।

ঠাকুরের জীবনের অতঃপর ঘটনাবলী জানিতে হইলে আমাদিগকে অন্যত্র দৃষ্টি করিতে হইবে। বিদায় আদায়ের সুবিধার জন্য ছাতুবাবুর দলে নাম লিখাইয়া তাঁহার অগ্রজ যখন নিজ চতুষ্পাঠীর শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নপর ছিলেন তখন কলিকাতার অন্যত্র একস্থলে, এক সুবিখ্যাত পরিবারমধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় যে ঘটনাপরম্পরার উদয় হইতেছিল তাহাতেই এখন পাঠককে একবার মনোনিবেশ করিতে হইবে।

কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার নামক পল্লীতে প্রথিতকীর্ত্তি রাণী রাসমণির বাস ছিল। চারিটী কন্যার মাতা হইয়া রাণী চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন এবং স্বামী ৺রাজচন্দ্র দাসের প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তদবধি ঐ বিষয়ের তত্ত্বাবধানে স্বয়ং নিযুক্তা থাকিয়া এবং উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া তিনি কলিকাতাবাসিগণের সুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ, কেবল বিষয়কর্ম্মের পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইয়া তিনি সাধারণের নিকট যশস্বিনী হয়েন নাই, কিন্তু সাহস বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব,

রাণী রাসমণি।

বিশ্বাস ভক্তি এবং ওজস্বিতা,* এবং সর্ব্বোপরি, দরিদ্রদিগের দুরবস্থার সহিত নিরন্তর সহানুভূতি, † অজস্র দান ও অকাতর অন্নব্যয়

---

* শুনা যায় রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটীর নিকট পূর্ব্বে ইংরেজ সৈনিকদিগের একটী ব্যারাক্ বা আড্ডা তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মদ্যপানে উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা একদিন রাণীর দ্বাররক্ষকদিগকে বল-প্রয়োগে অক্ষম করিয়া বাটী মধ্যে প্রবেশ ও লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। মথুর বাবু প্রমুখ পুরুষেরা তখন কার্য্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিলেন। সৈনিকেরা বাধা না পাইয়া ক্রমে অন্দরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া রাণী স্বয়ং অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

† কথিত আছে গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার জন্য ধীবরদিগের উপর ইংরাজ রাজ-সরকার একবার কর বসাইয়াছিলেন। ঐ সকল ধীবর-দিগের অনেকে রাণীর জমাদারীতে বাস করিত। পূর্ব্বোক্ত কর বসায় তাহারা উৎপীড়িত হইয়া রাণীর নিকট আপনাদের দুঃখ কষ্টের কথা নিবেদন করে। রাণী শুনিয়া তাহাদিগকে অভয় দিলেন ও বহু অর্থ দিয়া সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার ইজারা লইলেন। সরকার বাহাদুর, রাণী মৎস্য ব্যবসায় করিবেন ভাবিয়া উক্ত অধিকার প্রদান করিবামাত্র গঙ্গার কয়েক স্থল এক কূল হইতে অন্য কূল পর্য্যন্ত রাণী এমন শৃঙ্খলিত করিলেন যে ইংরাজরাজের জলযান-সমূহের নদী মধ্যে প্রবেশপথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া যাইল। তাঁহারা তখন রাণীর ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে রাণী বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি অনেক অর্থব্যয়ে নদীতে মৎস্য ধরিবার অধিকার আপনাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি; সেই অধিকারসূত্রেই ঐরূপ করিয়াছি; ঐরূপ করিবার কারণ, নদী মধ্য দিয়া জলযানাদি নিরন্তর গমনাগমন করিলে মৎস্য সকল অন্যত্র পলায়ন করিবে এবং আমার সমূহ ক্ষতি হইবে; অতএব নদীগর্ভ শৃঙ্খলমুক্ত কেমন করিয়া করিব? তবে যদি আপনারা নদীতে মৎস্য ধরিবার নূতন কর উঠাইয়া দিতে রাজী হন তবে আমিও

প্রভৃতি তাঁহার অন্তরের অশেষ গুণরাজী ও সুকর্ম্মানুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে সকলের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। কৈবর্ত্তক কুলোদ্ভূতা এই রমণী তখন নিজগুণ ও কর্ম্মে আপন 'রাণী' নাম সার্থক করিতে এবং ব্রাহ্মণেতরনির্বিশেষে সকল জাতির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি সর্ব্বপ্রকারে আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রাণীর কন্যাগণের বিবাহ এবং সন্তান সন্ততি হইয়াছে; এবং একটী মাত্র পুত্র রাখিয়া রাণীর তৃতীয় কন্যার মৃত্যু হওয়ায়, প্রিয়দর্শন তৃতীয় জামাতা

আমার অধিকার স্বত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে স্বীকৃতা আছি। নতুবা ঐ বিষয় লইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে এবং সরকার বাহাদুরকে আমার ক্ষতিপূরণে বাধ্য হইতে হইবে।" শুনা যায় রাণীর ঐরূপ যুক্তিযুক্ত কথায় এবং গরীব ধীবরদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই রাণী ঐরূপ করিতেছেন একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সরকার বাহাদুর ঐ কর অল্প দিন বাদেই উঠাইয়া দেন এবং ধীবরেরা পূর্ব্বের ন্যায় নদীতে বিনা করে যথা ইচ্ছা মৎস্য ধরিয়া রাণীকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে।

লোকহিতকর কার্য্যে রাণী রাসমণির উৎসাহ সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত। "সোণাই, বেলেঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার, কালীঘাটে ঘাট ও মুমূর্ষু নিবাস, হালিসহরে জাহ্নবীতীরে ঘাট, সুবর্ণরেখার অপর তীর হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রভৃতিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গাসাগর, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ ও পুরীতে তীর্থযাত্রা করিয়া রাসমণি দেবোদ্দেশে প্রচুর অর্থব্যয় করেন।" তদ্ভিন্ন মকিমপুর জমিদারীর প্রজাগণকে নীলকরের অত্যচার হইতে রক্ষা করা এবং দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে টোনায় খাল খনন করাইয়া মধুমতীর সহিত নবগঙ্গার সংযোগ বিধান করা প্রভৃতি নানা সৎকার্য্য রাণী রাসমণির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বা মথুরানাথ বিশ্বাস ঐ ঘটনায় এখন হইতে পর হইয়া যাইবেন ভাবিয়া, রাণী তাঁহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর বিবাহ উক্ত জামাতারই সহিত সম্পন্ন করিয়া তাঁহার ছিন্নহৃদয় পুনরায় স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। রাণীর ঐ চারি কন্যার সন্তান সন্ততিগণ এখনও বর্ত্তমান। *

রাণীর দেবীভক্তি

অশেষ গুণশালিনী রাণী রাসমণির শ্রীশ্রীকালিকার শ্রীপাদ-পদ্মে চিরকাল বিশেষ ভক্তি ছিল। জমীদারী সেরেস্তার কাগজ-পত্রে নামাঙ্কিত কবিবার জন্য তিনি যে শীল-মোহর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে খোদিত ছিল—"কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমনি দাসী"। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি তেজস্বিনী রাণীর দেবী-ভক্তি ঐরূপে সকল বিষয়ে, সকল কথা ও কার্য্যে প্রকাশ পাইত।

* পাঠকের অবগতির জন্য রাণীরাসমণির বংশতালিকা শ্রীদক্ষিণেশ্বর নামক পুস্তিকা হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি——

রাণী রাসমণি—স্বামী রায় রাজচন্দ্র দাস।

পদ্মমণি = রামচন্দ্র দাস — কুমারী = প্যারী চৌধুরী — করুণাময়ী = মথুরামোহন বিশ্বাস = জগদম্বা

গণেশ বলরাম সীতানাথ যদুনাথ ভূপাল দ্বারিক ত্রৈলোক্য ঠাকুরদাস

শ্যাম শিব যোগী অজিৎ চণ্ডী প্রসন্ন দুলাল কিশোর নন্দ গুরুদাস কালিদাস দুর্গাদাস শ্যামাচরণ

গোপালকৃষ্ণ = গিরিবালা অমৃত শশী গিরীন্দ্র মণীন্দ্র

শ্রীগোপাল ব্রজগোপাল নৃত্যগোপাল মোহনগোপাল

রাণী রাসমণির ৺কাশী যাইবার উদ্‌যোগকালে প্রত্যাদেশ লাভ।

শুনিতে পাওয়া যায় রাণীর হৃদয়ে ৺কাশীধামে যাইবার ও তথায় শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মাতাকে দর্শন ও বিশেষভাবে পূজা করিবার বাসনা বহুকাল হইতে বলবতী ছিল। শুনা যায়, বহু অর্থও তিনি ঐজন্য সঞ্চিত করিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু নিজ স্বামীর সহসা মৃত্যু হইয়া সমগ্র বিষয়ের তত্ত্বাবধান আপন স্কন্ধে পতিত হওয়ায় এতদিন ঐ বাসনা ফলবতী করিতে পারেন নাই। এখন জামাতৃগণ, বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন, তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠায়, রাণী ১২৫৫ সালে কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সমস্ত আয়োজন স্থির হইলে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব রাত্রে তিনি স্বপ্নে ৺দেবীর দর্শনলাভ এবং প্রত্যাদেশ পাইলেন—কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, ভাগীরথীতীরে মনোরম প্রদেশে আমার পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্য পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর, আমি ঐ মূর্ত্ত্যাশ্রয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমার নিকট হইতে নিত্য পূজা গ্রহণ করিব!* রাণীর বিশ্বাসী হৃদয় ঐরূপ আদেশ লাভে বিশেষ পরিতৃপ্ত হয় এবং কাশীযাত্রা স্থগিত রাখিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত সঞ্চিত ধনরাশি ঐ কার্য্যেই নিয়োজিত করিতে সংকল্প করেন।

পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তি কতদূর সত্য, বলিতে পারি না; কিন্তু

---

* কেহ কেহ বলেন যাত্রা করিয়া রাণী কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্য্যন্ত নৌকাযোগে অগ্রসর হইয়া সে রাত্রিতে ঐ স্থানে নৌকার উপর বাস করিবার সময় ঐ প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ করেন।

রাণীর দেবীমন্দির নির্ম্মাণ।

একথা সত্য যে, শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি রাণীর হৃদয়ে বহুকাল সঞ্চিত ভক্তি, ঐকালে দেব-মন্দির রূপ ও সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ভাগীরথীতীরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড † ক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থব্যয়ে তদুপরি নবরত্নশোভিত সুবৃহৎ মন্দির, দেবারাম ও তৎসংলগ্ন উদ্যান নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়া সুবৃহৎ দেবালয় ১২৬১ সালেও সম্যক্ নির্ম্মিত হয় নাই; কিন্তু জীবন্ অনিশ্চিৎ, মন্দির নির্ম্মাণে বহুকাল ব্যয় করিলে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প নিজ জীবনকালে কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠিবে কি—না, তাহা কে বলিতে পারে? — ঐ কথার আলোচনা করিয়া নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবামাত্র সন ১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্নানযাত্রার দিনে রাণী উহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু উহার পূর্ব্বের কয়েকটী কথা পাঠকের অগ্রে জানা আবশ্যক। আমরা এখন তাহাই বলিতে আরম্ভ করিব।

প্রত্যাদেশ পাইয়াই হউক বা হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসেই হউক—কারণ, ভক্তেরা নিজ ইষ্টদেবদেবীকে সর্ব্বদা আত্মবৎ

† কালীবাটীর জমীর পরিমাণ ৬০ বিঘা, দেবোত্তর দান পত্রে লেখা আছে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ই তারিখে উক্ত জমী কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টের এটর্ণী হেষ্টি নামক জনৈক ইংরাজের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। অতএব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দশ বৎসর লাগিয়াছিল।

সেবা করিতে ভালবাসেন— রাণীর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিত্য অন্ন-ভোগ দিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। রাণী ভাবিলেন—মন্দিরাদি ত মনের মত নির্ম্মিত হইল, দেবীসেবা চিরকাল বিশেষভাবে চলিবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তিও যথেষ্ট করিয়া দিতেছি, কিন্তু এতটা করিয়াও যদি শ্রীশ্রীজগদম্বাকে মনের মত সেবা করিতে না পারি, এতটা করিয়াও যদি তাঁহাকে, প্রাণ যেমন চাহে, নিত্য অন্নভোগ না দিতে পারি তবে সকলই বৃথা। ফলে এই পর্য্যন্ত দাঁড়াইবে যে, লোকে বলিবে, রাণী রাসমণি এত বড় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু লোকের ঐরূপ কথায় আমার কি আসে যায়? হে জগদম্বে, অন্য নানা বিষয়ে নাম যশ ত আমাকে অনেক দিয়াছ?—এ বিষয়ে আর অন্তঃসারহীন নাম যশ মাত্র দিয়াই আমাকে ফিরাইও না!—আমার নাম হউক বা নাই হউক তুমি এখানে সত্য সত্য আবির্ভূতা হও এবং নিত্য সেবা গ্রহণ করিয়া দাসীর কামনা পূর্ণ কর।

রাণীর ৺দেবীকে অন্ন-ভোগ দিবার বাসনা।

রাণী দেখিলেন, দেবীকে মনের মত সেবা করিবার পথে তাঁহার প্রধান অন্তরায় তাঁহার জাতি ও সামাজিক প্রথা। নতুবা তাঁহার প্রাণ ত একবারও বলে না যে অন্নভোগ দিলে জগন্মাতা উহা গ্রহণ করিবেন না—তাঁহার হৃদয় ত ঐ চিন্তায় উৎফুল্ল ভিন্ন কখন সঙ্কুচিত হয় না। ভাবিলেন, তবে এ বিপরীত প্রথার প্রচলন কেন? কে করিল,—শাস্ত্র? শাস্ত্রকার কি তবে প্রাণহীন ব্যক্তি ছিলেন? অথবা স্বার্থপ্রেরিত হইয়া ঈশ্বরীর নিকটেও উচ্চবর্ণের উচ্চাধিকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন? ঐরূপ হইলে শাস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই, আমি আমার প্রাণের পবিত্রাকাঙ্ক্ষারই

পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থাগ্রহণে ঐ বাসনাপূরণের অন্তরায়।

অনুসরণ করিব। আবার ভাবিলেন—তাহা হইলেই বা নিস্তার কোথায়? প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলেও ভক্ত ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা ত কেহই দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। তবে উপায়? রাণী নানাস্থান হইতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-সকলের ব্যবস্থা আনাইতে লাগিলেন—কিন্তু ঐ সকলের একটীও তাঁহার মনের মত হইল না।

রামকুমারের ব্যবস্থাদান।

এদিকে মন্দিরনির্ম্মাণ ও মূর্ত্তিগঠন সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু প্রাণের পূর্ব্বোক্ত পিপাসা মিটাইয়া সেবা করিবার সঙ্কল্প পূর্ণ হইবার কোন উপায় দেখা যাইল না। ছোট বড় সকল পণ্ডিতগণের নিকট পুনঃপুনঃ ব্যবস্থাগ্রহণে বারম্বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া রাণীর আশা যখন প্রায় নির্ম্মূলিত হইতেছিল, এমন সময়ে ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী হইতে ব্যবস্থা আসিল—প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে রাণী যদি উক্ত অপ্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং তদনন্তর উক্ত ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে শাস্ত্রনিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিলেও দোষভাগী হইবেন না।

মন্দিরোৎসর্গসম্বন্ধে রাণীর সঙ্কল্প।

ব্যবস্থা পাইয়া রাণীর হৃদয়ের আশা আবার মুকুলিত হইয়া উঠিল। তিনি নিজ গুরুর নামে উক্ত দেবালয় ও সম্পত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি লইয়া স্বয়ং, গুরুর ঐ সম্পত্তি ও দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারীর পদবী লইয়া থাকিবার সংকল্প স্থির করিলেন। পরে রামকুমার ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থানুযায়ী নিজ অভিপ্রায় রাণী অপরাপর পণ্ডিতগণকে জানাইলে, তাঁহারা, 'কার্য্যটী

সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধ,' 'ঐরূপ করিলেও ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা কেহ ঐ স্থানে আসিবেন না' ইত্যাদি নানা কথা বলিলেও উহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ হইবে একথা কেহই স্পষ্ট বলিতে সাহসী হইলেন না।

রামকুমারের উদারতা।

ভট্টাচার্য্য রামকুমারের প্রতি রাণীর দৃষ্টি যে উক্ত ঘটনায় বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ভাবিয়া দেখিলে তখনকার কালে রামকুমারের ঐরূপ ব্যবস্থাদান সামান্য উদারতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণের মন তখন সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে নিতান্ত আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এবং ঐ গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া শাস্ত্রশাসনের ভিতর একটা উদার ভাব দেখিতে এবং অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা প্রদান করিতে তাঁহাদের ভিতর বিরল ব্যক্তিই সক্ষম হইতেন; ফলে অনেক স্থলে তাঁহাদিগের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে লোকের মনে প্রবৃত্তির উদয় হইত।

রাণী রাসমণির উপযুক্ত পূজকের অন্বেষণ।

সে যাহা হউক রামকুমারের সহিত রাণীর সম্বন্ধ ঐখানেই পরিসমাপ্ত হইল না। বুদ্ধিমতী রাণী নিজ গুরু-বংশীয়গণকে যথাযথ সম্মান প্রদান করিলেও তাঁহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্য এবং শাস্ত্রমত দেবসেবা সম্পন্ন করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাদের ন্যায্য বিদায় আদায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নূতন দেবালয়ের যাবতীয় সেবাকার্য্যের ভার যাহাতে কার্য্য-দক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী সদ্‌ব্রাহ্মণগণের হস্তে সর্ব্বকাল অর্পিত হয় তদ্বিষয়ের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। এখানেও কিন্তু প্রচলিত সামাজিক প্রথা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। শূদ্র-

প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা করা দূরে যাউক, সদ্বংশজাত সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ ঐকালে ঐ সকল মূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন না এবং রাণীর গুরুবংশীয়গণের ন্যায় ব্রহ্মবন্ধুদিগকে তাঁহারা একপ্রকার শূদ্রমধ্যেই পরিগণিত করিতেন। সুতরাং যজনযাজনক্ষম সদাচারী কোন ব্রাহ্মণই যে এরূপ স্থলে রাণীর দেবালয়ে পূজকপদে ব্রতী হইতে স্বীকৃত হইবেন না একথায় আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, এককালে হতাশ না হইয়া রাণী বেতন ও পারিতোষিকের হার বৃদ্ধি করিয়া পূজকের জন্য নানা স্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন।

রাণীর কর্ম্মচারী সিহড় গ্রামের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূজক দিবার ভার গ্রহণ।

ঠাকুরের ভগ্নী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর বাটী কামারপুকুরের অনতিদূরে সিহড় নামক গ্রামে ছিল। সিহড়ে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি। তথাকার মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* নামক এক ব্যক্তি তখন রাণীর সরকারে কর্ম্ম করিতেন। বোধ হয় রাণীর দেবালয়ে ব্রাহ্মণ দিতে পারিলে দু'পয়সা লাভ হইতে পারে ভাবিয়া ইনিই এখন পূজক পাচক প্রভৃতি সকল প্রকার ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী জোগাড় করিয়া দিবার ভার লইতে অগ্রসর হইলেন। রাণীর দেবালয়ে চাকরি স্বীকার করাটা যে দূষণীয় নহে ইহা গ্রামস্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে বুঝাইবার জন্য হউক, বা ঐরূপ করিয়া নিজ সংসারের আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য হউক, অথবা তদুভয় উদ্দেশ্যসিদ্ধিসংকল্পেই হউক, মহেশ রাণীর নিকট হইতে নব দেবালয় সম্বন্ধে উক্ত বন্দোবস্তের ভার লইয়া নিজ অগ্রজ ক্ষেত্রনাথকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে পূজক পদে মনোনীত

* কেহ কেহ বলে এই বংশীয়েরা কোন সময়ে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

করিলেন। মহেশ নিজ পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে ঐরূপে রাণীর কার্য্যে নিযুক্ত করায় তাঁহার পক্ষে অন্যান্য ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীসকলের জোগাড় করা অনেকটা সহজ হইয়াছিল। কিন্তু নানা প্রযত্নেও তিনি শ্রীশ্রীকালিকা দেবীর মন্দিরের জন্য সুযোগ্য পূজক জোগাড় করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

রামকুমার ভট্টাচার্য্যের সহিত মহেশ পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। শুধু পরিচয় নহে, গ্রামসম্পর্কে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোন একটা সুবাদও যে পাতান ছিল, ইহা আমরা পল্লীগ্রামের রীতি দেখিয়া অনুমান করিতে পারি। রামকুমার যে বিশেষ ভক্তিমান তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং বহু পূর্ব্বে স্বেচ্ছায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, একথাও মহেশের অবিদিত ছিল না। সুতরাং রামকুমারের বর্ত্তমান সাংসারিক অভাব অনটনের কথা যে তিনি কিছু কিছু জানিতেন, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। অতএব শ্রীশ্রীকালিকা মাতার পূজক নির্ব্বাচন করিতে যাইয়া মহেশের দৃষ্টি রামকুমারের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল—অশূদ্রযাজী রামকুমার কলিকাতায় আসিয়া ৺দিগম্বর মিত্র প্রভৃতির বাটীতে পূজকপদ কখন কখন গ্রহণ করিলেও কৈবর্ত্তকজাতীয়া রাণীর দেবালয়ে কি ঐরূপ করিতে স্বীকৃত হইবেন?—বিশেষ সন্দেহ। যাহা হউক ৺দেবীপ্রতিষ্ঠার দিন অতি সন্নিকট, সুযোগ্য লোকও পাওয়া যাইতেছে না, অতএব সকল দিক ভাবিয়া মহেশ একবার ঐ বিষয়ে চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু স্বয়ং ঐ বিষয়ে সহসা অগ্রসর না হইয়া রাণীর নিকট সকল কথা বলিয়া

রাণীর রামকুমারকে পূজকের পদগ্রহণে অনুরোধ।

প্রতিষ্ঠার দিনে অন্ততঃ রামকুমার যাহাতে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করেন তজ্জন্য অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতে বলিলেন। রামকুমারের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাপত্র পাইয়া রাণী তাঁহার যোগ্যতার বিষয়ে পূর্ব্বেই উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পূজকপদে ব্রতী হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি এখন বিশেষ আনন্দিতা হইলেন এবং অতি দীনভাবে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন—শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রতিষ্ঠা করিতে আপনার ব্যবস্থাবলেই আমি অগ্রসর হইয়াছি, এবং আগামী স্নানযাত্রার দিনে শুভ মুহূর্ত্তে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সমুদয় আয়োজনও করিয়াছি। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীর জন্য পূজক পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণই শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজকপদগ্রহণে সম্মত হইয়া আমাকে প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব আপনিই এ বিষয়ে যাহা হয় একটা শীঘ্র ব্যবস্থা করিয়া আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি সুপণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব ঐ পূজকের পদে যাহাকে তাহাকে নিযুক্ত করা চলে না, একথা বলা বাহুল্য।

রাণীর ঐ প্রকার অনুরোধ পত্র লইয়া মহেশ যে, রামকুমারের নিকট স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইয়া সুযোগ্য কোন পূজক পাওয়া পর্য্যন্ত পূজকের আসন গ্রহণে স্বীকৃত করাইয়াছিল তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ঐরূপে লোভপরিশূন্য ভক্তিমান রামকুমার শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা বন্ধ হইবার আশঙ্কাতে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে * আগমন করেন এবং পরে রাণী ও মথুর

* দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শ্রীযুক্ত রামকুমারের প্রথমাগমন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আমরা ঠাকুরের অনুগত ভাগিনেয় শ্রীযুত হৃদয়রামের

বাবুর অনুনয় বিনয়ে এবং সুযোগ্য পূজকের অভাব দেখিয়াই ঐ স্থানে যাবজ্জীবন থাকিয়া যান। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছাতেই সংসারে ছোট বড় সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; কে বলিবে, দেবী-ভক্ত রামকুমার ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ঐ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন কি না?

নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছি। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ভট্টাচার্য্য কিন্তু ঐ সম্বন্ধে অন্য কথা বলেন। তিনি বলেন—

কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী দেশড়া নামক গ্রামের রামধন ঘোষ রাণী রাসমণির কর্ম্মচারী ছিলেন। কার্য্যদক্ষতায় ইনি রাণীর সুনয়নে পড়িয়া ক্রমে তাঁহার দেওয়ান পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। কালীবাটী প্রতিষ্ঠার সময়ে ইনি, শ্রীযুক্ত রামকুমারের সহিত পরিচয় থাকায়, বিদায় লইতে আসিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ পত্র দেন। রামকুমার তাহাতে রাণীর জানবাজারস্থ ভবনে উপস্থিত হইয়া রামধনকে বলেন, "রাণী কৈবর্ত্তকজাতীয়া, রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণ ও দান গ্রহণ করিলে 'এক ঘরে' হইতে হইবে।" রামধন তাহাতে তাঁহাকে খাতা দেখাইয়া বলেন, 'কেন?—এই দেখ কত রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তাহারা সকলে যাইবে ও রাণীর বিদায় গ্রহণ করিবে।' রামকুমার তাহাতে বিদায় গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া কালীবাটী প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে এখানে যাত্রা, ওখানে কালীকীর্ত্তন, এখানে ভাগবত পাঠ, ওখানে রামায়ণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে কালীবাটীতে আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়াছিল। রাত্রিকালেও ঐরূপ আনন্দের বিরাম হয় নাই এবং অসংখ্য আলোকমালায় দেবালয়ের সর্ব্বত্র দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, 'ঐ সময়ে দেবালয় দেখিয়া মনে হইয়াছিল, রাণী যেন রজতগিরি তুলিয়া আনাইয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছেন।' পূর্ব্বোক্ত আনন্দোৎসব দেখিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামকুমার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব দিনে কালীবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, ঐরূপ অসম্ভাবিত উপায়ে রামকুমারকে পূজকরূপে পাইয়া রাণী রাসমণি সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যেষ্ঠ, বৃহস্পতিবার স্নান-যাত্রার দিবসে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা করিলেন। শুনা যায়, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে সেদিন ঐ স্থান দিবারাত্র সমভাবে কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাণী অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অতিথি অভ্যাগত সকলকে আপনার ন্যায় আনন্দিত করিয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সুদূর কান্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থানসমূহ হইতে বহু অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঐ উপলক্ষে সমাগত হইয়া ঐদিনে প্রত্যেকে রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় এবং বিদায়স্বরূপে এক একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবালয় নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাণী নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, এবং ২,২৬০০০ মুদ্রার বিনিময়ে ত্রৈলোক্য নাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দিনাজপুর জেলার ঠাকুর গাঁ মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ি পরগণা ক্রয় করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে দেবসেবার জন্য দানপত্র করিয়া গিয়াছিলেন।

রাণীর ৺দেবী প্রতিষ্ঠা।

কেহ কেহ বলেন, ভট্টাচার্য্য রামকুমার ঐদিন সিধা লইয়া গঙ্গাতীরে স্বহস্তে রন্ধনকরতঃ আপন অভীষ্ট দেবীকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, দেবীভক্ত রামকুমার

শ্রীযুক্ত রামলাল ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত কথায় অনুমিত হয়, রামধন ও মহেশ উভয়ের কথাতে শ্রীযুত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক পূজকের পদ অঙ্গীকার করেন।

কোনরূপ প্রত্যাশায় প্রলোভিত না হইয়া রাণীকে যথাজ্ঞান ব্যবস্থা দিয়া দেবীর অন্নভোগের বন্দোবস্ত করাইয়াছিলেন। এখন তিনিই যে স্বয়ং ঐ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ না করিয়া আপন বিধানের এবং ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন একথা নিতান্তই অযুক্তিকর। ঠাকুরের মুখেও আমরা ঐরূপ কথা শুনি নাই। অতএব আমাদিগের ধারণা, তিনি পূজান্তে হৃষ্টচিত্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদী নৈবেদ্যান্নই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর

প্রতিষ্ঠার দিনে ঠাকুরের আচরণ।

কিন্তু ঐ আনন্দোৎসবে সম্পূর্ণহৃদয়ে যোগদান করিলেও আহারের বিষয়ে নিজ নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া সন্ধ্যাগমে নিকটবর্ত্তী বাজার হইতে এক পয়সার মুড়ি মুড়্কি কিনিয়া খাইয়া পদব্রজে ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটী প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে ঠাকুর স্বয়ং আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেক কথা বলিতেন।

কালীবাটীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

বলিতেন—রাণী কাশীধামে যাইবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন; যাত্রার দিন স্থির করিয়া প্রায় এক শত খানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকা বিবিধ দ্রব্য-সম্ভারে পূর্ণ করিয়া ঘাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন; যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব রাত্রে স্বপ্নে ৺ দেবীর নিকট হইতে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযোগ্য স্থানের অনুসন্ধানে নিযুক্তা হন।

বলিতেন—রাণী প্রথমে, 'গঙ্গার পশ্চিম কুল, বারাণসী সমতুল'—এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমকুলে বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে স্থানান্বেষণ করিয়া বিফল-

মনোরথ হয়েন ; * কারণ ঐ কুলের 'দশ আনি' 'ছয় আনি' খ্যাত প্রসিদ্ধ জমীদারেরা, রাণী প্রভূত অর্থ দানে স্বীকৃতা হইলেও, বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের কোথাও তাঁহারা অপরের ব্যয়ে নির্ম্মিত ঘাট দিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না। রাণী বাধ্য হইয়া পরিশেষে ভাগীরথীর পূর্ব্বকুলে এই স্থানটী ক্রয় করেন।

বলিতেন—রাণী দক্ষিণেশ্বরে যে স্থানটী মনোনীত করিলেন উহার কিয়দংশ এক সাহেবের ছিল, এবং অপরাংশে মুসলমানদিগের কবরডাঙ্গা ও গাজি সাহেব পীরের স্থান ছিল ; স্থানটীর কূর্ম্মপৃষ্ঠের মত আকার ছিল ; ঐরূপ কূর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানই শক্তিপ্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট ; অতএব দৈবাধীন হইয়াই রাণী যেন ঐ স্থানটী মনোনীত করেন।

আবার শক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশস্ত দিবসে উহা না করিয়া স্নানযাত্রার দিনে বিষ্ণুপর্ব্বকালে রাণী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা কেন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া ঠাকুর কখন কখন আমাদিগকে বলিতেন—দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণারম্ভের দিবস হইতে রাণী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপ পূজাদি করিতেছিলেন ; মন্দির ও দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে সুস্থে শুভ দিবসের নির্দ্ধারণ হইতেছিল এবং মূর্ত্তিটী ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় বাক্সবন্দি করিয়া রাখা হইয়াছিল ; এমন সময়ে যে কোন কারণেই হউক ঐ মূর্ত্তি

* বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রাচীন লোকেরা এখনও একথা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন।

ঘামিয়া উঠে এবং রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়—'আমাকে আর কতদিন এই ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবি? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে; যত শীঘ্র পারিস্ আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিতা কর্!'—ঐরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই রাণী দেবী-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া দিন দেখাইতে থাকেন এবং স্নান-যাত্রার পূর্ণিমার অগ্রে অন্য কোন প্রশস্ত দিন না পাইয়া ঐ দিবসে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সঙ্কল্প করেন।

তদ্ভিন্ন দেবীকে অন্নভোগ দিতে পারিবেন বলিয়া নিজ গুরুর নামে রাণীর উক্ত ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত অনেক কথা আমরা ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম। কেবল ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য রাণীকে রামকুমারের ব্যবস্থাদানের কথা ও ঠাকুরকে বুঝাইবার জন্য রামকুমারের ধর্ম্মপত্রানুষ্ঠানের কথা দুইটী আমরা ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয় রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি।

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে চিরকালের জন্য পূজকপদ গ্রহণ করা যে ভট্টাচার্য্য রামকুমারের প্রথম অভীপ্সিত ছিল না তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারি। ঐ কথার অনুধাবনে মনে হয় সরল রামকুমার তখনও ঐ বিষয় বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিন, ৺দেবীকে অন্নভোগ প্রদানের বিধান দিয়া এবং প্রতিষ্ঠার দিনে স্বয়ং ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার পরে তিনি পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিবেন। ঐ দিন দেবীকে অন্নভোগ নিবেদন করিতে বসিয়া তিনি যে, কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই বা কোনরূপ অন্যায় অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতেছেন মনে করেন নাই তাহাও কনিষ্ঠের সহিত তাঁহার এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল কথা আমরা এখানে পাঠককে বলিব।

প্রতিষ্ঠার পরদিনে প্রত্যুষে ঠাকুর, অগ্রজের সংবাদ লইবার জন্যই হউক বা প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত যে সকল কার্য্য বাকি ছিল, তাহা দেখিতে কৌতূহলপরবশ হইয়াই হউক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুকাল তথায় থাকিয়া বুঝেন, অগ্রজের সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সন্ধ্যায় ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেও অগ্রজের কথা না শুনিয়া ভোজনকালে তিনি পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর ঠাকুর পাঁচ সাত দিন আর দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরের কার্য্য সমাপনান্তে অগ্রজ যথাসময়ে ঝামাপুকুরে ফিরিবেন ভাবিয়া ঐ স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলেও যখন রামকুমার ফিরিলেন না তখন মনে নানা প্রকার তোলাপাড়া করিয়া ঠাকুর পুনরায় সংবাদ লইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন এবং শুনিলেন, রাণীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি চিরকালের জন্য তথায় শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজকের পদে ব্রতী হইতে সম্মত হইয়াছেন। শুনিয়াই ঠাকুরের মনে নানা কথার উদয় হইল এবং তিনি পিতার অশূদ্রযাজিত্বের এবং অপ্রতিগ্রাহিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, রামকুমার তাহাতে ঠাকুরকে শাস্ত্র ও যুক্তি সহায়ে নানা প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন এবং কোন কথাই তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতেছে না দেখিয়া পরিশেষে পল্লীগ্রামের প্রথানুসারে তাঁহাকে বুঝাইবার ধর্ম্মপত্ররূপ * সরল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুনা যায়

* পল্লীগ্রামে এখনও রীতি আছে, কোন বিষয় যুক্তিসহকারে সুমীমাংসিত হইবার সম্ভাবনা না দেখিলে লোকে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া দেবতার ঐ বিষয়ে কি অভীপ্সিত জানিবার জন্য ধর্ম্ম পত্রের

ধর্ম্মপত্রে উঠিয়াছিল, "রামকুমার পূজকের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া নিন্দিত কর্ম্ম করেন নাই। উহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে।"

অনুষ্ঠান করে এবং উহার সহায়ে দেবতার ইচ্ছা জানিয়া ঐ বিষয়ে আর যুক্তি তর্ক না করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ধর্ম্মপত্র নিম্নলিখিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়—

কতকগুলি টুকরা কাগজে বা বিল্বপত্রে "হাঁ" "না" লিখিয়া একটী ঘটীতে রাখিয়া কোন শিশুকে উহা হইতে একখণ্ড তুলিতে বলা হয়। শিশু "হাঁ,"লিখিত কাগজ তুলিলে অনুষ্ঠাতা বুঝে, দেবতা তাহাকে ঐ কার্য্য করিতে বলিতেছেন। বলা বাহুল্য বিপরীত উঠিলে অনুষ্ঠাতা' দেবতার অভিপ্রায় অন্যরূপ বুঝে। ধর্ম্মপত্রের অনুষ্ঠানে কখন কখন বিষয় বিভাগাদিও হইয়া থাকে। যেমন পিতার চারি সন্তান পূর্ব্বে একত্রে ছিল, এখন হইতে পৃথক্ হইবার সঙ্কল্প কবিয়া বিষয় বিভাগ করিতে যাইয়া উহার কোন্ অংশ কে লইবে ভাবিয়া স্থিব করিতে পারিল না, গ্রামের কয়েক জন নিঃস্বার্থ ধাম্মিক লোককে মীমাংসা করিয়া দিতে বলিল। তাঁহারা তখন স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তিকে যতদূর সম্ভব সমান চারি-ভাগে বিভাগ করতঃ কোন ভ্রাতার ভাগ্যে কোন ভাগটী পড়িবে তাহা ধর্ম্মপত্রের দ্বারা মীমাংসা করিয়া থাকেন। ঐ সময়েও প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়ই অনুষ্ঠান হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে বিষয়াধিকারীদিগের নাম লিখিয়া কেহ না দেখিতে পায় এরূপভাবে মুড়িয়া একটী ঘটীর ভিতর রক্ষিত হয় এবং উক্ত চারিভাগে বিভক্ত সম্পত্তির প্রত্যেক ভাগ "ক" "খ" ইত্যাদি চিহ্নে নির্দ্দিষ্ট হইয়া ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়া অন্য একটী পাত্রে পূর্ব্ববৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। অনন্তর দুই জন শিশুকে ডাকিয়া এক জনকে একটী পাত্র হইতে এবং অপরকে অপর পাত্র হইতে ঐ কাগজ খণ্ডগুলি তুলিতে বলা হয়। অনন্তর কাগজগুলি খুলিয়া দেখিয়া যে নামে সম্পত্তির যে ভাগটী উঠিয়াছে, তাহাই তাহাকে লইতে বাধ্য করা হয়।

ঠাকুরের আহারসম্বন্ধে নিষ্ঠা।

ধর্ম্মপত্রের মীমাংসা দেখিয়া ঠাকুরের মন ঐ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেও এখন অন্য এক চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, চতুষ্পাঠী ত এইবার উঠিয়া যাইল, তিনি এখন কি করিবেন। ঝামাপুকুরে ঐদিন আর না ফিরিয়া ঠাকুর ঐ বিষয়ক চিন্তাতেই মগ্ন রহিলেন এবং রামকুমার তাঁহাকে ঠাকুর-বাড়ীতে প্রসাদ পাইতে বলিলেও তাহাতে সম্মত হইলেন না। রামকুমার নানাপ্রকারে বুঝাইলেন; বলিলেন—"দেবালয়, গঙ্গা-জলে রান্না, তাহার উপর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত হইয়াছে; ইহা ভোজনে কোন দোষ হইবে না।" ঠাকুরের কিন্তু ঐ সকল কথা মনে লাগিল না। তখন রামকুমার বলিলেন, "তবে সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে গঙ্গাগর্ভে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন কর; গঙ্গা-গর্ভে অবস্থিত সকল বস্তুই পবিত্র, একথা ত মান?" আহার সম্বন্ধীয় ঠাকুরের মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এইবার তাঁহার অন্ত-র্নিহিত গঙ্গাভক্তির নিকট পরাজিত হইল। শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমার তাঁহাকে যুক্তিসহায়ে এত করিয়া বুঝাইয়া ইতিপূর্ব্বে যাহা করাইতে পারেন নাই, বিশ্বাস ও ভক্তি তাহা সংসাধিত করিল। ঠাকুর ঐ কথায় সম্মত হইলেন এবং ঐপ্রকারে ভোজন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের গঙ্গাভক্তি।

বাস্তবিক, আজীবন ঠাকুরের গঙ্গার প্রতি কি গভীর ভক্তি আমরা দেখিয়াছি। গাঙ্গবারিকে বলিতেন 'ব্রহ্মবারি'! বলিতেন,—গঙ্গাতীরে বাস করিলে দেবতুল্য অন্তঃকরণ হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি স্বতঃ স্ফুরিত হয়। গঙ্গার পূতবাষ্পকণাপূর্ণ পবন উভয় কূলে যতদূর সঞ্চরণ করে ততদূর পর্য্যন্ত পবিত্র ভূমি—ঐ ভূমিবাসীদিগের জীবনে সদাচার, ঈশ্বর-

ভক্তি, নিষ্ঠা, দান এবং তপস্যার ভাব শৈলসুতা ভাগীরথীর কৃপায় সদাই বিরাজিত। অনেকক্ষণ যদি কেহ বিষয়কথা কহিয়াছে বা বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিয়া আসিয়াছে ত ঠাকুর তাহাকে বলিতেন, একটু গঙ্গাজল খাইয়া আয়। ঈশ্বরবিমুখ ঘোর বিষয়াসক্ত বদ্ধ মানব পুণ্যাশ্রমের কোন স্থানে বসিয়া বিষয় চিন্তা করিয়া কলুষিত করিলে তথায় গঙ্গাবারি ছিটাইয়া দিতেন, এবং গঙ্গাবারিতে কেহ শৌচাদি কার্য্য করিতেছে দেখিলে মনে বিশেষ ব্যথা পাইতেন।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে বাস ও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন।

সে যাহা হউক, মনোরম ভাগীরথীতীরে বিহগকূজিত পঞ্চবটী-শোভিত উদ্যান, সুন্দর সুবিশাল দেবালয়ে ভক্তিমান সাধকানুষ্ঠিত সুসম্পন্ন দেবসেবা, ধার্ম্মিক সদাচারী পিতৃতুল্য অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ এবং দেবদ্বিজপরায়ণা পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও তজ্জামাতা মথুর বাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুরের নিকট কামারপুকুরের গৃহের ন্যায় আপনার করিয়া তুলিল এবং কিছুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেও তিনি তথায় সানন্দচিত্তে বাস করিয়া নিজ মনের পূর্ব্বোক্ত কিংকর্ত্তব্য-অনিশ্চয়তার ভাব দূর পরিহার করিতে সক্ষম হইলেন।

অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রভেদ।

ঠাকুরের আহার সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত দৃঢ় নিষ্ঠার কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ঐরূপ অনুদারতা ত আমাদের ন্যায় মানবের সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে—ঠাকুরের জীবনে উহার উল্লেখ করিয়া তোমরা কি ইহাই বলিতে চাও যে, ঐরূপ অনুদার না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোন্নতি সম্ভবপর নহে? তদুত্তরে আমরা বলি, অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা দুইটী এক বস্তু নহে।

অহঙ্কারেই প্রথমটীর জন্ম এবং উহার প্রাদুর্ভাবে মানব স্বয়ং যাহা বুঝিতেছে, করিতেছে তাহাকেই সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানে আপনার চারিদিকে গণ্ডী টানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে; এবং শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের অনুশাসনে বিশ্বাস হইতেই দ্বিতীয়ের উৎপত্তি—উহার উদয়ে মানব নিজ অহঙ্কারকে খর্ব্ব করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত এবং ক্রমে পরম সত্যের অধিকারী হইয়া থাকে। নিষ্ঠার প্রাদুর্ভাবে মানব প্রথম প্রথম কিছুকাল অনুদাররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু উহার সহায়ে সে জীবনপথে উচ্চ উচ্চতর আলোক দেখিতে পায় এবং তাহার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী স্বভাবতঃ খসিয়া পড়ে। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজনীয়তা কেমন করিয়া অস্বীকার করি? ঠাকুরের জীবনে উহার পূর্ব্বোক্তরূপ পরিচয় পাইয়া ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে শাস্ত্রশাসনের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা রাখিয়া যদি আমরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকলের প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হই তবেই কালে যথার্থ উদারতার অধিকারী হইব এবং শান্তিলাভে সক্ষম হইব, নতুবা নহে। ঠাকুর যেমন বলিতেন—কাঁটা দিয়াই আমাদিগকে কাঁটা তুলিতে হইবে—নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে সত্যের উদারতায় পৌঁছিতে হইবে—শাসন, নিয়ম অনুসরণ করিয়াই আমাদিগকে শাসনাতীত নিয়মাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে।

যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, তবে আর তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার ঠাকুর বলা কেন, মানুষ বলিলেই ত হয়? আর যদি তাঁহাকে ঠাকুর বানাইতেই চাও তবে তাঁহার ঐরূপ অসম্পূর্ণতাগুলি ছাপিয়া ঢাকিয়া বলাই ভাল। আমরা বলি—

ভ্রাতঃ আমাদেরও এককাল গিয়াছে যখন ঈশ্বরের মানববিগ্রহ-ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইবার কথা স্বপ্নেও সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করি নাই; আবার যখন তাঁহারই অহেতুক কৃপায় ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া তিনি আমাদিগকে বুঝাইলেন তখন দেখিলাম, মানবদেহ ধারণ করিতে গেলে ঐ দেহের অসম্পূর্ণতাগুলির ন্যায় মানবমনের অসম্পূর্ণতাগুলিও তাঁহাকে যথাযথভাবে স্বীকার করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, স্বর্ণাদি ধাতুতে "খাদ্ না থাক্‌লে গড়ন হয় না।" তাঁহার জীবনের ঐ সকল অসম্পূর্ণতার কথা তিনি আমাদের নিকট কোনও দিন কিছুমাত্র লুকাইবার প্রয়াস করেন নাই, অথচ স্পষ্টাক্ষরে আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন—"যে রাম, যে কৃষ্ণ হইয়াছিল, সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে আসিয়াছে; এবার গুপ্তভাবে আসা, রাজা যেমন ছদ্মবেশে সহর দেখিতে বাহির হন, সেই প্রকার।" অতএব আমাদের যতদূর জানা আছে সকল কথা তোমায় বলিব; তোমার লইতে ইচ্ছা হয় লইও, অথবা, আমাদিগকে যথা ইচ্ছা নিন্দা তিরস্কার করিও।

পঞ্চম অধ্যায়।

পূজকের পদগ্রহণ।

প্রথম দর্শন হইতে মথুর বাবুর ঠাকুরের প্রতি আচরণ ও সংকল্প।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরে ঠাকুরের সৌম্যদর্শন, কোমল প্রকৃতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অল্প বয়স, রাণী রাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথুর বাবুর নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল। দেখিতে পাওয়া যায়, জীবনে যাহাদিগের সহিত বহুকালব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহাদিগকে প্রথম দর্শনকালে মানব-হৃদয়ে একটা প্রীতির আকর্ষণ সহসা আসিয়া উপস্থিত হয়। শাস্ত্র বলেন, উহা আমাদিগের পূর্ব্বজন্মকৃত সম্বন্ধের সংস্কার হইতে উদিত হইয়া থাকে। ঠাকুরকে দেখিয়া মথুর বাবুর মনে এখন যে, ঐরূপ একটা অনির্দ্দিষ্ট আকর্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, একথা, পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে নিগূঢ় প্রেম-সম্বন্ধ দেখিয়া আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারি।

ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম

দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক মাস কাল পর্য্যন্ত ঠাকুর কিংকর্ত্তব্য-অনিশ্চয় ভাবে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন। মথুর বাবু ইতিমধ্যে তাঁহাকে দেবীর বেশকারীর কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সংকল্প মনে মনে স্থির করিয়া রামকুমার ভট্টাচার্য্যের নিকট ঐবিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। রাম-কুমার তাহাতে ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথা তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক বলিয়া উক্ত বিষয়ের সিদ্ধিসংকল্পে তাঁহাকে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু মথুর সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র

ছিলেন না। ঐরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তিনি ঐ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে অবসরানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত আর এক ব্যক্তি এখন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের পিতৃস্বস্রীয়া ভগিনী * শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীহৃদয়-রাম মুখোপাধ্যায় এই সময়ে কোনরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার বাসনায় বর্দ্ধমান সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। হৃদয়ের বয়স তখন ষোল বৎসর। যুবক ঐ স্থানে নিজগ্রামস্থ পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকটে থাকিয়া নিজ সংকল্পসিদ্ধির কোনরূপ সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। এমন সময়ে সে লোকমুখে সংবাদ পাইল তাহার মাতুলেরা রাণী রাসমণির নব দেবালয়ে সসম্মানে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে নিজ অভিপ্রায়-সিদ্ধির বিশেষ সুযোগ আছে। শুনিয়া, কালবিলম্ব না করিয়া

---

* পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা ঠাকুরের বংশতালিকা এখানে প্রদান করিতেছি—

মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়।

ক্ষুদিরাম　রামশীলা (=ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়)　নিধিরাম　রামকানাই

রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়　শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী =কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়　রামতারক (হলধারী)　কালিদাস

রাঘব　রামরতন　হৃদয়　রাজারাম　দীননাথ　রামদাস　হরমণি

রামকুমার　রামেশ্বর　কাত্যায়নী　শ্রীরামকৃষ্ণ (গদাধর)　সর্ব্বমঙ্গলা

অক্ষয়　রামলাল　লক্ষ্মী　শিবরাম　সারদাচরণ　শীতলমণি

হৃদয় দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে উপস্থিত হইল এবং বাল্যকাল হইতে সুপরিচিত, প্রায় সমবয়স্ক মাতুল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মিলিত হইয়া তথায় আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

হৃদয় দীর্ঘাকৃতি এবং দেখিতে সুশ্রী সুপুরুষ ছিল। তাহার শরীর যেমন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল, মনও তদ্রূপ উদ্যমশীল ও ভয়শূন্য ছিল। কঠোর পরিশ্রম ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে এবং প্রতিকূলাবস্থায় পড়িয়া স্থির থাকিয়া অদ্ভুত উপায়সকলের উদ্ভাবনপূর্ব্বক উহা অতিক্রম করিতে, হৃদয় পারদর্শী ছিল। তদুপরি নিজ কনিষ্ঠ মাতুলকে হৃদয় সত্যসত্যই ভালবাসিত এবং তাঁহাকে সুখী করিতে অশেষ শারীরিক কষ্টস্বীকারে কুণ্ঠিত হইত না।

হৃদয় সর্ব্বদা অনলস ছিল, কিন্তু তাহার অন্তরে ভাবুকতার বিন্দুবিসর্গও ছিল না; এজন্য কর্ম্মী সংসারী মানবের যেমন হইয়া থাকে, হৃদয়ের চিত্ত নিজ স্বার্থচেষ্টা হইতে কখনও সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইতে পারিত না। ঠাকুরের সহিত হৃদয়ের এখন হইতে সম্বন্ধের কথার আমরা যতই আলোচনা করিব ততই দেখিতে পাইব, হৃদয়ের জীবনে ভবিষ্যতে যতটুকু ভাবুকতা ও নিঃস্বার্থ-চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ভাবময় ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে এবং কখন কখন তাঁহার চেষ্টার অনুকরণে আসিয়া উপস্থিত হইত। আহার বিহার প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শারীরচেষ্টায় উদাসীন, সর্ব্বদা চিন্তাশীল, স্বার্থগন্ধশূন্য ভাবুক জীবনের সফলতার জন্য ঐরূপ একজন স্বাধীনচিন্তাপরাঙ্মুখ শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাহসী কর্ম্মীর সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীশ্রীজগদম্বা কি সেইজন্য ঠাকুরের সাধনকালে হৃদয়ের ন্যায় পুরুষকে ঠাকুরের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়াছিলেন?—কে বলিবে! তবে একথা

সত্য, হৃদয় না থাকিলে সাধনকালে ঠাকুরের শরীররক্ষা অসম্ভব হইত; শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের সহিত হৃদয়ের নাম তজ্জন্য নিত্য-সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল হৃদয় আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া আমাদিগের প্রণম্য হইয়া রহিয়াছেন।

হৃদয়ের আগমনে ঠাকুর।

হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে অসিবার কালে ঠাকুর বিংশতি বর্ষে কয়েক মাস মাত্র পদার্পণ করিয়াছেন। হৃদয়কে সহচররূপে পাইয়া তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে বাস যে, এখন হইতে অনেকটা সহজ হইয়াছিল একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ঠাকুর তাহাকে লইয়া একত্রে স্নান, ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। চিরকাল বালক-ভাবাপন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের, সাধারণনয়নে নিষ্কারণ চেষ্টাসকলের প্রতিবাদ না করিয়া সর্ব্বদা অন্তরের সহিত অনুমোদন ও সহানুভূতি করায়, হৃদয় এখন হইতে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিল।

ঠাকুরের প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা।

হৃদয় আমাদিগকে নিজমুখে কতবার বলিয়াছেন—"এই সময় হইতেই ঠাকুরের প্রতি আমি কি একটা অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতাম ও ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। তাঁহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড কোথাও থাকিতে হইলে কষ্ট বোধ হইত। শয়ন ভ্রমণ উপবেশনাদি সকল কাজ একত্রে করিতাম। কেবল মধ্যাহ্নে ভোজনকালে কিছুক্ষণের জন্য আমাদিগকে পৃথক্ হইতে হইত। কারণ, ঠাকুর সিধা লইয়া পঞ্চবটীতে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতেন এবং আমি ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতাম। তবে ঠাকুরের রন্ধনাদির জন্য সমস্ত জোগাড় আমি করিয়া দিয়া যাইতাম। ঐরূপে রন্ধন করিয়া খাইয়াও তিনি মনে শান্তি

পাইতেন না—আহার সম্বন্ধে নিষ্ঠা তাঁহার তখন এত প্রবল ছিল! মধ্যাহ্নে ঐরূপে রন্ধন করিলেও রাত্রে কিন্তু ঠাকুর আমাদিগের ন্যায় শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত প্রসাদী লুচি খাইতেন। কতদিন দেখিয়াছি ঐরূপে লুচি খাইতে খাইতে তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছে এবং আক্ষেপ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছেন, 'মা আমাকে কৈবর্ত্তের অন্নটা খাওয়ালি!'

ঠাকুর নিজমুখেও কখন কখন আমাদিগকে এই সময়ের কথা এইরূপে বলিয়াছেন—"কৈবর্ত্তের অন্ন খাইতে হইবে ভাবিয়া মনে তখন দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইত। গরীব কাঙ্গালেরাও অনেকে তখন রাসমণির ঠাকুরবাড়ীতে ঐজন্য খাইতে আসিত না। খাইবার লোক জুটিত না বলিয়া কতদিন প্রসাদী অন্ন গরুকে খাওয়াইতে এবং কতক গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে হইয়াছে।" তবে ঐরূপে রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে বহুদিন যে খাইতে হয় নাই, একথাও আমরা হৃদয় ও ঠাকুর উভয়ের মুখেই শুনিয়াছি। ঐ কথা শুনিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, কালীবাটীতে পূজকের পদে ঠাকুর যতদিন না ব্রতী হইয়াছিলেন ততদিনই ঐরূপ করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের পূজকপদে ব্রতী হওয়া উক্ত দেবালয়প্রতিষ্ঠার দুই তিনমাস পরেই হইয়াছিল।

ঠাকুরের আচরণ সম্বন্ধে যাহা হৃদয় বুঝিতে পারিত না।

ঠাকুর যে তাহাকে বিশেষ ভালবাসেন একথা হৃদয় বুঝিত। ঠাকুরের সম্বন্ধে একটী কথা কেবল সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। উহা এই—হৃদয় জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারকে যখন কোন বিষয়ে সহায়তা করিতে যাইত, মধ্যাহ্নে আহারাদির পর যখন একটু শয়ন করিত, অথবা সায়াহ্নে যখন সে মন্দিরে

আরাত্রিক দর্শন করিত, তখন ঠাকুর তাহাকে ফেলিয়া পাশ কাটা-ইয়া কিছুক্ষণের জন্য কোথায় অন্তর্দ্ধান হইতেন! হৃদয় অনেক খুঁজিয়াও তখন তাঁহার সন্ধান পাইত না। পরে দুই এক ঘণ্টা গত হইলে আবার ঠাকুর ফিরিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্ট কিছু বলিতেন না, বলিতেন 'এইখানেই ছিলাম।' ঐরূপ সময়ে কোন কোন দিন সন্ধান করিতে যাইয়া হৃদয় দেখিত, ঠাকুর পঞ্চবটীর দিক হইতে ফিরিতেছেন। দেখিয়া সে ভাবিত, তিনি শৌচাদির জন্য ঐদিকে গিয়াছিলেন এবং আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না।

ঠাকুরের গঠিত শিবমূর্ত্তি-দর্শনে মথুরের প্রশংসা।

হৃদয় বলেন, 'এই সময়ে একদিন মূর্ত্তিগঠন করিয়া ঠাকুরের শিবপূজা করিতে ইচ্ছা হয়।' আমরা ইতি-পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাল্যকালে কামারপুকুরে ঠাকুর কখন কখন ঐরূপ করিতেন। ঐরূপ ইচ্ছা হইবামাত্র তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিয়া বৃষ, ডমরু ও ত্রিশূল সহিত একটী শিবমূর্ত্তি স্বহস্তে গঠন করিয়া উহার পূজা করিতে থাকেন। মথুর বাবু ঐ সময়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে পূজাস্থানের কিয়দ্দূরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঠাকুর ঐরূপে তন্ময় হইয়া কি পূজা করিতেছেন জানিতে উৎসুক হইয়া নিকটে আসিয়া ঐ মূর্ত্তিটী দেখিতে পান। বৃহৎ না হইলেও মূর্ত্তিটী সুন্দর হইয়াছিল। মথুর উহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বাজারে ঐরূপ দেবভাবাঙ্কিত মূর্ত্তি যে পাওয়া যায় না ইহা দেখিয়াই বুঝিলেন। অতঃপর কৌতূহলপরবশ হইয়া মথুর হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ মূর্ত্তি কোথায় পাইলে, কে গড়িয়াছে? হৃদয়ের উত্তরে ঠাকুর দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িতে এবং ভগ্ন মূর্ত্তি সুন্দরভাবে যুড়িতে জানেন, একথা জানিতে

পারিয়া মথুর বিস্মিত হইলেন এবং পূজান্তে মূর্ত্তিটী তাঁহাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হৃদয়ও ঐ কথায় স্বীকৃত হইয়া পূজাশেষে ঠাকুরকে বলিয়া মূর্ত্তিটী লইয়া তাঁহাকে দিয়া আসিলেন। মূর্ত্তিটী হস্তে পাইয়া মথুর এখন উহা তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং মুগ্ধ হইয়া রাণীকে উহা দেখাইতে পাঠাইলেন। রাণীও উহা দেখিয়া নির্ম্মাতার বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং ঠাকুর উহা গড়িয়াছেন জানিয়া মথুরের ন্যায় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। * ঠাকুরকে দেবালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে মথুরের ইতিপূর্ব্বেই ইচ্ছা হইয়াছিল, এখন আবার তাঁহার এই নূতন গুণপনার পরিচয় পাইয়া ঐ ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইল। মথুর বাবুর ঐরূপ অভিপ্রায়ের কথা ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে অগ্রজের নিকটে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান ভিন্ন অপর কাহার আবার চাকরি করিব—এইরূপ একটা ভাব বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে দৃঢ়নিবদ্ধ থাকায়, ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুর।

চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুরকে ঐরূপ ভাব প্রকাশ করিতে আমরা অনেক সময় শুনিয়াছি। বিশেষ অভাবে না পড়িয়া কেহ স্বেচ্ছায় চাকরি স্বীকার করিলে ঠাকুর ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে বড় উচ্চ ধারণা করিতেন না। তাঁহার বালক ভক্তদিগের মধ্যে একজন † এক সময়ে চাকরি স্বীকার করিয়াছে জানিয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ ব্যথিত হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, "সে মরিয়াছে শুনিলে আমার যত

* কেহ কেহ বলেন এই ঘটনা ঠাকুরের পূজাকালে হইয়াছিল এবং মথুর উহা রাণী রাসমণিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—যেরূপ উপযুক্ত পূজক পাইয়াছি, তাহাতে ৺ দেবী শীঘ্র জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন।

† স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

না কষ্ট হইত, সে চাকুরি করিতেছে শুনিয়া ততোধিক কষ্ট হইয়াছে!" পরে কিছুকাল অতীত হইলে ঐ ব্যক্তির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়া যখন জানিলেন যে ঐ ব্যক্তি তাহার অসহায়া বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইতেছে না দেখিয়াই চাকরি স্বীকার করিয়াছে, তখন ঠাকুর সস্নেহে তাহার গাত্রে ও মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিলেন, 'তাতে দোষ নাই, ঐজন্য চাকরি করায় তোকে দোষ স্পর্শ কর্‌বে না; কিন্তু মার জন্য না হয়ে, যদি তুই স্বেচ্ছায় চাকরি কর্‌তে যেতিস্ তাহা হলে তোকে আর স্পর্শ কর্‌তে পার্‌তুম্ না। তাইত বলি আমার নিরঞ্জনে এত-টুকু অঞ্জন (কাল দাগ) নাই, তার ঐরূপ হীনবুদ্ধি কেন হবে?"

নিত্যনিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া অন্যান্য আগন্তুক ব্যক্তিরা সকলেই বিস্মিত হইল। একজন বলিয়াও বসিল—"মহাশয়, আপনি চাকরির নিন্দা করিতেছেন; কিন্তু চাকরি না করিলে সংসার পোষণ করিব কি রূপে?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "যে কর্‌বে, করুক না; আমি ত সকলকে ঐরূপে নিষেধ করছি না, (নিরঞ্জনকে ও তাঁহার অন্যান্য বালক ভক্তদিগকে দেখাইয়া) এদের ঐ কথা বল্‌চি; এদের কথা আলাদা।" ঠাকুর তাঁহার বালক ভক্তদিগের জীবন অন্য ভাবে গড়িতেছিলেন এবং ঐরূপ আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত চাকরি করাটার কখন সামঞ্জস্য হয় না বলিয়াই যে, ঐ কথা বলিয়াছিলেন ইহা বলা বাহুল্য।

চাকরি করিতে বলিবে বলিয়া ঠাকুরের মথুরের নিকট যাইতে সঙ্কোচ।

অগ্রজের নিকট হইতে মথুর বাবুর ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঠাকুর তখন হইতে তাঁহার সম্মুখে আর বড় একটা অগ্রসর হইতেন না; যতটা পারেন তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ, কায়মনোবাক্যে সত্য

ও ধর্ম্ম পালন করিতে তিনি যেমন কখন কাহারও অপেক্ষা রাখিতেন না, তেমনি আবার বিশেষ কারণ না থাকিলে কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া বৃথা কষ্ট দিতে চিরকাল কুণ্ঠিত হইতেন। আবার, কোনরূপ প্রত্যাশা মনের ভিতর না রাখিয়া গুণী ব্যক্তির গুণের আদর করা এবং মানী ব্যক্তিকে সরল স্বাভাবিক ভাবে সম্মান দেওয়াটা ঠাকুরের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ছিল। অতএব দেবালয়ে পূজকপদ গ্রহণ করিবেন কিনা, এই প্রশ্নের যাহা হয় একটা মীমাংসায় স্বয়ং উপনীত হইবার পূর্ব্বে মথুর বাবু তাঁহাকে উহা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়া ধরিয়া বসিলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া মথুরের মনে কষ্ট দিতে হইবে, এই আশঙ্কাই যে, ঠাকুরের ঐরূপ চেষ্টার মূলে ছিল তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বিশেষতঃ তিনি তখন একজন নগণ্য যুবক মাত্র এবং রাণী রাসমণির দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মথুর মহামাননীয় ব্যক্তি; এ অবস্থায় মথুরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাটা তাঁহার পক্ষে ভাল দেখাইবে না এবং বালসুলভ চপলতা বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু যত দিন যাইতেছে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে অবস্থান করাটা তাঁহার তত প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে, অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুরের নিকট নিজ মনোগত এই ভাবটী লুক্কায়িত ছিল না। বিশেষ কোন কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে পাইলে তাঁহার যে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় আপত্তি ছিল না এবং জন্মভূমি কামারপুকুরে ফিরিবার জন্য তাঁহার মন যে পূর্ব্বের ন্যায় চঞ্চল ছিল না, একথা আমরা এখনকার ঘটনাবলী হইতে বেশ বুঝিতে পারি।

ঠাকুর যাহা আশঙ্কা কবিতেছিলেন তাহাই একদিন হইয়া

বসিল। মথুর বাবু কালীমন্দিরে দর্শনাদি করিতে আসিয়া কিছু দূরে ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুর তখন হৃদয়ের সহিত বেড়াইতেছিলেন। মথুর বাবুকে দূরে দেখিতে পাইয়া সেখান হইতে সরিয়া অন্যত্র যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মথুরের ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু আপনাকে ডাকিতে-ছেন।" ঠাকুর মথুরের নিকট যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া হৃদয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,—"যাইলেই, আমাকে এখানে থাকিতে বলিবে, চাকরি স্বীকার করিতে বলিবে।" হৃদয় বলিল, 'তাঁহাতে দোষ কি ? এমন স্থানে, মহতের আশ্রয়ে কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া ত ভাল বৈ মন্দ নয়, তবে কেন ইতস্ততঃ করিতেছ ?"

ঠাকুরের পূজকের পদ গ্রহণ।

ঠাকুর।—"আমার চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ এখানে পূজা করিতে স্বীকার করিলে দেবীর অঙ্গে যে সমস্ত অলঙ্কারাদি আছে তাহার জন্য দায়ী থাকিতে হইবে ; সে বড় হাঙ্গামার কথা ; আমার দ্বারা উহা সম্ভব হইবে না ; তবে যদি তুমি ঐ কার্য্যের ভার লইয়া এখানে থাক তাহা হইলে আমার পূজা করিতে আপত্তি নাই।"

হৃদয় এখানে চাকরির অন্বেষণেই আসিয়াছিল। সুতরাং ঠাকুরের ঐ কথায় আনন্দে স্বীকৃত হইল। ঠাকুর তখন মথুর বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার দ্বারা দেবালয়ে কর্ম্ম-স্বীকার করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করি-লেন। শ্রীযুত মথুর তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইয়া ঐ দিন হইতে তাঁহাকে কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে নিযুক্ত করিলেন এবং হৃদয়কে ঠাকুর ও রামকুমারকে সাহায্য করিতে আদেশ করিলেন।

মথুর বাবুর অনুরোধে ভ্রাতাকে ঐরূপে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া রামকুমার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

৺গোবিন্দ বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া।

দেবালয়প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি হইয়া গেল। সন ১২৬২ সালের ভাদ্র মাস উপস্থিত। পূর্ব্বদিনে মন্দিরে জন্মাষ্টমীকৃত্য যথাযথ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ নন্দোৎসব। মধ্যাহ্নে ৺রাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়া গেলে পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৺রাধারাণীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাইয়া আসিয়া ৺গোবিন্দজীকে শয়ন করাইতে লইয়া যাইবার সময় বিগ্রহহস্তে পড়িয়া গেলেন; বিগ্রহের একটী পদ ভাঙ্গিয়া যাইল। ঐ ঘটনায় মন্দিরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। নানা পণ্ডিতের মতামত লইবার পর ঠাকুরের পরামর্শে ৺গোবিন্দজীর বিগ্রহটীর ভগ্নাংশ জুড়িয়া পূজা চলিতে লাগিল।* ঠাকুরকে ইতিপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইতে দেখিয়া মথুর বাবু ভগ্নবিগ্রহপরিবর্ত্তন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ-গ্রহণে এখন সমুৎসুক হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, পরামর্শ দিবার পূর্ব্বে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভাবভঙ্গ হইলে বলিয়াছিলেন, বিগ্রহমূর্ত্তি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। ঠাকুর যে ভগ্নবিগ্রহ সুন্দরভাবে জুড়িতে পারেন, একথা মথুর বাবুর অবিদিত ছিল না। সুতরাং মথুর বাবুর অনুরোধে তাঁহাকেই এখন ঐ বিগ্রহ জুড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ঠাকুর উহা এমন সুন্দররূপে জুড়িয়াছিলেন যে বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেও ঐ মূর্ত্তি যে কোনকালে ভগ্ন হইয়াছিল একথা বুঝিতে পারা যায় না।

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—ষষ্ঠ অধ্যায় ১৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

৺রাধাগোবিন্দজীর বিগ্রহ ঐরূপে ভগ্ন হইলে অঙ্গহীন বিগ্রহে পূজা সিদ্ধ হয় না বলিয়া অনেকে অনেক কথা তখন বলাবলি করিত। রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু কিন্তু ঠাকুরের যুক্তিযুক্ত পরামর্শে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ঐ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সে যাহা হউক, পূজক ক্ষেত্রনাথ অনবধানতার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইলেন। ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার তদবধি ঠাকুরের উপরে ন্যস্ত হইল এবং হৃদয় শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজাকালে বেশ করিয়া রামকুমারকে সাহায্য করিতে লাগিল।

ভগ্নবিগ্রহে পূজা সম্বন্ধে ঠাকুর জয়নারায়ণ বাবুকে যাহা বলেন।

বিগ্রহ ভঙ্গপ্রসঙ্গে হৃদয় এক সময়ে আমাদিগের নিকট আর একটী কথার উল্লেখ করিয়াছিল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে, বরানগরে কুটিঘাটার নিকটে নড়ালের প্রসিদ্ধ জমীদার ৺রতন রায়ের ঘাট বিদ্যমান। ঐ ঘাটের নিকটে একটী ঠাকুরবাটী আছে। উহাতে দশমহাবিদ্যা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। পূর্ব্বে উক্ত ঠাকুরবাটীতে পূজাদির বেশ বন্দোবস্ত থাকিলেও ঠাকুরের সাধন-কালে উহা হীন-দশাপন্ন হইয়াছিল। মথুর বাবু যখন ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেছেন তখন তিনি এক সময়ে উক্ত দেবালয় দর্শন করিতে আসেন এবং অভাব দেখিয়া মথুর বাবুকে বলিয়া ভোগের জন্য দুই মন চাউল ও দুইটী করিয়া টাকার মাসিক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। দর্শন করিয়া ফিরিবার কালে, ঠাকুর একদিন এখানকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার জয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকগুলি লোকের সহিত স্বপ্রতিষ্ঠিত ঘাটে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পরিচয় থাকায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। জয় নারায়ণ বাবু তাঁহাকে নমস্কার ও সাদরে আহ্বান করিয়া

অপর সকলকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; পরে কথা-প্রসঙ্গে রাণী রাসমণির কালীবাটীর কথা তুলিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মহাশয়! ওখানকার ৺গোবিন্দজী কি ভাঙ্গা?" ঠাকুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, "তোমার কি বুদ্ধি গো? অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি, তিনি কি কখন ভাঙ্গা হন?" জয়নারায়ণ বাবুর প্রশ্নে নিরর্থক নানা কথা উঠিবার সম্ভাবনা দেখিয়া ঠাকুর ঐরূপে ঐ প্রসঙ্গ পাল্‌টাইয়া দেন, এবং প্রসঙ্গান্তরের উত্থাপন করিয়া সকল বস্তুর অসার ভাগ ছাড়িয়া সার ভাগ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। সুবুদ্ধিসম্পন্ন জয়নারায়ণ বাবুও ঠাকুরের ইঙ্গিতে উহা বুঝিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের সঙ্গীতশক্তি।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঠাকুরের পূজা একটা দেখিবার বিষয় ছিল; যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। আর, ঠাকুরের সেই প্রাণের উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান?—সে গান যে একবার শুনিত সে কখন ভুলিতে পারিত না। তাহাতে ওস্তাদি কালোয়াতি ঢং ঢাং কিছুই ছিল না। ছিল কেবল, গীতোক্ত বিষয়ের ভাবটী আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া মর্ম্মস্পর্শী মধুর স্বরে যথাযথ প্রকাশ এবং তাল লয়ের বিশুদ্ধতা। ভাবই যে সঙ্গীতের প্রাণস্বরূপ একথা, যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। আবার তাল লয় বিশুদ্ধ না হইলে ঐ ভাব যে আত্মপ্রকাশে বাধা পাইয়া থাকে একথা ঠাকুরের মুখনিঃসৃত সঙ্গীত শুনিয়া এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত উহার তুলনা করিয়া বেশ বুঝা যাইত। রাণী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন তখন ঠাকুরকে ডাকাইয়া তাঁহার গান শুনিতেন। নিম্নলিখিত গীতটী তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল—

কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
জেনেছি জেনেছি তারা
তারা কি তোর এমনি ধারা
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল অম্‌নি করে॥

ঠাকুরের গীত অত মধুর লাগিবার আর একটী কারণ ছিল। গান গাহিবার সময়ে তিনি গীতোক্তভাবে নিজে এত মুগ্ধ হইতেন যে, অপর কাহারও প্রীতির জন্য গান গাহিতেছেন একথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। গীতোক্তভাবে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইতে আমরা জীবনে অপর কাহাকেও দেখি নাই। ভাবুক গায়কেরাও শ্রোতার নিকট হইতে প্রশংসার প্রত্যাশা কিছু না কিছু রাখিয়া থাকেন। ঠাকুরকে কেবল দেখিয়াছি, তাঁহার গীত শুনিয়া কেহ প্রশংসা করিলে, যথার্থই ভাবিতেন ঐ ব্যক্তি গীতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিতেছে এবং উহার বিন্দুমাত্র তাঁহার প্রাপ্য নহে।

প্রথম পূজাকালে ঠাকুরের দর্শন।

হৃদয় বলিতেন, এই কালে গীত গাহিতে গাহিতে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত; এবং যখন পূজা করিতেন, তখন এমন তন্ময়ভাবে উহা করিতেন, যে, পূজাস্থানে কেহ আসিলে বা নিকটে দাঁড়াইয়া কথা কহিলে তিনি উহা আদৌ টের পাইতেন না। ঠাকুর বলিতেন, অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতি পূজাঙ্গসকল সম্পন্ন করিবার কালে ঐ সকল মন্ত্রবর্ণ নিজ দেহে উজ্জ্বল বর্ণে সন্নিবেশিত রহিয়াছে বলিয়া তিনি বাস্তবিক দেখিতে পাইতেন! বাস্তবিকই দেখিতেন,—সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী-শক্তি সুষুম্নামার্গ দিয়া সহস্রারে উঠিতেছেন এবং শরীরের

যে যে অংশকে ঐ শক্তি ত্যাগ করিতেছেন সেই সেই অংশগুলি এককালে নিস্পন্দ, অসাড় ও মৃতবৎ হইয়া যাইতেছে! আবার পূজাপদ্ধতির বিধানানুসারে যখন "রং ইতি জলধারয়া বহ্নি-প্রাকারং বিচিন্ত্য"—অর্থাৎ, রং এই মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণপূর্ব্বক পূজক আপনার চতুর্দ্দিকে জল ছড়াইয়া ভাবিবে যেন অগ্নির প্রাচীর দ্বারা পূজাস্থান বেষ্টিত রহিয়াছে এবং তজ্জন্য কোন প্রকার বিঘ্নবাধা তথায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—প্রভৃতি কথার উচ্চারণ করিতেন তখন দেখিতে পাইতেন তাঁহার চতুর্দ্দিকে শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া অনুল্লঙ্ঘনীয় অগ্নির প্রাচীর সত্য সত্যই বিদ্যমান থাকিয়া পূজাস্থানকে সর্ব্ববিধ বিঘ্নের হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে! হৃদয় বলিত, পূজার সময় ঠাকুরের তেজঃপুঞ্জ শরীর ও তন্মনস্ক ভাব দেখিয়া অপর ব্রাহ্মণগণ বলাবলি করিতেন,—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন নরশরীর পরিগ্রহ করিয়া পূজা করিতে বসিয়াছেন!

ঠাকুরকে কার্য্যদক্ষ করিবার জন্য রামকুমারের শিক্ষাদান।

দেবীভক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অবধি আত্মীয়-গণের ভরণ পোষণ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেও অন্য এক বিষয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে বড় চিন্তিত হইতেন। কারণ, দেখিতেন, এখানে আসিয়া অবধি কনিষ্ঠের নির্জ্জনপ্রিয়তা ও সংসার সম্বন্ধে কেমন একটা উদাসীন উদাসীন ভাব! কোন কাজেই যেন তাঁহার আঁট দেখিতে পাইতেন না। প্রথমে ভাবিতেন, বালক বোধ হয় কামারপুকুরে মাতার নিকট ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, এবং ঐ বিষয় সদা সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছে। দেখিতেন, বালক সকাল সন্ধ্যা যখন তখন একাকী মন্দির হইতে দূরে গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছে,

পঞ্চবটী বৃক্ষমূলে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, অথবা, পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে তখন যে জঙ্গলপূর্ণ স্থান ছিল বহুক্ষণ পরে তন্মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইলেও বালক যখন গৃহে ফিরিবার কথা তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলিল না এবং কখন কখন তাহাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি যখন উহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া পাঠাইবার কথা ছাড়িয়া দিলেন! ভাবিলেন, তাঁহার নিজের বয়স হইয়াছে, শরীর দিন দিন অপটু হইয়া পড়িতেছে, কবে পরমায়ু ফুরাইবে কে বলিতে পারে?—এ অবস্থায় আর সময় নষ্ট না করিয়া, তাঁহার অবর্ত্তমানে বালক যাহাতে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারে এমনভাবে তাহাকে মানুষ করিয়া দিয়া যাওয়া তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং মথুরবাবু যখন বালককে দেবালয়ে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েন! পরে দিনের পর দিন যাইলে কনিষ্ঠের মন ফিরিয়া যখন সে মথুর বাবুর অনুরোধে প্রথমে বেশকারী ও পরে পূজকের পদে ব্রতী হইল এবং দক্ষতার সহিত ঐ কার্য্যসকল সম্পন্ন করিতে লাগিল তখন রামকুমার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং এখন হইতে তাহাকে চণ্ডীপাঠ শ্রীশ্রীকালিকা মাতার পূজাকার্য্য প্রভৃতি আদ্যোপান্ত শিখাইতে লাগিলেন। ভাবিলেন উহাতে সে মানুষ হইবে এবং তিনিও কোন দিন পূজা করিতে অপারগ হইলে জগদম্বার, পূজা ও সেবা-কার্য্যে গোলযোগ ঘটিবে না। ঠাকুর অচিরে ঐ সকল শিখিয়া লইলেন; এবং শাক্তী দীক্ষা না লইয়া দেবীপূজা প্রশস্ত নহে জানিয়া শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকট ঠাকুরের শক্তি-দীক্ষা গ্রহণ।

শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক প্রবীণ শক্তিসাধক তখন কলিকাতার বৈঠকখানা বাজারে বাস করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয়ে তাঁহার মধ্যে মধ্যে গতায়াত ছিল। মথুরবাবু-প্রমুখ রাণীর পরিবারবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল বলিয়া বোধ হয়। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন, অনুরাগী সাধক বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার ভট্টাচার্য্যের সহিত ইনি পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর ইহাঁর নিকট হইতেই দীক্ষাগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। শুনিয়াছি, দীক্ষাগ্রহণ করিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত কেনারাম তাঁহার অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ইষ্টলাভবিষয়ে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন!

রামকুমারের মৃত্যু।

রামকুমারের শরীর এখন হইতে মধ্যে মধ্যে অপটু হওয়াতেই হউক, অথবা ঠাকুরকে ঐ কার্য্যে অভ্যস্ত করাইবার জন্যই হউক, তিনি এই সময়ে প্রায় ৺রাধাগোবিন্দজীর সেবা স্বয়ং সম্পন্ন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীকালী মাতার পূজাকার্য্যে ঠাকুরকে নিযুক্ত করিতে থাকিলেন! কয়েক দিন এইরূপ হইলে মথুর বাবু একদিন ঐকথা জানিতে পারিয়া রাণীকে বলিয়া রামকুমারকে এখন হইতে বরাবর বিষ্ণুঘরে পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। অতএব এখন হইতে কালীঘরে ঠাকুর পূজক ও হৃদয় বেশকারীরূপে নিযুক্ত থাকিলেন। ঐরূপে পূজার বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করিবার কারণ বোধ হয় ইহাই যে, মথুর বাবু ভাবিয়াছিলেন কালীঘরের

সেবাকার্য্যে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, বৃদ্ধ রামকুমারের শরীর অপটু হওয়ায় ঐ কার্য্যভার বহন করা তাঁহার শক্তিতে কুলাইতেছে না। রামকুমার ঐরূপ বন্দোবস্তে বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কনিষ্ঠকে কালীঘরের পূজা ও সেবাকার্য্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে শিখাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ইহার কিছুকাল পরে রামকুমার, মথুর বাবুকে বলিয়া হৃদয়কে ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় নিযুক্ত করিলেন এবং অবসর লইয়া কিছু দিনের জন্য গৃহে ফিরিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকুমারকে আর গৃহে ফিরিতে হয় নাই। গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে কলিকাতার উত্তরে শ্যামনগর মূলাজোড় নামক স্থানে কয়েক দিনের জন্য কার্য্যান্তরে গমন করিয়া তিনি সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রামকুমার ভট্টাচার্য্য রাণী রাসমণির দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক বৎসরকাল মাত্র জীবিত থাকিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা করিয়াছিলেন। অতএব সম্ভবতঃ সন ১২৬৩ সালের প্রারম্ভে তাঁহার শরীর ত্যাগ হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন।

ঠাকুরের এই কালের আচরণ।

অতি অল্প বয়সেই ঠাকুরের পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং জ্ঞানোন্মেষের প্রারম্ভ হইতে তিনি নিজ জননী চন্দ্রমণি ও অগ্রজ রামকুমারের স্নেহে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অপেক্ষা রামকুমার প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসরের বড় ছিলেন।

অতএব ঠাকুরের পিতৃভক্তির কিয়দংশ তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং পিতৃতুল্য অগ্রজের সহসা মৃত্যু হওয়ায় ঠাকুর যে এখন নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন—একথা নিশ্চয়। জরাযুক্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, ও মৃত ব্যক্তির দর্শনে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের সংসারত্যাগের কথা লোকপ্রসিদ্ধ। কে বলিবে, ঠাকুরের জীবনে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা তাঁহার শুদ্ধ মনে সংসারের অনিত্যতাসম্বন্ধীয় ধারণা দৃঢ় করিয়া উহাতে বৈরাগ্যানল প্রবৃদ্ধ করিতে কতদূর সহায়তা করিয়াছিল? যাহাই হউক, এই সময় হইতে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজায় সমধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তৃষিত মানব তাঁহার দর্শনে বাস্তবিক কৃতার্থ হয় কি না তদ্‌বিষয় জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, এই সময় হইতে তিনি পূজান্তে মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে বসিয়া তন্মনস্কভাবে দিন যাপন করিতেন এবং রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তপ্রমুখ ভক্তগণরচিত সঙ্গীতসকল ৺দেবীকে শুনাইতে শুনাইতে প্রেমে বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। আবার, এখন হইতে তিনি বৃথা বাক্যালাপাদি করিয়া তিলমাত্র সময় ব্যয় করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইতেন এবং মধ্যাহ্নে ও রাত্রে যখন ৺দেবীর মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইত, তখন লোকসঙ্গ পরিহার করিয়া পঞ্চবটীর চতুঃপার্শ্বস্থ জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্মাতার চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া কালযাপন করিতেন।

হৃদয়ের তদ্দর্শনে চিন্তা ও সঙ্কল্প।

ঠাকুরের ঐ প্রকার চেষ্টাসমূহ হৃদয়ের প্রীতিকর হয় নাই। কিন্তু কি করিবে? বাল্যকাল হইতে ঠাকুর যখন যাহা ধরিয়াছেন তখনি তাহা সম্পাদন করিয়াছেন, কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই, একথা তাহার

অবিদিত ছিল না। সুতরাং প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়া বৃথা। কিন্তু দিনের পর দিন ঠাকুরের ঐ ভাব প্রবল বেগে বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া হৃদয় কখন কখন একটু আধটু না বলিয়াও থাকিতে পারিত না। আবার, রাত্রে নিদ্রা না যাইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া ঠাকুর কোথায় চলিয়া যান, একথা জানিতে পারিয়া হৃদয় বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিল। কারণ, মন্দিরে ঠাকুরসেবার পরিশ্রম, তাহার উপর পূর্ব্ববৎ আহার নাই, এ অবস্থায় রাত্রে নিদ্রা না যাইলে শরীর ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। হৃদয় স্থির করিল ঐ বিষয়ের সন্ধান এবং যথাসাধ্য প্রতিবিধান করিতে হইবে।

ঐ সময়ে পঞ্চবটী-প্রদেশের অবস্থা।

পঞ্চবটীর চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান তখন এখনকার মত সমতল ছিল না; নীচু জমি, খানাখন্দ ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল; নানা বুনো গাছগাছড়ার সহিত এক ধাত্রী বা আমলকী বৃক্ষ তথায় জন্মিয়াছিল। একে কবরডাঙ্গা, তাহার উপর জঙ্গল, সে জন্য দিবাভাগেও কেহ ঐ স্থানে বড় একটা যাইত না। যাইলেও জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইত না। আর, রাত্রে ?—ভূতের ভয়ে কেহই ঐ দিক মাড়াইত না! হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত আমলকী বৃক্ষটী নীচু জমিতে থাকায় তাহার তলে কেহ বসিয়া থাকিলে জঙ্গলের বাহিরের উচ্চ জমি হইতে কাহারও নয়নগোচর হইত না। ঠাকুর এই সময়ে উহারই তলে বসিয়া রাত্রে ধ্যান ধারণা করিতেন।

হৃদয়ের প্রশ্ন, 'রাত্রে জঙ্গলে যাইয়া কি কর'?

এক দিন রাত্রে ঠাকুর ঐ স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে হৃদয় অলক্ষ্যে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল এবং ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত জঙ্গল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, দেখিতে পাইল। তিনি বিরক্ত হইবেন

ভাবিয়া সে আর অগ্রসর হইল না। কিন্তু তাঁহাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আশে পাশে ঢিল্ ঢাল্ ছুড়িতে থাকিল। ঠাকুর তাহাতে ফিরিলেন না দেখিয়া অগত্যা সে স্বয়ং গৃহে ফিরিল। পরদিন অবসরকালে হৃদয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জঙ্গলের ভিতর রাত্রে যাইয়া কি কর বল দেখি?" ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন, "ঐ স্থানে একটা আমলকী গাছ আছে, তাহার তলায় বসিয়া ধ্যান করি; শাস্ত্রে বলে আমলকী গাছের তলায় যে যাহা কামনা করিয়া ধ্যান করে তাহার তাহা সিদ্ধ হয়।"

ঠাকুরকে হৃদয়ের ভয় দেখাইবার চেষ্টা।

ঐ ঘটনার পরে কয়েক দিন ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত আমলকী বৃক্ষের তলায় ধ্যানধারণা করিতে বসিলেই মধ্যে মধ্যে লোষ্ট্রাদি নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল। উহা হৃদয়ের কর্ম্ম বুঝিয়াও ঠাকুর তাহাকে কিছুই বলিলেন না। হৃদয় কিন্তু ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। এক দিন ঠাকুর বৃক্ষতলে যাইবার কিছুক্ষণ পরে নিশঃব্দে জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দূর হইতে দেখিল, তিনি পরিধেয় বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া সুখাসীন হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন! দেখিয়া ভাবিল, 'মামা কি পাগল হইল না কি? এরূপ ত পাগলেই করে; ধ্যান করিবে, কর; কিন্তু এরূপ উলঙ্গ হইয়া কেন?'

হৃদয়কে ঠাকুরের বলা,—'পাশমুক্ত হইয়া ধ্যান করিতে হয়।'

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঐরূপ ভাবিয়া সে আর কালবিলম্ব না করিয়া ঠাকুরের নিকটে সহসা উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "এ কি হচ্চে? পৈতে, কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?" কয়েকবার ডাকাডাকির পরে

ঠাকুরের হুঁস হইল এবং হৃদয়কে নিকটে দাঁড়াইয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিতে শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুই কি জানিস? এইরূপে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়; জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান এই অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে রয়েছে; পৈতেগাছটাও 'আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়'—এই অভিমানের চিহ্ন এবং একটা পাশ; মাকে ডাকতে হলে ঐ সব পাশ ফেলে দিয়ে এক মনে ডাকতে হয়, তাই ঐ সব খুলে রেখেছি; ধ্যান করা শেষ হলে ফিরবার সময় আবার পরব।" হৃদয় ঐরূপ কথা পূর্ব্বে আর কোথাও শুনে নাই, সুতরাং অবাক্ হইয়া রহিল, এবং উত্তরে কিছুই বলিতে না পারিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। ইতিপূর্ব্বে সে ভাবিয়াছিল, মাতুলকে অনেক কথা অদ্য বুঝাইয়া বলিবে ও তিরস্কার করিবে—তাহার কিছুই করা হইল না।

শরীর এবং মন উভয়ের দ্বারা ঠাকুরের জাত্যভিমান নাশের, 'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন' হইবার ও সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান লাভের জন্য অনুষ্ঠান।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে একটী কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল। কারণ, উহা জানা থাকিলে ঠাকুরের জীবনের পরবর্ত্তী অনেকগুলি ঘটনা আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। আমরা দেখিলাম, অষ্টপাশের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য কেবলমাত্র মনে মনে ঐ সকলকে ত্যাগ করিয়াই ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, কিন্তু শরীরের দ্বারা ঐ সকলকে যতদূর ত্যাগ করা যাইতে পারে তাহা করিয়াছিলেন। পরজীবনে অন্য সকল বিষয়েও ঐরূপ করিতে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই। যথা—

জাত্যভিমান নাশ করিয়া মনে যথার্থ দীনতা আনয়নের জন্য তিনি, অপরে যে স্থানকে অশুদ্ধ ভাবিয়া

সর্ব্বথা পরিহার করে, সে স্থান বহুপ্রযত্নে স্বহস্তে পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ' না হইলে অর্থাৎ ইতরসাধারণের নিকটে বহুমূল্য বলিয়া পরিগণিত স্বর্ণাদি ধাতু ও প্রস্তরসকলকে মৃণ্ময় ইষ্টকখণ্ডের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিতে না পারিলে, মানব-মন শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-লাভরূপ উদ্দেশ্য হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে সম্পূর্ণ ধাবিত হয় না এবং যোগারূঢ় হইতে পারে না—একথা শুনিয়াই ঠাকুর কয়েক খণ্ড মুদ্রা ও লোষ্ট্র হস্তে গ্রহণ করিয়া বারম্বার 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিতে বলিতে উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

সর্ব্ব জীবে শিবজ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য কালীবাটীতে কাঙ্গালীদের ভোজন সাঙ্গ হইলে, দেবতার প্রসাদজ্ঞানে তিনি তাহাদের উচ্ছিষ্টান্ন কিঞ্চিৎ গ্রহণ (ভক্ষণ) ও মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে, উচ্ছিষ্ট পত্রাদি মস্তকে বহন করিয়া গঙ্গাতীরে নিক্ষেপপূর্ব্বক স্বহস্তে মার্জ্জনী ধরিয়া ঐ স্থান ধৌত করিয়াছিলেন এবং নিজ নশ্বর শরীরের দ্বারা ঐরূপে দেবসেবা যৎকিঞ্চিৎ সাধিত হইল ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ত্যাগের ক্রম

ঐরূপ নানা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সকল স্থলেই দেখা যায়, ঈশ্বরলাভের পথে প্রতিকূল বিষয়সকলকে কেবলমাত্র মনে মনে ত্যাগ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। কিন্তু, স্থূলভাবে ঐ সকলকে প্রথমে ত্যাগ করিয়া অথবা, নিজ শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গকে ঐ সকল বিষয় হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়া

তদ্বিপরীত অনুষ্ঠানসকল করিতে তিনি উহাদিগকে বলপূর্ব্বক নিয়োজিত করিতেন। দেখা যায়, ঐরূপ অনুষ্ঠানে তাঁহার মনের পূর্ব্ব সংস্কারসকল এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং তদ্বিপরীত নবীন সংস্কারসকলকে উহা এমন দৃঢ়ভাবে ধারণ করিত যে, কখনই সে আর বিপরীত কার্য্যসকল করিতে পারিত না। এইরূপে কোন নবীনভাব মনের দ্বারা প্রথম গৃহীত হইয়া শরীরেন্দ্রিয়াদিসহায়ে কার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্রও যতক্ষণ না অনুষ্ঠিত হইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ের যথাযথ ধারণা হইয়া উহার বিপরীত ভাবের ত্যাগ হইয়াছে, একথা তিনি স্বীকার করিতেন না।

ঐ ক্রম সম্বন্ধে 'মনঃকল্পিত সাধন পথ' বলিয়া আপত্তি ও তাহার মীমাংসা।

পূর্ব্ব সংস্কারসমূহ ত্যাগ করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ আমরা ভাবি, ঠাকুরের ঐরূপ আচরণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। তাঁহার ঐরূপ আচরণসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলিয়া বসিয়াছেন—"অপবিত্র কদর্য্য স্থান পরিষ্কৃত করা, 'টাকা, মাটি, মাটি টাকা' বলিয়া মৃত্তিকাসহ মুদ্রা-খণ্ডসকল গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাবলী তাঁহার নিজ মনঃকল্পিত সাধনপথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব উপায়সকল অবলম্বনে তিনি মানসিক যে সকল ফল পাইয়াছিলেন তাহা অতি শীঘ্রই তদপেক্ষা সহজ উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে।" উত্তরে বলিতে হয়—উত্তম কথা, কিন্তু ঐরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানসকল না করিয়া কেবলমাত্র মনে মনে বিষয়-ত্যাগরূপ তোমাদের তথাকথিত সহজ উপায়ের অবলম্বনে কয় জন লোক এ পর্য্যন্ত

পূর্ণভাবে রূপরসাদি-বিষয়সমূহ হইতে বিমুখ হইয়া ষোল আনা মন ঈশ্বরে অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? উহা কখনই হইবার নহে। মন একরূপ চিন্তা করিয়া একদিকে চলিবে, এবং শরীর ঐ চিন্তা বা ভাবের বিপরীত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া অন্য পথে চলিবে—এই প্রকারে কোন মহৎ কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না, ঈশ্বরলাভ ত দূরের কথা। কিন্তু রূপরসাদি ভোগলোলুপ মানব ঐকথা বুঝে না! কোন বিষয় ত্যাগ করা ভাল বলিয়া বুঝিয়াও সে পূর্ব্বসংস্কারবশে নিজ শরীরে ন্দ্রিয়াদির দ্বারা উহা ত্যাগ করিতে অগ্রসর হয় না এবং ভাবিতে থাকে, 'শরীর যেরূপ কার্য্য করুক না কেন, মনে ত আমি অন্যরূপ ভাবিতেছি!' যোগ ও ভোগ একত্রে গ্রহণ করিবে ভাবিয়া সে আপনাকে আপনি ঐরূপে প্রতারিত করিয়া থাকে। কিন্তু আলোকান্ধকারের ন্যায় যোগ ও ভোগরূপ দুই পদার্থ কখন একত্রে থাকিতে পারে না। কাম-কাঞ্চনময় সংসার ও ঈশ্বরের সেবা যাহাতে একত্রে একই কালে সম্পন্ন করিতে পারা যায় এরূপ সহজ পথের আবিষ্কার, আধ্যাত্মিক জগতে এ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই।* শাস্ত্র সেজন্য আমাদিগকে বারম্বার বলিতেছেন, 'যাহা ত্যাগ করিতে হইবে তাহা কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করিতে হইবে এবং যাহা গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও ঐরূপ কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই সাধক ঈশ্বরলাভের অধিকারী হইবেন।' ঋষিগণ সে জন্যই বলিয়াছেন, মানসিক ভাবোদ্দীপক শারীরিক চিহ্ন ও অনুষ্ঠানরহিত তপস্যাসহায়ে,—"তপসাবাপ্যলিঙ্গাৎ,"—মানব কখন আত্মসাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ

---

* Ye cannot serve God and Mammon together.
(Holy Bible)

হয় না। যুক্তিও বলে, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে কারণে মানবমন ক্রমশঃ অগ্রসর হয়—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

ঠাকুর এই সময়ে যে ভাবে পূজাদি করিতেন।

সে যাহা হউক, দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্রজের মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য যাহাই অনুকূল বলিয়া বুঝিতেছেন তাহাই বিশ্বস্তচিত্তে ব্যগ্র হইয়া সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে যথারীতি পূজা সমাপনান্তে ৺দেবীকে নিত্যরাম প্রসাদ-প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করান তিনি পূজাঙ্গের অন্যতম বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ঐ সকল গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন—রামপ্রসাদপ্রমুখ ভক্তেরা মার দর্শন পাইয়াছিলেন; জগজ্জননীর দর্শন তবে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়; আমি কেন তবে তাঁহার দর্শন পাইব না? ব্যাকুলহৃদয়ে বলিতেন—"মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় তবে কেন দেখা দিবি না? আমি ধন, জন, ভোগসুখ, কিছুই চাহি না, আমায় দেখা দে!"—প্রার্থনা করিতে করিতে নয়নধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত এবং ঐরূপ কাতর ক্রন্দনে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিশ্বাসের মুগ্ধ প্রেরণায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় গীত গাহিয়া ৺দেবীকে প্রসন্না করিতে উদ্যত হইতেন। এইরূপে পূজা ধ্যান ও ভজনে দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের মনের অনুরাগ ও ব্যাকুলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিল।

অদ্ভুত পূজকের দেবীর পূজা ও সেবা সম্পন্ন করিবার নির্দ্দিষ্ট

কাল এই সময় হইতে দিনদিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পূজা করিতে বসিয়া তিনি যথাবিধি নিজ মস্তকে একটী পুষ্প দিয়াই হয়ত দুই ঘণ্টাকাল স্থাণুর ন্যায় স্পন্দহীনভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন, অন্নাদি নিবেদন করিয়া, মা খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতেই হয়ত বহুক্ষণ কাটাইলেন, প্রত্যূষে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া ৺দেবীকে সাজাইতে কত সময় ব্যয় করিলেন, অথবা অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সন্ধ্যারতিতেই বহুক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন। আবার অপরাহ্ণে বা আরতির অন্তে জগন্মাতাকে যদি গান শুনাইতে আরম্ভ করিলেন তবে এমন তন্ময় ও ভাববিহ্বল হইলেন যে, সময় অতীত হইতেছে একথা বারম্বার স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে আরাত্রিক বা সান্ধ্য শীতলাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইল!—এইরূপে কিছুকাল পূজা চলিতে লাগিল।

ঐরূপ নিষ্ঠা, ভক্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুরবাটীর জনসাধারণের দৃষ্টি যে, এখন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। সাধারণে সচরাচর যে পথে চলিয়া থাকে তাহা ছাড়িয়া নূতনভাবে কাহাকেও চলিতে বা কিছু করিতে দেখিলে লোকে প্রথম বিদ্রূপ পরিহাসাদি করিয়া থাকে। কিন্তু দিনের পর যত দিন যাইতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি দৃঢ়তাসহকারে নিজ গন্তব্য পথে যত অগ্রসর হয় ততই সাধারণের মনে পূর্ব্বোক্ত ভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং উহার স্থল শ্রদ্ধা আসিয়া অধিকার করে। ঠাকুরের ভাগ্যেও যে ঐরূপ হয় নাই তাহা নহে। কিছুদিন ঐরূপে পূজা করিতে না করিতেই তিনি অনেকেরই বিদ্রূপভাজন হইলেন। কিছুকাল পরে কেহ কেহ আবার তাঁহার প্রতি

ঠাকুরের এইকালে পূজাদি কার্য্যসম্বন্ধে মথুরপ্রমুখ সকলে যাহা ভাবিত।

শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। শুনা যায়, মথুর বাবু এই সময়ে ঠাকুরের পূজাদি দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে রাণী রাসমণিকে বলিয়াছিলেন, "অদ্ভুত পূজক পাওয়া গিয়াছে, ৺দেবী শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন!" লোকের ঐরূপ মতামতে ঠাকুর কিন্তু কোন দিন নিজ গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই। সাগরগামিনী নদীর ন্যায় তাঁহার মন এখন হইতে অবিরাম একভাবেই শ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদোদ্দেশে প্রধাবিত হইয়াছিল।

ঈশ্বরানুরাগের বৃদ্ধিতে ঠাকুরের শরীরে যে সকল বিকার উপস্থিত হয়।

দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল ঠাকুরের মনে অনুরাগ, ব্যাকুলতাও, তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং মনের ঐ প্রকার অবিরাম একদিকে গতি তাঁহার শরীরে নানা প্রকার বাহ্য লক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঠাকুরের আহার কমিয়া গেল, নিদ্রা কমিয়া গেল। শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তিষ্কে নিরন্তর দ্রুত প্রধাবিত হওয়ায়, বক্ষঃস্থল সর্ব্বদা আরক্তিম হইয়া রহিল, চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহসা জলভারাক্রান্ত হইতে লাগিল, এবং ভগবদ্দর্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতাবশতঃ তাঁহার মন 'কি করিব, কেমনে পাইব' এইরূপ একটা চিন্তা নিরন্তর পোষণ করায় ধ্যান পূজাদি কাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাঁহার শরীরে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব সদাই লক্ষিত হইতে লাগিল।

ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন তিনি জগদম্বাকে গান শুনাইতেছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, 'মা, এত যে ডাক্‌চি তার কিছুই তুই কি শুন্‌চিস্ না? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েচিস্, আমাকে কি দেখা দিবি না?" ঠাকুর বলিতেন—

মা'র "দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা; জলশূন্য করিবার জন্য লোকে যেমন সজোরে গামছা নিঙ্‌ড়াইয়া থাকে, মনে হইল, ভিতরে হৃদয় মনটাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে! মার দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহারই উপর পড়িল। উহার সাহায্যে এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা হস্তে লইয়াছি, এমন সময়ে সহসা মা'র অদ্ভুত অপূর্ব্ব দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম! তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন্ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই! অন্তরে অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূতপূর্ব্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মা'র সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম!"

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথম দর্শনলাভের বিবরণ। ঠাকুরের ঐ সময়ের ব্যাকুলতা।

কালীমন্দিরের পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের কথা ঠাকুর অন্য একদিন আমাদিগকে এইরূপে বিবৃত করিয়া বলেন, "ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই!—আর দেখিতেছি কি?—এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র!—যে দিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্ম্মিমালা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা অগ্রসর হইয়া আমার উপরে নিপতিত হইল এবং এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া, হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম!" ঐরূপে প্রথম দর্শনকালে

ঠাকুর, চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু, চৈতন্য-ঘন, জগদম্বার বরাভয়করা মূর্ত্তি?—ঠাকুর কি এখন তাহারও দর্শন এই জ্যোতিঃ-সমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ শুনিয়াছি, প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছু-মাত্র সংজ্ঞা যখনি হইয়াছিল তখনি তিনি কাতরকণ্ঠে 'মা', 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দর্শনের বিরাম হইলে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী মূর্ত্তির অবাধ অবিরাম দর্শনলাভের জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা অবিশ্রান্ত আকুল ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল! বাহ্য ক্রন্দন ও নয়নধারায় সকল সময়ে প্রকাশিত না হইলেও উহা অন্তরে সকল সময়ে বিদ্যমান থাকিত, এবং কখন কখন এত বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না পারিয়া ভূমিতে লুটাইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে 'মা আমার কৃপা কর, দেখা দে'—বলিয়া এমন ক্রন্দন করিতেন যে, চারি পার্শ্বে লোক দাঁড়াইয়া যাইত!—ঐরূপ অস্থির চেষ্টায় লোকে কি বলিবে, এ কথার বিন্দুমাত্রও তখন তাঁহার মনে আসিত না। তিনি বলিতেন, "চারি দিকে লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্ত্তির ন্যায় অবাস্তব মনে হইত এবং তজ্জন্য মনে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচের উদয় হইত না! ঐরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইবার পরেই কিন্তু দেখিতাম, মা'র ঐ বরাভয়করা চিন্ময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি!—দেখিতাম ঐ মূর্ত্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে!"

সপ্তম অধ্যায় ।

সাধনা ও দিব্যোন্মত্ততা ।

প্রথম দর্শনের পরের অবস্থা ।

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথম দর্শনলাভের আনন্দ ও উত্তেজনায় ঠাকুর কয়েক দিনের জন্য একেবারে কাজের বাহির হইয়া পড়িলেন। মন্দিরে পূজাদি কার্য্য নিয়মিতভাবে প্রত্যহ সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হৃদয় উহা অন্য এক ব্রাহ্মণের সহায়ে কোনরূপে সম্পাদন করিতে লাগিল এবং মাতুল বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার চিকিৎসায় মনোনিবেশ করিল। ভূকৈলাসের রাজবাটীতে নিযুক্ত এক সুযোগ্য বৈদ্যের সহিত হৃদয়ের ইতিপূর্ব্বে কোনও সূত্রে পরিচয় হইয়াছিল, হৃদয় এখন তাঁহারই দ্বারা ঠাকুরের চিকিৎসা করাইতে লাগিল এবং রোগের শীঘ্র উপশমের সম্ভাবনা না দেখিয়া কামারপুকুরে ঠাকুরের মাতা ও ভ্রাতার নিকটে সংবাদ পাঠাইল।

ঠাকুরের ঐ সময়ের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যক্ষ এবং দর্শনাদি ।

ভগবদ্দর্শনের জন্য উদ্দাম ব্যাকুলতায় ঠাকুর যেদিন একেবারে অস্থির হইয়া না পড়িতেন সেদিন পূর্ব্ববৎ নিয়মিতভাবে পূজা করিতে অগ্রসর হইতেন। পূজা ও ধ্যানাদি করিবার কালে ঐ সময়ে তাঁহার যেরূপ চিন্তা ও অনুভব উপস্থিত হইত তিনি তদ্বিষয়ে আমাদিগকে কখন কখন কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। বলিতেন, "মার নাটমন্দিরের ছাদের আলিশায় যে ধ্যানস্থ ভৈরব মূর্ত্তি আছে, ধ্যান করিতে যাইবার সময় তাহাকে দেখাইয়া মনকে বলিতাম, 'ঐরূপ স্থির নিস্পন্দভাবে বসিয়া মার

ঠাকুরের সাধন স্থান পঞ্চবটী।

পাদপদ্ম চিন্তা করিতে হইবে।' ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শুনিতে পাইতাম শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসকলে, পায়ের দিক হইতে উৰ্দ্ধে, খট্ খট্ করিয়া আওয়াজ হইতেছে এবং একটার পর একটা করিয়া গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, কে যেন ভিতরে ঐ সকল স্থান তালাবদ্ধ করিয়া দিতেছে! যতক্ষণ ধ্যান করিতাম ততক্ষণ শরীর যে, একটুও নাড়িয়া চাড়িয়া আসন পরিবর্ত্তন করিয়া লইব, অথবা ইচ্ছামাত্রেই ধ্যান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন বা অন্য কর্ম্মে লিপ্ত হইব তাহার সামর্থ্য থাকিত না! পূর্ব্ববৎ খট্ খট্ করিয়া—এবার উপরের দিক হইতে পা পর্য্যন্ত—আওয়াজ হইয়া ঐ সকল গ্রন্থি পুনরায় যতক্ষণ না খুলিয়া যাইত ততক্ষণ একভাবে কে যেন জোর করিয়া বসাইয়া রাখিত! ধ্যান করিতে বসিয়া প্রথম প্রথম খদ্যোৎপুঞ্জের ন্যায় জ্যোতিবিন্দুসমূহ দেখিতে পাইতাম; কখন বা কুয়াসার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম; আবার কখন বা গলিত রূপার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃতরঙ্গে সমুদয় পদার্থ পরিব্যাপ্ত দেখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐরূপ দেখিতাম; আবার অনেক সময়ে চক্ষু চাহিয়াও ঐরূপ দেখিতে পাইতাম। কি দেখিতেছি তাহা বুঝিতাম না, ঐরূপ দর্শন হওয়া ভাল কি মন্দ তাহাও জানিতাম না। সুতরাং মার (৺জগন্মাতার) নিকট ব্যাকুলহৃদয়ে প্রার্থনা করিতাম—'মা, আমার কি হচ্চে, কিছুই বুঝি না; তোকে ডাকিবার মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না; যাহা করিলে তোকে পাওয়া যায়, তুইই তাহা আমাকে শিখিয়ে দে। তুই না শিখালে আমাকে কে আর শিখাবে মা; তুই ছাড়া আমার গতি ও সহায় আর কেহই যে নাই!' এক মনে ঐরূপে প্রার্থনা করিতাম এবং প্রাণের ব্যাকুলতায় কাতর ক্রন্দন করিতাম!"

প্রথম দর্শনলাভে ঠাকুরের প্রত্যেক চেষ্টা ও ভাবে কিরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়।

ঠাকুরের পূজা ধ্যানাদি এই সময়ে এক অভিনব অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়াছিল। সে অদ্ভুত তন্ময়ভাব অপরকে বুঝান কঠিন! তাহাতে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে আশ্রয় করিয়া বালকের সরলতা, বিশ্বাস, নির্ভর ও মাধুর্য্যই কেবলমাত্র বর্ত্তমান থাকিত। প্রবীণের গাম্ভীর্য্য, পুরুষকার অবলম্বনে দেশকালপাত্র বুঝিয়া বিধি নিষেধ মানিয়া চলা এবং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একুল ওকুল দুকুল রাখিয়া ব্যবহার করা ইত্যাদির কিছুই লক্ষিত হইত না! দেখিলেই মনে হইত, 'মা, তোর শরণাগত বালককে যাহা কিছু বলিতে ও করিতে হইবে তাহা তুইই বলা ও করা'—হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ঐরূপ বলিয়া ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার ভিতর আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছা ও অভিমানকে ডুবাইয়া দিয়া এককালে যন্ত্রস্বরূপ হইয়াই যেন তিনি যত কিছু কার্য্য করিতেছেন। উহাতে সংসারের ইতরসাধারণের বিশ্বাস ও কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহার ব্যবহার-চেষ্টাদির বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হইয়া নানালোকে নানা কথা, প্রথম অস্ফুট জল্পনায়, পরে উচ্চ স্বরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ হইলে ও করিলে কি হইবে? জগদম্বার বালক এখন তাঁহারই অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে এবং যাহা করিবার তাহা করিতেছিল, সংসারের ক্ষুব্ধ কোলাহল তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছিল না। ঠাকুর এখন সংসারে থাকিয়াও সংসারে ছিলেন না। বহির্জগৎ এখন তাঁহার নিকট স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল এবং চেষ্টা করিয়াও তিনি উহাতে পূর্ব্বের ন্যায় বাস্তবতা আনিতে পারিতেছিলেন না। শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী আনন্দঘনমূর্ত্তিই কেবল তাঁহার নিকটে এখন একমাত্র সার পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

পূজা ধ্যানদি করিতে বসিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে বহুযত্নে দেখিতেন, কোন দিন মার হাতখানি, বা কোমলোজ্জ্বল পা খানি, বা 'সৌম্যাৎ-সৌম্য' হাস্য-দীপ্ত মধুর স্নিগ্ধ মুখখানি—এখন, পূজাধ্যান-কাল ভিন্ন অন্য সময়েও দেখিতে পাইতেন, সর্ব্বাবয়বসম্পন্না জ্যোতির্ম্ময়ী মা, হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, 'এটা কর্, ওটা করিস্ না,' বলিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন।

ঠাকুরের ইতিপূর্ব্বের পূজা ও দর্শনাদির সহিত এই সময়ের ঐ সকলের প্রভেদ।

পূর্ব্বে মাকে অন্নাদি নিবেদন করিয়া দেখিতেন, মার "নয়ন হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃরশ্মি 'লক্ লক্' করিয়া নির্গত হইয়া নিবেদিত আহার্য্যসমুদায় স্পর্শ ও তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নয়নে সংহৃত হইতেছে!"—এখন দেখিতে পাইতেন, ভোগ নিবেদন করিয়া দিবার পূর্ব্বেই সেই মা শ্রীঅঙ্গের প্রভায় মন্দির আলো করিয়া সাক্ষাৎ খাইতে বসিয়াছেন! হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, পূজাকালে একদিন সে সহসা উপস্থিত হইয়া দেখে ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে জবাবিল্বার্ঘ্য দিবেন বলিয়া উহা হস্তে লইয়া তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সহসা—'রোস্, রোস্, আগে মন্ত্রটা বলি তার পর খাস্'—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং পূজা সম্পূর্ণ না করিয়া অগ্রে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বে ধ্যান পূজাদিকালে দেখিতেন, সম্মুখস্থ পাষাণময়ী মূর্ত্তিতে এক অপূর্ব্ব জীবন্ত জাগ্রত অধিষ্ঠান আবির্ভূত হইয়াছে—এখন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পাষাণময়ীকে আর দেখিতেই পাইতেন না। দেখিতেন, তৎস্থলে জীবিতা জাগ্রতা চিন্ময়ী মাতা বরাভয়কর-সুশোভিতা হইয়া সর্ব্বদা দণ্ডায়মানা। ঠাকুর বলিতেন,

"নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়াছি, মা সত্য সত্যই নিশ্বাস ফেলিতে-ছেন! তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাত্রিকালে দীপালোকে মন্দির-দেউলে মার দিব্যাঙ্গের ছায়া কখন পতিত হইতে দেখি নাই! আপন কক্ষে বসিয়া শুনিয়াছি, মা পাঁইজোর পরিয়া বালিকার মত আনন্দিতা হইয়া ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপর তলায় উঠিতেছেন! পরীক্ষা করিবার জন্য কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছি, সত্য সত্যই মা মন্দিরের দ্বিতলের বারাণ্ডায় আলুলায়িত কেশে দাঁড়াইয়া কখন কলিকাতা, এবং কখন গঙ্গা দর্শন করিতেছেন!"

ঠাকুরের এই সময়ের পূজাদি সম্বন্ধে হৃদয়ের কথা।

হৃদয় বলিতেন, "ঠাকুর যখন শ্রীমন্দিরে থাকিতেন তখন ত কথাই নাই, অন্য সময়েও এখন কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলে গা কেমন 'ছম্ ছম্' করিত! অথচ, পূজাকালে ঠাকুর কিরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখিবার প্রলোভনও ছাড়িতে পারিতাম না। অনেক সময়ে সহসা উপস্থিত হইতাম এবং যাহা দেখিতাম তাহাতে তখন বিস্ময় ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ হইলেও পরে, বাহিরে আসিয়া মনে সন্দেহ হইত। ভাবিতাম, মামা কি সত্য সত্যই পাগল হইলেন না কি?—নতুবা পূজায় এরূপ অনাচার করেন কেন? আবার ভাবিতাম—রাণী-মাতা ও মথুর বাবু এইরূপ পূজার কথা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন ও বলিবেন? ঐকথা ভাবিয়া মনে বিষম ভয়ও হইত। মামার কিন্তু ঐরূপ কথা একবারও মনে আসিত না, এবং বলিলেও তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না! আবার, অধিক কথাও তাঁহাকে এখন বলিতে পারিতাম না; কে জানে কেন, একটা অব্যক্ত ভয় ও সঙ্কোচ আসিয়া অনেক সময় মুখ চাপিয়া ধরিত!

—এবং কি জানি কিসের জন্য, তাঁহার ও আমার মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয় দূরত্বের ব্যবধান অনুভব করিতাম। অগত্যা চুপ করিয়া তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতাম। কিন্তু মনে মনে ভাবিতাম যে, কোন দিন ইনি একটা কাণ্ড না বাঁধাইয়া বসেন।”

পূজাকালে মন্দির-মধ্যে সহসা উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের যে সকল চেষ্টা দেখিয়া হৃদয়ের বিস্ময়, ভয় ও ভক্তি যুগপৎ উপস্থিত হইত তৎসম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিলেন—

“দেখিতাম, জবাবিল্বার্ঘ্য সাজাইয়া মামা, প্রথমতঃ উহা দ্বারা নিজ মস্তক, বক্ষ, সর্ব্বাঙ্গ, এমন কি নিজ পদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া পরে উহা জগদম্বার পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন।

“দেখিতাম, মাতালের ন্যায় তাঁহার বক্ষ ও চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে এবং তদবস্থায় টলিতে টলিতে পূজাসন ত্যাগ করিয়া সিংহাসনের উপর উঠিয়া সস্নেহে জগদম্বার চিবুক ধরিয়া আদর ও গান করিতে, হাস্য, পরিহাস ও কথোপকথন করিতে, অথবা হাত ধরিয়া নৃত্য করিতেই আরম্ভ করিলেন!

“দেখিতাম, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অন্নাদি ভোগ নিবেদন করিতে করিতে তিনি সহসা উঠিয়া পড়িলেন এবং থাল হইতে এক গ্রাস অন্নব্যঞ্জন লইয়া দ্রুতপদে সিংহাসনে উঠিয়া মার মুখে স্পর্শ করাইতে করাইতে বলিতে লাগিলেন—‘খা, মা, খা, বেশ ক'রে খা!’ পরে হয়ত বলিলেন, ‘আমাকে খেতে বল্‌চিস্? আমি খাব এখন? আচ্ছা আমি খাচ্চি!’—এই বলিয়া উহার কিয়দংশ নিজেই গ্রহণ করিলেন, এবং অবশিষ্টাংশ পুনরায় মার মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন—‘আমি ত খেয়েছি, এইবার তুই খা!’ একদিন দেখি, ভোগ নিবেদন করিবার সময় একটা বিড়ালকে

কালীঘরে ঢুকিয়া ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকিতে দেখিয়া মামা, 'খাবি মা, খাবি মা' বলিয়া ভোগের অন্ন তাহাকেই খাওয়াইতে লাগিলেন!

"দেখিতাম, রাত্রে এক এক দিন জগন্মাতাকে শয়ন দিয়া মামা, 'আমাকে কাছে শুতে বল্‌চিস্,—আচ্ছা, শুচ্ছি', বলিয়া জগন্মাতার রৌপ্যনির্ম্মিত খট্টায় কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন!

"আবার দেখিতাম, পূজা করিতে বসিয়া তিনি এমন তন্ময়ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন যে বহুক্ষণ তাঁহার বাহ্যজ্ঞানের লেশমাত্র রহিল না!

"প্রত্যুষে উঠিয়া মা কালীর মালা গাঁথিবার নিমিত্ত মামা নিত্য পুষ্পচয়ন করিতেন। দেখিতাম, তখনও তিনি যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছেন, হাসিতেছেন, আদর, আবদার, রঙ্গ, পরিহাসাদি করিতেছেন!"

"আর দেখিতাম, রাত্রিকালে মামার আদৌ নিদ্রা নাই! যখনি জাগিয়াছি তখনই দেখিয়াছি তিনি ঐরূপে ভাবের ঘোরে কথা কহিতেছেন, গান করিতেছেন বা পঞ্চবটীতে যাইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন!"

ঠাকুরের রাগাত্মিকা পূজা দেখিয়া কালী-বাটীর খাজাঞ্চী প্রমুখ কর্ম্মচারীদিগের জল্পনা ও মথুর বাবুর নিকট সংবাদ প্রেরণ।

হৃদয় বলিতেন, ঠাকুরকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া মনে আশঙ্কা হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিষয়ে পরামর্শ লইবার তাঁহার উপায় ছিল না। কারণ, পাছে সে উহা ঠাকুরবাটীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রকাশ করে, এবং তাহারা শুনিয়া, ঐ কথা বাবুদের কাণে তুলিয়া তাঁহার মাতুলের অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু প্রতিদিন, প্রায় প্রতিদণ্ডেই যখন

ঐরূপ হইতে লাগিল তখন ঐকথা আর কেমনে চাপা যাইবে? অন্য কেহ কেহ তাঁহার ন্যায় পূজাকালে কালীঘরে আসিয়া ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ স্বচক্ষে দেখিয়া যাইয়া খাজাঞ্চী-প্রমুখ কর্ম্মচারী-দিগের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিল। তাহারা ঐকথা শুনিয়া কালীঘরে আসিয়া স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিল; কিন্তু ঠাকুরের দেবতাবিষ্টের ন্যায় উগ্র উত্তেজিত আকার, অসঙ্কোচ ব্যবহার ও নির্ভীক উন্মনাভাব দেখিয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সেই মুহূর্ত্তে সহসা তাঁহাকে কিছু বলিতে বা নিষেধ করিতে পারিল না! ঠাকুরবাটীর দপ্তরখানায় ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগের পরামর্শ চলিল। পরামর্শে স্থির হইল—হয় ভট্টাচার্য্য পাগল হইয়াছেন, না হয় ত তাঁহাতে উপদেবতার আবেশ হই-য়াছে! নতুবা পূজাকালে কেহ কখন ঐরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচার করিতে পারে না; যাহাই হউক, ৺দেবীর পূজা ভোগ রাগাদি কিছুই হইতেছে না; ভট্টাচার্য্য সকল নষ্ট করিয়াছেন; বাবুদের এ বিষয়ে সংবাদ না দিলেই নয়।

জানবাজারে মথুর বাবুর নিকটে সংবাদ প্রেরিত হইল। উত্তরে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি শীঘ্রই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে যথাবিধান করিবেন; যদবধি তাহা না করিতেছেন তদ-বধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবে পূজাদি করিতেছেন সেই ভাবেই করুন; তদ্বিষয়ে কেহ বাধা দিবে না। মথুর বাবুর ঐরূপ পত্র পাইয়া সকলে তাঁহার আগমনের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল এবং তাহাদের মধ্যে—"এইবারেই ভট্টাচার্য্য পদচ্যুত হইলেন, বাবু আসিয়াই ভট্টাচার্য্যকে দূর করিবেন—দেবতার নিকট অপরাধ, দেবতা কতদিন সহিবে বল"—ইত্যাদি নানা জল্পনা চলিতে লাগিল।

ঠাকুরের পূজা দেখিতে মথুর বাবুর আগমন ও তদ্বিষয়ে ধারণা।

মথুর বাবু কাহাকেও কিছু না জানাইয়া একদিন পূজাকালে সহসা আসিয়া কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভাববিভোর ঠাকুর কিন্তু তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য করিলেন না। পূজাকালে মাকে লইয়াই তিনি নিত্য তন্ময় হইয়া থাকিতেন, মন্দিরে কে আসিতেছে যাইতেছে সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ জ্ঞান থাকিত না। শ্রীযুত মথুরামোহন ঐ বিষয়টী আসিয়াই বুঝিতে পারিলেন। পরে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট তাঁহার বালকের ন্যায় আবদার অনুরোধ প্রভৃতি দেখিয়া উহা যে ঐকান্তিক প্রেমভক্তিপ্রসূত তাহাও ধরিতে পারিলেন। তাঁহার মনে হইল,—ঐরূপ অকপট ভক্তি বিশ্বাসে যদি মাকে না পাওয়া যায় তবে কিসে তাঁহার দর্শন লাভ হইবে? পূজা করিতে করিতে ভট্টাচার্য্যের কখন গলদশ্রুধারা, কখন অকপট উদ্দাম উল্লাস এবং কখন বা জড়ের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্যতা, অবিচলতা ও বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ লক্ষ্যরাহিত্য দেখিয়া তাঁহার চিত্ত একটা অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, শ্রীমন্দির দেবপ্রকাশে যথার্থই জম্ জম্ করিতেছে! তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল ভট্টাচার্য্য জগন্মাতার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন! অনন্তর ভক্তিপূতচিত্তে সজলনয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতা ও তাঁহার অপূর্ব্ব পূজককে দূর হইতে বারম্বার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এতদিনের পর ৺দেবীপ্রতিষ্ঠা সার্থক হইল, এতদিনের পর ৺দেবীপ্রতিষ্ঠা হইল, এতদিনে মার ঠিক্ ঠিক্ পূজা হইল!" মথুর বাবু সেদিন কর্ম্মচারীদিগের কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটীতে ফিরিলেন। পর দিন

মন্দিরের প্রধান কর্ম্মচারীর উপর তাঁহার নিয়োগ আসিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবেই পূজা করুন না কেন, তাঁহাকে বাধা দিবে না!'*

প্রবল ঈশ্বরপ্রেমে ঠাকুরের রাগাত্মিকা ভক্তিলাভ—ঐ ভক্তির ফল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক একথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঠাকুরের মনে এই সময়ে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল। বৈধী ভক্তির বিধিবদ্ধ সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া উহা এখন অহেতুক প্রেমভক্তির উচ্চমার্গে প্রবল-বেগে ধাবিত হইয়াছিল। ঐ পরিবর্ত্তন আবার, এমন সরল স্বাভাবিকভাবে উদয় হইয়াছিল যে, অপরের কথা দূরে থাকুক তিনি নিজেও ঐ কথা বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কেবল বুঝিয়াছিলেন যে, জগন্মাতার প্রতি ভালবাসার প্রবল প্রেরণায় তিনি ঐরূপ চেষ্টাদি না করিয়া থাকিতে পারিতে-ছেন না—কে যেন তাঁহাকে জোর করিয়া ঐরূপ করাইতেছে! ঐজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে হইতেছে, 'আমার এ কি প্রকার অবস্থা হইতেছে? আমি ঠিক পথে চলিতেছি ত?' ঐজন্য দেখা যায়, তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে জগদম্বাকে জানাইতেছেন—'মা, আমার এসব কি হইতেছে কিছুই জানি না, বুঝি না; তুই আমাকে যাহা করিবার করা, যাহা শিখাইবার শিখাইয়া দেখা দে! সর্ব্বদা আমার হাত ধরিয়া থাক্!' কাম, কাঞ্চন, মান, যশ, পৃথিবীর সমস্ত ভোগৈশ্বর্য্য হইতে মন ফিরাইয়া অন্তরের অন্তর হইতে তিনি জগন্মাতাকে ঐ কথা নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতাও তাহাতে তাঁহার হস্ত ধরিয়া সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭১ পৃষ্ঠা দেখ

প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাধক-জীবনের পরিপুষ্টি ও পূর্ণতার জন্য যখনি যাহা কিছু ও যেরূপ লোকের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, তখনি ঐ সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে অযাচিত-ভাবে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তির চরম সীমায় স্বাভাবিক সহজভাবে আরূঢ় করাইয়াছিলেন! গীতামুখে শ্রীভগবান ভক্তের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

গীতা—৯ম—২২।

যে সকল ব্যক্তি অনন্যচিত্তে উপাসনা কবিয়া আমার সহিত নিত্য-যুক্ত হইয়া থাকে—সম্পূর্ণ মন আমাতে রাখিয়া শরীরধারণোপযোগী আহার-বিহারাদি বিষয়ের জন্যও চিন্তা না করে— প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই আমি (অযাচিত হইয়াও) তাহাদিগের নিকট আনয়ন করি। গীতার ঐ প্রতিজ্ঞা ঠাকুরের জীবনে কিরূপ বর্ণে বর্ণে সাফল্য লাভ করিয়াছিল তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের জীবন যত আলোচনা করিব তত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইব! কামকাঞ্চনৈকলক্ষ্য স্বার্থপর বর্ত্তমান যুগে শ্রীভগবানের ঐ প্রতিজ্ঞার সত্যতা সুস্পষ্টরূপে পুনঃ প্রমাণিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল: যুগে যুগে সাধকেরা, "সব্ ছোড়ে সব্ পাওয়ে"—শ্রীভগবানের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলে প্রয়ো-জনীয় কোন বিষয়ের জন্য সাধককে অভাবগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে হয় না—একথা মানবকে উপদেশ করিয়া আসিলেও দুর্ব্বলহৃদয় বিষয়াবদ্ধ মানব তাহা বর্ত্তমান যুগে আবার পূর্ণভাবে না দেখিয়া বিশ্বাসী হইতে পারিতেছিল না। সেজন্য সম্পূর্ণ

অনন্যচিত্ত ঠাকুরকে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার শাস্ত্রীয় ঐ বাক্যের সফলতা মানবকে দেখাইবার এই অদ্ভুত লীলাভিনয়! হে মানব, পূতচিত্তে একথা শ্রবণ করিয়া ত্যাগের পথে যথাসাধ্য অগ্রসর হও!

ঠাকুরের কথা—রাগাত্মিকা বা রাগানুগা ভক্তির পূর্ণ প্রভাব, কেবল অবতার পুরুষদিগের শরীর মন ধারণ করিতে সমর্থ।

ঠাকুর বলিতেন, ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বন্যা যখন অতর্কিতভাবে মানবজীবনে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহাকে চাপিবার ঢাকিবার সহস্র চেষ্টা করিলেও পারা যায় না। শুধু তাহাই নহে, অনেক সময়ে স্থূল জড় দেহ মনের সেই প্রবল বেগ ধারণ করিতে সক্ষম না হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। ঐরূপে অনেক সাধক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন! পূর্ণজ্ঞান বা পূর্ণা ভক্তির উদ্দাম বেগ ধারণ করিবার জন্য, উপযোগী শরীরের প্রয়োজন। অবতারপ্রথিত মহাপুরুষদিগের শরীরসকলকেই কেবলমাত্র উহার পূর্ণ বেগ সর্ব্বক্ষণ ধারণ করিয়া সংসারে জীবিত থাকিতে এপর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। ভক্তিশাস্ত্র সেজন্য তাঁহাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহবান্ বলিয়া বারম্বার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, রজঃ ও তমোগুণ-সম্পর্কশূন্য শুদ্ধ সত্ত্বগুণমাত্র উপাদানে গঠিত শরীর ধারণ করিয়া সংসারে আগমন করেন বলিয়াই তাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের পূর্ণবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন। ঐরূপ শরীর ধারণ করিয়াও তাঁহাদিগকে ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বেগে অনেক সময় ক্লিষ্ট ও মুহ্যমান হইতে দেখা গিয়া থাকে, বিশেষতঃ ভক্তিমার্গ-সঞ্চরণশীল অবতারপুরুষদিগকে! ভাবের প্রবল প্রেরণায় শ্রীযুক্ত ঈশা ও শ্রীচৈতন্যের শরীরের অঙ্গগ্রন্থিসকল শিথিল হওয়া, ঘর্ম্মের ন্যায় শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়া

বিন্দু বিন্দু করিয়া শোণিত নির্গত হওয়া প্রভৃতি কথাতেই উহা বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল শারীরিক বিকার ক্লেশকর বলিয়া উপলব্ধ হইলেও উহাদের সহায়েই তাঁহাদিগের শরীর পূর্ব্বোক্ত অসাধারণ মানসিক বেগ ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া আসে। পরে, ঐ বেগ-ধারণ যখন তাঁহাদিগের শরীরের সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা হয়, দেখা যায়, ঐ বিকৃতিসকলও তখন আর তাঁহাদিগের ভিতর পূর্ব্বের ন্যায় সকল সময়ে পরিলক্ষিত হয় না।

ঐ ভক্তিপ্রভাবে ঠাকুরের শারীরিক বিকার ও তজ্জনিত কষ্ট। যথা, গাত্রদাহ। প্রথম গাত্রদাহ, পাপপুরুষ দগ্ধ-হইবার কালে; দ্বিতীয়, প্রথম দর্শনলাভের পর ঈশ্বরবিরহে; তৃতীয় মধুরভাব সাধনকালে।

ভাব-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় ঠাকুরের শরীরে এখন হইতে নানা প্রকার অদ্ভুত বিকারপরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল। সাধনার প্রারম্ভ হইতে তাঁহার গাত্রদাহের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। উহার বৃদ্ধিতে তাঁহাকে অনেক সময় বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ঠাকুর স্বয়ং আমাদেয় নিকট অনেক সময় উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলিতেন, সন্ধ্যা-পূজাদি করিবার সময় শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে ভিতরের পাপপুরুষ দগ্ধ হইয়া গেল এইরূপ চিন্তা করিতাম। তখন কে জানিত, শরীরে সত্য সত্যই পাপ-পুরুষ আছে এবং উহাকে বাস্তবিক দগ্ধ ও বিনষ্ট করা যায়! সাধনার প্রারম্ভ হইতে গাত্রদাহ উপস্থিত হইল; ভাবিলাম, এ আবার কি রোগ হইল। ক্রমে উহা খুব বাড়িয়া অসহ্য হইয়া উঠিল। নানা কবিরাজী তেল মাখা গেল; কিন্তু কিছুতেই উহা কমিল না। পরে একদিন পঞ্চবটীতে বসিয়া আছি; দেখ্‌চি কি—মিস্ কালো রঙ্, আরক্তলোচন, ভীষণাকার একটা পুরুষ যেন মদ খাইয়া টলিতে টলিতে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর হইতে বাহির

হইয়া সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল; আবার দেখি কি—আর এক-জন সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষও, গৈরিক ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া ঐরূপে শরীরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বোক্ত ভীষণাকার পুরুষকে সবলে আক্রমণ ও কিছুক্ষণ পরে নিহত করিল! ঐরূপ দর্শনের পরে কিছুদিনের জন্য গাত্রদাহ কমিয়া গেল! পাপপুরুষ দগ্ধ হইবার কালে ছয় মাস কাল অনবরত বিষম গাত্রদাহে কষ্ট পাইয়াছিলাম!'

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, পাপ-পুরুষ বিনষ্ট হইবার পরে গাত্রদাহ নিবারিত হইলেও অল্পকাল পরেই উহা তাঁহার আবার আরম্ভ হইয়াছিল। তখন ঠাকুর বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাগমার্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাদিতে নিযুক্ত। ক্রমে ঐ গাত্রদাহ এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে ভিজা গামছা মাথায় দিয়া তিনি তিন চারি ঘণ্টাকাল গঙ্গাগর্ভে শরীর ডুবাইয়া বসিয়া থাকিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। পরে ব্রাহ্মণী আসিয়া ঐ গাত্রদাহ, শ্রীভগবানের পূর্ণ দর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠা ও বিরহবেদনাপ্রসূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যেরূপ সহজ উপায়ে উহা নিবারণ করেন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি।* উহার পরে ঠাকুর মধুরভাব সাধন করিবার কাল হইতে আবার গাত্রদাহে পীড়িত হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিয়াছিলেন—বুকের ভিতর এক মালসা আগুন রাখিলে যেরূপ উত্তাপ ও যন্ত্রণা হয়, ঠাকুর ঐকালে সেইরূপ অনুভব করিতেন এবং অস্থির হইয়া পড়িতেন। ঐরূপ গাত্রদাহ মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বহুকাল পর্য্যন্ত কষ্ট দিয়াছিল। অনন্তর সাধনকালের কয়েক বৎসর পরে তিনি বারাসাতনিবাসী

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়—৮ পৃষ্ঠা।

মোক্তার শ্রীযুক্ত কানাই লাল ঘোষালের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন; ইনি উন্নত শক্তিসাধক ছিলেন এবং তাঁহার ঐরূপ দাহের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ইষ্টকবচ অঙ্গে ধারণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ঐ কবচধারণে পূর্ব্বোক্ত দাহ নিবারিত হইয়াছিল।

পূজা করিতে করিতে বিষয়কর্ম্মের চিন্তার জন্য রাণী রাসমণিকে ঠাকুরের দণ্ড প্রদান।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের ঐরূপ অদ্ভুত পূজা দেখিয়া জানবাজারে ফিরিয়া মথুরামোহন রাণী মাতাকে শুনাইলেন। ভক্তিমতী রাণী উহা শুনিয়া বিশেষ পুলকিতা হইলেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাটীতে আসিয়া ভট্টাচার্য্যের মুখনিঃসৃত ভক্তি-মাখা সঙ্গীত শুনিয়া তিনি তাঁহার প্রতি ইতিপূর্ব্বেই স্নেহপরায়ণা হইয়াছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ-ভগ্নকালে ভট্টাচার্য্যের ভক্তিপূত বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিতা হইয়াছিলেন। * অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপালাভ যে, ঠাকুরের ন্যায় পবিত্র হৃদয়ের সম্ভবপর একথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। ইহার অল্পকাল পরে কিন্তু এমন একটী ঘটনা উপস্থিত হইল যাহাতে রাণী ও মথুর বাবুর ঐ বিশ্বাস বিচলিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা হইয়াছিল। রাণী একদিন মন্দিরে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন ও পূজাদি করিতে যাইয়া তদ্বিষয়ে তন্ময় না হইয়া বিষয়কর্ম্মসম্পর্কীয় একটী মামলার ফলাফল সাগ্রহে চিন্তা করিতেছিলেন! ঠাকুর অনুরুদ্ধ হইয়া সে সময় তাঁহাকে ঐ স্থানে বসিয়া সঙ্গীত শুনাইতেছিলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাঁহার মনের তদবস্থা জানিতে পারিয়া, 'এখানেও ঐ চিন্তা'—বলিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গে আঘাত করিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগ-

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৯০ পৃষ্ঠা

ন্মাতার সম্মুখে বিষয়চিন্তা হইতে নিরস্ত হইতে শিক্ষাপ্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতার কৃপাপাত্রী সাধিকা রাণী উহাতে নিজ মনের দুর্ব্বলতা ধরিতে পারিয়া অনুতপ্তা হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ঐ ঘটনায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি। *

ভক্তির পরিণতিতে ঠাকুরের বাহ্য পূজা ত্যাগ। এইকালে তাঁহার অবস্থা।

শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে লইয়া ঠাকুরের অনুরাগ ও আনন্দোল্লাস ইহার অল্পদিন পরেই এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, তাঁহার দ্বারা দেবীসেবার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যকলাপ কোনরূপে চলাও এখন অসম্ভব হইল। আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতিতে বৈধী কর্ম্মের ত্যাগ কিরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া থাকে তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্তরূপে ঠাকুর বলিতেন, 'যেমন গৃহস্থের বধূর যে পর্য্যন্ত গর্ভ না হয় ততদিন তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে সকল জিনিস খাইতে ও সকল কাজ করিতে দেয়; গর্ভ হইলেই ঐ সকল বিষয়ে একটু আধটু বাচবিচার আরম্ভ হয়; পরে সেই গর্ভ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাহার কাজ কমাইয়া দেওয়া হয়; ক্রমে যখন সে আসন্নপ্রসবা হয়, গর্ভস্থ শিশুর অনিষ্টাশঙ্কায় তখন তাহাকে আর কোন কার্য্যই করিতে দেওয়া হয় না; পরে যখন তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন ঐ সন্তানকে নাড়াচাড়া করিয়াই তাহার দিন কাটিতে থাকে!' শ্রীশ্রীজগদম্বার বাহ্যপূজা ও সেবাদি ত্যাগও ঠাকুরের ঠিক ঐরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া আসিয়াছিল। এখন আর ঠাকুরের পূজা ও সেবার কালাকাল জ্ঞান ছিল না। সদাই আপনভাবে বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার যখন যেরূপে সেবা করিবার ইচ্ছা হইত

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৫ম অধ্যায় ১৫৬।৫৭ পৃষ্ঠা।

তখন সেইরূপই করিতেন। যথা—পূজা না করিয়াই হয়ত ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন! অথবা, ধ্যানে তন্ময় হইয়া আপনার পৃথগস্তিত্ব এককালে ভুলিয়া গিয়া দেবীপূজার নিমিত্ত আনীত পুষ্পচন্দনাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত করিয়া বসিলেন! ভিতরে বাহিরে নিরন্তর জগদম্বার দর্শনেই যে, ঠাকুরের এই কালের কার্য্যকলাপ ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, একথা আমরা তাঁহার নিকটে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। আর শুনিয়াছি যে, ঐ তন্ময়তার অল্পমাত্র হ্রাস হইয়া যদি এই সময়ে কয়েক দণ্ডের নিমিত্তও তিনি মাতৃদর্শনে বাধা প্রাপ্ত হইতেন ত এমন আকুল ব্যাকুলতা আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিত যে, তখন আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া মুখ ঘর্ষণ করিতে করিতে ব্যাকুল ক্রন্দনে দিক পূর্ণ করিতেন! প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া দম বন্ধ হইয়া আসিত! আছাড় খাইয়া পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরলিপ্ত হইয়া যাইতেছে, সে বিষয় লক্ষ্যই হইত না! জলে পড়িলেন বা অগ্নিতে পড়িলেন, তাহারও জ্ঞান থাকিত না! পরক্ষণেই আবার শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন পাইয়া সে ভাব কাটিয়া যাইত এবং তাঁহার মুখমণ্ডল অদ্ভুত জ্যোতি ও উল্লাসে পূর্ণ হইত—তিনি যেন আর একব্যক্তি হইয়া যাইতেন!

পূজাত্যাগসম্বন্ধে হৃদয়ের কথা এবং ঠাকুরের বর্ত্তমান অবস্থাসম্বন্ধে মথুরের সন্দেহ।

ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থালাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মথুর বাবু তাঁহার দ্বারা পূজাকার্য্য কোনরূপে চালাইয়া লইতেছিলেন। এখন আর তদ্রূপ করা অসম্ভব বুঝিয়া পূজাকার্য্যের অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে সংকল্প করিলেন। হৃদয় বলেন, "মথুর বাবুর ঐরূপ সংকল্পের একটী কারণও উপস্থিত হইয়াছিল। ভাবাবিষ্ট হইয়া পূজাসন হইতে সহসা

উত্থিত হইয়া ঠাকুর একদিন মথুরবাবু ও হৃদয়কে মন্দির-মধ্যে নিকটে দেখিলেন এবং হৃদয়ের হাত ধরিয়া পূজাসনে বসাইয়া এবং মথুর বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আজ হইতে হৃদয় পূজা করিবে ; মা বলিতেছেন, আমার পূজার ন্যায় হৃদয়ের পূজা মা সমভাবে গ্রহণ করিবেন!' বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরের ঐ কথা দেবাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন।" হৃদয়ের ঐ কথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না ; তবে বর্ত্তমান অবস্থায় ঠাকুরের নিত্য পূজাদি করা যে অসম্ভব একথা মথুরের বুঝিতে বাকি ছিল না।

গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজের চিকিৎসা।

প্রথমদর্শনকাল হইতে মথুর বাবুর মন যে ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ দিন হইতে তিনি সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ তাঁহাতে অদ্ভুত গুণরাশির তিনি যত পরিচয় পাইতেছিলেন ততই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কিছু কিছু সেবা আবশ্যকমত করিতেছিলেন, এবং স্নেহের চক্ষে দেখিয়া তাঁহাকে অপরের অযথা অত্যাচার হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। যথা—ঠাকুরের বায়ুপ্রবণ ধাতু জানিয়া মথুর তাঁহার নিমিত্ত নিত্য মিছরির সরবৎ পানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন ; ঠাকুর রাগানুগা ভক্তিপ্রসূত পূজায় প্রবৃত্ত হইলে বাধা পাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ; ঐরূপ আরও কয়েকটী কথার আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।* কিন্তু রাণী রাসমণির অঙ্গে আঘাত করিয়া ঠাকুর

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭৫ পৃষ্ঠা

যে দিন তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে মথুরের মন যে, কিছু সন্দিগ্ধ হইয়াছিল এবং ঠাকুরের বায়ুরোগ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, একথা আমাদিগের সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। বোধ হয়, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মথুর ঠাকুরের উন্নত অবস্থার কথা এখন হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহাতে আধ্যাত্মিকতার সহিত উন্মত্ততার সংযোগ অনুমান করিয়াছিলেন। কারণ এই সময়ে তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা ঠাকুরের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

শারীরিক ব্যাধি হইয়াছে অনুমান করিয়া ঐরূপে ঠাকুরের জন্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই মথুর এখন ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু নিজ মনকে সুসংযত রখিয়া যাহাতে তিনি সাধনায় অগ্রসর হন, তর্কযুক্তিসহায়ে তাঁহাকে তদ্বিষয় বুঝাইতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। লাল জবাফুলের গাছে একত্র এক সঙ্গে শ্বেত জবা কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়া কিরূপে মথুরের ঐসকল তর্ক নিষ্ফল হইয়াছিল এবং কিরূপে তিনি এখন ঠাকুরের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।*

সে যাহা হউক, মন্দিরের নিত্য নিয়মিত ৺দেবীসেবা ঠাকুরের দ্বারা এখন নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া মথুর বাবু ঐ বিষয়ের অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এবং ঠাকুরের খুল্লতাতপুত্র শ্রীযুক্ত রামতারক চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে কর্ম্মান্বেষণে ঠাকুর-বাটীতে উপস্থিত হওয়ায় ঠাকুর আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে,

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

৺দেবীপূজায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সকল ঘটনা সন ১২৬৫ সালে, ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উপস্থিত হইয়াছিল।

শ্রীযুত রামতারককে ঠাকুর হলধারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। আমরা তাঁহার নিকটে ইঁহার সম্বন্ধে অনেক সময়ে অনেক কথা শুনিয়াছি। হলধারী সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাচারী সাধক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যাত্ম রামায়ণাদি গ্রন্থে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল ও তিনি উহাদিগকে নিত্য পাঠ করিতেন। ৺দেবী অপেক্ষা ৺বিষ্ণুতে তাঁহার অধিক প্রীতি থাকিলেও ৺শক্তির উপর তাঁহার দ্বেষ ছিল না। সেজন্য বিষ্ণুভক্ত হইয়াও তিনি মথুর বাবুর অনুরোধে এখন শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তবে ঐ কার্য্যে ব্রতী হইবার অগ্রে তিনি মথুর বাবুকে বলিয়া সিধা লইয়া নিত্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, মথুর বাবু তাহাতে প্রথম আপত্তি করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেন, তোমার ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভাগিনেয় হৃদয় ঠাকুর-বাড়ীতে প্রসাদ পাইতেছে ?" বুদ্ধিমান হলধারী তাহাতে বলেন, "আমার ভ্রাতার আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা ; তাহার কিছুতেই দোষ নাই ; আমার ঐরূপ অবস্থা হয় নাই, নিষ্ঠাভঙ্গে দোষ হইবে।" মথুর বাবু তাঁহার ঐরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হন, এবং তদবধি হলধারী সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে নিত্য স্বপাক ভোজন করিতেন।

হলধারীর আগমন।

শক্তিদ্বেষী না হইলেও হলধারীর ৺দেবীকে পশুবলিদানে প্রবৃত্তি হইত না ; এবং ঠাকুর-বাটীতে পর্ব্বকালে ৺জগদম্বাকে পশুবলি প্রদান করা বিধি থাকায় ঐকালে আনন্দে ও উৎসাহে পূজা করিতে পারিতেন না। কথিত আছে, হলধারী প্রায় এক মাস পূজা করিবার পরে, এক দিবস সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছেন

এমন সময় দেখিলেন, ৺দেবী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বলেন, "তুই এস্থান হইতে উঠিয়া যা; তোর পূজা করিতে হইবে না; পূজাপরাধে তোর সন্তানের মৃত্যু হইবে!" শুনা যায়, এই ঘটনার কয়েক দিন পরে হলধারী, পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পান এবং ঠাকুরের নিকট ঐ বিষয় আদ্যোপান্ত বলিয়া ৺দেবীপূজায় বিরত হন। সেজন্য এখন হইতে তিনি শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পূজা করিতে এবং হৃদয় ৺দেবীপূজা করিতে থাকেন। ঘটনাটী আমরা হৃদয়ের ভ্রাতা শ্রীযুত রাজারামের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম।

অষ্টম অধ্যায়।

প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা।

ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে হইলে, তিনি আমাদিগকে ঐ কালসম্বন্ধে নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ঐ কালের একটা সময় নির্দ্দেশ করা অসম্ভব হইবে না। পাঠককে আমরা বলিয়াছি, আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল নিরন্তর নানা মতের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। রাণী রাসমণির মন্দির-সংক্রান্ত দেবোত্তর দানপত্র দর্শনে

সাধনকালের সময়-নিরূপণ।

নিশ্চয় সাব্যস্ত হয়, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৩১ মে বৃহস্পতিবারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সন ১২৬২ সালেই ঠাকুর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সন ১২৬২ হইতে সন ১২৭৩ সাল পর্য্যন্তই যে তাঁহার সাধনকাল, একথা সুনিশ্চিত। কিন্তু উক্ত দ্বাদশ বৎসর ঠাকুরের সাধনকাল বলিয়া বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহার পরে তীর্থদর্শনে গমন করিয়া ঐ সকল স্থলে এবং তথা হইতে ফিরিয়া দক্ষিণেশ্বরে তিনি কখন কখন সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা দেখিতে পাইব।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বৎসরকে আমরা তিনভাগে ভাগ করিয়া উহার প্রত্যেক অংশের আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। প্রথম ১২৬২ হইতে ১২৬৫, চারি বৎসর—যে কালের প্রধান প্রধান কথার আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়, ১২৬৬ হইতে ১২৬৯ পর্য্যন্ত, চারি বৎসর—যে কালে ঠাকুর, ব্রাহ্মণীর নির্দ্দেশে গোকল ব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সকল সাধন যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৃতীয় ১২৭০ হইতে ১২৭৩ পর্য্যন্ত, চারি বৎসর—যে কালে তিনি ‘জটাধারী’ নামক রামাইত সাধুর নিকট হইতে রাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট হন ও শ্রীশ্রীরামলালাবিগ্রহ লাভ করেন, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখীভাবলাভের জন্য ছয়মাস কাল স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া সাধনায় নিযুক্ত থাকেন—আচার্য্য শ্রীতোতাপুরীর নিকট হইতে বৈদিক মহাবাক্য গ্রহণ করিয়া সমাধির নির্ব্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে শ্রীযুক্ত গোবিন্দের নিকট

ঐ কালের তিনটী প্রধান বিভাগ।

হইতে ইস্‌লামী ধর্ম্মে উপদেশ গ্রহণ করেন। উক্ত দ্বাদশ বৎসরের ভিতরেই তিনি বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সখ্যভাব সাধন এবং কর্ত্তাভজা নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণবমতের অবান্তর সম্প্রদায় সকলের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব মতের অবান্তর সম্প্রদায়সকলের সহিত তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, একথা বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী প্রমুখ ঐ সকল পথের সাধকবর্গের তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তালাভের জন্য আগমনেই স্পষ্ট বুঝা যায়। ঠাকুরের সাধনকালকে পূর্ব্বোক্তরূপে তিনভাগে ভাগ করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ তিন ভাগের প্রত্যেকটীতে অনুষ্ঠিত তাঁহার সাধনসকলের মধ্যে একটা শ্রেণীগত বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুরের অবস্থা ও দর্শনাদির পুনরাবৃত্তি।

আমরা দেখিয়াছি—সাধনকালের প্রথম ভাগে ঠাকুর বাহিরের সহায়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টের নিকট দীক্ষামাত্র গ্রহণ করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঈশ্বরলাভের জন্য অন্তরের একান্ত ব্যাকুলতাই ঐকালে তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিল এবং ঐ ব্যাকুলতাই ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর ভাব ধারণ করিয়া অচিরকাল মধ্যে তাঁহার শরীর মনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আশাতীত নবীনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল। তদ্ভিন্ন উপাস্যের প্রতি অসীম ভালবাসা আনিয়া উহা, বৈধী ভক্তির কঠোর বহিঃশাসন উল্লঙ্ঘন করাইয়া তাঁহাকে রাগানুগা ভক্তিপথে অগ্রসর করিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রত্যক্ষ দর্শনে ধনী করিয়া তাঁহাকে যোগ-বিভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

ঐকালে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন লাভ হইবার পরে ঠাকুরকে আবার সাধন কেন করিতে হইয়াছিল। গুরুপদেশ শাস্ত্রবাক্য ও নিজ কৃত প্রত্যক্ষের একতাদর্শনে শান্তিলাভ।

পাঠক হয়ত বলিবেন—'তবে আর বাকি রহিল কি?—ঐকালেই ত ঠাকুর যোগসিদ্ধি ও ঈশ্বরলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; তবে পরে আবার সাধন কেন?' উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হয়—একভাবে ঐ কথা যথার্থ হইলেও পরবর্ত্তীকালে সাধনার প্রয়োজন ছিল। ঠাকুর বলিতেন—'বৃক্ষ ও লতাসকলের সাধারণ নিয়মে আগে ফুল, পরে ফল হইয়া থাকে; উহাদের কোন কোনটী কিন্তু এমন আছে যাহাদিগের আগেই ফল দেখা দিয়া পরে ফুল দেখা দেয়!' সাধনক্ষেত্রে ঠাকুরের মনের বিকাশও ঠিক ঐরূপভাবে হইয়াছিল। এজন্য পাঠকের পূর্ব্বোক্ত কথাটা আমরা এক ভাবে সত্য বলিতেছি। কিন্তু সাধনকালের প্রথম ভাগে ঐরূপে দর্শনাদি হইলেও ঐ সকলকে, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ সাধককুলের উপলব্ধির সহিত যতক্ষণ না মিলাইতে পারিতেছিলেন, শাস্ত্রীয় প্রণালী অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া যতক্ষণ না নিজ উপলব্ধিসকলকে পুনরায় উপলব্ধি করিতে-ছিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সকলের সত্যতা এবং উহাদিগের চরম সীমা সম্বন্ধে ঠাকুর দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিতেছিলেন না। সেজন্য পরবর্ত্তীকালে তাঁহার সাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেজন্য শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্য কৃপায় কেবলমাত্র অন্তরের ব্যাকুলতা-সহায়ে যাহা তিনি ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া শুনিয়াছিলেন তাহাই আবার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ ও প্রণালী অবলম্বনে প্রত্যক্ষ করিবার তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন গুরুমুখে শ্রুত অনুভব ও শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সাধককুলের অনুভবের সহিত সাধক আপন ধর্ম্মজীবনের দিব্যদর্শন ও অলৌকিক অনুভব-

সকল যতক্ষণ না মিলাইয়া সমসমান বলিয়া দেখিতে পায় ততক্ষণ সে এককালে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না; এবং গুরু-মুখে শ্রুত অনুভব, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ প্রাচীন সাধককুলের অনুভব, ও সাধক নিজে যাহা অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতেছে, এই তিনটী বিষয়কে মিলাইয়া সাধক যখনি এক বলিয়া দেখিতে পায় তখনই সে সর্ব্বতোভাবে ছিন্নসংশয় হইয়া পূর্ণ শান্তির অধিকারী হয়।

ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীর ঐরূপ হইবার কথা।

পূর্ব্বোক্ত কথার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমরা পাঠককে ব্যাসপুত্র পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত শুকদেব গোস্বামীর জীবন-ঘটনা নির্দ্দেশ করিতে পারি। মায়া-রহিত শুকের জন্মাবধি জীবনে নানাপ্রকার দিব্যদর্শন ও অনুভব উপস্থিত হইত। ঐ সকলের সত্যাসত্য ও চরম সীমা নির্দ্ধারণের জন্য তিনি নিজ পিতা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্যাসের নিকট ষড়ঙ্গ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। স্বাধ্যায় সমাপ্ত হইলে তিনি পিতাকে বলিলেন, শাস্ত্রে যে সকল অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে তাহা ত আমি জন্মাবধিই অনুভব করিতেছি; কিন্তু ঐ সকল অবস্থা ও অনুভবই যে চরম সত্য তদ্বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইতে পারিতেছি না; অতএব ঐ বিষয়ে আপনি যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহাই এখন আমাকে বলুন। মহাবুদ্ধি ব্যাস মনে মনে জল্পনা করিলেন, সাধনপ্রসূত নিজ জীবনের অনুভবসমূহের উল্লেখ করিয়া আমি শুককে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও চরম সত্যসম্বন্ধে উপদেশ সতত করিয়া আসিয়াছি, তাহাতেও তাহার মন হইতে সন্দেহ দূর হয় নাই, সে ভাবিয়াছে সত্য-লাভার্থী পুত্রের মানসিক ব্যাকুলতার প্রশমনের জন্য পুত্র-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া আমি তাহাকে ঐরূপ বলিয়াছি; সেজন্য

অন্য কোন মনীষী ব্যক্তির নিকটে তাহার ঐ বিষয় শ্রবণ করা ভাল। ঐ কথা ভাবিয়া ব্যাস বলিলেন, আমি তোমার ঐ সন্দেহ নিরসনে অসমর্থ; মিথিলার বিদেহরাজ জনকের যথার্থ জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপত্তির কথা তোমার অবিদিত নাই; তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তুমি সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লও। মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে, শুক পিতার ঐ কথা শুনিয়া অবিলম্বে মিথিলা গমন করিলেন এবং রাজর্ষি জনকের নিকট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যেরূপ অনুভূতি উপস্থিত হয়, শুনিয়া গুরূপদেশ শাস্ত্র-বাক্য ও নিজ জীবনানুভবের সহিত উহার একতা দেখিয়া শান্তি-লাভ করিলেন।

ঠাকুরের সাধনার অন্য কারণ স্বার্থে নহে—পরার্থে।

পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্ন, ঠাকুরের পরবর্ত্তী কালে সাধনার অন্য গভীর কারণসমূহও ছিল। ঐ সকলের উল্লেখ-মাত্রই আমরা এখানে করিতে পারিব। নিজ জীবনে শান্তিলাভই ঠাকুরের সাধনার উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে জগতের কল্যাণের জন্য শরীর-পরিগ্রহ করাইয়াছিলেন। সুতরাং যথার্থ আচার্য্য-পদবী গ্রহণের জন্য তাঁহাকে সকল প্রকার ধর্ম্ম-মতের সাধনা ও চরমোদ্দেশ্যের সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল। সেজন্যই স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া ঠাকুরেব সকল প্রকার ধর্ম্মমতের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের অদ্ভুত প্রয়াস। শুধু তাহাই নহে, নিরক্ষর পুরুষের জীবনে, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থাসকলের কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-সহায়ে স্বভাবতঃ উদয় করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরের শরীর-মনাবলম্বনে বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণাদি সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সত্যতাও বর্ত্তমান যুগে প্রমাণিত করিতে অগ্রসর হইয়া-ছিলেন। সেজন্য স্বয়ং শান্তিলাভ করিবার পরেও ঠাকুরের

সাধনার বিরাম হয় নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের সিদ্ধপুরুষ ও পণ্ডিত-সকলকে ঠাকুরের নিকট যথাকালে উপস্থিত করিয়া, তাঁহাকে সাধন ও ধর্ম্মশাস্ত্রসকল শ্রবণ করাইয়া, শ্রুতিধরত্বগুণসহায়ে ঐ সকল আয়ত্ত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা যে জগন্মাতা ঠাকুরকে পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনবিশেষ সাধনের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন, একথা আমরা এই অদ্ভুত জীবনালোচনায় যত অগ্রসর হইব ততই স্পষ্ট বুঝিতেঁ পারিব।

যথার্থ ব্যাকুলতার উদয়ে সাধকের ঈশ্বরলাভ। ঠাকুরের জীবনে উক্ত ব্যাকুলতা কতদূর উপস্থিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঈশ্বর দর্শনের জন্য অন্তরের ব্যাকুল আগ্রহই ঠাকুরের প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল। তখনও এমন কোন লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হন নাই যিনি তাঁহাকে সকল বিষয়ে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি-বদ্ধ পথে চালিত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর করিবেন। সুতরাং সকল সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত তীব্র আগ্রহরূপ সাধারণ বিধিই তাঁহার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছিল। কেবলমাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের ৺জগদম্বার দর্শন লাভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বাহ্য কোন বিষয়ের সহায়তা না পাইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা থাকিলেই সাধকের ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উহার সহায়ে সিদ্ধকাম হইতে হইলে ঐ ব্যাকুলাগ্রহের পরিমাণ যে কত অধিক হওয়া আবশ্যক তাহা আমরা অনেক সময় অনুধাবন করিতে ভুলিয়া যাই। ঠাকুরের এই সময়ের জীবনালোচনা করিলে সে কথা আমাদিগের স্পষ্ট প্রতীতি হয়। আমরা দেখিয়াছি, তীব্র ব্যকুলতার প্রেরণায় তাঁহার আহার, নিদ্রা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়-বদ্ধ সংস্কার ও অভ্যাসসকল যেন কোথায় লুপ্ত হইয়াছিল, এবং

শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা দূরে থাকুক, জীবনরক্ষার দিকেও কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না! ঠাকুর বলিতেন, "শরীর সংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় ঐ কালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধূলা মাটি লাগিয়া আপনা আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে পক্ষিসকল জড়পদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধূলিরাশি চঞ্চুদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত! আবার সময়ে সময়ে ভগবদ্বিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ করিতাম যে কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত! ঐরূপে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া এসময়ে চলিয়া যাইত তাহার হুঁসই থাকিত না! পরে সন্ধ্যাসমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকিত তখন মনে পড়িত—দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না! তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম না; আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া 'মা, এখনও দেখা দিলি না' বলিয়া চীৎকার ক্রন্দনে দিক্ পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতাম। লোকে বলিত, 'পেটে শূল ব্যথা ধরিয়াছে তাই অত কাঁদিতেছে'।" আমরা যখন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি তখন সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরেব জন্য প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতার প্রয়োজন বুঝাইতে সাধনকালের পূর্ব্বোক্ত কথাসকল শুনাইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেন—"লোকে পত্নী পুত্রাদির মৃত্যুতে বা বিষয় হারাইয়া ঘটী ঘটী চোখের জল ফেলে; কিন্তু ঈশ্বর লাভ হইল না বলিয়া কে আর ঐরূপ করে বল? অথচ

বলে, 'তাঁহাকে এত ডাকিলাম, তত্রাচ তিনি দর্শন দিলেন না!' ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ব্যাকুলভাবে একবার ক্রন্দন করুক্ দেখি, কেমন না তিনি দর্শন দেন।" কথাগুলি আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিত; শুনিলেই বুঝা যাইত, তিনি নিজ পূর্ব্বজীবনে ঐকথা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই অত নিঃসংশয়ে উহা এখন বলিতে পারিতেছেন।

মহাবীরের পদানুগ হইয়া ঠাকুরের দাস্য ভক্তি সাধনা।

আবার সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর ৺জদম্বার দর্শন মাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ভাবমুখে শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভের পর নিজ কুলদেবতা ৺রঘুবীরের দিকে তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়াছিল। মহাবীর হনুমানের ন্যায় ভক্তি-সহায়ে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ সম্ভবপর বুঝিয়া দাস্য ভক্তিতে সিদ্ধ হইবার জন্য তখন তিনি আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ করিয়া কিছু দিনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ঐ সময়ে তিনি নিরন্তর মহাবীরের চিন্তা করিতে করিতে এতদূর তন্ময় হইয়া যান যে, আপনার পৃথক অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কথা কিছুকালের জন্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বলিতেন, "এ সময়ে আহার বিহারাদি সকল কার্য্য হনুমানের ন্যায় করিতে হইত।—ইচ্ছা করিয়া যে করিতাম তাহা নহে, আপনা আপনিই ঐরূপ হইয়া পড়িত। পরিবার কাপড়খানাকে লেজের মত করিয়া কোমরে জড়াইয়া বাঁধিতাম, উল্লম্ফনে চলিতাম, ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না—তাহাও আবার খোষা ফেলিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, বৃক্ষের উপরেই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম, এবং নিরন্তর 'রঘুবীর, রঘুবীর' বলিয়া গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতাম। চক্ষুদ্বয় তখন ঐ জাতীয় পশুর ন্যায় সর্ব্বদা

চঞ্চলভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আশ্চর্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা ঐ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল।"* শেষোক্ত কথাটী শুনিয়া, আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহাশয় আপনার শরীরের ঐ অংশ কি এখনও ঐরূপ আছে?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "না; মনের উপর হইতে ঐ ভাবের প্রভুত্ব চলিয়া যাইবার পরে কালে উহা ধীরে ধীরে পূর্ব্বের ন্যায় স্বভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।"

দাস্যভক্তি সাধনকালে শ্রীশ্রীসীতাদেবীর দর্শন-লাভ বিবরণ।

দাস্যভক্তি সাধনকালে ঠাকুরের জীবনে এক অভূতপূর্ব্ব দর্শন ও অনুভব আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ দর্শন ও অনুভব তাঁহার ইতিপূর্ব্বের দর্শন প্রত্যক্ষাদি হইতে এত নূতন ধরণের ছিল যে, উহা তাঁহার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া স্মৃতিতে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। তিনি বলিতেন, "এইকালে পঞ্চবটীতলে একদিন বসিয়া আছি—তখন ধ্যানচিন্তা কিছু যে করিতেছিলাম তাহা নহে, অমনি বসিয়া ছিলাম—এমন সময়ে নিরুপমা জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া স্থানটীকে আলোকিত করিয়া তুলিল। ঐ মূর্ত্তিটিকেই তখন যে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নহে, পঞ্চবটীর গাছ, পালা, গঙ্গা ইত্যাদি সকল পদার্থই দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম, মূর্ত্তিটি মানবীর, কারণ ত্রিনয়নাদি দেবীলক্ষণ তাহাতে নাই। কিন্তু প্রেম-দুঃখ-করুণা-সহিষ্ণুতাপূর্ণ সেই মুখের ন্যায় অপূর্ব্ব ওজস্বী গম্ভীরভাব দেবীমূর্ত্তিসকলেও সচরাচর দেখা যায় না! দেখিলাম, প্রসন্নদৃষ্টিতে আমার দিকে দেখিতে দেখিতে ঐ দেবী-মানবী ধীর মন্থরপদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে, আমার

* Enlargement of the Coccyx.

দিকে অগ্রসর হইতেছেন! স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছি, 'কে ইনি?' এমন সময়ে একটা হনুমান কোথা হইতে সহসা উ-উপ শব্দ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া উপবিষ্ট হইল এবং মনের ভিতরে কে বলিয়া উঠিল 'সীতা, জনম-দুঃখিনী সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা!' তখন 'মা', 'মা' বলিয়া অধীর হইয়া পদে নিপতিত হইতে যাইতেছি এমন সময় তিনি চকিতের ন্যায় আসিয়া (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন!—আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেলাম। ধ্যানচিন্তাদি কিছু না করিয়া এমনভাবে কোন দর্শন ইতি পূর্ব্বে আর হয় নাই; ইহাই ঐরূপ ভাবের প্রথম দর্শন। জনম-দুঃখিনী সীতাকে ঐরূপে সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার ন্যায় আজন্ম দুঃখভোগ করিতেছি!"

ঠাকুরের স্বহস্তে পঞ্চবটী রোপণ।

তপস্যার উপযুক্ত পবিত্র ভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ঠাকুর এই সময়ে হৃদয়ের নিকট নূতন একটী পঞ্চবটী* স্থাপনের বাসনা প্রকাশ করেন। হৃদয় বলিত, "পঞ্চবটীর নিকটবর্ত্তী হাঁসপুকুর নামক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটী তখন ঝালান হইয়াছে এবং

---

* অশ্বত্থ বিল্ববৃক্ষঞ্চ বটধাত্রী অশোককম্।
বটীপঞ্চকমিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ॥
অশ্বত্থং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিল্বমুত্তরভাগতঃ।
বটং পশ্চিমভাগেতু ধাত্রীং দক্ষিণতঃস্তথা॥
অশোকং বহ্নিদিকৃস্থাপ্যং তপস্যার্থং সুরেশ্বরি।
মধ্যে বেদীং চতুর্হস্তাং সুন্দরীং সুমনোহরাম্॥

ইতি—স্কন্দপুরাণ।

পুরাতন পঞ্চবটীর নিকটস্থ নিম্ন জমিখণ্ড ঐ মাটিতে ভরাট করিয়া সমতল করান হওয়ায় ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে যে আমলকী বৃক্ষের নিম্নে ধ্যান করিতেন তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" তখন, এখন যেখানে সাধনকুটীর আছে তাহারই পশ্চিমে ঠাকুর স্বহস্তে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিয়া হৃদয়কে দিয়া বক, অশোক, বেল ও আমলকী বৃক্ষের চারা রোপণ করাইলেন এবং অনেকগুলি তুলসী ও অপরাজিতার চারা পুতিয়া সমগ্র স্থানটীকে বেষ্টন করাইয়া লইলেন। গরু ছাগলের হস্ত হইতে ঐ সকল চারা গাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যে অদ্ভুত উপায়ে ঠাকুর 'ভর্ত্তাভারী' নামক ঠাকুরবাটীর উদ্যানের জনৈক মালীর সাহায্যে ঐ স্থানে বেড়া লাগাইয়াছিলেন তাহা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।* ঠাকুরের যত্ন এবং নিয়মিত জলসিঞ্চনে তুলসী ও অপরাজিতা গাছগুলি অতি শীঘ্রই এত বড় ও নিবিড় হইয়া উঠে যে, উহার ভিতরে বসিয়া যখন তিনি ধ্যান করিতেন তখন ঐ স্থানের বাহিরের ব্যক্তিরা তাঁহাকে কিছুমাত্র দেখিতে পাইত না।

রাণী রাসমণির কালীবাটী প্রতিষ্ঠার কথা জানাজানি হইবার পর হইতে গঙ্গাসাগর ও ৺জগন্নাথ দর্শন প্রয়াসী পথিক সাধুকুল, ঐ তীর্থদ্বয়ে যাইবার ও সেখান হইতে আসিবার কালে, কয়েকদিনের জন্য শ্রদ্ধাসম্পন্না রাণীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে বিশ্রাম করিয়া যাইতে আরম্ভ করেন।† ঠাকুর বলিতেন, ঐরূপে ঐ কাল হইতে বিশিষ্ট সাধক ও অনেক সিদ্ধপুরুষেরা এখানে পদার্পণ করিতেন। ইহাদিগের কাহারও নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এইকালে প্রাণায়ামাদি

ঠাকুরের হঠযোগ অভ্যাস।

---

* গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, ৭৭ পৃষ্ঠা। † গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ৪৬ পৃষ্ঠা।

হট্‌যোগের ক্রিয়াসকল অভ্যাস্ করিতেন বলিয়া বোধ হয়। নিম্নলিখিত হলধারী-সম্পর্কীয় ঘটনাটী বলিতে বলিতে একদিন তিনি আমাদিগকে ঐ বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ঐরূপে হট-যোগোক্ত ক্রিয়াসকল স্বয়ং অভ্যাস ও উহাদিগের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি পরজীবনে আমাদিগকে ঐ সকল অভ্যাস করিতে নিষেধ করিতেন। আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ বিষয়ে উপদেশ লাভের জন্য কখন কখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তর পাইয়াছে—"ও সকল সাধন একালের পক্ষে নয়! কলিতে জীব অল্পায়ু ও অন্নগতপ্রাণ; এখন হটযোগ অভ্যাস করিয়া শরীর দৃঢ় করিয়া লইয়া রাজযোগ অভ্যাস করিবে, ঈশ্বরকে ডাকিবে তাহার সময় কোথায়? আবার হটযোগের ঐ সকল ক্রিয়া অভ্যাস করিতে হইলে ঐ বিষয়ে সিদ্ধ গুরুর সঙ্গে নিরন্তর থাকিয়া আহার বিহারাদি সকল বিষয়ে তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত বিশেষ কঠোর নিয়মে চলিতে হয়; নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রমে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত হয় এবং অনেক সময়ে সাধকের মৃত্যুও হইয়া থাকে। সেজন্য ঐসকল করিবার আবশ্যকতা নাই। আর এক কথা, মন নিরোধের জন্যই ত প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদি করিয়া বায়ু নিরোধ করা? ঈশ্বরের ভক্তিসংযুক্ত ধ্যানে মন ও বায়ু উভয়ই আপনা আপনি নিরুদ্ধ হইয়া আসিবে, দেখিতে পাইবে। কলিতে জীব অল্পায়ু ও অল্পশক্তি বলিয়াই ভগবান কৃপা করিয়া তাহার জন্য ঈশ্বর-লাভের পথ এত সুগম করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী পুত্রের বিয়োগে প্রাণে যেরূপ ব্যাকুলতা ও অভাববোধ আসে, ঈশ্বরের জন্য সেই-রূপ ব্যাকুলতা চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র কাহারও প্রাণে স্থায়ী হইলে একালে তিনি তাহাকে দেখা দিবেনই দিবেন।"

লীলাপ্রসঙ্গের অন্যত্র এক স্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি যে, বর্ত্তমানকালে ভারতে স্মৃত্যনুসারী সাধক ভক্তেরা প্রায়ই অনুষ্ঠানে তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ঐরূপ ব্যক্তিরা প্রায়ই পরকীয়া প্রেমসাধনরূপ পথে ধাবিত হন।* হলধারী সুপণ্ডিত বৈষ্ণব ও নিষ্ঠাচারী ছিলেন একথাও আমরা পাঠককে ইতি-পূর্ব্বে বলিয়াছি; দক্ষিণেশ্বরে ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় কিছু কাল নিযুক্ত হইবার পরে তিনিও গোপনে পূর্ব্বোক্ত-সাধনপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্রমে লোকে সে কথা জানিতে পারিয়া কাণাকাণি করিতে থাকে; কিন্তু হলধারী বাক্‌সিদ্ধ অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলিবে তাহাই হইবে, এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি থাকায় তাঁহার কোপে পড়িবার আশঙ্কায় কেহই ঐ কথা লইয়া তাঁহার সম্মুখে আলোচনা বা হাস্য-পরিহাসাদি করিতে সাহসী হইত না। ঠাকুর ক্রমে অগ্রজের ঐরূপ আচরণের কথা লোকমুখে জানিতে পারিলেন। স্পষ্টবক্তা নির্ভীক ঠাকুর তখন লোকে ঐ কথা জল্পনা করিয়া ভিতরে ভিতরে তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেছে দেখিয়া হলধারীকে সকল কথা খুলিয়া বলি-লেন। হলধারী তাহাতে সাতিশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন—"কনিষ্ঠ হইয়া তুই আমাকে এইরূপে অবজ্ঞা করিলি? তোর মুখ দিয়া রক্ত উঠিবে।" ঠাকুর তাঁহাকে ঐ বিষয় বলিবার কারণ বুঝাইয়া নানারূপে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি সে সময়ে উহার কোন কথা শ্রবণ করিলেন না।

হলধারীর অভিশাপ।

ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে এক দিন রাত্রি ৮৷৯টা আন্দাজ

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ৩২ পৃষ্ঠা।

উক্ত অভিশাপ কিরূপে সফল হইয়াছিল।

সময়ে ঠাকুরের তালুদেশ সহসা সাতিশয় সড়্ সড়্ করিয়া মুখ দিয়া সত্য সত্যই রক্ত বাহির হইতে লাগিল! ঠাকুর বলিতেন—"সিম্ পাতার রসের মত তার মিস্ কাল রং—এত গাঢ় যে কতক বাহিরে পড়িতে লাগিল এবং কতক মুখের ভিতরে জমিয়া গিয়া সম্মুখের দাঁতের অগ্রভাগ হইতে বটের জটের মত ঝুলিতে লাগিল! মুখের ভিতর কাপড় দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তথাপি থামিল না! দেখিয়া বড় ভয় হইল। সংবাদ পাইয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। হলধারী তখন মন্দিরে সেবার কাজ সারিতেছিল; ঐ সংবাদে সেও ভয় পাইয়া শশব্যস্তে আসিয়া পড়িল। তাকে দেখিয়া সজলনয়নে বলিলাম, 'দাদা, শাপ দিয়া তুমি আমার এ কি অবস্থা কর্‌লে, দেখ দেখি?' আমার কাতরতা দেখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল।"

"ঠাকুরবাড়ীতে সে দিন একজন ভাল সাধু আসিয়াছিলেন। গোলমাল শুনিয়া তিনি ঐ সময়ে আসিয়া পড়িলেন এবং রক্তের রং ও মুখের ভিতরে যে স্থানটা হইতে উহা নির্গত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন—'ভয় নাই, রক্ত বাহির হইয়া বড় ভালই হইয়াছে। দেখিতেছি, তুমি যোগসাধনা করিতে। ঐ সাধনাপ্রভাবে তোমার সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া যাইয়া শরীরের রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। মাথায় না উঠিয়া উহা যে এইরূপে মুখের ভিতরে একটা নির্গত হইবার পথ আপনা আপনি করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল ইহাতে বড়ই ভাল হইল। ঐ রক্ত মাথায় উঠিলে তোমার জড়সমাধি হইত এবং ঐ সমাধি আর কিছুতেই ভাঙ্গিত না। তোমার শরীরটার দ্বারা ৺জগন্মাতার বিশেষ কোন কার্য্য আছে; তাই উহাকে এইরূপে রক্ষা করিলেন,

বোধ হইতেছে। সাধুর ঐ কথা শুনিয়া যেন প্রাণ পাইলাম।” ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর শাপ ঐরূপে কাকতালীয়ের ন্যায়ে সফলতা দেখাইয়া বরে পরিণত হইয়াছিল।

হলধারীর সহিত ঠাকুরের আচরণে বেশ একটা মধুর রহস্যের ভাব ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি হলধারী ঠাকুরের খুল্লতাত-পুত্র ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আন্দাজ ১২৬৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তিনি ৺রাধা-গোবিন্দজীর পূজাকার্য্যে ব্রতী হন, এবং ১২৭২ সালের কিছুকাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। অতএব ঠাকুরের সাধনকালের দ্বিতীয় চারিবৎসর এবং তাহার পরেও দুই বৎসরের অধিক কাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া তিনি ঠাকুরকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তত্রাচ তিনি ঠাকুরের উচ্চ-আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হলধারী নিষ্ঠাচারী ছিলেন; সুতরাং ভাবাবেশে ঠাকুরের পরিধানের কাপড়, পৈতা প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়াটা তাঁহার ভাল লাগিত না। ভাবিতেন, কনিষ্ঠ যথেচ্ছাচারী অথবা পাগল হইয়াছে। হৃদয় বলিত—“তিনি কখন কখন আমাকে বলিয়াও ফেলিয়াছেন, ‘হৃদু, উনি কাপড় ফেলিয়া দেন, পৈতা ফেলিয়া দেন, এটা বড় দোষের কথা; কত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়, উনি কি না সেই ব্রাহ্মণত্বকে সামান্য জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণাভিমান ত্যাগ করিতে চান? এমন কি উচ্চাবস্থা হইয়াছে যাহাতে উনি ঐরূপ করিতে পারেন? হৃদু, উনি তোমারই কথা যাহা একটু শুনেন, তোমার উচিৎ যাহাতে উনি ঐরূপ না করিতে পারেন তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা; এমন কি বাঁধিয়া রাখিয়াও উঁহাকে

ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর ধারণার পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনের কথা।

যদি তুমি ঐরূপ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে পার, তাহাও করা উচিত'।"

আবার পূজা করিতে করিতে ঠাকুরের নয়নে প্রেমধারা, ভগবদ্গুণশ্রবণে অদ্ভুত উল্লাস ও ভগবদ্দর্শনলাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া ভাবিতেন, নিশ্চয়ই কনিষ্ঠের ঐসকল অবস্থা ঐশ্বরিক আবেশে হইয়া থাকে, নতুবা মানুষের কখন ত ঐরূপ হইতে দেখা যায় না! দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া হলধারী কখন কখন আবার হৃদয়কে বলিতেন, 'হৃদয়, তুমি নিশ্চয় উঁহার ভিতর হইতে কোনরূপ আশ্চর্য্য দর্শন পাইয়াছ, নতুবা এত করিয়া উঁহার কখন সেবা করিতে না।"

ঐরূপে হলধারীর মন সর্ব্বদা সন্দেহে দোলায়মান থাকিয়া ঠাকুরের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির মীমাংসায় কিছুতেই উপনীত হইতে পারিত না। ঠাকুর বলিতেন, "হলধারী মন্দিরে পূজাদি কালে তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া কতদিন বলিয়াছে, 'রামকৃষ্ণ, এইবার আমি তোকে চিনিয়াছি।' তাহাতে কখন কখন আমি রহস্য করিয়া বলিতাম, 'দেখো আবার যেন গোলমাল হয়ে যায় না।' সে বলিত, এবার আর তোর ফাঁকি দিবার যো নাই; তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে; এবার একেবারে ঠিক ঠাক বুঝিয়াছি।' শুনিয়া বলিতাম, 'আচ্ছা দেখা যাবে।' অনন্তর মন্দিরের দেবসেবা সম্পূর্ণ করিয়া হলধারী এক টিপ নস্য লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা বা অধ্যাত্ম রামায়ণাদিশাস্ত্রবিচার করিতে বসিয়াই অভিমানে একবারে অন্য এক লোক হইয়া যাইত। তখন আমি সেখানে উপস্থিত

নস্য লইয়া শাস্ত্র বিচার করিতে বসিয়াই হলধারীর উচ্চ ধারণার লোপ।

হইয়া বলিতাম, 'তুমি শাস্ত্রে যা যা পোড়েছ সে সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হয়েছে, আমি ওসব কথা বুঝ্‌তে পারি।' শুনিয়াই হলধারী বলিয়া উঠিত, 'হাঁ; তুই গণ্ডমূর্খ, তুই আবার এ সব কথা বুঝ্‌বি!' আমি বলিতাম (নিজের শরীর দেখাইয়া) 'সত্য বল্‌ছি, এর ভিতরে যে আছে সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। এই যে তুমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বোল্‌লে ইহার ভিতর ঈশ্বরীয় আবেশ আছে—সেই-ই সকল কথা বুঝিয়ে দেয়।' হলধারী ঐকথা শুনিয়া গরম হইয়া বলিত—'যাঃ যাঃ মুর্খু কোথাকার, কলিতে কল্কি ছাড়া আবার ঈশ্বরের অবতার হবার কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? তুই উন্মাদ হইয়াছিস্ তাই ঐরূপ ভাবিস্।' হাসিয়া বলিতাম—'এই যে বলেছিলে আর গোল হবে না;'—কিন্তু সে কথা তখন শোনে কে? এইরূপ এক আধ দিন নয় অনেক দিন হইয়াছিল! পরে একদিন সে দেখিতে পাইল, উলঙ্গ হইয়া পঞ্চবটীর বটবৃক্ষের ডালে বসিয়া মূত্র ত্যাগ করিতেছি—সেই দিন হইতে সে একেবারে পাকা করিল (স্থির নিশ্চয় করিল) আমাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছে!"

বৈষ্ণব হলধারীর শিশুপুত্রের মৃত্যুর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐদিন হইতে তিনি ৺কালীমূর্ত্তিকে তমোগুণময়ী বা তামসী বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুরকে ঐকথা বলিয়াও ফেলেন, "তামসী মূর্ত্তির উপাসনায় কখন আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে কি? তুমি কেন অত করিয়া ঐ দেবীর আরাধনা কর?" ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া তখন তাহাকে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ইষ্টনিন্দাশ্রবণে তাঁহার

৺কালীকে তমোগুণময়ী বলায় ঠাকুরের হলধারীকে শিক্ষাদান।

অন্তর ব্যথিত হইল। অনন্তর কালীমন্দিরে যাইয়া সজল নয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—সে তোকে তমোগুণময়ী বলে; তুই কি সত্যই ঐরূপ?" অনন্তর ৺জগদম্বার মুখে ঐ বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিয়া ঠাকুর উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া হলধারীর নিকট ছুটিয়া যাইলেন এবং একেবারে তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া উত্তেজিত স্বরে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—'তুই মাকে তামসী বলিস্? মা কি তামসী? মা যে সব—ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী!' ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐরূপ কথায় ও স্পর্শে হলধারীর তখন যেন অন্তরের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল! তিনি তখন পূজার আসনে বসিয়াছিলেন—ঠাকুরের ঐকথা অন্তরের সহিত স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার ভিতর সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থ ফুলচন্দনাদি লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিভরে অঞ্জলি প্রদান করিলেন! উহার কিছুক্ষণ পরে হৃদয় আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মামা, এই তুমি বল, রামকৃষ্ণকে ভূতে পাইয়াছে, তবে আবার তাঁহাকে ঐরূপে পূজা করিলে যে?' হলধারী বলিলেন "কি জানি হৃদু, কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে কি যে একরকম করিয়া দিল, আমি সব ভুলিয়া তার ভিতর সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রকাশ দেখিতে পাইলাম! কালী মন্দিরে যখনই আমি রামকৃষ্ণের কাছে যাই তখনই আমাকে ঐরূপ করিয়া দেয়! এ এক চমৎকার ব্যাপার—কিছু বুঝিতে পারি না।"

ঐরূপে হলধারী, ঠাকুরের ভিতর বারম্বার দৈব প্রকাশ দেখিতে পাইলেও নস্য লইয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বসিলেই

পাণ্ডিত্যাভিমানে মত্ত হইয়া 'পুনর্মূষিকত্ব' প্রাপ্ত হইতেন। কামকাঞ্চনে আসক্তি দূর না হইলে বাহ্যশৌচাচার এবং শাস্ত্রজ্ঞান যে, বিশেষ কোন কাজে লাগে না এবং মানবকে সত্য তত্ত্বের ধারণা করাইতে পারে না, হলধারীর পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

কাঙ্গালীদিগের পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে দেখিয়া হলধারীর ঠাকুরকে ভর্ৎসনা ও ঠাকুরের উত্তর।

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর বাড়ীতে প্রসাদ পাইতে সমাগত কাঙ্গালীদিগকে নারায়ণজ্ঞানে ঠাকুর এক সময়ে তাহাদের পাত্রাবশেষ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন—একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হলধারী উহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 'তোর ছেলে মেয়ের কেমন করিয়া বিবাহ হয় তাহা দেখিব!' ঠাকুর বেদান্তজ্ঞানাভিমানী হলধারীর মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া ক্ষোভে ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়াছিলেন, "তবে রে শালা, তুই না বলিস্, শাস্ত্রে বলেছে জগৎ মিথ্যা ও সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি কর্‌তে হয়? তুই বুঝি ভাবিস্ আমি তোর মত জগৎ মিথ্যা বল্‌বো অথচ ছেলে মেয়েও হবে! ধিক্ তোর শাস্ত্রজ্ঞানে!"

বালকস্বভাব ঠাকুর আবার, কখন কখন হলধারীর পাণ্ডিত্যে ভুলিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার মতামত গ্রহণ করিতে ছুটিতেন! আমরা শুনিয়াছি, ভাবসহায়ে ঐশ্বরিক স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল অনুভূতি হয় সে সকলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া এবং ঈশ্বরকে ভাবাভাবের অতীত বলিয়া শাস্ত্রসহায়ে নির্দ্দেশ করিয়া হলধারী ঠাকুরের মনে একদিন বিষম সন্দেহের উদয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিলাম, তবে তো ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখি-

হলধারীর পাণ্ডিত্যে ঠাকুরের মনে সন্দেহের উদয় ও শ্রীশ্রীজগদম্বার পুনর্দ্দর্শন ও প্রত্যাদেশ লাভ—'ভাবমুখে থাক্।'

য়াছি, কথা শুনিয়াছি সে সমস্তই ভুল; মা তো তবে আমায় ফাঁকি দিয়াছে! মন বড়ই ব্যাকুল হইল এবং অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিতে লাগিলাম—মা নিরক্ষর মুখ্খু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়—সে কান্নার তোড় (বেগ) আর তখন থামে না! কুঠির ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি কি, সহসা মেজে হইতে কুয়াসার মত ধোঁয়া উঠিয়া সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হইয়া গেল! তার পর দেখি তাহার ভিতরে আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু একখানি গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম্য মুখ! ঐ মূর্ত্তি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্!'—তিনবার মাত্র ঐকথাগুলি বলিয়াই ঐমূর্ত্তি ধীরে ধীরে আবার ঐ কুয়াসায় গলিয়া গেল এবং ঐ কুয়াসার মত ধূমও কোথায় অন্তর্হিত হইল! ঐরূপ দেখিয়া তবে সেবার শান্ত হইলাম।" ঘটনাটী ঠাকুর একদিন স্বামী প্রেমানন্দকে স্বমুখে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, হলধারীর কথায় ঐ সন্দেহ আর একবার মনে উঠিয়াছিল; "সেবার পূজা করিতে বসিয়া মাকে ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্য কাঁদিয়া ধরিয়াছিলাম; মা ঐ সময়ে 'রতির মা' নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের বেশে ঘটের পার্শ্বে আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই ভাবমুখেই থাক্!' আবার পরিব্রাজকাচার্য্য তোতাপুরী গোস্বামী বেদান্তজ্ঞান উপদেশ করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাইবার পর ঠাকুর যখন ছয় মাস কাল ধরিয়া নিরন্তর নির্বিবকল্প ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন তখনও ঐকালের অন্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার অশরীরী বাণী প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইয়াছিলেন—'তুই ভাবমুখে থাক্!'

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে হলধারী প্রায় সাত বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং পিশাচবৎ আচারবান পূর্ণজ্ঞানী সাধু, ব্রাহ্মণী, জটাধারী নামক রামায়েৎ সাধু ও শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে পর পর আগমন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনা গিয়াছে, তিনি শ্রীমৎ তোতাপুরীর সহিত একত্রে বসিয়া কখন কখন অধ্যাত্ম রামায়ণাদি শাস্ত্র পাঠও করিতেন। হলধারী সংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি তাঁহার দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে থাকিবার কালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। বলিবার সুবিধার জন্যই আমরা ঐসকল এখানে পাঠককে একত্রে বলিয়া লইলাম।

হলধারী কালীবাটীতে কতকাল ছিলেন।

ঠাকুরের সাধক-জীবনের কথা আমরা যতদূর আলোচনা করিলাম তাহাতে একথা নিঃসংশয় বুঝা যায় যে, কালীবাটীর জনসাধারণের নয়নে তিনি এখন উন্মত্ত বলিয়া পরিগণিত হইলেও মস্তিষ্কের বিকার বা ব্যাধিপ্রসূত সাধারণ উন্মাদাবস্থা তাঁহার উপস্থিত হয় নাই। ঈশ্বর দর্শনের জন্য তাঁহার অন্তরে সাতিশয় তীব্র ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল। ঐ ব্যাকুলতার প্রবল বেগে তিনি ঐকালে আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। ঈশ্বরলাভের জন্য অগ্নিময় ব্যাকুলতা হৃদয়ে নিরন্তর ধারণ করিয়া সাধারণের সহিত সাধারণ বিষয় লইয়া তিনি হাসিতে কাঁদিতে সক্ষম হইতেছিলেন না বলিয়াই লোকে বলিতেছিল, তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। কেই বা ঐরূপ করিতে পারে? হৃদয়ের যাতনা যখন কোন বিষয় লইয়া আমাদিগের স্বাভাবিক সহ্যগুণকে অতিক্রম করিয়া যায়, তখন কেহই আপনাকে সামলাইয়া মুখে

ঠাকুরের দিব্যোন্মাদাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা।

একখানা ভিতরে একখানা রাখিয়া কামকাঞ্চনোন্মত্ত সংসারের সহিত একযোগে চলিতে পারে না। বলিতে পার, সহ্যগুণের সীমা কিন্তু সকলের পক্ষে এক নহে, কেহ অল্প সুখদুঃখেই বিচলিত হইয়া পড়ে, আবার কেহবা তদুভয়ের গভীর বেগ হৃদয়ে ধরিয়াও সমুদ্রবৎ অচল অটল থাকে; অতএব ঠাকুরের সহ্যগুণের সীমার পরিমাণটা বুঝিব কিরূপে? উত্তরে বলি, তাঁহার জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলীর অনুধাবন করিলেই উহা যে অসাধারণ ছিল একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে; দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল অর্দ্ধাশন, অনশন ও অনিদ্রায় থাকিয়াও যিনি স্থির থাকিতে পারেন, বারম্বার অতুল সম্পত্তি পদে আসিয়া পড়িলে ঈশ্বরলাভের পথে অন্তরায় বলিয়া যিনি উহা ততোধিকবার প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন—ঐরূপ কত কথাই না বলিতে পারা যায়—তাঁহার শরীর ও মনের অসাধারণ ধৈর্য্যের কথা কি আবার বলিতে হইবে?

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ঐ অবস্থাকে ব্যাধিজনিত ভাবিয়াছিল, সাধকেরা নহে।

আবার, এই কালের অনুধাবনে দেখা যায় যে, ঘোর বিষয়াবদ্ধ জীবের চক্ষেই তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অবস্থা ব্যাধিজনিত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল! দেখা যায়, মথুরানাথকে ছাড়িয়া দিলে, কল্পনাযুক্তিসহায়ে তাঁহার মানসিক অবস্থার বিষয় আংশিকভাবেও নির্দ্ধারণ করিতে পারে এমন কোন লোক ঐ কালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত ছিল না। শ্রীযুত কেনারাম ভট্ট ঠাকুরকে দীক্ষা দিয়াই কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কারণ ঐ ঘটনার পরে তাঁহার কথা হৃদয় বা অন্য কাহারও মুখে আর শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ঠাকুরের ঐ কালের ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক অবস্থার বিষয়ে বিচার করিতে

তখন যে কেবল মাত্র মূর্খ লুব্ধ কালীবাটীর কর্ম্মচারীরাই অবশিষ্ট ছিল একথা বুঝা যায়। তাহাদের কথা প্রমাণের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। অতএব কালীবাটীতে ঐ কালে সমাগত সাধু-সাধককুলের কথাই যে, ঐ বিষয়ে একমাত্র বিশ্বস্ত প্রমাণ একথা সুনিশ্চিত; এবং ঠাকুরের নিজের ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকটে ঐ বিষয়ে যাহা শুনা গিয়াছে তাহাতে জানা যায় ঐ সকল সাধক ও সিদ্ধেরা তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির করা দূরে থাকুক, তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বদা অতি উচ্চ ধারণা করিয়া গিয়াছিলেন।

এই কালের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া ঠাকুরকে ব্যাধিগ্রস্ত বলা চলে না।

এই কালের পরবর্ত্তী কথাসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাইব ঈশ্বরলাভের প্রবল ব্যাকুলতায় যতক্ষণ না তিনি এককালে দেহবোধরহিত হইয়া দিগ্-বিদিক্‌শূন্য ও নিজ জীবনে পর্য্যন্ত মমতাবিহীন হইয়া পড়িতেন, ততক্ষণ শারীরিক কল্যাণের জন্য তাঁহাকে যে যাহা করিতে বলিত তাহা তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠান করিতেন। নিজ জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য কখন সচেষ্ট হইতেন না। পাঁচজনে বলিল, তাঁহার চিকিৎসা করান হউক, তাহাতেই সম্মত হইলেন; কামারপুকুরে তাঁহার মাতার নিকট লইয়া যাওয়া হউক, তাহাতেই সম্মত হইলেন; বিবাহ দেওয়া হউক, তাহাতেও অমত করিলেন না!—এরূপাবস্থায় উন্মত্তের কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহার আচরণাদির কেমন করিয়া তুলনা করা যাইতে পারে?

আবার দেখিতে পাওয়া যায়, বিষয়ী লোক ও বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপার হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে যত্নবান্ হইলেও বহুলোক একত্র হইয়া যেখানে কোনভাবে ঈশ্বরের পূজাকীর্ত্তনাদি করিতেছে ঠাকুর ঐ কাল হইতে সেখানে যাইতে ও তাহাদিগের সহিত

যোগদান করিতে কোনরূপ আপত্তি করা দূরে থাকুক, অনেক সময়ে বিশেষ আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইতেন। বরাহনগরের ৺দশ-মহাবিদ্যার স্থান দর্শন, কালীঘাটে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে কখন কখন দেখিতে গমন এবং এখন হইতে প্রায় প্রতি বৎসর পানিহাটির মহোৎসবে তাঁহার যোগদান হইতে ঐ কথা বেশ বুঝা যায়। ঐ সকল স্থানেও শাস্ত্রজ্ঞ সাধককুলের সহিত কখন কখন তাঁহার দর্শনসম্ভাষণাদি হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে অল্প স্বল্প আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি ঐ সকল সাধকেরা তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

১২৬৫ সালে পানিহাটির মহোৎসবে বৈষ্ণবচরণের ঠাকুরকে প্রথম দর্শন ও ধারণা।

ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা ঠাকুরের সন ১২৬৫ সালে, ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, পানিহাটি মহোৎসব-দর্শনে গমন করিবার কথা উল্লেখ করিতে পারি। শ্রীযুত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র বৈষ্ণবচরণকে তিনি ঐদিন ঐ স্থানেই প্রথম দেখেন। হৃদয়ের নিকটে এবং ঠাকুরের নিজমুখেও আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, ঠাকুর পানিহাটিতে গমন করিয়া ঐ দিন শ্রীযুত মণিমোহন সেনের ঠাকুরবাটীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে বৈষ্ণবচরণ তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে দেখিয়াই আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্ন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়া স্থির নিশ্চয় করেন। শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ সেদিন অধিকাংশ কাল উৎসবক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে অতিবাহিত করেন এবং নিজ ব্যয়ে চিঁড়া, মুড়্কি, আম ইত্যাদি ক্রয় করিয়া 'মালসা ভোগের' বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন। আবার উৎসবান্তে কলিকাতা ফিরিবার সময় বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরের পুনরায় দর্শনলাভের জন্য রাণী রাসমণির কালীবাটীতে নামিয়া তাঁহার

অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; এবং ঠাকুর তখনও উৎসবক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই জানিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার তিন চারি বৎসর পরে বৈষ্ণবচরণ কিরূপে পুনরায় ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি।*

ঠাকুরের এই কালের অন্যান্য সাধন—'টাকা মাটি', 'মাটি টাকা'; অশুচিস্থান পরিষ্কার; চন্দনবিষ্ঠায় সমজ্ঞান।

এই চারিবৎসরের ভিতরেই আবার, ঠাকুর, মন হইতে কাঞ্চনাসক্তি এককালে দূর করিবার জন্য কয়েক খণ্ড মুদ্রা মৃত্তিকার সহিত একত্রে হস্তে গ্রহণ করিয়া সদসদ্বিচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্যবস্তু ঈশ্বরকে লাভ করা যে ব্যক্তি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছে সে, ঐ বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে মৃত্তিকার ন্যায় কাঞ্চন হইতে বিশেষ কোন সহায়তা লাভ করিতে পারে না, যুক্তিসহায়ে একথা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া মনে ঐ মীমাংসা ধারণার জন্য বারম্বার 'টাকা মাটি,' 'মাটি টাকা' বলিতে বলিতে উহাদিগকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল বস্তু ও ব্যক্তিই শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ ও অংশ, একথা ধারণার জন্য ঠাকুরবাটীর কাঙ্গালীদের পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ ও তাহাদের ভোজন-স্থান পরিষ্কার করা—মন হইতে অভিমান ও অহঙ্কার এককালে দূর করিবার এবং সকলের ঘৃণার পাত্র অপেক্ষাও তিনি কোন অংশে বড় নহেন একথা ধারণার জন্য মেথরের ন্যায় অশুচি স্থান স্বহস্তে ধৌত করা—ঘৃণা ত্যাগ করিবার এবং চন্দন ও বিষ্ঠা উভয় পদার্থই পঞ্চভূতের বিকারপ্রসূত,

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়।

অতএব স্বরূপতঃ সমতুল্য, একথা ধারণার জন্য নির্ব্বিকারচিত্তে স্বীয় জিহ্বার দ্বারা অপরের বিষ্ঠা স্পর্শ করা প্রভৃতি যে সকল অশ্রুতপূর্ব্ব সাধনকথা ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায় তাহাও এই কালেই সাধিত হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রথম চারি বৎসরের ঐ সকল সাধন ও দিব্যদর্শনের বিবরণ অনুধাবন করিলে ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহার মনে ঐকালে কি অসাধারণ আকুলাগ্রহ যে, আধিপত্য করিতেছিল এবং কি অলৌকিক বিশ্বাসের সহিত যে, তিনি সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও নিশ্চয় ধারণা হইয়া পড়ে যে, অপর কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য না পাইয়া একমাত্র ব্যাকুলতাসহায়ে তিনি ঐ কালের ভিতরেই শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন এবং সাধনার ফল করগত করিয়া পববর্ত্তী কালে তিনি উহা গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত মিলাইতেই অগ্রসর হইয়াছিলেন!

পরিশেষে নিজ মনই সাধকের গুরু হইয়া দাঁড়ায়। ঠাকুরের মনের এই কালে গুরুবৎ আচরণের দৃষ্টান্ত (১) সূক্ষ্মদেহে কীর্ত্তনানন্দ।

ত্যাগ ও সংযমের অভ্যাস দ্বারা সাধক যখন নিজ ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, ঠাকুর বলিতেন, নিজ মনই তখন তাহার নিকট গুরুস্থানীয় হইয়া দাঁড়ায়; তাহার শুদ্ধ মনে তখন যে সকল ভাবতরঙ্গ উঠিতে থাকে সে সকল, বিপথগামী করা দূরে থাকুক, পথ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে গন্তব্য লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইয়া দেয়। সাধনার প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুরের শুদ্ধ পবিত্র মন, কেবল যে ঐরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে এবং কোন্‌টী হইতে বিরত থাকিতে হইবে

একথা শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল তাহা নহে, কিন্তু অনেক সময়ে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথক এক ব্যক্তির ন্যায় দেহমধ্য হইতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সাধনপথে উৎসাহিত করিত, ভয়প্রদর্শন করতঃ সাধনাবিশেষে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিত, অনুষ্ঠানবিশেষ কেন করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিত এবং কখন কখন সাধনার ফলাফলও বিজ্ঞাত করাইয়া দিত! সেইজন্যই ঠাকুর ধ্যান করিতে বসিয়া দেখিয়াছিলেন, শাণিতত্রিশূলধারী জনৈক সন্ন্যাসী, নিজদেহমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া বলিতেছেন, 'অন্য সকল চিন্তা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া ইষ্ট-চিন্তা যদি না করিবি ত এই ত্রিশূল তোর বুকে বসাইয়া দিব!' দেখিয়াছিলেন—ভোগবাসনাময় পাপপুরুষ নিজ শরীরমধ্য হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলে, ঐ সন্ন্যাসী যুবকও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া ঐ পুরুষকে নিহত করিলেন!—দূরস্থ দেবদেবীর মূর্ত্তি বা কীর্ত্তনাদি দর্শনে অভিলাষী হইয়া, তাঁহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট ঐ সন্ন্যাসী যুবক জ্যোতির্ম্ময় শরীরে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় পথে ঐ সকল স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং দর্শন ও ভজনানন্দ কিয়ৎকাল উপভোগ করিয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত জ্যোতি-র্ম্ময় বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া স্থূল শরীরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন! —ঐরূপ নানা দর্শনের কথা আমরা ঠাকুরের স্বমুখ হইতে সময়ে সময়ে শ্রবণ করিয়াছি।

(৩) নিজ শরীরের ভিতরে যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন ও উপদেশ লাভ।

সাধনকালের প্রায় প্রারম্ভ হইতেই শরীরমধ্যগত ঐ যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন আরব্ধ হইয়াছিল এবং ক্রমে সকল কার্য্যের বিধি-নিষেধ মীমাংসা স্থলেই ঠাকুর, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পরামর্শমত চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। সাধকজীবনের ঐ সকল অপূর্ব্ব

দর্শনাদির প্রসঙ্গ করিতে করিতে ঠাকুর একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—“ভিতর হইতে, দেখিতে আমারই অনুরূপ, এক যুবক সন্ন্যাসীমূর্ত্তি যখন তখন বাহির হইয়া আমাকে সকল বিষয়ে উপদেশ করিত; সে ঐরূপে বাহির হইলে কখন কিছু কিছু বাহ্যজ্ঞান থাকিত এবং কখন বা বাহ্যজ্ঞান এককালে হারাইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিতাম, কেবল তাহারই চেষ্টা ও কথা দেখিতে ও শুনিতে পাইতাম; পরে এই স্থূল দেহটায় সে পুনরায় প্রবেশ করিলে আবারবাহ্যজ্ঞান পূর্ণভাবে আসিত। তাহার মুখ হইতে যাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম তাহাই ব্রাহ্মণী, ন্যাঙ্গটা (শ্রীমৎ তোতাপুরী) প্রভৃতি আসিয়া পুনরায় উপদেশ করিয়াছিলেন। যাহা জানিতাম, তাহাই আবার জানাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রগত বিধির মান্য রক্ষা করাইবার জন্যই তাঁহারা গুরুরূপে জীবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নতুবা ন্যাঙ্গটা প্রভৃতিকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।”

সাধনার এই কালের শেষভাগে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে গিয়াছিলেন তখন আর একটী অপূর্ব্ব দর্শন তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। কামারপুকুর হইতে শিবিকারোহণে হৃদয়ের বাটী সিহড় গ্রামে যাইতে যাইতে তাঁহার ঐ দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। সুনীল অম্বরাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, পুঞ্জীভূতহরিৎ-শ্যামল ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে শীতলছায়াপ্রদ অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে প্রফুল্লমনে অগ্রসর হইবার কালে ঠাকুর দেখিলেন, সহসা তাঁহার দেহমধ্য হইতে দুইটী কিশোরবয়স্ক সুন্দর বালকমূর্ত্তি বহির্গত হইয়া কখন ধীরপদে

(৩) সিহড় যাইবার পথে ঠাকুরের দর্শন। উক্ত দর্শন সম্বন্ধে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মীমাংসা।

এবং কখন ক্রীড়াচ্ছলে ছুটাছুটি করিয়া, বন্যপুষ্পাদির অন্বেষণে কখন প্রান্তরমধ্যে বহুদূরে গমন করিয়া আবার কখন বা শিবিকার সন্নিকটে থাকিয়া, বাল-সুলভ হাস্য, পরিহাস, কথোপকথন প্রভৃতি নানা চেষ্টা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপে আনন্দ করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার দেহমধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। ঐ দর্শনের প্রায় দেড় বৎসর পরে বিদূষী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে প্রথম আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঠাকুরের মুখে ঐ দর্শনের কথা শুনিয়া কিছুমাত্র বিস্মিতা না হইয়া বলেন—'বাবা, তুমি ঠিক্ই দেখিয়াছ; এবার যে, নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য যে এবার, একাধারে একসঙ্গে আসিয়াছেন এবং তোমার ভিতরে রহিয়াছেন!' হৃদয়রাম বলিতেন, এই বলিয়াই ব্রাহ্মণী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে নিম্নের কয়েকটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

> অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বার বার।
> পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
> কীর্ত্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার॥
> অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায়।
> কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

উক্ত দর্শন হইতে যাহা বুঝিতে পারা যায়।

আমরা যখন তাঁহার নিকট যাইতেছি তখন ঐ দর্শনের কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, 'ঐরূপ দেখিয়াছিলাম সত্য। ব্রাহ্মণী তাহা শুনিয়া ঐরূপ বলিয়াছিল একথাও সত্য। কিন্তু উহার যথার্থ অর্থ যে কি, তাহা কেমন করিয়া বলি বল!' ঐ সকল দর্শনের কথা শুনিয়া আমাদের মনে হয়, ঠাকুর এই সময়ে বিশেষ আভাস পাইয়াছিলেন যে, বহুপূর্ব্ব যুগ হইতে পৃথিবীতে পরিচিত

কোন প্রাচীন আত্মাই তাঁহার শরীর মনে আমিত্বাভিমান লইয়া বিশেষ কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অবস্থান করিতেছেন!—মনে হয় ঐ সকল দর্শনাদিসহায়ে তিনি এখন নিজ ব্যক্তিত্বের যে অলৌকিক আভাস পাইতেছিলেন, তাহাই কালে সুস্পষ্ট হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অযোধ্যা ও শ্রীবৃন্দাবনে জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্র ও রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে উদিত হইয়াছিলেন, তিনিই এখন পুনরায় ভারত ও জগৎকে নবীন ধর্ম্মাদর্শদানের জন্য নব শরীর পরিগ্রহ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার নিকটে গমন করিয়া আমরা তাঁহাকে সুস্থ অসুস্থ সকল অবস্থাতেই একথা বারম্বার বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে রাম, যে কৃষ্ণ (হইয়াছিল) সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে—তবে এবার (তাঁহার) গুপ্তভাবে আসা!"

শেষোক্ত দর্শনটীর সত্যতা অনুধাবন করিতে হইলে স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকটে অন্য সময়ে উচ্চারিত ঠাকুরের নিজ বাক্যে বিশ্বাস ভিন্ন অপর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ দর্শনের কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার এই কালের অপর দর্শনসমূহের সত্যতাসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ধারণা করিতে পারি। কারণ ঐরূপ দর্শনাদি আমাদের গমনাগমনকালের সময় নিত্যই ঠাকুরের জীবনে উপস্থিত হইত এবং তাঁহার ইংরাজীশিক্ষাসম্পন্ন সন্দেহশীল শিষ্যবর্গ অনেক সময় ঐ সকলের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া আপনারাই পরাজিত হইয়াছিল। লীলাপ্রসঙ্গের অন্যত্র আমরা

ঠাকুরের দর্শনসমূহ কখন মিথ্যা হয় নাই।

ঐ বিষয়ের কয়েকটী উদাহরণের * উল্লেখ করিলেও পাঠকের তৃপ্তির জন্য এখানে আর একটী ঐরূপ দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি—

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীসুরেশ চন্দ্র মিত্রের বাটীতে ৺দুর্গাপূজা-কালে ঠাকুরের দর্শন-বিবরণ।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ, আশ্বিন মাস, ৺শারদীয়া পূজা মহোৎসবে কলিকাতা নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতি বৎসর যেমন মাতিয়া থাকে সেইরূপ মাতিয়াছে। সে আনন্দের প্রবাহ ঠাকুরের ভক্তদিগের প্রাণে বিশেষরূপে। অনুভূত হইলেও উহার বাহ্য প্রকাশের পথে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, যাঁহাকে লইয়া তাঁহাদের আনন্দোল্লাস তাঁহার শরীরই বিশেষ অসুস্থ—ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত। কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীস্থ একটী দ্বিতল বাটী ভাড়া † করিয়া প্রায় মাসাবধি হইল ভক্তেরা তাঁহাকে আনিয়া রাখিয়াছে এবং সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া ঠাকুরকে রোগমুক্ত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। এপর্য্যন্ত কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে। গৃহস্থ ভক্তেরা সকাল সন্ধ্যা ঐ বাটীতে আগমন করিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্ত করিতেছেন, এবং যুবক ছাত্র-ভক্তদলের ভিতর অনেকে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিতে যাওয়া ভিন্ন অপর সকল সময়ে এখানে ঠাকুরের সেবায় লাগিয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৬৭—১৭৫।

† গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাটী।

আবার আবশ্যক বুঝিয়া তাহাও করিতে না যাইয়া চব্বিশ ঘণ্টা এখানে কাটাইতেছে।

অধিক কথা কহিলে এবং বারম্বার সমাধিস্থ হইলে, শরীরের রক্তপ্রবাহ ঊর্দ্ধে প্রবাহিত হইয়া ক্ষত স্থানটীকে নিরন্তর আঘাত পূর্ব্বক রোগের উপশম হইতে দিবে না বলিয়া, চিকিৎসক, ঠাকুরকে ঐ সকল বিষয় হইতে সংযত থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরও ঐ ব্যবস্থামত চলিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু বারম্বার ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য করিয়া বসিতেছেন। কারণ, 'হাড় মাসের খাঁচা' বলিয়া চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া যে শরীরটা হইতে মন উঠাইয়া লইয়াছেন, তাহাকে সাধারণ মানবের ন্যায় পুনরায় বহুমূল্য জ্ঞান করিতে ঠাকুর কিছুতেই সক্ষম হইতেছেন না। ভগবৎপ্রসঙ্গ উঠিলেই তিনি শরীর ও শরীররক্ষার কথা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া উহাতে প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় যোগদান করিয়া বারম্বার সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেছেন! নূতন নূতন ধর্ম্মপিপাসুর সমাগম বহুল হইতেছে; তাহাদিগের হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, মৃদুস্বরে তাহাদিগকে সাধনপথসকল নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। ঐরূপ কার্য্যে তাঁহার নিরন্তর উৎসাহ ও আনন্দ দেখিয়া ভক্ত-দিগের অনেকে ঠাকুরের ব্যাধিটাকে সামান্য ও সহজসাধ্য জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন; কেহ কেহ আবার, নবাগত ঐ সকল ভক্তদিগকে কৃপা করিবার এবং বহুজনমধ্যে ধর্ম্মভাব প্রচারের জন্যই ঠাকুর স্বেচ্ছায় শারীরিক ব্যাধিরূপ একটা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন—অন্তরের এইরূপ ধারণা প্রকাশ করিয়া স্বীয় আধ্যাত্মিক-অর্থ গ্রহণ-পটুতার পরিচয় দিতেছেন।

ডাক্তার কোন দিন সকালে এবং কোন দিন অপরাহ্নে প্রায় নিত্য আসিতেছেন এবং রোগের হ্রাসবৃদ্ধি পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থাদি করিবার পর ঠাকুরের মুখ হইতে ভগবদালাপ শুনিতে শুনিতে এতই মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন যে তন্ময় হইয়া দুই তিন ঘণ্টাকাল অতীত হইলেও বিদায় গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না! আবার, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ঐ সকলের অদ্ভুত সমাধান শ্রবণ করিতে করিতে বহুক্ষণ অতীত হইলে কখন কখন তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছেন, 'আজ তোমাকে বহুক্ষণ বকাইয়াছি, অন্যায় হইয়াছে; তা হউক, সমস্ত দিন আর কাহারও সহিত কোনও কথা কহিও না, তাহা হইলেই আর কোন অপকার হইবে না; তোমার কথায় এরূপ আকর্ষণ যে, এই দেখ না, তোমার কাছে আসিলেই সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া দুই তিন ঘণ্টা না বসিয়া আর উঠিতে পারি না; জানিতেই পারি না কোন্ দিক দিয়া সময় চলিয়া গেল! সে যাহা হউক, আর কাহারও সহিত এরূপে এতক্ষণ ধরিয়া কথা কহিও না; (কতক রহস্যে এবং কতক ভালবাসা ও আনন্দে) কেবল আমি আসিলে এইরূপে কথা কহিবে, তাহাতে দোষ হইবে না।' (ডাক্তারের ও সকল ভক্তদিগের হাস্য)।

ঠাকুরের পরম ভক্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—ঠাকুর যাঁহাকে কখন কখন 'সুরেশ মিত্র' বলিতেন—তাঁহার সিমলার ভবনে এ বৎসর পূজা আনিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের বাটীতে প্রতি বৎসর পূজা হইত, কিন্তু এক বৎসর বিশেষ বিঘ্ন হওয়ায় তদবধি পূজা বন্ধ ছিল। বাটীর কেহই আর এপর্য্যন্ত পূজা আনিতে সাহসী হয়েন নাই; অথবা, ইতিপূর্ব্বে কেহ আনিতে উদ্যোগী হইলেও অপর সকলে ধরিয়া পড়িয়া তাহাকে ঐ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বলে বলীয়ান সুরেন্দ্রনাথ

দৈববিঘ্নের ভয় রাখিতেন না এবং একবার কোন বিষয় করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলে কাহারও কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না। সুতরাং বাটীর সকলে নানা ওজর করিয়াও তাঁহাকে এবৎসর পূজার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি ঠাকুরকে জানাইয়া সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বাটীতে আনয়ন করিয়াছেন। শরীরের অসুস্থতা বশতঃ ঠাকুর আসিতে পারিবেন না বলিয়াই কেবল সুরেন্দ্রের আনন্দে নিরানন্দ। আবার পূজাপ্রারম্ভের অল্পদিন পূর্ব্বে বাটীতে কয়েক জন আত্মীয় কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ায় তিনি ঐ বিষয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া বাটীর অপর সকলের মনোমালিন্যের হেতু হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও বিচলিত না হইয়া সুরেন্দ্রনাথ অতি সন্তর্পণে ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সকল গুরুভ্রাতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সপ্তমী পূজা হইয়া গিয়াছে, আজ মহাষ্টমী। শ্যামপুকুরের বাসায় ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্র হইয়া ভগবদালাপ ও ভজনাদি করিয়া আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তার বাবু অপরাহ্নে ৪ ঘটিকার সময়ে উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ভজন আরম্ভ করিয়াছেন। সকলে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া সে অপূর্ব্ব ভাবসংযুক্ত দিব্য স্বরলহরী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ভাব সমাধি হইতেছে, আবার সমাধিভঙ্গে সমীপে উপবিষ্ট ডাক্তারের সহিত মৃদুস্বরে কখন কখন দুই একটী ভগবৎকথা কহিতেছেন ও সঙ্গীতের ভাবার্থ বুঝাইয়া দিতেছেন। ভক্তগণের কেহ কেহ ভাবে বাহ্যচৈতন্য হারাইয়াছেন; একটা

প্রবল আনন্দপ্রবাহে ঘর জম্ জম্ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে সাতটা বাজিয়া গেল। ডাক্তারের এতক্ষণে চৈতন্য হইল। তিনি সস্নেহে স্বামিজীকে পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন এবং ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সহসা গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। ভক্তেরা কানাকানি করিতে লাগিল, 'এই সময় সন্ধিপূজা কিনা, সেই জন্যই ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! ঐ কথা না জানিয়াও সহসা সমাধিমগ্ন হইয়াছেন, ইহা কি অল্প বিচিত্র!' প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল এবং ডাক্তারও বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর এইবার ভক্তগণকে ঐ সমাধির বিষয় বলিতে লাগিলেন, "দেখিলাম এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ী পর্য্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, সুরেন্দ্রের ভক্তিতে প্রতিমাতে মার আবেশ হইয়াছে! তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতির রশ্মি নির্গত হইতেছে! সম্মুখে দালানের ভিতর দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে; আর মার সম্মুখে উঠানে বসিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া সুরেন্দ্র রোদন করিতেছে। তোমরা এখন সকলে মিলিয়া তার বাটীতে যাও। তোমাদের দেখিলে তার প্রাণ অনেকটা শীতল হইবে।"

অনন্তর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সকলে সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, বাস্তবিকই দালানে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দীপমালা জ্বালা হইয়াছিল এবং ঠাকুরের যখন সমাধি হইয়াছিল তখন সুরেন্দ্রনাথ প্রাণের আবেগ আর ধারণ করিতে না পারিয়া প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসিয়া 'মা', 'মা',

বলিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধরিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন! ঠাকুরের সমাধিকালের দর্শন ঐরূপে বাহ্য ঘটনার সহিত মিলাইয়া পাইয়া ভক্তগণ তখন আনন্দে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন!

রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু ভ্রমধারণাবশতঃ ঠাকুরকে যেভাবে পরীক্ষা করেন।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরের ভিতরেই আবার, শ্রীমতী রাণী রাসমণি ও তজ্জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন কোন সময়ে ভাবিয়াছিলেন যে, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য-ধারণের ফলেই ঠাকুরের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতারূপে প্রকাশিত হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হইলে পুনরায় শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের সম্ভাবনা ভাবিয়া ঠাকুরের কল্যাণকামনায় তাঁহারা লছ্‌মীবাই প্রমুখ হাবভাব-পূর্ণা সুন্দরী বারনারীকুলের সহায়ে তাঁহাকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এবং পরে কলিকাতার মেছুয়াবাজার পল্লীস্থ এক ভবনে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ঐ সকল নারীর মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি ঐকালে 'মা', 'মা' বলিতে বলিতে বাহ্যচৈতন্য হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয় সঙ্কুচিত হইয়া কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে এককালে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল! শুনিয়াছি ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং ঠাকুরের বালকের ন্যায় ব্যবহারে মুগ্ধা হইয়া ঐ সকল নারীর হৃদয়ে ঐকালে বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল! অনন্তর তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গে প্রলোভিত করিয়া তাহারাই অপরাধিনী হইয়াছে ভাবিয়া সজল-নয়নে ঠাকুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, ও তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম করিয়া তাহারা সশঙ্কচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল!

নবম অধ্যায়

বিবাহ ও পুনরাগমন।

এদিকে ঠাকুর পূজাকার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছেন এই সংবাদ কামারপুকুরে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার কর্ণে পোঁছিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। রামকুমারের মৃত্যুর পরে দুই বৎসর কাল যাইতে না যাইতে ঠাকুরকে বায়ু-রোগাক্রান্ত হইতে শুনিয়া জননী চন্দ্রমণি দেবী এবং শ্রীযুত রামেশ্বর বিশেষ চিন্তিত হইলেন। লোকে বলে, মানবের অদৃষ্টে যখন দুঃখ আসে তখন একটীমাত্র দুর্ঘটনায় উহার পরিসমাপ্তি হয় না, কিন্তু নানাপ্রকারের দুঃখ চারিদিক হইতে উপর্য্যুপরি আসিয়া তাহার জীবনাকাশ এককালে আচ্ছন্ন করে—ইঁহাদিগের জীবনে এখন ঐরূপ হইল। শ্রীযুত গদাধর চন্দ্রাদেবীর পরিণত বয়সে প্রাপ্ত, আদরের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। সুতরাং শোকে দুঃখে অধীরা হইয়া তিনি পুত্রকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন এবং নিকটে আসিলে পুত্রের উদাসীন, উন্মনা, চঞ্চল ভাব দেখিয়া এবং 'মা' 'মা' বলিয়া তাহার কাতর ক্রন্দন শুনিয়া উদ্বিগ্ন মনে নানারূপ প্রতীকারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ঔষধাদি ব্যবহারের সহিত শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়্‌ফুক্

ঠাকুরের কামারপুকুরে আগমন।

প্রভৃতি নানা দৈব প্রক্রিয়ারও অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। তখন সন ১২৬৫ সালের আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাস হইবে।

ঠাকুর উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আত্মীয়-দিগের ধারণা।

বাটীতে ফিরিয়া ঠাকুর অনেক সময় পূর্ব্বের ন্যায় থাকিলেও মধ্যে মধ্যে ভাববিহ্বল হইয়া পড়িতেন এবং যখন ঐরূপ হইতেন তখন তাঁহার চাল চলন ব্যবহারাদি সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যাইত! আবার, গাত্রদাহের জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। এইরূপে একদিকে তাঁহার সকলের সহিত সরল অমায়িক ব্যবহার, দেবভক্তি, মাতৃভক্তি ও বয়স্য-প্রেমের যেমন পূর্ব্ববৎ প্রকাশ ছিল, অপর দিকে আবার তেমনি, সময়ে সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীনতা ও লজ্জা-ভয়-ঘৃণারাহিত্য, সাধারণের অপরিচিত একটা অনির্দ্দিষ্ট বিষয়লাভের জন্য উদ্দাম ব্যাকুলতা এবং নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথের সকল বিঘ্ন বাধা নির্ম্মূল করিবার জন্য অনাশ্রব চেষ্টা তাঁহাতে এক অপূর্ব্ব বিপরীত প্রকাশ উপস্থিত করিয়া লোকের মনে এক অদ্ভুত বিশ্বাসের উদয় করিয়াছিল। লোকে ভাবিয়াছিল তিনি উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন!

ওঝা আনাইয়া চণ্ড নামান।

ঠাকুরের মাতা, সরলহৃদয়া চন্দ্রাদেবীর প্রাণে ইতিপূর্ব্বে ঐ কথা কখন কখন উদিত হইয়াছিল। এখন অপরেও ঐরূপ আলোচনা করিতেছে শুনিয়া তিনি পুত্রের কল্যাণের জন্য ওঝা আনাইতে মনোনীত করিলেন। ঠাকুর বলিতেন—"একদিন একজন ওঝা আসিয়া একটা মন্ত্রপূত পল্‌তে পুড়াইয়া শুঁকিতে দিল; বলিল, যদি ভূত হয় ত পলাইয়া যাইবে; কিন্তু কিছুই হইল না!" পরে বিশিষ্ট কয়েকজন ওঝার সাহায্যে পূজাদি

করিয়া একদিন রাত্রিকালে চণ্ড নামান হইল! চণ্ড পূজা ও বলি গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হইয়া ওঝাকে বলিল, 'উহাকে (ঠাকুরকে) ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধিও হয় নাই!'—পরে সকলের সমক্ষে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ও গদাই, তুমি সাধু হতে চাও, তবে অত সুপারী খাও কেন? সুপারীতে যে কামের বৃদ্ধি হয়!" ঠাকুর বলিতেন—'বাস্তবিকই ইতিপূর্ব্বে আমি সুপারী খাইতে বড় ভালবাসিতাম এবং উহা যখন তখন খাইতাম; চণ্ডের ঐরূপ কথাতে উহা তদবধি ত্যাগ করিলাম!"

ঠাকুরের প্রকৃতিস্থ হইবার কারণসম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয়বর্গের কথা।

ঠাকুরের বয়স তখন ত্রয়োবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। কামারপুকুরে কয়েক মাস থাকিবার পরে তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইবার এবং ব্যাকুল ক্রন্দনের ভাবটা তাঁহাতে প্রশমিত হইবার নিশ্চিত কোন বিশেষ কারণ ছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার বারম্বার অদ্ভুত দর্শনাদি-লাভেই নিশ্চিত তিনি এখন শান্ত হইতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ের অনেক কথা আমরা তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট শুনিয়াছি; তাহাতেই আমাদিগের মনে ঐ ধারণা নিঃসংশয় হইয়াছে। ঐ সকল কথা আমরা এখন পাঠককে বলিব।

কামারপুকুরের পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তদ্বয়ে অবস্থিত ভূতির খাল এবং বুধুই মোড়ল নামক জনশূন্য শ্মশানদ্বয়ে দিবা ও রাত্রির অনেক ভাগ তিনি এই সময়ে একাকী অতিবাহিত করিতেন এবং এই কাল হইতে সময়ে সময়ে তাঁহাতে অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তি-প্রকাশের কথা তাঁহার আত্মীয়েরা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের নিকটে শুনিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত শ্মশানদ্বয়ে অবস্থিত শিবাসমূহ এবং উপদেবতাদিগকে বলি দিবার জন্য মিষ্টা-

ন্নাদি খাদ্য সংগ্রহ করিয়া নূতন হাঁড়াতে পুরিয়া লইয়া গৃহ হইতে কখন কখন নিষ্ক্রান্ত হইতেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, ভূত-বলি নিবেদন করিয়া দিবার পরে ঐ হাঁড়ী বায়ুভরে ঊর্দ্ধে উঠিয়া শূন্যে লীন হইয়া যাইত এবং ঐ সকল উপদেবতাকে তিনি অনেক সময় স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন! কোন কোন দিন রাত্রি দ্বি-প্রহর অতীত হইলেও কনিষ্ঠকে গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ, শ্রীযুত রামেশ্বর শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইয়া ভ্রাতার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকিতেন। ঠাকুরও ডাক শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিতেন, 'যাচ্চি গো দাদা; তুমি এদিকে আর অগ্রসর হইও না, তাহা হইলে ইহারা (উপদেব-তারা) তোমার অপকার করিবে!' ভূতির খালের পার্শ্বের শ্মশানে ঠাকুর এই সময়ে একটী বিল্ববৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন এবং শ্মশানমধ্যে যে প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল তাহার তলে বসিয়া অনেক সময় জপ-ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। ঠাকুরের আত্মীয়-বর্গের ঐ সকল কথায় বুঝিতে পারা যায় যে, জগদম্বার দর্শন-লালসায় তিনি ইতিপূর্ব্বে ভিতরে যে বিষম অভাব অনুভব করিয়া-ছিলেন, তাহা আধ্যাত্মিক রাজ্যের কতকগুলি অপূর্ব্ব দর্শন ও উপ-লব্ধি দ্বারা এই সময়ে প্রশমিত হইয়াছিল। তাঁহার এই কালের জীবনালোচনা করিয়া মনে হয়, শ্রীশ্রীজগদম্বার অসিমুণ্ডধরা, বরাভয়করা, সাধকানুগ্রহকারিণী চিন্ময়ী মূর্ত্তির দর্শন, তিনি এখন প্রায় সর্ব্বদা লাভ করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে যখন যাহা প্রশ্ন করিতেছিলেন তাহার উত্তর পাইয়া তদনুযায়ী নিজ জীবন চালিত করিতেছিলেন। মনে হয়, এখন হইতে তাঁহার মনে একথার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ৺জগদম্বার বাধামাত্রশূন্য অবিরাম পূর্ণদর্শন তাঁহার ভাগ্যে অচিরেই উপস্থিত হইবে।

ঐরূপে ভূতবলি এবং শিবাবলি দিবার কথাই যে আমরা এইকালে ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিয়াছি তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ-দর্শন বিষয়ক অন্য একটী যোগবিভূতির কথাও জানিতে পারিয়াছি। হৃদয় এবং কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর অনেকে ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন—এবং ঠাকুরের শ্রীমুখেও আমরা ঐকথা শুনিয়াছি।

ঐ কালে ঠাকুরের যোগবিভূতির কথা।

ঠাকুরের বাহ্য ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার মাতা ও অন্যান্য পরিবারবর্গ এখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি সহসা যে বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, দৈবকৃপায় তাহার অনেকটা শান্তি হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা দেখিতেছিলেন, তিনি এখন যখন তখন ব্যাকুল ক্রন্দন করেন না, আহারাদি যথাসময়ে করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার অন্য সকল আচরণও অন্য সকলের ন্যায়। তবে যে, তিনি যখন তখন শ্মশানে যাইয়া বসিয়া থাকেন, পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া কখন কখন নির্লজ্জভাবে ধ্যান পূজাদি করিতে বসেন, পূজা অনুষ্ঠানাদি যাহা করিবেন ভাবিয়াছেন তাহাতে বাধা পাইলে বিরক্ত হইয়া উঠেন ও কাহারও নিষেধ মানেন না এবং সর্ব্বদা ঠাকুর-দেবতা লইয়া থাকেন—সেটা তাঁহার আবাল্য স্বভাব; উহাতে বায়ুরোগের পরিচয় পাইবার কোন কারণ নাই।

ঠাকুরকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আত্মীয়বর্গের বিবাহদানের সংকল্প।

কিন্তু সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক বিষয়ে ঠাকুরের পূর্ণমাত্রায় উদাসীনতা এবং উন্মনাভাবের জন্য তাঁহারা এখনও বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। দৈনন্দিন সাংসারিক বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত উন্মনা ভাবটা যতদিন না প্রশমিত হইতেছে ততদিন বায়ু-

রোগে পুনরাক্রান্ত হইবার তাঁহার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে—একথা তাঁহাদের মনে পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে এখনও কখন কখন চিন্তাসাগরে মগ্ন করিত। উহার হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুরের স্নেহময়ী মাতা ও অগ্রজ নানা উপায়োদ্ভাবনে অনেক সময় নিযুক্ত হইতেন। অশেষ চিন্তা ও আলোচনার পর অবশেষে মাতা ও পুত্রে পরামর্শ স্থির হইল যে, উপযুক্তা পাত্রী দেখিয়া ঠাকুরের এখন বিবাহ দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সদ্বংশীয়া সুশীলা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা পড়িলে ঠাকুরের মন আর অত ঊর্দ্ধসঞ্চরণশীল থাকিবে না। যৌবনে পদার্পণ করিলেও তিনি এখনও পূর্ব্বের ন্যায় সকল বিষয়ে মাতা ও ভ্রাতার মুখাপেক্ষী হইয়া যে বালক সেই বালকই রহিয়াছেন, স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবে নিজ সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা বা 'আঁট' তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয় নাই! ঘাড়ে স্ত্রীপুত্রাদি-পোষণের ভার না পড়িলে উহা কেমন করিয়া আসিবে?

আবার, দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে পণ দিয়া গৃহে কন্যা আনয়ন করিতে হইবে। দশ বার বৎসর বয়স্কা কন্যার পণে যত টাকা লাগিবে তত টাকা দিবার তাঁহাদিগের সামর্থ্য কোথায়? সাংসারিক নানাবিধ বিপৎপাতে টাকার যোগাড় হইয়া উঠে নাই বলিয়াই ত 'গয়ং গচ্ছ' করিয়া এতদিন গদাধরের বিবাহ দেওয়া হয় নাই। পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকার সহিত তখন বিবাহ দিয়া ফেলিলে সে এতদিনে বড় হইয়া পতির মনাকর্ষণ ও সংসারের কাজ কর্ম্মের কত ভার লইতে পারিত। সে যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, আর কালবিলম্ব উচিত নহে। চারিদিকে পাত্রীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে এজন্য

মাতা ও পুত্রে পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইলেও চতুর ঠাকুরের উহা জানিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব উঠিলে তিনি ঐ বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি না করিয়া বরং বাটীতে কোন একটা অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে বালক বালিকারা যেরূপ রঙ্গরস ও আনন্দ করিয়া থাকে তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট ঐ বিষয় নিবেদন করিয়া ঐ বিষয়ে কিংকর্ত্তব্য জানিয়াই কি তিনি এই সময়ে ঐরূপ আনন্দের ভাব দেখাইয়াছিলেন? অথবা, বালকের ন্যায় ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও চিন্তারাহিত্যই তাঁহার আনন্দ-প্রকাশের কারণ? সাধারণে দ্বিতীয়টীকে উহার কারণ বলিয়া নির্ণয় করিলেও আমরা উহার যথার্থ কারণ অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।*

ঠাকুরের বিবাহে সম্মতিদানের কারণ।

সে যাহা হউক, চারিদিকের গ্রামসকলে লোক প্রেরিত হইলেও কোথাও মনোমত পাত্রী পাওয়া গেল না। যে কয়েকটী পাওয়া গেল তাহাদের পিতা মাতা অসম্ভব অধিক হারে পণ যাচ্ঞা করায় ঠাকুরের অগ্রজ রামেশ্বর সে সকল স্থানে বিবাহ স্থির করিতে সাহস করিলেন না। গ্রামস্থ বন্ধুগণও তাঁহাকে অত অধিক পণ দিয়া ঐ কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন না। ঠাকুরের মাতা চন্দ্রাদেবী সুতরাং বিশেষ চিন্তিতা হইলেন। কারণ, দেবতুল্য স্বামী ও জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারের অবর্ত্তমানে তিনি অনাবিল সুখের আশায় গদাধরের বিবাহদানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, কিন্তু পুত্রের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ভাবিয়াই ঐ কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

বিবাহের জন্য ঠাকুরের পাত্রী নির্ব্বাচন।

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায় ১৩০—১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

সুতরাং পাত্রী পাইলেন না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার তাঁহার উপায় ছিল না। পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া পাত্রীর অনুসন্ধান চলিল। ঐরূপ অনুসন্ধানেও পাত্রী মিলিতেছে না দেখিয়া তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা যখন নিতান্ত বিরস ও চিন্তামগ্ন হইয়াছেন তখন সহসা একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—'হেথায় হোথায় অনুসন্ধান বৃথা, জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে খুঁজিয়া দেখগে, বিবাহের পাত্রী কুটাবাঁধা হইয়া সেখানে রক্ষিতা আছে!'*

বিবাহ।

ঠাকুরের ঐ কথায় সহসা বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও ঠাকুরের মাতা ও ভ্রাতা ঐ স্থানে একবার অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। লোক যাইয়া সংবাদ আনিল, অন্য সকল বিষয়ে যাহাই হউক পাত্রী কিন্তু নিতান্ত বালিকা, বয়স—পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। অন্য কোথাও হইতে অপর কোন পাত্রীর সন্ধান না আসায় এবং ঐরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে এই পাত্রীর সন্ধানলাভে ঠাকুরের মাতা অগত্যা ঐস্থানেই পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃতা হইলেন। অল্প দিনেই সকল কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। অনন্তর শুভদিন ও শুভ মুহূর্ত্ত দেখাইয়া শ্রীযুত রামেশ্বর নিজালয় হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত জয়রামবাটী গ্রামে ভ্রাতাকে লইয়া যাইয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম বর্ষীয়া একমাত্র কন্যার সহিত শুভ-পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া আসিলেন। বিবাহে তিন শত টাকা পণ লাগিল। তখন সন ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগ এবং ঠাকুর চতুর্বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়, ১৩২ পৃষ্ঠা দেখ

বিবাহের পরে শ্রীমতী চন্দ্রমণি এবং ঠাকুরের আচরণ।

গদাধরের বিবাহ দিয়া শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী এখন যে অনেকটা নিশ্চিন্তা হইয়াছিলেন, একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় বিবাহ-বিষয়ে তাঁহার নিয়োগ পুত্রকে শ্রদ্ধাসম্পন্নচিত্তে যথাযথ সম্পন্ন করিতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন দেবতা এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। কারণ, দেবতা অনুকূল না হইলে সকল কার্য্য কি কখন এরূপ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইত? উন্মনা পুত্র গৃহে ফিরিল, সদ্বংশীয়া পাত্রী জুটিল, অর্থের অনটন—তাহাও অচিন্তনীয়ভাবে পূর্ণ হইল, পুত্র সংসারী হইল! অতএব দৈব অনুকূল নহেন, একথা আর কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? সুতরাং সরল-হৃদয়া ধর্ম্মপরায়ণা চন্দ্রাদেবী যে, এখন কথঞ্চিৎ সুখী হইয়াছিলেন, একথা আমরা বলিতে পারি। কিন্তু, বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি ও বাহিরের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য জমীদার বন্ধু লাহাবাবুদের বাটী হইতে যে কন্যা-গহনাগুলি চাহিয়া বধূকে বিবাহের দিনে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, বিবাহের কয়েক দিন পরে তাহা ফিরাইয়া দিবার যখন সময় উপস্থিত হইল তখন তিনি যে আবার নিজ সংসারের দারিদ্র্য-চিন্তায় অভিভূতা হইয়াছিলেন, ইহাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। গদাধরের আদরের পাত্রী হইবে বলিয়া নববধূকে তিনি বিবাহের দিন হইতেই আপনার হইতে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি তিনি কোন্ প্রাণে খুলিয়া লইবেন, এই চিন্তায় বৃদ্ধার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়াছিল। হৃদয়ের পূর্ব্বোক্ত বেদনার কথা তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদাধরের উহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি দুই চারি কথায় মাতাকে শান্ত করিয়া নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে গহনাগুলি এমন কৌশলে

খুলিয়া লইলেন যে, বালিকা উহা কিছুই জানিতে পারিল না। অলঙ্কারগুলি লাহাবাবুদের বাটীতে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু এখানেই ঐ বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল না। বুদ্ধিমতী বালিকা নিদ্রাভঙ্গে বলিতে লাগিল, 'আমার গায়ে যে এইরূপ সব গহনা ছিল, তাহা কোথায় গেল ?' চন্দ্রাদেবী তাহাতে সজল নয়নে বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা প্রদানের জন্য বলিতে লাগিলেন, 'মা ! গদাধর তোমাকে ঐ সকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কার সকল, ইহার পর কত দিবে,' ইত্যাদি। কন্যার খুল্লতাত ঐ দিন তাহাকে দেখিতে আসিয়া ঐ কথা জানিতে পারিলেন এবং বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া ঐ দিনেই তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইলেন। চন্দ্রাদেবীর মনে উহাতে আবার বিশেষ কষ্ট হইল। ঠাকুর তাহাতে, 'উহারা এখন যাহাই বলুক্ ও করুক্ না কেন, বিবাহ ত আর ফিরিবে না ?'—ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া বালকের ন্যায় রঙ্গ-পরিহাসাদি করিয়া মাতার মনের সে দুঃখ অচিরে দূর করিয়াছিলেন।

বিবাহের পরে ঠাকুর প্রায় সাত মাস কাল কামারপুকুরেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে নিকটে পাইয়া তাঁহার জননী তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় যাইতে সহজে অনুমতি দেন নাই। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হইয়া কলিকাতায় ফিরিলে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার বায়ুরোগ হইতে পারে এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে সহসা যাইতে দেন নাই। সে যাহা হউক, সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বধূ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে কুলপ্রথানুসারে ঠাকুরের কয়েক দিনের জন্য শ্বশুরালয়ে যাইতে হইয়াছিল এবং শুভদিন দেখিয়া বধূকে

ঠাকুরের কলিকাতায় পুনরাগমন।

সঙ্গে লইয়া একত্রে কামারপুকুরে আগমন করিতে হইয়াছিল। ঐরূপে যোড়ে আসিবার অনতিকাল পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিতে সঙ্কল্প করিলেন। কারণ, কলিকাতায় না আসিলে চলে কি করিয়া? মাতা ও ভ্রাতা তাঁকে কামারপুকুরে আরও কিছু কাল অবস্থান করিতে বলিলেও সংসারের অভাব অনটনের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। স্নেহ-ভালবাসাপূর্ণ ঠাকুরের হৃদয় ঐ কথা জানিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবে? তিনি, তাঁহাদিগের ঐ কথা না শুনিয়া কালীবাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং পূর্ব্ববৎ শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবাকার্য্যে ব্রতী হইলেন।

ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোন্মাদাবস্থা।

কলিকাতায় ফিরিয়া কয়েক দিন পূজা করিতে না করিতেই তাঁহার মন ঐ কার্য্যে এত তন্ময় হইয়া যাইল যে, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, সংসার, অনটন প্রভৃতি কামারপুকুরের সকল কথা তাঁহার মনের কোন্ এক নিভৃত কোণে চাপা পড়িয়া গেল; এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সকল সময়ে, সকলের মধ্যে কিরূপে দেখিতে পাইবেন —এই বিষয়ই উহার সকল স্থল অধিকার করিয়া বসিল। দিবারাত্র স্মরণ, মনন, জপ, ধ্যানে তাঁহার বক্ষ পুনরায় সর্ব্বক্ষণ আরক্তিমভাব ধারণ করিল, সংসার ও সাংসারিক বিষয়ের প্রসঙ্গ বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল, বিষম গাত্রদাহ পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং নয়নকোণ হইতে নিদ্রা যেন দূরে কোথায় অপসৃত হইল! তবে, শারীরিক ও মানসিক ঐ প্রকার অবস্থা ইতিপূর্ব্বে একবার অনুভব করায় তিনি উহাতে পূর্ব্বের ন্যায় এককালে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন না।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, মথুর বাবুর নির্দ্দেশে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ, ঠাকুরের বায়ুপ্রকোপ, অনিদ্রা

ও গাত্রদাহাদি রোগের উপশমের জন্য এইকালে চতুর্মুখাদিবটী এবং মধ্যমনারায়ণাদি নানা তৈল ক্রমে ক্রমে ব্যবহার করাইয়াছিলেন। চিকিৎসায় আশু ফল না পাইলেও হৃদয় নিরাশ না হইয়া মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া কবিরাজের কলিকাতাস্থ ভবনে চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিতেন, একদিন ঐরূপে হৃদয়ের সহিত গঙ্গাপ্রসাদের ভবনে উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার জন্য নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। গঙ্গাপ্রসাদের নিকট তখন পূর্ববঙ্গীয় অন্য একজন বৈদ্যও উপস্থিত ছিলেন। ঐ বৈদ্য ঠাকুরের দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার রোগের বিষয় অনুধাবন করিতে করিতে বলিলেন, 'লক্ষণ দেখিয়া ইঁহার দেবোন্মাদ অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে; উহা যোগজ ব্যাধি: ঔষধে সারিবার নহে।* ঠাকুর বলিতেন, এই বৈদ্যই, ব্যাধির ন্যায় প্রতীয়মান তাঁহার শারীরিক বিকারসমূহের যথার্থ কারণ প্রথম নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার বাক্যে কেহই তখন আস্থা প্রদান করেন নাই। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং মথুর বাবু প্রমুখ ঠাকুরের হিতৈষী বন্ধুবর্গ চিন্তান্বিত হইয়া তাঁহার অসাধারণ ব্যাধির নানারূপে চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। রোগের কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধি ভিন্ন উপশম দেখা গেল না।

সংবাদ ক্রমে কামারপুকুরে পৌঁছিল। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রের কল্যাণকামনায় ৺মহাদেবের নিকট

---

* কেহ কেহ বলেন ৺গঙ্গাপ্রসাদের ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদই ঠাকুরকে দেখিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

হত্যা দিবার সংকল্প স্থির করিলেন, এবং কামারপুকুরের 'বুড়ো শিব'কে জাগ্রত দেবতা জানিয়া তাঁহারই মাড়ে (মন্দিরে) যাইয়া প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। মুকুন্দপুরের শিবের নিকট হত্যা দিলে তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে, তিনি এখানে এইরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিলেন এবং ঐস্থানে গমন করিয়া পুনরায় প্রায়োপবেশনের অনুষ্ঠান করিলেন। মুকুন্দপুরের শিবের নিকট ইতিপূর্ব্বে কামনা পূরণের জন্য কেহ হত্যা দিত না। প্রত্যাদিষ্টা বৃদ্ধা উহা জানিয়াও মনে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। দুই তিন দিন পরেই তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, জ্বলজ্জটাসুশোভিত বাঘাম্বর-পরিহিত রজতদলিতকান্তি মহাদেব সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক বলিতেছেন—'ভয় নাই, তোমার পুত্র পাগল হয় নাই, ঐশ্বরিক আবেশে তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে! ধর্ম্মপরায়ণা বৃদ্ধা ঐরূপ দেবাদেশলাভে আশ্বস্তা হইয়া ভক্তিপূতচিত্তে শ্রীশ্রীমহাদেবের পূজা দিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং পুত্রের মানসিক শান্তিবিধানের জন্য কুলদেবতা ৺রঘুবীর ও ৺শীতলা মাতার একমনে সেবা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, মুকুন্দপুরের শিবের নিকট তদবধি অনেক নরনারী প্রতি বৎসর হত্যা দিয়া সফলকাম হইতেছে।

চন্দ্রাদেবীর হত্যাদান।

এই কালের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে পরে অনেক সময় বলিয়াছেন—"সাধারণ জীবের শরীর-মনে আধ্যাত্মিক ভাবে ঐরূপ দূরে থাকুক্ উহার এক চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীর ত্যাগ হয়। দিবা-রাত্রির অধিকাংশ ভাগ, মার কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম তাই রক্ষা, নতুবা (নিজ শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা থাকা অসম্ভব হইত! এখন হইতে

ঠাকুরের এই কালের অবস্থা।

আরম্ভ হইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই! চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, চেষ্টা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না! কত কাল যে গত হইল, তাহার জ্ঞান থাকিত না এবং শরীরকে শরীর বলিয়া জ্ঞান ছিল না! মার দিক হইতে ফিরিয়া শরীরের দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পড়িত তখন বিষম ভয় হইত; ভাবিতাম, তাই ত পাগল হইতে বসিয়াছি নাকি? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া দেখিতাম, তাহাতে চক্ষুর পলক পড়ে কি না!—দেখিতাম তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশূন্য হইয়া থাকিত! ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম—'মা, তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাস নির্ভর করার কি এই ফল হ'ল? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি?' আবার পরক্ষণেই বলিতাম, 'তা যা হবার হ'ক্‌গে, শরীর যায় যাক্‌, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস্‌ নি, আমায় দেখা দে, কৃপা কর্‌, আমি যে; মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ লইয়াছি, তুই ভিন্ন আমার যে, আর অন্য গতি একেবারেই নাই!' ঐরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে মন আবার অদ্ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া মনে হইত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইতাম!"

মথুর বাবুর ঠাকুরকে শিব-কালীরূপে দর্শন।

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্য নিয়োগে মথুর বাবু এই সময়ে এক দিন ঠাকুরের মধ্যে অদ্ভুত দেবপ্রকাশ অযাচিতভাবে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কিরূপে তিনি সেদিন ঠাকুরের ভিতর শিব ও কালীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিয়াছিলেন,

তাহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।* ঐ দর্শনের দিন হইতে তিনি ঠাকুরকে আর এক নয়নে দেখিতে এবং তাঁহাতে সর্ব্বদা ভক্তি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! এরূপ অঘটন ঘটনা দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয়, ঠাকুরের সাধকজীবনে এখন হইতে মথুরের সহায়তা ও আনুকূল্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে বলিয়াই যেন ইচ্ছাময়ী জগন্মাতা তাঁহাদিগের উভয়কে ঐরূপে অবিচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সন্দেহ, জড়বাদ ও নাস্তিক্য-প্রবণ বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মগ্লানি দূর করিয়া অধ্যাত্মশক্তি সংক্রমণের জন্য ঠাকুরের শরীরমনরূপ যন্ত্রটীকে শ্রীশ্রীজগদম্বা কত যত্নে ও কি অদ্ভুত উপায়সকল অবলম্বনে যে, নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ঐরূপ ঘটনাসকলে তাহার প্রমাণ পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

দশম অধ্যায়

ভৈরবীব্রাহ্মণী-সমাগম

রাণী রাসমণির সাংঘাতিক পীড়া।

বিবাহ করিয়া কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পরে সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে, ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরের জীবনে দুইটী ঘটনা সমুপস্থিত হয় ঘটনা দুইটী তাঁহার জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছিল; সেজন্য উহাদের কথা আমাদিগের আলোচনা করা আবশ্যক। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রাণী রাসমণি গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হইলেন ঠাকুরের শ্রীমুখে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭৮ হইতে ১৮০

আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, রাণী ঐ সময়ে একদিন সহসা পড়িয়া যান। উহাতেই জ্বর, গাত্রবেদনা ও অজীর্ণাদির সূত্র-পাত হইয়া, ক্রমে গ্রহণীরোগের সঞ্চার হইয়াছিল। রোগ ক্রমে সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিল।

পাঠককে আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, অশেষ গুণবতী রাণী সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ইংরাজী ১৮৫৫ খৃস্টাব্দের মে মাসের ৩১শে তারিখে বৃহস্পতিবারে দক্ষিণেশ্বরকালীবাটী সুপ্রতি-ষ্ঠিত করেন এবং ঐ দেবসেবা আবহমান কাল নির্ব্বিঘ্নে চালাইবার উদ্দেশ্যে ঐ বৎসর ১৪ই ভাদ্র, ইংরাজী ২৯শে আগষ্ট তারিখে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তিন লাট জমিদারী দুই লক্ষ ছাব্বিশ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলেন।* মনে মনে সঙ্কল্প থাকিলেও, রাণী এতদিন ঐ সম্পত্তি আইনানুসারে যথাযথ-ভাবে দানপত্র লিপিবদ্ধ করিয়া উহাকে দেবো-ত্তররূপে পরিণত করেন নাই। আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া উহা করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাণীর চারি কন্যার মধ্যে মধ্যমা ও তৃতীয়া শ্রীমতী কুমারী ও শ্রীমতী করুণাময়ী দাসীর দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুশয্যার

রাণীর দিনাজপুরের সম্পত্তি দেবোত্তর করা ও মৃত্যু।

* Plaint in High Court Suit No. 308 of 1872 Puddomoni Dasee vs. Jagadamba Dasee, recites the following from the Deed of Endowment executed by Rani Rasmoni :—"According to my late husband's desire * * * I on 18th. Jaistha 1262 B. S. (June 1855) established and consecrated the *Thakurs* * * * and for purpose of carrying on the *Sheba* purchased three lots of Zemindaries in District Dinajpur on 14th Bhadra 1262 B. S. (29th, August 1855) for Rs 2,26,000."

পার্শ্বে সুতরাং তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয়, শ্রীমতী পদ্মমণি ও শ্রীমতী জগদম্বা দাসীই উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়াছি, কালীবাটীর দেবোত্তর দানপত্র রাণীর অভিপ্রায়ানুসারে প্রস্তুত হইয়া আসিলে, উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে ঐ সম্পত্তির নিয়োগ-সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিবাদ বিসম্বাদের পথ এককালে রুদ্ধ করিবার জন্য রাণী নিজ কন্যাদ্বয়কে সম্মতিসূচক অঙ্গীকারপত্রে সহি করিতে বলিয়াছিলেন। কনিষ্ঠা শ্রীমতী জগদম্বা ঐ পত্রে সহি করিয়াছিলেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী পদ্মমণি রাণীর মৃত্যুকালীন অনুরোধেও উহাতে সহি করেন নাই। সেজন্য মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও রাণী শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অগত্যা, ৺জগদম্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে, ভাবিয়া, রাণী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেবোত্তর দানপত্রে সহি করিলেন* এবং ঐ কার্য্য সমাধা করিবার পর দিনে, ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রিকালে শরীরত্যাগ করিয়া ৺দেবীলোকে গমন করিলেন।

শরীর রক্ষা করিবার কালে রাণীর দর্শন।

ঠাকুর বলিতেন, শরীরত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে রাণী রাসমণি ৺কালীঘাটে আদিগঙ্গাতীরস্থ বাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন; এবং দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বকালে, সম্মুখে অনেকগুলি আলোক জ্বালা

* The Deed of Endowment dated 18th. February 1861 was executed by Rani Rasmani; she acknowledged her execution of the same before J. F. Watkins, Solicitor, Calcutta. This dedication was accepted as valid by all parties in Alipore Suit No. 72 of 1867, Jadu Nath Chowdhury vs. Puddomoni, and in the High Court Suit No. 308 of 1872 Puddomoni vs. Jagadamba and also when that Suit (No. 308) was revived after contest on 19th. July 1888.

হইয়াছে দেখিয়া, সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ও সব রোস্‌নাই আর ভাল লাগ্‌ছে না, এখন আমার মা (শ্রীশ্রীজগন্মাতা) আস্‌ছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারিদিক আলোকময় হ'য়ে উঠেছে!" (কিছুক্ষণ পরে) "মা এলে"! পদ্ম যে সহি দিলে না—কি হবে মা!"—তাঁহাকে তখন গঙ্গা-গর্ভে আনয়ন করা হইয়াছিল, এবং নিকটেই চতুর্দ্দিকে শিবা-কুলের উচ্চ নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছিল! ঐ কথাগুলি বলিয়াই পুণ্যবতী রাণী স্থির শান্তভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন!

রাণী মৃত্যুকালে যাহা আশঙ্কা করেন তাহাই হইতে বসিয়াছে।

কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়া রাণী রাসমণির দৌহিত্র-গণের মধ্যে উত্তরকালে যে বহুল বিবাদ-বিসম্বাদ ও মকদ্দমা চলিতেছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্না রাণী, তাঁহার প্রাণস্বরূপ দেবীসেবার বন্দোবস্ত যথাযথ থাকিবে না বলিয়া, মৃত্যুকালে কেন অত আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং কেনই বা সাংঘাতিক ব্যাধির যন্ত্রণাপেক্ষা ঐ চিন্তার যন্ত্রণা তাঁহার নিকট তীব্রতর বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। আদালতের কাগজপত্রে দেখা যায়, ঐ সকল মোকদ্দমার বহুল ব্যয়ের জন্য ঐ দেবোত্তর সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত হইয়া এখনই কিঞ্চিন্ন্যূন লক্ষ মুদ্রায় বাঁধা পড়িয়াছে।* কে বলিবে, রাণী রাসমণির অদ্বিতীয় দৈবকীর্ত্তি ঐ বিবাদের ফলে নাম মাত্রে পর্য্যবসিত এবং ক্রমে লুপ্ত হইবে কি না!

* Debt due on mortgage by the Estate is Rs. 50,000; interest payable quarterly is Rs. 876—0—0; Costs of the Referee already stated amount to Rs. 20,000, as yet untaxed.

মথুর বাবুর সাংসারিক উন্নতি ও দেবসেবার বন্দোবস্ত।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠার কালে রাণীর কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুত মথুরানাথ বা মথুরামোহন বিশ্বাস বিষয়-সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিচালনায় তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কালী-বাটীপ্রতিষ্ঠার দিন হইতে তিনি উহার দেবোত্তর সম্পত্তির আয়-ব্যয় বুঝিয়া রাণীর ইচ্ছামত দেবসেবাসংক্রান্ত সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। সুতরাং রাণীর মৃত্যুর পরে তিনিই উহা পূর্ব্বের ন্যায় পরিচালনা করিতে থাকিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পবিত্র জীবন-প্রভাব মথুরামোহনের মনের উপর ইতিপূর্ব্বে অধিকার বিস্তৃত করায়, দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসেবা যে, রাণীর মৃত্যুতে কোন অংশে হীনাঙ্গসম্পন্ন হইল না, একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

মথুর বাবুর উন্নতি ও আধিপত্য ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্য।

ঠাকুরের সহিত মথুরামোহন বা মথুরানাথের বিচিত্র সম্বন্ধের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে অনেকবার বলিয়াছি। অতএব এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ ঠাকুরের জীবনে অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে রাণী রাসমণির স্বর্গারোহণ ও কালীবাটীসংক্রান্ত সকল বিষয়ে মথুরামোহনের একাধিপত্য-লাভরূপ ঘটনা উপস্থিত হওয়ায়, বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে সম্যক্ সহায়তা করিবার বিশেষ অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগ-দম্বার অঙ্গুলী-সঙ্কেতে মথুরের এই সময়ে বিষয়াধিকার লাভ ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্যই কি না, তাহা কে বলিতে পারে? কারণ, দেখা যায়, এখন হইতে আমরণ, মথুরামোহন ঠাকুরের বিশেষভাবে সেবা করিতে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

বিষয়াধিকার লাভের পর একাদশ বৎসরেরও অধিক কাল ঐরূপে এক ব্যক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া উচ্চ ভাবাশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করা একমাত্র ঈশ্বরকৃপাতেই সম্ভব হইতে পারে। রাণীর বিপুল বিষয়ে প্রায় একাধিপত্য লাভ করিয়া, মথুরামোহন যে উচ্ছৃঙ্খল ও বিপথগামী না হইয়া ঠাকুরের প্রতি দিন দিন অধিকতর বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার বিপুল ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারা যায়।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ইতর সাধারণের ও মথুরের ধারণা।

ঈশ্বর-সাধক ভিন্ন অন্য কেহ এখনও পর্য্যন্ত ঠাকুরের উচ্চাবস্থা সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা করিতে পারে নাই। মানব-সাধারণ তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদ বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। কারণ, দেখিয়াছিল, এই ব্যক্তি আপনার হিতাহিত কিছুমাত্র বুঝে না, রূপরসাদি কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, কখন কাহারও অনিষ্টচেষ্টা করে না এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া ইচ্ছামত কখন 'হরি', কখন 'রাম', এবং কখন বা 'কালী' 'কালী, বলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়! দেখিয়াছিল, যে, যে রাণী রাসমণির ও মথুর বাবুর কৃপা প্রাপ্ত হইলে লোকে আপন গণ্ডা বেশ গুছাইয়া লয়, ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সুনয়নে পড়িয়াও এ ব্যক্তি আপনার সাংসারিক উন্নতির কিছুই করিয়া লইতে পারে নাই—কখন পারিবে যে, সে সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু সকলে একথা বুঝিয়াছিল যে, সর্ব্বদা অকর্ম্মণ্য হইলেও এই উন্মাদের উজ্জ্বল নয়নে, অদৃষ্টপূর্ব্ব চালচলনে, মধুর কণ্ঠস্বরে, সুললিত বাক্যবিন্যাসে এবং অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এমন একটা কি আকর্ষণ আছে, যাহাতে, তাহারা যে সকল ধনী মানী ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে অগ্রসর হইতেও সঙ্কোচ বোধ করে, সে সকল লোকের সম্মুখে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত

না হইয়া উপস্থিত হইলেও অচিরে এ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠে! ইতর সাধারণ মানব এবং কালীবাটীর কর্ম্মচারীরা ঐরূপ ভাবিলেও, মথুর বাবু কিন্তু এখন অন্যরূপ ভাবিতেন। হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি—মথুরামোহন বলিতেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপা হইয়াছে বলিয়াই উঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তবৎ ভাব উপস্থিত হইয়াছে।"

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন।

সে যাহা হউক, রাণী রাসমণির মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে ঠাকুরের জীবনে ঐ বৎসর আর একটী বিশেষ ঘটনা সমুপস্থিত হয়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর পশ্চিম ভাগে গঙ্গাতীরে সুবৃহৎ পোস্তার উপর এইকালে বিচিত্র পুষ্পকানন ছিল। সযত্ন-রক্ষিত ঐ কাননে নানাজাতীয় পুষ্প-সম্ভার মস্তকে বহন করিয়া বৃক্ষলতাদি, তখন চিচিত্র শোভা বিস্তার করিত এবং মধুগন্ধে দিক আমোদিত হইত। শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা না করিলেও, ঠাকুর এই সময়ে নিত্য ঐ কাননে পুষ্প-চয়ন করিতেন এবং মাল্য রচনা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে স্বহস্তে সাজাইতেন। ঐ কাননের মধ্যভাগে গঙ্গাগর্ভ হইতে মন্দিরে যাইবার চাঁদনী-শোভিত বিস্তৃত সোপানাবলী এবং উত্তরে, পোস্তার শেষে স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারের জন্য একটী বাঁধা-ঘাট ও কালীবাটীর উত্তরের নহবৎখানা অদ্যাপি বর্ত্তমান। বাঁধা ঘাটটীর উপরে একটী বৃহৎ বকুল বৃক্ষ বিদ্যমান থাকায়, লোকে উহাকে বকুলতলার ঘাট বলিয়া নির্দ্দেশ করিত।

পূর্ব্বোক্ত কাননে ঠাকুর একদিন প্রাতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি নৌকা বকুলতলার ঘাটে আসিয়া লাগিল এবং উহা হইতে গৈরিকবস্ত্র-পরিহিতা, আলুলায়িত-দীর্ঘ-কেশা, ভৈরবীবেশধারিণী এক সুন্দরী রমণী পুস্তকাদির একটী পুঁটুলি হস্তে অবতরণ করিয়া, দক্ষিণের সুবৃহৎ ঘাটের চাঁদনীর

দিকে অগ্রসর হইলেন। যৌবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যাভাস তাঁহার শরীরকে তখনও ত্যাগ না করায়, প্রৌঢ়বয়স্কা হইলেও ভৈরবীকে দেখিয়া তাহা কেহই মনে করিতে পারিত না। কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ভৈরবীর বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি হইবে। ভৈরবীর সহিত নিজ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা ঠাকুর প্রথম দর্শনে কতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আপনার লোক দেখিলে লোকে যে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে, ভৈরবীকে দেখিয়া তিনি যে উহা অনুভব করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। কারণ ভৈরবীকে দূর হইতে দেখিয়াই ঠাকুর স্বগৃহে ফিরিলেন এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকিয়া চাঁদনী হইতে উক্ত সন্ন্যাসিনীকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। হৃদয় তাঁহার ঐরূপ আদেশ পালনে ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "রমণী অপরিচিতা, ডাকিলেই আসিবে কেন?"—ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন, "আমার নাম ক'রে বল্‌গে যা, তা হ'লেই আস্‌বে এখন।" হৃদয় বলিত, অপরিচিতা সন্ন্যাসিনীর সহিত আলাপ করিবার জন্য মাতুলের ঐরূপ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সে অবাক্ হইয়াছিল। কারণ, ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে ঐরূপ করিতে সে আর কখনও দেখে নাই।

সে যাহা হউক, উন্মাদ মাতুলের বাক্য অন্যথা করিবার উপায় নাই বুঝিয়া, হৃদয় চাঁদনীতে যাইয়া দেখিল, ভৈরবী ঐ স্থানেই উপবিষ্টা রহিয়াছেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, তাহার ঈশ্বরভক্ত মাতুল তাঁহার দর্শনলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ঐকথা শুনিয়া ভৈরবী, মনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ বা প্রশ্নান্তর না করিয়া, তাহার সহিত আগমনের জন্য উঠিলেন দেখিয়া হৃদয় অধিকতর বিস্মিত হইল।

ঠাকুরের ঘরে আসিয়া ও তাঁহাকে দেখিয়াই ভৈরবী সহসা আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূতা হইলেন এবং বাষ্পবারি মোচন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা, তুমি এখানে রয়েছ! তুমি গঙ্গাতীরে আছ জেনে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, এতদিনে দেখা পেলাম্!' ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার কথা কেমন ক'রে জান্‌তে পার্‌লে মা?" ভৈরবী বলিলেন,—'তোমাদের তিন জনের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে হবে, এ কথা ৺জগদম্বার কৃপায় পূর্ব্বে জান্‌তে পেরেছিলাম। দুই জনের দেখা পূর্ব্ব (বঙ্গ) দেশে পেয়েছি, আজ এখানে তোমার দেখাও পেলাম্!"

প্রথম দর্শনে ভৈরবী ঠাকুরকে যাহা বলেন।

ঠাকুর তখন ভৈরবীর নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বালক যেমন জননীর নিকটে সকল কথা সানন্দে বলিতে থাকে সেই ভাবে আপন অদৃষ্টপূর্ব্ব দর্শনের কথা, ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়া, গাত্রদাহ, নিদ্রাশূন্যতা প্রভৃতি যোগজ শারীরিক বিকারের কথা, লোকে তাঁহাকে যেজন্য উন্মাদ বলিয়া ধারণা করিয়াছে প্রভৃতি সকল কথা—তাঁহাকে মন খুলিয়া বলিতে ও পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"হাঁগা আমার এ সকল কি হয়?—আমি কি সত্যই পাগল হ'লুম?—মাকে (জগদম্বাকে) মনে প্রাণে ডেকে সত্যই কি আমার কঠিন ব্যাধি হ'ল?"—ভৈরবী ঠাকুরের ঐ কথা শুনিতে শুনিতে জননীর ন্যায় কখন উত্তেজিতা, কখন উল্লসিতা; এবং কখন বা করুণার্দ্র-হৃদয়া হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য বারম্বার বলিতে লাগিলেন,—'তোমায় কে পাগল বলে, বাবা? তোমার এ ত পাগলামি নয়; তোমার এ যে মহাভাব হ'য়েছে, তাই ঐরূপ হচ্চে! তোমার যে

ঠাকুর ও ভৈরবীর প্রথমালাপ।

অবস্থা হ'য়েছে, তা কি কাহারও চিনিবার সাধ্য আছে? তাই ঐ প্রকার বলে। ঐ রকম হ'য়েছিল শ্রীমতী রাধারাণীর; ঐ রকম হ'য়েছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর! সে সব কথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। আমার নিকটে এই সব পুঁথি রয়েছে। আমি তোমাকে প'ড়ে শুনাব এবং দেখাব যে, ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক যারা ডেকেছে, তাদেরই ঐরূপ অবস্থা সব হয়েছে ও হয়।—ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও নিজ মাতুলকে ঐরূপে পূর্ব্বপরিচিত পরমাত্মীয়ের ন্যায় বাক্যালাপ ও ব্যবহারাদি করিতে দেখিয়া, হৃদয়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না!

অনন্তর কথায় কথায় বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর দেবীর প্রসাদী ফল, মূল, মাখন, মিছরি প্রভৃতি ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে জলযোগ করিতে দিলেন এবং মাতৃভাবে ভাবিতা ব্রাহ্মণী পুত্ত্রস্বরূপ তাঁহাকে পূর্ব্বে না খাওয়াইয়া জলগ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া, স্বয়ং ঐ সকল খাদ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন। দেবদর্শন ও জল-যোগ শেষ হইলে, ব্রাহ্মণী নিজ কণ্ঠগত রঘুবীর শিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার হইতে আটা চাল প্রভৃতি ভিক্ষাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া, পঞ্চবটীতলে রন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা হইলেন।

অনন্তর রন্ধন শেষ হইলে, ৺রঘুবীরের সম্মুখে খাদ্যাদি রাখিয়া ব্রাহ্মণী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্না হইয়া, অভূতপূর্ব্ব দর্শনলাভে সমাধিস্থা হইলেন! তাঁহার দুনয়নে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তিনি বাহ্যজ্ঞান এককালে হারাইয়া ফেলিলেন!

পঞ্চবটীতে ভৈরবীর অপূর্ব্ব দর্শন।

ঠাকুরও ঐ সময়ে পঞ্চবটীতে আসিবার জন্য প্রাণে প্রাণে আকর্ষণানুভব করিয়া, ভাবা-বেশে সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়, কি করিতেছেন সম্যক্ না বুঝিয়া, অপরের

শক্তিবলে প্রযুক্ত নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় ব্রাহ্মণী-নিবেদিত সম্মুখস্থ খাদ্যসকল গ্রহণ করিতে থাকিলেন! কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ প্রকার কার্য্যকলাপ দেখিয়া এবং নিজ দর্শনের সহিত উহা মিলাইয়া পাইয়া, বিস্ময়ে আনন্দে কণ্টকিত-কলেবরা হইলেন! আবার কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর যখন সাধারণ জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিয়া, নিজকৃত কার্য্যের জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিতে লাগিলেন, "কে জানে বাবু, কেন এমন বেসামাল হইয়া এইরূপ কার্য্য সকল করিয়া বসি"—তখন ব্রাহ্মণী জননীর ন্যায় তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, "বেশ করিয়াছ বাবা; ঐ কাজ ত তুমি কর নাই, তোমার ভিতরে যিনি আছেন, তিনিই করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন; ধ্যান করিতে করিতে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি কে ঐরূপ করিয়াছে এবং কেনই বা করিয়াছে; বুঝিয়াছি যে, আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় পূজার আবশ্যকতা নাই, আমার পূজা করা এত-দিনের পরে সার্থক হইয়াছে!"—এই বলিয়া ব্রাহ্মণী মনে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, ঠাকুরের ভোজনাবশিষ্ট দেবপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে ৺রঘুবীরের জীবন্ত দর্শন স্থায়িভাবে লাভ করিয়া প্রেমগদ্গদ অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় বাষ্পবারি মোচন করিতে করিতে বহুকালের পূজিত রঘুবীর শিলাটীকে সযত্নে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত করিলেন!

প্রথম দর্শনের প্রীতি ও আকর্ষণ ঠাকুর ও ব্রাহ্মণীর মধ্যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অপত্যপ্রেমে মুগ্ধহৃদয়া

সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বরেই রহিয়া গেলেন। পরস্পরের দর্শন ও আধ্যাত্মিক বাক্যালাপে পঞ্চবটীতে দিনের পর দিন যে কোথা দিয়া যাইতে লাগিল, তদ্বিষয় উভয়ের মধ্যে কাহারও অনুভবে আসিল না! ঠাকুর নিজ আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থা সম্বন্ধীয় রহস্য কথাসকল অকপটে ব্রাহ্মণী মাতাকে বলিয়া সর্ব্বদা নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণী, নানা তন্ত্র-গ্রন্থসমূহ হইতে ঐ সকলের সমাধান করিয়া এবং কখন বা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থসমূহ হইতে অবতার পুরুষদের দেহমনে ঈশ্বরপ্রেমের প্রবল বেগ কিরূপ লক্ষণসকলের আবির্ভাব করে, তদ্বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইয়া, ঠাকুরের সংশয়-সকল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটীতে ঐরূপে দিব্যানন্দের প্রবাহ ছুটিল।

পঞ্চবটীতে শাস্ত্রপ্রসঙ্গ।

ছয় সাত দিন ঐরূপে কাটিবার পর, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ঠাকুরের মনে হইল, দোষসম্পর্ক না থাকিলেও, ব্রাহ্মণীকে এখানে রাখা ভাল হইতেছে না। কাম-কাঞ্চনাসক্ত সংসারী মানব বুঝিতে না পারিয়া পবিত্রা রমণীর চরিত্র-সম্বন্ধে নানা কথা রটনার অবসর পাইবে। মনে ঐ কথার উদয় হইবামাত্র তিনি ব্রাহ্মণীকে উহা ইঙ্গিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণীও মনে মনে উহার যাথার্থ্য অনুধাবন করিলেন এবং নিকটেই গ্রামমধ্যে কোন স্থানে থাকিয়া, প্রতিদিন দিবসে কিছুকালের জন্য আসিয়া ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া যাইবার সংকল্প স্থির করিয়া, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

ভৈরবীর দেব মণ্ডলের ঘাটে অবস্থানের কারণ।

কালীবাটীর অনতিদূরে উত্তরে ভাগীরথীতীরে দক্ষিণেশ্বর

গ্রামের মধ্যে দেব মণ্ডলের ঘাট,—ব্রাহ্মণী এইস্থানে আসিয়া আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন * এবং গ্রামমধ্যে যথাতথা পরিভ্রমণ করিয়া, নিজগুণে গ্রামস্থ রমণীগণের শীঘ্রই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। সুতরাং বাসস্থান ও ভিক্ষা কোন বিষয়ের জন্য এখানে তাঁহার অসুবিধা রহিল না এবং লোকনিন্দার ভয়ে ঠাকুরের পবিত্র দর্শনলাভে তাঁহাকে একদিনের জন্যও বঞ্চিত হইতে হইল না। তিনি প্রতিদিন কিয়ৎকালের জন্য কালী-বাটীতে আসিয়া ঠাকুরের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিয়া যাইতে লাগিলেন এবং গ্রামস্থ পরিচিত রমণীকুলের নিকট হইতে নানাপ্রকার খাদ্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করিয়া, ঠাকুরকে ভোজন করাইতে লাগিলেন।†

ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অনুভব, দর্শন ও অবস্থাদির কথা শুনিয়া, সাধিকা ব্রাহ্মণীর নিশ্চিত ধারণা হইল,—ঐ সকল, অসাধারণ ঈশ্বরপ্রেম হইতে উপস্থিত হইয়াছে। আবার, ঈশ্বরালাপে ঠাকুরের মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধিতে বাহ্যচৈতন্যের লোপ ও কীর্ত্তনে পরমানন্দ দেখিয়া, তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল—ইনিসামান্য সাধক নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতাদি

ঠাকুরকে ভৈরবীর অবতার বলিয়া ধারণা কিরূপে হয়।

* হৃদয় বলিতেন, দেব মণ্ডলের ঘাটে থাকিবার পরামর্শ ঠাকুরই ব্রাহ্মণীকে প্রদান করিয়া, তাঁহাকে মণ্ডলদের বাটী পাঠাইয়া দেন এবং তথায় যাইবামাত্র ৺নবীনচন্দ্র নিয়োগীর ধর্ম্মপরায়ণা পত্নী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, কেবলমাত্র ঐ ঘাটের ঘরে যতকাল ইচ্ছা থাকিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই, কিন্তু একখানি তক্তা-পোষ, এক মণ চাল, ডাল, ঘী ও অন্যান্য ভোজনসামগ্রীও তৎসহ প্রদান করিয়াছিলেন।

† গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৮ম অধ্যায়, ২৩১ পৃষ্ঠা হইতে ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

গ্রন্থের স্থলে স্থলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া আগমনের কথার যে সকল ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঠাকুরকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর স্মৃতিপথে সেই সকল কথা পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল। সুপণ্ডিতা ব্রাহ্মণী, ঐ সকল গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের চালচলন আচার-ব্যবহারাদি সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ কথালিপিবদ্ধ দেখিয়াছিলেন, সে সকলের সহিত ঠাকুরের চালচলনাদি তন্ন তন্ন করিয়া মিলাইয়া উহাদের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় ভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া অপরের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার শক্তি ঠাকুরে প্রকাশিত দেখিলেন। আবার, ঈশ্বরবিরহবিধুর শ্রীচৈতন্যদেবের নিরন্তর গাত্রদাহ, স্রক্‌চন্দনাদি যে সকল পদার্থের ব্যবহারে প্রশমিত হইবার কথা গ্রন্থনিবদ্ধ আছে, ঠাকুরের গাত্রদাহ প্রশমনের জন্য তিনি ঐ সকলের প্রয়োগ করিয়া তদ্রূপ ফল পাইলেন।* সুতরাং পঞ্চবটীতে ব্রাহ্মণীর শ্রীরামকৃষ্ণদেবসম্বন্ধীয় প্রথম দিনের দিব্যদর্শন, পূর্ব্বোক্ত কথা সকলের সহিত একযোগে সমুদিত হইয়া, তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা করাইয়া দিল, ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে এ যুগে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ দেব উভয়ে ঈশ্বপ্রেম প্রচার করিয়া জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরাগমন করিয়াছেন! সিহড় গ্রামে যাইবার কালে, ঠাকুর নিজ দেহাভ্যন্তর হইতে কিশোরবয়স্ক দুই জনকে বাহিরে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াছিলেন—একথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি—ব্রাহ্মণী এখন ঐ দর্শনের কথা ঠাকুরের মুখে শ্রবণ করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসায়

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়, ৪—৬ পৃষ্ঠা।

দৃঢ়তর বিশ্বাসবতী হইলেন এবং বলিলেন, "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব!"

সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণী সংসারে কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করিতেন না; শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসা অপরের নিকট প্রকাশে নিন্দা বা উপহাসভাগিনী হইবার শঙ্কাও রাখিতেন না। সুতরাং আপন মীমাংসা প্রথমে ঠাকুর ও হৃদয়ের নিকটে এবং পরে জিজ্ঞাসিতা হইলে অপর সকলের নিকটে বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হইতেন না। শুনিয়াছি এই সময়ে একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীতলে মথুর বাবুর সহিত বসিয়া ছিলেন। হৃদয়ও তাঁহাদের নিকটে ছিল। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর, তাঁহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণী যে মীমাংসায় উপনীতা হইয়াছেন, তাহা মথুরামোহনকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সে বলে যে, অবতারদিগের যে সকল লক্ষণ থাকে, তাহা এই শরীর-মনে আছে!* তার অনেক শাস্ত্র দেখা আছে, কাছে অনেক পুঁথিও আছে।" মথুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে যাই বলুক্ না বাবা, অবতার ত আর দশটার অধিক নাই? সুতরাং তার কথা সত্য হবে কেমন ক'রে? তবে, আপনার উপর মা কালীর কৃপা হয়েছে, একথা সত্য।"

মথুরের সম্মুখে ভৈরবীর ঠাকুরকে অবতার বলা।

তাঁহারা ঐরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসিনা তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন এবং মথুর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনিই কি তিনি?" ঠাকুর স্বীকার করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—ব্রাহ্মণী

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ – ১ম অধ্যায়, ৪—৬ পৃষ্ঠা।

কোথা হইতে এক থাল মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নন্দরাণী যশোদা যে ভাবে গোপালকে খাওয়াইতে সপ্রেমে অগ্রসর হইতেন, সেই ভাবে ভাবাবিষ্টা হইয়া, তাঁহাদিগের দিকে অন্যমনে চলিয়া আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া মথুর বাবুকে দেখিতে পাইয়া তিনি সযত্নে আপনাকে সংযতা করিলেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইবার নিমিত্ত হৃদয়ের হস্তে মিষ্টান্নথালটী প্রদান করিলেন। তখন মথুর বাবুকে দেখাইয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন "ওগো! তুমি আমাকে যা বল, সে সব কথা আজ ইঁহাকে বল্‌ছিলাম, তা ইনি বল্‌ছেন্ 'অবতার ত দশটী ছাড়া আর নাই'।" মথুরানাথও ইত্যবসরে সন্ন্যাসিনীকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনি সত্যই যে ঐরূপ আপত্তি করিতেছিলেন, তদ্বিষয় অঙ্গীকার করিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উত্তর করিলেন, "কেন? শ্রীমদ্ভাগবত চব্বিশটী প্রধান প্রধান অবতারের কথা বলিয়া, পরে অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়াছেন ত? তা ছাড়া বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং শ্রীচৈতন্যের সহিত (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখাইয়া) ইঁহার প্রধান প্রধান সকল বিষয়ের বিশেষ সৌসাদৃশ্য মিলাইয়া পাওয়া যায়।" ব্রাহ্মণী ঐরূপে নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের গ্রন্থে সুপণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকে ঐ বিষয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। ঐরূপ ব্যক্তির নিকটে তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে সম্মতা আছেন। ব্রাহ্মণীর ঐ কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া, মথুরামোহন নীরব রহিলেন।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণীর অপূর্ব্ব ধারণা ক্রমে কালীবাটীর ছোট বড় সকল মানবই জানিতে পারিল এবং উহা তাহাদের

মধ্যে একটা বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিল। ঐ আন্দোলনের ফলাফল আমরা অন্যত্র সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিয়াছি।* সুতরাং এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঐরূপে ঠাকুরকে সহসা দেব-পদবীতে আরূঢ় করাইয়া, সকলের সমক্ষে তাঁহাকে দেবতার সম্মান প্রদান করিলেও, অহঙ্কার-প্রবৃদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষসকলে ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া কিরূপ মতামত প্রদান করেন তাহা জানিতে তিনি উৎসুক হইয়াছিলেন এবং বালকের ন্যায় মথুরামোহনকে ঐরূপ পুরুষসকলকে আনাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐ অনুরোধের ফলেই পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন হইয়াছিল। বৈষ্ণবচরণের সহিত সম্মিলনে ব্রাহ্মণী কিরূপে নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে নিজ মতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।†

পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বরে আগমন কারণ।

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৫ম অধ্যায়, ১৫৩—১৫৫ পৃষ্ঠা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭১—১৭৩ পৃষ্ঠা ও উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায় দেখ।

† গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়, ১৯—২০ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়।

ঠাকুরের তন্ত্রসাধন।

কেবলমাত্র তর্কযুক্তি-সহায়েই যে, ব্রাহ্মণী, ঠাকুরের অলৌকিকত্ববিষয়ক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীতা হইয়াছিলেন, তাহা নহে। পাঠকের স্মরণ থাকিবে, ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রমুখ তিন ব্যক্তির সহিত দেখা করিয়া, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক-জীবন-বিকাশে তাঁহাকে সহায়তা করিতে হইবে। ঠাকুরকে দর্শন করিবার বহুপূর্ব্বে ব্রাহ্মণী, শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে ঐরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝিতে পায়া যায়, সাধনপ্রসূত দিব্যদৃষ্টিই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন ও ঠাকুরকে বুঝিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। ঠাকুরের দর্শনলাভের পর এখন যত দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের সহিত তিনি যত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বদ্ধা হইতে লাগিলেন, সাধনপথে ঠাকুরকে কতদূর কি ভাবে সহায়তা করিতে হইবে, তদ্বিষয় ততই তাঁহার মনে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অতএব ঠাকুরের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রমধারণা দূর করিবার চেষ্টাতেই তিনি যে এখন কেবলমাত্র কালক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা নহে; কিন্তু ঠাকুর যাহাতে শাস্ত্রপথাবলম্বনে সাধনক্রিয়া সকলের যথাযথ অনুষ্ঠান করিয়া

সাধনপ্রসূত দিব্যদৃষ্টি ব্রাহ্মণীকে ঠাকুরের অবস্থা যথাযথরূপে বুঝাইয়াছিল।

শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহার পূর্ণ কৃপা ও প্রসন্নতার অধিকারী হইয়া স্বস্বরূপে, নিজ দিব্যশক্তিতে অবিচলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইলেন।

ঠাকুরকে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, বিশিষ্টা সাধিকা ব্রাহ্মণীর একথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, গুরু-পরম্পরাগত সাধনপথ সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন না করিয়া, কেবল-মাত্র নিজ অসাধারণ অনুরাগ-সহায়ে শ্রীশ্রীজগ-দম্বার দর্শনলাভে এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়াই, ঠাকুর নিজ অবস্থা সম্বন্ধে সংশয়ের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিতেছেন না। সেজন্যই মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে উদয় হইতেছে যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার যে সকল দর্শন এ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন, তাহা নিজ মস্তিস্ক-বিকৃতিরফল কি না, এবং তাঁহার অপূর্ব্ব শারীরিক ও মানসিক বিকারসকল কোনরূপ উৎকট ব্যাধির লক্ষণ কি না। পূর্ব্বোক্ত বিষয় অনু-ধাবন করিয়া ব্রাহ্মণী এখন ঠাকুরকে তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গাবলম্বনে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী বুঝিয়াছিলেন, ঠাকুর, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণানুষ্ঠিত মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাদিগের অনুরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থাসকল প্রত্যক্ষ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ঐ সকল অবস্থা ব্যাধিপ্রসূত নহে। সাধক যেরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, তন্ত্রে তদ্বিষয় পূর্ব্ব হইতে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়া এবং ঐরূপ অনুষ্ঠান-সহায়ে স্বয়ং ঐরূপ ফল-সমূহ লাভ করিয়া তাঁহার মনে এ কথার দৃঢ় প্রতীতি হইবে যে, সাধনা-সহায়ে মানব অন্তঃরাজ্যের উচ্চ—উচ্চতর ভূমিসমূহে আরোহণ করিয়া অসাধারণ প্রত্যক্ষসকল করিয়া থাকে এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাসমূহ ঐরূপেই

ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর তন্ত্র সাধন করিতে বলিবার কারণ।

উপস্থিত হইয়াছে। ফলে দাঁড়াইবে এই যে, ঠাকুরের জীবনে ভবিষ্যতে যেরূপ অসাধারণ প্রত্যক্ষসকল উপস্থিত হউক না কেন, তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, ঐ সকলকে সত্য জানিয়া, নিশ্চিন্তমনে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণী জানিতেন, শাস্ত্র ঐজন্য সাধককে গুরুবাক্য ও শাস্ত্র-বাক্যের সহিত নিজ জীবনের অনুভবসকলকে সর্ব্বদা মিলাইয়া অনুরূপ হইল কি না, দেখিতে বলিয়াছেন।

অবতার বলিয়া বুঝিয়াও ব্রাহ্মণী কিরূপে ঠাকুরকে সাধনায় সহায়তা করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঠাকুরকে অবতার মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিয়া, ব্রাহ্মণী কোন্ যুক্তিবলে আবার তাঁহাকে সাধন করাইতে উদ্যতা হইলেন? অবতার-মহিমা যিনি বুঝেন, তিনি ত ঐরূপ পুরুষকে পূর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সাধনাদি চেষ্টার অনাবশ্যকতা সর্ব্বথা স্বীকার করেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে, ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐ প্রকার মহিমা বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ব্রাহ্মণীর মনে সর্ব্বদা সমুদিত থাকিলে, তাঁহার মানসিক ভাব নিশ্চয় ঐরূপ হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম দর্শন হইতে ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে অপত্যনির্ব্বিশেষে ভালবাসিয়াছিলেন। এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ভুলাইয়া অপরের কল্যাণ-চেষ্টায় নিযুক্ত করিতে ভালবাসার ন্যায় দ্বিতীয় পদার্থ সংসারে আর নাই! অতএব অকৃত্রিম ভালবাসার প্রেরণাতেই তিনি ঠাকুরকে সাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, একথা স্পষ্ট দেব-মানব, অবতার-পুরুষসকলের সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বত্র ঐরূপ হইতে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই যে, তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ব্যক্তিসকল তাঁহাদিগের অলৌকিক আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইলেও,

পরক্ষণেই উহা ভুলিয়া তাঁহাদিগের প্রেমাকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগকে হৃদয়ের ভালবাসা অর্পণমাত্র করিয়া কৃতার্থন্মন্য হইতেছেন! অতএব ঠাকুরের অলৌকিক ভাবাবেশ ও শক্তি-প্রকাশ দেখিয়া ব্রাহ্মণী সময়ে সময়ে স্তম্ভিতা হইলেও, তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অকৃত্রিম মাতৃজ্ঞান, নির্ভরতা এবং বিশ্বাস যে তাঁহার হৃদয়নিহিত কোমল-কঠোর মাতৃস্নেহকে সর্ব্বদা উদ্বেলিত করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিত এবং ঠাকুরকে বিন্দুমাত্র সুখী করিবার জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে, অপরের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে, ও সাধনায় সহায়তা করিতে তাঁহাকে সর্ব্বথা নিযুক্ত করিত, একথা বলা বাহুল্য।

বিশিষ্ট অধিকারীকে শিক্ষাদানের সুযোগ উপস্থিত হইলে, গুরুর হৃদয়ে পরম পরিতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদের স্বতঃ উদয় হয়। আধ্যাত্মিক জগতে, বর্ত্তমানকালে ঠাকুরের ন্যায় উত্তমাধি-কারী যে জন্মিতে পারে, ব্রাহ্মণী একথা পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। সুতরাং ঠাকুরকে শিক্ষাদানের অবসরপ্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণীর হৃদয় কিরূপ আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা আমরা বিলক্ষণ অনুমান করিতে পারি। তাহার উপর ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম পুত্র-বাৎসল্য। অতএব এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণী যে, নিজ স্বাধ্যায় ও তপস্যার সমগ্র ফল স্বল্পকালের মধ্যে ঠাকুরকে অনুভব করাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্রা হইয়া উঠিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই।

ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর সর্ব্ব তপস্যার ফলপ্রদানের জন্য ব্যস্ততা।

তন্ত্রোক্ত সাধন সকল অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে ঠাকুর ঐ বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে যে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়াই যে, উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন —একথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে কখন কখন শ্রবণ করিয়াছি।

৺জগদম্বার অনুজ্ঞা লাভে ঠাকুরের তন্ত্র সাধনের অনুষ্ঠান তাঁহার সাধনাগ্রহের পরিমাণ।

অতএব কেবলমাত্র ব্রাহ্মণীর আগ্রহ ও উত্তেজনা তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিযুক্ত করে নাই; সাধনপ্রসূত তাঁহার নিজ দিব্যদৃষ্টি তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে বলিয়া দিয়াছিল— শাস্ত্রীয় প্রণালীসকলের অবলম্বনে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ঠাকুরের একনিষ্ঠ মন এখন ব্রাহ্মণী-নির্দ্দিষ্ট সাধন-পথে পূর্ণাগ্রহে ধাবিত হইল। সে আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতা অনুভব করা আমাদিগের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির সম্ভবপর নহে। কারণ, নানাদিকে নানা বিষয়ে প্রসারিত আমাদিগের মনের সে উপরতি ও একলক্ষ্যতা কোথায়?—অন্তঃসমুদ্রের উপরিগত উর্ম্মিমালার রঙ্গভঙ্গে মোহিত হইয়া না থাকিয়া, উহার তলস্পর্শ করিবার জন্য এককালে হাত পা ছাড়িয়া ঝম্প প্রদানের অসীম সাহস আমাদিগের কোথায়?—'একেবারে ডুবে যা, আপনাতে আপনি ডুবে যা' বলিয়া, ঠাকুর আমাদিগকে বারম্বার যে ভাবে উত্তেজিত করিতেন, সেইভাবে জগতের সকল পদার্থ এবং নিজ শরীরের মায়া মমতা পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক অন্তররাজ্যে ডুবিয়া যাইবার আমাদিগের সামর্থ্য কোথায়? আমরা যখন শুনি, ঠাকুর হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া 'মা দেখা দে' বলিয়া পঞ্চবটীমূলে গঙ্গাসৈকতে মুখঘর্ষণ করিতেন এবং দিনের পর দিন চলিয়া যাইলেও তাঁহার ঐভাবের বিরাম হইত না—তখন কথাগুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, হৃদয়ে অনুরূপ ঝঙ্কারের কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না! হইবেই বা কেন? শ্রীশ্রীজগন্মাতা যে যথার্থই আছেন এবং সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলে, তাঁহার দর্শনলাভ যে যথার্থই সম্ভবপর—একথায় কি আমরা ঠাকুরের ন্যায় সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি?

সাধনকালে নিজ মানসিক আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতার কিঞ্চিৎ আভাস ঠাকুর আমাদিগকে একদিন কাশীপুরে অবস্থানকালে প্রদান করিয়া স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তৎকালে আমরা যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার ছায়ামাত্র পাঠককে প্রদানে সমর্থ হইব কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু কথাটীর এখানে উল্লেখ করিব ঃ—

ঈশ্বরলাভের জন্য স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের আকুল আগ্রহ তখন আমরা কাশীপুরে স্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলাম। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নির্দ্ধারিত টাকা (ফি) জমা দিতে যাইয়া, কেমন করিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, উঁহার প্রেরণায় অস্থির হইয়া কেমন করিয়া তিনি একবস্ত্রে নগ্নপদে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় সহরের রাস্তা দিয়া ছুটিয়া কাশীপুরে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় নিজ মনোবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিলেন, ঐ সময় হইতে কেমন করিয়া প্রায় আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া তিনি দিবা-রাত্র ধ্যান জপ ভজন ও ঈশ্বরচর্চ্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অসীম সাধনোৎসাহে কেমন করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় তখন বজ্র-কঠোরভাবাপন্ন হইয়া নিজ মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের অশেষ কষ্টে এককালে উদাসীন হইয়া রহিল, এবং কেমন করিয়া শ্রীগুরুপ্রদর্শিত সাধনপথে দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর দর্শন লাভ করিতে করিতে তিন চারি মাসের অন্তেই নির্ব্বিকল্প সমাধিসুখ প্রথম অনুভব করিলেন—ঐ সকল বিষয় তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া আমাদিগকে এককালে স্তম্ভিত করিতেছিল। ঠাকুর তখন পরমানন্দে স্বামিজীর ঐরূপ অপূর্ব্ব অনুরাগ, ব্যাকুলতা ও

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর নিজ সাধনকালের আগ্রহসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন।

সাধনোৎসাহের নিত্য ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিলেন। ঐ সময়ে একদিন, ঠাকুর নিজ অনুরাগ ও সাধনোৎসাহের সহিত স্বামিজীর ঐ বিষয়ের তুলনা করিয়া ঐ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—“নরেন্দ্রের অনুরাগোৎসাহ অতি অদ্ভুত, কিন্তু (আপনাকে দেখাইয়া) এখানে তখন (সাধনকালে) উহাদের যে তোড়্ আসিয়াছিল, তাহার তুলনায় ইহা যৎসামান্য—ইহা তাহার সিকিও হইবে না!”—ঠাকুরের ঐ কথায় আমাদিগের মনে কীদৃশ ভাবের উদয় হইয়াছিল, হে পাঠক, পার ত কল্পনাসহায়ে তাহা অনুভব কর।

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঠাকুর এখন সকল ভুলিয়া সাধনায় মগ্ন হইলেন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্না কর্ম্মকুশলা ব্রাহ্মণী নানা দেশ হইতে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়োপযোগী পদার্থ-সকলের সংগ্রহে এবং সাধনকালে উহাদিগের প্রয়োগসম্বন্ধে উপদেশাদি প্রদান করিয়া ঠাকুরকে সহায়তা করিতে অশেষ আয়াস স্বীকার করিতে লাগিলেন। মনুষ্যপ্রমুখ পঞ্চজীবের মস্তক-কঙ্কাল * গঙ্গাহীন প্রদেশ হইতে সযত্নে সমাহৃত হইয়া,

* ইদানীং শৃণু দেবেশি মুণ্ডসাধনমুত্তমং।
যৎ কৃত্বা সাধকো যাতি মহাদেব্যাঃ পরং পদং॥ ৫১
নর-মহিষ-মার্জ্জার-মুণ্ডত্রয়ং বরাননে।
অথবা পরমেশানি নৃমুণ্ডত্রয়মাদরাৎ॥ ৫২
শিবাসর্পসারমেয়বৃষভানাং মহেশ্বরি।
নরমুণ্ডং তথা মধ্যে পঞ্চমুণ্ডানি হীরিতং॥ ৫৩
অথবা পরমেশানি নরানাং পঞ্চমুণ্ডকান্।
তথা শতং সহস্রং বাযুতং লক্ষং তথৈবচ॥ ৫৪
নিযুতঞ্চাথবা কোটিং নৃমুণ্ডান্ পরমেশ্বরি।
নরমুণ্ডং স্থাপয়িত্বা প্রোথয়িত্বা ধরাতলে॥ ৫৫
বিতস্তিপ্রমিতাং বেদীং তস্যোপরি প্রকল্পয়েৎ।
আয়ামপ্রস্থতো দেবি চতুর্হস্তৌ সমাচরেৎ॥ ৫৬
যোগিনী তন্ত্রম্-পঞ্চমঃ পটলঃ।

ঠাকুরবাটীর উদ্যানের উত্তরসীমাপ্রান্তে অবস্থিত বিল্বতরুমূলে এবং ঠাকুরের স্বহস্ত-প্রোথিত পঞ্চবটীতলে সাধনানুকূল দুইটী বেদিকা* নির্ম্মিত হইল এবং প্রয়োজনমত ঐ মুণ্ডাসনদ্বয়ের অন্যতমের উপরে উপবিষ্ট হইয়া জপ পুরশ্চরণ ও ধ্যানাদিতে ঠাকুরের কাল কাটিতে লাগিল। দিবারাত্র, কয়েক মাস কোথা দিয়া কিরূপে আসিতে ও যাইতে লাগিল, তাহা এই অদ্ভুত সাধকেরও উত্তরসাধিকার জ্ঞান রহিল না। ঠাকুর বলিতেন†—"ব্রাহ্মণী দিবাভাগে কালীবাটীর উদ্যান হইতে বহু-দূরে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট নানা দুষ্প্রাপ্য পদার্থসকল সংগ্রহ করিত এবং রাত্রিকালে ঐ সকল বিল্বমূলে বা পঞ্চবটীতলে আনয়ন করতঃ আমাকে আহ্বান করিত, এবং ঐ সকলের সহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া,

পঞ্চমুণ্ডী আসন নির্ম্মাণ ও চৌষট্টি খানা তন্ত্রের সকল সাধনের অনুষ্ঠান।

* সচরাচর পঞ্চমুণ্ডসংযুক্ত একটী বেদিকা নির্ম্মাণ করিয়া সাধকেরা তদাশ্রয়ে জপ ধ্যানাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঠাকুর কিন্তু দুইটী মুণ্ডাসনের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিল্বমূলের বেদিকার নিম্নে তিনটী নরমুণ্ড প্রোথিত ছিল এবং পঞ্চবটীতলস্থ বেদিকায় পঞ্চপ্রকার জীবের পাঁচটী মুণ্ড প্রোথিত ছিল। সাধনায় সিদ্ধ হইবার কিছুকাল পরে তিনি ঐ মুণ্ড সকলকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আসনদ্বয় ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সাধনায় ত্রিমুণ্ডাসনের প্রশস্ততার জন্য হউক অথবা বিল্বমূল তৎকালে এককালে নির্জ্জন ছিল বলিয়া, সাধনসকল অনুষ্ঠানের তথায় অধিকতর সুবিধা হইবে বলিয়াই হউক ঐরূপে দুইটী আসন নির্ম্মিত হইয়াছিল। অথবা, বিল্বমূলের সন্নিকটে কোম্পানির বারুদখানা বিদ্যমান থাকায়, হোমাদির জন্য তথায় সর্ব্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার অসুবিধার জন্য দুইটী মুণ্ডাসন নির্ম্মিত হইয়াছিল।

† ঠাকুরের শ্রীমুখে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাহা শুনা গিয়াছে, তাহাই এখানে সম্বদ্ধভাবে দেওয়া গেল।

জপ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিত। আমিও তদ্রূপ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতাম, কিন্তু জপ আর বড় একটা করিতে হইত না, একবার মালা ফিরাইতে না ফিরাইতে একেবারে সমাধিমগ্ন হইয়া ঐ ক্রিয়াসকলের ফল যথাযথ প্রত্যক্ষ করিতাম! ঐরূপে এই কালে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব, অদ্ভুত অদ্ভুত সব, কতই যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই! প্রধান চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথা আছে, সকলগুলিই ব্রাহ্মণী একে একে অনুষ্ঠান করাইয়াছিল! কঠিন কঠিন সব সাধন!—যাহা করিতে যাইয়া অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয়—মার (শ্রীশ্রীজগদম্বার) কৃপায় সে সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছি!

"একদিন দেখি কি,—কোথা হইতে ব্রাহ্মণী নিশাভাগে এক পূর্ণযৌবনা সুন্দরী রমণীকে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং আমাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, 'বাবা, ইহাকে দেবীবুদ্ধিতে পূজা কর!' পরে পূজা সাঙ্গ হইলে, রমণীকে বিবস্ত্রা করিয়া বলিল, 'বাবা, ইহার ক্রোড়ে বসিয়া জপ কর!'—তখন আতঙ্কে অস্থির হইয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে মাকে বলিতে লাগিলাম, 'মা, জগদম্বে তোর একান্ত শরণাগতকে এ কি আদেশ করিতেছিস্? তোর দুর্ব্বল সন্তানের ঐরূপ দুঃসাহসের সামর্থ্য কোথায়?'—ঐরূপ বলিবামাত্র কিন্তু কাহার দ্বারা যেন আবিষ্ট হইলাম এবং কোথা হইতে অপূর্ব্ব বলে হৃদয় এককালে পূর্ণ হইল! তখন নিদ্রিতের ন্যায়, কি করিতেছি সম্যক্ না জানিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রমণীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইবামাত্র সমাধিস্থ হইয়া পড়িলাম! যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখি,

স্ত্রীমূর্ত্তিতে দেবীজ্ঞান-সিদ্ধি।

ব্রাহ্মণী চৈতন্য সম্পাদনের জন্য সযত্নে শুশ্রূষা করিতেছে এবং বলিতেছে, 'ক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে বাবা; অপরে কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ঐ অবস্থায় কিছুকাল জপমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তুমি এককালে শরীরবোধশূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছ!'—শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া ঐ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলাম!

"আর একদিন দেখি, ব্রাহ্মণী শবের খর্পরে মৎস্য রাঁধিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার তর্পণ করিল এবং আমাকেও ঐরূপ করাইয়া উহা গ্রহণ করিতে বলিল! তাহার আদেশে তাহাই করিলাম, মনে কোনরূপ ঘৃণার উদয় হইল না।

"কিন্তু যে দিন সে (ব্রাহ্মণী) গলিত আম-মহামাংস-খণ্ড আনিয়া তর্পণান্তে উহা জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিতে বলিল, সে দিন ঘৃণায় বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'তা কি কখন করা যায়?'—শুনিয়া সে বলিল, 'সে কি বাবা, এই দেখ আমি করিতেছি!'—বলিয়াই সে উহা নিজ মুখে গ্রহণ করিয়া 'ঘৃণা করিতে নাই' বলিয়া, পুনরায় উহার কিয়দংশ আমার সম্মুখে ধারণ করিল। তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রচণ্ড চণ্ডিকা-মূর্ত্তির উদ্দীপনা হইয়া গেল এবং 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। তখন ব্রাহ্মণী উহা মুখে প্রদান করিলেও, ঘৃণার উদয় হইল না।

ঘৃণাত্যাগ।

"ঐরূপে পূর্ণাভিষেক গ্রহণ করাইয়া অবধি ব্রাহ্মণী নিত্য কতই যে তান্ত্রিকী ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান করাইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সকল কথা সকল সময়ে এখন স্মরণে আসে না।

তবে মনে আছে, মার কৃপায় প্রণয়ি-যুগলের চরমানন্দ যে দিন দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম এবং তাহাদিগের ঐরূপ ক্রিয়াদর্শনে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধির বিন্দুমাত্র উদয় না হইয়া কেবল মাত্র ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপনায় যে দিন সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই দিন বাহ্যচৈতন্য লাভের পর ব্রাহ্মণীকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, 'বাবা' তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধকাম হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাই এই মতের (বীরভাবের) শেষ সাধন!' উহার কিছুকাল পরে অন্য একজন ভৈরবীকে পাঁচ সিকা দক্ষিণা দিয়া প্রসন্না করিয়া, তাঁহার সহায়ে কালীঘরের নাটমন্দিরে দিবাভাগে সর্ব্বজনসমক্ষে তন্ত্রোক্ত কুলাগার-পূজার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া বীরভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম। দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় আমার রমণীমাত্রে মাতৃভাব যেমন অক্ষুণ্ণ ছিল, বিন্দুমাত্র কারণ-গ্রহণও তদ্রূপ কখন করিতে পারি নাই!—কারণের নাম বা গন্ধমাত্রেই জগৎকারণের উপলব্ধিতে আত্মহারা হইয়া পড়িতাম; সেইরূপ 'যোনি' শব্দ শ্রবণমাত্রেই জগদ্‌যোনির উদ্দীপনায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িতাম।"

আনন্দাসনে সিদ্ধি-লাভ, কুলাগার পূজা, এবং তন্ত্রোক্ত সাধন-কালে ঠাকুরের আচরণ।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন তাঁহার রমণীমাত্রে চিরকাল মাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া একটী পৌরাণিক গল্প বলিয়াছিলেন। গল্পটীতে সিদ্ধ-জ্ঞানিগণের অধিনায়ক শ্রীশ্রীগণপতিদেবের হৃদয়ে রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান কিরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই বর্ণিত ছিল। মদস্রাবি-গজতুণ্ডাস্ফালিত-বদন লম্বোদর দেবতাটীর উপর ইতিপূর্ব্বে আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার বড় একটা

শ্রীশ্রীগণপতির রমণী-মাত্রে মাতৃজ্ঞানসম্বন্ধে ঠাকুরের গল্প।

আতিশয্য ছিল না। কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে ঐ গল্পটী শুনিয়া পর্য্যন্ত ধারণা হইয়াছে, শ্রীগণপতি বাস্তবিকই সকল দেবতার অগ্রে পূজা পাইবার যোগ্য! গল্পটী এই ঃ—

কিশোর বয়সে গণেশ একদিন ক্রীড়া করিতে করিতে একটী বিড়াল দেখিতে পান এবং বালসুলভ চপলতায় উহাকে নানাভাবে পীড়াপ্রদান ও প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত করেন! বিড়াল কোন-রূপে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিলে, গণেশ শান্ত হইয়া নিজ জননী শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবীর নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, দেবীর শ্রীঅঙ্গের নানাস্থানে প্রহারচিহ্ন দেখা যাইতেছে। বালক মাতার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া, নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবী বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন,—'তুমিই আমার ঐরূপ দুরবস্থার কারণ।' মাতৃভক্ত গণেশ ঐকথায় বিস্মিত ও অধিকতর দুঃখিত হইয়া সজলনয়নে বলিলেন,—'সে কি কথা মা, আমি তোমাকে কখন প্রহার করিলাম? অথবা এমন কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়াও ত স্মরণ হইতেছে না, যাহাতে তোমার অবোধ বালকের জন্য অপরের হস্তে তোমাকে ঐরূপ অপমান সহ্য করিতে হইবে?' জগন্ময়ী শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবী তখন বালককে বলিলেন,— 'ভাবিয়া দেখ দেখি, কোন জীবকে আজ তুমি প্রহার করিয়াছ কি না?' গণেশ বলিলেন,—'তাহা করিয়াছি; অল্পক্ষণ হইল, একটা বিড়ালকে মারিয়াছি।' যাহার বিড়াল সে-ই মাতাকে ঐরূপে প্রহার করিয়াছে ভাবিয়া, গণেশ তখন রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগণেশজননী অনুতপ্ত বালককে সান্ত্বনার জন্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া বলিলেন,—'তাহা নহে বাবা, আমার এই শরীরকে কেহ মারে নাই, কিন্তু আমিই বিড়ালরূপ পরিগ্রহ করিয়াছি, এজন্য তোমার প্রহারের চিহ্ন আমার অঙ্গে

দেখিতে পাইতেছ। তুমি না জানিয়া ঐরূপ করিয়াছ, সেজন্য দুঃখ করিও না; কিন্তু অদ্যাবধি একথা স্মরণ রাখিও, জগতে স্ত্রীমূর্ত্তি বিশিষ্ট জীব সকল আমার অংশে উদ্ভূত হইয়াছে এবং পুংমূর্ত্তি ধারী জীবসমূহ তোমার পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে— শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে কেহ বা কিছুই নাই!' গণেশ মাতার ঐকথা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন এবং বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, মাতাকে বিবাহ করিতে হইবে ভাবিয়া, উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলেন। ঐরূপে গণেশ চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং শিবশক্ত্যাত্মক জগৎ—এই কথা হৃদয়ে সর্ব্বদা দৃঢ় ধারণা করিয়া থাকায়, জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত গল্পটী বলিয়া ঠাকুর, শ্রীশ্রীগণপতির জ্ঞানগরিমা-সূচক নিম্নলিখিত কথাটীও বলিয়াছিলেন,—

গণেশ ও কার্ত্তিকের জগৎ পরিভ্রমণবিষয়ক গল্প।

কোন সময়ে শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবী নিজ গলদেশে লম্বিতা বহুমূল্য রত্নমালা দেখাইয়া, গণেশ ও কার্ত্তিককে বলেন যে, চতুর্দ্দশভুবনান্বিত জগৎ পরিক্রমণ করিয়া তোমাদের মধ্যে যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকেই আমি এই রত্নমালা প্রদান করিব। দেবসেনানী শিখিবাহন কার্ত্তিক অগ্রজের লম্বোদর স্থূল তনুর গুরুত্ব এবং তদীয় বাহন মূষিকের স্বল্পশক্তি ও মন্দগতি স্মরণ করিয়া, বিদ্রূপ-হাস্য হাসিলেন এবং 'রত্নমালা আমারই হইয়াছে' স্থির করিয়া, ময়ূরারোহণে জগৎ পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কার্ত্তিক ঐরূপে চলিয়া যাইবার বহুক্ষণ পরে স্থিরবুদ্ধি গণেশ আসন পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রজ্ঞাচক্ষুসহায়ে শিবশক্ত্যাত্মক জগৎকে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীর শরীরে অবস্থিত দেখিয়া, ধীরপদে তাঁহাদিগকে পরিক্রমণ ও

বন্দনা করতঃ পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর কার্ত্তিক ফিরিয়া আসিলে, জগন্ময়ী শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবী গণপতির জ্ঞান ও ভক্তিতে পরম পরিতুষ্টা হইয়া প্রসাদী রত্নমালা তাঁহারই গলদেশে সস্নেহে লম্বিতা করিলেন।

শ্রীশ্রীগণপতির জ্ঞানমহিমা এবং রমণীমাত্রে মাতৃভাবের উল্লেখ ঐরূপে করিয়া ঠাকুর বলিলেন,—"আমারও রমণীমাত্রে ঐরূপ ভাব; সে জন্যই বিবাহিতা স্ত্রীর ভিতরেও শ্রীশ্রীজগদম্বার সাক্ষাৎ মাতৃমূর্ত্তির দর্শন পাইয়া পূজা ও পাদবন্দনা করিয়াছিলাম।"

রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তন্ত্রোক্ত বীরভাবের সাধনসকলের অবলম্বন ও যথাযথ অনুষ্ঠান করিবার কথা কোনও যুগে কোনও সাধকের সম্বন্ধেই আমরা শ্রবণ করি নাই। বীরমতাশ্রয়ী হইয়া সাধকমাত্রেই সাধনকালে একাল পর্য্যন্ত শক্তিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। বীরধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিসকলকে ঐ বিষয়ের ব্যতিক্রম করিতে না দেখিয়া লোকের মনে একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হইয়াছে যে ঐরূপ না করিলে, সাধনায় সিদ্ধি বা শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসন্নতা লাভ একান্ত অসম্ভব। প্রধানতঃ ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই যে, লোকে তন্ত্রশাস্ত্রের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

তন্ত্র-সাধনে ঠাকুরের বিশেষত্ব।

যুগাবতার অলৌকিক ঠাকুরই কেবল নিজ সম্বন্ধে একথা আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন যে, আজীবন স্বপ্নেও তিনি কখন স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই। অতএব পূর্ব্ব হইতে পূর্ণরূপে মাতৃভাবাবলম্বন করাইয়া, ঠাকুরকে বীরমতের সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত

ঐ বিশেষত্ব ৺জগদম্বার অভিপ্রেত।

করাতে, শ্রীশ্রীজগদম্বার গূঢ় অভিপ্রায়-বিশেষ সম্পন্ন করাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

শক্তিগ্রহণ না করিয়া ঠাকুরের সিদ্ধিলাভে যাহা প্রমাণিত হয়।

ঠাকুর বলিতেন, সাধন সকলের কোনটীতে সাফল্য লাভ করিতে তাঁহার তিন দিনের অধিক সময় কখনও লাগে নাই! 'সাধনবিশেষ গ্রহণ করিয়া ফল প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ধরিয়া বসিলে, তিন দিবসেই উহাতে সিদ্ধকাম হইতাম।' শক্তিগ্রহণ না কয়িয়া সাধনসকলে তাঁহার ঐরূপে স্বল্পকালে সাফল্য লাভ করাতে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীগ্রহণ ঐ সকল অনুষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্য অঙ্গ-বিশেষ নহে। সংযমরহিত সাধক আপন দুর্ব্বল প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ করিয়া থাকে। সাধক ঐরূপ করিয়া বসিলেও যে, তন্ত্র তাহাকে অভয় দান করিয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে কালে সে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে—এ কথার উপদেশ করিয়াছেন, ইহাতে ঐ শাস্ত্রের পরম কারুণিকত্বই উপলব্ধ হয়।

তন্ত্রোক্ত-অনুষ্ঠান-সকলের উদ্দেশ্য।

অতএব রূপরসাদি যে সকল পদার্থ মানবসাধারণকে প্রলোভিত করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি অনুভব করাইতেছে এবং ঈশ্বরলাভ করিয়া আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে দিতেছে না, সংযত হইয়া বারম্বার উদ্যম ও চেষ্টার দ্বারা সেই সকলকে ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়া অবধারণ করিতে সাধককে অভ্যস্ত করানই তান্ত্রিকী ক্রিয়া সকলের সাধারণ উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সাধকের সংযম এবং পূর্ব্বোক্ত ধারণার তারতম্য বিচার করিয়াই তন্ত্র, পশু, বীর ও দিব্যভাবের অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহাকে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অগ্রসর হইতে উপদেশ

করিয়াছেন। কিন্তু কঠোর সংযমকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইলে, তবেই উহাদের ফল করগত হইবে—একথা, কালধর্ম্মে লোকে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কুক্রিয়া সকলের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রকেই দায়ী স্থির করিয়া, সাধারণে তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব রমণীমাত্রে মাতৃভাবে পূর্ণহৃদয় ঠাকুরের এই সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া,—যথার্থ সাধককুল কোন্ লক্ষ্যে চলিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া—যেমন উপকৃত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্যও তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ শাস্ত্র মহিমান্বিত হইয়াছে।

ঠাকুরের তন্ত্রসাধনের অন্য কারণ।

ঠাকুর, তন্ত্রোক্ত রহস্য সাধনসমূহের তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত যথাযথ অনুষ্ঠান করিলেও, উহাদিগের পারম্পর্য্য ও সবিস্তার বিবরণ আমাদিগের কাহাকেও কখন বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে সাধনপথে উৎসাহিত করিবার জন্য ঐ সকল কথার অল্প বিস্তর আমাদিগের অনেককে সময়ে সময়ে বলিয়াছেন; অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজন বুঝিয়া, বিরল কাহাকেও কোন কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠানে নানা প্রকারের অসাধারণ অনুভবসমূহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে, উত্তরকালে সমীপাগত নানা বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট ভক্তগণের মানসিক অবস্থা ধরিয়া সাধনপথে সহজে অগ্রসর করাইয়া দিতে পারিবেন না বলিয়াই যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঠাকুরকে এসময় এই পথের সহিত সম্যক্ পরিচিত করিয়াছিলেন—একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সমীপাগত শরণাগত ভক্তদিগকে, কি ভাবে কত রূপে ঠাকুর সাধনপথে অগ্রসর

করাইয়া দিতেন, তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস আমরা অন্যত্র* প্রদান করিয়াছি; তৎপাঠে আমাদের পূর্ব্বোক্ত বাক্যের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পাঠকের বিলম্ব হইবে না। অতএব এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তন্ত্র সাধনকালে ঠাকুরের দর্শন ও অনুভবসমূহ।

সাধনক্রিয়াসকল পূর্ব্বোক্তভাবে বলা ভিন্ন ঠাকুর তাঁহার তন্ত্রোক্ত সাধনকালের অনেকগুলি দর্শন এবং অনুভবের কথা আমাদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিতেন। আমরা এখন উহাদিগের কয়েকটী পাঠককে বলিব ঃ—

শিবানীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ।

ঠাকুর বলিতেন, তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় তাঁহাব পূর্ব্বস্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বা সময়ে সময়ে শিবারূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন শুনিয়া এবং কুক্কুরকে ভৈরবের বাহন জানিয়া, ঠাকুর ঐকালে তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্যকে পবিত্রবোধে গ্রহণ করিতেন! মনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ হইত না!

আপনাকে জ্ঞানাগ্নি-ব্যাপ্ত দর্শন।

শ্রীশ্রীজগদম্বার পাদপদ্মে দেহ, মন, প্রাণ—নিজ সর্ব্বস্ব, অন্তরের সহিত আহুতি প্রদান করিয়া, ঠাকুর ঐকালে আপনাকে অন্তরের বাহিরে নিরন্তর জ্ঞানাগ্নিপরিব্যাপ্ত দেখিতেন।

কুণ্ডলিনী-জাগরণ দর্শন।

কুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া মস্তকে উঠিতেছে এবং মূলাধারাদি সহস্রার পর্য্যন্ত পদ্মসকল ঊর্দ্ধমুখ ও পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইতেছে, এবং উহাদিগের একের পর অন্য যেমনি প্রস্ফুটিত হইতেছে, অমনি অপূর্ব্ব অনুভবসমূহ অন্তরে উদিত হইতেছে†—এবিষয় ঠাকুর

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—১ম অধ্যায়, ১৯—৩৮ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় অধ্যায় ৮১—৯২ পৃষ্ঠা। † গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৬৩—৬৭ পৃষ্ঠা।

এই সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন—এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্য পুরুষমূর্ত্তি সুষুম্নার মধ্য দিয়া ঐ সকল পদ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিয়া উহাদিগকে প্রস্ফুটিত করাইয়া দিতেছেন!

ব্রহ্মযোনি দর্শন।

স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের এককালে ধ্যান করিতে বসিলেই সম্মুখে সুবৃহৎ বিচিত্র জ্যোতির্ম্ময় একটী ত্রিকোণ স্বতঃ সমুদিত হইত এবং ঐ ত্রিকোণকে জীবন্ত বলিয়া তাঁহার বোধ হইত! একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয় বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন,—"বেশ, বেশ, তোর ব্রহ্মযোনি দর্শন হইয়াছে; বিল্বমূলে সাধনকালে আমিও ঐরূপ দেখিতাম এবং উহা প্রতিমুহূর্ত্তে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে, দেখিতে পাইতাম।"

অনাহতধ্বনি শ্রবণ।

ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পৃথক্ পৃথক্ যাবতীয় ধ্বনি একত্রীভূত হইয়া এক বিরাট্ প্রণবধ্বনি প্রতিমুহূর্ত্তে জগতের সর্ব্বত্র স্বতঃ উদিত হইতেছে—এবিষয় ঠাকুর এই কালে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আমাদিগের কেহ কেহ বলেন, এই কালে তিনি পশু পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জন্তুদিগের ধ্বনিসকলের যথাযথ অর্থবোধ যে করিতে পারিতেন—একথা তাঁহারা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছেন।

কুলাগারে ৺দেবীদর্শন।

স্ত্রীযোনির মধ্যে ঠাকুর এই কালে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিতা দেখিয়াছিলেন।

এই কালের শেষে ঠাকুর আপনাতে অণিমাদি সিদ্ধি বা বিভূতির আবির্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন এবং নিজ ভাগিনেয় হৃদয়ের পরামর্শে ঐ সকল প্রয়োগ করিবার ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট একদিন জানিতে যাইয়া দেখিয়াছিলেন,

উহারা বেশ্যা-বিষ্ঠার তুল্য হেয় ও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ঠাকুর বলিতেন,—ঐরূপ দর্শন করিয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধাইয়ের নামে তাঁহার ঘৃণার উদয় হয়!

অষ্টসিদ্ধিসম্বন্ধে ঠাকুরের স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথা।

ঠাকুরের অণিমাদি সিদ্ধিসকলের অনুভব-প্রসঙ্গে একটী কথা আমাদের মনে উদিত হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি পঞ্চবটীতলে নির্জ্জনে একদিন আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,—'ত্যাখ, আমাতে প্রসিদ্ধ অষ্ট-সিদ্ধি উপস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু আমি ঐ সকলের কখন প্রয়োগ করিব না, একথা বহুপূর্ব্ব হইতে নিশ্চয় করিয়াছি—উহাদিগের প্রয়োগ করিবার কোনরূপ আবশ্যকতাও দেখি না; তোকে ধর্ম্মপ্রচারাদি অনেক কার্য্য করিতে হইবে, তোকেই ঐ সকল দান করিব, স্থির করিয়াছি—গ্রহণ কর্।' স্বামিজী তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করেন,—'মহাশয়, ঐ সকল আমাকে ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে কি?' পরে ঠাকুরের উত্তরে যখন বুঝিলেন, উহারা ধর্ম্মপ্রচারাদি কার্য্যে কিছুদূর পর্য্যন্ত সহায়তা করিতে পারিলেও, ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে না, তখন তিনি ঐ সকল গ্রহণে অসম্মত হইলেন। স্বামিজী বলিতেন,—তাঁহার ঐরূপ আচরণে ঠাকুর তাঁহার উপর অধিকতর প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

মোহিনীমায়া দর্শন।

শ্রীশ্রীজগন্মাতার মোহিনী-মায়ার দর্শন করিবার ইচ্ছা মনে সমুদিত হইয়া ঠাকুর এইকালে দর্শন করিয়াছিলেন—এক অপূর্ব্বসুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি—গঙ্গা-গর্ভ হইতে উত্থিতা হইয়া, ধীরপদবিক্ষেপে পঞ্চবটীতে আগমন করিলেন। ক্রমে দেখিলেন, ঐ রমণী পূর্ণগর্ভা; পরে দেখিলেন, ঐ রমণী তাঁহার সম্মুখেই সুন্দর কুমার প্রসব করিয়া, তাহাকে

কত স্নেহে স্তন্যদান করিতেছেন; পরক্ষণে দেখিলেন, রমণী কঠোর করালবদনা হইয়া উঠিয়া, ঐ শিশুকে মুখমধ্যে গ্রহণ করিয়া, চর্ব্বণ ও গ্রাস করিলেন এবং পরে পুনরায় গঙ্গাগর্ভে প্রবিষ্টা হইলেন।

ষোড়শীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য।

পূর্ব্বোক্ত দর্শনসকল ভিন্ন ঠাকুর এই কালে দশভুজা হইতে দ্বিভুজা পর্য্যন্ত কত যে দেবীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। উহাদিগের মধ্যে কোন কোনটী আবার তাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্তা হইয়া, তাঁহাকে নানাভাবে উপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মূর্ত্তিসমূহের সকলগুলিই অপূর্ব্বস্বরূপা হইলেও, শ্রীশ্রীরাজ-রাজেশ্বরী বা ষোড়শী মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যের সহিত তাহাদিগের যে তুলনাই হয় না—একথাও আমরা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন,—'ষোড়শী বা ত্রিপুরামূর্ত্তির অঙ্গ হইতে রূপ-সৌন্দর্য্য যেন গলিত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে পতিত ও ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছিলাম!' এতদ্ভিন্ন ভৈরবাদি দেবযোনি-সম্ভব নানা পুরুষসকলের দর্শনও ঠাকুর এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

অলৌকিক দর্শন ও অনুভবসকল ঠাকুরের জীবনে তন্ত্রসাধন-কাল হইতে নিত্য এতই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদের সম্যক্ উল্লেখ করা মনুষ্যশক্তির সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদিগের প্রতীতি হইয়াছে। অতএব ঐ উদ্যমে অধিক কালক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন।

তন্ত্রসাধনে সিদ্ধিলাভে ঠাকুরের দেহবোধ-রাহিত্য ও বালকভাব প্রাপ্তি।

তন্ত্রোক্ত-সাধনকাল হইতে ঠাকুরের সুষুম্নাদ্বার পূর্ণভাবে উন্মোচিত হইয়া, তাঁহার বালকবৎ অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার কথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। এই কালের শেষভাগ হইতে তিনি পরিহিত বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্রাদি, চেষ্টা

করিলেও, সর্ব্বদা অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঐ সকল কখন কোথায় যে পড়িয়া যাইত, তাহার অনুভব হইত না! শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্মে মন সতত নিবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার শরীর-বোধ না থাকাই যে উহার হেতু, তাহা আর বলিতে হইবে না। নতুবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তিনি যে কখন ঐরূপ করেন নাই, বা অন্যত্রদৃষ্ট পরমহংসদিগের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতে অভ্যাস করেন নাই—একথা, আমরা তাঁহার শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন,—ঐসকল সাধনশেষে তাঁহার সকল পদার্থে অদ্বৈতবুদ্ধি এত অধিক বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাল্যাবধি তিনি যাহাকে হেয় নগণ্য বস্তু বলিয়া পরিগণনা করিতেন, তাহাকেও মহা পবিত্র বস্তুসকলের সহিত তুল্য দেখিতেন! বলিতেন,—"তুলসীগাছ ও সজ্‌নে খাড়া এক বোধ হইত!"

তন্ত্রসাধনকালে ঠাকুরের অঙ্গকান্তি।

আবার, এই কাল হইতে ঠাকুরের অঙ্গকান্তি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এত অধিক প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল যে, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র লোকনয়নের আকর্ষণের বিষয় হইয়াছিলেন। নিরভিমান ঠাকুরের উহাতে নিরন্তর এতই বিরক্তির উদয় হইত যে, তিনি দিব্যকান্তি পরি-হারের জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট অনেক সময় প্রার্থনা করিয়া বলিতেন,—'মা, আমার এ বাহ্য রূপে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, উহা লইয়া তুই আমাকে আন্তরিক আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান কর্!' তাঁহার ঐরূপ প্রার্থনা যে কালে পূর্ণ হইয়াছিল, একথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।*

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—সপ্তম অধ্যায়, ১৯৪—১৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

তন্ত্রোক্ত সাধনে ব্রাহ্মণী যেমন ঠাকুরকে সহায়তা করিয়াছিলেন, ঠাকুরও তদ্রূপ ব্রাহ্মণীর আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ করিতে উত্তরকালে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ঐরূপ না করিলে, ব্রাহ্মণী যে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিতা হইতে পারিতেন না, একথার আভাস আমরা পাঠককে অন্যত্র দিয়াছি।* ব্রাহ্মণীর নাম যোগেশ্বরী ছিল, এবং ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশসম্ভূতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশ ছিলেন।

তন্ত্রসাধনপ্রভাবে দিব্যশক্তি লাভ করিয়া ঠাকুরের অন্য ঐক বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পরে, বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকটে ধর্ম্মশক্তি লাভের জন্য উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ হইবে। পরম অনুগত শ্রীযুত মথুর এবং হৃদয় প্রভৃতিকে তিনি ঐ উপলব্ধির কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীযুত মথুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, 'বেশ ত বাবা, সকলে মিলিয়া তোমাকে লইয়া আনন্দ করিব।'

দ্বাদশ অধ্যায়।

জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন।

সন ১২৬৭ সালের শেষ ভাগে পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দেহত্যাগের পরে ভৈরবী শ্রীমতী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন করিয়াছিলেন—ঐকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১২৬৯

* গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, অষ্টম অধ্যায়, ২৪৩—২৪৭ পৃষ্ঠা দেখ।

সাল পর্য্যন্ত ঠাকুর তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে বিশেষভাবে প্রবর্ত্তিত হয়েন। তন্ত্রসাধনসকলের অনুষ্ঠানকালে মথুর বাবুই ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা শ্রীযুত মথুর ঐকালের পূর্ব্বে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঈশ্বরানুরাগ, অদ্ভুত সংযম এবং জ্বলন্ত ত্যাগবৈরাগ্য সম্বন্ধে যেমন দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন, তন্ত্রসাধনকালে সেইরূপ, তাঁহাতে অলৌকিক বিভূতি-সকলের বারম্বার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া তাঁহার দৃঢ়ধারণা হইয়াছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহাবলম্বনে তাঁহার ইষ্টদেবীই তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া তাঁহার সেবা লইতেছেন,* সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব ও বিষয়াধিকার সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে দিন দিন অশেষ মর্য্যাদা ও গৌরবসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। কারণ, মথুরামোহন তখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতেছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপালাভে আপনাকে বিশেষভাবে 'দৈবসহায়বান্ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সুতরাং ঠাকুরের সাধনানুকূল দ্রব্যসমূহের সংগ্রহে এবং তাঁহার অভিপ্রায়-মত দেবসেবার্থে বা অন্য কোন সৎকার্য্যানুষ্ঠানে মথুরের বহুল অর্থ ব্যয় করাতে কিছুই বিচিত্রতা ছিল না।

ঠাকুরের কৃপালাভে মথুরের অনুভব ও আচরণ।

তন্ত্রোক্ত সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশ দিন দিন যত বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল, তাঁহার শ্রীপদাশ্রয়ী মথুরের সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহ, সাহস এবং বল ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার আশ্রয় ও কৃপালাভে ভক্ত নিজ হৃদয়ে যে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭৮—১৮০পৃষ্ঠা।

অপূর্ব্ব উৎসাহ এবং বলসঞ্চার অনুভব করেন, মথুরের অনুভূতিও এখন তাদৃশী হইয়াছিল। তবে রজোগুণা সংসারী মথুরের ভক্তি ঠাকুরের সেবা ও পুণ্যকার্য্যসকলের অনুষ্ঠানমাত্র করিয়াই পরিতুষ্ট থাকিত, আধ্যাত্মিক রাজ্যে অধিকদূর অগ্রসর হইতে চাহিত না। ঐরূপ না হইলেও কিন্তু মথুরের মন তাঁহাকে একথা স্থির বুঝাইয়াছিল যে, ঠাকুরই তাঁহার বল, বুদ্ধি, ভরসা, তাঁহার ইহকাল পরকালের সম্বল, এবং তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি ও পদমর্য্যাদা লাভ প্রভৃতির মূলীভূত কারণ।

ঠাকুরের কৃপালাভে মথুর যে এখন আপনাকে বিশেষ সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার এই কালানুষ্ঠিত কার্য্যে পাইয়া থাকি। "রাণী রাসমণির জীবন বৃত্তান্ত" শীর্ষক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীযুত মথুরামোহন এই কালে (সন ১২৭০ সালে) দক্ষিণেশ্বরে বহুব্যয়সাধ্য অন্নমেরু ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, এই ব্রতকালে তিনি প্রভূত স্বর্ণ রৌপ্যাদি ব্যতীত সহস্র মন চাউল ও সহস্র মন তিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান করিয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধা গায়িকা সহচরীর কীর্ত্তন ও রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান প্রভৃতি কিছুকালের জন্য নিযুক্ত করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে উৎসবক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। হৃদয় একথাও বলিতেন যে, ঐ সকল গায়ক-গায়িকাদিগের ভক্তিরসাশ্রিত সঙ্গীত শ্রবণে ঠাকুরকে মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়া শ্রীযুত মথুর, ঠাকুরের পরিতৃপ্তির তারতম্যকেই তাহাদিগের গুণপনার পরিমাপকস্বরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া বহুমূল্য শাল, রেশমী বস্ত্র এবং শত শত মুদ্রা তাহাদিগকে পারিতোষিকস্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন।

মথুরের অন্নমেরু ব্রতানুষ্ঠান।

শ্রীযুত মথুরের ঐরূপে অন্নমেরু ব্রতানুষ্ঠানের কিছু পূর্ব্বে ঠাকুর বর্দ্ধমান রাজসভার তাৎকালিক প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মলোচনের অশেষ গুণগ্রাম ও নিরভিমানিতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, অন্নমেরু ব্রতকালে আহূত পণ্ডিতসভাতে ঐ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে আনয়ন ও দান গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত শ্রীযুত মথুরের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রতি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিসম্পন্ন জানিতে পারিয়া মথুরামোহন হৃদয়ের দ্বারা উক্ত পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। শ্রীযুত পদ্মলোচন কিন্তু মথুরের সাদর নিমন্ত্রণ ঐকালে রক্ষা করিতে পারেন নাই। পদ্মলোচন পণ্ডিতের কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র সবিস্তারে বলিয়াছি।*

বৈদান্তিক পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ।

তান্ত্রিক সাধনসমূহ অনুষ্ঠানের পর ঠাকুর বৈষ্ণব মতের সাধনসকলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঐরূপ হইবার কতকগুলি স্বাভাবিক কারণ আমরা অনুসন্ধানে পাইয়া থাকি। প্রথম, ভক্তিমতী ভৈরবী ব্রাহ্মণী—বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনসমূহে স্বয়ং পারদর্শিনী ছিলেন এবং ঐ ভাবসকলের অন্যতমকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং অনেককাল অবস্থান করিতেন। নন্দরাণী শ্রীমতী যশোদার ভাবে তন্ময় হইয়া ঠাকুরকে বালগোপাল জ্ঞানে তাঁহার ভোজন করাইবার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব বৈষ্ণব মত সাধন বিষয়ে ঠাকুরকে তাঁহার উৎসাহ প্রদান করা বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়, বৈষ্ণব-কুল-সম্ভূত ঠাকুরের বৈষ্ণব ভাবসাধনে অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক। কামারপুকুর অঞ্চলে

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৯২—৯৮ পৃষ্ঠা।

ঐসকল সাধন বিশেষ ভাবে প্রচলিত থাকায় উহাদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবার বাল্যকাল হইতে বিশেষ সুযোগ ছিল। তৃতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কারণ, ঠাকুরের ভিতর আজীবন পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়বিধ প্রকৃতির অদৃষ্টপূর্ব্ব সম্মিলন। উহাদিগের একের প্রভাবে তিনি সিংহপ্রতিম নির্ভীক বিক্রমশালী, সর্ব্ববিষয়ের মূলকারণান্বেষী, কঠোর পুরুষপ্রবররূপে আমাদের নয়নে প্রতিভাত হইতেন, এবং অন্যের প্রকাশে, ললনাজনসুলভ অসামান্য কোমল-কঠোর স্বভাববিশিষ্ট হইয়া তিনি নিজ হৃদয়ের মধ্য দিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে ও পরিমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, কতকগুলি বিষয়ে স্বভাবতঃ তীব্র অনুরাগসম্পন্ন ও অন্য কতকগুলিতে ঐরূপে বিরাগসম্পন্ন হইতেন এবং, ভাবসংযুক্ত হইলে অশেষ ক্লেশ হাস্যমুখে বহন করিতে পারিলেও ইতরসাধারণের ন্যায় ভাববিহীন হইয়া কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না।

ঠাকুরের বৈষ্ণব মতের সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইবার কারণ।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত শান্ত, দাস্য, এবং কখন কখন শ্রীকৃষ্ণসখা শ্রীদাম সুদামাদি ব্রজবালকগণের ন্যায় সখ্যভাবাবলম্বনে সাধন ও উপাসনায় স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়া ঐ সকলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রগতপ্রাণ মহাবীরকে আদর্শজ্ঞানে দাস্যভক্তি অবলম্বনে তাঁহার কিছুকাল অবস্থিতি এবং জনকনন্দিনী, জনমদুঃখিনী সীতার দর্শনলাভ প্রভৃতি কথা পাঠকের স্মরণ থাকিবে। অতএব বৈষ্ণবাচার্য্যগণনিষেবিত বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত মুখ্য ভাবদ্বয়

বাৎসল্য ও মধুরভাব সাধনের পূর্ব্বে ঠাকুরের ভিতর স্ত্রীভাবের উদয়।

গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৭ম অধ্যায়, ১৯৩–২০১পৃষ্ঠা।

সাধনেই তিনি এখন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন . দেখিতে পাওয়া যায়, এই কালে তিনি আপনাকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার সখীরূপে ভাবনা করিয়া চামরহস্তে তাঁহাকে বীজনে নিযুক্ত আছেন, শরৎ-কালীন দেবীপূজাকালে মথুরের কলিকাতাস্থ বাটীতে উপস্থিত হইয়া রমণীজনোচিত সাজে সজ্জিত ও কুলস্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া ৺দেবীর দর্শনাদি করিতেছেন এবং স্ত্রীভাবের প্রাবল্যে অনেক সময়ে স্বয়ং যে পুংদেহবিশিষ্ট, একথা বিস্মৃত হইতেছেন।* আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মসকাশে যাইতে আরম্ভ করিয়াছি, তখনও তাঁহাতে সময়ে সময়ে প্রকৃতি-ভাবের উদয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তখন উহার এই কালের মত এত সুদীর্ঘকালব্যাপী অবস্থান হইত না। ঐরূপ হইবার আবশ্যকতাও ছিল না। কারণ, স্ত্রী-পুং-প্রকৃতিগত যাবতীয় ভাব এবং ভাবাতীত অদ্বৈতভাবমুখে ইচ্ছামত অবস্থান করা শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় তাঁহার তখন সহজ হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল এবং সমীপাগত প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণসাধনের জন্য ঐ সকল ভাবের যেটীতে যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি অবস্থান করিতেছিলেন।

ঠাকুরের মনের গঠন কিরূপ ছিল তদ্বিষয়ের আলোচনা।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের সাধনকালের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠককে কল্পনাসহায়ে সর্ব্বাগ্রে অনুধ্যান করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহার মন, জন্মাবধি কীদৃশ অসাধারণ ধাতুতে গঠিত থাকিয়া কিভাবে সংসারে নিত্য বিচরণ করিত এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রবল বাত্যাভিমুখে পতিত হইয়া বিগত আট বৎসরে উহাতে কিরূপ পরিবর্ত্তনরাজি উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, ১২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ– ৭ম অধ্যায়, ১৯৩—২০১ পৃষ্ঠা।

যখন তিনি প্রথম পদার্পণ করেন এবং উহার পরেও কিছুকাল তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতৃপিতামহগণ যেরূপে সৎপথে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও ঐরূপ করিবেন। আজন্ম অভিমানরহিত তাঁহার মনে একথা একবারও উদয় হয় নাই যে, তিনি সংসারের অন্য কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে বড় বা বিশেষগুণসম্পন্ন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অসাধারণ বিশেষত্ব প্রতি পদে প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক অপূর্ব্ব দৈবী শক্তি যেন প্রতিক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সংসারের রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয়ের অনিত্যত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহার নয়নসম্মুখে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বদা বিপরীত পথে চালিত করিতে লাগিলেন। স্বার্থশূন্য সত্যমাত্রানুসন্ধিৎসু ঠাকুর উহার ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে শীঘ্রই আপনাকে অভ্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। পার্থিব ভোগ্য-বস্তুসকলের কোনটী লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল থাকিলে ঐরূপ করা তাঁহার যে, সুকঠিন হইত একথা বুঝিতে পারা যায়।

ঠাকুরের মনে সংস্কার-বন্ধন কত অল্প ছিল।

সর্ব্ব বিষয়ে ঠাকুরের আজীবন আচরণ স্মরণ করিলেই আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। সংসারে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্য, 'চাল কলা বাঁধা' বা অর্থোপার্জ্জন বুঝিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিলেন না—সংসারযাত্রানির্ব্বাহে সাহায্য হইবে বলিয়া পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া দেবোপাসনার অন্যোদ্দেশ্য বুঝিলেন এবং ঈশ্বরলাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—সম্পূর্ণ সংযমেই ঈশ্বরলাভ একথা বুঝিয়া বিবাহিত হইলেও কায়মনোবাক্যে কখন স্ত্রীগ্রহণ করিলেন না—সঞ্চয়শীল ব্যক্তি ঈশ্বরে পূর্ণনির্ভর-

বান্ হয় না বুঝিয়া কাঞ্চনাদি দূরের কথা, সামান্য পদার্থসকল সঞ্চয়ের ভাবও মন হইতে এককালে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন —ঐরূপ অনেক কথাই ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। ঐ সকল কথার অনুধাবনে বুঝিতে পারা যায়, ইতরসাধারণ জীবের মোহকর সংস্কারবন্ধনসকল তাঁহার মনে বাল্যাবধি কতদূর অসামান্য অল্প প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, ঠাকুরের ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, তাহার সম্মুখে তাঁহার পূর্ব্বসংস্কারসকল মস্তকোত্তলন করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করাইতে কখন সমর্থ হইত না।

সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ঠাকুরের মন কিরূপ গুণসম্পন্ন ছিল।

তদ্ভিন্ন আমরা দেখিয়াছি, বাল্যকাল হইতে ঠাকুর শ্রুতিধর ছিলেন। যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং তাঁহার স্মৃতি উহা চিরকালের জন্য ধারণ করিয়া থাকিত। বাল্যকালে রামায়ণাদি কথা, গান এবং যাত্রা প্রভৃতি একবার শ্রবণ করিবার পরে ঠাকুর বয়স্যগণকে লইয়া কামারপুকুরের গোঠে ব্রজে ঐ সকলের কিরূপে পুনরাবৃত্তি করিতেন, তদ্বিষয় পাঠকের জানা আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, অদৃষ্টপূর্ব্ব সত্যানুরাগ, শ্রুতিধরত্ব এবং সম্পূর্ণ ধারণারূপ সম্পত্তিনিচয় পূর্ব্ব হইতে নিজস্ব করিয়া ঠাকুর সাধকজীবনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যে অনুরাগ, ধারণা প্রভৃতি গুণসমূহ আয়ত্ত করা সাধারণ সাধকের জীবনপাতী চেষ্টাতেও সুসাধ্য হয় না, ঠাকুর সেই গুণসকলকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং সাধনরাজ্যে স্বল্পকালমধ্যে তাঁহার সমধিক ফললাভ করা বিচিত্র নহে।

সাধনকালে কঠিন সাধনসমূহে তিনি তিন দিনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, একথা তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়া অনেক সময়ে আমরা যে, বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছি, তাহার কারণ তাঁহার অসামান্য মানসিক গঠনের কথা আমরা তখন বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

ঠাকুরের অসাধারণ মানসিক গঠনের দৃষ্টান্ত ও আলোচনা।

ঠাকুরের জীবনের কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিলে পাঠক আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝিতে পারিবেন। সাধনকালের প্রথমে ঠাকুর নিত্যানিত্যবস্তু-বিচারপূর্ব্বক 'টাকা মাটি—মাটি টাকা' বলিতে বলিতে মৃত্তিকাসহ কয়েকখণ্ড মুদ্রা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন—অমনি তৎসহ যে কাঞ্চনাসক্তি মানবমনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার মন হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জিত হইল! সাধারণে যে স্থানে গমনপূর্ব্বক স্নানাদি না করিয়া আপনাদিগকে শুচি জ্ঞান করে না, সেই স্থান তিনি স্বহস্তে মার্জ্জনা করিলেন—অমনি তাঁহার মন, জন্মগত জাত্যভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক চিরকালের নিমিত্ত ধারণা করিয়া রাখিল, সমাজে অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত ব্যক্তিসমূহাপেক্ষা সে কোন অংশে বড় নহে! জগদম্বার সন্তান বলিয়া আপনাকে ধারণা করিয়া ঠাকুর যেমন শুনিলেন তিনিই "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—অমনি আর কখন স্ত্রীজাতির কাহাকেও অন্য চক্ষে দেখিয়া তাঁহার সহিত দাম্পত্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারিলেন না!—ঐ সকল বিষয়ের অনুধাবনে স্পষ্ট বুঝা যায়, অসামান্য ধারণাশক্তি না থাকিলে ঠাকুর ঐরূপ ফলসকল কখন লাভ করিতে পারিতেন না। ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল কথা শুনিয়া আমরা যে,

বিস্মিত হই, অথবা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহার কারণ —আমরা ঐ সময়ে আমাদিগের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, ঐরূপে মৃত্তিকাসহ মুদ্রাখণ্ড সহস্রবার জলে বিসর্জ্জন করিলেও আমাদিগের কাঞ্চনাসক্তি যাইবে না—সহস্রবার কদর্য্য স্থান ধৌত করিলেও আমাদের মনের অভিমান ধৌত হইবে না এবং জগজ্জননীর রমণীরূপে প্রকাশ হইয়া থাকিবার কথা আজীবন শুনিলেও কার্য্যকালে আমাদিগের রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানের উদয় হইবে না! আমাদিগের ধারণা-শক্তি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসংস্কারে নিতান্ত নিগড়বদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া চেষ্টা করিয়াও আমরা ঐ সকল বিষয়ে ঠাকুরের ন্যায় ফললাভ করিতে পারি না। সংযমরহিত, ধারণাশূন্য, পূর্ব্বসংস্কার-প্রবল মন লইয়া আমরা ঈশ্বরলাভ করিতে সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকি—ফলও সুতরাং তদ্রূপ হয়।

ঠাকুরের ন্যায় অপূর্ব্ব শক্তিবিশিষ্ট মন সংসারে চারি পাঁচ শত বৎসরেও এক আধটা আসে কিনা, সন্দেহ। সংযমপ্রবীণ, ধারণা-কুশল, পূর্ব্বসংস্কার-নির্জীব সেই মন ঈশ্বরলাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব্ব অনুরাগ-ব্যাকুলতা-তাড়িত হইয়া আট বৎসর কাল আহারনিদ্রা-ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণদর্শন লাভের জন্য সচেষ্ট থাকিয়া কতদূর শক্তিসম্পন্ন হইয়া ছিল ও কিরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করিয়া-ছিল, তাহা আমাদের মত মনের কল্পনায় আনয়ন করাও অসম্ভব।

ঠাকুরের অনুজ্ঞায় মথুরের সাধুসেবা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, রাণী রাসমণির মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবার কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হইত না। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মথুরামোহন ঐ সেবার জন্য নিয়মিত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময়ে

ঠাকুরের নির্দ্দেশে ঐবিষয়ে অনেক অধিক ব্যয় করিতেন। দেবদেবীসেবা ভিন্ন সাধুভক্তের সেবাতে তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। কারণ, ঠাকুরের শ্রীপদাশ্রয়ী মথুর তাঁহার শিক্ষায় সাধুভক্তগণকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সেজন্য দেখা যায়, ঠাকুর যখন এইকালে তাঁগকে সাধুভক্তদিগকে অন্নদান ভিন্ন দেহরক্ষার উপযোগী বস্ত্র কম্বলাদি ও নিত্যব্যবহার্য্য কমণ্ডলু প্রভৃতি জলপাত্র দানের ব্যবস্থা করিতে বলেন, তখন ঐ বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি ঐ সকল পদার্থ ক্রয় করিয়া কালীবাটীর একটী গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখেন এবং ঐ নূতন ভাঁণ্ডারের দ্রব্যসকল ঠাকুরের আদেশানুসারে বিতরিত হইবে, কর্ম্মচারীদিগকে এইরূপ বলিয়া দেন। আবার, উহার কিছুকাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদিগকে সাধনার অনুকূল পদার্থসকল দান করিয়া তাঁহাদিগের সেবা করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের মনে উদিত হইলে, মথুর তদ্বিষয় জানিতে পারিয়া উহারও বন্দোবস্ত করিয়া দেন।* সম্ভবতঃ সন ১২৬৯—৭০সালেই মথুরমোহন ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে ঐরূপে সাধুসেবার বহুল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐরূপ কার্য্যে রাণী রাসমণির কালীবাটীর অদ্ভুত আতিথেয়তার কথা সাধুভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বত্র সমধিক প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। রাণী রাসমণির জীবৎকাল হইতেই কালীবাটী তীর্থপর্য্যটনশীল সাধু-পরিব্রাজকগণের নিকটে পথিমধ্যে কয়েক দিন বিশ্রামলাভের স্থান-বিশেষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিলেও, এখন উহার সুনাম চারিদিকে সমধিক প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকাগ্রণী সাধুভক্তসকলে ঐ স্থানে উপস্থিত ও আতিথ্যগ্রহণে

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—২য় অধ্যায় ৬৫ পৃষ্ঠা।

পরিতৃপ্ত হইয়া উহার সেবা-পরিচালককে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ঐরূপে সমাগত বিশিষ্ট সাধুদিগের কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহা অন্যত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি।* এখানে তাহার পুনরুল্লেখ—'জটাধারী' নামক যে রামাইত সাধুর নিকট ঠাকুর রাম-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও 'শ্রীশ্রীরামলীলা'-নামক শ্রীরামচন্দ্রের বালবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমনকাল পাঠককে জানাইবার জন্য। সম্ভবতঃ ১২৭০ সালেই তিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জটাধারীর আগমন।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি জটাধারীর অদ্ভুত অনুরাগ ও ভালবাসার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। বালক রামচন্দ্রের মূর্ত্তিই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল; এবং শ্রীরামচন্দ্রের ঐরূপ মূর্ত্তির বহুকাল পর্য্যন্ত সানুরাগ সেবায় তাঁহার মন ভাবরাজ্যে আরূঢ় হইয়া এমন একটা অন্তর্ম্মুখী তন্ময়াবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি দেখিতে পাইতেন, শ্রীরামচন্দ্রের জ্যোতির্ঘন বালবিগ্রহ সত্যসত্যই তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ভক্তিপূত সেবা গ্রহণ করিতেছেন! প্রথম প্রথম ঐরূপ দর্শন ক্ষণকালের জন্য মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দে বিহ্বল করিত। কালে সাধনায় তিনি যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ঐ দর্শনও তত ঘনীভূত হইয়া বহুকালব্যাপী এবং ক্রমে নিত্য-পরিদৃষ্ট বিষয়সকলের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐরূপে ভাবারূঢ় হইয়া বাল-শ্রীরামচন্দ্রকে একপ্রকার নিত্যসহচর-রূপে লাভ করিয়া এবং যদবলম্বনে

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ২য় অধ্যায়

ঐ দিব্য দর্শন তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল সেই রামলালা বিগ্রহের সেবাতে আপনাকে নিত্য নিযুক্ত রাখিয়া, জটাধারী যদৃচ্ছাক্রমে ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রামলালার সেবায় নিযুক্ত জটাধারী যে, বাল-রামচন্দ্রের ভাবঘন মূর্ত্তির যখন তখন দর্শন লাভ করেন, একথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। লোকে দেখিত, তিনি নিত্য সদা-সর্ব্বক্ষণ একটী ধাতুময় বালবিগ্রহের সেবা অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়া থাকেন, এই পর্য্যন্ত। ভাবরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু জটাধারীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই স্থূল যবনিকার অন্তরাল ভেদ করিয়া অন্তরের গূঢ় রহস্য অবধারণ করিল, এবং উহাতে তিনি জটাধারীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তাঁহার সেবার অনুকূল যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার তাঁহাকে সাহ্লাদে যোগাইতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন ঠাকুর তাঁহার নিকটে প্রতিদিন বহুক্ষণ অবস্থান করিয়া, তাঁহার সেবা ভক্তিভরে নিরীক্ষণও করিতে লাগিলেন। জটাধারী শ্রীরামচন্দ্রের যে ভাবঘন দিব্য মূর্ত্তির দর্শন পাইতেন, সেই মূর্ত্তির দিব্যদর্শন পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে, ঠাকুর এখন ঐরূপ করিয়াছিলেন, একথা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।* জটাধারীর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ ভাব ধারণ করিয়াছিল।

জটাধারীর সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে প্রকৃতিভাবে

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ২য় অধ্যায়, ৫৩ পৃষ্ঠা।

ভাবিত হইয়া অনেক কাল অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার নিত্যসঙ্গিনীরূপে আপনাকে ধারণা করিয়া স্বহস্তে পুষ্পহারাদি গ্রন্থনপূর্ব্বক তাঁহার বেশভূষা করিয়া দেওয়া, গ্রীষ্মাপনোদনের জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে চামর ব্যজন করা, মথুরকে বলিয়া নূতন নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকে পরাইয়া দেওয়া এবং স্ত্রীবেশ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করান প্রভৃতি কার্য্যে তিনি এই সময়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অবশ্য ঐরূপ করিবার প্রবল প্রেরণা তাঁহার মনে স্বভাবতঃ উদয় হওয়াতেই ঠাকুর এখন ঐরূপ কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিতেন। জটাধারীর এই কালে আগমনে ও তৎসহ আলাপে ঠাকুরের মনে বৈদেহীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি-প্রীতি পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। উহার প্রেরণায় তিনি এখন তাঁহার যে ভাবঘন মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিলেন, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের শৈশবাবস্থার প্রতিরূপ। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিভাবের প্রাবল্যে তাঁহার মন যে এখন ঐ দিব্য শিশুর প্রতি বাৎসল্যরসে পূর্ণ হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? মাতা নিজ হৃদয়ে শিশুপুত্রের প্রতি যে অপূর্ব্ব প্রীতি ও প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন, ঠাকুর ঐ দিব্য শিশুর প্রতি অন্তরে সেইরূপ আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঐরূপ প্রীতি এবং প্রেমাকর্ষণই যে তাঁহাকে এখন জটাধারীর বালবিগ্রহের পার্শ্বে বসাইয়া কিরূপে কোথা দিয়া সময় অতীত হইতেছে তাহা জানিতে দিত না, একথা নিঃসন্দেহ। কারণ, তাঁহার নিজমুখে আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, ঐ অদ্ভুত উজ্জ্বল শিশু মধুময় নানা বালচেষ্টাদির দ্বারা ভুলাইয়া তাঁহাকে নিজ সকাশে ধরিয়া রাখিতে নিত্য প্রয়াস পাইত, তাঁহার অদর্শনে

স্ত্রীভাবের উদয়ে ঠাকুরের বাৎসল্যভাব সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া।

ব্যথিত হইয়া আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথ নিরীক্ষণ করিত এবং নিষেধ না শুনিয়া তাঁহার সহিত যথাতথা গমনে উদ্যত হইত!

ঠাকুরের উদ্যমশীল মন কখন কোন কার্য্যের অর্দ্ধেক নিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিত না। স্থূল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকাশিত তাঁহার ঐরূপ স্বভাব, সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের বিষয়সকলের অধিকারেও পরিদৃষ্ট হইত। দেখা যাইত, স্বাভাবিক প্রেরণায় কোন ভাব উপস্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিলে, তিনি উহার চরম সীমা পর্য্যন্ত উপলব্ধি না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের অনুশীলন করিয়া কোন কোন পাঠক হয়ত ভাবিয়া বসিবেন, কিন্তু উহা কি ভাল?—যখন যে ভাব অন্তরে উদয় হইবে, তখনই তাহার হস্তের ক্রীড়াপুত্তল-স্বরূপ হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলে মানবের কখন কি কল্যাণ হইতে পারে?—দুর্ব্বল মানবের অন্তরে সু এবং কু—সকলপ্রকার ভাবই যখন অনুক্ষণ উদয় হইতেছে, তখন ঠাকুরের ঐ প্রকার স্বভাব তাঁহাকে কখন বিপথগামী না করিলেও, সাধারণের অনুকরণীয় হইতে পারে না। কেবলমাত্র সুভাবসকলই অন্তরে উদিত হইবে, আপনার প্রতি এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা মানবের কখনই কর্ত্তব্য নহে। অতএব সংযমরূপ রশ্মি দ্বারা ভাবরূপ অশ্বসকলকে সর্ব্বদা নিয়ত রাখাই মানবের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

কোন ভাবের উদয় হইলে উহার চরম উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা; ঐরূপ করা কর্ত্তব্য কি না।

তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও, উত্তরে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। কামকাঞ্চনৈক-নিবদ্ধ-দৃষ্টি ভোগ-লোলুপ মানব-মনের আপনার প্রতি অতদূর বিশ্বাস স্থাপন কখনও যে কর্ত্তব্য নহে, একথা

ঠাকুরের ন্যায় নির্ভর-শীল সাধকের ভাব-সংযমের আবশ্যকতা নাই—উহার কারণ।

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে ভাবসংযমনের আবশ্যকতাসম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের উত্থাপন করা নিতান্ত অদূরদৃষ্টি মূঢ় ব্যক্তিরই সম্ভবপর। কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরকৃপায় বিরল কোন কোন সাধকের নিকট সংযম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজাবস্থা হইয়া দাঁড়ায় এবং তাঁহাদিগের মন তখন কামকাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে এককালে মুক্তিলাভ করিয়া কেবলমাত্র সুভাবসমূহের নিবাসস্থলরূপে পরিণত হয়। ঠাকুরও বলিতেন—শ্রীশ্রীজগদম্বার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ঐরূপ মানবের মনে তাঁহার কৃপায় তখন কোন কুভাবই আর মস্তকোত্তলন করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না—"মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) তাহার পা কখনও বেতালে পড়িতে দেন না।" ঐরূপ অবস্থাবিশিষ্ট মানব তৎকালে তাঁহার অন্তর্গত প্রত্যেক মনোভাবকে বিশ্বাস করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি না হইয়া বরং তদ্দ্বারা অপরের বিশেষ কল্যাণ সংসাধিত হয়। কারণ, দেহাভিমানবিশিষ্ট যে ক্ষুদ্র আমিত্বের প্রেরণায় আমরা স্বার্থপর হইয়া জগতের সমগ্র ভোগসুখাধিকারলাভকেও পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করি না, অন্তরের সেই ক্ষুদ্র আমিত্ব ঈশ্বরের বিরাট্ আমিত্বে চিরকালের জন্য বিসর্জ্জিত হওয়ায়, ঐরূপ মানবের পক্ষে স্বার্থসুখান্বেষণ তখন এককালে অসম্ভব হইয়া উঠে। বিরাট্ ঈশ্বরের সর্ব্বকল্যাণকরী ইচ্ছাই সুতরাং ঐ মানবের অন্তরে তখন অপরের কল্যাণসাধনের জন্য বিবিধ মনোভাবরূপে সমুদিত হইয়া থাকে। অথবা ঐরূপ অবস্থাপন্ন সাধক তখন 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' একথা প্রাণে প্রাণে অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ মনোগত ভাবসকলকে বিরাট্ পুরুষ ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়া উহাদিগের প্রেরণায় কার্য্য

করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। এবং ফলেও দেখা যায়, তাঁহাদিগের ঐরূপ অনুষ্ঠানে অপরের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ঠাকুরের ন্যায় অলোকসামান্য মহাপুরুষদিগের উক্তবিধ অবস্থা জীবনের অতি প্রত্যূষেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্য ঐরূপ পুরুষদিগের জীবনেতিহাসে আমরা তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র যুক্তি তর্ক না করিয়া নিজ নিজ মনোগত ভাবসকলকে পূর্ণভাবে বিশ্বাসপূর্ব্বক অনেক সময়ে কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই। বিরাট্ ইচ্ছাশক্তির সহিত নিজ ক্ষুদ্রেচ্ছাকে সর্ব্বদা ঐরূপে অভিন্ন রাখিয়া, তাঁহারা মানবসাধারণের মনবুদ্ধির অবিষয়ীভূত বিষয়সকল তখন সর্ব্বদা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। কারণ, বিরাট্ মনে সূক্ষ্ম ভাবাকারে ঐসকল বিষয় পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশিত থাকে।

ঐরূপ সাধক নিজ শরীরত্যাগের কথা জানিতে পারিয়াও উদ্বিগ্ন হন না—ঐবিষয়ে দৃষ্টান্ত।

আবার বিরাটেচ্ছার সর্ব্বদা সম্পূর্ণ অনুগত থাকায়, তাঁহারা এতদূর স্বার্থ ও ভয়শূন্য হয়েন যে, কি ভাবে কাহার দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র শরীর মন ধ্বংস হইবে তদ্বিষয় পর্য্যন্ত ঐ প্রকারে পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়া, ঐ বস্তু, ব্যক্তি ও বিষয়সকলের প্রতি কিছুমাত্র বিরাগসম্পন্ন না হইয়া পরম প্রীতির সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদনে তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। কয়েকটী দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই আমাদের কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেখ—শ্রীরামচন্দ্র জনকতনয়া সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও ভবিতব্য বুঝিয়া, তাঁহাকে বনে বিসর্জ্জন করিলেন। আবার, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ানুজ লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলে নিজ লীলাসম্বরণ অবশ্যম্ভাবী, একথা বুঝিয়াও ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 'যদুবংশ ধ্বংস হইবে', পূর্ব্ব হইতে একথা জানিতে পারিয়াও তৎপ্রতি-

রোধে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া যাহাতে ঐ ঘটনা যথাকালে উপস্থিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিলেন। অথবা ব্যাধহস্তে আপনার নিধন জানিয়াও ঐ কাল উপস্থিত হইলে বৃক্ষপত্রান্তরালে সর্ব্বশরীর লুক্কায়িত রাখিয়া নিজ আরক্তিম চরণযুগল এমনভাবে ধারণ করিয়া রহিলেন, যাহাতে ব্যাধ উহা দেখিবামাত্র পক্ষিভ্রমে শাণিত শর নিক্ষেপ করিল। তখন নিজ ভ্রমের জন্য অনুতপ্ত ব্যাধকে আশীর্ব্বাদ ও সান্ত্বনাপূর্ব্বক তিনি যোগাবলম্বনে শরীর রক্ষা করিলেন।

মহামহিম বুদ্ধ, 'চণ্ডালের আতিথ্যগ্রহণে পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তির কথা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াও উহা স্বীকার-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ ও সান্ত্বনার দ্বারা তাহাকে অপরের ঘৃণা ও নিন্দাবাদের হস্ত হইতে সম্যক্ রক্ষা করিয়া উক্ত পদবীতে আরূঢ় হইলেন। আবার স্ত্রীজাতিকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলে তৎ-প্রচারিত ধর্ম্ম শীঘ্র কলুষিত হইবে জানিতে পারিয়াও, মাতৃষ্বসা আর্য্যা গৌতমীকে প্রব্রজ্যাগ্রহণে আদেশ করিলেন।

ঈশ্বরাবতার ঈশা, 'তাঁহার শিষ্য যুদা তাঁহাকে অর্থলোভে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিবে এবং তাহাতেই তাঁহার শরীর ধ্বংস হইবে' একথা জানিতে পারিয়াও, তাহার প্রতি সমভাবে স্নেহপ্রদর্শন করিয়া আজীবন তাহার কল্যাণ-চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিলেন।

এইরূপে অবতারপুরুষদিগের ত কথাই নাই, সিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের জীবনালোচনা করিয়াও আমরা ঐরূপ অনেক ঘটনা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। পূর্ব্বোক্ত পুরুষসকলের জীবনে একপক্ষে অসাধারণ উত্তমশীলতার এবং অন্যপক্ষে বিরাটেচ্ছায়

সম্পূর্ণ নির্ভরতার সামঞ্জস্য করিতে হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, বিরাটেচ্ছার অনুমোদনেই তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া উদ্যমের প্রকাশ হইয়া থাকে, নতুবা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরেচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগামী পুরুষসকলের অন্তর্গত স্বার্থ-সংস্কার-সমূহ এককালে বিনষ্ট হইয়া মন, এমন এক পবিত্রভূমিতে উপনীত হয়, যেখানে উহাতে শুদ্ধ ভিন্ন স্বার্থদুষ্ট ভাবসমূহের কখনও উদয় হয় না এবং ঐরূপ অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা নিশ্চিন্ত-মনে আপন মনোভাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক উহাদিগের প্রেরণায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দোষভাগী হয়েন না। ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠানসমূহ ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে অনুকরণীয় না হইলেও, পূর্ব্বোক্ত প্রকার অসাধারণ অবস্থাসম্পন্ন সাধককে নিজ জীবন পরিচালনে বিশেষালোক প্রদান করিবে, সন্দেহ নাই। ঐরূপ অবস্থাসম্পন্ন পুরুষদিগের আহারবিহারাদি সামান্য স্বার্থবাসনাকে শাস্ত্র ভৃষ্ট বীজের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বৃক্ষলতাদির বীজসমূহ উত্তাপদগ্ধ হইলে তাহাদের জীবনী-শক্তি অন্তর্হিত হইয়া সমজাতীয় বৃক্ষলতাদি যেমন আর উৎপন্ন করিতে পারে না, ঐরূপ পুরুষদিগের সংসারবাসনা তদ্রূপ সংযম ও দিব্য-জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়ায়, উহারা তাঁহাদিগকে আর কখন ভোগতৃষ্ণায় আকৃষ্ট করিয়া বিপথগামী করিতে পারে না। ঠাকুরও ঐবিষয়ে বলিতেন, স্পর্শমণির সহিত সঙ্গত হইয়া লৌহের তরবারি স্বর্ণময় হইয়া যাইলে, উহার হিংসাক্ষম আকার মাত্রই বর্ত্তমান থাকে, উহা দ্বারা হিংসাকার্য্য আর করা চলে না।

ঐরূপ সাধকের মনে স্বার্থ-দুষ্ট বাসনা উদয় হয় না।

উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ বলিয়াছেন, এইপ্রকার অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা সত্যসঙ্কল্প হয়েন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের অন্তরে উদিত

সঙ্কল্পমাত্রই তখন সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও হয় না। ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের মনে উদিত ভাবসকলকে বারংবার পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলিয়া না দেখিতে পাইলে, আমরা ঋষিদিগের পূর্ব্বোক্ত কথায় কখনও বিশ্বাসবান্ হইতে পারিতাম না। আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ আহার্য্য গ্রহণ করিতে যাইয়া ঠাকুরের মন সঙ্কুচিত হইলে অনুসন্ধানে জানা যাইত, তাহা ইতিপূর্ব্বে বাস্তবিকই দোষদুষ্ট হইয়াছে—কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরীয় কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া যাইলে প্রমাণিত হইয়াছে, বাস্তবিকই ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ অনধিকারী—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে ইহজীবনে ধর্ম্মলাভ হইবে না বলিয়া অথবা অত্যল্পমাত্র ধর্ম্মলাভ হইবে বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হইলে, বাস্তবিকই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে—কাহাকেও দেখিয়া তাঁহার মনে বিশেষ কোন ভাব বা দেবদেবীর কথা উদিত হইলে, উক্ত ব্যক্তি ঐ ভাবের বা ঐ দেবদেবীর অনুগত সাধক বলিয়া জানা গিয়াছে—অন্তরের ভাব-প্রেরণায় সহসা কাহাকেও কোন কথা তিনি বলিলে, ঐ কথায় ঐ ব্যক্তি বিশেষালোক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার জীবন এককালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ কত কথাই না তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়।

ঐরূপ সাধক সত্য-সঙ্কল্প হন—ঠাকুরের জীবনে ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্তসকল।

সে যাহা হউক, আমরা বলিয়াছি, জটাধারীর আগমনকালে ঠাকুর অন্তরের ভাব-প্রেরণায় অনেক সময় ললনাজনোচিত দেহ-মন-সম্পন্ন বলিয়া নিজ সম্বন্ধে ধারণাপূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের মধুময় বাল্যরূপের দর্শনলাভে তৎপ্রতি বাৎসল্যভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।

জটাধারীর নিকটে ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক বাৎসল্যভাব সাধন ও সিদ্ধি।

কুলদেবতা ৺রঘুবীরের পূজা ও সেবাদি যথারীতি সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বহুপূর্ব্বে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাঁহার প্রতি নিজ সেব্য প্রভু ভিন্ন অন্য কোনভাবে আকৃষ্ট হয়েন নাই। বর্ত্তমানে ঐ দেবতার প্রতি পূর্ব্বোক্ত নবীন ভাব উপলব্ধি করায়, তিনি এখন গুরুমুখে যথাশাস্ত্র ঐ ভাবসাধনোচিত মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক উহার চরমোপলব্ধি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গোপালমন্ত্রে সিদ্ধকাম জটাধারী তাঁহার ঐরূপ আগ্রহ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সাহ্লাদে নিজ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ঠাকুরও ঐ মন্ত্রসহায়ে তৎপ্রদর্শিত পথে সাধনায় নিমগ্ন হইয়া কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের বালগোপালমূর্ত্তির দিব্য-দর্শন অনুক্ষণ লাভে সমর্থ হইলেন। বাৎসল্যভাবসহায়ে ঐ দিব্যমূর্ত্তির অনুধ্যানে তন্ময় হইয়া তিনি অচিরে প্রত্যক্ষ করিলেন—

"যো রাম দশরথকি বেটা,
ওহি রাম ঘট্-ঘট্‌মে লেটা।
ওহি রাম জগৎ পশেরা,
ওহি রাম সব্‌সে নেয়ারা।"

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র কেবলাত্র দশরথের পুত্র নহেন, কিন্তু প্রতি শরীর আশ্রয় করিয়া জীবভাবে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। আবার ঐরূপে অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক জগদ্রূপে নিত্য-প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও, জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক্, মায়া-রহিত নির্গুণ স্বরূপেও নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত হিন্দী দোঁহাটী আমরা ঠাকুরকে অনেক সময়ে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি।

শ্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান ভিন্ন, জটাধারী 'রামলালা' নামক

যে বালগোপালবিগ্রহের এতকাল পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সেবা করিতেছিলেন, তাহাও ঠাকুরকে দিয়া গিয়াছিলেন। কারণ, ঐ জীবন্ত বিগ্রহ, এখন হইতে ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিবেন বলিয়া স্বীয় অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। জটাধারী ও ঠাকুরকে লইয়া ঐ বিগ্রহের অপূর্ব্ব লীলাবিলাসের কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি, * এজন্য তৎপ্রসঙ্গের এখানে পুনরায় উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন।

ঠাকুরকে জটাধারীর 'রামলালা' বিগ্রহ দান।

বাৎসল্যভাবের পরিপুষ্টি ও চরমোৎকর্ষলাভের জন্য ঠাকুর যখন পূর্ব্বোক্তরূপে সাধনায় মনোনিবেশ করেন, তখন যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনে তিনিও বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। বাৎসল্য ও মধুরভাব-সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি ? ঐ বিষয়ে কোন কথা আমরা তাঁহার নিকটে স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই। তবে, বাৎসল্যভাবে আরূঢ়া হইয়া ব্রাহ্মণী অনেক সময় ঠাকুরকে বালগোপালরূপে দর্শনপূর্ব্বক সেবা করিতেন, একথা ঠাকুরের শ্রীমুখে ও হৃদয়ের নিকটে শুনিয়া অনুমিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালমূর্ত্তিতে বাৎসল্যভাব আরোপিত করিয়া উহার চরমোপলব্ধি করিবার কালে এবং মধুরভাব সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে কিছু না কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ কোন প্রকার সাহায্য

বৈষ্ণবমত সাধনকালে ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়তা লাভ কতদূর করিয়াছিলেন।

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা এবং ৬১-৬২ পৃষ্ঠা দেখ

না পাইলেও, ব্রাহ্মণীকে ঐরূপ সাধনসমূহে নিরতা দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে ঐ সকলের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, ঠাকুরের মনে ঐ সকল ভাবসাধনের ইচ্ছা যে বলবতী হইয়া উঠে, একথা অন্ততঃ নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারা যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মধুরভাবের সারতত্ত্ব।

সাধক না হইলে সাধকজীবনের ইতিহাস বুঝা সুকঠিন। কারণ, সাধনা সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের কথা। সেখানে রূপরসাদি বিষয়সমূহের মোহনীয় স্থূল মূর্ত্তিসকল নয়নগোচর হয় না, বাহ্যবস্তু ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে ঘটনাবলীর বিচিত্র সমাবেশপারম্পর্য্য দেখা যায় না, অথবা রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বসমাকুল মানবমন প্রবৃত্তির প্রেরণায় অস্থির হইয়া ভোগসুখ করায়ত্ত করিবার নিমিত্ত অপরকে পশ্চাৎপদ করিতে যেরূপ উদ্যম প্রয়োগ করে এবং বিষয়বিমুগ্ধ সংসার যাহাকে বীরত্ব ও মহত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে—সেরূপ উন্মাদ উদ্যমাদির কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। সেখানে আছে কেবল সাধকের নিজ অন্তর ও তন্মধ্যস্থ জন্মজন্মান্তরাগত অনন্ত সংস্কারপ্রবাহ। আছে কেবল, বাহ্যবস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের সংঘর্ষে আসিয়া সাধকের উচ্চভাব ও লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, এবং তদ্ভাবে মনের একতানতা আনয়ন করিবার ও তল্লক্ষ্যাভিমুখে

অগ্রসর হইবার জন্য নিজ প্রতিকূল সংস্কারসমূহের সহিত দৃঢ় সংকল্পপূর্ব্বক অনন্ত সংগ্রাম। আছে কেবল, বাহ্যবিষয়সমূহ হইতে সাধকমনের ক্রমে এককালে বিমুখ হইয়া নিজাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাওয়া, অন্তররাজ্যের গভীর গভীরতর প্রদেশসমূহে অবতীর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ভাবস্তরসমূহের উপলব্ধি করা, এবং পরিশেষে নিজাস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া যদবলম্বনে সর্ব্বভাবের এবং অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এবং যদাশ্রয়ে উহারা নিত্য অবস্থান করিতেছে, সেই 'অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় একমেবাদ্বিতীয়ং' বস্তুর উপলব্ধি ও তাহার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিতি। পরে, সংস্কার-সমূহ এককালে পরিক্ষীণ হইয়া মনের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক ধর্ম্ম চিরকালের মত যতদিন নাশ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত, যে পথাবলম্বনে সাধক-মন পূর্ব্বোক্ত অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধিতে উপস্থিত হইয়াছিল, বিলোমভাবে সেই পথ দিয়া সমাধি অবস্থা হইতে পুনরায় বহির্জগতের উপলব্ধিতে উহার উপস্থিত হওয়া। ঐরূপে সমাধি হইতে বাহ্য এবং বাহ্য হইতে সমাধি অবস্থায় সাধক-মনের গতাগতি পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস আবার, সৃষ্টির প্রাচীনতম যুগ হইতে অদ্যাবধি এমন কয়েকটী সাধকমনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, যাহাদের পূর্ব্বোক্ত সমাধি অবস্থাই যেন স্বাভাবিক অবস্থানভূমি—যেন, ইতরসাধারণ মানবের কল্যাণের জন্য কোনরূপে জোর করিয়া তাহারা কিছু কালের জন্য আপনাদিগকে সংসারের বাহ্য-ভূমিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

সাধকের কঠোর অন্তঃসংগ্রাম এবং লক্ষ্য।

অসাধারণ সাধকদিগের নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থানের স্বতঃপ্রবৃত্তি-শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ শ্রেণীভুক্ত সাধক।

সাধনেতিহাস আমরা যত অবগত হইব, ততই বুঝিব—তাঁহার মন পূর্ব্বোক্তশ্রেণীভুক্ত ছিল। তাঁহার লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনায় যদি আমাদের ঐরূপ ধারণা উপস্থিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, উহার জন্য লেখকের ত্রুটিই দায়ী। কারণ, তিনি আমাদিগকে বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন, 'ছোট ছোট এক সাধটা বাসনা জোর করিয়া রাখিয়া তদবলম্বনে মনটাকে তোদের জন্য নীচে নামাইয়া রাখি!—নতুবা উহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অখণ্ডে মিলিত ও একীভূত হইয়া, অবস্থানের দিকে।'

সমাধিকালে উপলব্ধ অখণ্ড অদ্বয় বস্তুকে প্রাচীন ঋষিগণের কেহ কেহ—সর্ব্বভাবের অভাব বা শূন্য বলিয়া, আবার কেহ কেহ—সর্ব্বভাবের সম্মিলনভূমি পূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলে কিন্তু সকলে এক কথাই বলিয়াছেন। কারণ, সকলেই উহাকে সর্ব্বভাবের উৎপত্তি এবং লয়ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ বুদ্ধ যাহাকে সর্ব্বভাবের নির্ব্বাণভূমি শূন্য বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভগবান্ শঙ্কর তাহাকেই সর্ব্বভাবের মিলনভূমি পূর্ণ বস্তু বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতামত ছাড়িয়া দিয়া উভয়ের কথা আলোচনা করিলে ঐরূপ প্রতিপন্নঃ হয়:

'শূন্য' এবং 'পূর্ণ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট বস্তু এক পদার্থ।

শূন্য বা পূর্ণ বলিয়া উপলক্ষিত অদ্বৈতভাবভূমিই উপনিষৎ ও বেদান্তে ভাবাতীত অবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ, উহাতে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের মন সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সৃজন, পালন ও নিধনাদি লীলাপ্রসূত সমগ্র ভাবভূমির সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক সমরসমগ্ন হইয়া যায়। অতএব দেখা

অদ্বৈতভাবের স্বরূপ।

যাইতেছে, সসীম মানবমন আধ্যাত্মিকরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তদাস্যাদি যে পঞ্চভাবাবলম্বনে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ হয় সে সকল হইতে অদ্বৈতভাব একটী পৃথক্ অপার্থিব বস্তু। পৃথিবীর মানুষ, ইহপরকালে প্রাপ্ত সকল প্রকার ভোগসুখে এককালে উদাসীন হইয়া পবিত্রতাবলে দেবতাগণাপেক্ষা উচ্চ পদবী লাভ করিলে তবেই ঐভাব উপলব্ধি করে এবং সমগ্র সংসার ও উহার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর যাঁহাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, উক্ত ভাবসহায়ে সেই নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষলাভে কৃতকৃতার্থ হয়।

শান্তাদি ভাবপঞ্চ এবং উহাদিগের সাধ্য বস্তু ঈশ্বর।

অদ্বৈতভাব এবং উহা দ্বারা উপলব্ধ নির্গুণব্রহ্মের কথা ছাড়িয়া দিলে আধ্যাত্মিকরাজ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররূপ পঞ্চভাব-প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের প্রত্যেকটীরই সাধ্য বস্তু ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম। অর্থাৎ সাধক মানব, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান্, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রতি ঐসকল ভাবের অন্যতমের আরোপ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হয়, এবং সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বভাবাধার ঈশ্বরও তাহার মনের ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠা দেখিয়া তাহার ভাবপরিপুষ্টির জন্য ঐ ভাবানুরূপ তনু ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বরের নানা ভাবময় চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি ধারণ এবং এমন কি, স্থূল মনুষ্যবিগ্রহে পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইয়া সাধকের অভীষ্টপূর্ণ করণের কথা শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব, অন্য সকল মানবের সহিত

যে সকল ভাব লইয়া নিত্য সম্বন্ধ থাকে, শান্ত দাস্যাদি পঞ্চভাব সেই পার্থিব ভাবসমূহেরই সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ প্রতিকৃতিস্বরূপ। দেখা যায়, সংসারে আমরা পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, সখা, সখী, প্রভু, ভৃত্য, পুত্র, কন্যা, রাজা, প্রজা, গুরু, শিষ্য প্রভৃতির সহিত এক একটা বিশেষ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকি এবং শত্রু না হইলে ইতরসকলের সহিত শ্রদ্ধাসংযুক্ত শান্ত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। ভক্ত্যাচার্য্যগণ ঐ সম্বন্ধসকলকেই শান্তাদি পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং অধিকারিভেদে উহাদিগের অন্যতমকে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কারণ, শান্তাদি পঞ্চভাবের সহিত জীব সংসারসম্বন্ধে নিত্য পরিচিত থাকায় তদবলম্বনে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সুগম হইবে। শুধু তাহাই নহে, প্রবৃত্তিমূলক ঐসকল সম্বন্ধাশ্রিত ভাবের প্রেরণায় রাগদ্বেষাদি যে সকল বৃত্তি তাহার মনে উদিত হইয়া তাহাকে সংসারে ইতিপূর্ব্বে নানা কুকর্ম্মে রত করাইতেছিল, ঈশ্বরার্পিত সম্বন্ধাশ্রয়ে সেই সকল বৃত্তি তাহার মনে উত্থিত হইলেও উহাদিগের প্রবল বেগ তাহাকে ঈশ্বরদর্শনরূপ লক্ষ্যাভিমুখেই অগ্রসর করাইয়া দিবে। যথা—সকল দুঃখের কারণস্বরূপ হৃদ্‌রোগ কাম তাহাকে ঈশ্বরদর্শন কামনায় নিযুক্ত রাখিবে, ঐ দর্শনপথের প্রতিকূল বস্তু ও ব্যক্তিসকলের উপরেই তাহার ক্রোধ প্রযুক্ত হইবে, সাধ্য বস্তু ঈশ্বরের অপূর্ব্ব প্রেম সৌন্দর্য্য সম্ভোগলোভেই সে উন্মত্ত ও মোহিত হইবে এবং ঈশ্বরের পুণ্যদর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ ব্যক্তিসকলের অপূর্ব্ব ধর্ম্মশ্রী দেখিয়া তল্লাভের জন্য সেও কাতর হইয়া উঠিবে।

শান্তাদি ভাবপঞ্চের স্বরূপ। উহারা জীবকে কিরূপে উন্নত করে।

প্রেমই ভাবসাধনার উপায় এবং ঈশ্বরের সাকার ব্যক্তিত্বই উহার অবলম্বন।

শান্তদাস্যাদি ভাবপঞ্চক ঐরূপে ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে জীব এক সময়ে বা একজনের নিকটে শিক্ষা করে নাই। যুগে যুগে নানা মহাপুরুষ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ সকল ভাবের এক দুই বা ততোধিক অবলম্বনে ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনায় নিযুক্ত হইয়া এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমে তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়া তাহাকে ঐরূপ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ঐ সকল আচার্য্যগণের অলৌকিক জীবনালোচনায় একথার স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, একমাত্র প্রেমই ভাবসাধনার মূলে অবস্থিত এবং ঈশ্বরের উচ্চাবচ কোন প্রকার সাকার ব্যক্তিত্বের উপরেই ঐ প্রেম সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইয়াছে কারণ, দেখা যায়, অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি মানব যতদিন না করিতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত সে, ঈশ্বরের কোন না কোন প্রকার সসীম সাকার ব্যক্তিত্বেরই কল্পনা ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়।

প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লোপসিদ্ধি—উহাই ভাব সকলের পরিমাপক।

প্রেমের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উহা প্রেমিকদ্বয়ের ভিতরে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমূলক ভেদোপলব্ধি ক্রমশঃ তিরোহিত করিয়া দেয়। ভাবসাধনায় নিযুক্ত সাধকের মন হইতেও উহা ক্রমে ঈশ্বরের অসীম ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তিরোহিত করিয়া তাঁহাকে তাহার ভাবানুরূপ প্রেমাস্পদমাত্র বলিয়া গণনা করিতে সর্ব্বথা নিযুক্ত করে। দেখা যায়, ঐজন্য ঐপথের সাধক প্রেমে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে আপনার জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি নানা আবদার, অনুরোধ, অভিমান, তিরস্কারাদি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সাধককে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ভুলাইয়া কেবলমাত্র তাঁহার প্রেম ও মাধুর্য্যের উপ-

লব্ধি করাইতে পূর্ব্বোক্ত ভাবপঞ্চকের মধ্যে যেটী যতদূর সক্ষম, সেটী ততদূর উচ্চভাব বলিয়া ঐপথে পরিগণিত হয়। শান্তাদি ভাবপঞ্চকের উচ্চাবচ তারতম্য নির্ণয় করিয়া মধুরভাবকে সর্ব্বোচ্চ পদবী প্রদান ভক্তাচার্য্যগণ ঐরূপেই করিয়াছেন। নতুবা উহাদিগের প্রত্যেকটীই যে, সাধককে ঈশ্বরলাভ করাইতে সক্ষম, একথা তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটীর চরম পরিপুষ্টিতে সাধক যে, আপনাকে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র তাহার প্রেমাস্পদের সুখে সুখী হইয়া থাকে এবং বিরহকালে তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া সময়ে সময়ে আপনার অস্তিত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া বসে, একথা আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রজগোপিকাগণ ঐরূপে আপনাদিগের অস্তিত্বজ্ঞান কেবলমাত্র বিস্মৃত হইতেন না কিন্তু সময়ে সময়ে আপনাদিগকে নিজ প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও উপলব্ধি করিয়া বসিতেন। জীবের কল্যাণার্থ ঈশার শরীরত্যাগ কালীন উৎকট দুঃখভোগের কথা চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া কোন কোন সাধক সাধিকার অনুরূপ অঙ্গসংস্থান হইতে রক্তনির্গমের কথা খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের ভক্তিগ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে। * অতএব বুঝা যাইতেছে—শান্তাদি ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটীর চরম পরিপুষ্টিতে সাধক প্রেমাস্পদের চিন্তায় তন্ময় হইয়া প্রেমের প্রাবল্যে তাঁহার সহিত পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হয় এবং অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য সাধক-জীবন ঐ বিষয়ে আমাদিগকে অদ্ভুত আলোক প্রদান করিয়াছে। ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি প্রত্যেক ভাবের চরম পরিপুষ্টি-তেই প্রেমাস্পদের সহিত প্রেমে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন এবং

শান্তদি ভাবের প্রত্যেকের সহায়ে চরমে অদ্বৈত ভাব উপলব্ধি বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের শিক্ষা।

* *Vide* Life of St. Francis of Assisi and St. Catharine of Sienna.

নিজাস্তিত্ব এককালে বিস্মৃত হইয়া অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, শান্ত, দাস্যাদি ভাবাবলম্বনে মানবমন কেমন করিয়া সর্ব্বভাবাতীত অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধি করিবে? কারণ, অন্ততঃ দুই ব্যক্তির উপলব্ধি ব্যতীত উহাতে কোন প্রকার ভাবের উদয়, স্থিতি ও পরিপুষ্টি কুত্রাপি দেখা যায় না।

শান্তাদি ভাবপঞ্চকের দ্বারা অদ্বৈতভাব লাভ বিষয়ে আপত্তি ও মীমাংসা।

সত্য; কিন্তু কোনও ভাব যত পরিপুষ্ট হয়, ততই উহা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া সাধকমন হইতে অপর সকল বিরোধী ভাবকে ক্রমে তিরোহিত করে। আবার যখন উহার চরম পরিপুষ্টি হয়, তখন সাধকের সমাহিত অন্তঃকরণ, ধ্যানকালে পূর্ব্বপরিদৃষ্ট 'তুমি' (সেব্য), 'আমি' (সেবক) এবং তদুভয়ের মধ্যগত দাস্যাদি সম্বন্ধ, সময়ে সময়ে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র 'তুমি'-শব্দ-নির্দ্দিষ্ট সেব্য বস্তুতে প্রেমে এক হইয়া অচলভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। ভারতের বিশিষ্ট আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, মানবমন কখনই যুগপৎ 'তুমি', 'আমি' ও তদুভয়ের মধ্যগত ভাবসম্বন্ধ উপলব্ধি করেনা। উহা একক্ষণে 'তুমি'-শব্দনির্দ্দিষ্ট বস্তুর এবং পরক্ষণে 'আমি'-শব্দাভিধেয় পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে; এবং ঐ উভয় পদার্থের মধ্যে সর্ব্বদা দ্রুত পরিভ্রমণ করিবার জন্য উহাদিগের মধ্যে একটা ভাবসম্বন্ধ তাহার বুদ্ধিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তখন মনে হয়, যেন উহা উহাদিগকে এবং উহাদিগের মধ্যগত ঐ সম্বন্ধকে যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে। পরিপুষ্ট ভাবের প্রভাবে মনের চঞ্চলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা ক্রমে পূর্ব্বোক্ত কথা ধরিতে সক্ষম হয়। ধ্যানকালে মন ঐরূপে যত বৃত্তিহীন হয় ততই সে ক্রমে বুঝিতে পারে যে,

এক অদ্বয় পদার্থকে দুই দিক হইতে দুই ভাবে দেখিয়া 'তুমি' ও 'আমি'রূপ দুই পদার্থের কল্পনা করিয়া আসিয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবসাধনার প্রাবল্যনির্দ্দেশ।

শান্ত-দাস্যাদি ভাবের প্রত্যেকটী পূর্ণ-পরিপুষ্ট হইয়া মানব-মনকে পূর্ব্বোক্তরূপে অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধি করাইতে কত সাধকের কতকালব্যাপী চেষ্টার যে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শাস্ত্ররূপ আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে বুঝা যায়, এক এক যুগে ঐ সকল ভাবের এক একটী, মানবমনের উপাসনার প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল এবং উহা দ্বারাই ঐ যুগের বিশিষ্ট সাধককুল ঈশ্বরের, ও তাঁহাদিগের মধ্যে বিরল কেহ কেহ, অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেখা যায়, বৈদিক ও বৌদ্ধযুগে প্রধানতঃ শান্তভাবের, ঔপনিষদিক যুগে শান্তভাবের চরম পরিপুষ্টিতে অদ্বৈতভাবের এবং দাস্য ও ঈশ্বরের পিতৃভাবের, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে শান্ত ও নিষ্কামকর্ম্ম-সংযুক্ত দাস্যভাবের, তান্ত্রিকযুগে ঈশ্বরের মাতৃভাব ও মধুরভাব-সম্বন্ধের কিয়দংশের এবং বৈষ্ণবযুগে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-ভাবের চরম পরিস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল।

শান্তাদি ভাবপঞ্চের পূর্ণ পরিপুষ্টিবিষয়ে ভারত এবং ভারতেতর দেশে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ঐরূপে অদ্বৈতভাবের সহিত শান্তাদি পঞ্চভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইলেও, ভারতেতর দেশীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়সকলে কেবলমাত্র শান্ত, দাস্য ও ঈশ্বরের পিতৃভাব-সম্বন্ধেরই প্রকাশ দেখা যায়। য়াহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়সকলে রাজর্ষি সোলেমানের সখ্য ও মধুরভাবাত্মক গীতাবলী প্রচলিত থাকিলেও, উহারা ঐ সকলের ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া ভিন্নার্থ কল্পনা করিয়া

থাকে। মুসলমানধর্ম্মের স্থফি সম্প্রদায়ের ভিতর সখ্য ও মধুর ভাবের অনেকটা প্রচলন থাকিলেও, মুসলমান জনসাধারণ ঐরূপে ঈশ্বরোপাসনা কোরাণবিরোধী বলিয়া বিবেচনা করে। আবার ক্যাথলিক্ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশামাতা মেরির প্রতিমা-বলম্বনে জগন্মাতৃত্বের পূজা প্রকারান্তরে প্রচলিত থাকিলেও, উহা ঈশ্বরের মাতৃভাবের সহিত প্রকাশ্যরূপে সংযুক্ত না থাকায়, ভারতে প্রচলিত জগজ্জননীর পূজার ন্যায় ফলদ হইয়া সাধককে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি করাইতে ও রমণীমাত্রে ঈশ্বরীয় বিকাশ প্রত্যক্ষ করাইতে সক্ষম হয় নাই। মাতৃভাবের ঐ প্রবাহ ফল্গু নদীর ন্যায় অর্দ্ধপথে অন্তর্হিত হইয়াছে।

সাধকের ভাবের গভীরত্ব যাহা দেখিয়া বুঝা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কোন প্রকার ভাবসম্বন্ধাবলম্বনে সাধক-মন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইলে উহা ক্রমে ঐ ভাবে তন্ময় হইয়া বাহ্য জগৎ হইতে বিমুখ হয় এবং আপনাতে আপনি ডুবিয়া যায়। ঐরূপে মগ্ন হইবার কালে মনের পূর্ব্বসংস্কারসমূহ ঐ পথে বাধা-প্রদান করিয়া, তাহাকে ভাসাইয়া পুনরায় বহির্ম্মুখ করিয়া তুলি-বার চেষ্টা করে। ঐজন্য প্রবল পূর্ব্বসংস্কারবিশিষ্ট সাধারণ মানবমনের একটীমাত্র ভাবে তন্ময় হওয়াও অনেক সময় এক জীবনের চেষ্টাতে হইয়া উঠে না। ঐরূপ স্থলে সে প্রথমে নিরুৎ-সাহ, পরে হতোদ্যম এবং তৎপরে সাধ্যবস্তুতে বিশ্বাস হারাইয়া, বাহ্যজগতের রূপরসাদি ভোগকেই সার ভাবিয়া বসে ও তল্লাভে পুনরায় ধাবিত হয়। অতএব বাহ্যবিষয়বিমুখতা, প্রেমাস্পদের ধ্যানে তন্ময়ত্ব এবং ভাবপ্রসূত উল্লাসই সাধকের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার একমাত্র পরিমাপক বলিয়া ভাবাধিকারে পরিগণিত হইয়াছে।

কোন এক ভাবে তন্ময়ত্বলাভে অগ্রসর হইয়া যিনি কখন অন্তর্নিহিত পূর্ব্বসংস্কারসমূহের প্রবল বাধা উপলব্ধি করেন নাই, সাধকমনের অন্তঃসংগ্রামের কথা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন না। যিনি উহা করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন—কত দুঃখে মানবজীবনে ভাবতন্ময়ত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্বল্পকালে একের পর এক করিয়া সকল প্রকার ভাবে অদৃষ্টপূর্ব্ব তন্ময়ত্ব লাভ করিতে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ভাবিবেন, ঐরূপ হওয়া মনুষ্যশক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে।

ঠাকুরকে সর্ব্বভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিয়া যাহা মনে হয়।

ভাববরাজ্যের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল সাধারণ মানবমন বুঝিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়াই কি অবতারপ্রথিত ধর্ম্মবীরদিগের সাধনেতিহাস সম্যক্ লিপিবদ্ধ হয় নাই? কারণ, তৎপাঠে দেখা যায়, তাঁহাদিগের সাধনপথে প্রবেশকালে বিষয়বৈরাগ্য ও তত্ত্যাগের কথা এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া বিষয়বিমুগ্ধ মনের কল্যাণের জন্য যে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই কথারই সবিস্তার আলোচনা বিদ্যমান। দেখা যায়, অন্তরের পূর্ব্বসংস্কারসমূহকে বিধ্বস্ত ও সমূলে উৎপাটিত করিয়া আপনার উপর সম্যক্ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য তাঁহারা সাধনকালে যে অপূর্ব্ব অন্তঃসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার আভাসমাত্রই কেবল উহাতে আলোচিত হইয়াছে। অথবা রূপক এবং অতিরঞ্জিত বাক্যসহায়ে ঐ সংগ্রামের কথা এমনভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তদ্বিবরণের মধ্য হইতে সত্য বাহির করিয়া লওয়াআমাদিগের পক্ষে এখন সুকঠিন হইয়াছে। কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন।

ধর্ম্মবীরগণের সাধনেতিহাস লিপিবদ্ধ না থাকা সম্বন্ধে আলোচনা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোককল্যাণসাধনোদ্দেশে বিশেষ বিশেষ শক্তিলাভের জন্য অনেক সময় তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, একথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে তিনি কিছুকাল জল বা পবনাহারপূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন ইত্যাদি কথা ভিন্ন তাঁহার অন্তরের ভাবপরম্পরার বিবরণ পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐ কথা।

ভগবান্ বুদ্ধের সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া অভিনিষ্ক্রমণ ও পরে ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের যতদূর বিশদেতিহাস পাওয়া যায়, তাঁহার সাধনেতিহাস ততদূর পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য ধর্ম্মবীরগণের ভাবেতিহাসের যেমন কিছুই পাওয়া যায় না, তাঁহার সম্বন্ধে তদ্রূপ না হইয়া ঐ বিষয়ের অল্প স্বল্প কিছু পাওয়া গিয়া থাকে। দেখা যায়—সিদ্ধিলাভে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আহার সংযম করিয়া তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর একাসনে ধ্যান-তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং অন্তঃপবন নিরোধপূর্ব্বক, 'আস্ফানক' নামক ধ্যানাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ কালে অন্তর্নিহিত পূর্ব্বসংস্কারসমূহের সহিত তাঁহার সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ করিবার সময় স্থূল বাহ্য ঘটনার সহায়তা লইয়া গ্রন্থকার 'মারের' সহিত তাঁহার সংগ্রামকাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে ঐ কথা।

ভগবান্ ঈশার সাধনেতিহাসের কোন কথাই একপ্রকার লিপিবদ্ধ নাই। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের কয়েকটী ঘটনামাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই গ্রন্থকার, ত্রিংশ বৎসরে জন্ নামক সিদ্ধ সাধুর নিকট হইতে তাঁহার অভিষেক গ্রহণপূর্ব্বক বিজন মরুপ্রদেশে একাকী প্রবিষ্ট হইয়া চল্লিশদিনব্যাপী ধ্যান-তপস্যার কথার এবং ঐ মরুপ্রদেশে 'শয়তান' কর্ত্তৃক প্রলোভিত

হইয়া জয়লাভপূর্ব্বক তাঁহার তথা হইতে প্রত্যাগমন ও লোক-কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইবার কথার অবতারণা করিয়াছেন। উহার পরে তিনি তিন বৎসর মাত্র স্থূল শরীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ হইতে ত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যে কি ভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদই নাই।

ঈশার সম্বন্ধে ঐ কথা।

ভগবান্ শঙ্করের জীবনে ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য অনেকটা পাওয়া যাইলেও তাঁহার অন্তরের ভাবেতিহাস অনেক স্থলে অনুমান করিয়া লইতে হয়।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের সাধনেতিহাসের অনেক কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া যাইলেও, তাঁহার কামগন্ধহীন উচ্চ ঈশ্বরপ্রেমের কথা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিহারাদি অবলম্বনে রূপকচ্ছলে বর্ণিত হওয়ায়, মানবসাধারণে উহা অনেক সময় যথাযথভাবে বুঝিতে পারে না। একথা কিন্তু অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ধর্ম্মবীর শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার প্রধান প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গেরা সখ্য, বাৎসল্য এবং বিশেষতঃ মধুর ভাবের আরম্ভ হইতে প্রায় চরম পরিস্ফূর্ত্তি পর্য্যন্ত সাধক-মনে যে যে অবস্থা ক্রমশঃ উপস্থিত হইয়া থাকে, সে সকল, রূপকের ভাষায় যতদূর বলিতে পারা যায়, ততদূর অতি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐরূপ হইলেও কিন্তু ঐ ভাবত্রয়ের প্রত্যেকটীর সর্ব্বোচ্চ তন্ময়াবস্থায় সাধকমন যে, প্রেমাস্পদের সহিত একত্ব অনুভব-পূর্ব্বক অদ্বয় বস্তুতে লীন হইয়া থাকে—এই চরম তত্ত্বটী তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনেতিহাস বর্ত্তমান যুগে আমাদিগকে ঐ

শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে ঐ কথা এবং মধুর ভাবের চরম তত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

চরম তত্ত্ব বিশদভাবে শিক্ষা দিয়া জগতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্ম্মভাব যে, সাধকমনকে একই লক্ষ্যে আনয়ন করিয়া থাকে, এবিষয় সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম করিয়াছে। তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষিতব্য অন্য সকল কথা গণনায় না আনিলেও, তাঁহার কৃপায় কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যে প্রসারতা এবং সমন্বয়াভাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য সমগ্র সংসার তাঁহার নিকট চিরকালের জন্য নিঃসংশয় ঋণী হইয়াছে।

মধুরভাব ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মধুরভাবই শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আধ্যাত্মিক জগতে প্রধান দান। তাঁহারা পথ প্রদর্শন না করিলে, কখনই উহা ঈশ্বরলাভের জন্য এত লোকের অবলম্বনীয় হইয়া তাহাদিগকে শান্তি ও বিমলানন্দের অধিকারী করিত না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বৃন্দাবনলীলা যে নিরর্থক অনুষ্ঠিত হয় নাই, একথা তাঁহারাই প্রথমে বুঝিয়া অপরকে বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভ্যুদয় না হইলে, শ্রীবৃন্দাবন সামান্য বনমাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত।

বৃন্দাবনলীলার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংসা।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাহ্য ঘটনাবলীমাত্র লিপিবদ্ধ করিতে যত্নশীল বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ বলিবেন, কিন্তু বৃন্দাবনলীলা তোমরা যেরূপ বলিতেছ, সেরূপ বাস্তবিক যে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; অতএব তোমাদের এতটা হাসি কান্না, ভাব মহাভাব সব যে শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে! বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তদুত্তরে বলিতে পারেন, পুরাণদৃষ্টে আমরা যেরূপ বলিতেছি, উহা যে তদ্রূপ হয় নাই, তদ্বিষয়ে তুমিই বা এমন কি

নিঃসংশয় প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার? তোমার ইতিহাস সেই বহু প্রাচীন যুগের দ্বার নিঃসংশয় উদ্ঘাটিত করিয়াছে, এ বিষয়ে যত দিন না প্রমাণ পাইব, ততদিন আমরা বলিব, তোমার সন্দেহই শূন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এক কথা, যদিই কখন তুমি ঐরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার, তাহা হইলেও আমাদের বিশ্বাসের এমন কি হানি হইবে? নিত্য-বৃন্দাবনে শ্রীভগবানের নিত্য লীলাকে উহা কিছুমাত্র স্পর্শ করিবে না। ভাবরাজ্যে ঐ রহস্যলীলা চিরকাল সমান সত্য থাকিবে। চিন্ময় ধামে চিন্ময় রাধাশ্যামের ঐরূপ অপূর্ব্ব প্রেমলীলা যদি দেখিতে চাও, তবে প্রথমে কায়মনোবাক্যে কামগন্ধহীন হও এবং শ্রীমতীর সখীদিগের অন্যতমের পদানুগ হইয়া নিঃস্বার্থ সেবা করিতে শিক্ষা কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার হৃদয়ে শ্রীহরির লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন চির-প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তোমাকে লইয়া ঐরূপ লীলার নিত্য অভিনয় হইতেছে।

বৃন্দাবনলীলার বুঝিতে হইলে ভাবেতিহাস বুঝিতে হইবে—এবিষয়ে ঠাকুর যাহা বলিতেন।

ভাবরাজ্যকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া যিনি বাহ্যঘটনারূপ আলম্বন ভুলিতে এবং শুদ্ধ ভাবেতিহাসের আলোচনা করিতে শিখেন নাই, তিনি শ্রীবৃন্দাবনলীলার সত্যতা ও মাধুর্য্যের উপভোগে কখন সক্ষম হইবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ লীলার কথা সোৎসাহে বলিতে বলিতে যখন দেখিতেন, উহা তাঁহার সমীপাগত ইংরাজী-শিক্ষিত নব্যযুবকদলের রুচিকর হইতেছে না, তখন বলিতেন, "তোরা ঐ লীলার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টান-টুকুই শুধু দেখ্‌না, ধর্‌না—ঈশ্বরে মনের ঐরূপ টান হ'লে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। দেখ্ দেখি, গোপীরা স্বামীপুত্র, কুল শীল, মান অপমান, লজ্জা ঘৃণা, লোক-ভয় সমাজ-ভয়—সব ছেড়ে

শ্রীগোবিন্দের জন্য কতদূর উন্মত্তা হয়ে উঠেছিল!—ঐরূপ করতে পারলে, তবে ভগবান্ লাভ হয়।” আবার বলিতেন,—“কামগন্ধহীন না হ’লে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না। সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেই গোপীদের মনে কোটী কোটী রমণসুখের অধিক আনন্দ হ’ত, দেহবুদ্ধি হারিয়ে যেত—তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাদের মনে উদয় হ’তে পারে রে! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হ’তে দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হয়ে তাদের শরীরকে স্পর্শ ক’রে, প্রতি রোমকূপে যে তাদের রমণসুখের অধিক আনন্দ অনুভব করাইত!”

স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে ঠাকুরের নিকট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার ঐতিহাসিকত্ব-সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে বলেন, “আচ্ছা, ধরিলাম যেন শ্রীমতী রাধিকা বলিয়া কেহ কখন ছিলেন না—কোন প্রেমিক সাধক রাধাচরিত্র কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত চরিত্র কল্পনাকালে ঐ সাধককে শ্রীরাধার ভাবে এককালে তন্ময় হইতে হইয়াছিল, একথা ত মানিস্? তাহা হইলে উক্ত সাধকই যে, ঐকালে আপনাকে ভুলিয়া রাধা হইয়াছিল, এবং বৃন্দাবনলীলার অভিনয় যে ঐরূপে স্থূলভাবেও হইয়াছিল, একথা প্রমাণিত হয়।”

বাস্তবিক, শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের প্রেমলীলাসম্বন্ধে শত সহস্র আপত্তি উত্থাপিত হইলেও শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা প্রথমাবিষ্কৃত এবং তাঁহাদিগের শুদ্ধ পবিত্র জীবনাবলম্বনে প্রকাশিত মধুরভাবসম্বন্ধ চিরকালই সত্য থাকিবে—চিরকালই ঐ বিষয়ের অধিকারী সাধক আপনাকে স্ত্রী ভাবিয়া এবং শ্রীভগবান্‌কে নিজ পতিস্বরূপে দেখিয়া, তাঁহার পুণ্যদর্শনলাভে

ধন্য হইবে, এবং ঐ ভাবের চরম পরিপুষ্টিতে শুদ্ধাদ্বয় ব্রহ্ম-স্বরূপেও প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইলেও, পুংশরীরধারী-দিগের নিকট উহা অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব একথা সহজে মনে উদিত হয় যে, ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব এরূপ বিসদৃশ সাধনপথ কেন লোকে প্রবর্ত্তিত করিলেন। তদুত্তরে বলিতে হয় যে, যুগাবতারগণের সকল কার্য্য লোককল্যাণের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধনপথের প্রবর্ত্তনও ঐজন্যই হইয়াছিল। সাধকগণ তৎকালে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেরূপ আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য বহুকাল হইতে ব্যগ্র হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদিগকে মধুরভাবরূপ পথে অগ্রসর করিয়াছিলেন। নতুবা ঈশ্বরাবতার নিত্যমুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজ কল্যাণের নিমিত্ত যে, ঐ ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়া উহার পূর্ণাদর্শ জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "হাতীর বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে আক্রমণের জন্য এবং ভিতরের দাঁত খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া নিজ শরীর পোষণের জন্য থাকে, তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে দুইপ্রকার ভাবের প্রকাশ ছিল। বাহিরের মধুরভাবসহায়ে তিনি লোক-কল্যাণ সাধন করিতেন এবং অন্তরের অদ্বৈতভাবে প্রেমের চরম পরিপুষ্টিতে ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং ভূমানন্দ অনুভব করিতেন।"

শ্রীচৈতন্যের পুরুষ-জাতিকে মধুরভাব-সাধনে প্রবৃত্ত করিবার কারণ।

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, বৌদ্ধযুগের অবসানকালে দেশে বজ্রা-চার্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন—

নির্ব্বাণপ্রয়াসী মানবমন বাসনাসমূহের হস্ত হইতে মুক্তপ্রায় হইয়া ধ্যানসহায়ে যখন মহাশূন্যে লীন হইতে অগ্রসর হয়, তখন 'নিরাত্মা' নামক দেবী তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে ঐরূপ হইতে না দিয়া নিজাঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখেন, এবং তখন সাধকের শরীররূপ স্থূল ভোগায়তন না থাকিলেও, সূক্ষ্মশরীর বিশিষ্ট তাহাকে ইন্দ্রিয়জ সর্ব্ব ভোগসুখের সারসমষ্টি নিত্য উপভোগ করাইয়া থাকেন। স্থূলবিষয়ভোগত্যাগে ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম নিরবচ্ছিন্ন ভোগসুখপ্রাপ্তিরূপ তাঁহাদিগের প্রচারিত মত, কালে বিকৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন স্থূল ভোগসুখপ্রাপ্তিকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য করিয়া তুলিবে এবং দেশে ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ ঐ সকল বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়া নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। উচ্চবর্ণদিগের অধিকাংশের মধ্যে তন্ত্রোক্ত বামাচার বিকৃত হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার সকাম পূজা ও উপাসনা দ্বারা অসাধারণ বিভূতি ও ভোগসুখলাভরূপ মতের প্রচলন হইয়াছিল। আবার, এই কালের যথার্থ সাধককুল আধ্যাত্মিক রাজ্যে ভাবসহায়ে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভে প্রয়াসী হইয়া পথের সন্ধান পাইতেছিলেন না। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া অদ্ভুত ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ ঐ সকল সাধকদিগের সম্মুখে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে, শুদ্ধ পবিত্র হইয়া আপনাকে প্রকৃতি ভাবিয়া, ঈশ্বরকে পতিরূপে ভজনা করিলে জীব যে, সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন দিব্যানন্দলাভে সত্য সত্য সমর্থ হয়, তাহা তাহাদিগকে দেখাইয়া গেলেন, এবং স্থূলদৃষ্টি-সম্পন্ন সাধারণ জনগণের নিকটে ঈশ্বরের নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া

তৎকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও শ্রীচৈতন্য কিরূপে উহাকে উন্নীত করেন।

তাহাদিগকে নাম জপ ও উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে নিযুক্ত করিলেন। ঐরূপে পথভ্রষ্ট লক্ষ্যবিচ্যুত বহুল বিকৃতবৌদ্ধসম্প্রদায়সকল তাঁহার কৃপায় পুনরায় আধ্যাত্মিক পথে উন্নীত হইয়াছিল। বিকৃত বামাচার-অনুষ্ঠানকারীর দলসকল প্রথম প্রথম প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও, পরে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব জীবনাদর্শের অদ্ভুত আকর্ষণে ত্যাগশীল হইয়া, নিষ্কামভাবে পূজা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া সেইজন্য কোন কোন গ্রন্থকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, তিনি অবতীর্ণ হইবার কালে শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়সকলও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।*

মধুরভাবের স্থূল কথা।

সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ—এবং জগতের স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ ও জীবগণের প্রত্যেকেই তাঁহার মহাভাবময়ী প্রকৃতির অংশ-সম্ভূত—অতএব, তাঁহার স্ত্রী। সেজন্য শুদ্ধ পবিত্র হইয়া জীব তাঁহাকে পতিরূপে সর্ব্বান্তঃকরণে ভজনা করিলে, তাঁহার কৃপায় তাহার গতি, মুক্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রাপ্তি হয়—ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকর্ত্তৃক প্রচারিত মধুরভাবের স্থূল কথা। মহাভাবে সর্ব্বভাবের একত্র সমাবেশ। প্রধানা গোপী শ্রীরাধা সেই মহাভাবস্বরূপিণী এবং অন্য গোপিকাগণের প্রত্যেকে মহাভাবান্তর্গত অন্তর্ভাবসকলের এক দুই বা ততোধিক ভাবস্বরূপিণী। সুতরাং ব্রজগোপিকাগণের ভাবানুকরণে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সাধক ঐ সকল অন্তর্ভাব নিজায়ত্ত করিতে সমর্থ হয় এবং পরিশেষে মহাভাবোত্থ মহানন্দের আভাস প্রাপ্ত হইয়া

* চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ দেখ।

ধন্য হইয়া থাকে। ঐরূপে মহাভাবস্বরূপিণী* শ্রীরাধিকার ভাবানুধ্যানে নিজ সুখবাঞ্ছা এককালে পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখে সুখী হওয়াই এই পথে সাধকের চরম লক্ষ্য।

স্বাধীনা নায়িকার সর্ব্বগ্রাসী প্রেম ঈশ্বরে আরোপ করিতে হইবে।

সামাজিক বিধানে বিবাহিত নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি প্রেম—জাতি, কুল, শীল, লোকভয়, সমাজভয় প্রভৃতি নানা বাহ্য বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হইয়া প্রবাহিত হয়। ঐরূপ নায়ক নায়িকা ঐ প্রকার নিয়মসকলের সীমার ভিতরে অবস্থানপূর্ব্বক নানা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, পরস্পরের সুখসম্পাদনে যথাসম্ভব ত্যাগস্বীকার করিয়া থাকে। বিবাহিতা নায়িকা সামাজিক কঠোর নিয়মবন্ধনসকল যথাযথ পালন করিতে যাইয়া অনেক সময় নায়কের প্রতি নিজ প্রেমসম্বন্ধ ভুলিতে বা হ্রস্ব করিতে সঙ্কুচিতা হয় না। স্বাধীনা নায়িকার প্রেমের আচরণ কিন্তু অন্যরূপ। প্রেমের প্রাবল্যে ঐরূপ নায়িকা অনেক সময় ঐ সকল নিয়মবন্ধনকে পদদলিত করিতে এবং সমাজপ্রদত্ত নিজ সামাজিক অধিকারের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নায়কের সহিত সংযুক্তা হইতে কুণ্ঠিতা হয় না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐরূপ সর্ব্বগ্রাসী প্রেমসম্বন্ধ

* কৃষ্ণস্য সুখে পীড়শঙ্কয়া নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র স রূঢ়ো মহাভাবঃ। কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি, সমস্তবৃশ্চিকসর্পাদিদংশকৃতদুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি, এবম্ভূতে কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যতো ভবতঃ সঃ অধিরূঢ়ঃ মহাভাবঃ। অধিরূঢ়স্যৈব মোদন মাদন ইতি দ্বৌ রূপৌ ভবতঃ। ইত্যাদি—

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভক্তিগ্রন্থাবলী।

ঈশ্বরে আরোপ করিতে সাধককে উপদেশ করিয়াছেন, এবং বৃন্দাবনাধীশ্বরী শ্রীরাধা সেজন্যই আয়ান ঘোষের বিবাহিতা পত্নী হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বস্বত্যাগিনী বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন।

মধুরভাব অন্য সকল ভাবের সমষ্টি ও অধিক।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মধুরভাবকে শান্তাদি অন্য চারি প্রকার ভাবের সারসমষ্টি এবং ততোধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ, প্রেমিকা নায়িকা ক্রীত-দাসীর ন্যায় প্রিয়ের সেবা করেন, সখীর ন্যায় সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাকে সুপরামর্শ দানপূর্ব্বক তাঁহার আনন্দে উল্লসিতা ও দুঃখে সমবেদনাযুক্তা হয়েন, মাতার ন্যায় সতত তাঁহার শরীর-মনের পোষণে এবং কল্যাণকামনায় নিযুক্তা থাকেন এবং ঐরূপে সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে ভুলিয়া প্রিয়ের কল্যাণসাধন ও চিত্ত-বিনোদনপূর্ব্বক তাঁহার মন অপূর্ব্ব শান্তিতে আপ্লুত করিয়া থাকেন। যে নায়িকা ঐরূপে প্রেমপ্রভাবে আত্মবিস্মৃতা হইয়া প্রিয়ের কল্যাণ ও সুখের দিকে সর্ব্বতোভাবে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকেন, তাঁহার প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সমর্থা প্রেমিকা বলিয়া ভক্তিগ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। স্বার্থগন্ধদুষ্ট অন্য সকল প্রকার প্রেম সমঞ্জসা ও সাধারণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সমঞ্জসা শ্রেণীভুক্তা নায়িকা প্রিয়ের সুখের ন্যায় আত্মসুখের দিকেও সমভাবে লক্ষ্য রাখে এবং সাধারণী শ্রেণীভুক্তা নায়িকা কেবলমাত্র আত্মসুখের জন্য নায়ককে প্রিয় জ্ঞান করে।

শ্রীচৈতন্য মধুরভাব-সহায়ে কিরূপে লোক-কল্যাণ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, কঠোর ত্যাগের আদেশে সাধকগণকে জীবন নিয়মিত করিতে এবং প্রেমে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার স্থলে দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষাপ্রদান করিয়া ও নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেব তৎকালে দেশের ব্যভিচারনিবারণে ও কল্যাণসাধনে প্রয়াসী

হইয়াছিলেন। ফলেও তৎকালে তদীয় ভাব ও উপদেশ পথ-ভ্রষ্টকে পথ দেখাইয়া, সমাজচ্যুতদিগকে নবীন সমাজবন্ধনে আনিয়া, জাতিবহির্ভূতদিগকে ভগবদ্ভক্তরূপ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের গোচরে ত্যাগবৈরাগ্যের পবিত্র উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া, অশেষ লোককল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে—সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রণয় ও মিলনসম্ভূত 'অষ্ট সাত্ত্বিকবিকার' * নামক মানসিক ও শারীরিক বিকারসমূহ শ্রীশ্রীজগৎস্বামীর তীব্র ধ্যানানুচিন্তনে পবিত্রচেতা সাধকের সত্যসত্যই উপস্থিত হইয়া থাকে, একথা নিঃসংশয় প্রমাণিত করিয়া ভগবান্ শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত মধুরভাব তৎকালে অলঙ্কার শাস্ত্রকে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসকলের অঙ্গীভূত করিয়াছিল, কুকাব্য-সকলকে উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে রঞ্জিত করিয়া সাধকমনের উপভোগ্য ও উন্নতিবিধায়ক করিয়াছিল, এবং শান্তভাবানুষ্ঠানে অবশ্য-পরিহর্ত্তব্য কামক্রোধাদি ইতর ভাবসমূহ, শ্রীভগবান্‌কে আপনার করিয়া লইয়া তন্নিমিত্ত এবং তাঁহারই উপর সাধককে প্রয়োগ করিতে শিখাইয়া তাহার সাধনপথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

বেদান্তবিৎ মধুরভাব-সাধনকে যে ভাবে সাধকের কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করেন।

পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান যুগের নব্য সম্প্রদায়ের চক্ষে মধুরভাব, পুংশরীরধারীদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইলেও, বেদান্তবাদীর নিকটে উহার সমুচিত মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে বিলম্ব হয় না। তিনি দেখেন,

* যে চিত্তং তমুঞ্চ ক্ষোভয়ন্তি তে সাত্ত্বিকাঃ। তে অষ্টৌ স্তম্ভ স্বেদঃ রোমাঞ্চ-স্বরভেদ-বেপথু-বৈবর্ণ্যাশ্রুপ্রলয়াঃ ইতি। তে ধূমায়িতা জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তা সুদীপ্তা ইতি পঞ্চবিধা যথোত্তরসুখদাঃ স্যুঃ।—আকরগ্রন্থ।

ভাবসমূহই বহুকালাভ্যাসে মানব-মনে দৃঢ়সংস্কাররূপে পরিণত হয় এবং জন্মজন্মাগত ঐরূপ সংস্কারের জন্যই মানব এক অদ্বয় ব্রহ্ম-বস্তুর স্থলে এই বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাইয়া থাকে। ঈশ্বরানুগ্রহে এই মুহূর্ত্তে যদি সে জগৎ নাই বলিয়া ঠিক্ ঠিক্ ভাবনা করিতে পারে, তবে তদ্দণ্ডেই উহা তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সম্মুখ হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইবে। জগৎ আছে, ভাবে বলিয়াই মানবের নিকট জগৎ বর্ত্তমান। আমি পুরুষ বলিয়া আপনাকে ভাবি বলিয়াই পুরুষভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি এবং অন্যে স্ত্রী বলিয়া ভাবে বলিয়াই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। আবার, মানবহৃদয়ে এক ভাব প্রবল হইয়া অপর সকল বিপরীত ভাবকে যে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে বিনষ্ট করে, ইহাও নিত্যপরিদৃষ্ট। অতএব ঈশ্বরের প্রতি মধুরভাবসম্বন্ধের আরোপ করিয়া উহার প্রাবল্যে সাধকের নিজ মনের অন্য সকল ভাবকে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে উৎসাদিত করিবার চেষ্টাকে বেদান্তবিৎ অন্য কণ্টকের সাহায্যে পদবিদ্ধ কণ্টকের অপনয়নের চেষ্টার ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকেন। মানবমনের অন্য সকল সংস্কারের অবলম্বনস্বরূপ 'আমি দেহী' বলিয়া বোধ এবং তদ্দেহসংযোগে 'আমি পুরুষ বা স্ত্রী' বলিয়া সংস্কারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। শ্রীভগবানে পতি-ভাবারোপ করিয়া 'আমি স্ত্রী' বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে সাধক পুরুষ আপনার পুংস্ত্ব ভুলিতে সক্ষম হইলে, তিনি যে উহার পরে 'আমি স্ত্রী' এ ভাবকেও অতি সহজে নিক্ষেপ করিয়া ভাবাতীত অবস্থায় উপনীত হইবেন, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব মধুরভাবে সিদ্ধ হইলে সাধক যে, ভাবাতীত ভূমির অতি নিকটেই উপস্থিত হইবেন বেদান্তবাদী দার্শনিকের চক্ষে ইহাই সর্ব্বথা প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি রাধাভাব প্রাপ্ত হওয়াই সাধকের

চরম লক্ষ্য ? উত্তরে বলিতে হয়, বৈষ্ণব গোস্বামিগণ বর্ত্তমানে উহা অস্বীকারপূর্ব্বক সখীভাবপ্রাপ্তিই সাধ্য এবং মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার ভাবলাভ সাধকের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া প্রচার করিলেও, উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, দেখা যায়, সখীদিগের ও শ্রীমতীর ভাবের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান নাই, কেবলমাত্র পরিমাণ-গত পার্থক্যই বর্ত্তমান। দেখা যায়, শ্রীমতীর ন্যায় সখীগণও সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজনা করিতেন এবং শ্রীরাধার সহিত সম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ দেখিয়া, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্যই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনসম্পাদনে সর্ব্বদা যত্নবতী। আবার দেখা যায়, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের প্রত্যেকে মধুরভাব-পরিপুষ্টির জন্য পৃথক্ পৃথক্ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সেবায় শ্রীবৃন্দাবনে জীবন অতিবাহিত করিলেও, তৎসঙ্গে শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিবার প্রয়াস পান নাই—আপনাদিগকে রাধাস্থানীয় ভাবিতেন বলিয়াই যে, তাঁহারা ঐরূপ করেন নাই, একথাই উহাতে অনুমিত হয়।

শ্রীমতীর ভাব প্রাপ্ত হওয়াই মধুরভাব সাধনের চরম লক্ষ্য।

বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাবের যাঁহারা বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবাদি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থসমূহের এবং শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-প্রমুখ বৈষ্ণব কবিকুলের পূর্ব্বরাগ, দান, মান ও মাথুর-সম্বন্ধীয় পদাবলী-সকলের আলোচনা করিবেন। মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর উহাতে কি অপূর্ব্ব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে সুগম হইবে বলিয়াই আমরা উহার সারাংশের এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ঠাকুরের মধুরভাব সাধন.

ঠাকুরের শুদ্ধ একাগ্রমনে যখন যে কোন ভাবের উদয় হইত, তাহাতেই তখন তিনি তন্ময় হইয়া কিছুকাল অবস্থান করিতেন। ঐ ভাব তখন তাঁহার মনে পূর্ণাধিকার স্থাপন-পূর্ব্বক অন্য সকল ভাবের লোপ করিয়া দিত এবং তাঁহার শরীরকে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহার প্রকাশানুরূপ পূর্ণাবয়ব যন্ত্র-স্বরূপ করিয়া তুলিত। ঠাকুরের জীবনালোচনা করিলে, বাল্য-কাল হইতে তাঁহার মনের ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিবার কালে তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় আমরা নিত্য পাইতাম। দেখিতাম, সঙ্গীতাদি শ্রবণে বা অন্য কোন উপায়ে তাঁহার মন ভাববিশেষে মগ্ন হইবার কালে যদি কেহ সহসা অন্য ভাবের সঙ্গীত বা কথা আরম্ভ করিত, তাহা হইলে তিনি মনে বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। লক্ষ্যে প্রবাহিত চিত্তবৃত্তিসকলের সহসা গতিরোধ হওয়াতেই যে

বাল্যকাল হইতে ঠাকুরের মনের ভাবতন্ময়তার আচরণ।

তাঁহার ঐরূপ কষ্ট উপস্থিত হইত, একথা বলা বাহুল্য। মহামুনি পতঞ্জলি, এক ভাবে তরঙ্গিত চিত্তবৃত্তিযুক্ত মনকে সবিকল্পক সমাধিস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং ভক্তিগ্রন্থসকলে ঐ সমাধি ভাব-সমাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঠাকুরের মন ঐরূপ সমাধিতে অবস্থান করিতে আজীবন সমর্থ ছিল।

সাধনায় প্রবর্ত্তিত হইবার কাল হইতে তাঁহার মনের পূর্ব্বোক্ত স্বভাব এক অপূর্ব্ব বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। কারণ, দেখা যায়,—ঐকালে তাঁহার মন পূর্ব্বের ন্যায় কোন ভাবে কিছুক্ষণ-মাত্র অবস্থান করিয়াই অন্য ভাববিশেষ অবলম্বন করিতেছে না; কিন্তু কোন এক ভাবে আবিষ্ট হইলে, যতক্ষণ না ঐ ভাবের চরম সীমায় উপনীত হইয়া অদ্বৈতভাবের আভাস পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করিতেছে। উক্ত বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, দাস্যভাবের চরম সীমায় উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি মাতৃভাবোপলব্ধি করিতে অগ্রসর হন নাই; আবার, তন্ত্রোপদিষ্ট মাতৃভাবসাধনায় চরমোপলব্ধি না করিয়া বাৎসল্যাদি ভাব সাধনে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার সাধনকালের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে ঐরূপ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়।

সাধনকালে তাঁহার মনের উক্ত স্বভাবের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়।

ব্রাহ্মণীর আগমনকালে ঠাকুরের মন ঈশ্বরের মাতৃভাবের অনুধ্যানে পূর্ণ ছিল। জগতের যাবতীয় প্রাণী ও পদার্থে, বিশেষতঃ, স্ত্রীমূর্ত্তিসকলে তখন তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণীকে দর্শনমাত্র তিনি কেন মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন এবং আপনাকে ব্রাহ্মণীর

বালক বলিয়া এককালে উপলব্ধি করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে আহার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী এই কালে কখন কখন ব্রজগোপিকাগণের ভাবে আবিষ্টা হইয়া মধুররসাত্মক সঙ্গীতসকল আরম্ভ করিলে, ঠাকুর বলিতেন, ঐ ভাব তাঁহার ভাল লাগে না, এবং ঐভাব সম্বরণপূর্ব্বক মাতৃ-ভাবের ভজনসকল গাহিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন। ব্রাহ্মণীও উহাতে ঠাকুরের মানসিক অবস্থা যথাযথ বুঝিয়া, তাঁহার প্রীতির জন্য তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীজগদম্বার দাসীভাবে সঙ্গীত আরম্ভ করিতেন, অথবা ব্রজগোপালের প্রতি নন্দরাণী শ্রীমতী যশোদার হৃদয়ের গভীরোচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীতের অবতারণা করিতেন। উক্ত ঘটনা অবশ্য, ঠাকুরের মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইবার বহু পূর্ব্বের কথা এবং ঠাকুরের মনে 'ভাবের ঘরে চুরি' যে বিন্দুমাত্র কোনকালে ছিল না, একথা উহাতে বুঝিতে পারা যায়।

সাধনকালের পূর্ব্বে ঠাকুরের মধুরভাব ভাল লাগিত না।

সে যাহা হউক, উহার কয়েক বৎসর পরে ঠাকুরের মন কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া বাৎসল্যভাব সাধনে অগ্রসর হইয়াছিল, সেকথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব মধুরভাব সাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি এখন যে সকল অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সেই সকল কথা আমরা বলিতে প্রবৃত্ত হই।

ঠাকুরের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—আমরা যাহাকে 'নিরক্ষর' বলি, তিনি প্রায় পূর্ণমাত্রায় তদ্রূপ অবস্থাসম্পন্ন হইলেও, কেমন করিয়া আজীবন শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। গুরুগ্রহণ করি-বার পূর্ব্বে কেবলমাত্র নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় তিনি যে সকল

ঠাকুরের সাধনসকল কখন শাস্ত্রবিরোধী হয় নাই। উহাতে যাহা প্রমাণিত হয়।

সাধনানুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সে সকলও কখন শাস্ত্রবিরোধী না হইয়া উহার অনুগামী হইয়াছিল। 'ভাবের ঘরে চুরি' না রাখিয়া শুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হইলে ঐরূপ যে হইয়া থাকে, তাঁহার জীবনের উক্ত ঘটনা এ বিষয়ের পরিচয় প্রদান করে। ঘটনা ঐরূপ হওয়ার বৈচিত্র্য কিছুই নাই; কারণ, শাস্ত্রসমূহ ঐ ভাবেই যে প্রণীত হইয়াছে একথা স্বল্প চিন্তার ফলে বুঝিতে পারা যায়। ঠাকুরের ন্যায় হৃদয়ের সত্যলাভের চেষ্টা পূর্ব্বক উপলব্ধিসকল লিপিবদ্ধ হইয়াই পরে 'শাস্ত্র' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, নিরক্ষর ঠাকুরের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপলব্ধিসকলের যথাযথ অনুভূতি হওয়ায় তাঁহার অলৌকিক জীবনের দ্বারা শাস্ত্রসমূহের সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ ঐকথা নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—ঠাকুরের এবার নিরক্ষর হইয়া আগমনের কারণ, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থা ও উপলব্ধিসমূহকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য।

তাঁহার স্বভাবতঃ শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষার দৃষ্টান্ত—সাধনকালে নামভেদ ও বেশ গ্রহণ।

শাস্ত্রমর্য্যাদা স্বভাবতঃ রক্ষা করিবার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা এখানে, ভাবের প্রেরণায় ঠাকুরের একের পর অন্য করিয়া নানা বেশ গ্রহণের কথার উল্লেখ করিতে পারি। ঋষিগণ উপনিষদ্‌মুখে বলিয়াছেন,—'তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ'* সিদ্ধ হওয়া যায় না। ঠাকুরের জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায়,—তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় প্রথমেই সেই ভাবানুকূল বেশভূষা বা বাহ্য চিহ্নসকল

* মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৪—অর্থ—সন্ন্যাসের লিঙ্গ বা চিহ্ন (যথা, গৈরিকাদি) ধারণা করিয়া কেবলমাত্র তপস্যা দ্বারা আত্মদর্শন হয় না।

ধারণ করিয়াছিলেন। যথা—তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি রক্তবস্ত্র, বিভূতি, সিন্দুর ও রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করিয়াছিলেন; বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত ভাবসমূহের সাধনকালে গুরুপরম্পরা-প্রসিদ্ধ ভেক্ বা তদনুকূল বেশ গ্রহণ করিয়া শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতচন্দন তুলসী-মাল্যাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত করিয়াছিলেন! বেদান্তোক্ত অদ্বৈতভাবে সিদ্ধ হইবেন বলিয়া শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কাষায় ধারণ করিয়াছিলেন—ইত্যাদি। আবার পুংভাবসমূহের সাধন কালে তিনি যেমন বিবিধ পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্ত্রীজনোচিত ভাবসমূহের সাধনকালে রমণীর বেশভূষায় আপনাকে সজ্জিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ঠাকুর আমাদিগকে বারংবার শিক্ষা দিয়াছেন,—লজ্জা ঘৃণা ভয় এবং জন্ম-জন্মাগত জাতি-কুল-শীলাদি অষ্টপাশ ত্যাগ না করিলে, কেহ কখন ঈশ্বরলাভ-পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ঐশিক্ষা তিনি স্বয়ং আজীবন, কায়মনোবাক্যে, কতদূর পালন করিয়াছিলেন, তাহা সাধনকালে তাঁহার ঐরূপ বিবিধ বেশধারণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি কার্য্যকলাপের অনুশীলনে স্পষ্ট বুঝিতে পায়া যায়।

মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত ঠাকুরের স্ত্রীবেশ গ্রহণ।

মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা ধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পরমভক্ত মথুরামোহন তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কখন বহুমূল্য বারাণসী সাড়ী এবং কখন ঘাগ্‌রা, ওড়্‌না, কাঁচুলি প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। আবার, 'বাবা'র রমণীবেশ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুর চাঁচর কেশপাশ (পরচুলা) এবং এক সুট্ স্বর্ণালঙ্কারেও তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শ্রবণ করিয়াছি, ভক্তিমান্ মথুরের ঐরূপ

দান, ঠাকুরের কঠোর ত্যাগে কলঙ্কার্পণ করিতে দুষ্টচিত্তদিগকে অবসর দিয়াছিল; কিন্তু ঠাকুর ও মথুরামোহন সে সকল কথায় কিছুমাত্র মনোযোগী না হইয়া আপন আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মথুরামোহন, 'বাবা'র পরিতৃপ্তিতে এবং 'তিনি যে উহা নিরর্থক করিতেছেন না'—এই বিশ্বাসে পরমসুখী হইয়াছিলেন; এবং ঠাকুর ঐরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শ্রীহরির প্রেমৈকলোলুপা ব্রজরমণীর ভাবে ক্রমে এতদূর মগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আপনাকে পুরুষবোধ এককালে অন্তর্হিত হইয়া প্রতি চিন্তা, চেষ্টা ও বাক্য রমণীর ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, মধুরভাবাবেশে তিনি ঐরূপে ছয়মাস কাল রমণীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ভিতর স্ত্রী ও পুরুষ—উভয় ভাবের বিচিত্র সমাবেশের কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। অতএব স্ত্রীবেশের উদ্দীপনায় তাঁহার মনে যে এখন রমণীভাবের উদয় হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? কিন্তু ঐ ভাবের প্রেরণায় তাঁহার চলন, বলন, হাস্য, কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গী এবং শরীর ও মনের প্রত্যেক চেষ্টা যে, এককালে ললনা-সুলভ হইয়া উঠিবে, একথা কেহ কখন কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐরূপ অসম্ভব ঘটনা যে এখন বাস্তবিক হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুর এবং হৃদয়—উভয়ের নিকটে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকালে আমরা অনেকবার তাঁহাকে রঙ্গচ্ছলে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিতে দেখিয়াছি। তখন উহা এতদূর সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইত যে, রমণীগণও উহা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেন।

স্ত্রীবেশ গ্রহণে ঠাকুরের প্রত্যেক আচরণ স্ত্রীজাতির ন্যায় হওয়া।

ঠাকুর এই সময়ে কখন কখন রাণী রাসমণির জানবাজারস্থ

বাটীতে যাইয়া শ্রীযুক্ত মথুরামোহনের পুরাঙ্গনাদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা তাঁহার কামগন্ধহীন পূতচরিত্রের কথা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বেই দেবতা-সদৃশ জ্ঞান করিতেন। এখন আবার তাঁহার স্ত্রীসুলভ আচার-ব্যবহারে এবং অকৃত্রিম যত্ন ও স্নেহে এতদূর মুগ্ধা হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাঁহারা আপনাদিগের অন্যতম বলিয়া নিশ্চয় ধারণাপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে লজ্জা-সঙ্কোচাদি আবরণের কিছুমাত্র রক্ষা করিতে সমর্থা হয়েন নাই।* ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—শ্রীযুক্ত মথুরের কন্যাগণের মধ্যে কাহারও স্বামী ঐকালে জানবাজার ভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি ঐ কন্যার কেশবিন্যাস ও বেশভূষাদি নিজ হস্তে সম্পাদনপূর্ব্বক স্বামীর চিত্তরঞ্জনের নানা উপায় তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়া সখীর ন্যায় তাহার হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইয়া স্বামীর পার্শ্বে দিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিতেন,—'তাহারাও তখন আমাকে তাহাদিগের সখী বলিয়া বোধ করিয়া কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না!'

মথুর বাবুর বাটীতে রমণীগণের সহিত ঠাকুরের সখীভাবে আচরণ।

হৃদয় বলিতেন,—"ঐরূপে রমণীগণপরিবৃত হইয়া থাকিবার কালে ঠাকুরকে সহসা চিনিয়া লওয়া তাঁহার নিত্যপরিচিত আত্মীয়দিগের পক্ষেও দুরূহ হইত। মথুর বাবু ঐকালে একসময়ে আমাকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'বল দেখি, উহাদিগের মধ্যে তোমার মামা কোন্‌টী?' এতকাল একসঙ্গে বাস ও নিত্য সেবাদি করিয়াও তখন আমি তাঁহাকে

রমণীবেশ গ্রহণে ঠাকুরকে পুরুষ বলিয়া চেনা দুঃসাধ্য হইত।

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৭ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯৯—২০১।

সহসা চিনিয়া লইতে পারি নাই! দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে মামা তখন প্রতিদিন প্রত্যূষে সাজি হস্তে লইয়া বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেন—আমরা ঐ সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, চলিবার সময় রমণীর ন্যায় তাঁহার বামপদই প্রতিবার অগ্রসর হইতেছে। ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলিতেন,—'ঐরূপে পুষ্পচয়ন করিবার কালে তাঁহাকে (ঠাকুরকে) দেখিয়া আমার সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে!' ঐরূপে পুষ্পচয়ন করিয়া বিচিত্র মালা গাঁথিয়া তিনি এই কালে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীকে সজ্জিত করিতেন এবং কখন কখন শ্রীশ্রীজগদম্বাকেও ঐরূপ সাজাইয়া ৺কাত্যায়নীর নিকটে ব্রজগোপিকাগণের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণকে স্বামিরূপে পাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সকরুণ প্রার্থনা করিতেন!"

মধুরভাব সাধনে নিযুক্ত ঠাকুরের আচরণ ও শারীরিক বিকারসমূহ।

ঐরূপে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবা-পূজাদি শ্রীকৃষ্ণদর্শন ও তাঁহাকে স্বীয় বল্লভরূপে প্রাপ্ত হইবার মানসে সম্পাদনপূর্ব্বক ঠাকুর এখন অনন্যচিত্তে শ্রীশ্রীযুগলপাদপদ্মসেবায় রত হইয়াছিলেন এবং সাগ্রহ প্রার্থনা ও প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দিবা কিম্বা রাত্রি—কোনকালেই তাঁহার হৃদয়ে সে আকুল প্রার্থনার বিরাম হইত না এবং দিন, পক্ষ বা মাসান্তেও অবিশ্বাস-প্রসূত নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে সে প্রতীক্ষা হইতে বিন্দু-মাত্র বিচলিত করিত না। ক্রমে ঐ প্রার্থনা আকুল ক্রন্দনে এবং ঐ প্রতীক্ষা উন্মত্তের ন্যায় উৎকণ্ঠা ও চঞ্চলতায় পরিণত হইয়া তাঁহার আহারনিদ্রাদির লোপসাধন করিয়াছিল। আর, বিরহ?—নিতান্ত প্রিয়জনের সহিত সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত হইবার অসীম লালসা নানা বিঘ্ন-বাধায় প্রতিরুদ্ধ

হইলে মানবের হৃদয়-মন-মথনকরী শরীরেন্দ্রিয়-বিকলকরী যে অবস্থা আনয়ন করে, সেই বিরহ?—উহা, তাঁহাতে অশেষ যন্ত্রণার নিদান মানসিক বিকাররূপে কেবলমাত্র প্রকাশিত হইয়াই উপশান্ত হয় নাই, কিন্তু সাধনকালের পূর্ব্বাবস্থায় অনুভূত নিদারুণ শারীরিক উত্তাপ ও জ্বালারূপে পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের প্রবল প্রভাবে এইকালে তাঁহার শরীরের প্রতি লোমকূপ দিয়া সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গমন হইত, দেহের গ্রন্থি-সকল শিথিল বা ভগ্নপ্রায় বলিয়া লক্ষিত হইত এবং হৃদয়ের অসীম যন্ত্রণায় ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য হইতে এককালে বিরত হওয়ায়, দেহ কখন কখন মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত!

ঠাকুরের অতীন্দ্রিয় প্রেমের সহিত আমাদের ঐ বিষয়ক ধারণার তুলনা।

দেহের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ, তন্মাত্রৈকবুদ্ধি মানব আমরা, প্রেম বলিতে এক দেহের প্রতি অন্য দেহের আকর্ষণই বুঝিয়া থাকি। অথবা বহু চেষ্টার ফলে স্থূল দেহবুদ্ধি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ঊর্দ্ধে উঠিয়া যদি উহাকে দেহবিশেষাশ্রয়ে প্রকাশিত গুণসমষ্টির প্রতি আকর্ষণ বলিয়া অনুভব করি, তবে 'অতীন্দ্রিয় প্রেম' বলিয়া উহার আখ্যা প্রদানপূর্ব্বক উহার কতই না যশোগান করি। কিন্তু কবিকুলবন্দিত আমাদিগের ঐ অতীন্দ্রিয় প্রেম যে স্থূল দেহবুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম ভোগলালসা পরিশূন্য নহে, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঠাকুরের জীবনে প্রকাশিত যথার্থ অতীন্দ্রিয় প্রেমের তুলনায় উহা কি তুচ্ছ, হেয় এবং অন্তঃসারশূন্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়!

ভক্তিগ্রন্থসকলে উল্লিখিত আছে, ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধা-

রাণীই কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত অতীন্দ্রিয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া উহার পূর্ণাদর্শ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। লজ্জা ঘৃণা ভয় ছাড়িয়া, লোক-ভয় সমাজভয় পরিত্যাগ করিয়া, জাতি কুল শীল পদমর্য্যাদাদি সকল বাহ্য বিষয় ভুলিয়া এবং নিজ দেহ-মনের ভোগসুখের কথা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখেই কেবলমাত্র আপনাকে সুখী অনুভব করিতে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল ভক্তিশাস্ত্রে আর পাওয়া যায় না। শাস্ত্র সেজন্য বলেন, শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন ঐ প্রেমের আংশিক উপলব্ধি করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিতে জগতে কেহ কখন সমর্থ হয় না। কারণ, সচ্চিদানঘন বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতীর কামগন্ধহীন প্রেমে চিরকাল সর্ব্বতোভাবে আবদ্ধ বা বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহারই ইঙ্গিতে ভক্তসকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। অতএব, প্রেমঘনতনু শ্রীমতীর প্রেমের অনুরূপ বা তজ্জাতীয় প্রেমলাভ না হইলে, কেহ কখন ঈশ্বরকে পতিভাবে লাভ করিতে এবং ঐ প্রেমের পূর্ণ মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ভক্তিশাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত কথার ইহাই যে অভিপ্রায়, একথা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীমতীর অতীন্দ্রিয় প্রেম সম্বন্ধে ভক্তি-শাস্ত্রের কথা।

ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব মহিমা, মায়ারহিতবিগ্রহ পরমহংসাগ্রণী শ্রীশুকদেবপ্রমুখ আত্মারাম মুনিসকলের দ্বারা বহুশঃ গীত হইলেও, ভারতের জনসাধারণ, উহা কিরূপে জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ বলেন, উহা বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবান্‌কে শ্রীমতীর সহিত পুনরায়

শ্রীমতীর অতীন্দ্রিয় প্রেমের কথা বুঝাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের আগমন।

একশরীরাবলম্বনে একাধারে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল এবং অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর বা রাধারূপে প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবই মধুরভাবের প্রেমাদর্শ শিক্ষা দিয়া লোককল্যাণ-সাধনের জন্য আবির্ভূত শ্রীভগবানের ঐ অপূর্ব্ব বিগ্রহ। তাঁহারা একথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে শ্রীমতী রাধারাণীর শরীর-মনে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইত, পুংশরীরধারী হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবে সে সমস্ত লক্ষণই ঈশ্বরপ্রেমের প্রাবল্যে আবির্ভূত হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শরীর-মনে মধুরভাবোত্থ ভক্তিলক্ষণসকলের প্রকাশ দেখিয়াই তাঁহারা তাঁহাকে শ্রীমতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে ঐরূপ অতীন্দ্রিয় প্রেমাদর্শের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল, একথা বুঝা যায়।

ঠাকুরের শ্রীমতী রাধিকার উপাসনা ও দর্শনলাভ।

সে যাহা হউক, শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণদর্শন অসম্ভব জানিয়া, ঠাকুর এখন তদগতচিত্তে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেমঘনমূর্ত্তির স্মরণ মনন ও ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন হইয়া, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিজ হৃদয়ের আকুল আবেগ অবিরাম নিবেদন করিয়াছিলেন। ফলে, অচিরেই তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর কামগন্ধহীন শ্রীমূর্ত্তির দর্শন লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে অন্যান্য দেবদেবীসকলের দর্শনকালে ঠাকুর যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই দর্শনকালেও তিনি সেইরূপে ঐ মূর্ত্তি নিজাঙ্গে সম্মিলিত হইয়া গেল, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন,—"শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বস্ব-হারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্ত্তির মহিমা ও মাধুর্য্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশরপুষ্পের কেসর-সকলের ন্যায় গৌরবর্ণ ছিল।"

ঠাকুরের আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া অনুভব ও তাহার কারণ।

এখন হইতে ঠাকুর ভাবাবেশে আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীমূর্ত্তি ও চরিত্রের গভীর অনুধ্যানে আপন পৃথগস্তিত্ব-বোধ এককালে হারাইয়াই তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং একথা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার মধুরভাবোত্থ ঈশ্বরপ্রেম এখন পরিবর্দ্ধিত হইয়া শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমানুরূপ সুগভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলেও ঐরূপ দেখা গিয়াছিল। কারণ, পূর্ব্বোক্ত দর্শন ও অবস্থার পর হইতে শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ন্যায় তাঁহাতেও মধুরভাবের পরাকাষ্ঠাপ্রসূত মহাভাবের সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থে মহাভাবে প্রকাশিত শারীরিক লক্ষণসকলের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণবতন্ত্রনিপুণা ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং পরে বৈষ্ণবচরণাদি শাস্ত্রজ্ঞ সাধকেরা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে মহাভাবের প্রেরণায় ঐ সকল লক্ষণের আবির্ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া, তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজা অর্পণ করিয়াছিলেন। মহাভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে বহুবার বলিয়াছেন,—উনিশপ্রকারের ভাব একাধারে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে মহাভাব বলে—একথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। সাধন করিয়া এক একটা ভাবে সিদ্ধ হইতেই লোকের জীবন কাটিয়া যায়! (নিজ শরীর দেখাইয়া) এখানে একাধারে একত্র ঐ প্রকার উনিশটা ভাবের পূর্ণ প্রকাশ।"*

শ্রীকৃষ্ণবিরহের দারুণ যন্ত্রণায় ঠাকুরের শরীরের প্রতি

---

* শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ রাগাত্মিকা ভক্তির নিম্নলিখিত বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

প্রকৃতিভাবে ঠাকুরের শরীরের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

লোমকূপ হইতে রক্তনির্গমনের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—উহা মহাভাবের পরাকাষ্ঠায় এই কালেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। প্রকৃতি ভাবিতে ভাবিতে তিনি এইকালে এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, স্বপ্নে বা ভ্রমেও কখনও আপনাকে পুরুষ বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না এবং স্ত্রীশরীরের ন্যায় কার্য্যকলাপে তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় স্বতঃই প্রবৃত্ত হইত! আমরা তাঁহার নিজ-মুখে শ্রবণ করিয়াছি,—স্বাধিষ্ঠানচক্রের অবস্থান-প্রদেশের রোম-কূপসকল হইতে তাঁহার এইকালে প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত-নির্গমন হইত এবং স্ত্রীশরীরের ন্যায় প্রতি-বারই উপর্য্যুপরি দিবসত্রয় ঐরূপ হইত! তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়নাথ আমাদিগকে বলিয়াছেন,—তিনি উহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এবং পরিহিত বস্ত্র দুষ্ট হইবার আশঙ্কায় ঠাকুরকে উহার জন্য এইকালে কৌপীন ব্যবহার করিতেও দেখিয়াছেন!

রাগাত্মিকা ভক্তি

- কামাত্মিকা (মধুররস) সম্ভোগেচ্ছাময়ী বা তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী
  - স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ।
- সম্বন্ধাত্মিকা
  - বাৎসল্য — স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ।
  - সখ্য — স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ।
  - দাস্য — স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ।
  - শান্ত

মহাভাবে কামাত্মিকা এবং সম্বন্ধাত্মিকা উভয় প্রকার ভক্তির পূর্ব্বোল্লিখিত ঊনবিংশ প্রকার অন্তর্ভাবের একত্র সমাবেশ হয়। ঠাকুর এখানে উহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মানসিক ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার শারীরিক ঐরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বুঝা যায়, 'মন সৃষ্টি করে এ শরীর।'

বেদান্তশাস্ত্রের শিক্ষা—মানবের মন তাহার শরীরকে বর্ত্তমান আকারে সৃষ্টি করিয়াছে—'মন সৃষ্টি করে এ শরীর' এবং তীব্র ইচ্ছা বা বাসনা-সহায়ে তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতনভাবে গঠিত করিতেছে। শরীরের উপর মনের ঐরূপ প্রভুত্বের কথা শুনিলে, আমরা বুঝিতে ও ধারণা করিতে সমর্থ হই না। কারণ, যেরূপ তীব্র বাসনা উপস্থিত হইলে মন অন্য সকল বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিষয়বিশেষে কেন্দ্রীভূত হয় ও অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করে, সেইরূপ তীব্র বাসনা আমরা কোন বিষয় লাভ করিবার জন্যই অনুভব করি না। বিষয়বিশেষ উপলব্ধি করিবার তীব্র বাসনায় ঠাকুরের শরীর স্বল্পকালে ঐরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, বেদান্তের পূর্ব্বোক্ত কথা সবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে, একথা বলা বাহুল্য। পদ্মলোচনাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল শ্রবণপূর্ব্বক বেদপুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সিদ্ধ ঋষিকুলের ঐ বিষয়ক উপলব্ধিসকলের সহিত মিলাইতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার উপলব্ধিসকল বেদপুরাণকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে!" মানসিক ভাবের প্রাবল্যে ঠাকুরের শরীরিক পরিবর্ত্তন সকলের অনুশীলনে তদ্রূপ স্তম্ভিত হইয়া বলিতে হয়,—তাঁহার শারীরিক বিকারসমূহ শারীরবিজ্ঞানরাজ্যের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক উহাতে অপূর্ব্ব যুগান্তর উপস্থিত করিবার সূচনা করিয়াছে।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের পতিভাবে ঈশ্বরপ্রেম এখন পরিশুদ্ধ ও ঘনীভূত হওয়াতেই, তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী

রাধারাণীর কৃপা অনুভব করিয়াছিলেন এবং ঐ প্রেমের প্রভাবে স্বল্পকাল পরেই সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। দৃষ্ট মূর্ত্তি অন্য সকলের ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। ঐ দর্শন লাভের দুই তিন মাস পরে পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী আসিয়া তাঁহাকে বেদান্তপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাব সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন! অতএব বুঝা যাইতেছে,—মধুরভাব সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর কিছুকাল ঐ ভাবসহায়ে ঈশ্বরসম্ভোগে কালযাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—ঐ কালে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় এককালে তন্ময় হইয়া তিনি নিজ পৃথক অস্তিত্ব-বোধ হারাইয়া কখন আপনাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, আবার কখন বা আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া দর্শন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে যখন আমরা গমনাগমন করিতেছি তখন তিনি একদিন বাগান হইতে একটী ঘাঁসফুল সংগ্রহ করিয়া হর্ষোৎফুল্লবদনে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, —"তখন তখন (মধুরভাব-সাধনকালে) যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতাম, তাঁহার অঙ্গের এই রকম রং ছিল।"

ঠাকুরের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ।

অন্তরস্থ প্রকৃতিভাবের প্রেরণায় যৌবনের প্রারম্ভে কামার-পুকুরে বাস করিবার কাল হইতে ঠাকুরের মনে এক প্রকার বাসনার উদয় হইত। ব্রজগোপীগণ স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিয়া-ছিলেন জানিয়া, ঠাকুরের মনে হইত, তিনি যদি স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে গোপিকাদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে ভজনা ও লাভ করিয়া ধন্য

যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে প্রকৃতি হইবার বাসনা।

হইতেন। ঐরূপে নিজ পুরুষশরীরকে শ্রীকৃষ্ণলাভের পথের অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিয়া, তিনি তখন কল্পনা করিতেন যে, যদি আবার ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে ব্রাহ্মণের ঘরের পরমা সুন্দরী দীর্ঘকেশী বাল-বিধবা হইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া জানিবেন না। মোটা ভাত কাপড়ের মত কিছু সংস্থান থাকিবে, কুঁড়ে ঘরের পার্শ্বে দুই এক কাঠা জমী থাকিবে—যাহাতে নিজ হস্তে দুই পাঁচ প্রকার শাকসবজী নিজ ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন করিতে পারিবেন, এবং তৎসঙ্গে একজন বৃদ্ধা অভিভাবিকা, একটী গাভী—যাহাকে তিনি স্বহস্তে দোহন করিতে পারিবেন এবং একখানি সূতা কাটিবার চরকা থাকিবে। বালকের কল্পনা আরও অধিক অগ্রসর হইয়া ভাবিত, দিনের বেলা গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া ঐ চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত করিবে এবং সন্ধ্যার পর ঐ গাভীর দুগ্ধে প্রস্তুত মোদকাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বহস্তে খাওয়াইবার নিমিত্ত গোপনে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে থাকিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও উহাতে প্রসন্ন হইয়া গোপবালকবেশে সহসা আগমন করিয়া ঐ সকল গ্রহণ করিবেন এবং অপরের অগোচরে ঐরূপে নিত্য গমনাগমন করিতে থাকিবেন। ঠাকুরের মনের ঐ বাসনা ঐ ভাবে পূর্ণ না হইলেও, মধুরভাব-সাধনকালে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিল।

'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান— তিন এক, এক তিন' রূপ দর্শন।

মধুরভাবে অবস্থানকালে ঠাকুরের আর একটী দর্শনের কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা বর্ত্তমান বিষয়ের উপসংহার করিব। ঐকালে বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে বসিয়া তিনি একদিন শ্রীমদ্-ভাগবত-পাঠ শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির সন্দর্শন লাভ

করিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন, ঐ মূর্ত্তির পাদপদ্ম হইতে দড়ার মত একটা জ্যোতি বহির্গত হইয়া প্রথমে ভাগবত গ্রন্থকে স্পর্শ করিল এবং পরে তাঁহার নিজ বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়া ঐ তিন বস্তুকে একত্র কিছুকাল সংযুক্ত করিয়া রাখিল।

ঠাকুর বলিতেন,—ঐরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ তিন পদার্থ ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও, এক পদার্থ বা এক পদার্থের প্রকাশ সম্ভূত। "ভাগবত (শাস্ত্র) ভক্ত ও ভগবান্, তিন এক, এক তিন!"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঠাকুরের বেদান্তসাধন।

মধুরভাবসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর এখন ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অতএব তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনকথা অতঃপর লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার এই কালের মানসিক অবস্থার কথা একবার আলোচনা করিয়া দেখা ভাল।

আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইতে হইলে, সাধককে সংসারের রূপরসাদি ভোগ্যবিষয়সমূহকে দূরে পরিহার করিয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধ ভক্ত তুলসীদাস যে বলিয়াছেন—যাঁহা রাম তাঁহা কাম† নেহি *—একথা বাস্তবিকই সত্য। ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনেতিহাস ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে। কামকাঞ্চনত্যাগ-রূপ ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঐ ভিত্তি কখনও তিলমাত্র

ঠাকুরের এই কালের মানসিক অবস্থার আলোচনা—(১) কামকাঞ্চনত্যাগে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা।

---

† সকাম কর্ম্ম।

* যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহি,
যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম।
দুঁহু একসাথ মিলত নেহি,
রবি রজনী এক ঠাম॥
তুলসীদাস-কৃত দোহা।

পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া, তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অতি স্বল্পকালেই তাহা নিজ জীবনে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব কামকাঞ্চনের প্রলোভন ভূমির সীমা বহুদূর পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহার মন যে, এখন নিরন্তর অবস্থান করিত, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

(২) নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ও ইহামুত্রফলভোগে বিরাগ।

বিষয়কামনা ত্যাগ করিয়া বৎসরকাল নিরন্তর ঐরূপে ঈশ্বরলাভে সচেষ্ট থাকায়, অভ্যাসযোগে তাঁহার মন এখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন বিষয়ের স্মরণ মনন করা উহার নিকট বিষবৎ বলিয়া প্রতীত হইত। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকেই সারাৎসার পরাৎপর বস্তু বলিয়া সর্ব্বতোভাবে ধারণা করায় উহা ইহকালে বা পরকালে তদতিরিক্ত অপর কোন বস্তুলাভে এককালে উদাসীন ও স্পৃহাশূন্য হইয়াছিল।

শম দমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতা।

সাংসারিক সকল বিষয় এবং নিজ শরীরের সুখদুঃখাদি সকল কথা বিস্মৃত হইয়া অভীষ্ট বিষয়ের একাগ্র অনুধ্যানে তাঁহার মন এখন এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, মুহূর্ত্তমাত্রেই বাহ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে সমাহৃত হইয়া, উহা ঐ বিষয়ে নিবিষ্ট হইত এবং উহাতেই আনন্দানুভব করিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও, উহার ঐ আনন্দের কিছুমাত্র বিরাম হইত না এবং ঈশ্বর ভিন্ন জগতে অপর কোন লব্ধব্য বস্তু যে আছে বা থাকিতে পারে, এ চিন্তার উদয় উহাতে ক্ষণেকের জন্যও উপস্থিত হইত না।

আর, জগৎকারণের প্রতি, 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ

শরণং সুহৃৎ' বলিয়া অনুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভর?—ঠাকুরের মনে ঐরূপ অনুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভরতার শুধু যে সীমা ছিল না, তাহা নহে, এবং উহাদিগের সহায়ে শুদ্ধ যে তিনি আপনাকে তাঁহার সহিত সপ্রেম সম্বন্ধে নিত্যযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাও নহে—কিন্তু মাতার প্রতি বালকের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভরতায় সাধক যে, তাঁহাকে সর্ব্বদা নিজ সকাশে দেখিতে পায়, তাঁহার মধুর বাণী সর্ব্বদা কর্ণগোচর করিয়া কৃতকৃতার্থ হয় এবং তাঁহার প্রবল হস্ত দ্বারা রক্ষিত হইয়া সংসারপথে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়—একথার বহুশঃ প্রমাণ পাইয়া জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্য শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশে ও ইঙ্গিতে নির্ভয়ে অনুষ্ঠান করিতে ঠাকুরের মন এখন সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

(৪) ঈশ্বরনির্ভরতা ও দর্শনজন্য ভয়শূন্যতা।

প্রশ্ন উঠিতে পারে,—জগৎকারণকে ঐরূপে নিজ মাতার ন্যায় লাভ করিয়া এবং সর্ব্বদা নিজ সমীপে দেখিতে পাইয়াও ঠাকুর আবার সাধনপথে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কেন? যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সাধকের যোগ-তপস্যাদি সাধনের অনুষ্ঠান, তাঁহাকেই যদি আপনার হইতেও আপনার রূপে প্রাপ্ত হইলাম, তবে আবার সাধন কিসের জন্য? ঐ কথার আলোচনা আমরা পূর্ব্বে একভাবে করিয়া আসিলেও, তৎসম্বন্ধে অন্য একভাবে এখন দুই চারিটী কথা বলিব। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সাধনেতিহাস শুনিতে শুনিতে, আমাদিগের মনে একদিন ঐরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল এবং উহা প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত হই নাই। তদুত্তরে তিনি তখন আমাদিগকে যাহা

ঈশ্বর-দর্শনের পরেও ঠাকুর সাধন কেন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার কথা।

বলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বলিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"ছ্যাখ্, সমুদ্রের তীরে যে সর্ব্বদা বাস করে, তার যেমন কখন কখন মনে হয় যে, রত্নাকর সমুদ্রের গর্ভে কত কি রত্ন আছে, তা দেখি, তেমনি মাকে পেয়ে ও মার কাছে সর্ব্বদা থেকেও, আমার তখন মনে হ'ত, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী মাকে নানাভাবে ও নানারূপে দেখ্‌ব। সেজন্য যখন যে ভাবে তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হ'ত, সেই ভাবে দেখ্‌বার জন্য তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ধ'র্‌তাম্। কৃপাময়ী মাও তখন, তাঁর ঐভাব দেখ্‌তে,উপলব্ধি ক'র্‌তে যা কিছু প্রয়োজন, তা নিজেই জুগিয়ে দিয়ে, করিয়ে নিয়ে, সেই ভাবে ও রূপে দেখা দিতেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের বা পথের সাধন করা হয়েছিল।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মধুরভাবে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন। উহার পরেই ঠাকুরের মনে সর্ব্বভাবাতীত বেদান্ত-প্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবল প্রেরণা আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঐ প্রেরণা তাঁহার জীবনে কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা তিনি এখন শ্রীশ্রীজগন্মাতার নির্গুণ নিরাকার নির্ব্বিকল্প তুরীয় রূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

ঠাকুরের জননীর গঙ্গা-তীরে বাস করিবার সঙ্কল্প এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমন।

ঠাকুর যখন অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার বৃদ্ধা মাতা দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারের মৃত্যু হইলে, শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা অপর দুইটী পুত্রের মুখ চাহিয়া কোনরূপে বুক বাঁধিয়া ছিলেন। কিন্তু উহার অনতিকাল পরে তাঁহার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র

গদাধর পাগল হইয়াছে বলিয়া লোকে যখন রটনা করিতে লাগিল, তখন তাঁহার দুঃখ-শোকের আর অবধি রহিল না। পুত্রকে গৃহে আনাইয়া নানা চিকিৎসা ও শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠানে তাঁহার ঐ ভাবের যখন কথঞ্চিৎ উপশম হইল, তখন বৃদ্ধা আবার আশায় বুক বাঁধিয়া তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের পরে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া গদাধরের ঐ অবস্থা আবার যখন উপস্থিত হইল, তখন বৃদ্ধা আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না—প্রথমে কামারপুকুরে এবং পরে মুকুন্দপুরের প্রাচীন শিবালয়ে গমনপূর্ব্বক পুত্রের আরোগ্য-কামনায় হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। পরে মহাদেবের প্রত্যাদেশে পুত্র দিব্যোন্মাদ হইয়াছে জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেও, বৃদ্ধা অনতিকাল পরে সংসারে বীতরাগ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে পুত্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল ভাগীরথীতীরে যাপন করিবেন বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। কারণ, যাহাদের জন্য এবং যাহাদের লইয়া তাঁহার সংসার করা, তাহারাই যদি একে একে সংসার ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল, তবে এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার আর উহাতে লিপ্ত থাকিবার প্রয়োজন কি? শ্রীযুত মথুরের অন্নমেরু অনুষ্ঠানের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। আমাদিগের অনুমান, ঠাকুরের মাতা ঐ সময়ে পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প করিয়া দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে উপস্থিত হন। বৃদ্ধার ঐ সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছিল এবং এখন হইতে দ্বাদশ বৎসরান্তে তাঁহার শরীরত্যাগের কালের মধ্যে তিনি পুনরায় কামারপুকুরে আগমন করেন নাই। অতএব ঠাকুরের জটাধারী বাবাজীর নিকট হইতে 'রাম'-মন্ত্রে দীক্ষা ও রামলালা বিগ্রহ গ্রহণ এবং মধুরভাব ও বেদান্তভাব প্রভৃতির সাধন যে তাঁহার মাতার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঠাকুর-জননীর লোভ-রাহিত্য।

ঠাকুরের মাতার উদার হৃদয়ের পরিচায়ক একটী ঘটনা আমরা পাঠককে এখানে বলিতে চাহি। ঘটনাটী তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্প-কাল পরেই উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐকালে শ্রীযুত মথুরের কালীবাটীতে অক্ষুণ্ণ অধিকার, এবং মুক্তহস্ত হইয়া তিনি নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও প্রভূত অন্নদান করিতেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির অবধি না থাকায়, তিনি ভবিষ্যতে তাঁহার অবর্ত্তমানে ঠাকুরের শারীরিক সেবার যাহাতে ত্রুটি না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ভিতরে ভিতরে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু ঠাকুরের কঠোর ত্যাগশীলতা দেখিয়া উহা মুখ ফুটিয়া তাঁহাকে বলিতে এপর্য্যন্ত সাহসী হন নাই। ঠাকুরের মনের ভাব জানি-বার জন্য তাঁহার যাহাতে শ্রবণগোচর হয়, এরূপ স্থলে দাঁড়াইয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে একদিন ঠাকুরের নামে একখানি তালুক লেখা-পড়া করিয়া দিবার পরামর্শ হৃদয়ের সহিত করিতে যাইয়া, বিষম অনর্থে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, ঐ কথার কিঞ্চিদাভাস কর্ণগোচর হইবামাত্র ঠাকুর উন্মত্তপ্রায় হইয়া 'শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করিতে চাস্' বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে বেগে ধাবিত হইয়াছিলেন! সুতরাং পূর্ব্বোক্তভাব মনে জাগরূক থাকিলেও, মথুর ঐ অভিপ্রায় সম্পাদনের কোনরূপ সুযোগ লাভ করেন নাই। ঠাকুরের মাতার আগমনে তিনি এখন সুযোগ বুঝিয়া, বৃদ্ধা চন্দ্রাদেবীকে পিতামহী সম্বোধনে আপ্যায়িত করি-লেন এবং প্রতিদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন। পরে অবসর বুঝিয়া একদিন

তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন—‘ঠাকুরমা, তুমি ত আমার নিকট হইতে কখন কিছু সেবা গ্রহণ করিলে না ? তুমি যদি যথার্থই আমাকে আপনার বলিয়া ভাব, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা, চাহিয়া লও।’ সরলহৃদয়া বৃদ্ধা মথুরের ঐরূপ কথায় বিশেষ বিপন্না হইলেন। কারণ, ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিলেন না, সুতরাং কি যে চাহিয়া লইবেন, তাহা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে বলিতে হইল,—“বাবা, তোমার কল্যাণে আমার ত এখন কোন বিষয়ের অভাব নাই, যখন কোন জিনিসের আবশ্যক বুঝিব, তখন চাহিয়া লইব।’ এই বলিয়া বৃদ্ধা আপনার পেঁট্‌রা খুলিয়া মথুরকে বলিলেন,—‘দেখিবে, এই দেখ, আমার এত পরিবার কাপড় রহিয়াছে; আর তোমার কল্যাণে এখানে খাবার ত কোন কষ্টই নাই, সকল বন্দোবস্তই ত তুমি করিয়া দিয়াছ ও দিতেছ; তবে আর কি চাহি, বল ?” মথুর কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন, ‘যাহা ইচ্ছা কিছু লও’ বলিয়া বারংবার অনুরোধ করিলেন। তখন ঠাকুরের জননীর অনেক ভাবিরা চিন্তিয়া একটী অভাবের কথা মনে পড়িল; তিনি বলিলেন,—‘যদি নেহাৎ দেবে, তবে আমার এখন মুখে দিবার গুলের অভাব হইয়াছে, তার জন্য এক আনার দোক্তা তামাক কিনে দাও।’ বিষয়ী মথুরের চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—‘এমন মা না হইলে কি অমন ত্যাগশীল পুত্র হয়!’—এই বলিয়া বৃদ্ধার অভিপ্রায়মত দোক্তা তামাক আনাইয়া দিলেন।

ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কালে তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র হলধারী দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া এবং

ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে তাঁহার যৎসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া, তিনি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কখন কখন ঠাকুরকে কিরূপে শ্লেষ করিতেন ও তাঁহার আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থাসমূহকে মস্তিষ্কের বিকার-প্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন—এবং ঠাকুর তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐ কথা নিবেদন করিয়া কিরূপে বারংবার আশ্বস্ত হইতেন, সে সকল কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। হলধারীর ঐরূপ শ্লেষপূর্ণ বাক্যে ঠাকুর একসময়ে ভাবাবেশে এক সৌম্য মূর্ত্তির দর্শন ও 'ভাবমুখে থাক্' বলিয়া প্রত্যাদেশ যে পাইয়াছিলেন, সে কথারও আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমাদিগের অনুমান, ঐ সকল ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং মধুরভাব সাধনের সময় ঠাকুরকে স্ত্রীবেশাদি ধারণ করিতে এবং স্ত্রীভাবে সর্ব্বদা থাকিতে দেখিয়াই হলধারী তাঁহাকে আত্মজ্ঞানবিহীন বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদাচার্য্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও অবস্থানের সময় হলধারী যে, কালীবাটীতে ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত একত্রে শাস্ত্র-চর্চ্চা করিতেন, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি শ্রীমৎ তোতা ও হলধারীর ঐরূপে অধ্যাত্মরামায়ণ-চর্চ্চাকালে ঠাকুর এক দিন, জায়া ও অনুজ লক্ষ্মণ সহ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ তোতা সম্ভবতঃ সন ১২৭১ সালের শেষভাগে দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে শারীরিক অসুস্থতাদি কারণনিবন্ধন হলধারী কালী-বাটীর কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয় তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হয়েন।

হলধারীর কর্ম্মত্যাগ ও অক্ষয়ের আগমন।

ভক্তের স্বভাব—তাঁহারা সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ মুক্তি লাভে কখন প্রয়াসী হন না। ভাববিশেষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের নানা রূপগুণাদির মহিমা সম্ভোগ করিতেই সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। দেবীভক্ত শ্রীরামপ্রসাদের 'চিনি হ'তে চাহি না মা, চিনি খেতে ভালবাসি'-রূপ কথা ভক্তহৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বলিয়া সর্ব্বকাল প্রসিদ্ধ আছে। অতএব ভাবসাধনের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া ঠাকুরের ভাবাতীত অদ্বৈতাবস্থা লাভের জন্য প্রয়াস, অনেকের বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ ভাবিবার পূর্ব্বে আমাদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, ঠাকুর স্বপ্রণোদিত হইয়া এখন আর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ ছিলেন না। জগদম্বার বালক ঠাকুর, এখন তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তাঁহারই মুখ চাহিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে যে ভাবে যখন ঘুরাইতে ফিরাইতেছিলেন, সেই ভাবেই তখন পরমানন্দে চালিত হইতেছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতাও সেজন্য তাঁহার সম্পূর্ণ ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, নিজ উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্য ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব আদর্শে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। জগদম্বার নিয়োগানুসারে ঠাকুর সর্ব্বপ্রকার সাধনের শেষে সেই উদ্দেশ্যবিশেষের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং উহা বুঝিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল মাতার সহিত প্রেমে এক হইয়াও কিঞ্চিৎ পৃথক্ থাকিয়া তৎপ্রদত্ত লোককল্যাণসাধনরূপ সুমহৎ দায়িত্ব সানন্দে বহন করিয়াছিলেন।

ভাবসমাধিতে সিদ্ধ ঠাকুরের অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবৃত্তি হইবার কারণ।

মধুরভাব সাধনের পরে ঠাকুরের অদ্বৈতভাব সাধনের যুক্তি-

যুক্ততা আর এক দিক দিয়া দেখিলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। ভাব ও ভাবাতীত রাজ্য পরস্পর কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে সর্ব্বদা অবস্থিত। কারণ, ভাবাতীত অদ্বৈতরাজ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ হইয়া ভাবরাজ্যের দর্শন-স্পর্শনাদি সম্ভোগানন্দরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। অতএব মধুরভাবে পরাকাষ্ঠালাভে ভাবরাজ্যের চরমভূমিতে উপনীত হইবার পরে ভাবাতীত অদ্বৈত-ভূমি ভিন্ন অন্য কোথায় আর তাঁহার মন অগ্রসর হইবে?

ভাবসাধনের চরমে অদ্বৈতভাবলাভের চেষ্টার যুক্তিযুক্ততা।

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতেই যে, ঠাকুর এখন অদ্বৈতভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, একথা আমরা নিম্নলিখিত ঘটনায় সম্যক্ বুঝিতে পারিব—

সাগরসঙ্গমে স্নান ও শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ প্রকাশ দর্শন করিবেন বলিয়া, পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ তোতা এইকালে মধ্যভারত হইতে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন। পুণ্যতোয়া নর্ম্মদাতীরে বহুকাল একান্তবাস পূর্ব্বক সাধন-ভজনে নিমগ্ন থাকিয়া তিনি যে, নির্বিকল্প সমাধিপথে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন, একথার পরিচয় তথাকার প্রাচীন সাধুরা এখনও প্রদান করিয়া থাকেন। ঐরূপে ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পরে তাঁহার মনে কিছু-কাল যদৃচ্ছা পরিভ্রমণের সঙ্কল্প উদিত হয় এবং উহার প্রেরণা-তেই তিনি এখন পূর্ব্বভারতে আগমনপূর্ব্বক তীর্থ হইতে তীর্থা-ন্তরে ভ্রমণ করিতে থাকেন। ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মারাম পুরুষ-দিগের সমাধি-ভিন্ন-কালে সমগ্র জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব হইয়া থাকে এবং জগদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ দেশ, কাল ও পদার্থে মায়া-সংযোগে উচ্চাবচ ব্রহ্ম-প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা

শ্রীমৎ তোতাপুরীর আগমন।

দেবস্থান, তীর্থ ও সাধুদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, একথা চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে। ব্রহ্মজ্ঞ তোতা ঐরূপ ভাবের প্রেরণাতেই দেব ও তীর্থদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত তীর্থদ্বয়-দর্শনান্তে ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে পুনরায় ফিরিবার কালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। তিন দিবসের অধিক কাল একস্থানে যাপন করা তাঁহার নিয়ম ছিল না। অতএব কালীবাটীতে তিনি দিবসত্রয় মাত্র অতিবাহিত করিবেন বলিয়াই আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার অচিন্ত্যলীলায় তদীয় জ্ঞানের মাত্রা সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন বলিয়া এবং তাঁহার দ্বারা নিজ বালককে বেদান্ত সাধন করাইবেন বলিয়া যে, তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছিলেন, একথা তিনি প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই।

ঠাকুর ও তোতাপুরীর প্রথম সম্ভাষণ এবং ঠাকুরের বেদান্তসাধন-বিষয়ে প্রত্যাদেশ-লাভ।

শ্রীমৎ তোতাপুরী কালীবাটীতে আগমন করিয়া প্রথমেই ঘাটের সুবৃহৎ চাঁদনীতে আসিয়া উপস্থিত হন। অন্য সাধারণের ন্যায় সামান্য একখানি বস্ত্র মাত্র পরিধান করিয়া অন্যমনে ঠাকুর তখন তথায় এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহার তপোদীপ্ত ভাবোজ্জ্বল বদনের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র শ্রীমৎ তোতা আকৃষ্ট হইলেন এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, ইনি সামান্য পুরুষ নহেন, বেদান্তসাধনের এরূপ উত্তম অধিকারী বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। 'তন্ত্রপ্রাণ বঙ্গে বেদান্তের এরূপ অধিকারী আছে!'—ভাবিতে ভাবিতে শ্রীমৎ তোতা বিস্ময় কৌতূহলে আবিষ্ট হইয়া ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বেদান্ত সাধন করিবে?"

জটাজূটধারী দীর্ঘবপুঃ উলঙ্গ সন্ন্যাসীর ঐ প্রশ্নে ঠাকুর উত্তর করিলেন,—"কি করিব না করিব, আমি কিছুই জানি না, আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব।"

শ্রীমৎ তোতা—"তবে যাও, তোমার মাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। কারণ, আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিব না।"

ঠাকুর ঐ কথায় আর কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে ৺জগদম্বার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাণী শুনিতে পাইলেন,—"যাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে।"

অর্দ্ধবাহ্যভাবাবিষ্ট ঠাকুর তখন হর্ষোৎফুল্লবদনে তোতাপুরী গোস্বামীর সমীপে আসিয়া তাঁহার মাতার ঐরূপ প্রত্যাদেশ নিবেদন করিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিতা ৺দেবীকেই ঠাকুর প্রেমে ঐরূপে মাতৃসম্বোধন করিতেছেন বুঝিয়া, শ্রীমৎ তোতা তাঁহার বালকের ন্যায় সরল ভাবে মুগ্ধ হইলেও তাঁহার ঐ প্রকার স্বভাব অজ্ঞতা ও কুসংস্কারনিবন্ধন হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিলেন। ঐরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহার অধরপ্রান্তে একটু করুণা ও ব্যঙ্গপ্রসূত হাস্যের রেখা যে এখন দেখা দিয়াছিল, একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। কারণ, শ্রীমৎ তোতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বেদান্তোক্ত কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন দেব দেবীর নিকট মস্তক অবনত করিত না এবং ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ সংযত সাধকের ঐরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রে বিশ্বাস ভিন্ন তাঁহাকে ভক্তি ও উপাসনাদি করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিত না। আর ত্রিগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি মায়া ?—গোস্বামীজী উহাকে ভ্রমমাত্র বলিয়া ধারণা করিয়া উহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব-

শ্রীশ্রীজগদম্বা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ তোতার যেরূপ ধারণা ছিল।

স্বীকারের বা উহার প্রসন্নতার জন্য উপাসনার কোনরূপ আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। ফলতঃ অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য সাধকের নিজ পুরুষকার অবলম্বন ভিন্ন ঈশ্বর বা শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের কৃপাপূর্ণ সহায়তা প্রার্থনার কিঞ্চিন্মাত্র সাফল্য তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন না, এবং যাহারা ঐরূপ করে, তাহারা অজ্ঞানতা-প্রসূত সংস্কারবশতঃ করিয়া থাকে বলিয়া ভাবিতেন।

সে যাহা হউক, তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইয়া জ্ঞানমার্গের সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, ঠাকুরের মনের পূর্ব্বোক্ত সংস্কার অচিরে দূর হইবে ভাবিয়া তোতা তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে আর কিছু এখন না বলিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন এবং বলিলেন,—বেদান্তসাধনে উপদিষ্ট ও প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। ঠাকুর উহাতে স্বীকৃত হইতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—গোপনে ঐরূপ করিলে যদি হয় তাহা হইলে ঐরূপ করিতে তাঁহার কিছু মাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে ঐরূপ করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত প্রদান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। গোস্বামীজী উহাতে ঠাকুরের গুপ্তভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ের কারণ সবিশেষ বুঝিতে পারিলেন এবং "উত্তম কথা, শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে তোমাকে গোপনেই দীক্ষিত করিব" বলিয়া কালীবাটীর উদ্যানের উত্তরাংশে অবস্থিত রমণীয় পঞ্চবটীতলে আগমনপূর্ব্বক আপন আসন বিস্তীর্ণ করিলেন।

ঠাকুরের গুপ্তভাবে সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় ও উহার কারণ।

অনন্তর শুভদিনের উদয় জানিয়া শ্রীমৎ তোতা ঠাকুরকে

পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন এবং ঐ কার্য্য সমাধা হইলে শিষ্যের নিজ আত্মার তৃপ্তির জন্য যথাবিধানে পিণ্ডপ্রদান করাইলেন। কারণ, সন্ন্যাসদীক্ষাগ্রহণের সময় হইতে সাধক ভূরাদি সমস্ত লোক প্রাপ্তির আশা ও অধিকার নিঃশেষে বর্জ্জন করেন বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাকে তৎপূর্ব্বে আপন প্রেত-পিণ্ড আপনি প্রদান করিতে বলিয়াছেন।

ঠাকুরের সন্ন্যাসদীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বকার্য্য-সকল সম্পাদন।

ঠাকুর যখন যাহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন তখন নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তিনি যেরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন, অসীম বিশ্বাসের সহিত তাহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব শ্রীমৎ তোতা তাঁহাকে এখন যেরূপ করিতে বলিতে-ছিলেন তাহাই তিনি বর্ণে বর্ণে অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। শ্রাদ্ধাদি পূর্ব্বক্রিয়া সমাপন করিয়া তিনি সংযত হইয়া রহিলেন এবং পঞ্চবটীস্থ নিজ সাধনকুটীরে গুরুনির্দ্দিষ্ট দ্রব্যসকল আহরণ করিয়া সানন্দে শুভমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাত্রি অবসানে শুভ-ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের উদয় হইলে, গুরু ও শিষ্য উভয়ে কুটীরে সমাগত হইলেন। পূর্ব্বকৃত্য সমাপ্ত হইল, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং সনাতন কাল হইতে ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্ব-ত্যাগরূপ যে ব্রত গুরুপরম্পরাগত হইয়া ভারতকে এখনও ব্রহ্মজ্ঞ পদবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই ত্যাগব্রতা-বলম্বনের পূর্ব্বোচ্চার্য্য মন্ত্রসকলের পূত-গম্ভীর ধ্বনি পঞ্চবটীর বন উপবনসকলকে মুখরিত করিয়া তুলিল। পবিত্রসলিলা ভাগী-রথীর স্নেহসম্পূর্ণ কোমল বক্ষ সেই ধ্বনির সুখস্পর্শে স্পন্দিত

হওয়ায় তাঁহাতে নূতন জীবনের অপূর্ব্ব সঞ্চার প্রকাশিত হইল, এবং বহুকাল পরে আবার ভারতের এবং সমগ্র জগতের বহুজনহিতায় প্রকৃত সাধক সর্ব্বস্বত্যাগরূপ ব্রতাবলম্বন করিতেছেন জানাইয়াই তিনি যেন আনন্দকলগানে ঐ সংবাদ দিগন্তে বহন করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

গুরু মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন; শিষ্য অবহিতচিত্তে তাঁহাকে অনুসরণ পূর্ব্বক সেই সকল কথা উচ্চারণ করিয়া সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতিপ্রদানে প্রস্তুত হইলেন। প্রথমে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত হইল—

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে প্রার্থনামন্ত্র।

'পরব্রহ্মতত্ত্ব আমাকে প্রাপ্ত হউক্। পরমানন্দলক্ষণোপেত বস্তু আমাকে প্রাপ্ত হউক্। অখণ্ডৈকরস মধুময় ব্রহ্মবস্তু আমাতে প্রকাশিত হউক্। হে ব্রহ্মবিদ্যাসহ নিত্য বর্ত্তমান পরমাত্মন্, দেব-মনুষ্যাদি তোমার সমগ্র সন্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষ করুণাযোগ্য বালক সেবক; হে সংসাররূপ-দুঃস্বপ্নহারিন্ পরমেশ্বর, দ্বৈতপ্রতিভাসরূপ আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্ন বিনাশ কর। হে পরমাত্মন্, আমার যাবতীয় প্রাণবৃত্তি আমি নিঃশেষে তোমাতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া ত্বদেকচিত্ত হইতেছি। হে সর্ব্বপ্রেরক দেব, জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যাবতীয় মলিনতা আমা হইতে বিদূরিত করিয়া অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদিরহিত তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে আমাতে উপস্থিত হয় তাহাই কর। সূর্য্য, বায়ু, নদীসকলের স্নিগ্ধ নির্ম্মল বারি, ব্রীহিযবাদি শস্য, বনস্পতি-সমূহ, জগতের সকল পদার্থ তোমার নিদেশে অনুকূল প্রকাশযুক্ত হইয়া আমাকে তত্ত্বজ্ঞানলাভে সহায়তা করুক্। হে ব্রহ্মন্, তুমিই জগতে বিশেষ শক্তিমান্ নানা রূপে প্রকাশিত হইয়া

রহিয়াছ। শরীর মন শুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানধারণের যোগ্যতা লাভের জন্য আমি অগ্নি স্বরূপ তোমাতে আহুতি প্রদান করিতেছি—প্রসন্ন হও!"*

অনন্তর বিরজা হোম আরম্ভ হইল—"পৃথ্বী, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশরূপে আমাতে অবস্থিত ভূতপঞ্চ শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব-সম্পাদ্য বিরজা হোমের সংক্ষেপ ভাবার্থ।

"প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যানাদি, আমাতে অবস্থিত বায়ুসকল শুদ্ধ হউক; আহুতি দ্বারা রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"আমার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়-রূপ কোষ-পঞ্চ শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধপ্রসূত, আমাতে অবস্থিত বিষয়-সংস্কারসমূহ শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রজোগুণসুলভ মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"আমার মন, বাক্য, কায়, কর্ম্মাদি শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রজোগুণসুলভ মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃ-স্বরূপ হই—স্বাহা।

"হে অগ্নিশরীরে শয়ান, জ্ঞান-প্রতিবন্ধ-হরণ-কুশল, লোহিতাক্ষ পুরুষ, জাগরিত হও; হে অভীষ্টপূরণকারিন্, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক নাশপূর্ব্বক গুরুমুখে শ্রুত জ্ঞান যাহাতে আমার অন্তরে সম্যক্ উদিত হয় তাহাই করিয়া দাও; আমাতে

* ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রের ভাবার্থ।

যাহা কিছু বর্ত্তমান সে সকল সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রজঃপ্রসূত মলিনতা বিদূরিত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা!

"চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি, দারা, পুত্র, সম্পৎ, লোকমান্য, সুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসনা অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ত্যাগ করিতেছি—স্বাহা।"

ঠাকুরের শিখা সূত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ।

ঐরূপে বহু আহুতি প্রদত্ত হইবার পর 'ভূরাদি সকল লোক লাভের প্রত্যাশা আমি এইক্ষণ হইতে ত্যাগ করিলাম' এবং 'জগতের সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদান করিতেছি'—বলিয়া হোম পরিসমাপ্ত হইল; শিখা, সূত্র ও যজ্ঞোপবীত যথাবিধানে আহুতি দিয়া আবহমান কাল হইতে সাধকপরম্পরানিষেবিত গুরুপ্রদত্ত কৌপীন কাষায় ও নামে * ভূষিত হইয়া ঠাকুর শ্রীমৎ তোতার নিকটে উপদেশ গ্রহণের জন্য উপবিষ্ট হইলেন।

ঠাকুরের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য শ্রীমৎ তোতার প্রেরণা;

অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ তোতা ঠাকুরকে এখন, বেদান্তপ্রসিদ্ধ 'নেতি নেতি' উপায়াবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বলিলেন—

নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, দেশকালাদি দ্বারা সর্ব্বদা অপরিচ্ছিন্ন এক মাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য সত্য। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া

* আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ন্যাসদীক্ষা দানের সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী, ঠাকুরকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের পরম ভক্ত সেবক, শ্রীযুত মথুরামোহনই তাঁহাকে ঐ নামে প্রথম অভিহিত করেন। প্রথম মতটাই আমাদিগের সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

নিজপ্রভাবে তাঁহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতীত করাইলেও তিনি কখনও বাস্তবিক ঐরূপ নহেন। কারণ, সমাধিকালে মায়াজনিত দেশকাল বা নামরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় না। অতএব নামরূপের সীমার মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত তাহা কখনও নিত্য বস্তু হইতে পারে না, তাহাকেই দূরপরিহার কর। নামরূপের দৃঢ় পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও। সমাধিসহায়ে তাঁহাতে অবস্থান কর; দেখিবে, নামরূপাত্মক জগৎ তখন কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র আমিজ্ঞান বিরাটে লীন ও স্তব্ধীভূত হইবে এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে। "যে জ্ঞানাবলম্বনে এক ব্যক্তি অপরকে দেখে, জানে বা অপরের কথা শুনে, তাহা অল্প বা ক্ষুদ্র; যাহা অল্প, তাহা তুচ্ছ—তাহাতে পরানন্দ নাই; কিন্তু যে জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া এক ব্যক্তি অপরকে দেখে না, জানে না বা অপরের বাণী ইন্দ্রিয়গোচর করে না—তাহাই ভূমা বা মহান্, তৎসহায়ে পরমানন্দে অবস্থিতি হয়। যিনি সর্ব্বথা সকলের অন্তরে বিজ্ঞাতা হইয়া রহিয়াছেন, কোন্ মনবুদ্ধি তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হইবে?"

ঠাকুরের মনকে নির্বিকল্প করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ায় তোতার আচরণ এবং ঠাকুরের নির্বিকল্পসমাধিলাভ।

শ্রীমৎ তোতা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নানা যুক্তি ও সিদ্ধান্তবাক্যসহায়ে ঠাকুরকে সেদিন সমাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, তিনি যেন সেদিন তাঁহার আজীবন সাধনালব্ধ উপলব্ধিসমূহ অন্তরে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতভাবে সমাহিত করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

তিনি বলিতেন, "দীক্ষা প্রদান করিয়া ন্যাংটা নানা সিদ্ধান্তবাক্যের উপদেশ করিতে লাগিল এবং মনকে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিল। আমার কিন্তু এমনি হইল যে, ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে নির্ব্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডী ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ঐরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল মূর্ত্তি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথা এককালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল! সিদ্ধান্ত-বাক্যসকল শ্রবণপূর্ব্বক ধ্যানে বসিয়া যখন উপর্য্যুপরি ঐরূপ হইতে লাগিল তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি-সম্বন্ধে এক প্রকার নিরাশ হইলাম এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ন্যাংটাকে বলিলাম, 'হইল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলাম না।' ন্যাংটা তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, 'কেঁও, হোগা নেহি' অর্থাৎ—কি? হইবে না, এত বড় কথা? বলিয়া কুটীরের মধ্যে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্ন কাচখণ্ড দেখিতে পাইয়া উহা গ্রহণ করিল এবং সূচীর ন্যায় উহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন্।' তখন পুনরায় দৃঢ়সংকল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং ৺জগদম্বার শ্রীমূর্ত্তি পূর্ব্বের ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া উহা দ্বারা ঐ মূর্ত্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম! তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না; একেবারে হু হু করিয়া উহা সমগ্র নাম-রূপ-রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিনিমগ্ন হইলাম!"

ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধি যথার্থই লাভ করিয়াছেন কি না তৎবিষয়ে তোতার পরীক্ষা ও বিস্ময়

ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমাধিস্থ হইলে শ্রীমৎ তোতা অনেকক্ষণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট রহিলেন। পরে নিঃশব্দে কুটীরের বাহিরে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার অজ্ঞাতসারে পাছে কেহ কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক ঠাকুরকে বিরক্ত করে এজন্য দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন। অনন্তর কুটীরের অনতিদূরে পঞ্চবটীতলে নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য ঠাকুরের আহ্বান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দিন যাইল, রাত্রি আসিল। দিনের পর দিন আসিয়া দিবসত্রয় অতিবাহিত হইল। তথাপি ঠাকুর শ্রীমৎ তোতাকে দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিলেন না! তখন বিস্ময়-কৌতূহলে তোতা আপনিই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং শিষ্যের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন বলিয়া অর্গল মোচন করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—যেমন বসাইয়া গিয়াছিলেন ঠাকুর সেই ভাবেই বসিয়া আছেন, দেহে প্রাণের প্রকাশ মাত্র নাই, কিন্তু মুখ প্রশান্ত, গম্ভীর, জ্যোতিঃপূর্ণ! বুঝিলেন—বহির্জগৎ সম্বন্ধে শিষ্য এখনও সম্পূর্ণ মৃতকল্প—নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপবৎ তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করিতেছে!

সমাধিরহস্যজ্ঞ তোতা স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—যাহা দেখিতেছি তাহা কি বাস্তবিক সত্য—চল্লিশ বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহা কি এই মহাপুরুষ সত্য সত্যই এক দিবসে আয়ত্ত করিলেন! সন্দেহাবেগে তোতা পুনরায় পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন, তন্ন তন্ন করিয়া শিষ্যদেহে প্রকাশিত লক্ষণসকল অনুধাবন করিতে লাগিলেন। হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে কি না, নাসিকাদ্বারে বিন্দু-

মাত্র বায়ু নির্গত হইতেছে কি না, বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ধীর স্থির কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত শিষ্যশরীর বারম্বার স্পর্শ করিলেন। কিছুমাত্র বিকার বৈলক্ষণ্য বা চেতনার উদয় হইল না! তখন বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া তোতা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

'য়হ ক্যা দৈবী মায়া'—সত্য সত্যই সমাধি, বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম ফল, নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছে!—দেবতার এ কি অত্যদ্ভুত মায়া!

শ্রীমৎ তোতার ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ করিবার চেষ্টা।

অনন্তর সমাধি হইতে শিষ্যকে ব্যুত্থিত করিবেন বলিয়া তোতা প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন এবং 'হরি ওম্' মন্ত্রের সুগম্ভীর আরাবে পঞ্চবটীর স্থল-জল-ব্যোম পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পরে শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া এবং নির্ব্বিকল্প ভূমিতে তাহাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবেন, বলিয়া শ্রীমৎ তোতা কিরূপে এখানে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের সহায়ে কিরূপে নিজ আধ্যাত্মিক জীবন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিলেন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র* সবিস্তারে বলিয়াছি বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

একাদিক্রমে একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎ তোতা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। ঐ ঘটনার অব্যবহিত পরেই ঠাকুরের মনে দৃঢ় সঙ্কল্প উপস্থিত হইল, তিনি এখন হইতে নিরন্তর নির্ব্বিকল্প অদ্বৈত ভূমিতে অবস্থান করিবেন। কিরূপে তিনি ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন—জীব-কোটি সাধকবর্গের কথা দূরে থাকুক, অবতারপ্রতিম আধিকারিক

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৮ম অধ্যায়, ২৪৮—২৭০ পৃঃ।

পুরুষেরাও যে ঘনীভূত অদ্বৈতাবস্থায় বহুকাল অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন না, সেই ভূমিতে কিরূপে তিনি নিরন্তর ছয় মাস কাল অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—এবং ঐকালে কিরূপে জনৈক সাধু পুরুষ কালীবাটীতে আগমন পূর্ব্বক ঠাকুরের দ্বারা পরে লোককল্যাণ বিশেষরূপে সাধিত হইবে একথা জানিতে পারিয়া ছয় মাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া নানা উপায়ে তাঁহার শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র * বলিয়াছি। অতএব ঠাকুরের সহায়ে এইকালে মথুর বাবুর জীবনে যে বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

ঠাকুরের ভিতর নানা প্রকার অদ্ভুত দৈবশক্তির দর্শনে শ্রীযুত মথুরামোহনের ভক্তি বিশ্বাস ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই কালের একটী ঘটনায় সেই ভক্তি অধিকতর অচল অটল ভাব ধারণ পূর্ব্বক মথুরামোহনকে চিরকাল ঠাকুরের শরণাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

ঠাকুরের জগদম্বা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা।

মথুরামোহনের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী এইকালে গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হয়েন। রোগ ক্রমশঃ এত বাড়িয়া উঠে যে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বৈদ্য সকলে তাঁহার জীবন-রক্ষাসম্বন্ধে প্রথমে সংশয়াপন্ন এবং পরে হতাশ হয়েন।

ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, মথুরামোহন সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপবান্ দেখিয়াই রাসমণি তাঁহাকে প্রথমে নিজ তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৪৮—৫৭ পৃঃ।

সহিত এবং ঐ কন্যার মৃত্যু হইলে পুনরায় নিজ কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। অতএব বিবাহের পরেই শ্রীযুত মথুরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং স্বায় বুদ্ধিবলে ও কর্ম্মকুশলতায় ক্রমে তিনি নিজ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠেন। অনন্তর রাণী রাসমণির মৃত্যু হইলে কিরূপে তিনি রাণীর বিষয়সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিচালনায় একরূপ একাধিপত্য লাভ করেন তাহা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছি।

শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়ায় মথুরামোহন এখন যে কেবল প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইতে বসিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর বিষয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত আধিপত্যও হারাইতে বসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনের এখনকার অবস্থাসম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

রোগীর অবস্থা দেখিয়া যখন ডাক্তার বৈদ্যেরা জবাবদিয়া গেলেন মথুর তখন কাতর হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কালীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধানে পঞ্চবটীতে আসিলেন। তাঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তপ্রায় অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সযত্নে পার্শ্বে বসাইলেন এবং ঐরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মথুর তাহাতে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া সজলনয়নে গদ গদ বাক্যে সকল কথা নিবেদন করিয়া দানভাবে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'আমার যাহা হইবার তাহা ত হইতে চলিল; বাবা, তোমার সেবাধিকার হইতেও এইবার বঞ্চিত হইলাম, তোমার সেবা আর করিতে পাইব না।'

মথুরের ঐরূপ দৈন্য দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় পূর্ণ

হইল। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, 'ভয় নাই, তোমার পত্নী আরোগ্য হইবে!' বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিতেন, সুতরাং, তাঁহার অভয়বাণীতে প্রাণ পাইয়া সেদিন বিদায়গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জানবাজারে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দেখিলেন, সহসা জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে! ঠাকুর বলিতেন, "সেই দিন হইতে জগদম্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল এবং তাহার ঐ রোগটার ভোগ (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই শরীরের উপর দিয়া হইতে থাকিল; জগদম্বা দাসীকে ভাল করিয়া ছয়মাস কাল পেটের পীড়া ও অন্যান্য যন্ত্রণায় ভুগিতে হইয়াছিল!"

শ্রীযুত মথুরের ঠাকুরের প্রতি অদ্ভুত প্রেমপূর্ণ-সেবার কথা আলোচনা করিবার সময় ঠাকুর একদিন আমাদিগের নিকট পূর্ব্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মথুর যে চৌদ্দ বৎসর সেবা করিয়াছিল তাহা কি অমনি করিয়াছিল?—মা, তাহাকে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর দিয়া নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত সব দেখাইয়াছিলেন, সে জন্যই সে অত সেবা করিয়াছিল।"

ষোড়শ অধ্যায়

বেদান্তসাধনের শেষকথা ও ইসলামধর্ম্মসাধন।

শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আরোগ্য করিয়াই হউক অথবা অদ্বৈত-ভাব-ভূমিতে নিরন্তর অবস্থানের জন্য ঠাকুর দীর্ঘ ছয় মাস কাল ধরিয়া যে অমানুষী চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ফলেই হউক তাঁহার দৃঢ় শরীর ভগ্ন হইয়া এখন কয়েক মাস রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি, ঐ সময়ে তিনি আমাশয় পীড়ায় কঠিনভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় নিরন্তর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিল, এবং শ্রীযুত মথুর তাঁহাকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করিবার জন্য প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসা ও পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শরীর ঐরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও ঠাকুরের দেহবোধবিবর্জ্জিত মন এখন কি যে অপূর্ব্ব শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থান করিত তাহা বলিবার নহে। বিন্দুমাত্র উত্তেজনায়* উহা শরীর, ব্যাধি এবং সংসারের সকল বিষয় হইতে পৃথক্ হইয়া দূরে নির্ব্বিকল্প ভূমিতে এককালে উপনীত হইত, এবং ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের স্মরণমাত্রেই অন্য সকল কথা ভুলিয়া তন্ময় হইয়া কিছুকালের জন্য আপনার পৃথগস্তিত্ববোধ সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিত! সুতরাং ব্যাধির প্রকোপে শরীরে

ঠাকুরের কঠিন ব্যাধি। ঐ কালে তাঁহার মনের অপূর্ব্ব আচরণ।

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, ২য় অধ্যায়—৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইলেও তিনি যে, উহার সামান্যমাত্রই উপলব্ধি করিতেন, একথা বুঝিতে পারা যায়। তবে, ঐ ব্যাধির যন্ত্রণা সময়ে সময়ে তাঁহার মনকে উচ্চভাবভূমি হইতে নামাইয়া শরীরে যে নিবিষ্ট করিত, একথাও আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, এই কালেই আবার তাঁহার নিকটে বেদান্তমার্গ-বিচরণশীল সাধকাগ্রণী পরমহংসসকলের আগমন হইয়াছিল এবং 'নেতি নেতি', 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদান্তপ্রসিদ্ধ তত্ত্বসমূহের বিচারধ্বনিতে তাঁহার বাসগৃহ নিরন্তর মুখরিত হইয়া থাকিত।* বেদান্তপ্রসিদ্ধ ঐসকল উচ্চ তত্ত্বের বিচারকালে তাঁহারা যখন কোন বিষয়ে সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেন না, ঠাকুরকেই তখন মধ্যস্থ হইয়া উহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইত। বলা বাহুল্য, ইতর সাধারণের ন্যায় ব্যাধির প্রকোপে নিরন্তর মুহ্যমান হইয়া থাকিলে কঠোর দার্শনিক বিচারে ঐরূপে প্রতিনিয়ত যোগদান করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না।

অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ঠাকুরের দর্শন—ঐ দর্শনের ফলে তাঁহার উপলব্ধিসমূহ।

আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, নির্ব্বিকল্প ভূমিতে নিরন্তর অবস্থান-কালের শেষভাগে ঠাকুরের এক বিচিত্র দর্শন বা উপলব্ধি উপস্থিত হইয়াছিল। ভাবমুখে অবস্থান করিবার জন্য তিনি তৃতীয়বার আদিষ্ট হইয়াছিলেন।† 'দর্শন' বলিয়া ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিলেও উহা যে তাঁহার প্রাণে প্রাণে উপলব্ধির কথা ইহা পাঠক বুঝিয়া লইবেন। কারণ, পূর্ব্ব দুইবারের ন্যায় ঠাকুর

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—২য় অধ্যায়—৪৮—৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

† বর্ত্তমান গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় দেখ।

এই কালে কোন দৃষ্ট মূর্ত্তির মুখে ঐ কথা শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু তুরীয়, অদ্বৈতভাবে একেবারে একীভূত হইয়া অবস্থান করিবার কালে যখন তাঁহার মন কথঞ্চিৎ পৃথক্ হইয়া কখন কখন আপনাকে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের বা শ্রীশ্রীজগদম্বার অংশ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছিল তখন উহা বিরাট ব্রহ্মের বিরাট মনে ঐরূপ ভাব বা ইচ্ছার বিদ্যমানতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিল †· ঐ উপলব্ধি হইতে তাঁহার নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা তাঁহার সম্মুখে এখন সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কারণ, শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিন্দুমাত্র বাসনা অন্তরে না থাকিলেও শ্রীশ্রীজগদম্বার বিচিত্র ইচ্ছায় ঐরূপে পুনরায় ভাবমুখে অবস্থান কবিতে আদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এখন বুঝিতে পারিলেন যে, নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও ভগবল্লীলাপ্রয়োজনের জন্য তাঁহাকে অতঃপর দেহ রক্ষা করিতে হইবে এবং নিত্যকাল ব্রহ্মে অবস্থান করিলে শরীর থাকা সম্ভবপর নহে বলিয়াই তিনি ঐরূপ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। পরে জাতিস্মরত্বসহায়ে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাববান্ আধিকারিক অবতার পুরুষ, বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মগ্লানি দূর করিয়া লোককল্যাণ সাধনের জন্যই তাঁহাকে দেহধারণ ও তপস্যাদিসাধন করিতে হইয়াছে। বুঝিতে পারিলেন, শ্রীশ্রীজগন্মাতা উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্যই এবার তাঁহাকে বাহ্যৈশ্বর্য্যের আড়ম্বরপরিশূন্য করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে নিরক্ষর করিয়া আনয়ন কয়িয়াছেন। বুঝিলেন, শ্রীশ্রীজগন্মাতার এ লীলারহস্য তাঁহার জীবৎকালে স্বল্পলোকেই ধরিতে বুঝিতে সমর্থ হইবে এবং

---

† গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, ৩য় অধ্যায়—৯৯ হইতে ১০৪ পৃষ্ঠা দেখ।

ইতরসাধারণে ঐ কথা বুঝিতে আরম্ভ করিলেই মাতা নিজ সন্তানকে আপন অঙ্গে মিলিত করিয়া লইবেন—কিন্তু তাঁহার শরীরমনের দ্বারা যে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ জগতে উদিত হইবে তাহা সর্ব্বতোভাবে অমোঘ থাকিয়া তিনি দেহ রক্ষা করিবার পরেও অনন্তকাল জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিতে থাকিবে।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে সাধকের জাতিস্মরত্ব-লাভসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা।

ঐরূপ অসাধারণ উপলব্ধিসকল ঠাকুরের কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল বুঝিতে হইলে শাস্ত্রের কয়েকটি কথা আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন, অদ্বৈতভাব-সহায়ে জ্ঞানস্বরূপে পূর্ণরূপে অবস্থান করিবার পূর্ব্বে সাধক জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। * অথবা, ঐ ভাবের পরিণামে তাঁহার স্মৃতি তখন এতদূর পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, ইতি-পূর্ব্বে তিনি যে ভাবে, যথায়, যতবার শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ঐ জন্মসকলে যাহা কিছু সুকৃত দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে সকল কথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইয়া থাকে। ফলে, সংসারের সকল বিষয়ের নশ্বরতা এবং রূপরসাদি ভোগসুখের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বারম্বার একই ভাবে জন্মপরিগ্রহের নিষ্ফলতা সম্যক্ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ঐ বৈরাগ্য-সহায়ে তাঁহার প্রাণ সর্ব্ববিধ বাসনা হইতে এককালে পৃথক্ হইয়া দণ্ডায়মান হয়।

* সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানং। পাতঞ্জলসূত্র-বিভূতিপাদ, ১৮শ সূত্র।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সাধকের সর্ব্বপ্রকার যোগ-বিভূতি ও সিদ্ধ-সঙ্কল্পত্বলাভসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা।

উপনিষদ্ বলেন, * ঐরূপ পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প হয়েন এবং দেব পিতৃ প্রভৃতি যখন যে লোক প্রত্যক্ষ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় তখনই তাঁহার মন সমাধি-বলে ঐ সকল লোক সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। মহামুনি পতঞ্জলি তৎকৃত যোগশাস্ত্রে ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ পুরুষে সর্ব্ববিধ বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্যের উদয় হইয়া থাকে। আবার, পঞ্চদশীকার সায়ন-মাধব ঐরূপ পুরুষের বাসনারাহিত্য এবং যোগৈশ্বর্য্যলাভ উভয় কথার সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ বিচিত্র ঐশ্বর্য্যসকল লাভ করিলেও বাসনা না থাকায় তাঁহারা ঐ সকল শক্তি নিজ ভোগসুখলাভের জন্য কখনও প্রয়োগ করেন না। সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছাধীন থাকিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে আধিকারিক † পুরুষেরাই কেবল কখন কখন বহুজনহিতায় ঐ শক্তিসকলের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পঞ্চদশীকার বলেন, ঐজন্য পুরুষ সংসারে যে অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করেন, ঐ জ্ঞানলাভের পরে তদবস্থাতেই কালাতিপাত করেন, সমর্থ হইলেও ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা কিছুমাত্র অনুভব করেন না।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রকথানুসারে ঠাকুরের জীবনালোচনায় তাঁহার অপূর্ব্ব উপলব্ধিসকলের কারণ বুঝা যায়।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় কথাসকল স্মরণ রাখিয়া ঠাকুরের বর্ত্তমান জীবনের অনুশীলনে তাঁহার এই কালের বিচিত্র অনুভূতিসকল সম্যক্ না হইলেও অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়। বুঝা যায় যে, তিনি ভগবৎপাদপদ্মে অন্তরের সহিত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সর্ব্ব-প্রকারে বাসনাপরিশূন্য হইয়াছিলেন বলিয়াই

---

* ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৮ম প্রপাঠক—২য় খণ্ড। † লোককল্যাণ সাধনের জন্য যাঁহারা বিশেষ অধিকার বা শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

অত স্বল্পকালে ব্রহ্মজ্ঞানের নির্ব্বিকল্প ভূমিতে উঠিতে এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুঝা যায় যে, তিনি জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়াই এইকালে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যিনি 'শ্রীরাম' এবং 'শ্রীকৃষ্ণ' রূপে আবির্ভূত হইয়া লোককল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, তিনিই বর্ত্তমান কালে পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ' রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বুঝা যায় যে, লোককল্যাণ-সাধনের জন্য পরজীবনে তাঁহাতে বিচিত্র বিভূতিসকলের প্রকাশ নিত্য দেখিতে পাইলেও কেন আমরা কখনও তাঁহাকে আপন শরীরমনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঐ সকল দিব্যশক্তির প্রয়োগ করিতে দেখিতে পাই না। বুঝা যায়, কেন তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি অপরের মধ্যে জাগরিত করিয়া দিতে সমর্থ হইতেন; এবং বুঝা যায়, কেন তাঁহার দিব্যপ্রভাব দিন দিন পৃথিবীর সকল দেশে অপূর্ব্ব আধিপত্যলাভ করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধিসকল ঠাকুরের যুগপৎ উপস্থিত না হইবার কারণ।

অদ্বৈতভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভাবরাজ্যে পুনরায় অবরোহণ করিবার কালে ঠাকুর ঐরূপে নিজ জীবনের ভূতভবিষ্যৎ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ উপলব্ধিসকল তাঁহাতে যে, সহসা একদিন যুগপৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না। আমাদিগের অনুমান, ভাবভূমিতে অবরোহণের পরে বৎসরকালের মধ্যে তিনি ঐ সকল কথা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঐ কালে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে আবরণের পর আবরণ উঠাইয়া দিন দিন তাঁহাকে ঐ সকল কথা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধিসকল ঠাকুরের মনে যুগপৎ কেন উপস্থিত হয় নাই তদ্বিষয়ের কারণ

জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে বলিতে হয় যে, অদ্বৈতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক গভীর ব্রহ্মানন্দসম্ভোগে তিনি এইকালে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। সুতারং তাঁহার মন যতদিন না বহির্মুখী বৃত্তি পুনরায় অবলম্বন করিয়াছিল ততদিন ঐ সকল বিষয় উপলব্ধি করিবার তাঁহার অবসর ছিল না এবং প্রবৃত্তিও হয় নাই। সে যাহা হউক, সাধনকালের প্রারম্ভে ঠাকুর যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'মা আমি কি করিব, তাহা কিছুই জানি না, তুই স্বয়ং আমাকে যাহা শিখাইবি, তাহাই শিখিব'—তাহা এই কালে পূর্ব্বোক্তরূপে পূর্ণ হইয়াছিল।

অদ্বৈত-ভাব-ভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের এই কালে আর একটী বিষয়ও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ব্ববিধ সাধন-ভজনের চরম উদ্দেশ্য। কারণ, ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই জন্য আমাদিগকে বারম্বার বলিতেন, 'উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা, ঈশ্বর-প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্ব্বশেষে উহা সাধক-জীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়; জানিবি, সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত, তত পথ।'

অদ্বৈতভাব লাভ করাই সকল সাধনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঠাকুরের উপলব্ধি।

ঐরূপে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া ঠাকুরের মন অসীম উদারতা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বরলাভকে যাহারা মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া শিক্ষা প্রদান করে, ঐরূপ সকল সম্প্রদায়ের

প্রতি উহা এখন অপূর্ব্ব সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ উদারতা এবং সহানুভূতি যে তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি, এবং পূর্ব্বযুগের কোন সাধকাগ্রণী যে, উহা তাঁহার ন্যায় পূর্ণভাবে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, এ কথা প্রথমে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এবং প্রসিদ্ধ তীর্থসকলে নানা সম্প্রদায়ের প্রবীণ সাধকসকলের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে তাঁহার ঐ কথার উপলব্ধি হইয়াছিল বলিয়াই আমাদিগের ধারণা; কিন্তু এখন হইতে তিনি ধর্ম্মের একদেশী ভাব অবলোকন করিলেই প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ হীনবুদ্ধি দূর করিতে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন।

পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধি তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কেহ পূর্ণভাবে করে নাই।

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঠাকুরের মন এখন কিরূপ উদার ভাবসম্পন্ন হইয়াছিল তাহা আমরা এই কালের একটী ঘটনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি, ঐ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে ঠাকুরের শরীর কয়েক মাসের জন্য রোগাক্রান্ত হয়। ব্যাধির হস্ত হইতে তাঁহার মুক্ত হইবার পরে উল্লিখিত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের মনের উদারতা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—তাঁহার ইসলামধর্ম্মসাধন।

গোবিন্দ রায় নামক এক ব্যক্তি এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ধর্ম্মান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। হৃদয় বলেন, ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। সম্ভবতঃ পারসী ও আরবী ভাষায় ইঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা মতামত আলোচনা করিয়া এবং নানা সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া ইনি পরিশেষে ইসলাম ধর্ম্মের উদার মতে আকৃষ্ট হইয়া যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ধর্ম্মপিপাসু গোবিন্দ ইসলামের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেও উহার সামাজিক নিয়মপদ্ধতি

কতদূর অনুসরণ করিতেন, বলিতে পারি না। কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অবধি তিনি যে, কোরাণ পাঠ এবং তদুক্ত প্রণালীতে সাধনভজনে মহোৎসাহে নিযুক্ত ছিলেন, একথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। গোবিন্দ প্রেমিক ছিলেন। বোধ হয়, ইস্‌লামের সুফি সম্প্রদায়ে প্রচলিত শিক্ষা এবং ভাবসহায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার পদ্ধতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কারণ, ঐ সম্প্রদায়ের দরবেশদিগের মত তিনি এখন ভাবসাধনে অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিতেন।

সুফি গোবিন্দ রায়ের আগমন।

যেরূপেই হউক, গোবিন্দ এখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হয়েন এবং সাধনানুকূল বুঝিয়া পঞ্চবটীর শান্তিপ্রদ ছায়ায় আসনবিস্তীর্ণ করিয়া কিছুকাল কাটাইতে থাকেন। রাণী রাসমণির কালীবাটীতে, তখন হিন্দু সংসারত্যাগীদের ন্যায় মুসলমান ফকীরগণেরও সমাদর ছিল,* এবং কালীবাটীর আতিথ্য উভয় দলের উপরেই সমভাবে বর্ষিত হইত। অতএব এখানে থাকিবার কালে গোবিন্দের ভিক্ষাটনাদি করিতে হইত না এবং ইষ্টচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া তিনি সানন্দে দিন যাপন করিতেন।

গোবিন্দের সহিত আলাপ করিয়া ঠাকুরের সঙ্কল্প।

প্রেমিক গোবিন্দকে দেখিয়া ঠাকুর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়েন, এবং তাঁহার সহিত আলপে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সরল বিশ্বাস ও প্রেমে মুগ্ধ হয়েন। ঐরূপে ঠাকুরের মন এখন ইসলামধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি ভাবিতে থাকেন, 'ইহাও ত ঈশ্বরলাভের এক পথ, অনন্তলীলাময়ী মা এপথ দিয়াও ত কত লোককে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মলাভে ধন্য করিতেছেন; এ পথ দিয়া কিরূপে তিনি তাঁহার আশ্রিতদিগকে কৃতার্থ করেন

তাহা দেখিতে হইবে, গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া ঐভাব-সাধনে নিযুক্ত হইব।'

যে চিন্তা, সেই কাজ। ঠাকুর গোবিন্দকে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যথাবিধি ইসলামধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ঐ সময়ে 'আল্লা' মন্ত্র জপ করিতাম, মুসলমানদিগের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়িতাম, এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দুর দেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক, দর্শন পর্য্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ঐভাবে তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পরে ঐ মতের সাধনফল সম্যক্ হস্তগত হইয়াছিল।" ইসলামধর্ম্মসাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট, সুগম্ভীর জ্যোতির্ম্ময় পুরুষপ্রবরের দিব্য দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পরে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধি পূর্ব্বক তুরীয় নিগুর্ণব্রহ্মে তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছিল।

গোবিন্দের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনে ঠাকুরের সিদ্ধিলাভ।

হৃদয় বলেন, মুসলমানধর্ম্মসাধনের সময় ঠাকুর, মুসলমান-দিগের খাদ্যসকল, এমন কি গোমাংস গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। মথুরামোহনের সানুনয় অনুরোধই তখন তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিয়াছিল। বালকস্বভাব ঠাকুরের ঐরূপ ইচ্ছা অন্ততঃ আংশিক পূর্ণ না হইলে তিনি কখন নিরস্ত হইবেন না ভাবিয়া মথুর ঐ সময়ে এক মুসলমান পাচক আনাইয়া তাহার নির্দ্দেশে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা মুসলমানদিগের প্রণালীতে খাদ্যসকল রন্ধন করাইয়া ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছিলেন। মুসলমানধর্ম্ম সাধনের সময় ঠাকুর কালীবাটীর অভ্যন্তরে একবারও পদার্পণ

মুসলমানধর্ম্ম সাধনকালে ঠাকুরের আচরণ।

করেন নাই। উহার বাহিরে অবস্থিত মথুরামোহনের কুঠিতেই থাকিতেন।

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান জাতি কালে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, ঠাকুরের ইসলাম মত সাধনে ঐ বিষয় বুঝা যায়।

বেদান্তসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মন অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় এবং একমাত্র বেদান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকুল পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে একথাও হৃদয়ঙ্গম হয়। নতুবা ঠাকুর যেমন বলিতেন, 'হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্ব্বত ব্যবধান রহিয়াছে—পরস্পরের চিন্তাপ্রণালী, ধর্ম্মবিশ্বাস ও কার্য্যকলাপ এতকাল একত্র বাসেও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে।' ঐ পাহাড় যে একদিন অন্তর্হিত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমানধর্ম্মসাধন কি তাহারই সূচনা করিয়া যাইল?

পরবর্ত্তীকালে ঠাকুরের মনে অদ্বৈতস্মৃতি কত দূর প্রবল ছিল।

নির্ব্বিকল্প ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ঠাকুরের এখন দ্বৈতভূমির সীমান্তরালে অবস্থিত বিষয় ও ব্যক্তিসকলকে দেখিয়া অদ্বৈতস্মৃতি অনেক সময় সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিত এবং তাঁহাকে তুরীয়ভাবে লীন করিত। সঙ্কল্প না করিলেও সামান্য মাত্র উদ্দীপনায় আমরা তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। অতএব এখন হইতে তিনি সঙ্কল্প করিবামাত্র যে, ঐ ভূমিতে আরোহণে সমর্থ ছিলেন, এ কথা বলা বাহুল্য। অদ্বৈতভাব যে, তাঁহার কতদূর অন্তরের পদার্থ ছিল তাহা পূর্ব্বোক্তপ্রকার সামান্য বিষয়সকল হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, এবং

বুঝা যায় যে ঐ ভাব তাঁহার হৃদয়ে যেমন দুরবগাহ তেমনই দূর প্রচারী ছিল। ঠাকুরের জীবন হইতে ঐ ভাবের পরিচায়ক কয়েকটী ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন।

ঐ বিষয়ক কয়েকটী দৃষ্টান্ত—(১) বৃদ্ধ ঘেসেড়া।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যান বর্ষাকালে তৃণাচ্ছন্ন হওয়ায় মালিদিগের তরিতরকারি বপনের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। তজ্জন্য ঘেসেড়াদিগকে ঐ সময়ে ঘাস কাটিয়া লইবার অনুমতি প্রদান করা হয়। একজন বৃদ্ধ ঘেসেড়া একদিন ঐরূপে বিনা-মূল্যে ঘাস লইবার অনুমতি পাইয়া সানন্দে ঘাস কাটিতেছিল এবং পরে মোট বাঁধিয়া উহা বাজারে বিক্রয় করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিল। ঠাকুর দেখিতে পাইলেন, লোভে পড়িয়া সে এত ঘাস কাটিয়াছে যে, ঐ ঘাসের বোঝা লইয়া যাওয়া বৃদ্ধের শক্তিতে সম্ভবে না। দরিদ্র ঘেসেড়া কিন্তু ঐ বিষয় কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বৃহৎ বোঝাটী মাথায় তুলিয়া লইবার জন্য নানারূপে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও উহা উঠাইতে পারিতেছিল না। ঐ বিষয় দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। ভাবিলেন, অন্তরে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান এবং বাহিরে এত নিবু্দ্ধিতা, এত অজ্ঞান! 'হে রাম, তোমার বিচিত্র লীলা!'—বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন!

(২) আহত পতঙ্গ।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর দেখিলেন একটী পতঙ্গ (ফড়িং) উড়িয়া আসিতেছে এবং উহার গুহ্যদেশে একটী লম্বা কাটি বিদ্ধ রহিয়াছে। কোন দুষ্ট বালকে ঐরূপ করিয়াছে ভাবিয়া তিনি প্রথমে ব্যথিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবাবিষ্ট হইয়া 'হে রাম, তুমি আপনার দুর্দ্দশা আপনি করিয়াছ' বলিয়া হাস্যের রোল উঠাইলেন!

কালীবাটীর উদ্যানের স্থানবিশেষ নবীন দূর্ব্বাদলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এক সময়ে রমণীয়দর্শন হইয়াছিল। ঠাকুর উহা দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার নিজ অঙ্গ বলিয়া তখন অনুভব করিতেছিলেন; এমন সময়ে সহসা এক ব্যক্তি ঐস্থানের উপর দিয়া অন্যত্র গমন করিতে লাগিল। তিনি উহাতে নিজ বক্ষের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া এককালে অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "বুকের উপর দিয়া কেহ চলিয়া যাইলে যেমন যন্ত্রণার অনুভব হয় ঐ কালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম। ঐরূপ ভাবাবস্থা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, আমার উহা ছয় ঘণ্টাকাল মাত্র ছিল, তাহাতেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম।'

(৩) পদদলিত নবীন দুর্ব্বাদিল।

কালীবাটীর চাঁদনি-সমাযুক্ত বৃহৎ ঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে গঙ্গাদর্শন করিতেছিলেন। ঘাটে তখন দুইখানি নৌকা লাগিয়াছিল এবং মাঝিরা কোন বিষয় লইয়া পরস্পর কলহ করিতেছিল। কলহ ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া সবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের পৃষ্ঠদেশে বিষম চপেটাঘাত করিল। ঠাকুর উহাতে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতর ক্রন্দন কালীঘরে হৃদয়ের কর্ণে প্রবেশ করায় সে দ্রুতপদে তথায় আগমনপূর্ব্বক দেখিল তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম হইয়াছে এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়া হৃদয় বারম্বার বলিতে লাগিল, 'মামা, কে তোমায় মারিয়াছে দেখাইয়া দাও, আমি তার মাথাটা ছিঁড়িয়া লই।' পরে ঠাকুর কথঞ্চিৎ

(৪) নৌকায় মাঝিদ্বয়ের পরস্পর কলহে ঠাকুরের নিজ শরীরে আঘাতানুভব।

শান্ত হইলে ঘটনা শুনিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইহাও কি কখন সম্ভবপর! ঘটনাটী শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরূপ অনেক ঘটনার* উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাহুল্য বোধে আমরা নিরস্ত হইলাম।

সপ্তদশ অধ্যায়।

জন্মভূমিসন্দর্শন।

প্রায় ছয়মাস কাল ভুগিয়া ঠাকুরের শরীর অবশেষে ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইল, এবং মন ভাবমুখে দ্বৈতাদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিতে অনেকাংশে অভ্যস্ত হইয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার শরীর তখনও পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হয় নাই। সুতরাং বর্ষাগমে গঙ্গার জল লবণাক্ত হইলে বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাবে তাঁহার পেটের পীড়া যে পুনরায় দেখা দিবে না, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা কি? অতএব স্থির হইল, এখন তাঁহার কয়েকমাসের জন্য জন্মভূমি কামারপুকুরে গমন করাই শ্রেয়ঃ। তখন সন ১২৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ হইবে।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন।

আয়োজন হইতে লাগিল। মথুর-পত্নী ভক্তিমতী জগদম্বা দাসী, কামারপুকুরের ঠাকুরের সংসার, শিবের সংসারের ন্যায় চিরদরিদ্র বলিয়া জানিতেন। অতএব সেখানে যাইয়া 'বাবা'-কে যাহাতে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, ২য় অধ্যায়—৭৪,৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

কোন বিষয়ের জন্য কষ্ট পাইতে না হয়, এরূপভাবে সকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিয়া দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। * অনন্তর শুভ মুহূর্ত্তের উদয় হইলে, ঠাকুর যাত্রা করিলেন। হৃদয় ও ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার সঙ্গে যাইল। তাঁহার বৃদ্ধা জননী কিন্তু গঙ্গাতীরে বাস করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাই স্থির রাখিয়া দক্ষিণেশ্বরে, মথুরের নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রায় আট বৎসরকাল ঠাকুর কামারপুকুরে আগমন করেন নাই, সুতরাং তাঁহার আত্মীয়বর্গ যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন একথা বলা বাহুল্য। কখনও স্ত্রীবেশ ধরিয়া 'হরি হরি' করিতেছেন, কখনও সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কখনও 'আল্লা আল্লা' বলিতেছেন, প্রভৃতি তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হওয়ায় ঐরূপ হইবার বিশেষ কারণ যে ছিল একথা বলিতে হইবে না। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদিগের মধ্যে আসিবামাত্র তাঁহাদিগের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল।

ঠাকুরকে তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ যেভাবে দেখিয়া ছিল।

তাঁহারা দেখিলেন, তিনি পূর্ব্বে যেমন ছিলেন এখনও তদ্রূপ আছেন। সেই অমায়িকতা, সেই প্রেমপূর্ণ হাস্য-পরিহাস, সেই কঠোর সত্যনিষ্ঠা, সেই ধর্ম্মপ্রাণতা, সেই হরিনামে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হওয়া—সেই সকলই তাঁহাতে পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, কেবল, কি একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় দিব্যাবেশ তাঁহার শরীরমনকে সর্ব্বদা এমন সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে যে সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইতে, এবং তিনি স্বয়ং ঐরূপ না করিলে ক্ষুদ্র সংসারের বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে,

* গুরুভাব উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়, ১২ ও ১৩ পৃষ্ঠা দেখ

হৃদয়ে কোথা হইতে বিষম সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার, নিকটে থাকিলে সংসারের সকল দুর্ভাবনা যেমন কোথায় অপসারিত হইয়া প্রাণে একটী ধীর স্থির আনন্দ ও শান্তি প্রবাহিত থাকে, দূরে যাইলে তেমনি পুনরায় তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য কি একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক, বহুকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া এই দরিদ্র সংসারে এখন আনন্দের হাটবাজার বসিল, এবং নববধূকে আনাইয়া সুখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্য, রমনীগণের নির্দ্দেশে ঠাকুরের শ্বশুরালয় জয়রামবাটী গ্রামেও লোক প্রেরিত হইল। ঠাকুর ঐ বিষয় জানিতে পারিয়া উহাতে বিশেষ সম্মতি বা আপত্তি কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বিবাহের পর নববধূর ভাগ্যে একবার মাত্র স্বামিসন্দর্শন লাভ হইয়াছিল। কারণ তাঁহার সপ্তম বর্ষ বয়সকালে কুলপ্রথানুসারে ঠাকুরকে একদিন জয়রামবাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তিনি নিতান্ত বালিকা, ঐ বিষয় বুঝিবার কিছুমাত্র অধিকারিণী ছিলেন না। সুতরাং ঐ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার এইটুকুমাত্রই মনে ছিল যে, হৃদয়ের সহিত ঠাকুর তাঁহার পিত্রালয়ে আসিলে বাটীর কোন নিভৃত অংশে তিনি লুকাইয়াও পরিত্রাণ পান নাই। কারণ, কোথা হইতে অনেকগুলি পদ্মফুল আনিয়া কিছুক্ষণ বাদে হৃদয় তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল এবং লজ্জা ও ভয়ে তিনি নিতান্ত সঙ্কুচিত হইলেও পাদপদ্ম পূজা করিয়াছিল। ঐ ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পরে তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহাকে কামারপুকুরে প্রথম লইয়া যাওয়া হয়। সেবার তাঁহাকে তথায় একমাস থাকিতেও হইয়াছিল। কিন্তু, ঠাকুর ও ঠাকুরের জননী তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকায় উভয়ের কাহাকেও দেখা তাঁহার ভাগ্যে হইয়া

উঠে নাই। উহার ছয় মাস আন্দাজ পরে পুনরায় শ্বশুরালয়ে আগমন পূর্ব্বক দেড়মাস কাল থাকিয়াও পূর্ব্বোক্ত কারণে তিনি তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পান নাই। মাত্র তিন চারি মাস তাঁহার তথা হইতে পিত্রালয়ে ফিরিবার পরেই এখন সংবাদ আসিল—ঠাকুর আসিয়াছেন, তাঁহাকে কামারপুকুরে যাইতে হইবে। তিনি তখন ছয় সাত মাস হইল চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে গেলে, বিবাহের পরে ইহাই তাঁহায় প্রথম স্বামিসন্দর্শন।

শ্রীশ্রীমার কামার পুকুরে আগমন।

কামারপুকুরে ঠাকুর এবার ছয়, সাত মাস ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বাল্যবন্ধুগণ এবং গ্রামস্থ পরিচিত স্ত্রীপুরুষ সকলে তাঁহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় মিলিত হইয়া তাঁহার প্রীতিসম্পাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরও বহুকাল পরে তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমের পর অবসরলাভে চিন্তাশীল মনীষিগণ বালকবালিকাদিগের অর্থহীন উদ্দেশ্যরহিত ক্রীড়াদিতে যোগদান করিয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করেন, কামারাপুকুরের স্ত্রী-পুরুষ সকলের ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনে যোগদান করিয়া ঠাকুরের বর্ত্তমান আনন্দ তদ্রূপ হইয়াছিল। তবে, ইহজীবনের নশ্বরতা অনুভব করিয়া যাহাতে তাহারা সংসারে থাকিয়াও ধীরে ধীরে সংযত হইতে এবং সকল বিষয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষালাভ করে তদ্বিষয়ে তিনি যে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন একথা নিশ্চয় বলা যায়। ক্রীড়া, কৌতুক, হাস্য, পরিহাসের ভিতর দিয়া তিনি আমাদিগকে নিরন্তর ঐ সকল বিষয় যে ভাবে শিক্ষা দিতেন তাহা হইতে আমরা পূর্ব্বোক্ত কথা অনুমান করিতে পারি।

আত্মীয়বর্গ ও বাল্যবন্ধুগণের সহিত ঠাকুরের এই কালের আচরণ।

আবার এই ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র সংসারে থাকিয়াও কেহ কেহ ধর্ম্মজীবনে অশাতীত অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া তিনি ঈশ্বরের অচিন্ত্য মহিমা-ধ্যানে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ক একটী ঘটনার তিনি বহুবার আমাদিগের নিকট উল্লেখ করিতেন—

উঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

ঠাকুর বলিতেন, এই সময়ে একদিন তিনি আহারান্তে নিজ গৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রতিবেশিনী কয়েকটী রমণী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানা প্রশ্নালাপে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময় সহসা ঠাকুরের ভাবাবেশ হয় এবং তাঁহার অনুভূতি হইতে থাকে তিনি যেন মীনরূপে সচ্চিদানন্দ সাগরে পরমানন্দে ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন, এবং নানা ভাবে সন্তরণে ক্রীড়া করিতেছেন। কথা কহিতে কহিতে ঐরূপে ভাবাবেশে মগ্ন হওয়া ঠাকুরের অনেক সময়েই উপস্থিত হইত। সুতরাং রমণীগণ উহাতে কিছুমাত্র মন না দিয়া উপস্থিত বিষয়ে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ যতক্ষণ না ভঙ্গ হয়, ততক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে বলিলেন। বলিলেন, 'উনি (ঠাকুর) এখন মীন হইয়া সচ্চিদানন্দ সাগরে সন্তরণ দিতেছেন, গোলমাল করিলে উঁহার ঐ আনন্দে ব্যাঘাত হইবে!' রমণীর কথায় অনেকে তখন বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ভাবভঙ্গে ঠাকুরকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—'রমণী সত্যই বলিয়াছে! আশ্চর্য্য, কিরূপে ঐ বিষয় জানিতে পারিল!"

কামরপুকুর পল্লীস্থ নরনারীর দৈনন্দিন জীবন ঠাকুরের নিকটে

এখন যে অনেকাংশে নবীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল একথা বুঝিতে পারা যায়। বিদেশ হইতে বহুকাল পরে প্রত্যাগত ব্যক্তির, স্বদেশের প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিষয়কে যেমন নূতন বলিয়া বোধ হয় ঠাকুরের এখন অনেকটা তদ্রূপ হইয়াছিল। কারণ, কেবল আট বৎসরকাল মাত্র জন্মভূমি হইতে দূরে থাকিলেও ঐ কালের মধ্যে ঠাকুরের অন্তরে সাধনার প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া উহাতে আমূল পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছিল। ঐ আট বৎসরকালের ভিতর তিনি আপনাকে ভুলিয়াছিলেন, জগৎ ভুলিয়াছিলেন এবং দূরাৎ সুদূরে দেশকালের সীমার বহির্ভাগে যাইয়া উহার ভিতর পুনরাগমনকালে সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া আগমনপূর্ব্বক সকল ব্যক্তি ও বিষয়কে অপূর্ব্ব নবীন ভাবে দেখিতে পাইতেছিলেন! চিন্তা-শ্রেণীসমূহের পারম্পর্য্য হইতেই আমাদিগের কালের অনুভূতি এবং উহার দৈর্ঘ্য স্বল্পতাদি পরিমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে, একথা দর্শনপ্রসিদ্ধ। ঐ জন্য স্বল্পকালের মধ্যে প্রভূত চিন্তা-রাশি অন্তরে উদয় ও লয় হইলে ঐ কাল আমাদিগের নিকট সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্ব্বোক্ত আট বৎসরে ঠাকুরের অন্তরে কি বিপুল চিন্তারাশি প্রকটিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ঐ কালকে সুতরাং তাঁহার যে এক যুগতুল্য বলিয়া অনুভব হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি?

কামারপুকুরবাসী-দিগকে ঠাকুরের অপূর্ব্ব নূতন ভাবে দেখিবার কারণ।

কামারপুকুরে স্ত্রী-পুরুষ সকলকে ঠাকুর কি অদ্ভুত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রামের জমীদার, লাহা বাবুদের বাটী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ, কামার, সূত্রধর, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি সকল জাতীয় প্রতিবেশি-

গণের পরিবারভুক্ত স্ত্রী-পুরুষদিগের সকলেই তাঁহার সহিত শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেমসম্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস লাহার সরলহৃদয়া ভক্তিমতী বিধবা ভগ্নী প্রসন্ন ও ঠাকুরের বাল্যসখা তৎপুত্র গয়াবিষ্ণু লাহা, সরল বিশ্বাসী শ্রীনিবাস শাঁখারী, পাইনদের বাটীর ভক্তিপরায়ণা রমণীগণ, ঠাকুরের ভিক্ষামাতা কামারকন্যা ধনী প্রভৃতি অনেকের ভক্তিভালবাসার কথা ঠাকুর বিশেষ প্রীতির সহিত অনেক সময়ে আমাদিগকে বলিতেন, এবং আমরাও শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। ইঁহারা সকলে প্রায় সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতেন। বিষয় বা গৃহকর্ম্মের অনুরোধে যাঁহারা ঐরূপ করিতে পারিতেন না, তাঁহারা সকাল, সন্ধ্যা বা মধ্যাহ্নে অবসর পাইলেই আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ঐরূপে আসিবার কালে রমণীগণ আবার তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত হইবার জন্য নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেন। গ্রামবাসীদিগের ঐ সকল মধুর আচরণ, এবং গৃহে পরিজনমধ্যে থাকিয়াও ঠাকুর নিরন্তর কিরূপ দিব্য ভাবাবেশে থাকিতেন, সে সকল কথার আভাস আমরা অন্যত্র পাঠককে দিয়াছি, * সেজন্য পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জন্মভূমির সহিত ঠাকুরের চিরপ্রেমসম্বন্ধ।

কামারপুকুরে আসিয়া ঠাকুর এইবার অন্য একটী সুমহৎ কর্ত্তব্য পালনেও যত্নপরায়ণ হইয়াছিলেন। কারণ, নিজ পত্নীর কামারপুকুরে আসা না আসা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও যখন তিনি তাঁহার সেবা করিতে সত্য সত্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঠাকুর তখন তাঁহাকে শিক্ষা দীক্ষাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার কল্যাণসাধনে

ঠাকুরের নিজ পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনের আরম্ভ।

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়, ১২—১৬ পৃঃ

তৎপর হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে বিবাহিত জানিয়া তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু শ্রীমদাচার্য্য তোতাপুরী তাঁহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, “তাহাতে আসে যায় কি? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান, সর্ব্বতোভাবে অক্ষুন্ন থাকে সে ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও পুরুষের উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রীপুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে এখনও বহুদূরে রহিয়াছে।” শ্রীমৎ তোতার পূর্ব্বোক্ত কথা ঠাকুরের স্মরণপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে বহুকালব্যাপী সাধনলব্ধ নিজ বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং নিজ পত্নীর যথার্থ কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল।

ঐ বিষয়ে ঠাকুর কতদূর সুসিদ্ধ হইয়া ছিলেন।

কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে ঠাকুর কখনও কোনও কার্য্য উপেক্ষা করিতে বা অর্দ্ধসম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না। বর্ত্তমান বিষয়েও তদ্রূপ হইয়াছিল। ঐহিক পারত্রিক সকল সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মুখাপেক্ষা বালিকা পত্নীকে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ বিষয় অর্দ্ধনিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। গৃহকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যাহাতে তিনি লোক-চরিত্রজ্ঞা হন, টাকার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, এবং যেখানে যেমন সেখানে তেমন ব্যবহার করিতে নিপুণা হইয়া উঠেন * তদ্বিষয়ে এখন হইতে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৯১ পৃঃ এবং ৪র্থ অধ্যায় ১৪০-১৪২ পৃঃ দেখ।

তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। অখণ্ডব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন নিজ আদর্শ জীবন সম্মুখে রাখিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে শিক্ষা-প্রদানের ফল কতদূর কিরূপ হইয়াছিল তাহা আমরা অন্যত্র অনেক স্থলে আভাস প্রদান করিয়াছি। অতএব এখানে সংক্ষেপে ইহাই বলিলে চলিবে যে, শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী, ঠাকুরের কামগন্ধরহিত বিশুদ্ধ প্রেমলাভে সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্তা হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতাজ্ঞানে আজীবন পূজা করিতে এবং তাঁহার শ্রীপদানুসারিণী হইয়া নিজ জীবন গড়িয়া তুলিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

ঐরূপে পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হইলে ঠাকুরকে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এখন অনেক সময় বুঝিতে পারেন নাই। আমরা দেখিয়াছি, শ্রীমৎ তোতার সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের সন্ন্যাস-গ্রহণ কালেও তিনি, তাঁহাকে ঐরূপ সঙ্কল্প হইতে বিরত করিবার চেষ্টা কয়িয়াছিলেন। * কারণ, তিনি ভাবিয়াছিলেন ঐরূপ করিলে ঠাকুরের হৃদয় হইতে ঈশ্বরপ্রেমের এককালে উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানকালে ঐরূপ কোন আশঙ্কাই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। বোধ হয় তিনি ভাবিয়া-ছিলেন, ঠাকুর নিজ পত্নীর সহিত ঐরূপ ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিলিত হইলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইবে। ঠাকুর কিন্তু পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারেও ব্রাহ্মণীর উপদেশ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণী যে উহাতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণা হইলেন একথা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, ঐ ঘটনায় তাঁহার অভি-

পত্নীর প্রতি ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ দর্শনে ব্রাহ্মণীর আশঙ্কা ও ভাবান্তর।

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৪৮ পৃঃ।

মান প্রতিহত হইয়া ক্রমে অহঙ্কারে পরিণত হয় এবং কিছুকালের জন্য উহা তাঁহাকে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীনা করে। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, সময়ে সময়ে তিনি উহার প্রকাশ্যে পরিচয়ও প্রদান করিয়া বসিতেন। যথা—আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন প্রশ্ন তাঁহার সমীপে উত্থাপন করিয়া যদি কেহ বলিত শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মতামত গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিয়া বসিতেন, 'সে আবার বলিবে কি? তাহার চক্ষুদান ত আমিই করিয়াছি!' অথবা সামান্য কারণে এবং সময়ে সময়ে বিনা কারণেও বাটীর স্ত্রীলোক-দিগের উপরে অসন্তুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিয়া বসিতেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহার ঐরূপ কথা বা অন্যায় অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে বিরত হয়েন নাই।

ঠাকুরের নির্দ্দেশে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীও ব্রাহ্মণীকে নিজ শ্বশ্রূতুল্য জানিয়া ভক্তিপ্রীতির সহিত সর্ব্বদা তাঁহার সেবাদিতে নিযুক্ত থাকিতেন এবং আপনাকে অজ্ঞ বালিকা জানিয়া তাঁহার কোন কথা বা কার্য্যের কখনও প্রতিবাদ করিতেন না।

অভিমান, অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইলে বুদ্ধিমান মনুষ্যেরও মতিভ্রম উপস্থিত হয়। অতএব ঐরূপ অহঙ্কার পদে পদে প্রতিহত হইতে বিলম্ব হয় না। আবার ঐরূপে প্রতিহত হওয়াতে মানব উহার বিপরীত ফল চিন্তা করিয়া উহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন কল্যাণ-সাধনের অবসর লাভ করে। বিদুষী সাধিকা ব্রাহ্মণীরও এখন ঐরূপ হইয়াছিল। কারণ ঐরূপ অহঙ্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি, 'যেখানে যেমন, সেখানে তেমন' ব্যবহার করিতে না পারিয়া এই সময়ে একদিন

অভিমান, অহঙ্কারের বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণীর বুদ্ধি নাশ।

বিষম অনর্থ উপস্থিত করিলেন। ঘটনাটী এইরূপে উপস্থিত হইল—

শ্রীনিবাস শাঁখারীর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চ জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ না করিলেও শ্রীনিবাস ভগবদ্ভক্তিতে অনেক ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও বড় ছিলেন। শ্রীশ্রীরঘুবীরের প্রসাদ পাইবার জন্য ইনি একদিন এই সময়ে ঠাকুরের সমীপে আগমন করেন। ভক্ত শ্রীনিবাসকে লইয়া ঠাকুর এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সকলে যে সেদিন আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা বলিতে হইবে না। ভক্তি-মতী ব্রাহ্মণীও শ্রীনিবাসের বিশ্বাস ভক্তি দর্শনে পরিতুষ্টা হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত নানা ভক্তিপ্রসঙ্গে অতিবাহিত হইল এবং শ্রীশ্রীরঘুবীরের ভোগরাগাদি সম্পূর্ণ হইলে শ্রীনিবাস প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ভোজনান্তে প্রচলিত প্রথামত তিনি আপন উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন 'আমরাই উহা করিব এখন।' ব্রাহ্মণী বারম্বার ঐরূপ বলায় শ্রীনিবাস অগত্যা নিরস্ত হইয়া নিজ বাটীতে গমন করিলেন।

ঐ বিষয়ক ঘটনা।

সমাজ-প্রবল পল্লীগ্রামে সামান্য সামাজিক নিয়মভঙ্গ লইয়া অনেক সময় বিষম গণ্ডগোল এবং দলাদলির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এখনও ঐরূপ হইবার উপক্রম হইল। কারণ, ব্রাহ্মণকন্যা ভৈরবী শ্রীনিবাসের উচ্ছিষ্ট মোচন করিবেন, এই বিষয় লইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে সমাগতা পল্লীবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যাগণ বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহাদের ঐরূপ আপত্তি স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমে গণ্ডগোল বাড়িয়া

ব্রাহ্মণীর সহিত হৃদয়ের কলহ।

উঠিল এবং ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় ঐ কথা শুনিতে পাইলেন। সামান্য বিষয় লইয়া বিষম গোল বাঁধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, হৃদয় ব্রাহ্মণীকে ঐ কার্য্য হইতে বলিলেও তিনি তাঁহার কথা গ্রহণ করিলেন না। তখন হৃদয়ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। হৃদয় বলিতে লাগিলেন, 'ঐরূপ করিলে তোমাকে ঘরে থাকিতে স্থান দিব না।' ব্রাহ্মণীও ছাড়িবার পাত্রী নহে, বলিলেন, 'না দিলেই ক্ষতি কি?—শীতলার ঘরে* মনসা † শোবে এখন।' তখন বাটীর অন্য সকলে মধ্যস্থ হইয়া নানা অনুনয়বিনয়ে ব্রাহ্মণীকে ঐকার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়া বিবাদ শান্তি করিলেন।

ব্রাহ্মণীর নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অপরাধের আশঙ্কা, অনুতাপ ও ক্ষমা চাহিয়া কাশী গমন।

অভিমানিনী ব্রাহ্মণী ঐরূপে নিরস্ত হইলেও কিন্তু সেদিন অন্তরে বিষম আঘাৎ পাইয়াছিলেন। ক্রোধের উপশম হইলে তিনি শান্তভাবে চিন্তা করিয়া আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, এখানে যখন ঐরূপ মতিভ্রম উপস্থিত হইতেছে তখন অতঃপর এখানে তাঁহার আর অবস্থান করা শ্রেয়ঃ নহে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সাধকের দৃষ্টি কোনরূপে নিজান্তরে পতিত হইলে চিত্তের কোন মলিনভাবই তখন তাঁহার নিকট আত্মগোপন করিতে পারে না—ব্রাহ্মণীরও এখন তদ্রূপ হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভাবপরিবর্ত্তনের আলোচনা করিয়া তিনি উহারও মূলে আত্মদোষ দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে সাতিশয় অনুতপ্তা হইলেন। অনন্তর কয়েকদিন গত হইলে একদিন ভক্তিসহকারে বিবিধ পুষ্পমাল্য স্বহস্তে রচনা ও চন্দন-

---

* দেবমন্দিরে।

† ব্রাহ্মণী ঐরূপে ক্রুদ্ধ সর্পের সহিত আপনাকে সমতুল্য করেন।

চর্চ্চিত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গজ্ঞানে ঠাকুরকে মনোহর বেশে ভূষিত করিলেন এবং সর্ব্বান্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরে সংযত হইয়া মনপ্রাণ ঈশ্বরে অর্পণপূর্ব্বক কামারপুকুর পশ্চাতে রাখিয়া কাশীধামের পথ অবলম্বন করিলেন। ঐরূপে, প্রায় ছয় বৎসর কাল নিরন্তর ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া ব্রাহ্মণী ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

প্রায় সাতমাসকাল ঐরূপে নানাভাবে কামারপুকুরে অতিবাহিত করিয়া সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার শরীর তখন প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইয়াছিল। এখানে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে তাঁহার জীবনে একটী বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। উহারই কথা আমরা এখন পাঠককে বলিব।

ঠাকুরের কলিকাতায় প্রত্যাগমন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

তীর্থদর্শন ও হৃদয়মোহনের কথা।

শ্রীযুত মথুরামোহন এখন সপরিবারে ভারতের পুণ্যতীর্থসকল দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন। যাত্রার দিন আগামী মাঘে দেখা হইতেছিল এবং মথুরামোহনের গুরুপুত্রাদি অনেক ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল। সস্ত্রীক মথুরামোহন ঠাকুরকে সঙ্গে লইবার জন্য বিশেষরূপে অনু-

ঠাকুরের তীর্থযাত্রা স্থির হওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয়।

রোধ করিতে লাগিলেন। ফলে, বৃদ্ধা জননী * এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া, ঠাকুর যাইতে সম্মত হইলেন।

অনন্তর শুভদিনের উদয় হইলে, শ্রীযুত মথুর, ঠাকুর ও অন্যান্য সকলকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। তখন সন ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের মধ্যভাগ হইবে, ইংরাজী ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তারিখ। ঠাকুরের তীর্থযাত্রা-সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি। † সেজন্য শ্রীযুত হৃদয়ের নিকট আমরা ঐ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, কেবলমাত্র তাহারই এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

ঐ যাত্রার সময়-নিরূপণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার জননী, শ্রীযুত মথুরামোহন, তাঁহার পত্নী, পুত্রবধূ, এবং গুরুপুত্র, হৃদয়, পাচক ব্রাহ্মণ, দ্বারবান্, এবং দাসদাসী প্রভৃতিতে সর্ব্বসমেত একশত পঁচিশ জন আন্দাজ ঐকালে তীর্থদর্শনে যাত্রা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি এবং তৃতীয় শ্রেণীর তিনখানি গাড়ী রেলওয়ে কোম্পানির নিকট হইতে রিজার্ভ (reserve) করিয়া লওয়া হয় এবং বন্দোবস্ত থাকে, শ্রীযুত মথুরের ইচ্ছা হইলে, কলিকাতা হইতে কাশীর মধ্যে যে কোন স্থানে ঐ চারিখানি গাড়ি তাহারা কাটিয়া দিবে।

ঐ যাত্রার বন্দোবস্ত।

মথুরপ্রমুখ সকলে দেবঘরে ৺বৈদ্যনাথজীকে দর্শনপূর্ব্বক

* কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের জননী তাঁহার সহিত তীর্থে গমন করেন নাই। হৃদয় কিন্তু আমাদিগকে অন্যরূপ বলিয়াছিলেন।

† গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ— ৩য় অধ্যায় দেখ।

কয়েক দিন অবস্থান করেন। এখানে একটী বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানের এক দরিদ্র পল্লীর স্ত্রীপুরুষদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণাপূর্ণ হইয়াছিল এবং মথুর বাবুকে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে এক দিবস ভোজন এবং প্রত্যেককে এক এক খানি বস্ত্র দান করাইয়াছিলেন। *

৺বৈদ্যনাথ দর্শন ও দরিদ্র-সেবা।

বৈদ্যনাথ হইতে শ্রীযুত মথুর একেবারে ৺কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। কেবল, কাশীর সন্নিকট কোন স্থানে গাড়ী হইতে নামিয়া কার্য্যান্তরে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও হৃদয় উঠিতে না উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দেয়। শ্রীযুত মথুর উহাতে ব্যস্ত হইয়া কাশী হইতে এই মর্ম্মে তার করিয়া পাঠান যে, পরবর্ত্তী গাড়ীতে যেন তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী গাড়ীর জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। কোম্পানির জনৈক বিশিষ্ট কর্ম্মচারী, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কোন কার্য্যের তত্ত্বাবধানে একখানি স্বতন্ত্র (special) গাড়ীতে করিয়া স্বল্পক্ষণ পরেই ঐ স্থানে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদিগকে ঐরূপে বিপন্ন দেখিয়া, নিজ গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া কাশীধামে নামাইয়া দেন। রাজেন্দ্র বাবু কলিকাতায় বাগবাজার পল্লীতে বাস করিতেন।

পথে বিঘ্ন।

কাশীধামে পৌঁছিয়া শ্রীযুত মথুর কেদারঘাটের উপরে পাশাপাশি দুইখানি বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। তিনি এখানে সকল

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৭ম অধ্যায়, ২২৬ পৃষ্ঠা দেখ।

বিষয়ে রাজা রাজড়ার ন্যায় আচরণ করিতেন।* বাটীর বাহিরে কোন স্থানে গমন করিবার কালে তাঁহার সঙ্গে রূপার ছত্র এবং অগ্র পশ্চাৎ দ্বারবানগণ রূপার আসাসোঁটা প্রভৃতি লইয়া যাইত।

কেদারঘাটে অবস্থান ও ৺বিশ্বনাথ দর্শন।

এখানে থাকিবার কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পাল্কীতে চাপিয়া প্রায় প্রত্যহই ৺বিশ্বনাথ জীউর দর্শনে যাইতেন। হৃদয় তাঁহার সঙ্গে যাইত। যাইতে যাইতেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন, দেবদর্শনকালের ত কথাই নাই! ঐরূপে সকল দেবস্থানে তাঁহার ভাবাবেশ হইলেও ৺কেদারনাথের মন্দিরে তাঁহার বিশেষ ভাবাবেশ হইত।

ঠাকুর ও শ্রীত্রৈলঙ্গস্বামি।

দেবস্থান ভিন্ন ঠাকুর কাশীর বিশিষ্ট সাধুদিগকেও দর্শন করিতে যাইতেন। তখনও হৃদয় সঙ্গে থাকিত। ঐরূপে কয়েকদিন প্রথিতনামা পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামিজীকে দেখিতে যান। স্বামিজী তখন মৌনাবলম্বনে মণিকর্ণিকার ঘাটে থাকিতেন। প্রথম দর্শনের দিন স্বামিজী আপন নস্যদানি ঠাকুরের সম্মুখে ব্যবহারের জন্য ধারণ করিয়া ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, এবং ঠাকুর তাঁহার ইন্দ্রিয় ও অবয়ব সকলের গঠনাদি পরীক্ষা করিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, ইঁহাতে যথার্থ পরমহংসের লক্ষণসকল বর্ত্তমান, ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর।' স্বামিজী তখন মণিকর্ণিকার পার্শ্বে একটি ঘাট বাঁধাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন! ঠাকুরের অনুরোধে হৃদয়, কয়েক কোদাল মৃত্তিকা ঐ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। তৎপরে ঠাকুর একদিন স্বামিজীকে মথুরের আবাসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহাকে পায়সান্ন খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন।

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৩য় অধ্যায়, ১১৮ পৃষ্ঠা।

পাঁচ সাতদিন কাশীতে থাকিয়া ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগে গমন করেন এবং পুণ্যসঙ্গমে স্নান করিয়া তথায় ত্রিরাত্রি বাস করেন। মথুরপ্রমুখ সকলে তথায় শাস্ত্রীয় ব্যবহারানুসারে মস্তক মুণ্ডিত করিলেও ঠাকুর উহা করেন নাই। বলিয়াছিলেন, 'আমার করিবার আবশ্যক নাই।' প্রয়াগ হইতে মথুরপ্রমুখ সকলে পুনরায় ৺কাশীতে ফিরিয়াছিলেন এবং এক পক্ষ কাল তথায় বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

৺প্রয়াগধামে ঠাকুরের আচরণ।

শ্রীবৃন্দাবনে মথুর নিধুবনের নিকটে একটী বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশীর ন্যায় এখানেও তিনি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া অবস্থান করিতেন এবং পত্নীসমভিব্যাহারে দেবস্থানসকল দর্শন করিতে যাইয়া প্রত্যেক স্থলে কয়েক খণ্ড গিনি প্রণামীস্বরূপে প্রদান করিতেন। নিধুবন দর্শন ভিন্ন ঠাকুর এখানে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড এবং গিরিগোবর্দ্ধন দর্শন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থলে তিনি ভাবাবেশে গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। এখানেও ঠাকুর বিশিষ্ট সাধক সাধিকাগণের নাম শ্রবণ করিলেই দর্শন করিতে যাইতেন। ঐরূপে নিধুবনে গঙ্গামাতার দর্শনলাভে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন এবং হৃদয়কে তাঁহার অঙ্গের লক্ষণসকল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'ইঁহার বিশেষ উচ্চাবস্থা লাভ হইয়াছে।'

শ্রীবৃন্দাবনে নিধুবনাদি স্থান দর্শন।

এক পক্ষ কাল আন্দাজ শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া মথুরপ্রমুখ সকলে পুনরায় কাশীধামে আগমন করেন এবং ৺বিশ্বনাথের বিশেষ বেশ দর্শনের জন্য ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করেন।

৺কাশীতে প্রত্যাগমন ও স্থিতি।

ঐ সময়ে ঠাকুর এখানে সুবর্ণময়ী অন্নপূর্ণা প্রতিমা দর্শন করিয়াছিলেন।

কাশীতে ব্রাহ্মণীকে দর্শন। ব্রাহ্মণীর শেষ কথা।

হৃদয় বলেন, কাশীধামে ঠাকুরের যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত পুনরায় দেখা হইয়াছিল, এবং চৌষট্টী যোগিনী নামক পল্লাতে তাঁহার বাসা বাটীতে তিনি কয়েকবার গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী ঐস্থলে মোক্ষদা নাম্নী একটী রমণীর সহিত বাস করিতেছিলেন। ঐ রমণীর ভক্তি বিশ্বাস দর্শনে ঠাকুর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন যাইবার কালে ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সঙ্গে তথায় গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর এখানেই অবস্থান করিতে বলেন। ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে ব্রাহ্মণী তথায় দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে ঠাকুরের বীণা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে তথায় কোনও বীণ্‌কার উপস্থিত না থাকায় উহা সফল হয় নাই। কাশীতে ফিরিয়া তাঁহার

বীণকার মহেশকে দেখিতে যাওয়া।

মনে পুনরায় ঐ ইচ্ছা উদয় হয় এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সরকার নামক একজন অভিজ্ঞ বীণ্‌কারের ভবনে হৃদয়ের সহিত স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে বীণা শুনাইবার জন্য অনুরোধ করেন। মহেশ বাবু কাশীস্থ মদনপুরা নামক পল্লীতে অবস্থান করিতেন। ঠাকুরের অনুরোধে তিনি সেদিন পরম আহ্লাদে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বীণা বাজাইয়াছিলেন। বীণার মধুর ঝঙ্কার শুনিবামাত্র ঠাকুর ঐদিন ভাবাবিষ্ট হয়েন, পরে অর্দ্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে এইরূপে প্রার্থনা করিতে শুনা গিয়াছিল—'মা, আমায় হুঁস দাও, আমি ভাল করিয়া বীণা শুনিব!'

উহার পরেই তিনি বাহ্যভাবভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হন, এবং সানন্দে বীণা শুনিতে এবং সময়ে সময়ে উহার স্বরের সহিত নিজ স্বর মিলাইয়া গীত গাহিতে থাকেন। অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত ঐরূপে আনন্দে অতিবাহিত হইলে মহেশ বাবুর অনুরোধে তিনি ঐস্থানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া মথুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন! মহেশ বাবু তদবধি ঠাকুরকে প্রত্যহ দর্শন করিতে আগমন করিতেন। ঠাকুর বলিতেন—বীণা বাজাইতে বাজাইতে ইনি এককালে মত্ত হইয়া উঠিতেন।

কাশী হইতে শ্রীযুত মথুর গয়াধামে যাইবার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু ঠাকুরের ঐ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি* থাকায় তিনি ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, ঐরূপে প্রায় চারি মাস কাল তীর্থে

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন ও আচরণ।

ভ্রমণ করিয়া সন ১২৭৫ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে ঠাকুর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মাটী ও রজ আনয়ন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া হৃদয়ের সাহায্যে তিনি উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিলেন এবং কিয়দংশ নিজ সাধনকুটীরমধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া বলিলেন, "আজ হইতে এই স্থল শ্রীবৃন্দাবন তুল্য দেবভূমি হইল।" হৃদয় বলিত, উহার অনতিকাল পরে তিনি মথুর বাবুকে বলিয়া নানাস্থানের বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তসকলকে নিমন্ত্রণ করাইয়া আনিয়া পঞ্চবটীতে একটী মহোৎসব করিয়াছিলেন। মথুরবাবু

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৩য় অধ্যায়, ১২৮—১৩৬ পৃষ্ঠা।

ঐ কালে গোস্বামীদিগকে ১৬৲ টাকা এবং বৈষ্ণব ভক্তদিগকে ১৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন।

হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু ও বৈরাগ্য।

তীর্থ হইতে ফিরিবার অল্পকাল পরে শ্রীযুত হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ঐ ঘটনায় তাহার মন, সংসারের প্রতি কিছুকালের জন্য বিরাগসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি হৃদয়রাম ভাবুক ছিল না। নিজ ক্ষুদ্র সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যথাসম্ভব ভোগ-সুখে কালযাপন করাই তাহার জীবনের আদর্শ ছিল। ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে তাহার মনে কখন কখন অন্যভাবের উদয় হইলেও উহা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিত না। ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত হইলেই হৃদয় সকল ভুলিয়া উহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত এবং যতকাল উহা সংসিদ্ধ না হইত ততকাল তাহার মনে অন্য চিন্তা প্রবেশলাভ করিত না। সেজন্য ঠাকুরের সমগ্র সাধন হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে অনুষ্ঠিত হইলেও সে তাহার স্বল্পই দেখিবার ও বুঝিবার অবসর পাইয়াছিল। ঐরূপ হইলেও কিন্তু হৃদয় তাহার মাতুলকে যথার্থ ভালবাসিত এবং তাঁহার যখন যেরূপ সেবার আবশ্যক হইত তাহা সম্পাদন করিতে যত্নের ত্রুটি করিত না। উহার ফলে হৃদয়ের সাহস, বুদ্ধি এবং কার্য্যকুশলতা বিশেষ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। পরে বিশিষ্ট সাধককুল আসিয়া তাহার মাতুলের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে যত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং সাধনার ফলে তাঁহাতে দৈবশক্তি সকলের প্রকাশ সে যত অবলোকন করিতে লাগিল, মাতুলকে অবলম্বন করিয়া তাহার মনে ততই একটা বিশেষ বলের উদয় হইতে থাকিল। সে ভাবিতে লাগিল মাতুল যখন তাহার আপনার হইতেও আপনার এবং সেবা

দ্বারা যখন সে তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়াছে তখন আধ্যাত্মিক রাজ্যের ফলসকল তাহার এক প্রকার করায়ত্তই রহিয়াছে। যখনি তাহার মন ঐ সকল ফল লাভ করিতে প্রয়াসী হইবে মাতুল নিজ দৈবশক্তিপ্রভাবে তাহাকে তখনি ঐ সকল লাভ করাইয়া দিবেন। অতএব পরকাল সম্বন্ধে তাহার ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। অগ্রে কিছুকাল সংসারসুখ ভোগ করিয়া পরে সে উহাতে মনোনিবেশ করিবে। পত্নীবিয়োগবিধুর হৃদয় ভাবিল, এখন সেইকাল উপস্থিত হইয়াছে। সে পূর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় মনোনিবেশ করিল, পরিধানের কাপড় ও পৈতা খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে ধ্যান করিতে লাগিল এবং ঠাকুরকে ধরিয়া বসিল, তাহার যাহাতে তাঁহার ন্যায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল উপস্থিত হয়, তাহা করিয়া দিতে হইবে। ঠাকুর তাহাকে যত বুঝাইলেন যে, তাহার ঐরূপ করিবার আবশ্যকতা নাই, তাঁহার সেবা করিলেই তাহার সকল ফল লাভ হইবে, এবং হৃদয় ও তিনি উভয়েই যদি দিবারাত্র ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া আহার-নিদ্রাদি শারীরিক চেষ্টা সকল ভুলিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে কে কাহাকে দেখিবে, ইত্যাদি—সে তাহাতে কর্ণপাত করিল না। ঠাকুর অগত্যা বলিলেন, "মার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক, আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয় রে!—মা-ই আমার বুদ্ধি পাল্টাইয়া দিয়া আমাকে এইরূপ অবস্থায় আনিয়া অদ্ভুত অদ্ভুত উপলব্ধি সকল করাইয়া দিয়াছেন—মার ইচ্ছা হয় যদি তোরও হইবে।"

হৃদয়ের ভাবাবেশ।

ঐরূপ কথাবার্ত্তার কয়েক দিন পরে পূজা ও ধ্যানকালে হৃদয়ের অল্পস্বল্প অদ্ভুত দর্শন এবং অর্দ্ধবাহ্যভাব হইতে আরম্ভ হইল! মথুর বাবু হৃদয়কে একদিন ঐরূপ ভাবাবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—'হৃদুর

আবার এ কি অবস্থা হইল, বাবা?' ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'হৃদয় ঢং করিয়া ঐরূপ করিতেছে না,—একটু আধটু দর্শন হ'ক্ ব'লে সে মাকে অনেক ক'রে ধ'রেছিল তাই ঐরূপ হইতেছে। ঐরূপ দেখাইয়া বুঝাইয়া মা আবার তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন।' মথুর বলিলেন, 'বাবা, এসব তোমারই খেলা, তুমিই হৃদয়কে ঐরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছ, তুমিই এখন তাহার মন ঠাণ্ডা করিয়া দাও—আমরা উভয়ে নন্দীভৃঙ্গীর মত তোমার কাছে থাকিব, সেবা করিব, আমাদের ঐ সব অবস্থা কেন?'

শ্রীযুত মথুরের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ কথাবার্ত্তার কয়েক দিন পরে একদিন রাত্রে ঠাকুরকে পঞ্চবটী অভিমুখে যাইতে দেখিয়া, তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া, হৃদয় গাড়ু ও গামছা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে হৃদয়ের এক অপূর্ব্ব দর্শন উপস্থিত হইল। সে দেখিতে লাগিল, ঠাকুর স্থূল রক্ত-মাংসের দেহধারী মনুষ্য নহেন, তাঁহার দেহনিঃসৃত অপূর্ব্ব জ্যোতিতে পঞ্চবটী আলোকিত হইয়া উঠিতেছে, এবং চলিবার কালে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় পদযুগল ভূমি স্পর্শ না করিয়া শূন্যে শূন্যেই তাঁহাকে বহন করিয়া চলিয়াছে। চক্ষুর দোষে ঐরূপ দেখিতেছি ভাবিয়া হৃদয় বারংবার নিজ চক্ষু মার্জ্জন করিল, চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থসকল নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ঠাকুরের দিকে দেখিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—বৃক্ষ, লতা, গঙ্গা, কুটীর প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে পূর্ব্ববৎ দেখিতে পাইলেও, ঠাকুরকে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ দেখিতে থাকিল! তখন বিস্মিত হইয়া হৃদয় ভাবিল, আমার ভিতরে কি কোনরূপ

হৃদয়ের অদ্ভুত দর্শন।

পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে ঐরূপ দেখিতেছি? ঐরূপ ভাবিয়া সে আপনার শরীরের দিকে চাহিল। দেখিল, সেও দিব্যদেহধারী জ্যোতির্ম্ময় দেবানুচর, সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থাকিয়া চিরকাল তাঁহার সেবা করিতেছে—সে যেন ঐ দেবতার জ্যোতিঃঘন অঙ্গসম্ভূত অংশবিশেষ, উঁহার সেবার জন্যই তাহার ভিন্ন শরীর ধারণপূর্ব্বক পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতি! ঐরূপ দেখিয়া এবং নিজ জীবনের ঐরূপ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার অন্তরে আনন্দের প্রবল বন্যা উপস্থিত হইল। সে আপনাকে ভুলিল, সংসার ভুলিল, পৃথিবীর মানুষ তাহাকে ভাল মন্দ নানা কথা বলিবে তাহা ভুলিল এবং অর্দ্ধবাহ্যভাবাবেশে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল,—'ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, আমরা ত মানুষ নহি, আমরা এখানে কেন? চল দেশে দেশে যাই, জীবোদ্ধার করি! তুমি যা, আমিও তাই!'

ঠাকুর বলিতেন, "তাহাকে ঐরূপ চীৎকার করিতে শুনিয়া বলিলাম, 'ওরে থাম্, থাম্; আমাদের কি হইয়াছে যে, অমন করিতেছিস্; একটা কি হইয়াছে ভাবিয়া এখনি লোকজন সব ছুটিয়া আসিবে'—কিন্তু সে কি তা শুনে! তখন তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, 'দে মা শালাকে জড় করে দে।' "

হৃদয়ের মনের জড়ত্ব প্রাপ্তি।

হৃদয় বলিত, ঠাকুর ঐরূপ বলিবামাত্র তাহার পূর্ব্বোক্ত দর্শন ও আনন্দ যেন কোথায় লুপ্ত হইল এবং সে পূর্ব্বে যেমন ছিল আবার তেমনি হইল! অপূর্ব্ব আনন্দ হইতে ঐরূপে সহসা বিচ্যুত হইয়া তাহার মন বিষাদে পূর্ণ হইল এবং সে রোদন করিতে

করিতে ঠাকুরকে বলিতে লাগিল, 'মামা, তুমি কেন অমন করলে, কেন জড় হতে বল্‌লে, ঐরূপ দর্শনানন্দ আমার আর হবে না।' ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন, "আমি কি তোকে একেবারে জড় হতে বলেছি, তুই এখন স্থির হয়ে থাক্—এই কথা বলেছি। একটু দেখেই তুই যে গোল কর্‌লি, তাতেই ত আমাকে ঐরূপ বল্‌তে হ'ল। আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা কত কি দেখি, আমি কি ঐরূপ গোল করি? তোর এখনও ঐরূপ দর্শন কর্‌বার সময় হয় নাই, এখন স্থির হয়ে থাক্, সময় হলে আবার কত কি দেখবি।"

হৃদয়ের সাধনায় বিঘ্ন।

ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথায় হৃদয় নীরব হইলেও নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইল। পরে অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সে ভাবিল, যেরূপেই হউক সে ঐরূপ দর্শন আবার লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। ঐরূপ ভাবিয়া সে ধ্যান-জপের মাত্রা বাড়াইল, এবং রাত্রে পঞ্চবটীতলে যাইয়া ঠাকুর যেখানে বসিয়া পূর্ব্বে জপ ধ্যান করিতেন সেই স্থলে বসিয়া ৺জগদম্বাকে ডাকিবে এইরূপ মনস্থ করিল। ঐরূপ ভাবিয়া একদিন সে গভীররাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইল এবং ঠাকুরের আসনে ধ্যান করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের মনে পঞ্চবটীতে আসিবার বাসনা হওয়াতে তিনিও ঐদিকে আসিতে লাগিলেন এবং তথায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে শুনিতে পাইলেন, হৃদয় কাতর চাৎকারে তাঁহাকে ডাকিতেছে, 'মামা গো, পুড়ে মলুম, পুড়ে মলুম!' ত্রস্তপদে অগ্রসর হইয়া ঠাকুর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে, কি হইয়াছে?' হৃদয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিল, 'মামা, এইখানে ধ্যান করিতে বসিবামাত্র কে যেন এক মালসা

আগুন গায়ে ঢালিয়া দিল, অসহ্য দাহযন্ত্রণা হইতেছে!' ঠাকুর তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'যা' ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তুই কেন এরূপ করিস্ বল দেখি, তোকে বলেছি, আমার সেবা কর্‌লেই তোর সব হবে।' হৃদয় বলিত, ঠাকুরের হস্তস্পর্শে বাস্তবিক তাহার সকল যন্ত্রণা তখনি শান্ত হইল। অতঃপর সে আর পঞ্চবটীতে ঐরূপে ধ্যান করিতে যাইত না এবং তাহার মনে বিশ্বাস হইল ঠাকুর তাহাকে যে কথা বলিয়াছেন তাহার অন্যথা করিলে তাহার ভাল হইবে না।

হৃদয়ের ৺দুর্গোৎসব।

ঠাকুরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হৃদয় এখন অনেকটা শান্তিলাভ করিলেও ঠাকুরবাটীর দৈনন্দিন কর্ম্মসকল তাহার পূর্ব্বের ন্যায় রুচিকর বোধ হইতে লাগিল না। তাহার মন নূতন কোন কর্ম্ম করিয়া নবোল্লাস লাভ করিবার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সন ১২৭৫ সালের আশ্বিন মাস আগত দেখিয়া সে নিজ বাটীতে শারদীয়া পূজা করিবার মনস্থ করিল। হৃদয়রামের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় সহোদর গঙ্গানারায়ণের তখন মৃত্যু হইয়াছে, এবং রাঘব, মথুর বাবুর জমীদারীতে খাজনা আদায়ের কর্ম্মে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। সময় ফিরিয়া বাটীতে নূতন চণ্ডীমণ্ডপখানি নির্ম্মিত হইবার কালে গঙ্গানারায়ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, একবার ৺জগদম্বাকে আনিয়া তথায় বসাইবেন, কিন্তু জীবৎকালে সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। হৃদয় এখন তাঁহার ঐ ইচ্ছা স্মরণপূর্ব্বক উহা পূর্ণ করিতে যত্নপর হইল। কর্ম্মী হৃদয়ের ঐ কার্য্যে শান্তিলাভের সম্ভাবনা বুঝিয়া ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইলেন এবং মথুর বাবু হৃদয়ের ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহাকে আর্থিক সাহায্য করিলেন। শ্রীযুত

মথুর ঐরূপে অর্থসাহায্য করিলেন বটে কিন্তু পূজাকালে ঠাকুরকে নিজ বাটীতে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হৃদয় তাহাতে ক্ষুণ্ণমনে পূজা করিবার জন্য একাকী দেশে যাইতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। হৃদয় বলিত, তাহাকে ক্ষুণ্ণ দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'তুই দুঃখ করিতেছিস্ কেন? আমি নিত্য সূক্ষ্ম শরীরে তোর পূজা দেখিতে যাইব, আমাকে অপর কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তুই পাইবি। তুই অপর এক-জন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধার রাখিয়া নিজে আপনার ভাবে পূজা করিস্ এবং একেবারে উপবাস না করিয়া মধ্যাহ্নে দুধ গঙ্গাজল ও মিছরির সরবৎ পান করিস্। ঐরূপে পূজা করিলে ৺জগদম্বা তোর পূজা নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন।' হৃদয় বলিত ঐরূপে ঠাকুর, কাহার দ্বারা প্রতিমা গড়াইতে হইবে, কাহাকে তন্ত্রধার করিতে হইবে, কিভাবে অন্য সকল কার্য্য করিতে হইবে—সকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন এবং সেও মহানন্দে পূজা করিতে যাত্রা করিল।

৺দুর্গোৎসবকালে হৃদয়ের ঠাকুরকে দেখা।

বাটীতে আসিয়া হৃদয় ঠাকুরের কথামত সকল কার্য্যের অনু-ষ্ঠান করিল এবং ষষ্ঠীর দিনে ৺দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং পূজায় ব্রতী হইল। সপ্তমী-বিহিতা পূজা সাঙ্গ করিয়া রাত্রে নীরা-জন করিবার কালে হৃদয় দেখিতে পাইল, ঠাকুর জ্যোতির্ম্ময় শরীরে প্রতিমার পার্শ্বে ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! হৃদয় বলিত, ঐরূপে প্রতিদিন ঐ সময়ে এবং সন্ধিপূজাকালে সে, দেবীপ্রতিমাপার্শ্বে ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়া মহোৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। পূজা সাঙ্গ হইবার স্বল্পকাল পরে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল এবং ঐ বিষয়ক সকল

কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়াছিলেন, "আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা দেখিবার জন্য বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া আমার ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং অনুভব করিয়াছিলাম যেন জ্যোতির্ম্ময় শরীরে জ্যোতির্ম্ময় পথ দিয়া তোর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছি।"

হৃদয় বলিত, ঠাকুর তাহাকে এক সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই তিন বৎসর পূজা করিবি'—ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়াছিল। ঠাকুরের কথা না শুনিয়া চতুর্থবারে পূজার আয়োজন করিতে যাইয়া এমন বিঘ্নপরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল যে, পরিশেষে বাধ্য হইয়া তাহাকে পূজা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সে যাহা হউক, প্রথম বৎসরের পূজার কিছুকাল পরে হৃদয় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরের পূজাকার্য্যে এবং ঠাকুরের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিল।

৺দুর্গোৎসবের শেষ কথা।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

স্বজনবিয়োগ।

ঠাকুরের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের সহিত পাঠককে আমরা ইতিপূর্ব্বে সামান্যভাবে পরিচিত করাইয়াছি। পূজ্যপাদ আচার্য্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্পকাল পরে সন ১২৭২ সালের প্রথম ভাগে অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বিষ্ণুমন্দিরে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার

রামকুমার-পুত্র অক্ষয়ের কথা।

বয়স সত্তর বৎসর হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা এখানে বলা প্রয়োজন।

জন্মগ্রহণ কালে অক্ষয়ের প্রসূতীর মৃত্যু হওয়ায় মাতৃহীন বালক নিজ আত্মীয়বর্গের বিশেষ আদরের পাত্র হইয়াছিল। সন ১২৫৯ সালে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রথম আগমনকালে অক্ষয়ের বয়স তিন চারি বৎসর মাত্র ছিল। অতএব ঐ ঘটনার পূর্ব্বে দুই তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত ঠাকুর অক্ষয়কে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিতে, ও সর্ব্বদা আদর যত্ন করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। পিতা রামকুমার কিন্তু আজীবন অক্ষয়কে কখনও ক্রোড়ে করেন নাই; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'মায়া বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, এ ছেলে বাঁচিবে না!' পরে ঠাকুর যখন সংসার ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন, তখন সুন্দর শিশু তাঁহার অলক্ষ্যে কৈশোর অতিক্রম পূর্ব্বক যৌবনে পদার্পণ করিয়া অধিকতর প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুর এবং তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি, অক্ষয় বাস্তবিকই অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, অক্ষয়ের দেহের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল ছিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠনও তেমন সুঠাম ও সুললিত ছিল, দেখিলে জীবন্ত শিবমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান হইত।

অক্ষয়ের রূপ।

বাল্যকাল হইতে অক্ষয়ের মন শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। কুলদেবতা ৺রঘুবীরের সেবায় তিনি প্রতিদিন অনেক কাল যাপন করিতেন। সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অক্ষয় যখন পূজাকার্য্যে ব্রতী হইলেন তখন আপনার মনের মত কার্য্যেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, শ্রীশ্রীরাধা-

অক্ষয়ের শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি ও সাধনানুরাগ।

গোবিন্দজীর পূজা করিতে বসিয়া অক্ষয় ধ্যানে এমন তন্ময় হইত যে, সে সময় বিষ্ণুঘরে বহুলোকের সমাগম হইলেও সে জানিতে পারিত না—দুই ঘণ্টাকাল ঐরূপে অতিবাহিত হইবার পরে তাহার হুঁস হইত!' হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি মন্দিরের নিত্যপূজা সুসম্পন্ন করিবার পরে অক্ষয় পঞ্চবটীতলে আগমন-পূর্ব্বক অনেক ক্ষণ শিবপূজায় অতিবাহিত করিতেন; পরে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন সমাপনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে নিবিষ্ট হইতেন। তদ্ভিন্ন নবানুরাগের প্রেরণায় তিনি এইকালে ন্যাস ও প্রাণায়াম এত অতিমাত্রায় করিয়া বসিতেন যে, তজ্জন্য তাঁহার কণ্ঠ-তালুদেশ স্ফীত হইয়া কখন কখন রুধির নির্গত হইত। অক্ষয়ের ঐরূপ ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ যে তাঁহাকে ঠাকুরের প্রিয় করিয়া তুলিবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

অক্ষয়ের বিবাহ।

ঐরূপে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া সন ১২৭৫ সাল সমাগত হইল। অক্ষয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া খুল্লতাত রামেশ্বর তাহার বিবাহের জন্য এখন পাত্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কামারপুকুরের অনতিদূরে কুচেকোল নামক গ্রামে উপযুক্তা পাত্রীর সন্ধান পাইয়া রামেশ্বর যখন অক্ষয়কে লইয়া যাইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন, তখন চৈত্র মাস। চৈত্রমাসে যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া আপত্তি উঠিলেও রামেশ্বর এবং অক্ষয় উহা মানিলেন না। বলিলেন, বিদেশ হইতে নিজ বাটীতে আগমন কালে ঐ নিষেধ-বচন মানিবার আবশ্যকতা নাই। বাটীতে ফিরিয়া অনতিকাল পরে সন ১২৭৬ সালের বৈশাখে অক্ষয়ের বিবাহ হইল।

বিবাহের কয়েক মাস পরে শ্বশুরালয়ে যাইয়া অক্ষয়ের কঠিন পীড়া হইল। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সংবাদ পাইয়া তাহাকে কামার-

পুকুরে আনাইলেন এবং চিকিৎসাদি দ্বারা আরোগ্য করাইয়া পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে আসিয়া তাহার চেহারা ফিরিল এবং স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা একদিন অক্ষয়ের জ্বর হইল। ডাক্তারবৈদ্যেরা বলিল, সামান্য জ্বর, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।

বিবাহের পরে অক্ষয়ের কঠিন পীড়া ও দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন।

হৃদয় বলিতেন, বিবাহের স্বল্পকাল পরে অক্ষয়কে পূর্ব্বোক্তরূপে শ্বশুরালয়ে পীড়িত হইতে শুনিয়া ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, 'হৃদু, লক্ষণ বড় খারাপ, রাক্ষস-গণ-বিশিষ্টা কোন কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে, ছোঁড়া মারা যাবে দেখ্‌চি!' তিন চারি দিনেও অক্ষয়ের জ্বরের উপশম হইল না দেখিয়া তিনি এখন হৃদয়কে ডাকিয়া বলিলেন, 'হৃদু, ডাক্তারেরা বুঝিতে পারিতেছে না, অক্ষয়ের বিকার হইয়াছে, ভাল চিকিৎসক আনাইয়া আশ মিটাইয়া চিকিৎসা কর্, ছোঁড়া কিন্তু বাঁচিবে না।'

অক্ষয়ের দ্বিতীয়বার পীড়া। অক্ষয়ের মৃত্যু-ঘটনা ঠাকুরের পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারা।

হৃদয় বলিতেন "তাঁহাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়া আমি বলিলাম, 'ছিঃ ছিঃ মামা, তোমার মুখ দিয়ে ও রকম কথাগুলা কেন বাহির হইল!'—তাহাতে তিনি বলিলেন, 'আমি কি ইচ্ছা করে ঐরূপ বলি? বে-একতারে বলি, মা যেমন জানান্ ও বলান্ তেমনি বলি। আমার কি ইচ্ছা, অক্ষয় মারা পড়ে!"

অক্ষয় বাঁচিবে না শুনিয়া হৃদয়ের আশঙ্কা ও আচরণ।

ঠাকুরের ঐরূপ কথা শুনিয়া হৃদয় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সুচিকিৎসক সকল আনাইয়া অক্ষয়ের পীড়া আরোগ্যের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগের ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতে লাগিল; অনন্তর প্রায় মাসাবধি ভুগিবার পরে অক্ষয়ের অন্তিমকাল আগত

অক্ষয়ের মৃত্যু ও ঠাকুরের আচরণ।

দেখিয়া ঠাকুর তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'অক্ষয়, বল্ গঙ্গা নারায়ণ ওঁ রাম!'—অক্ষয় এক দুই করিয়া তিনবার ঐ মন্ত্র আবৃত্তি করিল; পরক্ষণেই তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল! হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, অক্ষয়ের ঐরূপ মৃত্যু হইলে হৃদয় যত কাঁদিতে লাগিল, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তত হাসিতে লাগিলেন!

প্রিয়দর্শন পুত্রসদৃশ অক্ষয়ের মৃত্যু উচ্চ ভাবভূমি হইতে দর্শন করিয়া ঠাকুর ঐরূপে হাস্য করিলেও হৃদয়ে বিষমাঘাত যে অনুভব করেন নাই, তাহা নহে। বহুকাল পরে আমাদের নিকট ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি সময়ে সময়ে বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ে ভাবাবেশে মৃত্যুটাকে অবস্থান্তরপ্রাপ্তিমাত্র বলিয়া দেখিতে পাইলেও ভাবভঙ্গ হইয়া সাধারণ ভূমিতে অবরোহণ করিবার কালে অক্ষয়ের বিয়োগে তিনি বিশেষ অভাব বোধ করিয়াছিলেন।* এবং তাহার মৃত্যুর পরে তিনি বাবুদের কুঠিতে আর কখনও বাস করিতে পারেন নাই। কারণ, অক্ষয়ের দেহত্যাগ ঐ বাটীতে হইয়াছিল।

অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুরের মনঃকষ্ট।

অক্ষয়ের মৃত্যুর পরে ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজীর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কামারপুকুরের সংসারের সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধান তাঁহারই উপর ন্যস্ত থাকায় তিনি সকল সময়ে দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে পারিতেন না। উপযুক্ত বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে ঐ কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া মধ্যে মধ্যে কামারপুকুর গ্রামে যাইয়া থাকিতেন।

ঠাকুরের ভ্রাতা রামেশ্বরের পূজকের পদ গ্রহণ।

---

* গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, ১ম অধ্যায়, ২১ হইতে ২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

শুনিয়াছি, শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীননাথ নামক একব্যক্তি ঐ সময়ে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিত।

সে যাহা হউক, অক্ষয়ের মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে শ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নিজ জমীদারী মহলে এবং গুরুগৃহে গমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মন হইতে অক্ষয়ের বিয়োগজনিত অভাববোধ প্রশমিত করিবার জন্যই বোধ হয়, তিনি এখন ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, পরমভক্ত মথুর, এক পক্ষে যেমন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে সকল বিষয়ে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অপর পক্ষে তেমনি আবার তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপারমাত্রে অনভিজ্ঞ বালকবোধে সর্ব্বতোভাবে নিজ রক্ষণীয় বিবেচনা করিতেন। মথুরের জমীদারী মহল পরিদর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুর এক স্থানের পল্লীবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের দুর্দ্দশা ও অভাব দেখিয়া তাহাদিগের দুঃখে কাতর হন এবং তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মথুরের দ্বারা তাহাদিগকে 'একমাথা করিয়া তেল, এক একখানি নূতন কাপড় এবং উদর পূরিয়া একদিনের ভোজন,' দান করাইয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, রাণাঘাটের সন্নিকট কলাইঘাট নামক স্থানে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং মথুরবাবু ঐ সময়ে ঠাকুরকে ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় করিয়া চূর্ণীর খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

মথুরের সহিত ঠাকুরের রাণাঘাটে গমন ও দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, সাতক্ষীরার নিকট সোনাবেড়ে নামক গ্রামে মথুরের নিজ বাটী ছিল। ঐ গ্রামের সন্নিহিত গ্রামসকল তখন মথুরের জমীদারীভুক্ত। ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া মথুর এই সময়ে ঐস্থানে গমন করিয়াছিলেন। এখান হইতে মথুরের গুরুগৃহ অধিক দূরবর্ত্তী

মথুরের নিজ বাটী ও গুরুগৃহ দর্শন।

ছিল না। বিষয়সম্পত্তির বিভাগ লইয়া গুরুবংশীয়দিগের মধ্যে এই কালে বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য মথুরকে তাঁহারা আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গ্রামের নাম তালামাগ্‌রো। মথুর তথায় যাইবার কালে ঠাকুর ও হৃদয়কে নিজ হস্তীর উপর আরোহণ করাইয়া এবং স্বয়ং শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। * মথুরের গুরুপুত্রগণের সযত্ন পরিচর্য্যায় কয়েক সপ্তাহ এখানে অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

কলুটোলার হরিসভায় ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যদেবের আসনাধিকার ও কাল্‌না, নবদ্বীপাদি দর্শন।

মথুরের বাটী ও গুরুস্থান দর্শন করিয়া ফিরিবার স্বল্পকাল পরে ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতায় কলুটোলা নামক পল্লীতে একটী বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত পল্লীবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত বা ধরের, বাটীতে তখন হরিসভার অধিবেশন হইত। ঠাকুর তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন পূর্ব্বক ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাঠককে অন্যত্র প্রদান করিয়াছি। † উহার অনতিকাল পরে ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিতে অভিলাষ হওয়ায় শ্রীযুত মথুর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কাল্‌না, নবদ্বীপ প্রভৃতি

* হৃদয় বলিতেন, যাইবার কালে পথ বন্ধুর ছিল বলিয়া শ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন এবং গ্রামে পৌঁছিবার পরে ঠাকুরের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে কখন কখন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়াছিলেন।

† গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৩য় অধ্যায়।

স্থানে গমন করিয়াছিলেন। কাল্‌নায় গমন করিয়া ঠাকুর কিরূপে ভগবান দাস বাবাজী নামক সিদ্ধ ভক্তের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কিরূপ অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকল কথা আমরা পাঠককে বলিয়াছি।* সম্ভবতঃ সন ১২৭৭ সালে ঠাকুর ঐ সকল পুণ্য স্থান দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের সন্নিকট গঙ্গায় চড়াসকলের নিকট দিয়া গমন করিবার কালে ঠাকুরের যেরূপ গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল, নবদ্বীপে যাইয়া তদ্রূপ হয় নাই। শ্রীযুত মথুর প্রভৃতি ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলাস্থল পুরাতন নবদ্বীপ, গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে; ঐ সকল চড়ার স্থলেই সেই সকল বিদ্যমান ছিল, সেজন্যই ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল।

মথুরের নিষ্কাম ভক্তি।

সে যাহা হউক, একাদিক্রমে চতুর্দ্দশ বৎসর ঠাকুরের সেবায় সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীযুত মথুরের মন এখন কতদূর নিষ্কাম ভাবে উপনীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে হৃদয় আমাদিগকে একটী ঘটনা বলিয়াছিলেন। পাঠককে উহা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

এক সময়ে মথুর বাবু শরীরের সন্ধিস্থলবিশেষে স্ফোটক হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য ঐসময়ে তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হৃদয় ঐকথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, 'আমি যাইয়া কি করিব, তাহাব ফোড়া আরাম করিয়া দিবার আমার কি শক্তি আছে? ঠাকুর যাইলেন না দেখিয়া মথুর লোক পাঠাইয়া বারম্বার

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ৩য় অধ্যায়—১৩৭ পৃষ্ঠা।

কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ ব্যাকুলতায় রকে অগত্যা যাইতে হইল। ঠাকুর উপস্থিত হইলে মথুরের আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি অনেক কষ্টে উঠিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন, এবং বলিলেন 'বাবা, একটু পায়ের ধূলা দাও।'

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

ঠাকুর বলিলেন, 'আমার পায়ের ধূলা লইয়া কি হইবে, উহাতে তোমার ফোড়া কি আরোগ্য হইবে?'

মথুর তাহাতে বলিলেন, 'বাবা আমি কি এমনি, তোমার পায়ের ধূলা কি ফোড়া আরাম করিবার জন্য চাহিতেছি? তাহার জন্য ত ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হইবার জন্য তোমার শ্রীচরণের ধূলা চাহিতেছি।'

শ্রীযুত মথুর ঐকথা বলিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং মথুর তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন—তাঁহার দুনয়নে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল! শ্রীযুত মথুর স্বল্পকালেই সে যাত্রা রোগমুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে এখন কতদূর ভক্তিবিশ্বাস করিতেন তদ্বিষয়ের নানা কথা আমরা ঠাকুরের এবং হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি। এক কথায় বলিতে হইলে, তিনি তাঁহাকে ইহকাল পরকালের সম্বল ও গতি বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলেন। অন্য পক্ষে ঠাকুরের কৃপাও তাঁহার প্রতি তেমনি অসীম ছিল। স্বাধীন-চেতা ঠাকুর মথুরের কোন কোন কার্য্যে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইলেও ঐভাব ভুলিয়া তখনি আবার তাঁহার সকল অনুরোধ রক্ষাপূর্ব্বক তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর ও মথুরের সম্বন্ধ যে কত গভীর প্রেমপূর্ণ ও

ঠাকুরের সহিত মথুরের গভীর প্রেমসম্বন্ধ।

অবিচ্ছেদ্য ছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়—

এক দিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, 'মথুর, তুমি যতদিন (জীবিত) থাকিবে আমি ততদিন এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) থাকিব। মথুর শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, সাক্ষাৎ জগদম্বাই ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন—সুতরাং ঠাকুরের ঐরূপ কথা শুনিয়া বুঝিলেন তাঁহার অবর্ত্তমানে ঠাকুর তাঁহার পরিবারবর্গকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। অনন্তর তিনি দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, 'সে কি বাবা, আমার পত্নী এবং পুত্র দ্বারকানাথও যে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে।' ঠাকুর মথুরকে কাতর দেখিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমার পত্নী ও দোয়ারি যতদিন থাকিবে, আমি ততদিন থাকিব।' ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়াছিল। শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ও দ্বারিকানাথের দেহাবসানের অনতিকাল পরে ঠাকুর চিরকালের নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।* উহার পরে কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর মাত্র ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

অন্য এক দিবস শ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, কৈ বাবা, তুমি যে, বলিয়াছিলে তোমার ভক্তগণ আসিবে, তাহারা কেহই ত এখন আসিল না?

ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

* "Jagadamba died on or about 1st January, 1881, intestate, leaving defendant Traylukshа, then the only son of Mathura, her surviving." Quoted from Plaintiff's statement in High Court Suit no. 203 of 1889.

ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, 'কি জানি বাবু, মা তাহাদিগকে কত দিনে আনিবেন—তাহারা সব আসিবে, একথা কিন্তু মা আমাকে স্বয়ং জানাইয়াছেন! অপর যাহা যাহা দেখাইয়াছেন সে সকলি ত একে একে সত্য হইয়াছে, এটী কেন সত্য হইল না, কে জানে!' ঐ বলিয়া ঠাকুর বিষণ্নমনে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার ঐ দর্শনটী কি তবে ভুল হইল? মথুর তাঁহাকে বিষণ্ন দেখিয়া মনে বিশেষ ব্যথা পাইলেন, ভাবিলেন, ঐকথা পাড়িয়া ভাল করেন নাই। পরে, বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে সান্ত্বনার জন্য বলিলেন, 'তারা আসুক্ আর নাই আসুক্ বাবা, আমি ত তোমার চিরানুগত ভক্ত রহিয়াছি?—তবে আর, তোমার দর্শন সত্য হইল না কিরূপে?—আমি একাই এক শত ভক্তের তুল্য, তাই মা বলিয়াছিলেন, অনেক ভক্ত আসিবে!—ঠাকুর বলিলেন, 'কে জানে বাবু, তুমি যা বল্‌চ তাই বা হবে।' মথুর ঐ প্রসঙ্গে আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া অন্য কথা পাড়িয়া ঠাকুরকে ভুলাইয়া দিলেন।

মথুরের ঐরূপ নিষ্কাম-ভক্তি লাভ করা আশ্চর্য্য নহে। ঐ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত।

ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে শ্রীযুত মথুরের মনে কতদূর ভাব-পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা আমরা 'গুরুভাব' গ্রন্থের অনেক স্থলে পাঠককে বলিয়াছি। শাস্ত্র বলেন মুক্ত পুরুষের সেবকেরা তদনুষ্ঠিত শুভ কর্ম্মসকলের ফলের অধিকারী হয়েন। অতএব অবতার পুরুষের সেবকেরা যে, বিবিধ দৈবী সম্পদের অধিকারী হইবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

সে যাহা হউক, সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ, মিলন বিয়োগ, জীবন মৃত্যু রূপ তরঙ্গসমাকুল কালের অনন্ত প্রবাহ ক্রমে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধামে উপস্থিত করিল। ঠাকুরের

সহিত মথুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া ঐ বৎসর পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। বৈশাখ যাইল, জ্যৈষ্ঠ যাইল, আষাঢ়েরও অর্দ্ধেক দিন অতীতের গর্ভে লীন হইল, এমন সময় শ্রীযুত মথুর জ্বররোগে শয্যাগত হইলেন। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া উহা সাত আট দিনেই বিকারে পরিণত হইল এবং মথুরের বাক্‌রোধ হইল। ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন—মা তাঁহার নিজ ভক্তকে স্নেহময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছেন—মথুরের ভক্তিব্রতের উদ্‌যাপন হইয়াছে! সেজন্য হৃদয়কে প্রতিদিন দেখিতে পাঠাইলেও, স্বয়ং মথুরকে দর্শন করিতে একদিনও যাইলেন না। ক্রমে শেষ দিন উপস্থিত হইল—অন্তিমকাল আগত দেখিয়া মথুরকে কালীঘাট লইয়া যাওয়া হইল। সেই দিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখিতে পাঠাইলেন না—কিন্তু অপরাহ্ণ উপস্থিত হইলে, দুই তিন ঘণ্টাকাল গভীর ভাবে নিমগ্ন হইলেন। শরীর দক্ষিণেশ্বরে পড়িয়া রহিল—জ্যোতির্ম্ময় বর্ত্মে দিব্য শরীরে ঠাকুর ভক্তের পার্শ্বে উপনীত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন—বহুপুণ্যার্জ্জিত লোকে তাহাকে স্বয়ং আরূঢ় করাইলেন!

মথুরের দেহত্যাগ।

ভাবভঙ্গে ঠাকুর হৃদয়কে ডাকিলেন, তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে—বলিলেন, "মথুর দিব্য রথে আরোহণ করিল, শ্রীশ্রীজগদম্বার সখীগণ তাহাকে সাদরে রথে উঠাইয়াছিল এবং তাহার তেজ শ্রীশ্রীদেবীলোকে গমন করিল।"—হৃদয় শুনিয়া নীরব রহিল। পরে, গভীর রাত্রে কালীবাটীর কর্ম্মচারিগণ ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়কে সংবাদ দিল, শ্রীযুত মথুর অপরাহ্ণে পাঁচটার সময় দেহ রক্ষা

ঠাকুরের ভাবাবেশে ঐ ঘটনা দর্শন।

করিয়াছেন! * ঐরূপে পুণ্যলোকে গমন করিলেও, ভোগবাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় না হওয়ায়, পরম ভক্ত মথুরামোহনকে ধরাধামে পুনরায় ফিরিতে হইবে, ঠাকুরের মুখে ঐকথা আমরা অন্যসময়ে শুনিয়াছি এবং পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।†

* "Mathura Mohan Biswas died in July, 1871, intestate leaving him surviving Jagadamba, sole widow, Bhupal since deceased, a son by his another wife who had pre-deceased him—and Dwarka Nath Biswas since deceased, defendant Trayluksha Nath and Thakurdas alias Dhurmadas, three sons by the said Jagadamba."

Quoted from plaintiff's statement in High Court Suit No. 230 of 1889—Shyama Churun Biswas, vs. Trayluksha Nath Biswas, Gurudas, Kalidas, Durgadas and Kumudini.

†. গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, ৭ম অধ্যায়, ২২৮ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়

৺ষোড়শী-পূজা।

মথুর চলিয়া যাইলেন, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে মানবের জীবন প্রবাহ কিন্তু সমভাবেই বহিতে লাগিল। দিন, মাস অতীত হইয়া ক্রমে ছয়মাস কাটিয়া গেল এবং ১২৭৮ সালের ফাল্গুন মাস সমাগত হইল। ঠাকুরের জীবনে একটী বিশেষ ঘটনা ঐ কালে উপস্থিত হইয়াছিল। উহা জানিতে হইলে আমাদিগকে জয়রামবাটী গ্রামে ঠাকুরের শ্বশুরালয়ে একবার গমন করিতে হইবে।

বিবাহের পরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শনকালে শ্রীশ্রীমা বালিকা মাত্র ছিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সন ১২৭৪ সালে ঠাকুর যখন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া নিজ জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার আত্মীয়া রমণীগণ তাঁহার পত্নীকে তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন। বলিতে হইলে বিবাহের পর ঐ কালেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর স্বামিসন্দর্শন প্রথম লাভ হইয়াছিল। কামারপুকুর অঞ্চলের বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার বালিকাদিগের তুলনা করিবার অবসর যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদিগের দেহের ও মনের পরিণতি স্বল্প বয়সেই

উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রামসকলের বালিকাদিগের তাহা হয় না। চতুর্দ্দশ এবং কখন কখন পঞ্চদশ ও ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যা-দিগেরও সেখানে যৌবনকালের অঙ্গলক্ষণসমূহ পূর্ণভাবে উদ্গত হয় না—এবং শরীরের ন্যায় তাহাদিগের মনের পরিণতিও ঐরূপ বিলম্বে উপস্থিত হয়। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীসকলের ন্যায় অল্পপরিসর স্থানে কাল যাপন করিতে বাধ্য না হইয়া পবিত্র নির্ম্মল গ্রাম্য বায়ু সেবন এবং গ্রাম মধ্যে যথা তথা স্বচ্ছন্দবিহারপূর্ব্বক স্বাভাবিক ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্যই বোধ হয় ঐরূপ হইয়া থাকে।

গ্রাম্য বালিকাদিগের বিলম্বে শরীরমনের পরিণতি হয়।

অতএব চতুর্দ্দশ বৎসরে প্রথমবার স্বামিসন্দর্শনকালে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী বালিকা মাত্র ছিলেন। দাম্পত্যজীবনের গভীর উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব-বোধ করিবার শক্তি তাঁহাতে তখন বিকাশোন্মুখ হইয়াছিল মাত্র। পবিত্রা বালিকা দেহবুদ্ধিবিরহিত ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদরযত্ন লাভে ঐকালে অনির্ব্বচনীয় দিব্যানন্দে উল্লসিতা হইয়াছিলেন। ঠাকুরের স্ত্রীভক্তদিগের নিকটে তিনি ঐ উল্লাসের কথা অনেক সময় এই-রূপে বলিয়াছিলেন—"হৃদয়মধ্যে একটী পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐকাল হইতে সর্ব্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম—অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অন্তর তখন নিরন্তর এমন পূর্ণ থাকিত!"

ঠাকুরকে প্রথমবার দেখিয়া শ্রীশ্রীমার মনের ভাব।

কয়েক মাস পরে ঠাকুর যখন কামারপুকুর হইতে কলি-কাতায় ফিরিলেন, বালিকা তখন অনন্ত আনন্দ-সম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন—এইরূপ অনুভব করিতে করিতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্বোক্ত উল্লাসের উপলব্ধিতে তাঁহার চলন,

ঐভাব লইয়া শ্রীশ্রীমার জয়রামবাটীতে বাসের কথা।

বলন, আচরণাদি সকল চেষ্টার ভিতর এখন একটী পরিবর্ত্তন যে, উপস্থিত হইয়াছিল একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু সাধারণ মানব উহা দেখিতে পাইয়াছিল কি না সন্দেহ; কারণ, উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্‌ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থ-দৃষ্টি-নিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থ প্রেমিকা করিয়াছিল, এবং অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানব-সাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্ত সমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক উল্লাসপ্রভাবে অশেষ শরীর-কষ্টকে তাঁহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়াই মনে হইত না এবং আদর যত্নের প্রতি-দান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। ঐরূপে শারীরিক সকল বিষয়ে সামান্যে সন্তুষ্টা থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর ঐস্থানে থাকিলেও তাঁহার মন ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও বালিকা উহা যত্নে সম্বরণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেন;—ভাবিতেন, প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে কৃপা করিয়া এতদূর ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিবেন না,—সময় হইলেই নিজ সকাশে ডাকিয়া লইবেন। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া বালিকা ঐ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চারিটী দীর্ঘ বৎসর একে একে কাটিয়া গেল। আশা প্রতীক্ষার প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বহিতে লাগিল। তাঁহার শরীর কিন্তু মনের ন্যায় সমভাবে থাকিল না, দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া সন ১২৭৮ সালের পৌষে উহা তাঁহাকে অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতীতে পরিণত করিল। দেবতুল্য স্বামীর প্রথম সন্দর্শনজনিত আনন্দ তাঁহাকে জীবনের দৈনন্দিন সুখদুঃখ হইতে উচ্চে উঠাইয়া রাখিলেও সংসারে নিরাবিল আনন্দের অবসর কোথায়?—গ্রামের পুরুষেরা জল্পনা করিতে বসিয়া যখন তাঁহার স্বামীকে 'উন্মত্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, "পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া 'হরি' 'হরি' করিয়া বেড়ায়"—ইত্যাদি নানা কথা বলিত, অথবা সমবয়স্কা রমণীগণ যখন তাঁহাকে 'পাগলের স্ত্রী' বলিয়া করুণা বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা করিত, তখন মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার অন্তরে দারুণ ব্যথা উপস্থিত হইত। উন্মনা হইয়া তিনি তখন চিন্তা করিতেন—তবে কি পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছিলাম তিনি সেরূপ আর নাই? লোকে যেমন বলিতেছে, তাঁহার কি ঐরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে? বিধাতার নির্ব্বন্ধে যদি ঐরূপই হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার ত আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে, পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকাই উচিত। অশেষ চিন্তার পর স্থির করিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং গমনপূর্ব্বক চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন, পরে—যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিবেন।

ঐকালে শ্রীশ্রীমার মনোবেদনার কারণ ও দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সঙ্কল্প।

ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতে স্নান করিবার জন্য বঙ্গের সুদূর

প্রান্ত হইতে অনেকে ঐদিন কলিকাতায় আগমন করে। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর দূরসম্পর্কীয়া কয়েক-জন আত্মীয়া রমণী ঐ বৎসর ঐজন্য আগমন করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন।

ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার বন্দোবস্ত।

তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া তিনি এখন তাঁহাদিগের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পিতার অভিমত না হইলে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, ভাবিয়া রমণীরা তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধিমান পিতা শুনিয়াই বুঝিলেন, কন্যা কেন এখন কলিকাতায় যাইতে অভিলাষিনী হইয়াছেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং কলিকাতা আসিবার জন্য সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিলেন।

রেল-কোম্পানীর প্রসাদে সুদূর কাশী বৃন্দাবন কলিকাতার অতি সন্নিকট হইয়াছে, কিন্তু ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়-রামবাটী ঐ প্রসাদে বঞ্চিত থাকিয়া যে দূরে সেই দূরেই পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও ঐরূপ, তখনকার ত কথাই নাই—তখন বিষ্ণুপুর বা তারকেশ্বর কোন স্থানেই রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই এবং ঘাটালকেও বাষ্পীয় জলযান কলিকাতার সহিত যুক্ত করে নাই; সুতরাং শিবিকা অথবা পদব্রজে গমনাগমন করা ভিন্ন ঐ সকল গ্রামের লোকের অন্য উপায় ছিল না এবং জমীদার প্রভৃতি ধনী লোক ভিন্ন মধ্যবিৎ গৃহস্থেরা সকলেই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিতেন। অতএব কন্যা ও সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্র দূর পথ পদব্রজে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে

নিজ পিতার সহিত শ্রীশ্রীমার পদব্রজে গঙ্গা-স্নান করিতে আগমন ও পথিমধ্যে জ্বর।

কমলপূর্ণ দীর্ঘিকানিচয় দেখিতে দেখিতে, অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ-রাজির শীতল ছায়া অনুভব করিতে করিতে, তাঁহারা সকলে প্রথম দুই তিন দিন সানন্দে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছান পর্য্যন্ত ঐ আনন্দ রহিল না। পথশ্রমে অনভ্যস্তা কন্যা পথিমধ্যে একস্থলে দারুণ জ্বরে আক্রান্তা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিলেন। কন্যার ঐরূপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া তিনি চটীতে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পীড়িতাবস্থায় শ্রীশ্রীমার অদ্ভুত দর্শন বিবরণ।

পথিমধ্যে ঐরূপে পীড়িতা হওয়ায় শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর অন্তঃকরণে কতদূর বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়া ঐ সময়ে তাঁহাকে আশ্বস্তা করিয়াছিল। উক্ত দর্শনের কথা তিনি পরে স্ত্রীভক্তদিগকে কখন কখন নিম্নলিখিত ভাবে বলিয়াছেন—

"জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁস্, লজ্জাসরমরহিত হইয়া পড়িয়া আছি, তখন দেখিলাম,পাশে একটী মেয়ে এসে ব'স্‌ল—মেয়েটীর রং কাল, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই!—ব'সে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল—এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে যেতে লাগ্‌ল! জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কোথা থেকে আস্‌চ গা?' মেয়েটী ব'ল্লে—'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আস্‌চি।' শুনে, অবাক্ হয়ে বল্‌লাম—'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখ্‌ব, তাঁর সেবা ক'র্‌ব। কিন্তু পথে জ্বর হয়ে আমার ভাগ্যে সে সব আর হ'ল না।' মেয়েটী ব'ল্‌লে—'সে কি! তুমি দক্ষিণে-শ্বরে যাবে বৈ কি, ভাল হয়ে—সেখানে যাবে, তাঁকে দেখ্‌বে। তোমার জন্যই ত তাঁকে সেখানে আট্‌কে রেখেছি।' আমি

বলিলাম, 'বটে? তুমি আমাদের কে হও গা?' মেয়েটী বল্‌লে, 'আমি তোমার বোন্ হই!' আমি বলিলাম, 'বটে? তাই তুমি এসেছ!' ঐরূপ কথাবার্ত্তার পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম!"

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন, কন্যার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে! পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি তাঁহাকে লইয়া ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। রাত্রের পূর্ব্বোক্ত দর্শনে উৎসাহিতা হইয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী তাঁহার ঐ পরামর্শ সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতে একখানি শিবিকাও পাওয়া গেল। তাঁহার পুনরায় জ্বর আসিল, কিন্তু পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় প্রবল বেগে না আসায় তিনি উহার প্রকোপে একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িলেন না। ঐবিষয়ে কাহাকে কিছু বলিলেনও না। ক্রমে পথের শেষ হইল এবং রাত্রি নয়টার সময় শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

রাত্রে জ্বরগায়ে শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছান ও ঠাকুরের আচরণ।

ঠাকুর তাঁহাকে সহসা ঐরূপে রোগাক্রান্তা হইয়া আসিতে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'তুমি এত দিনে আসিলে? আর কি আমার সেজ বাবু (মথুর বাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে?' ঔষধ পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিন চারি দিনেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আরোগ্যলাভ করিলেন। ঐ তিন চারি দিন ঠাকুর তাঁহাকে দিবারাত্র নিজ গৃহে রাখিয়া ঔষধ পথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিলেন, পরে নহবত ঘরে নিজ জননীর নিকটে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল ; পরের কথায় উদিত হইয়া যে সন্দেহ মেঘের ন্যায় ইতিপূর্ব্বে বিশ্বাস-সূর্য্যকে আবৃত করিতে উপক্রম করিয়াছিল, ঠাকুরের যত্ন-প্রবৃদ্ধ অনুরাগপবনে তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এখন কোথায় বিলীন হইল! শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ঠাকুর পূর্ব্বে যেমন ছিলেন এখনও তদ্রূপ আছেন—সংসারী মানব না বুঝিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানা রটনা করিয়াছে। দেবতা, দেবতাই আছেন এবং বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সমানভাবে কৃপাপরবশ রহিয়াছেন! অতএব কর্ত্তব্য স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। প্রাণের উল্লাসে তিনি নহবতে থাকিয়া দেবতার ও দেবজননীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন—এবং তাঁহার পিতা?—কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েক দিন ঐ স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক তিনি হৃষ্টচিত্তে নিজগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ঠাকুরের ঐরূপ আচরণে শ্রীশ্রীমার সানন্দে তথায় অবস্থিতি।

সন ১২৭৪ সালে কামারপুকুরে অবস্থান করিবার কালে, শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর আগমনে ঠাকুরের মনে যে চিন্তাপরম্পরার উদয় হইয়াছিল তাহা আমরা পাঠককে বলিয়াছি। ব্রহ্মবিজ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠালাভসম্বন্ধীয় আচার্য্য শ্রীমৎ তোতাপুরীর কথা আলোচনা পূর্ব্বক তিনি ঐ কালে নিজ সাধন-লব্ধ বিজ্ঞানের পরীক্ষা করিতে এবং পত্নীর প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পরিপালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে তদুভয় অনুষ্ঠানের আরম্ভ মাত্র করিয়াই তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইয়াছিল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে নিকটে পাইয়া তিনি এখন পুনরায় ঐ দুই বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

ঠাকুরের নিজ ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরীক্ষা ও পত্নীকে শিক্ষাপ্রদান।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—পত্নীকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বেই ত ঐরূপ করিতে পারিতেন, ঐরূপ করেন নাই কেন? উত্তরে বলিতে হয়—সাধারণ মানব ঐরূপ করিত, সন্দেহ নাই; ঠাকুর ঐ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না বলিয়া ঐরূপ আচরণ করেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যাঁহারা জীবনের প্রতিক্ষণ প্রতি কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং মতলব আঁটিয়া কখন কোন কার্য্যে অগ্রসর হন না। আত্মকল্যাণ বা অপরের কল্যাণ সাধন করিতে তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র বুদ্ধির সহায়তা না লইয়া শ্রীভগবানের বিরাট বুদ্ধির সহায়তা ও ইঙ্গিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। সেজন্য স্বেচ্ছায় পরীক্ষা দিতে তাঁহারা সর্ব্বথা পরাঙ্মুখ হন। কিন্তু বিরাটেচ্ছার অনুগামী হইয়া চলিতে চলিতে যদি কখন পরীক্ষা দিবার কাল স্বতঃ উপস্থিত হয় তবে তাঁহারা ঐ পরীক্ষা প্রদানের জন্য সানন্দে অগ্রসর হন। ঠাকুর স্বেচ্ছায় আপন ব্রহ্মবিজ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন পত্নী স্বেচ্ছায় কামারপুকুরে তাঁহার সকাশে আগমন করিয়াছেন এবং তৎপ্রতি নিজ কর্ত্তব্য প্রতি-পালনে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তখনই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবার, ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ অবসর চলিয়া যাইয়া যখন তাঁহাকে কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক পত্নীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইল তখন তিনি ঐরূপ অবসর পুনরানয়নের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইলেন না। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী যতদিন না স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা

ইতিপূর্ব্বে ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠান না করিবার কারণ।

করিলেন না। সাধারণ বুদ্ধিসহায়ে আমরা ঠাকুরের আচরণের ঐরূপে সামঞ্জস্য করিতে পারি, তদ্ভিন্ন বলিতে পারি যে, যোগ-দৃষ্টিসহায়ে তিনি বিদিত হইয়াছিলেন, ঐরূপ করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রণালী ও শ্রীশ্রীমার সহিত এইকালে আচরণ।

সে যাহা হউক, পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনপূর্ব্বক পরীক্ষা প্রদানের অবসর উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর এখন তদ্বিষয়ে সানন্দে অগ্রসর হইলেন এবং অবসর পাইলেই মাতাঠাকুরাণীকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। শুনা যায় এই সময়েই, তিনি মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন, 'চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাঁহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকার আছে, যে ডাকিবে তিনি তাহাকেই দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন, তুমি ডাক ত তুমিও তাঁহার দেখা পাইবে।' কেবল উপদেশ মাত্র দানেই ঠাকুরের শিক্ষার অবসান হইত না; কিন্তু শিষ্যকে নিকটে রাখিয়া ভালবাসায় সর্ব্বতোভাবে আপনার করিয়া লইয়া তিনি তাহাকে প্রথমে উপদেশ প্রদান করিতেন, পরে শিষ্য উহা কার্য্যে কতদূর প্রতিপালন করিতেছে সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন এবং ভ্রমবশতঃ সে বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে তিনি যে, এখন পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রথম দিন হইতে ভালবাসায় তিনি তাঁহাকে কতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলেন তাহা আগমনমাত্র তাঁহাকে নিজগৃহে বাস করিতে দেওয়াতে এবং আরোগ্য হইবার পরে প্রত্যহ রাত্রে নিজ শয্যায় শয়ন করিবার

অনুমতি প্রদানে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মাতাঠাকুরাণীর সহিত ঠাকুরের এইকালের দিব্য আচরণের কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র* বলিয়াছি, এজন্য এখানে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিব না। দুই একটী কথা, যাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হয় নাই, তাহাই কেবল বলিব।

শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর কি ভাবে দেখিতেন।

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী এক দিন এই সময়ে ঠাকুরের পদ-সম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?' ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন, এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন! সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্ব্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই!'

ঠাকুরের নিজ মনের সংযম পরীক্ষা।

অন্য এক দিবস শ্রীশ্রীমাকে নিজ পার্শ্বে নিদ্রিতা দেখিয়া ঠাকুর আপন মনকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন—"মন, ইহারই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্য বস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়, সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; পেটে একখানা, মুখে একখানা, করিও না, সত্য বল তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি উহা চাও ত এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে গ্রহণ কর!" ঐরূপ বিচার পূর্ব্বক ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতা

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়,—১৪১ পৃষ্ঠা।

ঠাকুরাণীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইবামাত্র মন কুণ্ঠিত হইয়া সহসা সমাধিপথে এমন বিলীন হইয়া গেল যে, সে রাত্রিতে উহা আর সাধারণ ভাবভূমিতে অবরোহণ করিল না। ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইয়া পরদিন বহু যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইতে হইল !

পত্নীকে লইয়া ঠাকুরের আচরণের ন্যায় আচরণ কোন অবতার পুরুষ করেন নাই। উহার ফল।

ঐরূপে পূর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাস-সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি তাহা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না। ঐ সকল কথায় মুগ্ধ হইয়া মানব-হৃদয় স্বতঃই ইঁহাদিগের দেবত্বে বিশ্বাসবান্ হইয়া উঠে এবং অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা ইঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে বাধ্য হয় ! দেহবোধবিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বাহ্যভূমিতে অবরোহণ করিলেও তাঁহার মন এখন এত উচ্চে অবস্থান করিত যে সাধারণমানবের ন্যায় দেহবুদ্ধি উহাতে এক ক্ষণের জন্যও উদিত হইত না।

শ্রীশ্রীমার অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

ঐরূপে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতীত হইয়া ক্রমে বৎসরাধিক কাল অতীত হইল—কিন্তু এই অদ্ভুত ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর সংযমের বাঁধ ভঙ্গ হইল না!—একক্ষণের জন্য ভুলিয়াও তাঁহাদিগের মন, প্রিয় বোধ করিয়া দেহের রমণ কামনা করিল না! ঐ কালের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর পরে আমাদিগকে কখন কখন বলিয়াছেন, "ও (শ্রীশ্রীমাতা-

ঠাকুরাণী) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কিনা, কে বলিতে পারে ? বিবাহের পরে মাকে (৺জগদম্বাকে) ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম যে, মা আমার পত্নীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দূর করিয়া দে—ওর (শ্রীশ্রীমার) সঙ্গে একত্র বাস করিয়া এইকালে বুঝিয়াছিলাম, মা সে কথা সত্য সত্যই শ্রবণ করিয়াছিলেন।”

বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও মনে একক্ষণের জন্য যখন দেহবুদ্ধির উদয় হইল না, এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে কখন ৺জগদম্বার অংশভাবে এবং কখন সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে যখন সমর্থ হইলেন না, তখন ঠাকুর বুঝিলেন শ্রীশ্রীজগন্মাতা কৃপা করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন এবং মার কৃপায় তাঁহার মন এখন সহজ স্বাভাবিক ভাবে দিব্যভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে। শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রসাদে তিনি এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে মন এতদূর তন্ময় হইয়াছে যে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মার ইচ্ছার বিরোধী কোন ইচ্ছাই এখন আর, উহাতে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই! অতঃপর শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগে তাঁহার প্রাণে এক অদ্ভুত বাসনার উদয় হইল এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তিনি উহা এখন কার্য্যে পরিণত করিলেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে ঐ বিষয়ে সময়ে সময়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই এখন সম্বদ্ধভাবে আমরা পাঠককে বলিব।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঠাকুরের সঙ্কল্প।

সন ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্দ্ধেকের উপর গত হইয়াছে। আজ অমাবস্যা, ফলহারিণী কালিকা পূজার পুণ্য-দিবস। সুতরাং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আজ বিশেষ পর্ব্ব উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে পূজা করিবার মানসে আজ বিশেষায়োজন করিয়াছেন। ঐ আয়োজন কিন্তু মন্দিরে না হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে গুপ্তভাবে তাঁহার গৃহেই হইয়াছে। পূজাকালে ৺দেবীকে বসিতে দিবার জন্য আলিম্পনভূষিত একখানি পীঠ পূজকের আসনের দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে। সূর্য্য অস্তে গমন করিয়া ক্রমে গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে অমাবস্যার নিশি সমাগতা হইল। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়কে অদ্য রাত্রিকালে মন্দিরে ৺দেবীর বিশেষপূজা করিতে হইবে, সুতরাং ঠাকুরের পূজার আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া সে মন্দিরে চলিয়া যাইল এবং ৺রাধাগোবিন্দের রাত্রিকালের সেবা-পূজা সমাপনানন্তর দীনু পূজারি আসিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিল। ৺দেবীর রহস্যপূজার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে পূজাকালে উপস্থিত থাকিতে ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও ঐ গৃহে এখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর পূজায় বসিলেন।

৺ষোড়শী-পূজার আয়োজন।

পূজা-দ্রব্যসকল সংশোধিত হইয়া পূর্ব্বকৃত্য সম্পাদিত হইল। ঠাকুর এইবার আলিম্পনভূষিত পীঠে শ্রীশ্রীমাকে উপবেশনের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। পূজা দর্শন করিতে করিতে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী ইতিপূর্ব্বে অর্দ্ধ-বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং কি করিতেছেন তাহা সম্যক্ না বুঝিয়া মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায়

শ্রীশ্রীমাকে অভিষেক-পূর্ব্বক ঠাকুরের পূজা-করণ।

তিনি এখন পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণভাগে উত্তরাস্যা হইয়া উপবিষ্টা হইলেন! সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারম্বার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—

"হে বালে, হে সর্ব্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্ব্বকল্যাণ সাধন কর!"

অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাসপূর্ব্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ ৺দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন

পূজাশেষে সমাধি ও ঠাকুরের জপপূজাদি ৺দেবীচরণে সমর্পণ।

এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তু সকলের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন। বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন! ঠাকুরও অর্দ্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন! সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন!

কতক্ষণ কাটিয়া গেল! নিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত হইল! আত্মারাম ঠাকুরের এইবার বাহ্যসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেল! পূর্ব্বের ন্যায় অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এখন ৺দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—

"হে সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্ব্বকর্ম্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনী ত্রিনয়নী শিব-গেহিনী গৌরি, হে নারায়ণি তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।"

পূজা শেষ হইল—মূৰ্ত্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহালম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্ব্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল—তাঁহার দেব-মানবত্ব সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল!

৺ষোড়শী-পূজার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী প্রায় পাঁচ মাস কাল ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় ঐকালে তিনি ঠাকুর এবং ঠাকুরের জননীর সেবায় নিযুক্তা থাকিয়া দিবাভাগে নহবত ঘরে অতিবাহিত করিয়া রাত্রিকালে ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিতেন। দিবারাত্র ঠাকুরের ভাব-সমাধির বিরাম ছিল না এবং কখন কখন নির্ব্বিকল্প সমাধিপথে তাঁহার মন সহসা এমন বিলীন হইত যে মৃতের লক্ষণ সকল তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইত! কখন্ ঠাকুরের ঐরূপ সমাধি হইবে এই আশঙ্কায় শ্রীশ্রীমার রাত্রিকালে নিদ্রা হইত না। বহুক্ষণ সমাধিস্থ হইবার পরেও ঠাকুরের সংজ্ঞা হইতেছে না দেখিয়া ভীতা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া তিনি এক রাত্রিতে হৃদয় এবং অন্যান্য সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলেন। পরে হৃদয় আসিয়া বহুক্ষণ নাম শুনাইলে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইয়াছিল। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়া এবং শ্রীশ্রীমার রাত্রিকালে প্রত্যহ নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে জানিয়া নহবতে তাঁহার জননীর নিকটে মাতা-ঠাকুরাণীর শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঐরূপে এক বৎসর চারি মাসকাল ঠাকুরের নিকটে দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করিয়া সম্ভবতঃ সন ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসের কোন সময়ে শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের নিরন্তর সমাধির জন্য শ্রীশ্রীমার নিদ্রায় ব্যাঘাত হওয়ায় অন্যত্র শয়ন এবং কামারপুকুরে প্রত্যাগমন।

একবিংশ অধ্যায়।

সাধকভাবের শেষকথা।

৺ষোড়শী-পূজা সম্পন্ন করিয়া ঠাকুরের সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। ঈশ্বরানুরাগরূপ যে পুণ্য হুতবহ হৃদয়ে নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকিয়া তাঁহাকে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অস্থির করিয়া নানাভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিল এবং ঐকালের পরেও সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইতে দেয় নাই, পূর্ণাহুতি প্রাপ্ত হইয়া এতদিনে তাহা প্রশান্তভাব ধারণ করিল। ঐরূপ না হইয়াই বা উহা এখন করিবে কি—ঠাকুরের আপনার বলিবার এখন আর কি আছে, যাহা তিনি উহাতে ইতিপূর্ব্বে আহুতি প্রদান না করিয়াছেন?—ধন মান নাম যশাদি পৃথিবার সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা বহুপূর্ব্বেই তিনি উহাতে বিসর্জ্জন করিয়াছেন! হৃদয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারাদি সকলকেও উহার করাল মুখে একে একে আহুতি দিয়াছেন! ছিল কেবল বিবিধ সাধন পথে অগ্রসর হইয়া নানাভাবে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিবার বাসনা—তাহাও এখন তিনি উহাতে নিঃশেষে অর্পণ করিলেন!—অতএব প্রশান্ত না হইয়া উহা এখন আর করিবে কি?

৺ষোড়শীপূজার পরে ঠাকুরের সাধনবাসনার নিবৃত্তি।

ঠাকুর দেখিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছেন—পরে, নানা অদ্ভুত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিসকলের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া বিবিধ শাস্ত্রীয় পথে অগ্রসর করিয়া ঐ দর্শন মিলাইয়া লইবার অবসর দিয়াছেন—অতএব, তাঁহার নিকটে তিনি এখন আর কি চাহিবেন! দেখিলেন—চৌষট্টিখানা তন্ত্রের

কারণ, সর্ব্বধর্ম্মমতের সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া অপর আর কি করিবেন।

সকল সাধন একে একে সম্পন্ন হইয়াছে, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চ-ভাবাশ্রিত যতপ্রকার সাধনপথ ভারতে প্রবর্ত্তিত আছে সে সকল যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সনাতন বৈদিকমার্গানুসারী হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণ নিরাকাররূপের দর্শন হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্যলীলায় ভারতের বাহিরে উদ্ভূত ইসলাম মতের সাধনায় প্রবর্ত্তিত হইয়াও যথাযথ ফল হস্তগত হইয়াছে—সুতরাং শ্রীশ্রীমার নিকটে তিনি এখন আর কি দেখিতে বা শুনিতে চাহিবেন!

শ্রীশ্রীঈশাপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে ঠাকুরের অদ্ভুত উপায়ে সিদ্ধিলাভ।

এই কালের একবৎসর পরে কিন্তু ঠাকুরের মন আবার অন্য এক সাধন পথে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দর্শন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। তখন তিনি শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে বাইবেল শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীঈশার পবিত্র জীবনের এবং সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। ঐ বাসনা তাঁহার মনে ঈষন্মাত্র উদয় হইতে না হইতে শ্রীশ্রীজগদম্বা উহা অদ্ভুত উপায়ে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, সেজন্য উহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় নাই। ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে যদুনাথ মল্লিকের উদ্যান বাটী; ঠাকুর ঐস্থানে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন। শ্রীযুত যদুনাথ ও তাঁহার মাতা ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অবধি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, সুতরাং উদ্যানে তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর তথায় বেড়াইতে যাইলেই কর্ম্মচারিগণ বাবুদের বৈঠকখানা উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল বসিবার ও বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিত। উক্ত গৃহের দেয়ালে অনেকগুলি উত্তম চিত্র বিলম্বিত ছিল।

মাতৃকোলে অবস্থিত শ্রীশ্রীঈশার বালগোপাল মূর্ত্তি একখানিও তন্মধ্যে ছিল। ঠাকুর বলিতেন, একদিন উক্ত ঘরে বসিয়া তিনি ঐ ছবিখানি তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন এবং শ্রীশ্রীঈশার অদ্ভুত জীবনকথা ভাবিতে ছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, ছবিখানি যেন জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ অদ্ভুত দেব-জননী ও দেব-শিশুর অঙ্গ হইতে জ্যোতিরশ্মিসমূহ তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার মানসিক ভাবসকল আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে! জন্মগত হিন্দুসংস্কারসমূহ অন্তরের নিভৃত কোণে লীন হইয়া ভিন্ন সংস্কার সকল উহাতে উদয় হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর তখন নানাভাবে আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন—'মা, আমাকে এ কি করিতেছিস্,' কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ঐ সংস্কার-তরঙ্গ প্রবলবেগে উত্থিত হইয়া তাঁহার মনের হিন্দুসংস্কার সমূহকে এককালে তলাইয়া দিল, দেবদেবীসকলের প্রতি ঠাকুরের অনুরাগ, ভালবাসা কোথায় বিলীন হইল এবং শ্রীশ্রীঈশার ও তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিয়া হৃদয় অধিকার পূর্ব্বক, খৃষ্টীয় পাদ্‌রিসমূহ প্রার্থনামন্দিরে শ্রীশ্রীঈশার মূর্ত্তি-সম্মুখে ধূপ-দীপ দান করিতেছে, অন্তরের ব্যাকু-লতা কাতর প্রার্থনায় তাঁহাকে নিবেদন করিতেছে—এই সকল বিষয় ঠাকুরকে দেখাইতে লাগিল! ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া নিরন্তর ঐ সকল বিষয়ের ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার মন্দিরে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার কথা এক-কালে ভুলিয়া যাইলেন! তিন দিন পর্য্যন্ত ঐ ভাবতরঙ্গ তাঁহার উপর ঐরূপে প্রভুত্ব করিয়া বর্ত্তমান রহিল। পরে তৃতীয় দিবসের অবসানে ঠাকুর পঞ্চবটী তলে বেড়াইতে বেড়াইতে

দেখিলেন, এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দেব-মানব, সুন্দর গৌরবর্ণ, স্থির দৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন! ঠাকুর দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনি বিদেশী এবং বিজাতি-সম্ভূত। দেখিলেন, বিশ্রান্ত নয়নযুগলে ইঁহার মুখের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং নাসিকা 'একটু চাপা' হইলেও উহাতে ঐ সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম সাধিত হয় নাই। ঐ সৌম্যমুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব দেবভাব দেখিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং বিস্মিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—কে ইনি? দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্ত্তি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পূত-হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামসি—দুঃখযাতনা হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি হৃদয়ের শোণিত দান করিয়াছিলেন, অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরাভিন্ন পরম যোগী ও প্রেমিক খৃষ্ট ঈশামসি!'—তখন দেব-মানব ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরে লীন হইলেন, এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ঠাকুরের মন সগুণ বিরাট-ব্রহ্মের সহিত কতক্ষণ পর্য্যন্ত একীভূত হইয়া রহিল!—ঐরূপে শ্রীশ্রীঈশার দর্শনলাভ করিয়া ঠাকুর তাঁহার অবতারত্বসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঈশাসম্বন্ধীয় ঠাকুরের দর্শন কিরূপে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

উহার বহুকাল পরে আমরা যখন ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেছি তখন তিনি একদিন শ্রীশ্রীঈশার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'হাঁ রে, তোরা ত বাইবেল পড়িয়াছিস্, বল্ দেখি উহাতে ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে কি লেখা আছে?—তাঁহাকে দেখিতে কিরূপ ছিল?' আমরা বলিলাম, 'মহাশয় ঐ কথা বাইবেলের কোন স্থানে উল্লিখিত দেখি

নাই ; তবে, ঈশা য়াহুদি জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; অতএব সুন্দর গৌরবর্ণ ছিলেন এবং তাঁহার চক্ষু বিশ্রান্ত এবং নাসিকা দীর্ঘ টিকাল ছিল নিশ্চয়।' ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, 'কিন্তু আমি দেখিয়াছি তাঁহার নাক একটু চাপা ! কেন ঐরূপ দেখিয়াছিলাম কে জানে !' ঠাকুরের ঐ কথায় তখন কিছু না বলিলেও আমরা ভাবিয়াছিলাম তাঁহার ভাবাবেশে দৃষ্ট মূর্ত্তি ঈশার বাস্তবিক মূর্ত্তির সহিত কেমন করিয়া মিলিবে ? য়াহুদি জাতীয় পুরুষসকলের ন্যায় ঈশার নাসিকা টিকাল ছিল। কিন্তু ঠাকুরের শরীর রক্ষার কিছুকাল পরে জানিতে পারিলাম, ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে তিন প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং উহার মধ্যে একটীতে তাঁহার নাসিকা চাপা ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে !

শ্রীশ্রীবুদ্ধের অবতারত্ব ও তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

ঠাকুরকে ঐরূপে পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান যাবতীয় ধর্ম্মমতসকলে সিদ্ধ হইতে দেখিয়া পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ধারণা ছিল। সেজন্য ঐ বিষয়ে আমাদের যাহা জানা আছে তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা ভাল। ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে ঠাকুর হিন্দুসাধারণে যেমন বিশ্বাস করিয়া থাকে সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন ; অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধদেবকে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজা সর্ব্বকাল অর্পণ করিতেন এবং পুরীধামস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলভদ্ররূপ ত্রিরত্নমূর্ত্তিতে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের প্রকাশ অদ্যাপি বর্ত্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদে ভেদবুদ্ধির লোপ হইয়া মানবসাধারণের জাতিবুদ্ধি বিরহিত হওয়া রূপ উক্ত ধামের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া তিনি তথায় যাইবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় গমন করিলে

নিজ শরীরনাশের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া এবং যোগদৃষ্টি-সহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বিষয়ে অন্যরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।* গাঙ্গবারিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি বলিয়া ঠাকুরের সতত বিশ্বাসের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী অন্ন গ্রহণে মানবের বিষয়াসক্ত মন তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় এবং আধ্যাত্মিক ভাব ধারণের উপযোগী হয়, এ কথাতেও তিনি ঐরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। বিষয়ী লোকের সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলে তিনি উহার পরেই কিঞ্চিৎ গাঙ্গবারি ও 'আট্‌কে' মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যবর্গকেও ঐরূপ করিতে বলিতেন। শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারে ঠাকুরের বিশ্বাসসম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি ভিন্ন আরও একটী কথা আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম। ঠাকুরের পরম অনুগত ভক্ত মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীবুদ্ধাবতারের লীলাময় জীবন যখন নাটকাকারে প্রকাশিত করেন তখন ঠাকুর উহা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবর্ত্তিত মতে এবং বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই।' আমাদিগের ধারণা ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে ঐ কথা জানিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

ঠাকুরের জৈন ও শিখ-ধর্ম্মমতে ভক্তিবিশ্বাস।

জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক তীর্থঙ্করসকলের এবং শিখধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গুরু নানক হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু গোবিন্দ পর্য্যন্ত দশ গুরুর অনেক কথা ঠাকুর পরজীবনে জৈন এবং শিখধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকটে শুনিতে পাইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার ঐ সকল সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের উপরে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। অন্যান্য

---

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, ১২৮—১৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

দেব দেবীর আলেখ্যের সহিত তাঁহার গৃহের এক পার্শ্বে মহাবীর তীর্থঙ্করের একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি এবং শ্রীশ্রীঈশার একখানি আলেখ্য স্থাপিত ছিল। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐ সকল আলেখ্যের এবং তদুভয়ের সম্মুখে ঠাকুর ধূপ ধুনা প্রদান করিতেন। ঐরূপে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিলেও কিন্তু আমরা তাঁহাকে তীর্থঙ্করদিগের অথবা দশ গুরুর মধ্যে কাহাকেও ঈশ্বরাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে শ্রবণ করি নাই। শিখদিগের দশ গুরু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "উহারা সকলে জনক ঋষির অবতার; শিখদিগের নিকট শুনিয়াছি, রাজর্ষি জনকের মনে মুক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে লোককল্যাণ সাধন করিবার কামনা উদয় হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি নানকাদি গোবিন্দ পর্য্যন্ত দশ গুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির মধ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপনপূর্ব্বক পরব্রহ্মের সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলেন; শিখদিগের ঐ কথা মিথ্যা হইবার কোনও কারণ নাই।"

সে যাহা হউক, সর্ব্বসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের কতকগুলি অসাধারণ উপলব্ধি হইয়াছিল। ঐ উপলব্ধিগুলির কতকগুলি ঠাকুরের নিজ সম্বন্ধে ছিল এবং কতকগুলি সাধারণ আধ্যাত্মিক বিষয়সম্বন্ধে ছিল। উহার কিছু কিছু বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিলেও প্রধান প্রধানগুলির এখানে উল্লেখ করিতেছি। সাধনকালের অবসানে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া ভাবমুখে থাকিবার কালে ঐ উপলব্ধিগুলির সম্যক্ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের ধারণা। যোগদৃষ্টিসহায়ে ঠাকুর ঐ উপলব্ধিসকল

সর্ব্বধর্ম্মমতে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের অসাধারণ উপলব্ধিসকলের আবৃত্তি।

প্রত্যক্ষ করিলেও মানব-বুদ্ধিতে ঐ সকলের কারণ আমরা যতটা বুঝিতে পারি তাহাও এখানে পাঠককে বলিব।

প্রথম—ঠাকুরের ধারণা হইয়াছিল তিনি ঈশ্বরাবতার, আধিকারিক পুরুষ, তাঁহার সাধনভজন অন্যের জন্য সাধিত হইয়াছে। আপনার সহিত অপরের সাধকজীবনের তুলনা করিয়া ঠাকুর তদুভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সাধারণ দৃষ্টিসহায়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন, সাধারণ ঈশ্বরসাধক তাঁহার একটী মাত্র ভাবসহায়ে আজীবন চেষ্টা করিয়া তাঁহার দর্শনলাভ পূর্ব্বক শান্তির অধিকারী হয়; তাঁহার কিন্তু ঐরূপ না হইয়া যতদিন পর্য্যন্ত তিনি সকল মতের সাধনা না করিয়াছিলেন ততদিন কিছুতেই শান্ত হইতে পারেন নাই এবং প্রত্যেক মতের সাধনে সিদ্ধ হইতে তাঁহার অত্যল্প সময় লাগিয়াছে। কারণ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব; পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের কারণানুসন্ধানই ঠাকুরকে এখন যোগারূঢ় করাইয়া উহার কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেখাইয়া দিয়াছিল! দেখাইয়াছিল, তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিশেষাবতার বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ হইয়াছে!—এবং বুঝাইয়াছিল যে, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনাসমূহ আধ্যাত্মিক রাজ্যের নূতন আলোক আনয়ন করিয়া জীবের কল্যাণসাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভাবমোচনের জন্য নহে!

(১) তিনি ঈশ্বরাবতার।

দ্বিতীয়—তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, অন্য জীবের ন্যায় তাঁহার মুক্তি হইবে না! সাধারণ যুক্তিসহায়ে ঐকথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, যিনি ঈশ্বর হইতে সর্ব্বদা অভিন্ন তাঁহার অংশবিশেষ তিনি ত সর্ব্বদাই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তাঁহার অভাব বা

পরিচ্ছিন্নতাই নাই—অতএব মুক্তি হইবে কিরূপে? ঈশ্বরের জীবকল্যাণ-সাধনরূপ কর্ম্ম যতদিন থাকিবে ততদিন তাঁহাকেও যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া উহা করিতে হইবে—অতএব তাঁহার মুক্তি কিরূপে হইবে! ঠাকুর যেমন বলিতেন, 'সরকারী কর্ম্মচারীকে জমীদারীর যেখানে গোলমাল উপস্থিত হইবে সেখানেই ছুটিতে হইবে।' ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে নিজ সম্বন্ধে কেবল ঐ কথাই জানিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম-কোণ নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন, আগামী বারে তাঁহাকে ঐদিকে আগমম করিতে হইবে। আমাদিগের কেহ কেহ* বলেন তিনি তাঁহাদিগকে ঐ আগমনের সময় নিরূপণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দুইশত বৎসর পরে ঐদিকে আসিতে হইবে, তখন অনেকে মুক্তিলাভ করিবে, যাহারা তখন মুক্তিলাভ না করিবে তাহাদিগকে উহার জন্য অনেক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে!'

(২) তাঁহার মুক্তি নাই।

তৃতীয়—যোগারূঢ় হইয়া ঠাকুর নিজ দেহরক্ষার কাল বহু পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে একদিন ঐ বিষয়ে তিনি ভাবাবেশে এইরূপে বলিয়াছিলেন—

(৩) নিজ দেহরক্ষার কাল জানিতে পারা।

"যখন দেখিবে যাহার তাহার হাতে খাইব, কলিকাতায় রাত্রি যাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ অন্যকে পূর্ব্বে খাওয়াইয়া পরে স্বয়ং অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিব তখন জানিবে দেহরক্ষা করিবার কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।"—ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

আর একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বরে

* মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।

বলিয়াছিলেন, শেষকালে আর কিছু খাইব না—কেবল পায়সান্ন খাইব”—উহা সত্য হইবার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি!*

আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকারের উপলব্ধি-গুলি এখন আমরা লিপিবদ্ধ করিব—

প্রথম—সর্ব্বমতের সাধনে সিদ্ধিলাভ হইয়া ঠাকুরের দৃঢ়ধারণা হইয়াছিল, সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য—যত মত, তত পথ মাত্র। যোগবুদ্ধি এবং সাধারণ বুদ্ধি উভয় সহায়েই ঠাকুর যে, ঐ কথা বুঝিয়া-ছিলেন, ইহা বলিতে পারা যায়। কারণ, সকল প্রকার ধর্ম্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যুগাবতার ঠাকুরের উহা প্রচার-পূর্ব্বক পৃথিবীর ধর্ম্মবিরোধ ও ধর্ম্মগ্লানি নিবারণের জন্যই যে বর্ত্তমান কালে আগমন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, কোন ঈশ্বরাবতারই ইতিপূর্ব্বে সাধনাসহায়ে ঐ কথা নিজ জীবনে পূর্ণ উপলব্ধি পূর্ব্বক জগৎকে ঐ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন নাই। আধ্যাত্মিক মতের উদারতা লইয়া অবতারসকলের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে ঐ বিষয় প্রচারের জন্য ঠাকুরকে নিঃসন্দেহে সর্ব্বোচ্চাসন প্রদান করিতে হয়।

(৪) সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য—যত মত তত পথ।

দ্বিতীয়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়—অতএব ঠাকুর বলিতেন, উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, কিন্তু মানব মনের অবস্থাসাপেক্ষ। ঠাকুরের ঐ প্রকার প্রত্যক্ষ অনন্ত শাস্ত্র বুঝি-বার পক্ষে যে, কতদূর সহায়তা করিবে তাহা স্বল্প চিন্তার ফলেই উপলব্ধি হইবে। বেদোপনিষদাদি

(৫) দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত মানবকে অবস্থাভেদে অবলম্বন করিতে হইবে।

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত তিন মতের কথা ঋষিগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ থাকায় কি অনন্ত গণ্ডগোল বাঁধিয়া শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মমার্গকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে তাহা বলিবার নহে। প্রত্যেক সম্প্রদায় ঋষিগণের ঐ তিন প্রকারের প্রত্যক্ষ এবং উক্তিসকলকে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া ভাষা মোচড়াইয়া উহাদিগকে একই ভাবাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন; টীকাকারগণের ঐপ্রকার চেষ্টার ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, শাস্ত্রবিচার বলিলেই লোকের মনে একটা দারুণ ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ ভীতি হইতেই শাস্ত্রে অবিশ্বাস এবং উহার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক অবনতি উপস্থিত হইয়াছে। যুগাবতার ঠাকুরের সেইজন্য ঐ তিন মতকে অবস্থাবিশেষে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া উহাদিগের ঐরূপ অদ্ভুত সামঞ্জস্যের কথা প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। ঠাকুরের ঐ মীমাংসা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আমাদিগের শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার লাভের একমাত্র পথ। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক উক্তি স্মরণ কর—

"অদ্বৈত ভাব শেষ কথা জান্‌বি, উহা বাক্য-মনাতীত উপলব্ধির বিষয়।"

"মন-বুদ্ধি সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্য্যন্ত বলা ও বুঝা যায়; তখন নিত্য যেমন নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য—চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম!"

"বিষয়বুদ্ধিপ্রবল, সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদ-পঞ্চরাত্রের উপদেশ মত উচ্চ নাম-সংকীর্ত্তনাদি প্রশস্ত।"

কর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠাকুর ঐরূপে সীমানির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন—

"সত্ত্বগুণী ব্যক্তির কর্ম্ম স্বভাবতঃ ত্যাগ হইয়া যায়—চেষ্টা করিলেও সে আর কর্ম্ম করিতে পারে না,—অথবা ঈশ্বর তাহাকে উহা করিতে দেন না। যথা, গৃহস্থের বধূর গর্ভবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম ত্যাগ এবং পুত্র হইলে সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উহাকে লইয়াই নাড়া চাড়া করিয়া অবস্থান। অন্য সকল মানবের পক্ষে কিন্তু ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সকল কার্য্য বড় লোকের বাটীর চাকরাণীর মত সম্পাদন করার চেষ্টাই কর্ত্তব্য। ঐরূপ করার নামই কর্ম্মযোগ। যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম জপ ও ধ্যান করা এবং পূর্ব্বোক্ত রূপে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করা—ইহাই পথ।"

(৬) কর্ম্মযোগ অবলম্বনে সাধারণ মানবের উন্নতি হইবে।

তৃতীয়—ঠাকুরের উপলব্ধি হইয়াছিল, শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া নিজ জীবনে প্রকাশিত উদার মতের বিশেষভাবে অধিকারী নব সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। ঐ বিষয়ে ঠাকুর প্রথমে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা মথুর বাবু জীবিত থাকিবার কালে। তিনি তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার নিকটে ধর্ম্মলাভ করিতে অনেক ভক্ত আসিবে। পরে ঐ বিষয় যে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে ঠাকুর নিজ ছায়ামূর্ত্তি (photograph) দেখিতে দেখিতে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ইহা অতি উচ্চ যোগাবস্থার মূর্ত্তি—ইহার পরে এই মূর্ত্তির* ঘরে ঘরে পূজা হইবে।"

(৭) উদার মতের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

* ঠাকুরের বসিয়া সমাধিস্থ থাকিবার মূর্ত্তি

যাহাদের শেষজন্ম তাহারা তাঁহার মত গ্রহণ করিবে।

চতুর্থ—যোগদৃষ্টিসহায়ে জানিতে পারিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, "যাহাদের শেষ জন্ম তাহারা (তাঁহার নিকটে ধর্ম্মলাভ করিতে) আসিবে!" ঐ বিষয়ে আমাদিগের মতামত আমরা পাঠককে অন্যত্র † বলিয়াছি। সেজন্য উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তিন জন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ সাধক ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ঠাকুরের সাধনকালের তিনটী বিশেষ সময়ে তিনজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ সাধক পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত পদ্মলোচন, ঠাকুর তন্ত্রসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন—পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, ঠাকুর বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সাধনসকলে সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন—এবং গৌরী পণ্ডিত, দিব্যসাধনশ্রীসম্পন্ন ঠাকুরকে সাধনকালের অবসানে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পদ্মলোচন ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনার ভিতরে আমি ঈশ্বরীয় আবির্ভাব ও শক্তি দেখিতেছি।' বৈষ্ণবচরণ সংস্কৃত ভাষায় স্তব রচনা করিয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের সম্মুখে তাঁহার অবতারত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গৌরীকান্ত ঐরূপে ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'শাস্ত্রে যে সকল উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে পাঠ করিয়াছি, সে সকলি তোমাতে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান দেখিতেছি, তদ্ভিন্ন শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ নাই এরূপ উচ্চাবস্থাসকলের প্রকাশও তোমাতে বিদ্যমান দেখিতেছি—

† গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ১৯৮—২০০ পৃষ্ঠা দেখ।

তোমার অবস্থা বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রসকল অতিক্রম করিয়া বহু-দূর অগ্রসর হইয়াছে, তুমি মানুষ নহ, অবতারসকলের যাঁহা হইতে উৎপত্তি হয় সেই বস্তু তোমার ভিতরে রহিয়াছে!' ঠাকুরের অলৌকিক জীবনকথা এবং পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব উপলব্ধিসকলের আলোচনা করিয়া বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ঐ সকল সাধক পণ্ডিতাগ্রণীগণ তাঁহাকে বৃথা চাটুবাদ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাসকল বলিয়া যান নাই। ঐ সকল পণ্ডিতের দক্ষিণেশ্বরে আগমনকাল নিম্নলিখিত ভাবে নিরূপিত হয়—

দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবার অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী গৌরী পণ্ডিতকে তথায় দেখিয়াছিলেন। আবার, মথুর বাবু জীবিত থাকিবার কালে গৌরী পণ্ডিত যে, দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন একথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। অতএব বোধ হয় শ্রীযুক্ত গৌরী সন ১২৭৭ সালের কোন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমন পূর্ব্বক সন ১২৭৯ সাল পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া নিজ জীবনে যাঁহারা ঐজ্ঞান পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন ঐরূপ সাধক পণ্ডিতদিগকে দেখিবার জন্য ঠাকুরের নিরন্তর আগ্রহ ছিল। ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভূষণ পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষ হয় এবং মথুর বাবুর দ্বারা নিমন্ত্রণ করাইয়া তিনি তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন করেন। পণ্ডিতজীর বাস ঠাকুরের জন্মভূমির নিকটে ইঁদেশ নামক গ্রামে ছিল। হৃদয়ের ভ্রাতা রামরতন, মথুর বাবুর নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া যাইয়া শ্রীযুত গৌরীকান্তকে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে আনয়ন করিয়াছিলেন। গৌরী পণ্ডিতের সাধনপ্রসূত

ঐ পণ্ডিতদিগের আগমন-কাল নিরূপণ।

অদ্ভুত শক্তির কথা এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমন পূর্ব্বক ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার মনে ক্রমে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হইয়া তিনি যে ভাবে সংসার ত্যাগ করেন সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র* বলিয়াছি।

'রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত' শীর্ষক গ্রন্থে শ্রীযুত মথুরের অন্নমেরু অনুষ্ঠানের কাল সন ১২৭০ সাল বলিয়া নিরূপিত আছে। পণ্ডিত পদ্মলোচনকে ঐকালে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া দান গ্রহণ করাইবার জন্য শ্রীযুত মথুরের আগ্রহের কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। অতএব বেদান্তবিৎ ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ঠাকুরের নিকট আগমনকাল সন ১২৭০ সাল বলা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বরে আগমনকাল সহজেই নিরূপিত হয়। কারণ, ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীমতী যোগেশ্বরীর সহিত এবং পরে ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভূষণের সহিত দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে তাঁহার ঠাকুরের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইবার কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। ব্রাহ্মণীর ন্যায় তিনিও ঠাকুরের শরীরমনে বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত মহাভাবের লক্ষণসমুদয় প্রকাশিত দেখিয়াছিলেন এবং স্তম্ভিতহৃদয়ে শ্রীযুক্তা ব্রাহ্মণীর সহিত একমত হইয়া তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুনরাবতীর্ণ, বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকটে পূর্ব্বোক্ত কথাসকল শুনিয়া মনে হয় শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ সন ১২৭১ সালে ঠাকুরের মধুরভাব সাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহার নিকটে আসিয়া সন

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—১ম অধ্যায়, ৩৩—৪১ পৃষ্ঠা দেখ।

১২৭৯ সাল পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধিসকল করিবার পরে ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া ঠাকুরের মনে এক অভিনব বাসনা প্রবলভাবে উদিত হইয়াছিল।

ঠাকুরের নিজ সাঙ্গোপাঙ্গসকলকে দেখিতে বাসনা ও আহ্বান।

যোগারূঢ় হইয়া পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ভক্তসকলকে দেখিবার জন্য এবং তাহাদিগের অন্তরে নিজ ধর্ম্মশক্তি সঞ্চার করিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "সেই ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। দিবাভাগে সর্ব্বকাল ঐ ব্যাকুলতা হৃদয়ে কোনরূপে ধারণ করিয়া থাকিতাম। বিষয়ী লোকের মিথ্যা বিষয়প্রসঙ্গ শুনিয়া যখন বিষবৎ বোধ হইত তখন ভাবিতাম তাহারা সকলে আসিলে ঈশ্বরীয় কথা কহিয়া প্রাণ শীতল করিব, শ্রবণ জুড়াইব, নিজ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল তাহাদিগকে বলিয়া অন্তরের বোঝা লঘু করিব। ঐরূপে প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদিগের আগমনের কথার উদ্দীপনা হইয়া তাহাদিগের বিষয়ই নিরন্তর চিন্তা করিতাম—কাহাকে কি বলিব, কাহাকে কি দিব ঐ সকল কথা ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু দিবাবসানে যখন সন্ধ্যার সমাগম হইত তখন ধৈর্য্যের বাঁধ দিয়া ঐ ব্যাকুলতাকে আর রাখিতে পারিতাম না; মনে হইত আবার একটা দিন চলিয়া গেল, তাহাদিগের কেহই আসিল না! যখন দেবালয় আরাত্রিকের শঙ্খঘণ্টাদি রোলে মুখরিত হইয়া উঠিত তখন বাবুদিগের কুঠির উপরের ছাদে যাইয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস্ আয় রে—তোদের না দেখে আর থাক্‌তে পার্‌চি না রে' বলিয়া চীৎকারে গগন পূর্ণ•

করিতাম! মাতা তাহার বালককে দেখিবার জন্য ঐরূপ ব্যাকুলতা অনুভব করে কি না সন্দেহ, সখা সখার সহিত এবং প্রণয়ি-যুগল পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য কখনও ঐরূপ করে বলিয়া শুনি নাই—এত ব্যাকুলতায় প্রাণ চঞ্চল হইয়াছিল! ঐরূপ হইবার কয়েক দিন পরেই ভক্তসকলে একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল!”

ঐরূপে ঠাকুরের ব্যাকুল আহ্বানে ভক্তসকলের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্ব্বে কয়েকটী বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থের সহিত ঐসকলের মুখ্যভাবে সম্বন্ধ না থাকায় আমরা উহাদিগকে পরিশিষ্টমধ্যে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পরিশিষ্ট ।

পরিশিষ্ট

৺ষোড়শীপূজার পর হইতে ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তসকলের আগমন পর্য্যন্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী।

আমরা পাঠককে বলিয়াছি, ৺ষোড়শী-পূজার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সন ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমার ঐ স্থানে পৌঁছিবার স্বল্প কাল পরেই ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য জরাতিসার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঠাকুরের পিতার বংশের প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতা কোনও না কোন ভাবে প্রকাশিত ছিল। শ্রীযুত রামেশ্বরের সম্বন্ধে ঐরূপ অনেক কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি।

রামেশ্বরের মৃত্যু।

রামেশ্বর বড় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সন্ন্যাসী ফকীরেরা দ্বারে আসিয়া যে যাহা চাহিত, গৃহে থাকিলে, তিনি তাহাদিগকে উহা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি, ঐরূপে কোন ফকীর আসিয়া বলিত, রন্ধনের জন্য আমার একটী বোক্‌নোর অভাব, কেহ বলিত, আমার লোটা বা জলপাত্রের অভাব, কেহ বলিত, আমার কম্বলের অভাব—রামেশ্বরও ঐসকল তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাহাদিগকে দিতেন। বাটীর যদি কেহ উহাতে আপত্তি করিত, তাহা হইলে শ্রীযুত রামেশ্বর তাহাকে শান্তভাবে বলিতেন,—লইয়া যাউক, কিছু বলিও না, আবার ঐরূপ দ্রব্যাদি কত আসিবে, ভাবনা কি? জ্যোতিষ-শাস্ত্রে রামেশ্বরের সামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল।

রামেশ্বরের উদার প্রকৃতি।

দক্ষিণেশ্বর হইতে রামেশ্বরের শেষবার বাটী ফিরিয়া আসিবার কালে আর যে তাঁহাকে তথা হইতে ফিরিতে হইবে না, একথা ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন,—'বাটী যাচ্ছ, যাও, কিন্তু স্ত্রীর নিকটে শয়ন করিও না; তাহা হইলে তোমার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়!' ঐ কথা ঠাকুরের মুখে আমাদিগের কেহ * কেহ শ্রবণ করিয়াছেন।

রামেশ্বরের মৃত্যুর সম্ভাবনা ঠাকুরের পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারা ও তাঁহাকে সতর্ক করা।

রামেশ্বর বাটীতে পৌঁছিবার কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল, তিনি পীড়িত। ঠাকুর ঐকথা শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন,—'সে নিষেধ মানে নাই, তাহার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়!' ঐ ঘটনার পাচ সাত দিন পরেই সংবাদ আসিল, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর পরলোকে গমন করিয়াছেন! তাঁহার মৃত্যুসংবাদে, ঠাকুর তাঁহার বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত লাগিবে বলিয়া বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন, এবং মন্দিরে গমনপূর্ব্বক জননীকে শোকের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে কাতর-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ঐরূপ করিবার পরে তিনি জননীকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য মন্দির হইতে নহবতে আগমন করিলেন এবং সজলনয়নে তাঁহাকে ঐ দুঃসংবাদ নিবেদন করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিয়াছিলাম, মা ঐ কথা শুনিয়া একবারে হতজ্ঞান হইবেন এবং তাঁহার প্রাণরক্ষা সংশয় হইবে, কিন্তু ফলে দেখিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল! মা ঐকথা শুনিয়া অল্প স্বল্প দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক 'সংসার অনিত্য, সকলেরই একদিন মৃত্যু নিশ্চিত, অতএব শোক করা বৃথা'—ইত্যাদি বলিয়া আমাকেই শান্ত করিতে লাগিলেন!—দেখিলাম, তানপুরার কান টিপিয়া সুর যেমন চড়াইয়া দেয়, শ্রীশ্রীজগদম্বা যেন ঐরূপে মার মনকে উচ্চ গ্রামে চড়াইয়া রাখিয়াছেন, পার্থিব শোক-দুঃখ ঐজন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে

রামেশ্বরের মৃত্যুসংবাদে জননীর শোকে প্রাণসংশয় হইবে ভাবিয়া ঠাকুরের প্রার্থনা ও তৎফল।

* শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামী।

না! ঐরূপ দেখিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বারংবার প্রণাম করিলাম এবং নিশ্চিন্ত হইলাম!”

রামেশ্বর পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে নিজ মৃত্যুকাল জানিতে পারিয়াছিলেন এবং আত্মীয়গণকে ঐ কথা বলিয়া নিজ সৎকার ও শ্রাদ্ধের জন্য সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাটীর সম্মুখে একটী আঁব গাছ কোন কারণে কাটা হইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—ভাল হইল, আমার কার্য্যে লাগিবে! মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পূত নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। পরে সংজ্ঞা হারাইয়া অল্পক্ষণ থাকিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে রামেশ্বর আত্মীয়বর্গকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহটাকে শ্মশানমধ্যে অগ্নিসাৎ না করিয়া, উহার পার্শ্বের রাস্তার উপরে যেন অগ্নিসাৎ করা হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিয়াছিলেন, কত সাধুলোক ঐ রাস্তার উপর দিয়া চলিবে, তাঁহাদিগের পদরজে আমার সদ্গতি হইবে। রামেশ্বরের মৃত্যু গভীর রাত্রিতে হইয়াছিল।

মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া রামেশ্বরের আচরণ।

পল্লীর গোপাল নামক এক ব্যক্তির সহিত রামেশ্বরের বহুকালাবধি বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে গোপাল বলিয়াছিলেন, ঐ দিন ঐ সময়ে তিনি তাঁহার বাটীর দ্বারে, কাহাকেও শব্দ করিতে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইয়াছিলেন, ‘আমি রামেশ্বর, গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছি, বাটীতে ৺রঘুবীর রহিলেন, তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যাহাতে গোল না হয়, তদ্বিষয়ে তুমি নজর রাখিও!’ গোপাল বন্ধুর আহ্বানে দ্বার খুলিতে যাইয়া পুনরায় শুনিলেন, ‘আমার শরীর নাই, অতএব দ্বার খুলিলেও তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না!’ গোপাল তথাপি দ্বার খুলিয়া যখন কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন সংবাদ সত্য কি মিথ্যা জানিবার জন্য রামেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, সত্যসত্যই রামেশ্বরের দেহত্যাগ হইয়াছে!

মৃত্যুর পরে রামেশ্বরের নিজবন্ধু গোপালের সহিত কথোপকথন।

শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের মৃত্যু সন ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণের ২৭ তারিখে হইয়াছিল এবং তখন তাঁহার বয়স আন্দাজ ৪৮ বৎসর ছিল। পিতার অস্থিসঞ্চয়পূর্ব্বক কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বৈদ্যবাটী নামক স্থলে আসিয়া তিনি উহা গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার জন্য ঐস্থলে নৌকায় করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। পার হইবার কালে বারাকপুরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, মথুর বাবুর পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তখন যে মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, উহার অর্দ্ধেক ভাগ গাঁথা হইয়াছে। অনন্তর ১২৮১ সালের ৩০ চৈত্র ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল তারিখে ঐ মন্দিরে ৺দেবী-প্রতিষ্ঠা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। রামেশ্বরের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র রামলাল দক্ষিণেশ্বরে পূজকের পদ স্বীকার করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও পূজকের পদগ্রহণ। চানকের অন্নপূর্ণার মন্দির।

মথুর বাবুর মৃত্যুর পরে কলিকাতায় সিঁদুরিয়াপটি পল্লী-নিবাসী শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিক মহাশয় ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহাকে বিশেষরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন।* শম্ভু বাবু ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতে বিশেষ অনুরাগসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার অজস্র দানের জন্য কলিকাতাবাসী সকলের পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রতি শম্ভু বাবুর ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন অতি গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং মথুর বাবুর ন্যায় তিনি

ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদ-দার শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের কথা।

---

* ঠাকুরের ভক্ত সকলের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, মথুর বাবুর মৃত্যুর পরে পানিহাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জোগাইবার ভার লইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মণিমোহন তখন ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার পরে শম্ভু বাবু ঐ সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদিগের মনে হয়, শম্ভু বাবুকে ঠাকুর স্বয়ং যখন তাঁহার দ্বিতীয় রসদ্দার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন মণি বাবু ঠাকুরের সেবাভার গ্রহণ করিলেও, অধিক কাল উহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের যখন যাহা কিছুর অভাব হইত, জানিতে পারিলে শম্ভু বাবু এখন হইতে তৎসমস্তই পূরণ করিতে আনন্দিত হইতেন শ্রীযুক্ত শম্ভু ঠাকুরকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, 'কে কার গুরু?—তুমি আমার গুরু!'—শম্ভু কিন্তু ছাড়িতেন না, ঠাকুরকে চিরকাল ঐরূপেই সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দিব্য-সঙ্গগুণে শ্রীযুক্ত শম্ভু যে, আধ্যাত্মিক পথে বিশেষ আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহার প্রভাবে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসসকল যে, পূর্ণতা এবং সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার ঠাকুরকে ঐরূপ সম্বোধনে হৃদয়ঙ্গম হয়। শম্ভু বাবুর পত্নীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিতেন এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে, তাঁহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করিতেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন বোধ হয় সন ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে হইয়াছিল। পূর্ব্বের ন্যায় তখন তিনি নহবতের ঘরে ঠাকুরের জননীর সহিত বাস করিতে থাকেন। শম্ভু বাবু ঐ কথা জানিতে পারিয়া, সঙ্কীর্ণ নহবতঘরে তাঁহার থাকিবার কষ্ট হইতেছে অনুমান করিয়া, দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সন্নিকটে কিছু জমী ২৫০৲ টাকা প্রদানপূর্ব্বক মৌরসী করিয়া লন এবং তদুপরি একখানি সুপরিসর চালা ঘর বাঁধিয়া দিবার সঙ্কল্প করেন। তখন কাপ্তেন উপাধি-প্রাপ্ত নেপাল-রাজসরকারের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের নিকট গমনাগমন করিতেছেন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কাপ্তেন বিশ্বনাথ উক্ত ঘর করিবার সঙ্কল্প শুনিয়া, উহার নিমিত্ত যত কাঠ লাগিবে, দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কারণ, নেপাল-রাজসরকারের নেপালী সাল কাষ্ঠের কারবারের ভার তখন তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকায়, উহা দেওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ ব্যয়-সাধ্য ছিল না। গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইলে, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ গঙ্গার অপর পারে বেলুড়গ্রামস্থ তাঁহার কাঠের গদী হইতে তিনখানি সালের

চকোর পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাত্রে গঙ্গায় বিশেষ প্রবলভাবে জোয়ার আসায় উহার একখানি ভাসিয়া গেল। হৃদয় উহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীমাকে 'ভাগ্যহীনা' বলিয়া বসেন। সে যাহা হউক, কাঠ ভাসিয়া যাইবার কথা শুনিয়া, কাপ্তেন আর একখানি কাঠ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং গৃহনির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমার জন্য শম্ভুবাবুর ঘর করিয়া দেওয়া। কাপ্তেনের ঐ বিষয়ে সাহায্য। ঐ গৃহে ঠাকুরের একরাত্রি বাস।

অতঃপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী উক্ত গৃহে যাইয়া প্রায় বৎসরকাল বাস করেন। 'গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিবে এবং সর্ব্বদা শ্রীশ্রীমার সঙ্গে থাকিবে বলিয়া, একটী রমণীকে তখন নিযুক্তা করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমা এই গৃহে রন্ধনাদি করিয়া, ঠাকুরের জন্য খাদ্যাদি প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার ভোজনান্তে এখানে ফিরিয়া আসিতেন। ঠাকুরও তাঁহার তত্ত্বাবধানের জন্য দিবাভাগে কোন সময়ে ঐ গৃহে আগমন করিতেন এবং কিছুকাল তাঁহার নিকটে থাকিয়া পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন। একদিন কেবল ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। সেদিন অপরাহ্নে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার নিকটে আগমনমাত্র গভীর রাত্র পর্য্যন্ত এমন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল যে, মন্দিরে ফিরিয়া আসা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। সুতরাং ঠাকুর সে রাত্রি তথায় বাস করিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীশ্রীমা ঝোল ভাত রাঁধিয়া দিলেন এবং ঠাকুর উহা ভোজন করিয়া ঐ গৃহেই বিশ্রাম করিলেন।

এক বৎসর ঐ গৃহে ঐরূপে বাস করিবার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আমাশয় রোগে কঠিনভাবে আক্রান্তা হইলেন। শম্ভুবাবু তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিয়োগে প্রসাদ ডাক্তার এই সময়ে শ্রীশ্রীমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। একটু আরোগ্য হইলে, শ্রীশ্রীমা পিত্রালয় জয়রামবাটী গ্রামে গমন করিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তথায় যাইবার স্বল্পকাল পরে পুনরায় তিনি ঐ রোগে শয্যাশায়িনী হইলেন। ক্রমে উহার এত বৃদ্ধি হইল যে, তাঁহার শরীর-রক্ষা সংশয়ের বিষয় হইয়া

ঐ গৃহে বাসকালে শ্রীশ্রীমার কঠিন পীড়া ও জয়রামবাটীতে গমন।

উঠিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পূজ্যপাদ পিতা শ্রীরামচন্দ্র তখন মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জননী এবং ভ্রাতৃবর্গই তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুর ঐ সময়ে তাঁহার নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, 'তাইত রে হৃদে, ও (শ্রীশ্রীমা) কেবল আস্‌বে আর যাবে, মনুষ্যজন্মের কিছুই করা হবে না!'

৺সিংহবাহিনীর নিকট হত্যাদান ও ঔষধপ্রাপ্তি।

রোগের যখন কিছুতেই উপশম হইল না, তখন শ্রীশ্রীমার প্রাণে ৺দেবীর নিকট হত্যা-প্রদানের কথা উদিত হইল এবং জননী এবং ভ্রাতৃগণ জানিতে পারিলে ঐ বিষয়ে বাধা প্রদান করিতে পাবে ভাবিয়া, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া গ্রাম্য দেবী ৺সিংহবাহিনীর মাড়ে (মন্দিরে) যাইয়া ঐ উদ্দেশ্যে প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। কয়েক ঘণ্টাকাল ঐরূপে থাকিবার পরেই ৺দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে আরোগ্যের জন্য ঔষধ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

৺দেবীর আদেশে উক্ত ঔষধ সেবনমাত্রেই তাঁহার রোগের শান্তি হইল এবং ক্রমে তাঁহার শরীর পূর্ব্বের ন্যায় সবল হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমার হত্যা-প্রদানপূর্ব্বক ঔষধপ্রাপ্তির কাল হইতে ঐ দেবী বিশেষ জাগ্রতা বলিয়া চতুস্পার্শ্বের গ্রামসমূহে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে শম্ভু বাবুর নির্ভীক আচরণ।

প্রায় চারি বৎসর কাল ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমার ঐরূপে সেবা করিবার পরে শম্ভু বাবু রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। পীড়িতাবস্থায় ঠাকুর তাঁহাকে একদিন দেখিতে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া বলিয়াছিলেন, 'শম্ভুর প্রদীপে তৈল নাই!' ঠাকুরের কথাই সত্য হইল—বহুমূত্র রোগে বিকার উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত শম্ভু শরীর রক্ষা করিলেন। শম্ভুবাবু পরম উদার ও তেজস্বী ঈশ্বর-ভক্ত ছিলেন। পীড়িতাবস্থাতে তাঁহার মনের প্রসন্নতা এক দিনের জন্যও নষ্ট হয় নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি হৃদয়কে হৃষ্টচিত্তে বলিয়াছিলেন, "মরণের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, আমি পুঁটুলি পাঁট্‌লা বেঁধে প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে আছি!" শম্ভু

বাবুর সহিত পরিচয় হইবার বহুপূর্ব্বে ঠাকুর যোগারূঢ় অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা শম্ভুকেই তাঁহার দ্বিতীয় রসদ্দার-রূপে মনোনীত করিয়াছেন, এবং দেখিবামাত্র তাঁহাকে সেই ব্যক্তি বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিলেন।

পীড়িতা হইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পিত্রালয়ে যাইবার কয়েক মাস পরে ঠাকুরের জীবনে একটী বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮২ সালের ১৬ই ফাল্গুন তারিখে, ঠাকুরের জন্মতিথির দিবসে তাঁহার জননী শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ৯০।৯৫ বৎসর হইয়াছিল এবং উহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে জরার আক্রমণে তাঁহার ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তিসমূহ অনেকাংশে লুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আমরা হৃদয়ের নিকটে যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিতেছি—

ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি দেবীর শেষাবস্থা ও মৃত্যু।

ঐ ঘটনা উপস্থিত হইবার চারিদিন পূর্ব্বে হৃদয় কিছুদিনের জন্য অবসর লইয়া বাটী যাইতেছিল। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একটী অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কায় তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ঠাকুরকে ছাড়িয়া তাহার কিছুতেই যাইতে ইচ্ছা হইল না। ঠাকুরকে উহা নিবেদন করায় তিনি বলিলেন, তবে যাইয়া কাজ নাই। উহার পরে তিন দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

ঠাকুর প্রত্যহ তাঁহার জননীর নিকট কিছুকালের জন্য যাইয়া তাঁহার সেবা স্বহস্তে যথাসাধ্য সম্পাদন করিতেন। হৃদয়ও ঐরূপ করিতেন; এবং 'কালীর মা' নাম্নী চাকরাণী দিবাভাগে প্রায় সর্ব্বদা বৃদ্ধার নিকটে থাকিত। হৃদয়কে বৃদ্ধা ইদানীং দেখিতে পারিতেন না। অক্ষয়ের মৃত্যুর সময় হইতে বৃদ্ধার মনে কেমন একটা ধারণা হইয়াছিল যে, হৃদয়ই অক্ষয়কে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং ঠাকুরকে ও তাঁহার পত্নীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে! সেজন্য বৃদ্ধা ঠাকুরকে কখন কখন সতর্ক করিয়া দিতেন, বলিতেন—"হৃদুর কথা কখন শুনিবি না।" জরাজীর্ণা হইয়া বৃদ্ধার বুদ্ধিভ্রংশের পরিচয় অন্য নানা বিষয়েও পাওয়া যাইত। যথা,—দক্ষিণেশ্বর-বাগানের সন্নিকটেই আলমবাজারের পাটের কল। মধ্যাহ্নে ঐ কলের

কর্ম্মচারীদিগকে কিছু ক্ষণের জন্য ছুটি দেওয়া হয় এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বাদে বাঁশী বাজাইয়া পুনরায় কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়। কলের বাঁশীর আও-য়াজকে বৃদ্ধা ৺বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং যত-ক্ষণ্ না ঐ ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, ততক্ষণ আহারে বসিতেন না। ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিলে বলিতেন—'এখন কি খাব গো, এখন শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারা-য়ণের ভোগ হয় নাই, বৈকুণ্ঠে শঙ্খ বাজে নাই, এখন কি খাইতে আছে?' কলের যেদিন ছুটি থাকিত, সেদিন বাঁশী বাজিত না, বৃদ্ধাকে আহারে বসান সেদিন বিষম মুস্কিল হইত; হৃদয় এবং ঠাকুরকে ঐদিন নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃদ্ধাকে আহার করাইতে হইত!

সে যাহা হউক, চতুর্থ দিবস সমাগত হইল, বৃদ্ধার অসুস্থতার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। সন্ধ্যার পরে ঠাকুর তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বজীবনের নানা কথার উত্থাপন ও গল্প করিয়া বৃদ্ধার মন আনন্দে পূর্ণ করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঠাকুর তাঁহাকে শয়ন করাইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন প্রভাত হইয়া ক্রমে আটটা বাজিয়া গেল, বৃদ্ধা তথাপি ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন না। 'কালীর মা' নহবতের উপ-রের ঘরের দ্বারে যাইয়া অনেক ডাকাডাকি করিল, কিন্তু বৃদ্ধার সাড়া পাইল না। দ্বারে কান পাতিয়া শুনিতে পাইল, তাঁহার গলা হইতে কেমন একটা বিকৃত রব উত্থিত হইতেছে। তখন ভীত হইয়া সে, ঠাকুর ও হৃদয়কে ঐবিষয় নিবেদন করিল। হৃদয় যাইয়া কৌশলে বাহির হইতে দ্বারের অর্গল খুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধা সংজ্ঞারহিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন কবিরাজী ঔষধ আনিয়া হৃদয় তাঁহার জিহ্বায় লাগাইয়া দিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু করিয়া দুগ্ধ ও গঙ্গাজল তাঁহাকে পান করাইতে লাগিল। তিন দিন ঐভাবে থাকিবার পরে বৃদ্ধার অন্তিম কাল উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহাকে অন্তর্জ্জলি করা হইল এবং ঠাকুর ফুল, চন্দন ও তুলসী লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। পরে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে উহা করিতে নাই বলিয়া ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল তাঁহার নিয়োগে বৃদ্ধার দেহের সৎকার করিল। অনন্তর অশৌচ উত্তীর্ণ হইলে, ঠাকুরের

নির্দ্দেশে রামলালই বৃষোৎসর্গ করিয়া ঠাকুরের জননীর শ্রাদ্ধক্রিয়া যথারীতি সম্পাদন করিল।

মাতৃবিয়োগ হইলে, ঠাকুর শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অশৌচগ্রহণাদি কোন কার্য্য করেন নাই। জননীর পুত্রোচিত কোন কার্য্য করিলাম না ভাবিয়া একদিন তিনি তর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিবামাত্র ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গুলিসকল অসাড় ও অসংলগ্ন হইয়া সমস্ত জল হস্ত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। বারম্বার চেষ্টা করিয়াও তখন তিনি ঐ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েন নাই এবং দুঃখিত অন্তরে ক্রন্দন করিয়া পরলোকগতা জননীকে নিজ অসামর্থ্য নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে এক পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলেন, গলিত-কর্ম্ম অবস্থা হইলে অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে স্বভাবতঃ কর্ম্ম উঠিয়া যাইলে ঐরূপ হইয়া থাকে; শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিতে পারিলেও, তখন ঐরূপ ব্যক্তিকে দোষ স্পর্শে না।

মাতৃবিয়োগ হইলে ঠাকুরের তর্পণ করিতে যাইয়া তৎকরণে অপারগ হওয়া। তাঁহার গলিত-কর্ম্মাবস্থা।

ঠাকুরের মাতৃবিয়োগের একবৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় তাঁহার জীবনে একটী বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮১ সালের চৈত্র মাসের মধ্যভাগে, ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ঠাকুরের প্রাণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার বাসনা উদয় হইয়াছিল। যোগারূঢ় ঠাকুর উহাতে শ্রীশ্রীমাতার ইঙ্গিত দেখিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত কেশব তখন কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে বেলঘ'রে নামক স্থানে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন মহাশয়ের উদ্যানবাটিকায় সশিষ্যে সাধনভজনে নিযুক্ত আছেন জানিতে পারিয়া, হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঐ উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, তাঁহারা কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্ণে আন্দাজ এক ঘটিকার সময় ঐ স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। ঠাকুরের পরিধানে সে দিন একখানি লালপেড়ে কাপড় মাত্র ছিল এবং

ঠাকুরের কেশব বাবুকে দেখিতে গমন।

উহার কোঁচার খুঁটটী তাঁহার বাম স্কন্ধোপরি লম্বিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতেছিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া হৃদয় দেখিলেন, শ্রীযুক্ত কেশব অনুচরবর্গের সহিত উদ্যানমধ্যস্থ পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া আছেন। অগ্রসর হইয়া তিনি তাঁহাকে নিবেদন করিলেন 'আমার মাতুল হরিকথা ও হরিগুণগান শুনিতে বড় ভালবাসেন এবং উহা শ্রবণ করিতে করিতে মহাভাবে তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে; আপনার নাম শুনিয়া আপনার মুখে ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তন শুনিতে তিনি এখানে আগমন করিয়াছেন, আদেশ পাইলে তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিব।' শ্রীযুত কেশব সম্মতিপ্রকাশ করিলে, হৃদয় গাড়ী হইতে ঠাকুরকে নামাইয়া সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কেশব প্রভৃতি সকলে ঠাকুরকে দেখিবার জন্য এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া এখন স্থির করিলেন, ইনি সামান্য ব্যক্তি মাত্র।

বেলঘরিয়া উদ্যানে কেশব।

ঠাকুর কেশবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'বাবু তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাক। ঐ দর্শন কিরূপ, তাহা জানিতে বাসনা, সেজন্য তোমাদিগের নিকটে আসিয়াছি।' ঐরূপে সৎপ্রসঙ্গ আরব্ধ হইল। ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথার উত্তরে শ্রীযুত কেশব কি বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর যে, "কে জানে মন কালী কেমন—ষড়্‌দর্শনে দর্শন মিলে না"-রূপ রামপ্রসাদী সঙ্গীতটী গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, একথা আমরা হৃদয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুরের ভাবাবস্থা দেখিয়া তখন কেশব প্রভৃতি সকলে উহাকে আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বলিয়া মনে করেন নাই; ভাবিয়াছিলেন, উহা একটা মিথ্যা ভাণ বা মস্তিষ্কের বিকার-প্রসূত।

কেশবের সহিত প্রথমালাপ।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের বাহ্যচৈতন্য আনয়নের জন্য হৃদয় তাঁহার কর্ণে এখন প্রণব শুনাইতে লাগিলেন এবং উহা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঐরূপে অর্দ্ধবাহ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর

এখন গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়সকল সামান্য সামান্য দৃষ্টান্ত সহায়ে এমন সরল ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন যে, সকলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। স্নানাহারের সময় অতীত হইয়া ক্রমে পুনরায় উপসনার সময় উপস্থিত হইতে বসিয়াছে, সেকথা কাহারও মনে হইল না! ঠাকুর তাঁহাদিগের ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "গরুর পালে অন্য কোন পশু আসিলে, তাহারা তাহাকে গুঁতাইতে যায়, কিন্তু গরু আসিলে গা চাটাচাটি করে—আমাদের আজ সেইরূপ হইয়াছে।" অনন্তর কেশবকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তোমার ল্যাজ্ খসিয়াছে!" শ্রীযুত কেশবের অনুচরবর্গ ঐ কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া যেন অসন্তুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর তখন ঐ কথার অর্থ বুঝাইয়া সকলকে মোহিত করিলেন। বলিলেন, "দেখ, ব্যাঙাচির যতদিন ল্যাজ্ থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে, স্থলে উঠিতে পারে না; কিন্তু ল্যাজ্ যখন খসিয়া পড়ে, তখন জলেও থাকিতে পারে, ডাঙ্গাতেও বিচরণ করিতে পারে—সেইরূপ মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ্ থাকে, ততদিন সে সংসারজলেই কেবল থাকিতে পারে; ঐ ল্যাজ্ খসিয়া পড়িলে, সংসার এবং সচ্চিদানন্দ উভয় বিষয়েই ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে। কেশব তোমার মন এখন ঐরূপ হইয়াছে, উহা সংসারেও থাকিতে পারে এবং সচ্চিদানন্দেও যাইতে পারে!" ঐরূপে নানাপ্রসঙ্গে অনেক ক্ষণ অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুরের দর্শন পাইবার পরে শ্রীযুত কেশবের মন তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, এখন হইতে তাঁহার দেহরক্ষার কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি প্রায়ই ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আগমন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার কলিকাতার 'কমল কুটীর' নামক বাটীতেও লইয়া যাইয়া তাঁহার দিব্যসঙ্গ লাভে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ বিবেচনা কবিতেন। ঠাকুর ও কেশবের সম্বন্ধ, ক্রমে এত গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরকে কয়েক দিন

ঠাকুর ও কেশবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

দেখিতে না পাইলে উভয়েই বিশেষ অভাব বোধ করিতেন; তখন ঠাকুর কলিকাতায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন অথবা শ্রীযুত কেশব দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সময় প্রতি বৎসর ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া অথবা ঠাকুরকে লইয়া যাইয়া তাঁহার সহিত ঈশ্বর প্রসঙ্গে একদিন অতিবাহিত করাকে শ্রীযুত কেশব ঐ উৎসবের অঙ্গমধ্যে পরিগণিত করিতেন। ঐরূপে কতবার ঐ সময়ে তিনি জাহাজে করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বদলবলে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়া লইয়া, তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনিতে শুনিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া কেশবের আচরণ।

দক্ষিণেশ্বরে আগমনকালে শ্রীযুত কেশব শাস্ত্রীয় প্রথা স্মরণ করিয়া কখন রিক্তহস্তে আসিতেন না, ফলমূলাদি কিছু আনয়নপূর্ব্বক ঠাকুরের সম্মুখে রক্ষা করিতেন এবং অনুগত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। ঠাকুর রহস্য করিয়া তাঁহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "কেশব তুমি এত লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ কর, আমাকে কিছু বল।" শ্রীযুত কেশব তাহাতে বিনীতভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচিতে বসিব! আপনি বলুন, আমি শুনি। আপনার মুখের দুই চারিটী কথা লোককে বলিবামাত্র তাহারা মুগ্ধ হয়!'

ঠাকুরের কেশবকে—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ এবং ভাগবত, ভক্ত, ভগবান্, তিনে এক, একে তিন—বুঝান।

ঠাকুর একদিন কেশবকে দক্ষিণেশ্বরে বুঝাইয়াছিলেন যে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয় এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সর্ব্বদা অভেদ ভাবে অবস্থিত। শ্রীযুত কেশব ঠাকুরের ঐ কথা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে বলেন যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির সম্বন্ধের ন্যায় ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ রূপ তিন পদার্থ অভিন্ন বা নিত্যযুক্ত—ভাগবত ভক্ত, ভগবান্, তিনে এক, একে তিন। কেশব তাঁহার ঐ কথা বুঝিয়া উহাও অঙ্গীকার করিয়া লইলেন। অতঃপর

ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, গুরু, কৃষ্ণ, ও বৈষ্ণব তিনে এক, একে তিন— তোমাকে এখন একথা বুঝাইয়া দিতেছি।' কেশব তাহাতে কি চিন্তা করিয়া বলিতে পারি না, বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, 'মহাশয়, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিক এখন আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, অতএব বর্ত্তমান প্রসঙ্গ এখন আর উত্থাপনে প্রয়োজন নাই।' ঠাকুরও তাহাতে বলিলেন, "বেশ, বেশ এখন ঐ পর্য্যন্তই থাক্।" ঐরূপে পাশ্চাত্যভাবভাবিত শ্রীযুত কেশবের মন ঠাকুরের দিব্য সঙ্গলাভে জীবনে বিশেষালোক উপলব্ধি করিয়াছিল এবং বৈদিক ধর্ম্মের সার রহস্য দিন দিন বুঝিতে পারিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে তাঁহার ধর্ম্মমত দিন দিন পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ঐকথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

আঘাত না পাইলে মানবমন সংসার হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরকে নিজ সর্ব্বস্ব বলিয়া ধারণে সমর্থ হয় না। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার প্রায় তিন বৎসর পরে শ্রীযুত কেশব কুচবিহার প্রদেশের রাজার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া ঐরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐবিবাহ লইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বিশেষান্দোলন উপস্থিত হইয়া উহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং শ্রীযুত কেশবের বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়া সাধারণ সমাজ নাম দিয়া অন্য এক নূতন সমাজের সৃষ্টি করিয়া বসে। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া সামাজিক সামান্য বিষয় লইয়া উভয় পক্ষীয়গণের ঐরূপ বিরোধ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধীয় ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বরেচ্ছাধীন ব্যাপার। উহাদিগকে কঠিন নিয়মে নিবদ্ধ করা চলে না; কেশব কেন ঐরূপ করিতে গিয়াছিল! কুচবিহার-বিবাহের কথা তুলিয়া ঠাকুরের নিকটে যদি কেহ শ্রীযুত কেশবের নিন্দাবাদ করিত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে উত্তরে বলিতেন, কেশব উহাতে নিন্দনীয় এমন কি করিয়াছে? কেশব সংসারী, নিজ পুত্রকন্যাগণের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহা করিবে না? সংসারী

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ কুচবিহার বিবাহ। ঐ কালে আঘাত পাইয়া কেশবের আধ্যাত্মিক গভীরতা লাভ। ঐবিবাহ সম্বন্ধে ঠাকুরের মত।

ব্যক্তি ধর্ম্মপথে থাকিয়া ঐরূপ করিলে নিন্দার কথা কি আছে? কেশব উহাতে ধর্ম্মহানিকর কিছুই করে নাই, পরন্তু পিতার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে। ঠাকুর ঐরূপে সংসারধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিয়া কেশবকৃত ঐ ঘটনা নির্দ্দোষ বলিয়া সর্ব্বদা প্রতিপন্ন করিতেন। সে যাহা হউক, কুচবিহার-বিবাহ-রূপ ঘটনায় বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শ্রীযুত কেশব যে আপনাতে আপনি ডুবিয়া দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের ভাব কেশব সম্পূর্ণরূপে ধরিতে পারেন নাই। ঠাকুরের সম্বন্ধে কেশবের দুই প্রকার আচরণ।

পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাকে দেখিবার বহু অবসর পাইয়াও কিন্তু তাঁহাকে সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। কারণ দেখা যায়, একপক্ষে তিনি ঠাকুরকে জীবন্ত ধর্ম্মমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন—নিজ বাটীতে লইয়া যাইয়া তিনি যেখানে শয়ন, ভোজন, উপবেশন ও সমাজের কল্যাণ চিন্তা করিতেন সেই সকল স্থান ঠাকুরকে স্বয়ং দেখাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে বলিয়াছিলেন, যাহাতে ঐ সকল স্থানের কোথাও অবস্থান করিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরকে ভুলিয়া সংসারচিন্তা না করে—আবার যেখানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে লইয়া যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন। * দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক 'জয় বিধানের জয়' বলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আমাদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে।

নববিধান ও ঠাকুরের মত।

সেইরূপ অন্যপক্ষে আবার দেখা গিয়াছে, তিনি ঠাকুরের 'সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য যত মত, তত পথ'-রূপ বাক্য সম্যক্ লইতে না পারিয়া, নিজ বুদ্ধির সহায়ে সকল ধর্ম্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসারভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক 'নববিধান' আখ্যা দিয়া এক নূতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে

* শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আমরা এই ঘটনা শুনিয়াছি।

হৃদয়ঙ্গম হয়, শ্রীযুত কেশব ঠাকুরের সর্ব্বধর্ম্মমত-সম্বন্ধীয় চরম মীমাংসাটীকে ঐরূপ আংশিক ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্যবিদ্যা ও সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়া ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যা ও সামাজিক রীতি নীতি প্রভৃতির যখন আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে বসিল, তখন ভারতের প্রত্যেক মনীষী ব্যক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রভৃতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশব প্রভৃতি মনীষিগণ বঙ্গদেশে যেমন ঐ চেষ্টায় জীবনপাত করিয়াছেন, ভারতের অন্যত্রও সেইরূপ অনেক মহাত্মার ঐরূপ করিবার কথা শ্রুতিগোচর হয়। কিন্তু ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের কেহই ঐবিষয়ের সম্পূর্ণ সমাধান করিয়া যাইতে পারেন নাই। ঠাকুর নিজ জীবনে ভারতের ধর্ম্মমতসমূহের সাধনা যথাযথ সম্পন্ন করিয়া এবং উহাদিগের প্রত্যেকে সাফল্য লাভ করিয়া বুঝাইলেন যে, ভারতের ধর্ম্ম ভারতের অবনতির কারণ নহে; উহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। দেখাইলেন যে, ঐ ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের সমাজ, রীতি, নীতি, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয় দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীনকালে ভারতকে গৌরব-সম্পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এখনও ঐধর্ম্মের সেই জীবন্ত শক্তি রহিয়াছে এবং উহাকে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিয়া আমরা সকল বিষয়ে সচেষ্ট হইলে, তবেই সকল বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে পারিব, নতুবা নহে। ঐ ধর্ম্ম যে মানবকে কতদূর উদার করিতে পারে, তাহা ঠাকুর নিজ জীবনাদর্শে দেখাইয়া যাইলেন এবং পরে পাশ্চাত্যভাবভাবিত নিজ শিষ্যবর্গের বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর ঐ উদার ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক তাহাদিগকে সংসারের সকল কার্য্য কি ভাবে ধর্ম্মের সহায়করূপে সম্পন্ন করিতে হয় তৎশিক্ষা প্রদান করিয়া ভারতের পূর্ব্বোক্ত জাতীয় সমস্যার এক অপূর্ব্ব সমাধান করিয়া যাইলেন। সর্ব্ব ধর্ম্মমতের সাধনে সাফল্য লাভ করিয়া ঠাকুর যেমন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বিরোধ তিরোহিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন—ভারতীয় সকল

ভারতের জাতীয় সমস্যার ঠাকুরই সমাধান করিয়াছেন।

ধর্ম্মমতের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তেমনি আবার তিনি ভারতের ধর্ম্মবিরোধ নাশপূর্ব্বক কোন্ বিষয়াবলম্বনে আমাদিগের জাতিত্ব সর্ব্বকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে, তদ্বিষয়েরও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

কেশবের দেহত্যাগে ঠাকুরের আচরণ।

সে যাহা হউক, শ্রীযুত কেশবের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা যে কি অদ্ভুত ছিল, তাহা আমরা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কেশবের শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরের আচরণে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি তিন দিন শয্যা ত্যাগ করিতে পারি নাই; মনে হইয়াছিল, যেন আমার একটা অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে!"

ঠাকুরের সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন।

কেশবের সহিত প্রথম পরিচয়ের পরে ঠাকুরের জীবনের অন্য একটী ঘটনার এখানে উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। ঠাকুরের ঐ সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বজনমোহকর নগর-সঙ্কীর্ত্তন দেখিতে বাসনা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বা তখন তাঁহাকে নিম্নলিখিত ভাবে ঐ বিষয় দেখাইয়া পূর্ণমনোরথ করিয়াছিলেন—নিজ গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, পঞ্চবটীর দিক হইতে ঐ অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণেশ্বর-উদ্যানের প্রধান ফটকের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং বৃক্ষান্তরালে লীন হইয়া যাইতেছে; দেখিলেন, নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া ঐ জনতরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন করিতেছেন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলে তাঁহার প্রেমে ভাবতন্ময় হইয়া কেহ বা অবশ ভাবে এবং কেহ বা উদ্দাম তাণ্ডবে আপনাপন অন্তরের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে! এত জনতা হইয়াছে যে, মনে হইতেছে, লোকের যেন আর অন্ত নাই। ঐ অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তনদলের ভিতর কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল এবং ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে তাহাদিগকে নিজ ভক্তরূপে আগমন করিতে দেখিয়া,

ঠাকুর তাহাদিগের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পূর্ব্বজীবনে তাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল!

সে যাহা হউক, ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে ঠাকুর কামারপুকুরে এবং হৃদয়ের বাটী সিহড়গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থানের কয়েক ক্রোশ দূরে ফুলুই শ্যামবাজার নামক স্থান। সেখানে অনেক বৈষ্ণবের বসতি আছে এবং তাহারা নিত্য কীর্ত্তনাদি করিয়া ঐস্থানকে আনন্দপূর্ণ করে শুনিয়া, ঠাকুরের ঐস্থানে যাইয়া কীর্ত্তন শুনিতে অভিলাষ হয়। শ্যামবাজার গ্রামের পার্শ্বেই বেলটে নামক গ্রাম। ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত নটবর গোস্বামী ঠাকুরকে ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাটীতে পদধূলি দিবার জন্য নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন। ঠাকুর এখন হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে যাইয়া সাত দিন অবস্থানপূর্ব্বক শ্যামবাজারের বৈষ্ণব সকলের কীর্ত্তনানন্দ দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানের শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র মল্লিক তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকে নিজ বাটীতে কীর্ত্তনানন্দে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন! কীর্ত্তনকালে তাঁহার অপূর্ব্বভাব দেখিয়া বৈষ্ণবেরা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে এবং ক্রমে সর্ব্বত্র ঐকথা প্রচার হইয়া পড়ে। শুধু শ্যামবাজার গ্রামেই যে ঐ কথা প্রচার হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু রামজীবনপুর, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ দূর দূরান্তর গ্রাম সকলেও ঐকথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ক্রমে ঐ সকল গ্রাম হইতে দলে দলে সঙ্কীর্ত্তনদলসমূহ তাঁহার সহিত আনন্দ করিতে আগমনপূর্ব্বক শ্যামবাজারকে বিষম জনতাপূর্ণ করে এবং দিবারাত্র কীর্ত্তন চলিতে থাকে। ক্রমে রব উঠিয়া যায় যে একজন ভগবদ্ভক্ত একক্ষণে মৃত এবং পরক্ষণেই জীবিত হইয়া উঠিতেছে। তখন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য লোকে গাছে চড়িয়া, ঘরের চালে উঠিয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া উদ্গ্রীব হইয়া থাকে। ঐরূপে তিন দিবারাত্র তথায় আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইয়া লোকে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাঁহার পদস্পর্শ করিবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঠাকুর স্নানাহারের অবকাশ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই! পরে হৃদয় তাঁহাকে লইয়া লুকাইয়া

ঠাকুরের ফুলুইশ্যামবাজারে গমন ও অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দ। ঐ ঘটনার সময় নিরূপণ।

সিহড়ে পলাইয়া আসিলে, ঐ আনন্দমেলার অবসান হয়। শ্যামবাজার গ্রামের ঈশান চৌধুরী, নটবর গোস্বামী, ঈশান মল্লিক, শ্রীনাথ মল্লিক প্রভৃতি ব্যক্তি সকল ও তাঁহাদের বংশধরগণ ঐ ঘটনার কথা এখনও উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণগঞ্জের প্রসিদ্ধ খোলবাদক শ্রীযুত রাইচরণ দাসের সহিতও ঠাকুরের পরিচয় হইয়াছিল। ইঁহার খোলবাদন শুনিলেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হইত। ঘটনাটীর পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আমরা কিয়দংশ ঠাকুরের নিকটে এবং কিয়দংশ হৃদয়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং উহার সময় নিরূপণ করিতে নিম্নলিখিত ভাবে সক্ষম হইয়াছি—

বরানগর আলমবাজার নিবাসী ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ পাল কবিরাজ মহাশয়, কেশব বাবুর পরে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরকে যখন তিনি প্রথমবার দর্শন করিতে গমন করেন, তখন ঠাকুর ঐ ঘটনার পরে সিহড় হইতে অল্পদিন মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ দিন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবুর নিকট ফুলুই শ্যামবাজারের ঘটনার কথা গল্প করিয়াছিলেন।

৺যোগানন্দ স্বামিজীর বাটী দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের অনতিদূরে ছিল। সেজন্য তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলে, ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণ সন ১২৮৫ সাল, ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার নিকটে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সন ১২৮৭ সালে, ইংরাজী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। উহার অনতিকালপরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের প্রথম তারিখে শ্রীমতী জগদম্বা দাসী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ ঘটনার ছয় মাস আন্দাজ পরে হৃদয় বুদ্ধি-হীনতা-বশতঃ মথুর বাবুর স্বল্পবয়স্কা পৌত্রীর চরণ পূজা করে। কন্যার পিতা উহাতে তাহার অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া বিশেষ রুষ্ট হয়েন এবং হৃদয়কে কালীবাটীর কর্ম্ম হইতে চিরকালের জন্য অবসর প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে সাধকভাবপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

সন ১২৫৯ সাল হইতে ১২৮৭ সাল পর্য্যন্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর সময় নিরূপণ।

ঠাকুরের জন্ম, সন ১২৪২ সাল, ৬ই ফাল্গুন, শুক্লপক্ষ, দ্বিতীয়ায়, ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ, ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রি ৪টার সময় হইয়াছিল।

সন	খৃষ্টাব্দ	ঘটনা
১২৫৯	১৮৫২—১৮৫৩	কলিকাতারচতুষ্পাঠীতে আগমন। (ঠাকুরের বয়স ১৬ পূর্ণ হইয়া কয়েক মাস।)
১২৬০	১৮৫৩ – ১৮৫৪	চতুষ্পাঠীতে বাস, পাঠ ও পূজাদি।
১২৬১	১৮৫৪—১৮৫৫	ঐ ঐ
১২৬২	১৮৫৫—১৮৫৬	১৮ই জ্যৈষ্ঠ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা; বিষ্ণু-বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া; ঠাকুরের বিষ্ণুঘরের পূজ-কের পদগ্রহণ; ১৪ই ভাদ্র, ইং ২৯শে আগষ্ট রাণীর দেবসেবার জন্য জমীদারী কেনা; কেনারাম ভট্টের" নিকট ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণ; রাম কুমারের মৃত্যু।
১২৬৩	১৮৫৬—১৮৫৭	ঠাকুরের ৺কালীর পূজকের পদ ও হৃদয়ের বিষ্ণুপূজকের পদ গ্রহণ; ঠাকুরের পাপপুরুষ দগ্ধ হওয়া ও গাত্রদাহ; ঠাকুরের প্রথম বার দেবোন্মত্তভাব ও দর্শন; ভূকৈলাসের বৈদ্যের ঔষধ সেবন।
১২৬৪	১৮৫৭—১৮৫৮	ঠাকুরের রাগানুগা পূজা দেখিয়া মথুরের আশ্চর্য্য হওয়া; ঠাকুরের রাণী রাসমণিকে দণ্ড দান; হলধারীর পূজকরূপে নিযুক্ত হওয়া ও ঠাকুরকে অভিশাপ; কবিরাজ গঙ্গা প্রসাদের চিকিৎসা।
১২৬৫	১৮৫৮—১৮৫৯	আশ্বিন বা কার্ত্তিকে ঠাকুরের কামারপুকুর গমন; চণ্ড নামান।

১২৬৬	১৮৫৯—১৮৬০	বৈশাখ মাসে ঠাকুরের বিবাহ।
১২৬৭	১৮৬০—১৮৬১	ঠাকুরের দ্বিতীয় বার জয়রামবাটী গমন, পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন, মথুরের শিব ও কালীরূপে ঠাকুরকে দর্শন।
১২৬৮	১৮৬১—১৮৬২	১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাণী রাসমণির দেবোত্তর দলিলে সহি করা ও পরদিন মৃত্যু; ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোন্মত্ততা। ঠাকুরের জননীর বুড়ো শিবের নিকটে হত্যা দেওয়া। ব্রাহ্মণীর আগমন ও ঠাকুরের তন্ত্র সাধন আরম্ভ।
১২৬৯	১৮৬২—১৮৬৩	ঠাকুরের তন্ত্রসাধন।
১২৭০	১৮৬৩—১৮৬৪	ঠাকুরের তন্ত্রসাধন সম্পূর্ণ হওয়া; পদ্মলোচন পণ্ডিতের সহিত দেখা; মথুরের অন্নমেরু অনুষ্ঠান; ঠাকুরের জননীর গঙ্গাবাস করিতে আগমন।
১২৭১	১৮৬৪—১৮৬৫	জটাধারীর আগমন, ঠাকুরের বাৎসল্য ও মধুর ভাব সাধন; তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ।
১২৭২	১৮৬৫—১৮৬৬	হলধারীর কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ ও অক্ষয়ের পূজকের পদ গ্রহণ; শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাওয়া।
১২৭৩	১৮৬৬—১৮৬৭	ঠাকুরের ছয়মাস কাল অদ্বৈত ভূমিতে অবস্থান সম্পূর্ণ হওয়া; শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা; পরে ঠাকুরের শারীরিক পীড়া ও মুসলমান ধর্ম্মসাধন।
১২৭৪	১৮৬৭—১৮৬৮	ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন; শ্রীশ্রীমার কামারপুকুরে আগমন; কার্ত্তিকমাসে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও মাঘমাসে তীর্থযাত্রা।

১২৭৫	১৮৬৮—১৮৬৯	জ্যৈষ্ঠ মাসে তীর্থ হইতে ফিরা; হৃদয়ের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু, দুর্গোৎসব ও দ্বিতীয় বার বিবাহ।
১২৭৬	১৮৬৯—১৮৭০	অক্ষয়ের বিবাহ ও মৃত্যু।
১২৭৭	১৮৭০—১৮৭১	ঠাকুরের মথুরের বাটীতে ও গুরুগৃহে গমন, কলুটোলায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আসন গ্রহণ, পরে কাল্‌না নবদ্বীপ ও ভগবান দাস বাবাজীকে দর্শন।
১২৭৮	১৮৭১—১৮৭২	জুলাই মাসের ১৬ই তারিখে (১লা শ্রাবণ) মথুরের মৃত্যু। ফাল্গুন মাসে রাত্রি ৯টার সময় শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন।
১২৭৯	১৮৭২—১৮৭৩	শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে বাস।
১২৮০	১৮৭৩—১৮৭৪	জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের ৺ষোড়শী-পূজা, শ্রীশ্রীমার গৌরী পণ্ডিতকে দর্শন ও আন্দাজ আশ্বিনে কামারপুকুরে প্রত্যাগমন; অগ্রহায়ণে রামেশ্বরের মৃত্যু।
১২৮১	১৮৭৪—১৮৭৫	শ্রীশ্রীমার দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসা; শম্ভু মল্লিকের ঘর করিয়া দেওয়া, চানকে ৺অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা। ঠাকুরের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে প্রথমবার দেখা।
১২৮২	১৮৭৫—১৮৭৬	পীড়িতা হইয়া শ্রীশ্রীমার পিত্রালয়ে গমন; ঠাকুরের জননীর মৃত্যু।
১২৮৩	১৮৭৬—১৮৭৭	কেশবের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।
১২৮৪	১৮৭৭—১৮৭৮	ঐ ঐ
১২৮৫	১৮৭৮—১৮৭৯	ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণের আগমন আরম্ভ।
১২৮৬	১৮৭৯—১৮৮০	শ্রীবিবেকানন্দস্বামীর ঠাকুরের নিকট আগমন।
১২৮৭	১৮৮০—১৮৮১	শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর মৃত্যু; হৃদয়ের পদচ্যুতি ও দক্ষিণেশ্বর হইতে অন্যত্র গমন।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০	৫	বর্ত্তমান	বর্ত্তমান থাকা
৫১—৫৫	অধ্যায়নামে	সাধক ও সাধনা	অবতারজীবনে সাধকভাব
৭২	২	রূপ ও	রূপ
৮৩	১৯	ভাবিয়াছিল	ভাবিয়াছিলেন
৮৮	১২	পার	পারা
১১৫	৯	নিত্যরাম প্রসাদ	নিত্য রামপ্রসাদ
১২১	৭	গমন	গমন করিব
১৪১	২	১৮৯৫	১৮৫৫
ঐ	১৬	ব্রাহ্মণীর নির্দ্দেশে গোকল	গোকল
১৫৫	২	কাকতালীয়ের ন্যায়ে	কাকতালীয়ন্যায়ের মত নিজ
১৮৬	১৬	সাত মাস	এক বৎসর সাত মাস
২১৬	১৮	ক্রন্দন করিতে	ক্রন্দন করিতে করিতে
২২৪	১৮	অন্তরের	অন্তরে
২৩৪	শেষ পংক্তি	২৬২	১২৬২
২৭৫	১৩	লক্ষ্যে	এক লক্ষ্যে
২৭৮	পাদটীকা	ধারণা করিয়া	ধারণ না করিয়া
২৮৪	১১	সচ্চিদানঘন	সচ্চিদানন্দঘন
২৯২	৬	বৎসরকাল	নয় বৎসরকাল
২৯৮	১৮	শুনিয়াছি	শুনিয়াছি।
৩৩০	৫	আকর্ষণে	আকর্ষণে প্রাণ
ঐ	২১	পাদপদ্ম	তাঁহার পাদপদ্ম
৩৩৫	১৬	সকল	সকল বিষয়ে
৩৩৯	৩	ঐ কার্য্য হইতে	ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে
৩৪০	অধ্যায়নামে	হৃদয়মোহনের	হৃদয়রামের
৩৪৪	৪	ব্যবহারানুসারে	ব্যবস্থানুসারে
৩৪৯	১৭	উঠিতেছে	উঠিয়াছে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক চরিত্র ও জীবনী সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া উদ্বোধন পত্রে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে, তাহাই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড (গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ) মূল্য ১।৹ আনা; উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে—১৲ টাকা। ২য় খণ্ড (গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ)— ১৷৹ আনা; উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে—১৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সার্ব্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগদ্গুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটী বর্ত্তমান পুস্তক ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব; কারণ, ইহা তাঁহাদেরই অন্যতমের দ্বারা লিখিত। মার্জ্জিন্যাল নোট, বিস্তারিত সূচীপত্র ও বহু চিত্রসম্বলিত।

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন-কার্য্যালয়,
১২, ১৩নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীরামানুজ-চরিত

শ্রীসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্য রামানুজের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার এমন তদ্ভাবভাবিত ও রসগ্রাহী হইয়া তুলিকা ধরিয়াছেন যে বঙ্গসাহিত্যে আচার্য্যের যোগ্য পরিচয় দিবার জন্য যে আমরা যোগ্য লেখক পাইয়াছিলাম, তাহা পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

গ্রন্থের মলাট সুন্দর কাপড়ে বাঁধান এবং প্রাচীন দ্রাবিড়ী পুঁথির পাটার মত নানা বর্ণে চিত্রিত। আচার্য্য রামানুজের জীবদ্দশায় খোদিত প্রতিমূর্ত্তি ও গ্রন্থকারের প্রতিমূর্ত্তি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ডিমাই আকারের প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা।

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

নিবেদিতা।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত।

উদ্বোধনে প্রকাশিত "নিবেদিতা" নামক প্রবন্ধটি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকাসহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। বঙ্গসাহিত্যে নিবেদিতা-সম্বন্ধীয় তথ্যপূর্ণ এমন পুস্তক আর নাই। এই পুস্তকের সমস্ত লাভ সিষ্টার নিবেদিতা-প্রবর্ত্তিত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ প্রদত্ত। বিদ্যালয়ে নিবেদিতা কি ভাবে শিখিতেন ও কাজ করিতেন তাহার একটী মনোজ্ঞ ও বিশদ চিত্র এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। সিষ্টারের একখানি সুন্দর হাফটোন ছবি সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা প্রভৃতি সুন্দর। মূল্য ৷৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়।

বাগবাজার, কলিকাতা।

উদ্বোধন।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মঠ' পরিচালিত মাসিক পত্র। স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি লেখক। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২ টাকা। মাঘ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। উদ্বোধন কার্য্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল গ্রন্থই পাওয়া যায়। উদ্বোধন গ্রাহকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। নিম্নে দ্রষ্টব্য :—

উদ্বোধন গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত।

পুস্তক	সাধারণের পক্ষে। Rs. As.	উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে। Rs. As.
Raja-Yoga (2nd Edition)	1—	12
Jnana-Yoga "	1—8	1—3
Karma-Yoga "	12	8
Bhakti-Yoga "	10	6
Chicago Address (4th Edi.)	6	5
The Science and Philosophy of Religion	1—	12
A Study of Religion	1—	12
Religion of Love	10	8
My Master (2d edition)	8	6
Pavhari Baba	3	2
Thoughts on Vedanta	10	8
Realisation and its Methods	12	10
Christ the Messenger	3	2
Paramahansa Ramakrishna By P. C. Majumdar	2	1

"My Master" পুস্তকখানি ॥০ আনায় লইলে "Paramahansa Ramakrishna" বিনামূল্যে ১খানি পাইবেন। সকলের ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তক	সাধারণের পক্ষে	উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে
রাজযোগ (৩য় সংস্করণ)	১৲	৸০
জ্ঞানযোগ (৪র্থ সং)	১৲	৸০
সন্ন্যাসীর গীতি (৩য় সং)	৴০	৴০
ভক্তিযোগ (৫ম সং)	॥৵০	॥০
কর্ম্মযোগ (৪র্থ সংস্করণ)	৸০	॥০
চিকাগো বক্তৃতা (৩য় সং)	৷৴০	৷০
ভাব্‌বার কথা (৩য় সং)	৷৵০	৷০
পত্রাবলী ১ম ভাগ (৩য় সংস্করণ)	॥০	৷৵০
ঐ ২য় ভাগ	॥৵০	॥০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (৪র্থ সং)	॥০	৷৵০
বীরবাণী (৪র্থ সং)	৷০	৷০
মদীয় আচার্য্যদেব (২য় সং)	৷৵০	৷৴০
পওহারী বাবা (২য় সং)	৶০	৵০
ধর্ম্মবিজ্ঞান	১৲	৸০
বর্ত্তমান ভারত (৩য় সং)	৷০	৷০
ভক্তিরহস্য	॥৵০	॥০
ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সং)	২৲	১৸০
ঐ সুলভ সংস্করণ	১৷০	১৷০
পরিব্রাজক (২য় সং)	৸০	॥০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

গুরুভাব—পূর্বার্ধ

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে গুরুভাব প্রকাশিত হইল। ঠাকুরের সাধনকালের সময় হইতে বিশেষ প্রকটভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবনের ঘটনাবলীই ইহাতে প্রধানতঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবে কেবলমাত্র ঐ সকল ঘটনা বা ঠাকুরের ঐ সময়ের কার্য্যকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই নাই। যে মনের ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, যে উদ্দেশ্যে, তিনি ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহারও যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। কারণ শরীর ও মনের সমষ্টিভূত মানবের জীবনেতিহাস কেবলমাত্র তাহার জড় দেহ ও তৎকৃত কার্য্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনে পাওয়া যায় না। জড়বাদী পাশ্চাত্য জীবনী ও ইতিহাস লিখিতে যাইয়া প্রধানতঃ ঘটনাবলীর সংগ্রহেই দক্ষতার পরিচয় দেয় এবং আত্মবাদী হিন্দু মনোভাবের সুনিপুণ সংস্থানেই মনোনিবেশ করে। আমাদের ধারণা, ঐ উভয় ভাবের সম্মিলনেই যথার্থ জীবনী বা ইতিহাস সম্ভবে এবং মনের ইতিহাসকে পুরোবর্ত্তী রাখিয়াই সর্ব্বত্র জড়ের কার্য্যকলাপ লিপিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

আর এক কথা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবন আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থে শাস্ত্রসহায়েও অনেকস্থলে অনুশীলন করিয়াছি; তাঁহার অসাধারণ মনোভাব, অনুভব ও কার্য্যকলাপের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি ভারতের এবং ঈশাদি ভারতেতর দেশের মহাপুরুষগণের অনুভব ও কার্য্যকলাপের তুলনায় আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কারণ ঠাকুর আমাদিগের

নিকট স্পষ্টাক্ষরে বারম্বার নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে "যে রাম, যে কৃষ্ণ (ইত্যাদি হইয়াছিল) সে-ই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতর রহিয়াছে !"—এবং "এখানকার (আমার) অনুভবসকল বেদ-বেদান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে !" বাস্তবিক 'ভাবমুখে' অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ঈদৃশ অলৌকিক জীবন আধ্যাত্মিক জগতে আর ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই।

আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারসকলের মতানুগ হইয়া সকল প্রকার সাধনমার্গে স্বল্পকালেই সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি 'যত মত তত পথ'-রূপ যে নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার ও লোকহিতার্থ ঘোষণা করিয়াছেন, তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা তাঁহাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগাবির্ভূত সকল অবতার-পুরুষগণের ঘনীভূত সমষ্টি ও নবাভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিতেই বাধ্য হইয়াছি। বাস্তবিক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদৃষ্টপূর্ব্ব পবিত্র জীবনের আমরা যতই অনুশীলন করিয়াছি, ততই উহাকে বৈদিক সার্ব্বজনীন ও সনাতন অধ্যাত্ম-ভাববৃক্ষের সারসমষ্টি-সমুদ্ভূত প্রথমোৎপন্ন ফলস্বরূপেই নির্দ্ধারিত করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীরামকৃষ্ণপদাশ্রিত পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্মপ্রচারের পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকথা জানিবার জন্য সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া বর্ত্তমান কালে অনেকে অনেক কথা তৎসম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিলেও ঐ অলোকসামান্য জীবনের সহিত সনাতন হিন্দু বা বৈদিক ধর্ম্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া কেহই এ পর্য্যন্ত উহার অনুশীলন করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন সনাতন

হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথক্ এক ব্যক্তি এবং সাম্প্রদায়িক মতবিশেষেরই সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—এইরূপ বিপরীত ধারণাই ঐ সকল পুস্তকপাঠে মনে উদিত হইয়া থাকে। আবার ঐ সকল গ্রন্থের অনেকগুলি ঠাকুরের জীবনাখ্যায়িকা সম্বন্ধে নানা ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ এবং অপরগুলিতে ঐ সকল জীবনঘটনার প্রকৃত অর্থ এবং পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ ও পারম্পর্য্য লক্ষিত হয় না। সাধারণের তদভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য ঐ মহদুদার জীবন আমাদের নিকটে যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে এবং যে ভাবোপলব্ধি করিয়া শ্রীবিবেকানন্দ প্রমুখ আমরা ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে জীবনোৎসর্গ করিয়াছি, তাহারই কিছু স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের পদানুগ হইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থে পাঠককে বলিবার প্রযত্ন করিয়াছি। ঠাকুরের অলৌকিক জীবনাদর্শ যদি উহাতে কথঞ্চিৎ যথার্থ ভাবেও অঙ্কিত হইয়া থাকে, তবে উহা তাঁহারই গুণে হইয়াছে; এবং যাহা কিছু অসম্পূর্ণতা ও অঙ্গহানিত্ব রহিয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের বুঝিবার ও বলিবার দোষেই হইয়াছে, পাঠক এ কথা বুঝিয়া লইবেন। ভবিষ্যতে ঠাকুরের অমূল্য জীবনের পূর্ব্ব ও শেষভাগের পরিচয়ও এইভাবে পাঠককে উপহার দিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে 'ভাবমুখে' অবস্থিত দুরবগাহী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধালোচনা করিয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ যে সূত্রগুলি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখানে পাঠকের নয়নগোচর করিয়া আমরা গ্রন্থারম্ভে প্রবৃত্ত হই। অলমিতি—

বিনীত

গ্রন্থকার

হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ॥
স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তম্
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥[১]

শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়। ধর্ম্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য, যে পর্য্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্য্যন্ত।

১ প্রেমের প্রবাহ যাঁর আচণ্ডালে অবারিত।
লোকহিতে রত সদা হয়ে যিনি লোকাতীত॥
জানকীর প্রাণবন্ধ উপমা নাহিক যাঁর।
ভক্ত্যাবৃত জ্ঞানবপু যিনি রাম অবতার॥
স্তব্ধ করি কুরুক্ষেত্রে প্রলয়ের হুহুঙ্কার।
দূর করি সহজাত মহামোহ-অন্ধকার॥
উঠেছিল সুগম্ভীর গীতাসিংহনাদ যাঁর।
সেই এবে রামকৃষ্ণ খ্যাতনামা ত্রিসংসার॥

'সত্য' দুই প্রকার :—(১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত।

(২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়।

'বেদ' নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান; সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন।

ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম 'বেদ'।

এই ঋষিত্ব ও বেদদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্ম্মানুভূতি। সাধকের জীবনে যতদিন উহার উন্মেষ না হয়, ততদিন 'ধর্ম্ম' কেবল 'কথার কথা' ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রথম সোপানেও তাহার পদস্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে।

সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন, অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র 'বেদ'।

অলৌকিক জ্ঞানবেত্তৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদিদেশীয় ধর্ম্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্ত্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্ব্বপ্রথম, সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্য্য জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ 'বেদ' নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকের প্রমাণভূমি।

আর্য্য জাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদনামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে তাহাই 'বেদ'।

এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফলসমূহ মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে সর্ব্বকাল অবস্থিত বলিয়া দেশ, কাল, পাত্রাদি নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতিনীতিও এই কর্ম্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবে। লোকাচারসকলও সৎশাস্ত্র এবং সদাচারের অবিসম্বাদী হইয়াই কালে কালে গৃহীত হইয়াছে ও হইবে। সৎশাস্ত্রবিগর্হিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্ত্তী হওয়াই আর্য্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্তভাগই—নিষ্কামকর্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায়—মুক্তিপ্রদ এবং মায়াপারনেতৃত্ব-পদে সর্ব্বকাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এবং দেশ, কাল, পাত্রাদির দ্বারা সর্ব্বথা অপ্রতিহত থাকা বিধায় উহাই সার্ব্বলৌকিক, সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক ধর্ম্মের একমাত্র উপদেষ্টা।

মন্বাদি তন্ত্র কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশ-কাল-পাত্রভেদে সামাজিক কল্যাণকর কর্ম্মের শিক্ষাই প্রধানতঃ দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র বেদান্তনিহিত তত্ত্বসকল লইয়া অবতারাদির মহান্ চরিত-বর্ণনমুখে ঐ সকল তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যানই করিতেছেন; এবং অনন্ত-ভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকা-

চারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্য্যসন্তান—এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য আপাতপ্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত, ও অল্প-বুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী—পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্ম্মগ্রহে অসমর্থ, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্ম্মকে বহু খণ্ডে বিভক্ত এবং সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন, তখন আর্য্য জাতির প্রকৃত ধর্ম্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতদৃষ্টে বহুধা-বিভক্ত, সর্ব্বথা-বিপরীত-আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম্ম নামক যুগ-যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বলৌকিক ও সার্ব্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্ব্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনাদি বর্ত্তমান, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষিহৃদয়ে স্বতঃ আবির্ভূত হন তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার, পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্রচার হইবে এই জন্য বেদমূর্ত্তি ভগবান এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

বেদ—অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মের, এবং ব্রাহ্মণত্ব—অর্থাৎ ধর্ম্ম-

শিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান যে বারম্বার শরীরধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়, পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক পতনের পর আর্য্য-সমাজও যে শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্য্যবান হইতেছে, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর আমাদের পুনরুত্থিত সমাজ অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছে এবং সর্ব্ব-ভূতান্তর্য্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারম্বার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারম্বার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা, গতপ্রায়া, বর্ত্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা ইতিপূর্ব্বে এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

সেইজন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় আর্য্য-সমাজের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের বোধনসমূহ সূর্য্যালোকে তারকাবলীর ন্যায় মহিমাবিহীন হইবে এবং উহার এই পুনরুত্থানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।

সনাতন ধর্ম্মের সমগ্র-ভাবসমষ্টি বর্ত্তমান পতনাবস্থাকালে

অধিকারিহীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-আকারে কোথাও আংশিকভাবে পরিরক্ষিত এবং কোথাও বা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছিল।

এই নবোত্থানে নববলে বলীয়ান মানবসন্তান যে, সেই বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টিকৃত করিয়া নিজ জীবনে ধারণা ও অভ্যাস করিতে এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে, ইহারই নিদর্শনস্বরূপ পরম কারুণিক শ্রীভগবান বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্ব্বভাবসমন্বিত, সর্ব্ব-বিদ্যাসহায়, পূর্ব্বোক্ত যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্ব্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নব-যুগধর্ম্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এবং এই নব-যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পূর্ব্বগ শ্রীযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ!—হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর।

হে মানব, মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না—গতরাত্রি পুনর্ব্বার আসে না—বিগতোচ্ছ্বাস পূর্ব্বরূপ আর প্রদর্শন করে না—জীবও দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যেক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি—গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি—লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও!

যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগদিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র-পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর !

আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক—এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও !

বিবেকানন্দ

বিস্তারিত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥

—গীতা, ৭।১২,১৩

দ্বাদশবর্ষব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক তপস্যান্তে শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরকে বলেন—"ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্"; ঠাকুরও তাহাই করেন—একথা এখন অনেকেই জানিয়াছেন। কিন্তু ভাবমুখে থাকা যে কি ব্যাপার এবং উহার অর্থ যে কত গভীর তাহা বুঝা ও বুঝান বড় কঠিন।

ঠাকুরের কথার গভীর ভাব

আটাশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন জনৈক বন্ধুকে[১] বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন করিয়া ঝুড়ি-ঝুড়ি দর্শন-গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে।" বন্ধুটি তৎশ্রবণে অবাক হইয়া বলেন—"বটে? আমরা তো ঠাকুরের কথার অত গভীর ভাব বুঝতে পারি না। তাঁর কোন একটি কথা ঐ ভাবে আমাকে বুঝিয়ে বল্‌বে?"

১ শ্রীযুত হরমোহন মিত্র

স্বামীজি—বোঝ্‌বার মাথা থাক্‌লে তবে ত বুঝ্‌বি! আচ্ছা, ঠাকুরের যে-কোন-একটি কথা ধর, আমি বুঝুচ্চি।

বন্ধু—বেশ; সর্ব্বভূতে নারায়ণ দেখা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ঠাকুর 'হাতি-নারায়ণ ও মাহুত-নারায়ণে'র যে গল্পটি বলেন সেইটি বুঝিয়ে বল।

স্বামীজিও তৎক্ষণাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ পণ্ডিতদিগের ভিতরে আবহমানকাল ধরিয়া স্বাধীন-ইচ্ছা ও অদৃষ্টবাদ অথবা পুরুষকার ও ভগবদিচ্ছা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে অথচ কোন একটা স্থির মীমাংসা হইতেছে না, সেই সকল কথা উত্থাপন করেন এবং ঠাকুরের ঐ গল্পটি যে ঐ বিবাদের এক অপূর্ব্ব সমাধান, তাহা সরল ভাষায় তিন দিন ধরিয়া বন্ধুটিকে বুঝাইয়া বলেন।

তলাইয়া দেখিলে বাস্তবিকই ঠাকুরের অতি সামান্য-সামান্য দৈনিক ব্যবহার ও উপদেশের ভিতর ঐরূপ গভীর অর্থ দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। অবতারপুরুষদিগের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই কথাটি সত্য। তাঁহাদের জীবনালোচনায় ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল অবতার-পুরুষদিগের কথাই ঐরূপ

আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি যে দুই-এক জন মহাপুরুষকে বিপক্ষদলের কুতর্কজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে অপর সকল মহাপুরুষদিগের জীবনেই দেখা যায়, তাঁহারা সাদা কথায় মর্ম্মস্পর্শী ছোট-ছোট গল্প, উপমা বা রূপকের সহায়ে যাহা বলিবার বলিয়া ও বুঝাইয়া গিয়াছেন। লম্বা-চওড়া কথা, দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস

প্রভৃতির ধার দিয়াও যান নাই। কিন্তু সে সাদা কথায়, সে ছোট উপমার ভিতর এত ভাব ও মানবসাধারণকে উচ্চ আদর্শে পৌছাইয়া দিবার এত শক্তি রহিয়াছে যে, আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও তাহাদের ভাবের অন্ত বা শক্তির সীমা এখনও করিতে পারিলাম না। যতই দেখি ততই উচ্চ উচ্চতর ভাব দেখিতে পাই, যতই নাড়াচাড়া তোলাপাড়া করি ততই মন 'অনিত্য অশুভ' সংসারের রাজত্ব ছাড়িয়া উর্দ্ধে উর্দ্ধতর দেশে উঠিতে থাকে এবং 'পরমপদপ্রাপ্তি' 'ব্রাহ্মীস্থিতি' 'মোক্ষ' বা 'ভগবদ্দর্শনে'র দিকে—কারণ এক বস্তুকেই নানাভাবে দেখিয়া মহাপুরুষেরা ঐসকল নানা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যতই কেহ অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ঐসকল সাদা কথার গভীর ভাব প্রাণে প্রাণে বুঝিতে থাকে।

দৃষ্টান্ত—গিরিশকে বকল্‌মা দিতে বলা

ইহাই নিয়ম। ঠাকুরের কথা ও ব্যবহারের সম্বন্ধেও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখি না। তাঁহার যে কথাগুলি আগে যে ভাবে বুঝিতাম, এখন সেইগুলিরই আরও কতই না গভীর ভাব দেখিতে পাই! দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি কথা বলিলেই চলিবে। শ্রীযুত গিরিশ ঠাকুরের নিকট কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর এক দিন তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন—"এখন থেকে আমি কি করব ?"

ঠাকুর—"যা করচ তাই করে যাও। এখন এদিক (ভগবান) ওদিক (সংসার) দুদিক রেখে চল, তারপর যখন একদিক ভাঙ্গবে তখন যা হয় হবে। তবে সকালে-বিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা

রেখো।—এই বলিয়া গিরিশের দিকে চাহিলেন, যেন তাঁহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গিরিশের মনের অবস্থা

গিরিশ শুনিয়া বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার যে কাজ তাহাতে স্নান-আহার-নিদ্রা প্রভৃতি নিত্য-কর্ম্মেরই একটা নিয়মিত সময় রাখিতে পারি না। সকালে-বিকালে স্মরণ-মনন করিতে নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইব। তাহা হইলে ত মুশকিল—শ্রীগুরুর আজ্ঞালঙ্ঘনে মহা দোষ ও অনিষ্ট হইবে। অতএব এ কথা কি করিয়া স্বীকার করি? সংসারে অন্য কাহারও কাছে কথা দিয়াই সে কথা না রাখিতে পারিলে দোষ হয়, তা যাঁহাকে পরকালের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি তাঁহার কাছে—!' গিরিশ মনের কথাগুলি বলিতেও কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন, 'কিন্তু ঠাকুর আমাকে তো আর কোন একটা বিশেষ কঠিন কাজ করিতে বলেন নাই। অপরকে এ কথা বলিলে এখনি আনন্দের সহিত স্বীকার পাইত।' কিন্তু তিনি কি করিবেন, আপনার একান্ত বহির্ম্মুখ অবস্থা ঠিক ঠিক দেখিতে পাইয়াই বুঝিতেছিলেন যে, ধর্ম্মকর্ম্মের অতটুকুও প্রতিদিন করা যেন তাঁহার সামর্থ্যের অতীত! আবার নিজের স্বভাবের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন—'কোনরূপ ব্রত বা নিয়মে চিরকালের নিমিত্ত আবদ্ধ হইলাম'—এ কথা মনে করিতে গেলেও যেন হাঁপাইয়া উঠেন এবং যতক্ষণ না ঐ নিয়ম ভঙ্গ হয় ততক্ষণ যেন প্রাণে অশান্তি! আজীবন এইরূপে ঘটিয়া আসিয়াছে। নিজের ইচ্ছায় ভাল-মন্দ যাহা হয় করিতে কোন গোল নাই, কিন্তু যেমন

মনে হইল—বাধ্য হইয়া অমুক কাজটা আমাকে করিতে হইতেছে বা হইবে, অমনি মন বাঁকিয়া দাঁড়াইল! কাজেই আপনার নিতান্ত অপারক ও অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিতে করিতে কাতর হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন—'করিব' বা 'করিতে পারিব না' কোন কথাই বলিতে পারিলেন না! আর অত সোজা কাজটা করিতে পারিবেন না, একথা লজ্জার মাথা খাইয়া বলেনই বা কিরূপে—বলিলেও ঠাকুর ও উপস্থিত সকলে মনে করিবেনই বা কি? তাঁহার একান্ত অসহায় অবস্থার কথা হয়ত বুঝিতেই পারিবেন না, আর মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মনে নিশ্চয় করিবেন—তিনি একটা ঢঙ করিয়া কথাগুলি বলিতেছেন।

ঠাকুর গিরিশকে ঐরূপ নীরব দেখিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা যদি না পার ত খাবার শোবার আগে তাঁহার একবার স্মরণ করে' নিও।"

গিরিশ নীরব। ভাবিলেন উহাই কি করিতে পারিবেন! দেখিলেন—কোন দিন খান বেলা দশটায়, আর কোন দিন বৈকালে পাঁচটায়; রাত্রির খাওয়া সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। আবার মামলা-মোকদ্দমার ফ্যাসাদে পড়িয়া এমন দিন গিয়াছে যে, খাইতে বসিয়াছেন বলিয়াই হুঁশ নাই! কেবলই উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছেন—'ব্যারিষ্টারকে যে ফি পাঠাইয়াছি তাহা ঠিক সময়ে তাঁহার হাতে পৌঁছিল কিনা খবরটা পাইলাম না, মোকদ্দমার সময় যদি তিনি উপস্থিত না হন তাহা হইলেই তো বিপদ' ইত্যাদি। কার্য্যগতিকে ঐরূপ দিন যদি আবার আসে—আর আসাও কিছু অসম্ভব নয়—তাহা হইলে সেদিন ভগবানের স্মরণ-মনন করিতে

তো নিশ্চয় ভুলিবেন! হায় হায়, ঠাকুর এত সোজা কাজ করিতে বলিতেছেন, আর তিনি 'করিব' বলিতে পারিতেছেন না! গিরিশ বিষম ফাঁপরে পড়িয়া স্থির, নীরব রহিলেন, আর তাঁহার প্রাণের ভিতরে যেন একটা চিন্তা, ভয় ও নৈরাশ্যের ঝড় বহিতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশের দিকে আবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে এইবার বলিলেন—"তুই বলবি, 'তাও যদি না পারি'—আচ্ছা, তবে আমায় বকল্মা[১] দে।" ঠাকুরের তখন অর্দ্ধবাহ্যদশা।

বকল্মা দেওয়ার পর গিরিশের মনের অবস্থা

কথাটি মনের মত হইল। গিরিশের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। শুধু ঠাণ্ডা হইল না, ঠাকুরের অপার দয়ার কথা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভালবাসা ও বিশ্বাস একেবারে অনন্তধারে উছলিয়া উঠিল। গিরিশ ভাবিলেন, 'যাক্—নিয়মবন্ধনগুলিকে বাঘ মনে হয়, তাহার ভিতর আর পড়িতে হইল না। এখন যাহাই করি না কেন এইটি মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলেই হইল যে, ঠাকুর তাঁহার অসীম দিব্যশক্তিবলে কোন-না-কোন উপায়ে তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন।' শ্রীযুত গিরিশ তখন বকল্মা বা ঠাকুরের উপর সমস্ত ভার দেওয়ার এইটুকু অর্থই বুঝিলেন;—বুঝিলেন তাঁহাকে নিজে চেষ্টা বা সাধন-ভজন করিয়া কোন বিষয় ছাড়িতে হইবে না, ঠাকুরই তাঁহার মন হইতে সকল বিষয় নিজশক্তিবলে ছাড়াইয়া

---

১ অর্থাৎ ভার দাও। বিষয়কর্ম্মে একব্যক্তি তাহার হইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা বা অধিকার অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে সে ব্যক্তি তাহার হইয়া সমস্ত লেন্-দেন্ করে, রসিদ চিঠিপত্র লিখে এবং তাহার নামে ঐসকলে সহি করিয়া নিম্নে 'বঃ (অর্থাৎ বকলম)—অমুক' বলিয়া নিজের নাম লিখিয়া দেয়।

লইবেন। কিন্তু নিয়মের বন্ধন গলায় পরা অসহ্য বোধ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে যে তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ভালবাসার বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় তুলিয়া লইলেন তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না। ভাল মন্দ যে অবস্থায় পড়ুন না কেন, যশ অপযশ যাহাই আসুক না কেন, দুঃখ-কষ্ট যতই উপস্থিত হউক না কেন, নিঃশব্দে তাহা সহ্য করা ভিন্ন তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার যে আর বলিবার বা করিবার কিছুই রহিল না, সে কথা তখন আর তলাইয়া দেখিলেন না;—দেখিবার শক্তিও হইল না। অন্য সকল চিন্তা মন হইতে সরিয়া যাইয়া কেবল দেখিতে লাগিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা! আর বাড়িয়া উঠিল—শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া শতগুণে অহঙ্কার। মনে হইল—'সংসারে যে যা বলে বলুক, যতই ঘৃণা করুক, ইনি তো সকল সময়ে সকল অবস্থায় আমার—তবে আর কি? কাহাকে ডরাই?' ভক্তিশাস্ত্র[১] এ অহঙ্কারকে যে সাধনের মধ্যে গণ্য করেন এবং মানবের বহুভাগ্যে আসে বলেন—তাহাই বা তখন কেমন করিয়া জানিবেন? যাহাই হউক, শ্রীযুত গিরিশ এখন নিশ্চিন্ত এবং খাইতে-শুইতে-বসিতে ঐ এক চিন্তা—'শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন'—সর্ব্বদা মনে উদিত থাকিয়া তাঁহাকে যে ঠাকুরের ধ্যান করাইয়া লইতেছে এবং তাঁহার সকল কর্ম্ম ও মনোভাবের উপর একটা ছাপ দিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিতেছে তাহা বুঝিতে

বকল্মা ভালবাসার বন্ধন

---
১ নারদ-ভক্তিসূত্র

না পারিলেও সুখী—কারণ তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) যে তাঁহাকে ভালবাসেন এবং আপনার হইতেও আপনার!

ঠাকুর চিরকাল শিক্ষা দিয়াছেন, 'কখন কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই' এবং প্রত্যেক ভক্তের সহিত ঐরূপ ব্যবহারও নিত্য করিতেন। শ্রীযুত গিরিশকে পূর্ব্বোক্ত ভাব দিয়া ধরিয়া এখন হইতে ঐ ভাবের উপযোগী শিক্ষা-সকলও তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীযুত গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে কোন একটি সামান্য বিষয়ে 'আমি করিব' বলায় ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ও কি গো? অমন করে 'আমি কর্‌ব' বল কেন? যদি না করতে পার? বল্‌বে—ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তো করবো।" গিরিশও বুঝিলেন, 'ঠিক কথা; আমি যখন ভগবানের উপর সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার দিয়াছি এবং তিনিও সেই ভার লইয়াছেন, তখন তিনি যদি ঐ কার্য্য আমার পক্ষে করা উচিত বা মঙ্গলকর বলিয়া করিতে দেন তবেই তো করিতে পারিব; নতুবা উহা কেমন করিয়া আপনার সামর্থ্যে করিতে পারিব?'—বুঝিয়া তদবধি আমি করিব, যাইব, ইত্যাদি বলা ও ভাবগুলো ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

গিরিশের অতঃপর শিক্ষা

এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে ঠাকুরের অদর্শন হইল; স্ত্রী-পুত্রাদির বিয়োগরূপ নানা দুঃখ-কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল; তাঁহার মন কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি ব্যাপারে বলিয়া উঠিতে লাগিল—'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ঐরূপ হওয়া তোর পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়াই ঐ সকল হইতে দিয়াছেন।

গিরিশের বকল্‌মার গূঢ় অর্থবোধ

তুই তাঁহার উপর ভার দিয়াছিস্, তিনিও লইয়াছেন; কিন্তু কোন্ পথ দিয়া তিনি তোকে লইয়া যাইবেন, তাহা তো আর তোকে লেখাপড়া করিয়া বলেন নাই? তিনি এই পথই তোর পক্ষে সহজ বুঝিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে তোর 'না' বলিবার বা বিরক্ত হইবার তো কথা নাই। তবে কি তাঁহার উপর বকল্‌মা বা ভার দেওয়াটা একটা মুখের কথামাত্র বলিয়াছিলি?' ইত্যাদি। এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল ততই গিরিশের বকল্‌মা দেওয়ার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। এখনই কি উহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারা গিয়াছে? শ্রীযুত গিরিশকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "এখনও ঢের বাকি আছে! বকল্‌মা দেওয়ার ভিতর যে এতটা আছে তখন কি তা বুঝেছি! এখন দেখি যে সাধন-ভজন-জপ-তপরূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত আছে, কিন্তু যে বকল্‌মা দিয়াছে তার কাজের আর অন্ত নাই—তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর (ভগবানের) উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেল্‌লে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটি কর্‌লে।"

অবতারেরাই বকল্‌মার ভার লইতে পারেন

বকল্‌মার প্রসঙ্গে নানা কথা মনে উদয় হইতেছে। জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই ভগবান যীশু, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণই কখন কখন কাহাকেও ঐরূপে অভয় দিয়াছেন। সাধারণ গুরুর ঐরূপ করিবার সামর্থ্য বা অধিকার নাই। সাধারণ গুরু বা সাধুরা মন্ত্র-তন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষ, যাহা দ্বারা তাঁহারা নিজে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহাই বড় জোর অপরকে

বলিয়া দিতে পারেন। অথবা পবিত্রভাবে নিজ জীবন যাপন করিয়া লোককে পবিত্রতার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু নানা বন্ধনে জড়ীভূত হইয়া মানুষ যখন একেবারে অসহায় অবস্থায় উপস্থিত হয়, যখন 'এইরূপ কর' বলিলে সে হতাশ হইয়া বলিয়া উঠে, 'করিব কিরূপে ? করিবার শক্তি দাও তো করি' তখন তাহাকে সাহায্য করা সাধারণ গুরুর সাধ্যাতীত। 'তোমার দুষ্কৃতির সকল ভার লইলাম, আমি তোমার হইয়া ঐ সকলের ফলভোগ করিব'—একথা মানবকে মানবের বলা ও তদ্রূপ করা সাধ্যাতীত। মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মের ঐরূপ গ্লানি উপস্থিত হইলেই কৃপায় শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন এবং তাহার হইয়া ফলভোগ করিয়া তাহাকে সেই বন্ধনের আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু ঐরূপ করিলেও তিনি তাহাকে একেবারে রেহাই দেন না। শিক্ষার নিমিত্ত তাহাকে দিয়া কিছু-না-কিছু করাইয়া লন। ঠাকুর যেমন বলিতেন—"তাঁদের (অবতারপুরুষদিগের) কৃপায় মানবের দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মে হয়ে যায়।" ব্যক্তির সম্বন্ধে যেরূপ, জাতির

তদ্দৃষ্টান্ত

সম্বন্ধেও উহা সেইরূপ সত্য। ইহাই গীতায়—বিশ্বরূপ-দর্শনের জন্য অর্জ্জুনের দিব্যচক্ষুলাভ বলিয়া, পুরাণে—শ্রীভগবানের কৃপালাভ বলিয়া, বৈষ্ণবশাস্ত্রে—জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারসাধন বা পাষণ্ডদলন বলিয়া এবং ক্রিশ্চান-ধর্ম্মে—ঈশার অপরের ভোগটা নিজের ঘাড়ে লইয়া ভগবানের কোপশমন করা (Atonement) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে যদি ইহার আভাস না পাইতাম, তাহা

হইলে কথাটিতে যে সত্য আছে তাহা কখনই বুঝিতে পারিতাম না।

বকলমা সম্বন্ধে ঠাকুরের দর্শন

কলিকাতার শ্যামপুকুরে চিকিৎসার জন্য আসিয়া ঠাকুর যখন থাকেন, তখন একদিন দেখিয়াছিলেন—তাঁহার নিজের সূক্ষ্মশরীরটা স্থূলশরীর হইতে বাহিরে আসিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছে! ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দেখলুম তার পিঠময় ঘা হয়েছে! ভাব্‌চি কেন এমন হোল? আর মা দেখিয়ে দিচ্ছে—যা তা করে এসে যত লোক ছোঁয়, আর তাদের দুর্দ্দশা দেখে মনে দয়া হয়—সেইগুলো (দুষ্কর্ম্মের ফল) নিতে হয়! সেই সব নিয়ে নিয়ে ঐরূপ হয়েছে। সেইজন্যই তো (নিজের গলা দেখাইয়া) এই হয়েছে। নইলে এ শরীর কখনও কিছু অন্যায় করে নি—এত (রোগ) ভোগ কেন?" আমরা শুনিয়া অবাক! ভাবিতে লাগিলাম—বাস্তবিকই তবে একজন অপরের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিয়া তাহাকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে? অনেকে তখন ঠাকুরের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভালবাসায় ভাবিয়াছিলেন—'হায় হায়, কেন আমরা ঠাকুরকে মিথ্যা-প্রবঞ্চনাদি নানা দুষ্কর্ম্ম করিয়া আসিয়া ছুঁইয়াছি! আমাদের জন্য তাঁহার এত ভোগ, এত কষ্ট! আর কখনও ঠাকুরের দেবশরীর স্পর্শ করিব না।'

ঠাকুরের ধবলকুষ্ঠ আরোগ্য করা

এ সম্বন্ধে ঠাকুরের আর একটি কথা এখানে মনে পড়িতেছে। কোন সময় একটি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত (ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ) ব্যক্তি আসিয়া ঠাকুরকে কাতর হইয়া ধরে ও বলে যে, তিনি একবার হাত বুলাইয়া দিলেই তাহার

ঐ রোগ হইতে নিষ্কৃতি হয়। ঠাকুর তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন, "আমি তো কিছু জানি না, বাবু; তবে তুমি বল্‌ছ, আচ্ছা, হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। মার ইচ্ছা হয় তো সেরে যাবে।"—এই বলিয়া হাত বুলাইয়া দেন। সে দিন সমস্ত দিন ধরিয়া ঠাকুরের হাতে এমন যন্ত্রণা হয় যে, তিনি অস্থির হইয়া জগদম্বাকে বলেন, "মা, আর কখন এমন কাজ করব না।" ঠাকুর বলিতেন, "তার রোগ সেরে গেল—কিন্তু তার ভোগটা (নিজের দেহ দেখাইয়া) এইটের উপর দিয়ে হয়ে গেল।" ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল ঘটনা হইতেই মনে হয়, বেদ বাইবেল পুরাণ কোরান তন্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসকল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোক-সহায়ে বুঝিলে এ যুগে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। ঠাকুরও আমাদের বলিয়াছেন—"ওরে, নবাবি আমলের টাকা বাদশাই আমলে চলে না!"

বকল্‌মা দেওয়া সহজ নয়

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বকল্‌মা দেওয়াটা বড় সোজা কথা—দিলেই হইল আর কি। মানুষ প্রবৃত্তির দাস, ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে আসিয়াও কেবল সুবিধাই খোঁজে—কিরূপে এদিক-ওদিক, সংসারসুখ ও ভগবদানন্দ, দুইটাই পাইতে পারে তাহাই কেবল দেখিতে থাকে। সংসারের ভোগসুখগুলোকে এত মধুর, এত অমৃতোপম বলিয়া বোধ করে যে, সেগুলোকে ছাড়িতে হইবে মনে হইলেও দশদিক শূন্য দেখে, মনে করে তাহা হইলে কি লইয়া থাকিবে! সেজন্য আধ্যাত্মিক জগতে বকল্‌মা দেওয়া চলে শুনিয়াই সে

লাফাইয়া উঠে! মনে করে, তবে আর কি?—আমি চুরি জুয়াচুরি বাটপারি যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া যতটা পারি সংসারে সুখভোগ করি, আর শ্রীচৈতন্য, যীশু বা শ্রীরামকৃষ্ণ আমি পরকালটায়—কারণ মরিতে ত একদিন হইবেই—যাহাতে সুখী হইতে পারি তাহা দেখুন। সে তখন বোঝে না যে, উহা আর কিছুই নহে, কেবল পাজি মনের জুয়াচুরি—বোঝে না যে ঐরূপে সে নিরন্তর আপনাকে আপনি ঠকাইতেছে। বোঝে না যে উহা আর কিছুই নহে, কেবল আপনার দুষ্কৃতিসকলের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে হইবে বলিয়া সাধ করিয়া চক্ষে ঠুলি পরিয়া সর্ব্বনাশের দিকে অগ্রসর হওয়া—বোঝে না যে ঐ ঠুলি একদিন জোর করিয়া একজন খুলিয়া দিবে এবং সে অকূল পাথার দেখিবে—দেখিবে জুয়াচোরের বকল্‌মা কেহ লয় নাই! হায় মানব! কত রকমেই না তুমি আপনাকে আপনি ঠকাইতেছ এবং মনে করিতেছ যে, 'বড় জিতিয়াছি!' আর ধন্য মহামায়া! তুমি কি ভেল্কিই না মানবমনে লাগাইয়াছ! শ্রীরামপ্রসাদ স্বরচিত গীতে তোমায় সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই সম্পূর্ণ সত্য—

সাবাস্ মা দক্ষিণাকালী, ভুবন ভেল্কি লাগিয়ে দিলি
তোর ভেল্কির গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি
এমন বাজিকরের মেয়ে, রাখলি বাবারে পাগল সাজায়ে
নিজে গুণময়ী হয়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি।
মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি,
প্রসাদ রে সেই চরণ পাবি, তুইও বুঝি পাগল হলি!

বকল্‌মা অমনি দিলেই দেওয়া যায় না, নানা উদ্যম-অধ্যবসায়ের

ফলে মনে বকল্‌মা দিবার অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইলে, তবেই মানব উহা ঠিক ঠিক দিতে পারে; আর তখনই শ্রীভগবান তাহার ভার লইয়া থাকেন।

কোন্ অবস্থায় বকল্‌মা দেওয়া চলে

সুখী হইবার আশায় সংসারের নানাকাজে ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া মানব যখন বাস্তবিকই দেখে—"প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়", সাধন-ভজন-জপ-তপ করিয়া মানব যখন প্রাণে প্রাণে বুঝে অনন্ত ভগবানকে পাইবার উহা কখনই উপযুক্ত মূল্য হইতে পারে না, অদম্য উত্তমে পাহাড় কাটিয়া পথ করিয়া লইব ভাবিয়া সকল বিষয়ে লাগিয়া মানব যখন বুঝিতে পারে তাহার কোন ক্ষমতাই নাই তখন সে 'কে কোথায় আছ গো, রক্ষা কর' বলিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিতে থাকে, আর তখনই শ্রীভগবান তাহার বকল্‌মা লইয়া থাকেন! নতুবা সাধন ভজন করিতে বা শ্রীভগবানকে ডাকিতে আমার ভাল লাগে না, যথেচ্ছাচার করিতেই ভাল লাগে, অতএব তাহাই করিব, আর কেহ ঐ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে বলিব 'কেন? আমি ত ভগবানকে বকল্‌মা দিয়াছি। তিনি আমায় ঐরূপ করাইতেছেন তা কি করিব? মনটি কেন তিনি ফিরাইয়া দেন্ না?'—এ বকল্‌মা কেবল পরকে ফাঁকি দিবার এবং নিজেও ফাঁকিতে পড়িবার বকল্‌মা; উহাতে 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হইতে হয়।

মনের জুয়াচুরি হইতে সাবধান

আর একদিক দিয়া কথাটির আলোচনা করিলে আরও পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে। আচ্ছা বুঝিলাম—তুমি বকল্‌মা দিয়াছ, তোমার শ্রীভগবানকে ডাকিবার বা সাধন-ভজন

করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ঠিক ঠিক বকল্‌মা দিলে তোমার প্রাণে প্রাণে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার করুণার কথা উদিত হইতে থাকিবেই থাকিবে—মনে হইবে যে, এই অপার সংসারসমুদ্রে পড়িয়া এতদিন হাবু-ডুবু খাইতেছিলাম, আহা! তিনি আমায় কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন! বল দেখি, ঐরূপ অনুভবে তাঁহার উপর তোমার কতটা ভক্তি-ভালবাসার উদয় হইবে! তোমার হৃদয় তাঁহার উপর কৃতজ্ঞতা ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া সর্ব্বদাই যে তাঁহার কথা ভাবিতে ও তাঁহার নাম লইতে থাকিবে—উহা করিতে তোমাকে কি আর বলিয়া দিতে হইবে? সর্পের ন্যায় ক্রূর প্রাণীও আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া বাস্তুসাপ হয় ও বাটীর কাহাকেও দংশন করে না। তোমার হৃদয় কি উহা অপেক্ষাও নীচ যে, যিনি তোমার ইহকাল পরকালের ভার লইলেন, তত্রাচ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভালবাসায় মন পূর্ণ হইল না? অতএব বকল্‌মা দিয়া যদি দেখ—তোমার ভগবানকে ডাকিতে ভাল লাগে না, তাহা হইলে বুঝিও তোমার বকল্‌মা দেওয়া হয় নাই এবং তিনিও তোমার ভার গ্রহণ করেন নাই। 'বকল্‌মা দিয়াছি' বলিয়া আর আপনাকে ঠকাইও না এবং অপাপবিদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক ভগবানে নিজকৃত দুষ্কৃতির কালিমা অর্পণ করিও না। উহাতে আপনারই সমূহ ক্ষতি ও অমঙ্গল। ঠাকুরের 'ব্রাহ্মণের গোহত্যা' গল্পটি মনে রাখিও:

বকল্‌মার শেষ কথা

এক ব্রাহ্মণ অনেক যত্ন ও পরিশ্রমে একখানি সুন্দর বাগান করিয়াছিল। নানাজাতীয় ফল-ফুলের গাছ পুঁতিয়াছিল ও

সেগুলি দিন দিন নধর হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণের আনন্দের আর সীমা ছিল না। এখন একদিন দরজা খোলা পাইয়া একটা গরু ঢুকিয়া সেই গাছ-গুলি মুড়াইয়া খাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কার্য্যান্তরে গিয়াছিল। আসিয়া দেখে তখনও গরুটা গাছ খাইতেছে! বিষম কোপে তাড়া করিয়া সেটাকে যেমন এক ঘা লাঠি মারিয়াছে, আর অমনি মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগায় গরুটা মরিয়া গেল! ব্রাহ্মণের তখন প্রাণে ভয়—তাইতো হিন্দু হইয়া গোহত্যা করিলাম? গোহত্যার তুল্য যে পাপ নাই! ব্রাহ্মণ একটু-আধটু বেদান্ত পড়িয়াছিল। দেখিয়াছিল তাহাতে লেখা আছে যে, বিশেষ বিশেষ দেবতার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া মানবের ইন্দ্রিয়সকল স্ব-স্ব কার্য্য করে। যথা—সূর্য্যের শক্তিতে চক্ষু দেখে, পবনের শক্তিতে কর্ণ শুনে, ইন্দ্রের শক্তিতে হস্ত কার্য্য করে, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের সেই কথাগুলি এখন মনে পড়ায় ভাবিল—'তবে তো আমি গোহত্যা করি নাই। ইন্দ্রের শক্তিতে হস্ত চালিত হইয়াছে—ইন্দ্রই তবে তো গোহত্যা করিয়াছে!' কথাটি মনে মনে পাকা করিয়া ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হইল।

ঠাকুরের 'ব্রাহ্মণ ও গোহত্যা'র গল্প

এদিকে গোহত্যা-পাপ ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করিতে আসিল কিন্তু ব্রাহ্মণের মন তাহাকে তাড়াইয়া দিল। বলিল, "যাও, এখানে তোমার স্থান নাই; গোহত্যা ইন্দ্র করিয়াছে, তাহার কাছে যাও।" কাজেই পাপ ইন্দ্রকে ধরিতে গেল। ইন্দ্র পাপকে বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর, আমি ব্রাহ্মণের

সহিত দুটো কথা কহিয়া আসি, তারপর আমায় ধরিও।' ঐকথা বলিয়া ইন্দ্র মানবরূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিলেন ও দেখিলেন ব্রাহ্মণ অদূরে দাঁড়াইয়া গাছপালার তদারক করিতেছে। ইন্দ্র উদ্যানের শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মণের যাহাতে কানে যায় এমনভাবে প্রশংসা করিতে করিতে ধীরপদে ব্রাহ্মণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; বলিলেন—"আহা, কি সুন্দর বাগান, কি রুচির সহিত গাছপালাগুলি লাগান হইয়াছে, যেখানে যেটি দরকার ঠিক সেখানে সেটি পোঁতা রহিয়াছে!" এই প্রকার বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, বলিতে পারেন বাগানখানি কার? এমন সুন্দরভাবে গাছ-পালাগুলি কে লাগাইয়াছে?" ব্রাহ্মণ উদ্যানের প্রশংসা শুনিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল—"আজ্ঞা, এখানি আমার; আমিই এগুলি সব পুঁতিয়াছি। আসুন না, ভাল করিয়া বেড়াইয়া দেখুন না।" এই বলিয়া উদ্যান সম্বন্ধে নানাকথা বলিতে বলিতে ইন্দ্রকে উদ্যানমধ্যস্থ সব দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং ক্রমে ভুলিয়া মৃত গরুটা যথায় পড়িয়াছিল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ইন্দ্র যেন একেবারে চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাম, রাম, এখানে গোহত্যা করিল কে?" ব্রাহ্মণ এতক্ষণ উদ্যানের সকল পদার্থই 'আমি করিয়াছি, আমি করিয়াছি' বলিয়া আসিয়াছে; কাজেই গোহত্যা কে করিল জিজ্ঞাসায় বিষম ফাঁপরে পড়িয়া একেবারে নির্ব্বাক—চুপ! তখন ইন্দ্র নিজরূপ পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "তবে রে ভণ্ড?

উদ্যানের যাহা কিছু ভাল সব তুমি করিয়াছ, আর গোহত্যাটাই কেবল আমি করিয়াছি, বটে? নে তোর গোহত্যা-কৃত পাপ!" এই বলিয়া ইন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন এবং পাপও আসিয়া ব্রাহ্মণের শরীর অধিকার করিল।

যাক্ এখন বকল্‌মার কথা, আমরা পূর্ব্বপ্রসঙ্গের অনুসরণ করি। ঠাকুরের প্রত্যেক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, ঠাকুরের কথা-গুলির পূর্ব্বে তাঁহারা যে অর্থগ্রহণে সমর্থ হইতেন, এখন যত দিন যাইতেছে তত সেইগুলির ভিতর আরও কত গভীর অর্থ তাঁহার কৃপায় বুঝিতে পারিতেছেন। আবার ঠাকুরের অনেক কথা বা ব্যবহার, যাহার অর্থ আমরা তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কেবল হাঁ করিয়া শুনিয়া গিয়াছি মাত্র, তাহাদের ভিতর এখন অপূর্ব্ব অর্থ ও ভাব উপলব্ধি করিয়া অবাক হইয়া থাকিতে হয়! ঠাকুরের কথাই ছিল—"ওরে, কালে হবে, কালে বুঝবি। বিচিটা পুঁতলেই কি অমনি ফল পাওয়া যায়? আগে অঙ্কুর হবে, তারপর চারা গাছ হবে, তারপর সেই গাছ বড় হয়ে তাতে ফুল ধরবে, তারপর ফল—সেই রকম। তবে লেগে থাকতে হবে, ছাড়লে হবে না; এই গানটায় কি বল্‌ছে শোন।" এই বলিয়া ঠাকুর মধুরকণ্ঠে গান ধরিতেন—

সাধকের মনের উন্নতির সহিত ঠাকুরের কথার গভীর অর্থবোধ

'কালে হবে'

হরিষে লাগি রহো রে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই—তেরা বিগড় বাত বনি যাই॥
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে তারে সুজন কসাই
(আওর্) শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাঈ।

দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা, বেনিয়া বয়েল চালাই
(আওর্) এক বাতকো টাণ্টা পড়ে তো খোঁজ খবর না পাই।
এয়্সী ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাঈ
সেবা বন্দি আওর্ অধীনতা সহজ মিলি রঘুরাঈ॥

—গান গাহিয়া আবার বলিতেন, "তাঁর সেবা, বন্দনা ও অধীনতা—কি না দীনভাব; এই নিয়ে বিশ্বাস করে পড়ে থাকতে থাকতে সব হবে, তাঁর দর্শন পাওয়া যাবেই যাবে। তা' না করে ছেড়ে দিলে কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই হ'ল। একজন চাকরি করে কষ্টে-সৃষ্টে কিছু কিছু করে টাকা জমাত। একদিন গুণে দেখে যে হাজার টাকা জমেছে। অমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে মনে করলে, তবে আর কেন চাকরি করা? হাজার টাকা ত জমেছে, আর কি? এই বলে চাকরি ছেড়ে দিলে। এতটুকু আধার, এতটুকু আশা! ঐ পেয়েই সে ফুলে উঠলো, ধরাকে সরাখানা দেখতে লাগল। তারপর—হাজার টাকা খরচ হতে আর ক'দিন লাগে? অল্প দিনেই ফুরিয়ে গেল। তখন দুঃখ-কষ্টে আবার চাকরির জন্য ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াতে লাগল। ও রকম করলে চলবে না, তাঁর (ভগবানের) দ্বারে পড়ে থাকতে হবে; তবে ত হবে!"

সাধনে লাগিয়া থাকা আবশ্যক

আবার কখন কখন গানটির দ্বিতীয় চরণ—'তেরা বনত বনত বনি যাই' অর্থাৎ ভক্তি করিতে করিতে ফল পাওয়া যাইবে; গাহিতে গাহিতে বলিয়া উঠিলেন—"দূর শালা! 'বনত বনত' কি? অমন ম্যাদাটে

ম্যাদাটে ভক্তি ত্যাগ করা

ভক্তি করতে নাই। মনে জোর করতে হয়—এখনি হবে, এখনি তাঁকে পাব। ম্যাদাটে ভক্তির কর্ম্ম কি তাঁকে পাওয়া ?"

ঠাকুরকে দেখিলেই বাস্তবিকই মনে হইত, যেন একটি জ্বলন্ত ভাবঘনমূর্ত্তি!—যেন পুঞ্জীকৃত ধর্ম্মভাবরাশি একত্র সম্বদ্ধ হইয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে বলিয়াই আমরা তাঁহার একটা আকার ও রূপ দেখিতে পাইতেছি! মনের ভাবপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটার পরিবর্ত্তন হওয়ার কথা আমরা বলিয়াই থাকি ও কালে-ভদ্রে কখন একটু-আধটু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; কিন্তু মনের ভাবতরঙ্গ যে শরীরে এতটা পরিবর্ত্তন আনিয়া দিতে পারে, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে 'আমি'-জ্ঞানের একেবারে লোপ হইল—আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের হাতের নাড়ি, হৃদয়ের স্পন্দন, সব বন্ধ হইয়া গেল; শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি ডাক্তারেরা যন্ত্রসহায়ে পরীক্ষা করিয়াও হৃৎপিণ্ডের কার্য্য কিছুই পাইলেন না।[১] তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জনৈক ডাক্তারবন্ধু ঠাকুরের চক্ষুর তারা বা মণি অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিলেন—তথাচ উহা মৃত ব্যক্তির ন্যায় কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না! 'সখীভাব'-সাধনকালে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী ভাবিতে ভাবিতে মন তন্ময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরেও স্ত্রী-সুলভ

ভাবঘনমূর্ত্তি ঠাকুরের প্রত্যেক ভাবের সহিত দৈহিক পরিবর্ত্তন

১ গলরোগের চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরের বাসায় যখন ঠাকুর থাকেন, তখন আমাদের সম্মুখে এই পরীক্ষা হয়।

ভাব, উঠা-বসা, দাঁড়ান, কথাকহা প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যে এমন প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, শ্রীযুত মথুরানাথ মাড় প্রভৃতি যাহারা চব্বিশঘণ্টা ঠাকুরের সঙ্গে উঠা-বসা করিত, তাহারাও তাঁহাকে দেখিয়া অনেকবার কোন আগন্তুক স্ত্রীলোক হইবে বলিয়া ভ্রমে পড়িল! এইরূপ কত ঘটনাই না আমরা দেখিয়াছি ও ঠাকুরের নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছি—যাহাতে বর্ত্তমানে মনোবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞানের বাঁধা-ধরা নিয়মগুলিকে পাল্‌টাইয়া বাঁধিতে হয়। সে সব কথা বলিলেও কি লোকে বিশ্বাস করিবে?

ঠাকুরের সকলের সকলপ্রকার ভাব ধরিবার ক্ষমতা

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিয়াছি ঠাকুরের ভাবরাজ্যের সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার ক্ষমতা—ছোট-বড় সব রকম ভাব বুঝিতে পারা! বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সকলের মনোভাব—বিষয়ী, সাধু, জ্ঞানী, ভক্ত, স্ত্রী, পুরুষ সকলের হৃদ্‌গত ভাব ধরিয়া কে কোন্ পথে কতদূর ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছে, পূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী ঐ পথ দিয়া অগ্রসর হইতে তাহার কিরূপ সাধনেরই বা বর্ত্তমানে প্রয়োজন, সকল কথা বুঝিতে পারা ও তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করা! দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ঠাকুর যেন মানবমনে যতপ্রকার ভাব উঠিয়াছে, উঠিতে পারে বা পরে উঠিবে, সে সকল ভাবই নিজ জীবনে অনুভব করিয়া বসিয়া আছেন এবং ঐ সকল ভাবের প্রত্যেকটির তাঁহার নিজের মনের ভিতর আবির্ভাব হইতে তিরোভাবকাল পর্য্যন্ত পর পর তাঁহার যে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন! আর

তজ্জন্যই ইতরসাধারণ মানব যে যখন আসিয়া যে ভাবের কথা বলিতেছে, নিজের ঐ সকল পূর্ব্বানুভূত ভাবের সহিত মিলাইয়া তখনি তাহা ধরিতেছেন, বুঝিতেছেন ও তদুপযোগী বিধান করিতেছেন। সকল বিষয়েই যেন এইরূপ। মায়ামোহ, সংসার-তাড়না, ত্যাগ-বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়েই কেহ কোন অবস্থায় পড়িয়া উহা হইতে উদ্ধার পাইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া কাতর-জিজ্ঞাসু হইয়া আসিলে ঠাকুর পথের সন্ধান ত দিয়া দিতেনই, আবার অনেক সময়েই সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঐ অবস্থায় পড়িয়া যেরূপ অনুভূতি হইয়াছিল তাহাও বলিতেন। বলিতেন, "ওগো, তখন এইরূপ হইয়াছিল ও এইরূপ করিয়াছিলাম" ইত্যাদি। বলিতে হইবে না—ঐরূপ করায় জিজ্ঞাসুর মনে কত ভরসার উদয় হইত এবং ঠাকুর তাহার জন্য যে পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন, কতদূর বিশ্বাস ও উৎসাহে সে সেই পথে অগ্রসর হইত! শুধু তাহাই নহে, এইরূপে নিজ জীবনের ঘটনা বলায় জিজ্ঞাসুর মনে হইত ঠাকুর তাহাকে কত ভালবাসেন!—আপনার মনের কথাগুলি পর্য্যন্ত বলেন! দুই একটি দৃষ্টান্তেই বিষয়টি সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে।

১ম দৃষ্টান্ত—মণিমোহনের পুত্রশোকের কথা

সিঁদুরিয়াপটির শ্রীযুত মণিমোহন মল্লিকের একটি উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইল। মণিমোহন পুত্রের সংকার করিয়াই ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া বিমর্ষভাবে ঘরের একপাশে বসিলেন। দেখিলেন, ঘরে স্ত্রী-পুরুষ অনেকগুলি জিজ্ঞাসু ভক্ত বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুর তাঁহাদের

সহিত নানা সৎপ্রসঙ্গ করিতেছেন। বসিবার অল্পক্ষণ পরেই ঠাকুরের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল এবং ঘাড় নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো? আজ এমন শুকনো দেখছি কেন?"

মণিমোহন বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে উত্তর করিলেন—(পুত্রের নাম করিয়া) "অমুক আজ মারা পড়িয়াছে।"

বৃদ্ধ মণিমোহনের সেই রুক্ষবেশ ও শোকনিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ সকলেই স্তম্ভিত, নীরব! সকলেই বুঝিলেন, বৃদ্ধের হৃদয়ের সেই গভীর মর্ম্মবেদনা ও উথলিত শোকাবেগ বাক্যে রুদ্ধ হইবার নহে। তথাচ বৃদ্ধের বিলাপ ও ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া—সংসারের ধারাই ঐ প্রকার, সকলকেই একদিন মরিতে হইবে, যাহা হইয়াছে সহস্র ক্রন্দনেও তাহা ফিরিবার নহে, অতএব শোক পরিত্যাগ কর, সহ্য কর—এইরূপ নানা কথায় তাঁহাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই মানব শোকসন্তপ্ত নরনারীকে ঐ সকল কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া আসিতেছে; কিন্তু হায়, কয়টা লোকের প্রাণ তাহাতে শান্ত হইতেছে? কেনই বা হইবে? মন, মুখ এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—তিনটি পদার্থ একই ভাবে ভাবিতে থাকিলে তবেই আমাদের উচ্চারিত বাক্যসমূহ অপরের প্রাণস্পর্শ করিয়া তাহাতে সমভাবের তরঙ্গ উত্থাপিত করিতে পারে। এখানে যে তাহার একান্তাভাব! আমরা মুখে সংসার অনিত্য বলিয়া প্রতি চিন্তায় ও কার্য্যে তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; নিশার স্বপ্নসম সংসারটা অনিত্য বলিয়া ভাবিতে অপরকে উপদেশ করিয়া নিজে সর্ব্বদা প্রাণে প্রাণে উহাকে নিত্য বলিয়া ভাবি এবং

চিরকালের মত এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া থাকি। আমাদের কথায় সে শক্তি কোথা হইতে আসিবে?

অপর সকলে মণিমোহনকে ঐরূপে নানা কথা কহিলেও ঠাকুর এক্ষেত্রে অনেকক্ষণ কোন কথাই না কহিয়া মণিমোহনের শোকোচ্ছ্বাস কেবল শুনিয়াই যাইতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার সেই উদাসীন ভাব দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইয়া ভাবিতেও লাগিলেন—ইঁহার হৃদয় কি কঠোর, কি করুণাশূন্য!

বৃদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্য-দশা প্রাপ্ত হইলেন এবং সহসা তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীযুক্ত মণিমোহনকে লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব্ব তেজের সহিত গান ধরিলেন—

জীব সাজ সমরে

ঐ দেখ্ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।

আরোহণ করি মহাপুণ্য-রথে ভজন-সাধন দুটো অশ্ব জুড়ে তাতে

দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান ভক্তি-ব্রহ্মবাণ সংযোগ কর রে।

আর এক যুক্তি আছে শুন সুসঙ্গতি,

সব শত্রু নাশের চাইনে রথরথী

রণভূমি যদি করেন দাশরথি ভাগীরথীর তীরে॥

গানের বীরত্বব্যঞ্জক সুর ও তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গী ঠাকুরের নয়ন হইতে নিঃসৃত বৈরাগ্য ও তেজের সহিত মিলিত হইয়া সকলের প্রাণে তখন এক অপূর্ব্ব আশা ও উদ্যমের স্রোত প্রবাহিত করিল। সকলেরই মন তখন শোক-মোহের রাজ্য হইতে উত্থিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয়াতীত, সংসারাতীত, বিমল ঈশ্বরীয় আনন্দে পূর্ণ হইল। মণিমোহনও উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এখন শোক-তাপ ভুলিয়া স্থির, গম্ভীর, শান্ত!

গীত সাঙ্গ হইল—কিন্তু গীতোক্ত কয়েকটি বাক্যের সহায়ে ঠাকুর যে দিব্য ভাবতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঘর অনেকক্ষণ অবধি জম্‌জম্‌ করিতে লাগিল! ঈশ্বরই একমাত্র আপনার, মন-প্রাণ তাঁহাকে অর্পণ করিলাম—তিনি কৃপা করুন, দর্শন দিন—এইভাবে আত্মহারা হইয়া সকলে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইলে তিনি মণিমোহনের নিকটে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—

"আহা! পুত্রশোকের মত কি আর জ্বালা আছে? খোলটা (দেহ) থেকে বেরোয় কি না? খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ—যত দিন খোলটা থাকে ততদিন থাকে।"

এই বলিয়া ঠাকুর নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর কথা দৃষ্টান্ত-স্বরূপে তাহাকে বলিতে লাগিলেন। এমন বিমর্ষ-গম্ভীরভাবে ঠাকুর কথাগুলি বলিতে লাগিলেন যে, স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল তিনি যেন আপনার আত্মীয়ের মৃত্যু পুনরায় চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছেন! বলিলেন, "অক্ষয় মলো—তখন কিছু হল না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম—যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে; তলোয়ারের কিছু হলো না—যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল! দেখে খুব আনন্দ হলো—খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম! তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এল! তার পরদিন (ঘরের পূর্ব্বে, কালীবাড়ীর উঠানের সাম্‌নের বারাণ্ডার দিকে দেখাইয়া) ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি কি যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা

যেমন নেংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্ছে, অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি কচ্ছে! ভাবলুম, মা, এখানে (আমার) পরনের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নাই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল! এখানেই (আমার) যখন এরকম হচ্চে তখন গৃহীদের শোকে কি না হয়!—তাই দেখাচ্ছিস্, বটে!"

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, "তবে কি জান? যারা তাঁকে (ভগবানকে) ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সাম্‌লে যায়। চুনোপুঁটির মত আধারগুলো একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে বা তলিয়ে যায়। দেখনি? গঙ্গায় ষ্টীমারগুলো গেলে জেলেডিঙ্গিগুলো কি করে? মনে হয় যেন একেবারে গেল—আর সাম্‌লাতে পারলে না। কোনখানা বা উল্টেই গেল! আর বড় বড় হাজারমুণে কিস্তিগুলো দু'চারবার টাল্‌-মাটাল্‌ হয়েই যেমন তেমনি—স্থির হলো। দু'চারবার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে।"

আবার কিছুক্ষণ বিমর্ষ-গম্ভীরভাবে থাকিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "কয়দিনের জন্যেই বা সংসারের এ সকলের (পুত্রাদির) সঙ্গে সম্বন্ধ! মানুষ সুখের আশায় সংসার করতে যায়—বিয়ে করলে, ছেলে হলো, সেই ছেলে আবার বড় হলো, তার বিয়ে দিলে—দিন কতক বেশ চল্‌লো। তারপর এটার অসুখ, ওটা মলো, এটা ব'য়ে গেল—ভাবনায়, চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত; যত রস মরে তত একেবারে 'দশ ডাক' ছাড়তে থাকে। দেখনি?—ভিয়েনের উনুনে কাঁচা

সুঁদরীর চেলাগুলো প্রথমটা বেশ জ্বলে। তারপর কাঠখানা যত পুড়ে আসে কাঠের সব রসটা পেছনের দিক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গ্যাঁজলার মত হয়ে ফুটতে থাকে আর চুঁ-চাঁ, ফুস্-ফাস্ নানা-রকম আওয়াজ হতে থাকে—সেই রকম।" এইপ্রকারে সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা এবং শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াতেই একমাত্র সুখ—ইত্যাদি বিষয়ে নানাকথা কহিয়া মণিমোহনকে বুঝাইতে লাগিলেন। মণিমোহনও সামলাইয়া বলিলেন, "এই-জন্যই তো আপনার কাছে ছুটে এলুম। বুঝলুম—এ জ্বালা আর কেউ শান্ত করতে পারবে না।"

আমরা তখন ঠাকুরের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—ইঁহাকেই আমরা পূর্ব্বে কঠোর উদাসীন ভাবিতেছিলাম। যিনি যথার্থ মহৎ, তাঁহার ছোট ছোট কাজগুলিও অপর সাধারণের ন্যায় হয় না। ছোট-বড় প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এইমাত্র কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সমাধি বা ঈশ্বরের সহিত নৈকট্য-উপলব্ধিতে যাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন পর্য্যন্ত রহিত হইয়া গিয়াছিল, ইনি কি তিনি? সেই ঠাকুরই কি বাস্তবিক মণিমোহনের অবস্থার সহিত সহানুভূতিতে একেবারে সাধারণ মানবের ন্যায় হইয়াছেন? 'মায়া হ্যায়'—ছোট কথা বলিয়া বৃদ্ধের কথা ইনি তো উড়াইয়া দিতে পারিতেন? সে ক্ষমতা যে ইঁহার নাই তাহা ত নহে? কিন্তু ঐরূপে মহত্ত্বখ্যাপন করিলে বুঝিতাম, ইনি বড় হন বা আর যাহা কিছু হন, লোকগুরু—জগদ্গুরু ঠাকুর নহেন। বুঝিতাম, মানবসাধারণের ভাব বুঝিবার ইঁহার ক্ষমতা নাই এবং বলিতাম, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি

মমতায় দুর্ব্বল মানব আমাদের মত অসহায় অবস্থায় ইনি যদি একবার পড়িতেন, তবে কেমন করিয়া মায়ার খেলায় উদাসীন থাকিতে পারিতেন তাহা দেখিতাম!

পরক্ষণেই আবার হয়ত কোন যুবক আসিয়া বিষণ্নচিত্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়, কাম কি করে যায়? এত চেষ্টা করি, তবুও মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ও কুভাব মনে উপস্থিত হয়ে বড় অশান্তি আসে।"

২য় দৃষ্টান্ত—কাম দূর করা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

ঠাকুর—"ওরে, ভগবদ্দর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। তা (ভগবানের দর্শন) হলেও শরীর যতদিন থাকে ততদিন একটু-আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তুই কি মনে করিস্ আমারই একেবারে গেছে? এক সময়ে মনে হয়েছিল যে কামটাকে জয় করেছি। তারপর পঞ্চবটীতে বসে আছি, আর এমনি কামের তোড় এল যে আর যেন সামলাতে পারি নি! তারপর ধূলোয় মুখ ঘস্‌ড়ে কাঁদি আর মাকে বলি, 'মা, বড় অন্যায় করেছি, আর কখন ভাবব না যে কাম জয় করেছি'—তবে যায়। কি জানিস্—(তোদের) এখন যৌবনের বন্যা এসেছে! তাই বাঁধ দিতে পাচ্ছিস্ না। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাধ মানে? বাঁধ উছলে ভেঙ্গে জল ছুট্‌তে থাকে। লোকের ধান-ক্ষেতের ওপর এক বাঁশ সমান জল দাঁড়িয়ে যায়! তবে বলে—কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়। আর মনে একবার আধবার কখন কুভাব এসে পড়ে তো—'কেন এল' বলে' বসে বসে তাই ভাবতে থাক্‌বি কেন? ওগুলো কখন কখন শরীরের ধর্ম্মে

আসে যায়—শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টার মত মনে করবি। শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টা হয়েছিল বলে লোকে কি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে? সেই রকম ঐ ভাবগুলোকে অতি সামান্য, তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান করে মনে আর আন্‌বি না। আর তাঁর নিকটে খুব প্রার্থনা করবি, হরিনাম করবি ও তাঁর কথাই ভাববি। ও ভাব-গুলো এল কি গেল—সেদিকে নজর দিবি না। এরপর ওগুলো ক্রমে ক্রমে বাঁধ মান্‌বে।" যুবকের কাছে ঠাকুর যেন এখন যুবকই হইয়া গিয়াছেন!

৩য় দৃষ্টান্ত—যোগানন্দকে ঐ সম্বন্ধে উপদেশ

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত যোগেনের কথা মনে পড়িতেছে। স্বামী যোগানন্দ যাঁহার মত ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ বিরল দেখিয়াছি, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে একদিন ঐ প্রশ্ন করেন। তাঁহার বয়স তখন অল্প, বোধ হয় ১৪।১৫ হইবে এবং অল্পদিনই ঠাকুরের নিকট গতায়াত করিতেছেন। সে সময় নারায়ণ নামে এক হঠযোগীও দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে কুটীরে থাকিয়া নেতি-ধৌতি[১] ইত্যাদি ক্রিয়া দেখাইয়া কাহাকেও কাহাকেও কৌতূহলাকৃষ্ট করিতেছে। যোগেন স্বামীজি বলিতেন, তিনিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং ঐ সকল ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, ঐ

১ দুই অঙ্গুলি চওড়া ও প্রায় দশ-পনর হাত লম্বা একটা ন্যাকড়ার ফালি ভিজাইয়া আস্তে আস্তে গিলিয়া ফেলা ও পরে তাহা আবার টানিয়া বাহির করার নাম নেতি। আর ২।৩ সের জল খাইয়া পুনরায় বমন করিয়া ফেলার নাম ধৌতি। গুহ্যদ্বার দিয়া জল টানিয়া বাহির করাকেও ধৌতি বলে। হঠযোগীরা এইরূপে শরীর-মধ্যস্থ সমস্ত শ্লেষ্মাদি বাহির করিয়া ফেলেন। তাঁহারা বলেন—ইহাতে শরীরে রোগ আসিতে পারে না এবং উহা দৃঢ় হয়।

সকল না করিলে বোধ হয় কাম যায় না এবং ভগবদ্দর্শন হয় না। তাই প্রশ্ন করিয়া বড় আশায় ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর কোন একটা আসন-টাসন বলিয়া দিবেন, বা হরিতকী কি অন্য কিছু খাইতে বলিবেন, বা প্রাণায়ামের কোন ক্রিয়া শিখাইয়া দিবেন। যোগেন স্বামীজি বলিতেন—"ঠাকুর আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'খুব হরিনাম করবি, তা হলে যাবে'। কথাটা আমার একটুও মনের মত হলো না। মনে মনে ভাবলুম—উনি কোন ক্রিয়া-ট্রিয়া জানেন না কিনা, তাই একটা যা তা বলে দিলেন। হরিনাম করলে আবার কাম যায়!—তা হলে এত লোক ত কচ্চে, যাচ্চে না কেন? তারপর একদিন কালীবাটীর বাগানে এসে ঠাকুরের কাছে আগে না গিয়ে পঞ্চবটীতে হঠযোগীর কাছে দাঁড়িয়ে তার কথাবার্ত্তা মুগ্ধ হয়ে শুনছি, এমন সময় দেখি ঠাকুর স্বয়ং সেখানে এসে উপস্থিত! আমাকে দেখেই ডেকে আমার হাত ধরে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, 'তুই ওখানে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাস্ নি। ওসব (হঠযোগের ক্রিয়া) শিখলে ও করলে শরীরের উপরেই মন পড়ে থাকবে। ভগবানের দিকে যাবে না।' আমি কিন্তু ঠাকুরের কথাগুলি শুনে ভাবলুম—পাছে আমি ওঁর (ঠাকুরের) কাছে আর না আসি, তাই এই সব বলছেন। আমার বরাবরই আপনাকে বড় বুদ্ধিমান বলে ধারণা, কাজেই বুদ্ধির দৌড়ে ঐরূপ ভাবলুম আর কি! আমি তাঁর কাছে আসি বা না-ই আসি তাতে তাঁর (ঠাকুরের) যে কিছুই লাভ-লোকসান নাই—একথা তখন মনেও এল না! এমন পাজি সন্দিগ্ধ মন ছিল! ঠাকুরের কৃপার শেষ নাই, তাই এত

সব অন্যায় ভাব মনে এনেও স্থান পেয়েছিলাম। তারপর ভাবলুম —উনি (ঠাকুর) যা বলেছেন, তা করেই দেখি না কেন—কি হয়? এই বলে একমনে খুব হরিনাম করতে লাগলুম। আর বাস্তবিকই অল্পদিনেই, ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ ফল পেতে লাগলুম।"

৪র্থ দৃষ্টান্ত—মণিমোহনের আত্মীয়ার কথা

এইরূপে সকলের সকল অবস্থা ও ভাব ধরিবার কথার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সিঁদুরিয়াপটির মল্লিকমহাশয়ের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার ভক্তিমতী জনৈকা আত্মীয়াও ঠাকুরের নিকট যাওয়া-আসা করিতেন। একদিন আসিয়া তিনি বিশেষ কাতরভাবে জানাইলেন যে, ভগবানের ধ্যান করিতে বসিলে সংসারের চিন্তা, এর কথা, তার মুখ ইত্যাদি মনে পড়িয়া বড়ই অশান্তি আসে। ঠাকুর অমনি তাঁর ভাব ধরিলেন; বুঝিলেন, ইনি কাহাকেও ভালবাসেন—যাহার কথা ও মুখ মনে পড়ে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার মুখ মনে পড়ে গো? সংসারে কাকে ভালবাস বল দেখি?" তিনি উত্তর করিলেন, "একটি ছোট ভ্রাতুষ্পুত্রকে"—যাহাকে তিনি মানুষ করিতেছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "বেশ তো, তার জন্য যা কিছু করবে, তাকে খাওয়ান-পরান ইত্যাদি সব, গোপাল ভেবে করো। যেন গোপাল-রূপী ভগবান তার ভেতরে রয়েছেন—তুমি তাঁকেই খাওয়াচ্ছ, পরাচ্ছ, সেবা করচ—এই রকম ভাব নিয়ে করো। মানুষের করচি ভাববি কেন গো? যেমন ভাব তেমন লাভ।" শুনিতে পাই ঐরূপ করার ফলে অল্পদিনেই তাঁহার বিশেষ মানসিক উন্নতি, এমন কি ভাবসমাধি পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

ঠাকুরের নিজের পুরুষ শরীর ছিল, সেজন্ত তাঁহার পুরুষের ভাব বুঝা ও ধরাটা কতক বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু স্ত্রীজাতি—কোমলতা, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি মনোভাবের জন্য ভগবান যাহাদের পুরুষ অপেক্ষা একটা অঙ্গই অধিক দিয়াছেন—তাহাদের সকল ভাব ঠাকুর কি করিয়া ঠিক ঠিক ধরিতেন, তাহা ভাবিলে আর আশ্চর্য্যের সীমা থাকে না। ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তেরা বলেন, "ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলিয়াই অনেক সময় মনে হইত না। মনে হইত—যেন আমাদেরই একজন। সেজন্য পুরুষের নিকটে আমাদের যেমন সঙ্কোচ-লজ্জা আসে, ঠাকুরের নিকটে তাহার কিছুই আসিত না। যদি বা কখন আসিত তো তৎক্ষণাৎ আবার ভুলিয়া যাইতাম ও আবার নিঃসঙ্কোচে মনের কথা খুলিয়া বলিতাম।"

ঠাকুরের স্ত্রী-জাতির সর্ব্বপ্রকার মনোভাব ধরিবার ক্ষমতা

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখী বা দাসী আমি'—এই ভাবনা দীর্ঘকাল ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া তন্ময় হইয়া 'পুরুষ আমি' এ ভাবটি ঠাকুর একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই কি ঐরূপ হইত? পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন, 'তোমার মন হইতে হিংসা যদি একেবারে ত্যাগ হয়, তো মানুষের ত কথাই নাই, জগতে কেহই—বাঘ সাপ প্রভৃতিও—তোমাকে আর হিংসা করিবে না। তোমাকে দেখিয়া তাহাদের মনে হিংসা-প্রবৃত্তিরই উদয় হইবে না।' হিংসার ন্যায় কাম ক্রোধাদি অন্য সকল বিষয়েও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। পুরাণে এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি বলিলেই চলিবে। মায়াহীন নিষ্কলঙ্ক যুবক শুক ভগবদ্‌ভাবে অহরহঃ

উহার কারণ

নিমগ্ন থাকিয়া সংসার ছাড়িয়া যাইতেছেন, আর বৃদ্ধ পিতা ব্যাস পুত্রমায়ায় অন্ধ হইয়া 'কোথা যাও, কোথা যাও' বলিতে বলিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন। পথিমধ্যে সরোবর-তীরে বস্ত্র রাখিয়া অপ্সরাগণ স্নান করিতেছিলেন। শুককে দেখিয়া তাঁহাদের মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জার উদয় হইল না—যেমন স্নান করিতে-ছিলেন তেমনই করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাস তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিলেন! ব্যাস ভাবিলেন—'এতো বেশ! আমার যুবক পুত্র অগ্রে যাইল, তাহাতে কেহ একটু নড়িলও না, আর আমি বৃদ্ধ, আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা!' কারণ-জিজ্ঞাসায় রমণীরা বলিলেন, "শুক এত পবিত্র যে 'তিনি আত্মা' এই চিন্তাই তাঁহার সর্ব্বক্ষণ রহিয়াছে। তাঁহার নিজের স্ত্রীশরীর কি পুরুষশরীর সে বিষয়ে আদৌ হুঁশই নাই। কাজেই তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা আসিল না। আর তুমি বৃদ্ধ, রমণীর হাবভাব কটাক্ষের অনেক পরিচয় পাইয়াছ ও রূপ-লাবণ্যের অনেক বর্ণনাও করিয়াছ; তোমার শুকের মত স্ত্রীপুরুষে আত্মদৃষ্টি নাই এবং হইবেও না, কাজেই তোমাকে দেখিয়া আমাদের পুরুষবুদ্ধির উদয় হইয়া সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আসিল।"

স্ত্রীজাতির ঠাকুরের নিকট সর্ব্বথা নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের কারণ

ঠাকুরের সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাই মনে হয়। তাঁহার জ্বলন্ত আত্মজ্ঞান ও স্ত্রী-পুরুষ সকলের ভিতর, সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি তাঁহার নিকটে যতক্ষণ থাকা যাইত ততক্ষণ সকলের মন এত উচ্চে উঠাইয়া রাখিত যে, 'আমি পুরুষ', 'উনি স্ত্রী'—এসকল ভাব অনেক সময়ে মনেই উঠিত না। কাজেই পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতিরও

তাঁহার নিকট সঙ্কোচাদি না হইবারই কথা। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের সংসর্গে ঐ আত্মদৃষ্টি তাঁহাদের ভিতর তৎকালে এত বদ্ধমূল হইয়া যাইত যে, যে-সকল কাজকে মেয়েরা অসীম সাহসের কাজ বলেন ও কখনও কাহারও দ্বারা আদিষ্ট হইয়া করিতে পারেন না, ঠাকুরের কথায় সেই-সকল কাজ অবাধে অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া আসিতেন! সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রীলোক যাঁহারা গাড়ী-পাল্কী ভিন্ন কোথাও কখন গমনাগমন করিতেন না, ঠাকুরের আজ্ঞায় তাঁহারাও কখন কখন তাঁহার সহিত দিনের বেলায় পদব্রজে সদর রাস্তা দিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অনায়াসে হাঁটিয়া আসিয়া নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গমন করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, সেখানে যাইয়া হয়ত আবার ঠাকুরের আজ্ঞায় নিকটস্থ বাজার হইতে বাজার করিয়া আনিয়াছেন এবং সন্ধ্যার সময় পুনরায় হাঁটিয়া কলিকাতায় নিজ বাড়ীতে ফিরিয়াছেন। ঐ বিষয়ে দু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিলেই কথাটি বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

ঐ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ভাদ্র বা আশ্বিন মাস, শ্রীশ্রীমা তখন পিত্রালয় জয়রামবাটীতে গিযাছেন। শ্রীযুত বলরাম বসু তাঁহার পিতার সহিত বৃন্দাবন গিয়াছেন। সঙ্গে শ্রীযুত রাখাল (ব্রহ্মানন্দ স্বামীজি), শ্রীযুত গোপাল (অদ্বৈতানন্দ স্বামী) প্রভৃতি ও অন্যান্য অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ গিয়াছেন। বাগবাজারের একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রীলোকের—যিনি ঠাকুরকে কখন দেখেন নাই, কথামাত্রই শুনিয়াছেন—ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল; পরিচিতা

আর একটি স্ত্রীলোককে ঐ কথা বলিলেন। পরিচিতা স্ত্রী-ভক্তটি দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঠাকুরের নিকট যাওয়া-আসা করিতেছেন, সেজন্যই তাঁহাকে বলা। পরামর্শ স্থির হইল; পরদিন অপরাহ্ণে নৌকায় করিয়া উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। দেখিলেন—ঠাকুরের ঘরের দ্বার রুদ্ধ। ঘরের উত্তরের দেয়ালে দুটি ফোকর আছে, তাহার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন—ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। কাজেই নহবতে, যেখানে শ্রীশ্রীমা থাকিতেন, গিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু পরেই ঠাকুর উঠিলেন এবং উত্তরের দরজা খুলিয়া নহবতের দ্বিতলের বারাণ্ডায় তাঁহারা বসিয়া আছেন দেখিতে পাইয়া "ওগো, তোরা এখানে আয়" বলিয়া ডাকিলেন। স্ত্রী-ভক্তেরা আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর তক্তা হইতে নামিয়া পরিচিতা স্ত্রী-ভক্তটির নিকট যাইয়া বসিলেন। তিনি তাহাতে সঙ্কুচিতা হইয়া সরিয়া বসিবার উপক্রম করিলে ঠাকুর বলিলেন, "লজ্জা কি গো? লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে নয়। (হাত নাড়িয়া) তোরাও যা, আমিও তাই। তবে (দাড়ির চুলগুলি দেখাইয়া) এইগুলি আছে বলে লজ্জা হচ্ছে—না?"

এই বলিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ পাড়িয়া নানা কথার উপদেশ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী-ভক্তেরাও স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ ভুলিয়া যাইয়া নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিতে ও শুনিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বিদায়কালে ঠাকুর বলিলেন, "সপ্তাহে একবার করে আসবে। নূতন নূতন এখানে আসা-যাওয়াটা বেশী রাখতে হয়।" আবার সম্ভ্রান্তবংশীয়া হইলেও গরীব দেখিয়া নৌকা বা

গাড়ীর ভাড়া নিত্য নিত্য কোথা পাইবেন ভাবিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, "আসবার সময় তিন-চার জনে মিলে নৌকায় করে আস্‌বে। আর যাবার সময় এখান থেকে হেঁটে বরানগরে গিয়ে 'সেয়ারে' গাড়ী করবে।" বলা বাহুল্য, স্ত্রী-ভক্তেরা তদবধি তাহাই করিতে লাগিলেন।

ঐ সম্বন্ধে ২য় দৃষ্টান্ত

আর একজন আমাদের একদিন বলিয়াছিলেন—"ভোলা ময়রার দোকানে বেশ সর করেছিল। ঠাকুর সর খেতে ভাল-বাসতেন জানতুম, তাই বড় একখানি সর কিনে আমরা পাঁচজনে মিলে নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। ও মা, এসেই শুনলুম কলিকাতায় গিয়াছেন! সকলে তো একেবারে বসে পড়লুম। কি হবে? রামলাল দাদা ছিলেন—তাঁকে ঠাকুর কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায় বলে দিলেন, 'কম্বুলেটোলায় মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে।' অ—র মা শুনে বললে, 'সে বাড়ী আমি জানি, আমার বাপের বাড়ীর কাছে—যাবি? চল্ যাই; এখানে বসে আর কি করব?' সকলেই তাই মত করলে। রামলাল দাদার হাতে সরখানি দিয়ে বলে গেলুম, 'ঠাকুর এলে দিও।' নৌকা তো ছেড়ে দিয়েছিলুম—হেঁটে হেঁটেই সকলে চললুম। কিন্তু এমনি ঠাকুরের ইচ্ছে, আলমবাজারটুকু গিয়েই একখানা ফেরতা গাড়ী পাওয়া গেল। ভাড়া করে তো শ্যামপুকুরে সব এলুম। এসে আবার বিপদ। অ—র মা বাড়ী চিনতে পারলে না। শেষে ঘুরে ঘুরে তার বাপের বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে একটা চাকরকে ডেকে আন্‌লে। সে সঙ্গে এসে দেখিয়ে দেয়, তবে

হয়! অ—র মা'রই বা দোষ দেব কি, আমাদের চেয়ে ৩।৪ বছরের ছোট তো? তখন ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের হবে। বৌ মানুষ, রাস্তাঘাটে কখনও বেরোয় নি, আর গলির ভেতরে বাড়ী[১]—সে চিনবেই বা কেমন করে গা?

"যা হোক করে তো পৌঁছুলুম। তখন মাষ্টারদের (পরিবারের) সঙ্গেও চেনাশুনা হয় নি। বাড়ী ঢুকে দেখি একখানি ছোট ঘরে তক্তাপোশের ওপর ঠাকুর বসে, কাছে কেউ নাই। আমাদের দেখেই হেসে বলে উঠলেন, 'তোরা এখানে কেমন করে এলি গো?' আমরা তাঁকে প্রণাম করে সব কথা বললুম। তিনি খুব খুশী, ঘরের ভেতর বসতে বললেন, আর অনেক কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন। এখন সকলে বলে, মেয়েদের তিনি ছুঁতে দিতেন না—কাছে যেতে দিতেন না! আমরা শুনে হাসি ও মনে করি—তবু আমরা এখনও মরি নি! তাঁর যে কি দয়া ছিল, তা কে জান্‌বে! স্ত্রী-পুরুষে সমান ভাব! তবে স্ত্রীলোকের হাওয়া অনেকক্ষণ সহ্য করতে পারতেন না, অনেকক্ষণ থাকলে বলতেন, 'যা গো' এইবার একবার মন্দিরে দর্শন করে আয়।' পুরুষদেরও ঐরূপ বল্‌তে আমরা শুনেছি।

"যা'ক্। আমরা তো বসে কথা কইছি। আমাদের ভেতর যে দুজনের বেশী বয়েস ছিল তারা দরজার সামনেই বসেছে,

১ ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—যিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রকাশ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন—তখন কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলায় একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতেন।

আর আমরা তিন জনে ঘরের ভেতর, এককোণে; এমন সময়ে ঠাকুর যাকে 'মোটা বামুন' বল্‌তেন (শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) তিনি এসে উপস্থিত। বেরিয়ে যাব—তারও জো নেই! কোথায় যাই! বুড়ীরা দরজার সামনেই একটা জানালা ছিল তাইতে বসে রইল। আর আমরা তিনটেয় ঠাকুর যে তক্তাপোশে বসেছিলেন তার নীচে ঢুকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে রইলুম! মশার কামড়ে সর্ব্বাঙ্গ ফুলে উঠলো, কি করি—নড়বার জো নেই, স্থির হয়ে পড়ে রইলুম। কথাবার্ত্তা কয়ে বামুন প্রায় এক ঘণ্টা বাদে চলে গেল, তখন বেরুই আর হাসি!

"তারপর বাড়ীর ভেতর জল খাবার জন্য ঠাকুরকে নিয়ে গেল। তখন তাঁর সঙ্গে—বাড়ীর ভেতর গেলুম। তারপর খেয়ে-দেয়ে কতক্ষণ বাদে ঠাকুর গাড়ীতে উঠলেন (দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন বলিয়া); তখন সকলে হেঁটে বাড়ী ফিরি। রাত তখন ৯টা হবে।

স্ত্রী-ভক্তদিগের প্রতি ঠাকুরের সমান কৃপা

"তার পরদিন আবার দক্ষিণেশ্বরে গেলুম। যাবামাত্র ঠাকুর কাছে এসে বল্লেন, 'ওগো, তোমার সর প্রায় সবটা খেয়েছিলুম, একটু বাকি ছিল; কোন অসুখ করে নি, পেটটা একটু সামান্য গরম হয়েছে।' আমি তো শুনে অবাক! তাঁর পেটে কিছু সয় না, আর একখানা সর তিনি একেবারে খেয়েছেন! তারপর শুন্‌লুম—ভাবাবস্থায় খেয়েছেন। শুন্‌লুম—মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ী থেকে ঠাকুর খেয়ে-দেয়ে তো রাত্রি সাড়ে দশটায় এসে

পৌঁছুলেন ; এসে খানিক বাদে তাঁর ভাব হয় ও অর্দ্ধবাহ্য দশায় রামলাল দাদাকে বলেন, 'বড় ক্ষুধা পেয়েছে, ঘরে কি আছে দে ত রে।' রামলাল দাদা শুনে আমার সেই সরখানি এনে সামনে দেন ও ঠাকুর তা প্রায় সব খেয়ে ফেলেন! ভাবের ঘোরে তাঁর কখন কখন অমন অসম্ভব খাওয়াও খেয়ে হজম করার কথা মা-র কাছে ও লক্ষ্মীদিদির কাছে শুনেছিলুম, সেই সব কথা মনে পড়্‌ল। এত কৃপা আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি! সে যে কি দয়া, তা বলে বোঝাবার নয়! আর সে কি টান! কেমন করে যে আমরা সব যেতুম, করতুম—তা আমরাই জানি না, বুঝি না। কই—এখন তো আর সে রকম করে কোথাও হেঁটে বলা নেই কওয়া নেই অচেনা লোকের বাড়ীতে সাধু দেখতে বা ধর্ম্মকথা শুনতে যেতে পারি না! সে যার শক্তিতে করতুম তাঁব সঙ্গে গিয়েছে! তাঁকে হারিয়ে এখনও কেন যে বেঁচে আছি, তা জানি না!"

এইরূপ আরও কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা কখনও বাটীর বাহির হন নাই—তাঁহাদের দিয়া বাজার করাইয়া আনিয়াছেন, অভিমান অহঙ্কার দূরে যাইবে বলিয়া সাধারণ ভিখারীর ন্যায় লোকের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করাইয়াছেন, সঙ্গে লইয়া পেনেটির মহোৎসব ইত্যাদি দেখাইয়া আনিয়াছেন—আর তাঁহারাও মনে কোন দ্বিধা না করিয়া মহানন্দে যাহা ঠাকুর বলিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন! ভাবিয়া দেখিলে ইহা একটি কম ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না; সে প্রবল জ্ঞানতরঙ্গের সম্মুখে সকলেরই ভেদজ্ঞানপ্রসূত দ্বিধাভাব তখনকার মত ভাসিয়া

গিয়াছে। সে উজ্জ্বল ভাবঘনতনু ঠাকুরের ভিতর সকলেই নিজ নিজ ভাবের পূর্ণাদর্শ দেখিতে পাইয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে। পুরুষ পুরুষত্বের পূর্ণবিকাশ দেখিয়া নতশির হইয়াছে; স্ত্রী স্ত্রীজনসুলভ সকল ভাবের বিকাশ তাঁহাতে দেখিতে পাইয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার জ্ঞান করিয়াছে।

ঠাকুরের স্ত্রীসুলভ হাবভাবের অনুকরণ

স্ত্রীজাতিসুলভ হাবভাবাদি ঠাকুর কখন কখন আমাদের সাক্ষাতে নকল করিতেন। উহা এত ঠিক ঠিক হইত যে, আমরা অবাক হইতাম। জনৈকা স্ত্রী-ভক্ত ঐ সম্বন্ধে একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, ঠাকুর একদিন তাঁহাদের সামনে স্ত্রীলোকেরা পুরুষ দেখিলে যেরূপ হাবভাব করে তাহা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন—"সে মাথায় কাপড় টানা, কানের পাশে চুল সরিয়ে দেওয়া, বুকে কাপড় টানা, ঢং করে নানারূপ কথা কওয়া—একেবারে হুবহু ঠিক। দেখে আমরা হাস্‌তে লাগলুম, কিন্তু মনে মনে লজ্জা আর কষ্টও হল যে, ঠাকুর মেয়েদের এই রকম করে হেয় জ্ঞান কর্‌চেন। ভাব্‌লুম—কেন, সকল স্ত্রীলোকেরাই কি ওই রকম? হাজার হোক আমরা মেয়ে কিনা, মেয়েদের ওরকম করে কেউ ব্যাখ্যানা করলে মনে কষ্ট হতেই পারে। ওমা, ঠাকুর অমনি আমাদের মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরেছেন। আর বল্‌ছেন, 'ওগো, তোদের বল্‌চি না। তোরা তো অবিদ্যাশক্তি নোস্; ওসব অবিদ্যাশক্তিগুলো করে!'"

ঠাকুরের স্ত্রী-পুরুষ উভয় ভাবের এইরূপ একত্র সমাবেশ তাঁহার প্রত্যেক ভক্তই কিছু-না-কিছু উপলব্ধি করিয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঐরূপ উপলব্ধি করিয়া একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলেন, 'মশাই, অপনি পুরুষ না প্রকৃতি?' ঠাকুর হাসিয়া তদুত্তরে বলিলেন, "জানি না।" ঠাকুর ঐ কথাটি আত্মজ্ঞ পুরুষেরা যেমন বলেন, 'আমি পুরুষও নহি, স্ত্রীও নহি'—সেইভাবে বলিলেন, অথবা নিজের ভিতর উভয় ভাবের সমান সমাবেশ দেখিয়া বলিলেন, সে কথা এখন কে মীমাংসা করিবে?

ঠাকুরে স্ত্রী-পুরুষ উভয় ভাবের একত্র সমাবেশ

এইরূপে ভাবময় ঠাকুর ভাবমুখে থাকিয়া স্ত্রীর কাছে স্ত্রী ও পুরুষের কাছে পুরুষ হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের সকল ভাব ঠিক ঠিক ধরিতেন। আমাদের কাহারও কাহারও কাছে একথা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরম ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রীভক্ত[১] আমাদিগকে বলিয়াছেন, ঠাকুর তাঁহাকে একদিন বলিতেছেন, "লোকের দিকে চেয়েই—কে কেমন বুঝতে পারি; কে ভাল কে মন্দ, কে সুজন্মা কে বেজন্মা, কে জ্ঞানী কে ভক্ত, কার হবে (ধর্ম্মলাভ)—কার হবে না—সব জানতে পারি; কিন্তু বলি না—তাদের মনে কষ্ট হবে, তাই!" ভাবমুখে থাকায় সমগ্র জগৎটাই তাঁহার নিকট সদা সর্ব্বক্ষণ ভাবময় বলিয়াই প্রতীত হইত। বোধ হইত—স্ত্রী-পুরুষ, গরু-ঘোড়া, কাঠ-মাটি সকলই যেন বিরাট মনে এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমষ্টিরূপে

ভাবমুখে থাকাতেই ঠাকুর সকলের ভাব বুঝিতে সমর্থ হইতেন

১ স্বামী প্রেমানন্দজীর মাতাঠাকুরাণী

উঠিতেছে, ভাসিতেছে—আর ঐ ভাবাবরণের ভিতর দিয়া অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদাকাশ কোথাও অল্প, কোথাও অধিক পরিমাণে প্রকাশিত রহিয়াছে; আবার কোথাও বা আবরণের নিবিড়তায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। আনন্দময়ীর নিষ্কলঙ্ক মানসপুত্র ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে স্বেচ্ছায় শরীর-মন, চিত্তবৃত্তি, সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সমাধিবলে অশরীরী আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় পৌঁছিয়া জগন্মাতার অন্যরূপ ইচ্ছা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহারই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় লীন আপনার মনকে জোর করিয়া আবার বিদ্যার আবরণে আবরিত করিয়া নিয়ত মা-র আদেশ পালন করিতে থাকিলেন। অনন্তভাবময়ী জগজ্জননীও ঠাকুরের প্রতি প্রসন্না হইয়া ঠাকুরকে শরীরী করিয়া রাখিয়াও একত্বের এত উচ্চপদে তাঁহার মনটি সর্ব্বক্ষণ রাখিয়া দিলেন যে, অনন্ত বিরাট মনে যতকিছু ভাবের উদয় হইতেছে, তৎসকলই সেখান হইতে তাঁহার নিজস্ব বলিয়া সর্ব্বকালে অনুভূত হইত এবং এতদূর আয়ত্তীভূত হইয়া থাকিত যে, দেখিলেই মনে হইত—যিনি মাতা তিনিই সন্তান এবং যিনি সন্তান তিনিই মাতা—'*চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম!*'

আমরা যতটুকু বলিতে পারিলাম বলিলাম; পাঠক, এইবার তুমি ভাবিয়া দেখ অনন্তভাবরূপী এ ঠাকুর কে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

—গীতা, ১৮।৬৪

ঠাকুরের আবির্ভাব বা প্রকাশের পূর্ব্বে কলিকাতায় শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলেই যে ভাব সমাধি বা আধ্যাত্মিক রাজ্যের অপূর্ব্ব দর্শন ও উপলব্ধিসমূহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অশিক্ষিত জনসাধারণের ঐ সম্বন্ধে ভয়-বিস্ময়-সম্ভূত একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল এবং নবীন শিক্ষিতসম্প্রদায় তখন ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত বিদেশী শিক্ষার স্রোতে সম্পূর্ণরূপে অঙ্গ ঢালিয়া ঐরূপ দর্শনাদি হওয়া অসম্ভব বা মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত বলিয়া মনে করিতেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের ভাবসমাধি হইতে উৎপন্ন শারীরিক বিকারসমূহ তাঁহাদের নয়নে মূর্চ্ছা ও শারীরিক রোগবিশেষ বলিয়াই প্রতিভাত হইত। বর্ত্তমান কালে ঐ অবস্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইলেও ভাব এবং সমাধি-রহস্য যথাযথ বুঝিতে এখনও অতি অল্প লোকেই সক্ষম। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবমুখাবস্থা কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিতে হইলে সমাধিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকার

নিতান্ত প্রয়োজন। সেজন্য ঐ বিষয়েরই কিছু-কিছু আমরা এখন পাঠককে বুঝাইবার প্রয়াস পাইব।

সাধারণ মানবে যাহা উপলব্ধি করে না তাহাকেই আমরা সচরাচর 'বিকার' বলিয়া থাকি। ধর্ম্মজগতের সূক্ষ্ম উপলব্ধি-সমূহ কিন্তু কখনই সাধারণ মানবমনের অনুভবের বিষয় হইতে পারে না; উহাতে শিক্ষা, দীক্ষা ও নিরন্তর অভ্যাসাদির প্রয়োজন। ঐ সকল অসাধারণ দর্শন ও অনুভবাদি সাধককে দিন দিন পবিত্র করে ও নিত্য নূতন বলে বলীয়ান এবং নব নব ভাবে পূর্ণ করিয়া ক্রমে চিরশান্তির অধিকারী করে। অতএব ঐ সকল দর্শনাদিকে 'বিকার' বলা যুক্তিসঙ্গত কি? 'বিকার' মাত্রই যে মানবকে দুর্ব্বল করে ও তাহার বুদ্ধি-শুদ্ধি হ্রাস করে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ধর্ম্মজগতের দর্শনানুভূতিসকলের ফল যখন উহার সম্পূর্ণ বিপরীত তখন ঐ সকলের কারণও সম্পূর্ণ বিপরীত বলিতে হইবে এবং তজ্জন্য ঐ সকলকে মস্তিষ্ক-বিকার বা রোগ কখনও বলা চলে না।

সমাধি মস্তিষ্ক-বিকার নহে

বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মানুভূতিসকল ঐরূপ দর্শনাদি দ্বারাই চিরকাল অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। তবে যতক্ষণ না মনের সকল বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া মানব নির্ব্বিকল্প অবস্থায় উপনীত ও অদ্বৈতভাবে অবস্থিত হয়, ততক্ষণ সে আধ্যাত্মিক জগতের চিরশান্তির অধিকারী হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন—"একটা কাঁটা ফুটেছে, আর একটা কাঁটা দিয়ে পূর্ব্বের সেই

সমাধি দ্বারাই ধর্ম্মলাভ হয় ও চিরশান্তি পাওয়া যায়

কাঁটাটা তুলে ফেলে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।" শ্রীভগবানকে ভুলিয়া এই জগৎ-রূপ বিকার উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল নানা রূপ-রসাদির অনুভবরূপ বিকার ধর্ম্মজগতের পূর্ব্বোক্ত দর্শনানুভবাদির দ্বারা প্রতিহত হইয়া মানবকে ক্রমশঃ ঐ অদ্বৈতানুভূতিতে উপস্থিত করে। তখন 'রসো বৈ সঃ'—এই ঋষিবাক্যের উপলব্ধি হইয়া মানব ধন্য হয়; ইহাই প্রণালী। ধর্ম্ম-জগতের যত কিছু মত, অনুভব, দর্শনাদি সব ঐ লক্ষ্যেই মানবকে অগ্রসর করে। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজি ঐ সকল দর্শনাদিকে সাধক লক্ষ্যাভিমুখে কতদূর অগ্রসর হইল তাহারই পরিচায়ক-স্বরূপ (mile-stones on the way to progress) বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। অতএব পাঠক যেন না মনে করেন, ভাব-বিশেষের কিঞ্চিৎ প্রাবল্যে অথবা ধ্যানসহায়ে দুই-একটি দেবমূর্ত্তি-দর্শনাদিতেই ধর্ম্মের 'ইতি' হইল; তাহা হইলে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। সাধকেরা ধর্ম্মজগতে ঐরূপ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াই লক্ষ্য হারাইয়া থাকেন এবং লক্ষ্য হারাইয়া একদেশীভাবাপন্ন হইয়া পরস্পরের প্রতি দ্বেষ, হিংসাদিতে পূর্ণ হইয়া পড়েন। শ্রীভগবানে ভক্তি করিতে যাইয়া ঐ ভ্রম উপস্থিত হইলেই মানুষ 'গোঁড়া' 'একঘেয়ে' হয়। ঐ দোষই ভক্তি-পথের বিষম কণ্টক-স্বরূপ এবং মানবের 'হীনবুদ্ধি'-প্রসূত।

আবার ঐরূপ দর্শনাদিতে বিশ্বাসী হইয়া অনেকে বুঝিয়া বসেন, যাহার ঐরূপ দর্শনাদি হয় নাই সে আর ধার্ম্মিক নহে। ধর্ম্ম ও লক্ষ্য-বিহীন অদ্ভুতদর্শন-পিপাসা (miracle-mongering) তাঁহাদের নিকট একই ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু

ঐরূপ পিপাসায় ধর্ম্মলাভ না হইয়া মানব দিন দিন সকল বিষয়ে দুর্ব্বলই হইয়া পড়ে। যাহাতে একনিষ্ঠ বুদ্ধি ও চরিত্রবল না আসে, যাহাতে মানব পবিত্রতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াইয়া সত্যের জন্য সমগ্র জগৎকে তুচ্ছ করিতে না পারে, যাহাতে কামগন্ধহীন না হইয়া মানব দিন দিন নানা বাসনা-কামনায় জড়ীভূত হয়, তাহা ধর্ম্মরাজ্যের বহির্ভূত। অপূর্ব্ব দর্শনাদি যদি তোমার জীবনে ঐরূপ ফল প্রসব না করিয়া থাকে, অথচ দর্শনাদিও হইতে থাকে, তবে জানিতে হইবে—তুমি এখনও ধর্ম্মরাজ্যের বাহিরে রহিয়াছ, তোমার ঐ সকল দর্শনাদি মস্তিষ্ক-বিকারজনিত, উহার কোন মূল্য নাই। আর যদি অপূর্ব্ব দর্শনাদি না করিয়াও তুমি ঐরূপ বলে বলীয়ান হইতেছ দেখ, তবে বুঝিবে তুমি ঠিক পথে চলিয়াছ, কালে যথার্থ দর্শনাদিও তোমার উপস্থিত হইবে।

দেবমূর্ত্ত্যাদি-দর্শন না হইলেই যে ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হওয়া যায় না, তাহা নহে

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের মধ্যে অনেকের ভাবসমাধি হইতেছে অথচ তাঁহার অনেকদিন গতায়াত করিয়াও ওরূপ কিছু হইল না দেখিয়া আমাদের জনৈক বন্ধু[১] কোন সময়ে বিশেষ ব্যাকুল হন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট সজলনয়নে উপস্থিত হইয়া প্রাণের কাতরতা নিবেদন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন, "তুই ছোঁড়া ত

ত্যাগ, বিশ্বাস এবং চরিত্রের বলই ধর্ম্ম-লাভের পরিচায়ক

১ শ্রীযুত গোপালচন্দ্র ঘোষ

ভারি বোকা, ভাবচিস্ বুঝি ঐটে হলেই সব হল? ঐটেই ভারি বড়? ঠিক ত্যাগ, বিশ্বাস ওর চেয়ে ঢের বড় জিনিস জান্‌বি। নরেন্দরের (স্বামী বিবেকানন্দের) ত ওসব বড় একটা হয় না; কিন্তু দেখ দেখি—তার কি ত্যাগ, কি বিশ্বাস, কি মনের তেজ ও নিষ্ঠা!"

'পাকা আমি' ও শুদ্ধ বাসনা। জীবন্মুক্ত, আধিকারিক বা ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি

একনিষ্ঠ বুদ্ধি, দৃঢ় বিশ্বাস ও ঐকান্তিক ভক্তিসহায়ে সাধকের যখন বাসনাসমূহ ক্ষীণ হইয়া শ্রীভগবানের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব্বসংস্কারবশে কাহারও কাহারও মনে কখন কখন 'আমি লোক-কল্যাণ সাধন করিব, যাহাতে বহুজন সুখী হইতে পারে তাহা করিব'—এইরূপ শুদ্ধ বাসনার উদয় হইয়া থাকে। ঐ বাসনাবশে সে আর তখন পূর্ণরূপে অদ্বৈতভাবে অবস্থান করিতে পারে না। ঐ উচ্চ ভাবভূমি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র নামিয়া আসিয়া 'আমি, আমার'-রাজ্যে পুনরায় আগমন করে। কিন্তু সে 'আমি' শ্রীভগবানের দাস, সন্তান বা অংশ 'আমি' এইরূপে শ্রীভগবানের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লইয়াই অনুক্ষণ থাকে। সে 'আমি'-দ্বারায় আর অহর্নিশি কাম-কাঞ্চনের সেবা করা চলে না। সে 'আমি' শ্রীভগবানকে সারাৎসার জানিয়া আর সংসারের রূপ-রসাদি-ভোগের জন্য লালায়িত হয় না। যতটুকু রূপ-রসাদিবিষয়-গ্রহণ তাঁহার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সহায়ক, ততটুকুই সে ইচ্ছামত গ্রহণ করিয়া থাকে; এই পর্য্যন্ত। যাঁহারা পূর্ব্বে বদ্ধ ছিলেন, পরে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং

জীবনের অবশিষ্টকাল কোনরূপ ভগবদ্ভাবে কাটাইতেছেন, তাঁহাদিগকেই 'জীবন্মুক্ত' কহে। যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত ঐরূপ বিশিষ্ট সম্বন্ধের ভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এ জন্মে কোন সময়েই সাধারণ মানবের ন্যায় বন্ধনযুক্ত হইয়া পড়েন নাই, তাঁহারাই শাস্ত্রে 'আধিকারিক পুরুষ', 'ঈশ্বরকোটি' বা 'নিত্যমুক্ত' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। আবার একদল সাধক আছেন, যাঁহারা অদ্বৈতভাব লাভ করিবার পরে এ জন্মে বা পরজন্মে সংসারে লোককল্যাণ করিতেও আর ফিরিলেন না, ইঁহারাই 'জীবকোটি' বলিয়া অভিহিত হন এবং ইঁহাদের সংখ্যাই অধিক বলিয়া আমরা গুরুমুখে শ্রুত আছি।

আবার যাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপে অদ্বৈতভাব-লাভের পর লোক-কল্যাণের জন্য সমাধিভূমি হইতে নামিয়া আসেন, সে সকল সাধকদিগের মধ্যেও অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপ জগৎ-কারণের সহিত অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিবার তারতম্য আছে। কেহ ঐ ভাবসমুদ্র দূর হইতে দর্শন করিয়াছেন মাত্র, কেহ বা উহা আরো নিকটে অগ্রসর হইয়া স্পর্শ করিয়াছেন, আবার কেহ বা ঐ সমুদ্রের জল অল্প-স্বল্প পান করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, "দেবর্ষি নারদ দূর হ'তে ঐ সমুদ্র দেখেই ফিরেছেন, শুকদেব তিনবার স্পর্শমাত্র করেছেন, আর জগদ্গুরু শিব তিন গণ্ডূষ জল খেয়ে শব হয়ে পড়ে আছেন!" এই অদ্বৈতভাবে অল্পক্ষণের নিমিত্তও তন্ময় হওয়াকেই 'নির্ব্বিকল্প সমাধি' কহে।

অদ্বৈতভাবোপলব্ধির তারতম্য

অদ্বৈতভাব-উপলব্ধির যেমন তারতম্য আছে, সেইরূপ

নিম্নস্তরের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি ভাব সমূহের অথবা যে ভাবসমূহ অদ্বৈতভাবে সাধককে উপনীত করে সে সকলের উপলব্ধি করিবার মধ্যেও আবার তারতম্য আছে। কেহ বা উহার কোনটি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হন, আবার কেহ বা উহার আভাসমাত্রই পাইয়া থাকেন। এই নিম্নাঙ্গের ভাবসকলের মধ্যে কোন একটির সম্পূর্ণ উপলব্ধিই 'সবিকল্প সমাধি' নামে যোগশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শান্ত, দাস্যাদি ভাবের গভীরতায় সবিকল্প সমাধি

উচ্চাঙ্গের অদ্বৈতভাব বা নিম্নাঙ্গের সবিকল্পভাব—সকল প্রকার ভাবেই সাধকের অপূর্ব্ব শারীরিক পরিবর্ত্তন এবং অদ্ভুত দর্শনাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ শরীরবিকার ও অদ্ভুত দর্শনাদির প্রকার আবার ভিন্ন ভিন্ন জনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে লক্ষিত হয়। কাহারও অল্প উপলব্ধিতেই শারীরিক বিকার ও দর্শনাদি দেখা যায়, আবার কাহারও বা অতি গভীরভাবে ঐসকল ভাবোপলব্ধিতেও শারীরিক বিকার এবং দর্শনাদি অতি অল্পই দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, "গেড়ে ডোবার অল্প জলে যদি দু-একটা হাতী নামে তো জল ওছল্‌-পাছল্‌ হয়ে তোলপাড় হয়ে উঠে; কিন্তু সায়ের দীঘিতে অমন বিশগণ্ডা হাতী নামলেও যেমন জল স্থির তেমনই থাকে।" অতএব শারীরিক বিকার এবং দর্শনাদিই যে ভাবের গভীরতার ধ্রুব লক্ষণ, তাহাও নহে। ভাবের গভীরতার যদি পরিমাণের আবশ্যক হয়,

মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে শারীরিক বিকার অবশ্যম্ভাবী

উচ্চাবচ ভাবসমাধি কিরূপে বুঝা যাইবে

ভবে পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি—নিষ্ঠা, ত্যাগ, চরিত্রবল, বিষয়-কামনার হ্রাস প্রভৃতি দেখিয়াই অনুমান করিতে হইবে। ভাব-সমাধিতে কত খাদ আছে তাহা কেবল ঐ কষ্টিপাথরেই পরীক্ষিত হইতে পারে, নতুবা আর অন্য উপায় নাই। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহারা সকল প্রকার বিষয়বাসনা-বর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরেই কেবল শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর—যে কোন ভাবের যথাযথ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ছবি দেখিতে পাওয়া সম্ভব, যাহারা কামকাঞ্চন-বাসনাবিজড়িত তাহাদের ভিতর নহে। কামান্ধ কামনার টানই বুঝে—কামগন্ধরহিত যে মনের আবেগ, তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে?

ভাবসমাধির দার্শনিক তত্ত্ব শ্রীগুরুর মুখ হইতে আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি। আরও কয়েকটি কথা ঐ সম্বন্ধে এখানে বলা প্রয়োজন—তবেই পাঠক উহা বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন।

সর্ব্বপ্রকার ভাব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে অবতারেরাই সক্ষম। দৃষ্টান্ত—ঠাকুরের সমাধির কথা

সাধকদিগের মধ্যে শান্ত দাস্যাদি ও অদ্বৈত-ভাবোপলব্ধির তারতম্য লক্ষিত হওয়া সম্বন্ধে যেসকল কথা পূর্ব্বে বলা হইল, তাহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, ঈশ্বরাবতারেরাও ভাবরাজ্যে কোনরূপ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকেন। তাঁহারা শান্ত-দাস্যাদি যখন যে ভাব ইচ্ছা পূর্ণমাত্রায় নিজ জীবনে প্রদর্শন করিতে পারেন, আবার অদ্বৈতভাবাবলম্বনে শ্রীভগবানের সহিত একত্বানুভবে এতদূর অগ্রসর হইতে

পারেন যে, জীবন্মুক্ত, নিত্যমুক্ত বা ঈশ্বরকোটি কোনপ্রকার জীবেরই তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপের সহিত অতদূর একত্বে অগ্রসর হইয়া আবার তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়া এবং 'আমি' 'আমার' রাজ্যে পুনরায় নামিয়া আসা জীবের কখনই সম্ভবপর নহে। উহা কেবল একমাত্র অবতারপ্রথিত পুরুষসকলে সম্ভবে। তাঁহাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব উপলব্ধিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াই আধ্যাত্মিক জগতে বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল অনেক স্থলে যে বেদাদিশাস্ত্রনিবদ্ধ উপলব্ধিসকল অতিক্রম করিবে—ইহাতে বিচিত্রতা কি আছে? শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, "এখানকার অবস্থা (আমার উপলব্ধি) বেদ বেদান্তে যা লেখা আছে, সে সকলকে ঢের ছাড়িয়ে চলে গেছে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ শ্রেণীর পুরুষসকলের অগ্রণী ছিলেন বলিয়াই নিরন্তর ছয়মাস কাল অদ্বৈত-ভাবে পূর্ণরূপে অবস্থান করিবার পরেও আবার 'বহুজনহিতায়' 'লোকশিক্ষা'র জন্য 'আমি' 'আমার' রাজ্যে ফিরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে বড় অদ্ভুত কথা। ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাঠককে এখানে বলা অসঙ্গত হইবে না।

বেদান্ত-চর্চ্চা করিতে ব্রাহ্মণীর নিষেধ

শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর ঠাকুরের তৃতীয় দিবসে বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বিকল্প সমাধি বা শ্রীভগবানের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের চরম উপলব্ধি হয়। সে সময় ঠাকুরের তন্ত্রোক্ত সকলপ্রকার সাধন হইয়া গিয়াছে এবং যিনি ঐসকল সাধনায় সময় বৈধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া এবং ঐ

সকল দ্রব্যের ব্যবহারপ্রণালী প্রভৃতি দেখাইয়া তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই বিদুষী ভৈরবীও (ঠাকুর ইঁহাকে আমাদের নিকট 'বাম্‌নী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট বাস করিতেছেন। কারণ ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি, উক্ত 'বাম্‌নী' বা ভৈরবী তাঁহাকে শ্রীমৎ তোতাপুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশামিশি করিতে নিষেধ করিয়া বলিতেন—"বাবা, ওর সঙ্গে অত মেশামিশি করো না, ওদের সব শুক্‌নো ভাব; ওর অত সঙ্গ কর্‌লে তোমার ভাব-প্রেম আর কিছু থাক্‌বে না।" ঠাকুর কিন্তু ঐ কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অহর্নিশ তখন বেদান্ত-বিচার ও উপলব্ধিতে নিমগ্ন থাকিতেন।

ঠাকুরের নির্ব্বিকল্প ভূমিতে সর্ব্বদা থাকিবার সঙ্কল্প ও উক্ত ভূমির স্বরূপ

এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎ তোতাপুরী চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের তখন দৃঢ়সঙ্কল্প হইল—'আমি, আমার' রাজ্যে আর না থাকিয়া নিরন্তর শ্রীভগবানের সহিত একাত্মানুভবে বা অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান করিব। তিনি তদ্রূপ আচরণও করিতে লাগিলেন। সে বড় অপূর্ব্ব কথা! তখন ঠাকুরের শরীরটা যে আছে, সে বিষয়ে আদৌ হুঁশ ছিল না। খাইব, শুইব, শৌচাদি করিব—এসকল কথাও মনে উদিত হইত না, তা অপরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিব, সে তো অনেক দূরের কথা! সে অবস্থায় 'আমি আমার'ও নাই, আর 'তুমি তোমার'ও নাই! 'দুই'ও নাই, 'এক'ও নাই! কারণ 'দুই'-এর স্মৃতি থাকিলে তবে তো 'একের' উপলব্ধি হইবে। সেখানে মনের সব বৃত্তি স্থির—শান্ত। কেবল—

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্
নিরবধিগগনাভং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ ॥
প্রকৃতি-বিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং ।১

*   *   *   *

—কেবল আনন্দ! আনন্দ!—তার দিক্ নাই, দেশ নাই, আলম্বন নাই, রূপ নাই, নাম নাই! কেবল অশরীরী আত্মা আপনার অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় অবস্থায়, মনবুদ্ধির গোচরে অবস্থিত যত প্রকার ভাবরাশি আছে সে সকলের অতীত এক প্রকার ভাবাতীত ভাবে অবস্থিত! যাহাকে শাস্ত্র 'আত্মায় আত্মায় রমণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন!—এইপ্রকার এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থার উপলব্ধিই ঠাকুরের তখন নিরন্তর হইয়াছিল।

ঠাকুরের মনের অদ্ভুত গঠন

ঠাকুর বলিতেন, বেদান্তের নির্ব্বিকল্প সমাধি-উপলব্ধিতে উঠিবার পথে সংসারের কোনও পদার্থ বা কোন সম্বন্ধই তাঁহার অন্তরায় হয় নাই। কারণ পূর্ব্ব হইতেই তো তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্ম সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত যত প্রকার ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। "মা, এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান—এই নে তোর ধর্ম্ম, এই নে তোর অধর্ম্ম—এই নে তোর ভাল, এই নে তোর মন্দ—এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য—এই নে তোর যশ, এই নে তোর অযশ—আমায় তোর শ্রীচরণে

১ বিবেকচূড়ামণি, ৪০৮-৯

শুদ্ধা-ভক্তি দে, দেখা দে”—এই বলিয়া মন হইতে ঠিক ঠিক সকল প্রকার বাসনা কামনা শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভালবাসিয়া তাঁহার জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। হায়, সে একাকী ভক্তি-প্রেমের কথা কি আমরা উপলব্ধি দূরে থাক্, একটু কল্পনাও করিতে পারি? আমরা মুখে যদি কখনও শ্রীভগবানকে বলি, ‘ঠাকুর, এই নাও আমার যাহা কিছু সব’ তো বলিবার পরই আবার কাজের সময় ঠাকুরকে তাড়াইয়া সে সব ‘আমার আমার’ বলিতে থাকি এবং লাভ-লোকসান খতাই! প্রতি কার্য্যে ‘লোকে কি বলবে’ ভাবিয়া নানাপ্রকারে তোলাপাড়া, ছুটাছুটি করি; ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া কখন অকূলপাথারে, আবার কখন বা আনন্দে ভাসি এবং মনে মনে একথা স্থিরনিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছি যে, দুনিয়াটা আমরা আমাদের উদ্যমে একেবারে ওলট্-পালট্ করিয়া না দিতে পারিলেও কতকটাও ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি! ঠাকুরের তো আমাদের মত জুয়াচোর মন ছিল না; তিনি যেমন বলিলেন, “মা, এই তোর দেওয়া জিনিস তুই নে,” অমনি তদ্দণ্ড হইতে তাঁহার মন আর সে সকলের প্রতি লালসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল না! ‘বলে ফেলেছি কি করি? না বল্‌লে হত’—মনের এইরূপ ভাব পর্য্যন্তও তখন হইতে আর উদিত হইল না! সেইজন্যই দেখিতে পাই, ঠাকুর যখনই যাহা শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দিবেন বলিয়াছেন তাহা আর কখনও ‘আমার’ নিজের বলিতে পারেন নাই।

এখানে ঐ বিষয়ে আর একটি কথাও আমরা পাঠককে বলিতে ইচ্ছা করি। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্য-পাপ,

ভাল-মন্দ, যশ-অযশ প্রভৃতি শরীর-মনের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াও 'মা, এই নে তোর সত্য, এই নে তোর মিথ্যা'—এ কথাটি বলিতে পারেন নাই। উহার কারণ ঠাকুর নিজ মুখেই এক সময়ে আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "ঐরূপে সত্য ত্যাগ করিলে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সর্ব্বস্ব যে অর্পণ করিলাম—এ সত্য রাখিব কিরূপে?" বাস্তবিক সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াও কি সত্যনিষ্ঠাই না আমরা তাঁহাতে দেখিয়াছি! যেদিন যেখানে যাইব বলিয়াছেন, সেদিন ঠিক সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন; যাহার নিকট হইতে যে জিনিস লইব বলিয়াছেন, তাহার নিকটে ভিন্ন অপর কাহারও নিকটে তাহা লইতে পারেন নাই। যেদিন বলিয়াছেন আর অমুক জিনিসটা খাইব না, বা অমুক কাজ আর করিব না, সেদিন হইতে আর তাহা খাইতে বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুর বলিতেন, "যার সত্যনিষ্ঠা আছে, সে সত্যের ভগবানকে পায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনও মিথ্যা হতে দেন না।" বাস্তবিকও ঐ বিষয়ের কতই না দৃষ্টান্ত আমরা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি! তাহার মধ্যে কয়েকটি পাঠককে এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠা

দক্ষিণেশ্বরে একদিন পরমা ভক্তিমতী গোপালের মা ঠাকুরকে ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবেন। সব প্রস্তুত; ঠাকুর খাইতে বসিলেন। বসিয়া দেখেন, ভাতগুলি শক্ত রহিয়াছে—সুসিদ্ধ হয় নাই। ঠাকুর বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন, "এ ভাত কি আমি খেতে পারি? ওর

ঐ বিষয়ের ১ম দৃষ্টান্ত

হাতে আর কখনও ভাত খাব না।" ঠাকুরের মুখ দিয়া ঐ কথাগুলি বাহির হওয়ায় সকলে ভাবিলেন, ঠাকুর গোপালের মাকে ভবিষ্যতে সতর্ক করিবার নিমিত্ত ঐরূপ বলিয়া ভয় দেখাইলেন মাত্র, নতুবা গোপালের মাকে যেরূপ আদর-যত্ন করেন, তাহাতে তাঁহার হাতে আর খাইবেন না—ইহা কি হইতে পারে? কিছুক্ষণ বাদেই আবার গোপালের মাকে ক্ষমা করিবেন এবং ঐ কথাগুলির আর কোন উচ্চবাচ্য হইবে না। কিন্তু ফলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। কারণ উহার অল্পকাল পরেই ঠাকুরের গলায় অসুখ হইল। ক্রমে উহা বাড়িয়া ঠাকুরের ভাত খাওয়া বন্ধ হইল এবং গোপালের মা-র হাতে আর একদিনও ভাত খাওয়া হইল না।

ঐ ২য় দৃষ্টান্ত

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভাবাবস্থায় বলিতেছেন, "এর পরে আর কিছু খাব না, কেবল পায়সান্ন, কেবল পায়সান্ন।" শ্রীশ্রীমা ঐ সময়ে ঠাকুরের খাবার লইয়া আসিতেছিলেন। ঐ কথা শুনিতে পাইয়া এবং ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়া যে কথা যখনি নির্গত হয় তাহা কখনই নিরর্থক হয় না জানিয়া, ভয় পাইয়া বলিলেন—"আমি মাছের ঝোল ভাত রেঁধে দেব, খাবে—পায়েস কেন?" ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় বলিয়া উঠিলেন, "না—পায়সান্ন।" তাহার অল্পকাল পরেই ঠাকুরের গলদেশে অসুখ হওয়ায় বাস্তবিকই আর কোনরূপ ব্যঞ্জনাদি খাওয়া চলিল না—কেবল দুধ-ভাত, দুধ-বার্লি ইত্যাদি খাইয়াই কাল কাটিতে লাগিল।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ দানশীল ধনী ৺শম্ভুচন্দ্র মল্লিক মহাশয়কেই

ঠাকুর তাঁহার চারিজন 'রসদ্দারের' ভিতর দ্বিতীয় রসদ্দার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। রাণী রাসমণির কালীবাটীর নিকটেই তাঁহার একখানি বাগান ছিল। উহাতে তিনি ভগবৎ-চর্চ্চায় ঠাকুরের সঙ্গে অনেক কাল কাটাইতেন। ঐ বাগানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি দাতব্য ঔষধালয়ও ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পেটের অসুখ অনেক সময়ই লাগিয়া থাকিত। একদিন ঐরূপ পেটের অসুখের কথা শম্ভু বাবু জানিতে পারিয়া তাঁহাকে একটু আফিম সেবন করিতে ও রাসমণির বাগানে ফিরিবার সময় উহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। ঠাকুরও সে কথায় সম্মত হইলেন। তাহার পর কথাবার্ত্তায় ঐ কথা দুইজনেই ভুলিয়া যাইলেন।

ঐ তৃতীয় দৃষ্টান্ত

শম্ভু বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পথে আসিয়া ঠাকুরের ঐ কথা মনে পড়িল এবং আফিম লইবার জন্য পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শম্ভু বাবু অন্দরে গিয়াছেন। ঠাকুর ঐ বিষয়ের জন্য তাঁহাকে আর না ডাকাইয়া তাঁহার কর্ম্মচারীর নিকট হইতে একটু আফিম চাহিয়া লইয়া রাসমণির বাগানে ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু পথে আসিয়াই ঠাকুরের কেমন একটা ঝোঁক আসিয়া পথ আর দেখিতে পাইলেন না! রাস্তার পাশে যে জলনালা আছে, তাহাতে যেন কে পা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল! ঠাকুর ভাবিলেন—এ কি? এ তো পথ নয়! অথচ পথও খুঁজিয়া পান না। অগত্যা কোনরূপে দিক ভুল হইয়াছে ঠাওরাইয়া পুনরায় শম্ভুবাবুর বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—

জগদম্বা 'বেচালে পা পড়িতে' দেন না

সে দিকের পথ বেশ দেখা যাইতেছে। ভাবিয়া-চিন্তিয়া পুনরায় শম্ভুবাবুর বাগানের ফটকে আসিয়া সেখান হইতে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সাবধানে রাসমণির বাগানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুই-এক পা আসিতে না আসিতে আবার পূর্ব্বের মত হইল—পথ আর দেখিতে পান না! বিপরীত দিকে যাইতে পা টানে! এইরূপ কয়েকবার হইবার পর ঠাকুরের মনে উদয় হইল—"ওঃ, শম্ভু বলিয়াছিল, 'আমার নিকট হইতে আফিম চাহিয়া লইয়া যাইও'; তাহা না করিয়া আমি তাহাকে না বলিয়া তাহার কর্ম্মচারীর নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া যাইতেছি, সেইজন্য মা আমাকে যাইতে দিতেছেন না! শম্ভুর হুকুম ব্যতীত কর্ম্মচারীর দেওয়া উচিত নয়, আর আমারও শম্ভু যেমন বলিয়াছে—তাহার নিকট হইতেই লওয়া উচিত। নহিলে যেভাবে আমি আফিম লইয়া যাইতেছি, উহাতে মিথ্যা ও চুরি এই দুটি দোষ হইতেছে; সেইজন্যই মা আমায় অমন করিয়া ঘুরাইতেছেন, ফিরিয়া যাইতে দিতেছেন না!" এই কথা মনে করিয়া শম্ভু বাবুর ঔষধালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, সে কর্ম্মচারীও সেখানে নাই—সেও আহারাদি করিতে অন্যত্র গিয়াছে। কাজেই জানালা গলাইয়া আফিমের মোড়কটি ঔষধালয়ের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওগো, এই তোমাদের আফিম রহিল।" ইহা বলিয়া রাসমণির বাগানের দিকে চলিলেন। এবার যাইবার সময় আর তেমন ঝোঁক নাই; রাস্তাও বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে; বেশ চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বলিতেন, "মার উপর সম্পূর্ণ ভার

দিয়েছি কিনা?—তাই মা হাত ধরে আছেন। এতটুকু বেচালে পা পড়্‌তে দেন না।” এরূপ কতই না দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের জীবনে শুনিয়াছি! চমৎকার ব্যাপার! আমরা কি এ সত্যনিষ্ঠা, এ সর্ব্বাঙ্গীণ নির্ভরতার এতটুকু কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারি? ইহা কি সেই প্রকারের নির্ভর, ঠাকুর যাহা আমাদিগকে রূপকচ্ছলে বারম্বার বলিতেন?—“ওদেশে (ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরে) মাঠের মাঝে আল্‌পথ আছে। তার উপর দিয়ে সকলে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে যায়। সরু আল্‌পথ—চলে গেলে পাছে পড়ে যায়, সেজন্য বাপ ছোট ছেলেটিকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে; আর বড় ছেলেটি সেয়ানা বলে, নিজেই বাপের হাত ধরে সঙ্গে যাচ্ছে। যেতে যেতে একটা শঙ্খচিল বা আর কিছু দেখে ছেলেগুলো আহ্লাদে হাততালি দিচ্ছে। কোলের ছেলেটি জানে বাপ আমায় ধরে আছে, নির্ভয়ে আনন্দ করতে করতে চলেছে। আর যে ছেলেটা বাপের হাত ধরে যাচ্ছিল, সে যেই পথের কথা ভুলে বাপের হাত ছেড়ে হাততালি দিতে গেছে—আর অমনি টিপ করে পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো! সেই রকম মা যার হাত ধরেছেন, তার আর ভয় নেই; আর যে মার হাত ধরেছে, তার ভয় আছে—হাত ছাড়্‌লেই পড়ে যাবে।”

এইরূপে ঈশ্বরানুরাগের প্রাবল্যে সংসারের কোনও বস্তু বা ব্যক্তির উপর মনের একটা বিশেষ আকর্ষণ বা পশ্চাৎটান ছিল না বলিয়াই নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের পথে সাংসারিক কোনরূপ বাসনা-কামনা ঠাকুরের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই। দাঁড়াইয়াছিল

কেবল ঠাকুর যাঁহাকে এতকাল ভক্তিভরে পূজা করিয়া, ভালবাসিয়া, সারাৎসারা পরাৎপরা বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিতেছিলেন—শ্রীশ্রীজগদম্বার সেই 'সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী' মূর্ত্তি। ঠাকুর বলিতেন, "মন কুড়িয়ে এক করে যাই এনেছি, আর অমনি মা-র মূর্ত্তি এসে সামনে দাঁড়াল! তখন আর তাঁকে ত্যাগ করে তার পারে এগিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না! যতবার মন থেকে সব জিনিস তাড়িয়ে নিরালম্ব হয়ে থাকতে চেষ্টা করি, ততবারই ঐরূপ হয়। শেষে ভেবে চিন্তে মনে খুব জোর এনে, জ্ঞানকে অসি ভেবে, সেই অসি দিয়ে ঐ মূর্ত্তিটাকে মনে মনে দুখানা করে কেটে ফেল্‌লুম! তখন মনে আর কিছুই রহিল না—হু হু করে একেবারে নির্ব্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছুল!" আমাদের কাছে এগুলি যেন অর্থহীন কথার কথা মাত্র। কারণ কখন তো জগদম্বার কোন মূর্ত্তি বা ভাব ঠিক ঠিক আপনার করিয়া লই নাই। কখন তো কাহাকেও সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে শিখি নাই। ঐ প্রকার পূর্ণ ভালবাসা, মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ভালবাসা রহিয়াছে আমাদের এই মাংসপিণ্ড শরীর ও মনের উপর! সেইজন্যই মৃত্যুতে বা মনের হঠাৎ একটা আমূল পরিবর্ত্তনে আমাদের এত ভয় হয়। ঠাকুরের তো তাহা ছিল না। সংসারে একমাত্র জগদম্বার পাদপদ্মই মনে-জ্ঞানে সার জানিয়াছিলেন এবং সেই পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির দিবানিশি সেবা করিয়াই কাল কাটাইতেছিলেন, কাজেই ঐ মূর্ত্তিকে যখন একবার কোন

ঠাকুরের নির্ব্বিকল্প ভূমিতে উঠিবার পথে অন্তরায়

প্রকারে মন হইতে সরাইয়া ফেলিলেন, তখন আর মন কি লইয়া সংসারে থাকিবে। একেবারে আলম্বনহীন হইয়া, বৃত্তিরহিত হইয়া নির্ব্বিকল্প অবস্থায় যাইয়া দাঁড়াইল। পাঠক, এ কথা বুঝিতে না পার, একবার কল্পনা করিতেও চেষ্টা করিও। তাহা হইলেই বুঝিবে, ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে কতদূর আপনার করিয়াছিলেন—কি 'পাঁচসিকে পাঁচআনা' মন দিয়া তিনি জগদম্বাকে ভালবাসিয়াছিলেন!

একুশ দিন যে ভাবে থাকিলে শরীর নষ্ট হয়, সেই ভাবে ছয় মাস থাকা

এই নির্ব্বিকল্প অবস্থায় প্রায় নিরন্তর থাকা ঠাকুরের ছয় মাস কাল ব্যাপিয়া হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, "যে অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পৌঁছুলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিন মাত্র শরীরটে থেকে শুক্‌নো পাতা যেমন গাছ থেকে ঝরে পড়ে তেমনি পড়ে যায়, সেইখানে ছয়মাস ছিলুম! কখন কোন্ দিক দিয়ে যে দিন আস্‌ত, রাত যেত, তার ঠিকানাই হ'ত না। মরা মানুষের নাকে মুখে যেমন মাছি ঢোকে—তেমনি ঢুক্‌তো, কিন্তু সাড় হত না। চুলগুলো ধূলোয় ধূলোয় জটা পাকিয়ে গিয়েছিল! হয়ত অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গেছে, তারও হুঁশ হয় নাই! শরীরটে কি আর থাকৃত?—এই সময়েই যেত। তবে এই সময়ে একজন সাধু এসেছিল। তার হাতে রুলের মত একগাছা লাঠি ছিল। সে অবস্থা দেখেই চিনেছিল; আর বুঝেছিল—এ শরীরটে দিয়ে মা-র অনেক কাজ এখনও বাকি আছে, এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে। তাই খাবার সময় খাবার এনে মেরে মেরে হুঁশ আনবার চেষ্টা করত।

একটু হুঁশ হচ্চে দেখেই মুখে খাবার গুঁজে দিত। এই রকমে কোন দিন একটু আধটু পেটে যেতো, কোন দিন যেতো না। এই ভাবে ছ মাস গেছে! তারপর এই অবস্থার কতদিন পরে শুন্‌তে পেলুম মার কথা—'ভাবমুখে থাক্, লোকশিক্ষার জন্য ভাবমুখে থাক্!' তারপর অসুখ হল—রক্ত-আমাশয়; পেটে খুব মোচড়, খুব যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় প্রায় ছয় মাস ভুগে ভুগে তবে শরীরে একটু একটু করে মন নাব্‌লো—সাধারণ মানুষের মত হুঁশ এলো! নতুবা থাক্‌ত থাক্‌ত মন আপনা-আপনি ছুটে গিয়ে সেই নির্ব্বিকল্প অবস্থায় চলে যেত!"

বাস্তবিক ঠাকুরের শরীরত্যাগের দশ-বার বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহার দর্শনলাভ যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি তখনও ঠাকুরের কথাবার্ত্তা শুনা বড় একটা তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। চব্বিশ ঘণ্টা ভাব-সমাধি লাগিয়াই আছে! কথা কহিবে কে? নেপাল রাজসরকারের কর্ম্মচারী শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়—যাঁহাকে ঠাকুর 'কাপ্তেন' বলিয়া ডাকিতেন—মহাশয়ের মুখে আমরা শুনিয়াছি, তিনি একাদিক্রমে তিন অহো-রাত্র ঠাকুরকে নিরন্তর সমাধিমগ্ন হইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন! তিনি আরও বলিয়াছিলেন, ঐরূপ বহুকালব্যাপী গভীর সমাধির সময় ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে—গ্রীবাদেশ হইতে মেরুদণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত এবং জানু হইতে পদতল পর্য্যন্ত, উপর হইতে নিম্নের দিকে—মধ্যে মধ্যে গব্যঘৃত মালিশ করা হইত এবং ঐরূপ করা হইলে

ঠাকুরের সমাধি সম্বন্ধে 'কাপ্তেনের' কথা

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

সমাধির উচ্চভাবভূমি হইতে 'আমি আমার' রাজ্যে আবার নামিতে ঠাকুরের সুবিধা বোধ হইত।

ঐ সম্বন্ধে ঠাকুরের নিজের কথা

আমাদের নিকট ঠাকুর কতদিন স্বয়ং বলিয়াছেন, "এখানকার মনের স্বাভাবিক গতিই উর্দ্ধদিকে (নির্ব্বিকল্পের দিকে)। সমাধি হলে আর নাম্‌তে চায় না। তোদের জন্য জোর করে নামিয়ে আনি। কোন একটা নীচেকার বাসনা না ধর্‌লে নাম্‌বার ত জোর হয় না, তাই 'তামাক খাব,' 'জল খাব,' 'সুক্তো খাব,' 'অমুককে দেখব,' 'কথা কইব,'—এইরূপ একটা ছোটখাট বাসনা মনে তুলে বার বার সেইটে আওড়াতে আওড়াতে তবে মন ধীরে ধীরে নীচে (শরীরে) নামে। আবার নাম্‌তে নাম্‌তে হয়ত সেই দিকে (উর্দ্ধে) চোঁচা দৌড়ুল। আবার তাকে তখন ঐরূপ বাসনা দিয়ে ধরে নামিয়ে আনতে হয়।" চমৎকার ব্যাপার! শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম, আর ভাবিতাম 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর' এ কথার যদি ঐ মানে হয়, তাহা হইলে এরূপ করা আমাদের জীবনে হইয়াছে আর কি! শরণাগত হইয়া থাকাই দেখিতেছি আমাদের একমাত্র উপায়। ঐরূপ করিতে যাইয়াও কিছুদিন বাদে দেখি বিষম হাঙ্গামা! ঐ পথ আশ্রয় করিতে যাইয়াও দুষ্ট মন মাঝে মাঝে বলিয়া বসে—আমাকে ঠাকুর সকলের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিবেন না কেন? নরেন্দ্রনাথকে যতটা ভালবাসেন আমাকেও ততটা কেন না ভালবাসিবেন? আমি তদপেক্ষা ছোট কিসে? —ইত্যাদি! যাউক এখন সে কথা—আমরা পূর্ব্বানুসরণ করি।

উচ্চাঙ্গের ভাব এবং সমাধিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা ঠাকুরের নিকট হইতে যতদূর বুঝিয়াছি, অতঃপর তাহারই কিছু কিছু পাঠককে বলিয়া 'ভাবমুখ' অবস্থাটা যে কি, তাহাই এখন বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—উচ্চাবচ যে ভাবই মনে আস্থক না কেন, উহার সহিত কোন না কোনপ্রকার শারীরিক পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। ইহা আর বুঝাইতে হয় না—নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। ক্রোধের উদয়ে একপ্রকার, ভালবাসায় অন্য প্রকার—এইরূপ নিত্যানুভূত সাধারণ ভাবসমূহের আলোচনাতেই উহা সহজে বুঝা যায়। আবার সৎ বা অসৎ কোনপ্রকার চিন্তার সবিশেষ আধিক্য কাহারও মনে থাকিলে তাহার শরীরেও এতটা পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তাহাকে দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে—ইহার এইরূপ প্রকৃতি। অমুককে দেখিলেই মনে হয় রাগী, কামুক বা সাধু—এরূপ কথার নিত্য ব্যবহার হওয়াই ঐ বিষয়ের প্রমাণ। আবার দানব-তুল্য বিকটাকৃতি বিকৃত-স্বভাবাপন্ন লোক যদি কোন কারণে সৎচিন্তায়, সাধুভাবে নিরন্তর ছয় মাস কাল কাটায় তো তাহার আকৃতি হাব-ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা কত কোমল ও সরল হইয়া আসে, তাহাও বোধ হয় আমাদের ভিতর অনেকের প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছে। পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ বলেন—যে প্রকার ভাবই তোমার মনে উঠুক না কেন, উহা তোমার মস্তিষ্কে চিরকালের নিমিত্ত একটি দাগ অঙ্কিত করিয়া যাইবে। এইরূপে ভাল-মন্দ দুই প্রকার ভাবের দুই প্রকার দাগের সমষ্টির স্বল্পাধিক্য লইয়াই

মনোভাবপ্রসূত শারীরিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মত

তোমার চরিত্র গঠিত ও তুমি ভাল বা মন্দ লোক বলিয়া পরিগণিত। প্রাচ্যের বিশেষতঃ ভারতের যোগি-ঋষিগণ বলেন, ঐ দুই প্রকার ভাব মস্তিষ্কে দুই প্রকার দাগ অঙ্কিত করিয়াই শেষ হইল না—ভবিষ্যতে আবার তোমাকে পুনরায় ভাল-মন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে এরূপ সূক্ষ্ম প্রেরণাশক্তিতে পরিণত হইয়া মেরুদণ্ডের শেষভাগে অবস্থিত 'মূলাধার' নামক মেরুচক্রে নিত্যকাল অবস্থান করিতে থাকে; জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত ঐরূপ প্রেরণাশক্তিসমূহের উহাই আবাসভূমি। ঐ সকলের নামই সংস্কার বা পূর্ব্ব-সংস্কার এবং ঐ সকলের নাশ একমাত্র শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলে বা নির্ব্বিকল্পসমাধি-লাভ হইলে তবেই হইয়া থাকে। নতুবা দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবার সময়ও জীব ঐ সংস্কারের পুঁটুলিটি 'বায়ুর্গন্ধা-নিবাশয়াৎ' বগলে করিয়া লইয়া যায়।

কুণ্ডলিনীর সঞ্চিত পূর্ব্ব-সংস্কারের আবাসস্থান ও ঐসকলের নাশ কিরূপে হয়

অদ্বৈতজ্ঞান বা শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শরীর ও মনের পূর্ব্বোক্তরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। শরীরের কিছু হইলে মনে আঘাত লাগে, আবার মনে কিছু হইলে শরীরে আঘাত অনুভব হয়। আবার ব্যক্তির শরীর-মনের ন্যায়, ব্যক্তির সমষ্টি সমগ্র মনুষ্যজাতির শরীর ও মনে এইপ্রকার সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তোমার শরীর-মনের ঘাত-প্রতিঘাত আমার ও অপর সকলের শরীর-মনে লাগে। এইরূপে বাহ্য ও আন্তর, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ নিত্য সম্বন্ধে অবস্থিত ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিরন্তর

শরীর ও মনের সম্বন্ধ

ঘাতপ্রতিঘাত করিতেছে। সেইজন্যই দেখা যায়—যেখানে সকলে শোকাকুল, সেখানে তোমারও মনে শোকের উদয় হইবে; যেখানে সকলে ভক্তিমান সেখানে তোমারও মনে বিনা চেষ্টায় ভক্তিভাব আসিবে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও বুঝিতে হইবে।

সেইজন্যই দেখা যায় শারীরিক রোগ ও স্বাস্থ্যের ন্যায় মানসিক বিকার বা ভাবসকলেরও সংক্রামিকা শক্তি আছে। উহারাও অধিকারিভেদে সংক্রমণ করিয়া থাকে। ভগবদ-নুরাগ উদ্দীপিত করিবার জন্য সেইজন্যই শাস্ত্র সাধুসঙ্গের এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেইজন্য ঠাকুর যাহারা তাঁহার নিকট একবার যাইত তাহাদের "এখানে যাওয়া-আসা কোরো—প্রথম প্রথম এখানে বেশী বেশী যাওয়া-আসাটা রাখ্‌তে হয়" ইত্যাদি বলিতেন। যাক্‌ এখন সে কথা।

ভাবসকল সংক্রামক বলিয়াই সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠেয়

সাধারণ মানসিক ভাবসমূহের ন্যায় শ্রীভগবানের প্রতি একান্ত একনিষ্ঠ তীব্র অনুরাগে যে সমস্ত ভাব মনে উদয় হয়, সে সকলেও অপূর্ব্ব শারীরিক পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। যথা—ঐরূপ অনুরাগ উপস্থিত হইলে সাধকের রূপরসাদির উপর টান কমিয়া যায়—স্বল্পাহার, স্বল্পনিদ্রা হয়—খাদ্যবিশেষে রুচি ও অন্য প্রকার খাদ্যে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়—স্ত্রীপুত্রাদি যে সকল ব্যক্তির সহিত মায়িক সম্বন্ধ তাহাকে শ্রীভগবান হইতে বিমুখ করে, তাহাদিগকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়—বায়ুপ্রধান ধাত (ধাতু) হয় ইত্যাদি। ঠাকুর যেমন বলিতেন, "বিষয়ী লোকের হাওয়া সইতে

একনিষ্ঠা-প্রসূত শারীরিক পরিবর্ত্তন

পারুতুম্ না, আত্মীয়-স্বজনের সংসর্গে যেন দম বন্ধ হয়ে প্রাণটা বেরিয়ে যাবার মত হত"; আবার বলিতেন, "ঈশ্বরকে যে ঠিক ঠিক ডাকে তার শরীরে মহাবায়ু গর-গর করে মাথায় গিয়ে উঠবেই উঠবে" ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাইতেছে, ভগবদনুরাগে যে সকল মানসিক পরিবর্ত্তন বা ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐ সকলেরও এক একটা শারীরিক প্রতিকৃতি বা রূপ আছে। মনের দিক দিয়া দেখিয়া বৈষ্ণবতন্ত্র ঐ সকল ভাবকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; আর ঐ সকল মানসিক বিকারকে আশ্রয় করিয়া যে সকল শারীরিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তাহার দিক দিয়া দেখিয়া যোগশাস্ত্র মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কান্তর্গত কুণ্ডলিনীশক্তি ও ষট্চক্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন।

ভক্তিপথ ও যোগমার্গের সামঞ্জস্য

কুণ্ডলী বা কুণ্ডলিনীশক্তির সংক্ষেপে পরিচয় আমরা ইতঃ-পূর্ব্বেই দিয়াছি। ইহজন্মে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মজন্মান্তরে যত মানসিক পরিবর্ত্তন বা ভাব জীবের উপস্থিত হইতেছে ও হইয়াছিল, তৎসমূহের সূক্ষ্ম শারীরিক প্রতিকৃতি-অবলম্বনে অবস্থিতা মহা ওজস্বিনী প্রেরণাশক্তিকেই পতঞ্জলিপ্রমুখ ঋষিগণ ঐ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যোগী বলেন, উহা বদ্ধজীবে প্রায় সম্পূর্ণ সুপ্ত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। উহার ঐরূপ সুপ্তাবস্থাতেই জীবের স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি বৃত্তির উদয়। উহা যদি কোনরূপে সম্পূর্ণ জাগরিত বা প্রকাশাবস্থাপ্রাপ্ত হয়, তবেই

কুণ্ডলিনী কাহাকে বলে ও তাহার সুপ্ত এবং জাগ্রত অবস্থা

জীবকে পূর্ণজ্ঞানলাভে প্রেরণ করিয়া শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয়। যদি বল, সুপ্তাবস্থায় কুণ্ডলিনী-শক্তি হইতে কেমন করিয়া স্মৃতি-কল্পনা প্রভৃতির উদয় হতে পারে? তদুত্তরে বলি, সুপ্ত হইলেও বাহিরের রূপ-রসাদি পদার্থ পঞ্চেন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া নিরন্তর মস্তিষ্কে যে আঘাত করিতেছে তজ্জন্য একটু-আধটু ক্ষণমাত্রস্থায়ী চেতনা তাহার আসিয়া উপস্থিত হয়। যেমন মশকদষ্ট নিদ্রিত ব্যক্তির হস্ত স্বতঃই মশককে আঘাত বা কণ্ডুয়নাদি করে, সেইরূপ।

জাগরিতা কুণ্ডলিনীর গতি—ষট্‌চক্র-ভেদ ও সমাধি

যোগী বলেন, মস্তিষ্কমধ্যগত ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ অবকাশ বা আকাশে অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার বা শ্রীভগবানের জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান। তাঁহার প্রতি পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডলীশক্তির বিশেষ অনুরাগ অথবা শ্রীভগবান তাহাকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু জাগরিতা না থাকায় কুণ্ডলীশক্তির সে আকর্ষণ অনুভূত হইতেছে না। জাগরিতা হইবামাত্র উহা শ্রীভগবানের ঐ আকর্ষণ অনুভব করিবে এবং তাঁহার নিকটস্থ হইবে। ঐরূপে কুণ্ডলীর শ্রীভগবানের নিকটস্থ হইবার পথও আমাদের প্রত্যেকের শরীরে বর্ত্তমান। মস্তিষ্ক হইতে আরব্ধ হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বরাবর ঐ পথ মেরুদণ্ডের মূলে 'মূলাধার' নামক মেরুচক্র পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ঐ পথই যোগশাস্ত্র-কথিত সুষুম্নাবর্ত্ম। পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ ঐ পথকেই canal centralis (মধ্যপথ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, কিন্তু উহার কোনরূপ আবশ্যকতা বা কার্য্যকারিতা এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই। ঐ পথ দিয়াই কুণ্ডলী পূর্ব্বে

পরমাত্মা হইতে বিযুক্তা হইয়া মস্তিষ্ক হইতে মেরুচক্রে বা মূলাধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিদ্রিতা হইয়াছে। আবার ঐ পথ দিয়াই উহা মেরুদণ্ডমধ্যে উর্দ্ধে উর্দ্ধে অবস্থিত ছয়টি চক্র ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে মস্তিষ্কে আসিয়া উপনীত হয়।[১] কুণ্ডলী জাগরিতা হইয়া এক চক্র হইতে অন্য চক্রে যেমনি আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি জীবের এক এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব উপলব্ধি হইতে থাকে এবং ঐ প্রকারে যখনি উহা মস্তিষ্কে উপনীত হয়, তখনি জীবের ধর্ম্মবিজ্ঞানের চরমোপলব্ধি বা অদ্বৈত-জ্ঞানে 'কারণং কারণানাং' পরমাত্মার সহিত তন্ময়ত্ব আসে। তখনই জীবের ভাবেরও চরমোপলব্ধি হয় বা যে মহাভাব-অবলম্বনে অপর সকল ভাব মানবমনে সর্ব্বক্ষণ উদিত হইতেছে, সেই 'ভাবাতীত ভাবে' তন্ময় হইয়া অবস্থানকরা-রূপ অবস্থা আসে।

ঐ সম্বন্ধে ঠাকুরের অনুভব

কি সরল কথা দিয়াই না ঠাকুর যোগের এই সকল জটিল তত্ত্ব আমাদিগকে বুঝাইতেন! বলিতেন, "ভাখ, সড় সড় করে একটা পা থেকে মাথায় গিয়ে উঠে। যতক্ষণ না সেটা মাথায় গিয়ে উঠে ততক্ষণ হুঁশ থাকে; আর যেই সেটা মাথায় গিয়ে উঠলো আর একেবারে বেব্‌ভুল হয়ে যাই, তখন আর দেখা-শুনাই থাকে না, তা কথা

১ যোগশাস্ত্রে এই ছয়টি মেরুচক্রের নাম ও বিশেষ বিশেষ অবস্থানস্থল পর পর নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—মেরুদণ্ডের শেষভাগে 'মূলাধার' (১), তদূর্দ্ধে লিঙ্গমূলে 'স্বাধিষ্ঠান' (২), তদূর্দ্ধে নাভিস্থলে 'মণিপুর' (৩), তদূর্দ্ধে হৃদয়ে 'অনাহত' (৪), তদূর্দ্ধে কণ্ঠে 'বিশুদ্ধ' (৫), তদূর্দ্ধে ভ্রূমধ্যে 'আজ্ঞা' (৬), অবশ্য এই ছয়টি চক্রই মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সুষুম্না পথেই বর্ত্তমান—অতএব 'হৃদয়' 'কণ্ঠ' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তদ্বিপরীত অবস্থিত মেরুমধ্যস্থ স্থলই লক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

কওয়া! কথা কইবে কে?—'আমি' 'তুমি' বুদ্ধিই চলে যায়! মনে করি তোমাদের সব বল্‌বো—সেটা উঠ্‌তে উঠ্‌তে কত কি দর্শন-টর্শন হয় সব কথা বল্‌বো। যতক্ষণ সেটা (হৃদয় ও কণ্ঠ দেখাইয়া) এ অবধি বা এই অবধি বড় জোর উঠেছে, ততক্ষণ বলা চলে ও বলি; কিন্তু যেই সেটা (কণ্ঠ দেখাইয়া) এখান ছাড়িয়ে উঠ্‌লো, আর অমনি যেন কে মুখ চেপে ধরে, আর বেব্‌ভুল হয়ে যাই—সামলাতে পারি নি! (কণ্ঠ দেখাইয়া) ওর উপরে গেলে কি রকম সব দর্শন হয় তা বল্‌তে গিয়ে যেই ভাব্‌চি কি রকম দেখিছি, আর অমনি মন হুস্‌ করে উপরে উঠে যায়—আর বলা যায় না!"

ঠাকুরের নির্ব্বিকল্প-সমাধিকালের অনুভব বলিবার চেষ্টা

আহা, কতদিন যে ঠাকুর কণ্ঠের উপরিস্থ চক্রে মন উঠিলে কিরূপ দর্শনাদি হয় তাহা অশেষ প্রয়াসপূর্ব্বক সামলাইয়া আমাদের নিকট বলিতে যাইয়া অপারক হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না! আমাদের এক বন্ধু বলেন, "এক দিন ঐরূপে খুব জোর করিয়া বলিলেন, 'আজ তোদের কাছে সব কথা বল্‌বো, একটুও লুকোবো না' বলিয়া আরম্ভ করিলেন। হৃদয় ও কণ্ঠ পর্য্যন্ত সকল চক্রাদির কথা বেশ বলিলেন, তারপর ভ্রূমধ্যস্থল দেখাইয়া বলিলেন, 'এইখানে মন উঠলেই পরমাত্মার দর্শন হয় ও জীবের সমাধি হয়। তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে কেবল একটি স্বচ্ছ পাতলা পর্দ্দামাত্র আড়াল (ব্যবধান) থাকে। সে তখন এইরকম ভাখে' বলিয়া যেই পরমাত্মার দর্শনের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিবেন, অমনি সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিভঙ্গে পুনরায় বলিতে চেষ্টা করিলেন, পুনরায় সমাধিস্থ

হইলেন! এইরূপ বার বার চেষ্টার পর সজলনয়নে আমাদের বলিলেন, 'ওরে, আমি ত মনে করি সব কথা বলি, এতটুকুও তোদের কাছে লুকোবো না, কিন্তু মা কিছুতেই বল্‌তে দিলে না—মুখ চেপে ধর্‌লে!' আমরা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম —এ কি ব্যাপার! দেখিতেছি উনি এত চেষ্টা করিতেছেন, বলিবেন বলিয়া। না বলিতে পারিয়া উঁহার কষ্টও হইতেছে বুঝিতেছি, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছেন না—মা বেটী কিন্তু ভারি দুষ্ট! উনি ভাল কথা বলিবেন, ভগবদ্দর্শনের কথা বলিবেন, তাহাতে মুখ চাপিয়া ধরা কেন বাপু? তখন কি আর বুঝি যে, মন-বুদ্ধি—যাহাদের সাহায্যে বলা-কহাগুলো হয়, তাহাদের দৌড় বড় বেশী দূর নয়; আর তাহারা যতদূর দৌড়াইতে পারে তাহার বাহিরে না গেলে পরমাত্মার পূর্ণ দর্শন হয় না! ঠাকুর যে আমাদের প্রতি ভালবাসায় অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা করিতেছেন—এ কথা কি তখন বুঝিতে পারিতাম?"

কুণ্ডলিনী-শক্তি সুষুম্নাপথে উঠিবার কালে যে যে রূপের অনুভব হয় তৎসম্বন্ধে ঠাকুর আরও বিশেষ করিয়া বলিতেন, "ভাখ্, যেটা সড়্ সড়্ করে মাথায় উঠে, সেটা সব সময় এক রকম ভাবে উঠে না। শাস্ত্রে সেটার পাঁচ রকম গতির কথা আছে—যথা, পিপীলিকাগতি—যেমন পিঁপড়েগুলো খাবার মুখে করে সার দিয়ে সুড় সুড় করে যায়, সেই রকম পা থেকে একটা সুড়সুড়ানি আরম্ভ হয়ে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে উপরে উঠ্‌তে থাকে, মাথা পর্য্যন্ত যায় আর সমাধি হয়! ভেকগতি—ব্যাঙ্‌গুলো

সমাধিপথে কুণ্ডলিনীর পাঁচ প্রকারের গতি

যেমন টুপ্ টুপ্ টুপ্—টুপ্ টুপ্ টুপ্ করে' দু-তিন বার লাফিয়ে একটু থামে, আবার দু-তিন বার লাফিয়ে আবার একটু থামে, সেইরকম করে কি একটা পায়ের দিক থেকে মাথায় উঠছে বোঝা যায়, আর যেই মাথায় উঠলো আর সমাধি! সর্পগতি—সাপগুলো যেমন লম্বা হয়ে বা পুঁটুলি পাকিয়ে চুপ করে পড়ে আছে, আর যেই সাম্‌নে খাবার (শিকার) দেখেছে বা ভয় পেয়েছে, অমনি কিল্‌বিল্ কিল্‌বিল্ করে এঁকে বেঁকে ছোটে, সেইরকম কোরে ওটা কিল্‌বিল্ ক'রে একেবারে মাথায় গিয়ে উঠে, আর সমাধি! পক্ষিগতি—পক্ষিগুলো যেমন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে বস্‌বার সময় হুস্ করে উড়ে কখন একটু উঁচুতে উঠে, কখন একটু নীচুতে নাবে কিন্তু কোথাও বিশ্রাম করে না, একেবারে যেখানে বস্‌বে মনে করেছে সেই-খানে গিয়ে বসে, সেইরকম ক'রে ওটা মাথায় উঠে ও সমাধি হয়! বাঁদরগতি—হনুমানগুলো যেমন একগাছ থেকে আর এক গাছে যাবার সময় 'উউপ' করে এক ডাল থেকে আর এক ডালে গিয়ে পড়লো, সেখান থেকে 'উউপ' ক'রে আর এক ডালে গিয়ে পড়লো, এইরূপে দু-তিন লাফে যেখানে মনে করেছে সেখানে উপস্থিত হয়, সেইরকম ক'রে ওটাও দু-তিন লাফে মাথায় গিয়ে উঠে বোঝা যায় ও সমাধি হয়।"

কুণ্ডলিনীশক্তি সুষুম্নাপথে উঠিবার কালে প্রতি চক্রে কি কি প্রকার দর্শন হয় তদ্বিষয়ে বলিতেন, "বেদান্তে আছে সপ্ত ভূমিকার কথা। এক এক ভূমি হতে এক এক রকম দর্শন হয়। মনের স্বভাবতঃ নীচের তিন ভূমিতে ওঠা-নামা, ঐ

দিকেই দৃষ্টি—গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি—খাওয়া, পরা, রমণ ইত্যাদিতে। ঐ তিন ভূমি ছাড়িয়ে যদি হৃদয়ে উঠে তো তখন তার জ্যোতিঃ দর্শন হয়। কিন্তু হৃদয়ে কখন কখন উঠ্‌লেও মন আবার নীচের তিন ভূমি—গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে নেমে যায়। হৃদয় ছাড়িয়ে যদি কারো মন কণ্ঠে ওঠে তো সে আর ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কোন কথা —যেমন বিষয়ের কথা-টথা, কইতে পারে না।

বেদান্তের সপ্তভূমি ও প্রত্যেক ভূমি-লব্ধ আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

তখন তখন এমনি হ'ত—বিষয়কথা যদি কেউ কয়েছে তো মনে হ'ত মাথায় লাঠি মার্‌লে; দূরে পঞ্চবটীতে পালিয়ে যেতাম, যেখানে ওসব কথা শুনতে পাব না। বিষয়ী দেখ্‌লে ভয়ে লুকোতুম! আত্মীয়-স্বজনকে যেন কূপ বলে মনে হ'ত —মনে হ'ত তারা যেন টেনে কূপে ফেল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, পড়ে যাব আর উঠ্‌তে পারব না। দম বন্ধ হয়ে যেতো, মনে হ'ত যেন প্রাণ বেরোয় বেরোয়—সেখান থেকে পালিয়ে এসে তবে শান্তি হ'ত! কণ্ঠে উঠলেও মন আবার গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে নেমে যেতে পারে, তখনও সাবধানে থাকৃতে হয়। তারপর কণ্ঠ ছাড়িয়ে যদি কারো মন ভ্রূমধ্যে ওঠে তো তার আর পড়বার ভয় নেই, তখন পরমাত্মার দর্শন হয়ে নিরন্তর সমাধিস্থ থাকে। এখানটার আর সহস্রারের মাঝে একটা কাঁচের মত স্বচ্ছ পর্দ্দা-মাত্র আড়াল আছে। তখন পরমাত্মা এত নিকটে যে, মনে হয় যেন তাঁতে মিশে গেছি, এক হয়ে গেছি; কিন্তু তখনও এক হয় নি। এখান থেকে মন যদি নামে তো বড় জোর কণ্ঠ বা হৃদয় পর্য্যন্ত নামে—তার নীচে আর নামতে পারে না।

জীবকোটিরা এখান থেকে আর নামে না—একুশ দিন নিরন্তর সমাধিতে থাক্‌বার পর ঐ আড়ালটা বা পর্দ্দাটা ভেদ হয়ে যায়, আর তাঁর সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। সহস্রারে পরমাত্মার সঙ্গে একেবারে মেশামেশি হয়ে যাওয়াই সপ্তম ভূমিতে ওঠা।"

ঠাকুরকে ঐ সব বেদ-বেদান্ত, যোগ-বিজ্ঞানের কথা কহিতে শুনিয়া আমাদের কেহ কেহ আবার কখন কখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, 'মশাই, আপনিতো লেখা-পড়ার কখন ধার ধারেন নি, এত সব জানলেন কোথা থেকে?' অদ্ভুত ঠাকুরের ঐ অদ্ভুত প্রশ্নেও বিরক্তি নাই! একটু হাসিয়া বলিতেন, "নিজে পড়ি নাই, কিন্তু ঢের সব যে শুনেছি গো? সে সব মনে আছে। অপরের কাছ থেকে, ভাল ভাল পণ্ডিতের কাছ থেকে, বেদ-বেদান্ত, দর্শন-পুরাণ সব শুনেছি। শুনে, তাদের ভেতর কি আছে জেনে, তারপর সেগুলোকে (গ্রন্থগুলোকে) দড়ি দিয়ে মালা করে গেঁথে গলায় পরে নিয়েছি—'এই নে তোর শাস্ত্র-পুরাণ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে' বলে মার পাদপদ্মে ফেলে দিয়েছি!"

ঠাকুরের শ্রুতিধরত্ব

বেদান্তের অদ্বৈতভাব বা ভাবাতীত ভাব সম্বন্ধে বলিতেন, "ওটা সব শেষের কথা। কি রকম জানিস? যেমন, অনেক দিনের পুরোণো চাকর। মনিব তার গুণে খুশী হয়ে তাকে সকল কথায় বিশ্বাস করে, সব বিষয়ে পরামর্শ করে। একদিন খুব খুশী হয়ে তার হাত ধরে নিজের গদিতেই বসাতে গেল! চাকর সঙ্কোচ করে 'কি

ঠাকুরের অদ্বৈতভাব সহজে বুঝান

কর, কি কর' বল্‌লেও মনিব জোর করে টেনে বসিয়ে বল্‌লে, 'আঃ, বস্ না! তুইও যে, আমিও সে'—সেই রকম।"

আমাদের জনৈক বন্ধু[১] এক সময়ে বেদান্তচর্চ্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন। ঠাকুর তখন বর্ত্তমান এবং উঁহার আকুমার ব্রহ্মচর্য্য, ভক্তি, নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য উঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। বেদান্তচর্চ্চা ও ধ্যান-ভজনাদিতে নিবিষ্ট হইয়া বন্ধুটি ঠাকুরের নিকট পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন সেরূপ কিছুদিন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে বিষয় অলক্ষিত থাকে নাই। বন্ধুটির সঙ্গে যাতায়াত করিত এমন এক ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, তুই যে একলা—সে আসে নি?" জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিল, "সে মশাই আজকাল খুব বেদান্তচর্চ্চায় মন দিয়েছে। রাত-দিন পাঠ, বিচারতর্ক নিয়ে আছে। তাই বোধ হয় সময় নষ্ট হবে বলে আসে নি।" ঠাকুর শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না।

ঐ দৃষ্টান্ত—স্বামী তুরীয়ানন্দ

উহার কিছুদিন পরেই, আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, "কি গো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্তবিচার কর্‌চ? তা বেশ, বেশ। তা বিচার তো খালি এই গো—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,—না আর কিছু?"

বেদান্ত আর কি? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই ধারণা

বন্ধু—আজ্ঞা হাঁ, আর কি?

---

১ স্বামী তুরীয়ানন্দ

বন্ধু বলেন, বাস্তবিকই ঠাকুর সেদিন ঐ কয়টি কথায় বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার চক্ষু যেন সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন—বাস্তবিকই তো, ঐ কয়টি কথা হৃদয়ে ধারণা হইলে বেদান্তের সকল কথাই বুঝা হইল!

ঠাকুর—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—আগে শুন্‌লে; তারপর মনন—বিচার করে মনে মনে পাকা কর্‌লে; তারপর নিদিধ্যাসন—মিথ্যা বস্তু জগৎকে ত্যাগ করে সদ্বস্তু ব্রহ্মের ধ্যানে মন লাগালে—এই। কিন্তু তা না হয়ে শুন্‌লুম, বুঝ্‌লুম কিন্তু যেটা মিথ্যা সেটাকে ছাড়্‌তে চেষ্টা কর্‌লুম না—তা হলে কি হবে? সেটা হচ্চে সংসারীদের জ্ঞানের মত; ও রকম জ্ঞানে বস্তুলাভ হয় না। ধারণা চাই, ত্যাগ চাই—তবে হবে। তা না হলে, মুখে বল্‌চ বটে 'কাঁটা নেই খোঁচা নেই', কিন্তু যেই হাত দিয়েছ অমনি প্যাঁট্ করে কাঁটা ফুটে উহুঃ উহুঃ করে উঠ্‌তে হবে, মুখে বল্‌চ 'জগৎ নেই, অসৎ—একমাত্র ব্রহ্মই আছেন' ইত্যাদি, কিন্তু যেই জগতের রূপরসাদি বিষয় সম্মুখে আসা, অমনি সেগুলো সত্যজ্ঞান হয়ে বন্ধনে পড়া। পঞ্চবটীতে এক সাধু এসেছিল। সে লোকজনের সঙ্গে খুব বেদান্ত-টেদান্ত বলে। তারপর একদিন শুনলুম, একটা মাগীর সঙ্গে নট্-ঘট্ হয়েছে। তারপর ওদিকে শৌচে গিয়েছি, দেখি সে বসে আছে। বল্‌লুম, 'তুমি এত বেদান্ত-টেদান্ত বল, আবার এ সব কি?' সে বল্‌লে, 'তাতে কি? আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্চি তাতে দোষ নেই। যখন জগৎটাই তিন কালে মিথ্যা হল, তখন ঐটেই কি সত্য হবে? ওটাও মিথ্যা।'

আমি তো শুনে বিরক্ত হয়ে বলি, 'তোর অমন বেদান্তজ্ঞানে আমি মুতে দি!' ও সব হচ্চে সংসারী, বিষয়ী জ্ঞানীর জ্ঞান। ও জ্ঞান জ্ঞানই নয়।

বন্ধু বলেন, সেদিন ঐ পর্য্যন্ত কথাই হইল। কথাগুলি ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চবটীতলে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার ধারণা ছিল—উপনিষৎ, পঞ্চদশী ইত্যাদি নানা জটিল গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে, সাংখ্য ন্যায়াদি দর্শনে ব্যুৎপত্তিলাভ না করিলে বেদান্ত কখনই বুঝা যাইবে না এবং মুক্তিলাভও সুদূর-পরাহত থাকিবে। ঠাকুরের সেদিনকার কথাতেই বুঝিলেন, বেদান্তের যত কিছু বিচার সব ঐ ধারণাটি হৃদয়ে দৃঢ় করিবার জন্য। ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন ও বিচার-গ্রন্থ পড়িয়া যদি কাহারও মনে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' কথাটি নিশ্চয় ধারণা না হয়, তবে ঐ সকল পড়া না পড়া উভয়ই সমান। ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তখন হইতে গ্রন্থপাঠাদি অপেক্ষা সাধন-ভজনেই অধিক মনোনিবেশ করিবেন—ঐরূপ নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতার দিকে ফিরিলেন। এইরূপে তিনি সাধনসহায়ে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিবার সঙ্কল্প মনে স্থির ধারণা করিয়া তদবধি তদনুরূপ কার্য্যেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন।

ঠাকুর কলিকাতায় কাহারও বাটীতে আগমন করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কথা তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণের মধ্যে জানাজানি হইয়া যাইত। কতকগুলি লোক যে ঐ কার্য্যের বিশেষভাবে ভার লইয়া ঐ কথা সকলকে জানাইয়া আসিতেন তাহা নহে। কিন্তু ভক্তদিগের প্রাণ ঠাকুরকে সর্ব্বদা দর্শন

করিবার জন্য এতই উন্মুখ হইয়া থাকিত এবং কার্য্যগতিকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতে না পারিলে পরস্পরের বাটীতে সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তায় এত আনন্দানুভব করিত যে, তাহাদের ভিতর একজন কোনরূপে ঠাকুরের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহা অনেকের ভিতর বিনা চেষ্টায় মুখে মুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িত। ঠাকুরের শক্তিতে ভক্তগণ পরস্পরে কি যে এক অনির্ব্বচনীয় প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বুঝান দুষ্কর! কলিকাতায় বাগবাজার, সিমলা ও আহিরীটোলা পল্লীতেই ঠাকুরের অনেক ভক্তেরা বাস করিতেন, তজ্জন্য ঐ তিন স্থানেই ঠাকুরের আগমন অধিকাংশ সময়ে হইত। তন্মধ্যে আবার বাগবাজারেই তাঁহার অধিক পরিমাণে আগমন হইত।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন বাগবাজারে ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। বাগবাজার অঞ্চলের ভক্তগণ সংবাদ পাইয়া অনেকে উপস্থিত হইলেন। আমাদের পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর আবাস অতি নিকটেই ছিল। ঠাকুর তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করায় পাড়ার পরিচিত জনৈক প্রতিবেশী যুবক যাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। বলরাম বাবুর বাটীর দ্বিতলের প্রশস্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই বন্ধু ভক্তমণ্ডলীপরিবৃত ঠাকুরকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটেই একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সহাস্যে কুশলপ্রশ্নমাত্র করিয়াই উপস্থিত প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

দুই-একটি কথার ভাবেই বন্ধু বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর উপস্থিত সকলকে বুঝাইতেছেন—জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হইবার নহে। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর তাঁহার মনের ভুল ধারণাটি দূর করিবার জন্যই অদ্য যেন ঐ প্রসঙ্গ উঠাইয়াছেন। মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছেন তাহা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন।

শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন—"কি জান ? কাম-কাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে বোধ হওয়া, জগৎটা তিন কালেই অসৎ বলে ঠিক ঠিক মনে জ্ঞানে ধারণা হওয়া কি কম কথা ? তাঁর দয়া না হলে কি হয় ? তিনি কৃপা করে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মানুষ নিজে সাধন করে সেটা কি ধারণা করতে পারে ? তার কতটুকু শক্তি ! সেই শক্তি দিয়ে সে কতটুকু চেষ্টা করতে পারে ?" এইরূপে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। কিছুক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্যদশাপ্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "একটা ঠিক করতে পারে না, আবার আর একটা চায়।" ঐ কথাগুলি বলিয়াই ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় গান ধরিলেন—

ঈশ্বরকৃপা ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হয় না

"ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব,
ধরা না দিলে কি পারিস্ ধরিতে।"

গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের দুই চক্ষে এত জলধারা বহিতে লাগিল যে, বিছানার চাদরের খানিকটা ভিজিয়া গেল! বন্ধুও

সে অপূর্ব্ব শিক্ষায় দ্রবীভূত হইয়া কাঁদিয়া আকুল! কতক্ষণে তবে দুইজনে প্রকৃতিস্থ হইলেন। বন্ধু বলেন, "সে শিক্ষা চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেদিন হইতেই বুঝিলাম ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে।"

ঠাকুরের অদ্বৈতজ্ঞানসম্বন্ধীয় গভীরতা সম্বন্ধে আর একটি কথা এখানে আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ঠাকুরের তখন অসুখ—কাশীপুরের বাগানে—বাড়াবাড়ি। শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি, সঙ্গে কয়েকজন, অসুখের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিলেন। পণ্ডিতজী কথায় কথায় ঠাকুরকে বলেন, "মহাশয়, শাস্ত্রে পড়েছি আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম করিয়া ফেলিতে পারেন। আরাম হোক মনে করে মন একাগ্র করে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখ্‌লেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করিলে হয় না?"

শশধর পণ্ডিত ঠাকুরকে যোগ-শক্তিবলে রোগ সারাইতে বলায় ঠাকুরের উত্তর

ঠাকুর বলিলেন, "তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বল্লে গো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙ্গা হাড়-মাসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?"

পণ্ডিতজী নিরুত্তর হইলেন; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ ভক্তেরা নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। পণ্ডিতজী চলিয়া যাইবার পরেই ঠাকুরকে ঐরূপ করিবার জন্য একেবারে বিশেষভাবে ধরিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আপনাকে অসুখ সারাতেই হবে, আমাদের জন্য সারাতে হবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ ও ঠাকুরের উত্তর

ঠাকুর—আমার কি ইচ্ছা রে, যে আমি রোগে ভুগি; আমি তো মনে করি সারুক, কিন্তু সারে কৈ? সারা না সারা মা-র হাত।

স্বামী বিবেকানন্দ—তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুন্‌বেনই শুন্‌বেন।

ঠাকুর—তোরা তো বল্‌ছিস্‌, কিন্তু ও কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না রে।

শ্রীযুত স্বামীজি—তা হবে না মশাই, আপনাকে বল্‌তেই হবে। আমাদের জন্য বলতে হবে।

ঠাকুর—আচ্ছা দেখি, পারি ত বল্‌বো।

কয়েক ঘণ্টা পরে শ্রীযুত স্বামীজি পুনরায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, বলেছিলেন? মা কি বল্লেন?"

ঠাকুর—মাকে বল্‌লুম (গলার ক্ষত দেখাইয়া), 'এইটের দরুণ কিছু খেতে পারি না, যাতে দুটি খেতে পারি করে দে।' তা মা বল্লেন তোদের সকলকে দেখিয়ে, 'কেন? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস!' আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।

ঠাকুরের অদ্বৈতভাবের গভীরতা

কি অদ্ভুত দেহবুদ্ধির অভাব! কি অপূর্ব্ব অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান! তখন ছয়মাস কাল ধরিয়া ঠাকুরের নিত্য আহার, বোধ হয় চারি-পাঁচ ছটাক বার্লী মাত্র; সেই অবস্থায় জগন্মাতা যাই বলিয়াছেন, 'এই যে এত মুখে খাচ্ছিস্‌', অমনি "কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, এই একটা ক্ষুদ্র শরীরকে 'আমি' বলিয়াছি!"—মনে করিয়া ঠাকুর

লজ্জায় হেঁটমুখ ও নিরুত্তর হইলেন। পাঠক, এ ভাব কি একটুও কল্পনায় আনিতে পার?

কি অদ্ভুত ঠাকুরের সঙ্গে দেখাই না আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে! জ্ঞান-ভক্তি, যোগ-কর্ম্ম, পুরাতন-নবীন, সকলপ্রকার ধর্ম্মভাবের কি অদৃষ্টপূর্ব্ব সামঞ্জস্যই না তাহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি! উপনিষদ্‌কার ঋষি বলেন, ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প হন। সংকল্প বা ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার ইচ্ছা বাহ্য জগতের সকল পদার্থ, সকল শক্তি ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লয় ও সেই ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব উক্ত পুরুষের নিজের শরীর-মন যে তদ্রূপ করিবে ইহাতে বিচিত্র কি আছে! উপনিষদ্‌কারের ঐ বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা করা সাধারণ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে; তবে একথা বেশ বলা যাইতে পারে যে, যতদূর পরীক্ষা করা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভব, তাহার বোধ হয় কিছু অভাব বা ত্রুটি, আমরা সকল বিষয়ে অনুক্ষণ যেভাবে ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া লইতাম, তাহাতে হয় নাই। ঠাকুর প্রতিবারই কিন্তু সে সকল পরীক্ষায় হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যেন ব্যঙ্গ করিয়াই আমাদের বলিতেন, "এখনও অবিশ্বাস! বিশ্বাস কর্—পাকা করে ধর্—যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সেই ইদানীং (নিজের শরীরটা দেখাইয়া) এ খোলটার ভিতর—তবে এবার গুপ্তভাবে আসা! যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য-পরিদর্শন! যেমনি জানাজানি কানাকানি হয় অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে—সেই রকম!"

ঠাকুরের সকল প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া

ঠাকুরের জীবনের অনেক ঘটনা উপনিষদোক্ত ঐ বিষয়ে আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দেয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, মানবমনে যত প্রকার ভাবের উদয় হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে তাহারই 'স্বসংবেদ্য' অর্থাৎ ঐ সকল ভাবের পরিমাণ, তীব্রতা ইত্যাদি সে নিজেই ঠিক ঠিক জানিতে পারে। অপরে কেবল ভাবের বাহ্যিক বিকাশ দেখিয়া ঐ সকলের অনুমান মাত্র করিয়া থাকে। ভাব-সমাধির ঐরূপ স্বসংবেদ্য প্রকৃতি (subjective nature) সকলেরই প্রত্যক্ষের অন্তর্ভূত। সকলেই জানে ভাবসকল অন্যান্য চিন্তাসমূহের ন্যায় মানসিক বিকার বা শক্তি-প্রকাশ মাত্র—মনেতেই উহাদের উদয়, মনেতেই লয়; বাহ্য-জগতে উহার ছবি বা অনুরূপ প্রতিকৃতি দেখা ও দেখান অসম্ভব। ঠাকুরের ভাবসমাধির অনেকগুলিতে কিন্তু উহার বৈপরিত্য দেখা যায়। ধর—সাধনকালে ঠাকুরের স্বহস্তরোপিত পঞ্চবটীর চারাগাছগুলি ছাগল-গোরুতে মুড়াইয়া খাইয়াছে দেখিয়া ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে ঠাকুরের বেড়া দিবার ইচ্ছা হওয়া এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই গঙ্গায় বান ডাকিয়া ঐ বেড়া-নির্ম্মাণের জন্য আবশ্যকীয় যত কিছু দ্রব্যাদি—কতকগুলি গরাণের খুঁটি, বাঁখারি, নারিকেল-দড়ি, মায় একখানি কাটারি পর্য্যন্ত—সেইস্থানে ভাসিয়া আসিয়া লাগা ও তাঁহার কালীবাটীর ভর্ত্তাভারি নামক মালীর সাহায্যে ঐ বেড়া-নির্ম্মাণ! অথবা ধর—রাসমণির জামাতা মথুরানাথের সহিত তর্কে তাঁহার বলা "ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব হতে পারে—

ঠাকুরের ভাব-কালে দৃষ্ট বিষয়গুলি বাহ্যজগতে সত্য হইতে দেখা

ঐ দৃষ্টান্ত—পঞ্চবটীর বেড়া ইত্যাদি

লাল ফুলের গাছে সাদা ফুলও হতে পারে”, মথুরের তাহা অস্বীকার করা এবং পরদিনই ঠাকুরের বাগানের জবাগাছের একটি ডালের তুটি ফ্যাকড়ায় ঐরূপ তুটি ফুল দেখিতে পাওয়া ও ফুলশুদ্ধ ঐ ডালটি ভাঙ্গিয়া আনিয়া মথুরানাথকে দেওয়া! অথবা ধর—তন্ত্র বেদান্ত বৈষ্ণব ইস্‌লামাদি যখন যে মতের সাধনা করিবারই অভিলাষ ঠাকুরের প্রাণে উদিত হওয়া, তখনি সেই সেই মতের এক এক জন সিদ্ধ ব্যক্তির দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁহাকে ঐ ঐ মতে দীক্ষিত করা। অথবা ধর—ঠাকুরের ভক্তদিগকে আহ্বান ও তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রত্যেককে ঠাকুরের চিনিয়া গ্রহণ করা—ঐরূপ অনেক কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনুধাবন করিলে ঐ সকল ঘটনায় এইটি দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঠাকুরের মানসিক ভাবের অনেকগুলি সাধারণ মানবমনের ভাবসকলের ন্যায় কেবলমাত্র মানসিক চিন্তা বা প্রকাশরূপেই পর্য্যবসিত ছিল না। কিন্তু বাহ্যজগতের অন্তর্গত ঘটনাবলী ঐ সকলের দ্বারা আমাদের অপরিজ্ঞাত কি এক নিয়মবশে তদনুরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইত। আমরা এখানে উক্ত সত্যের নির্দ্দেশমাত্র করিয়াই ছাড়িয়া দিলাম। উহা হইতে পাঠকেরা যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি তদ্রূপ আলোচনা ও অনুমানাদি করুন—ঘটনা কিন্তু সত্যই ঐরূপ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঠাকুর নির্ব্বিকল্পসমাধি-অবস্থার সময় ভিন্ন অপর সকল সময়ে ‘ভাবমুখে’ থাকিতেন। এইজন্যই দেখা যায় তিনি তাঁহার সমীপাগত প্রত্যেক ভক্তের সহিত এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বরাবর সেই সেই সম্বন্ধ

অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার হ্লাদিনী ও সন্ধিনী শক্তির বিশেষবিকাশক্ষেত্রস্বরূপ যত স্ত্রীমূর্ত্তির সহিত ঠাকুরের আজীবন মাতৃ-সম্বন্ধের কথা এখন সাধারণে প্রসিদ্ধ। কিন্তু পুরুষভক্তদিগের প্রত্যেকের সহিত তাঁহার ঐরূপ এক একটি সম্বন্ধ থাকার কথা বোধ হয় সাধারণে এখনও জ্ঞাত নহে। সেজন্য ঐ সম্বন্ধে কিছু বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাধারণতঃ ঠাকুর তাঁর ভক্ত-দিগকে দুই থাকে বা শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতেন—শিবাংশসম্ভূত ও বিষ্ণু-অংশোদ্ভূত। ঐ দুই শ্রেণীর ভক্তদিগের প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার, ভজনানুরাগ প্রভৃতি সকল বিষয়ে পার্থক্য আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন এবং নিজে তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু ঐ পার্থক্য যে কি, তাহা বিশেষ করিয়া পাঠককে বুঝান আমাদের একপ্রকার সাধ্যাতীত।

প্রত্যেক ভক্তের সহিত ঠাকুরের বিভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ

অতএব সংক্ষেপে পাঠক ইহাই বুঝিয়া লউন যে, শিব ও বিষ্ণু-চরিত্র যেন দুইটি আদর্শ ছাঁচ (type or model) এবং ঐ দুই ভিন্ন ছাঁচে যেন ভক্তদিগের প্রত্যেকের মানসিক প্রকৃতি গঠিত—এই পর্য্যন্ত। ঐ সকল ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি সকলপ্রকার ভাবেরই সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল—অবশ্য বিভিন্ন জনের সহিত বিভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ ছিল। যথা, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলিতেন, "নরেন্দ্রর যেন আমার শ্বশুরঘর—(আপনাকে দেখাইয়া) এর ভেতর যেটা আছে সেটা যেন মাদি, আর (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) ওর ভেতর

ভক্তদিগের দুই শ্রেণী

যেটা আছে সেটা যেন মদ্দা"; শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ স্বামী বা রাখাল মহারাজকে ঠিক ঠিক নিজ পুত্রস্থানীয় বিবেচনা করিতেন। সন্ন্যাসী ও গৃহী বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগের প্রত্যেকের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ এক একটা বিশেষ বিশেষ ভাব বা সম্বন্ধ ছিল এবং সাধারণ ভক্তমণ্ডলীর প্রত্যেকের প্রতি ঠাকুরের নারায়ণ-বুদ্ধি সর্ব্বদা স্থির থাকায় তাহাদের সহিত শান্তভাবের সম্বন্ধ যে তিনি অবলম্বন করিয়া থাকিতেন, একথা বলা বাহুল্য। ভক্তদিগের প্রত্যেকের ভিতরকার প্রকৃতি দেখিয়াই ঠাকুরের তাহাদের সহিত ঐরূপ ভাব বা সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। কারণ ঠাকুর বলিতেন, "মানুষগুলোর ভেতর কি আছে, তা সব দেখতে পাই; যেমন কাঁচের আলমারির ভেতর যা যা জিনিস থাকে সব দেখা যায়, সেই রকম।" যাহার যেরূপ প্রকৃতি সে তদ্বিপরীতে কখনই আচরণ করিতে পারে না—কাজেই ভক্তদিগের কাহারও ঠাকুরের ঐ সম্বন্ধ বা ভাবের বিপরীতে গমন বা আচরণ কখন সাধ্যায়ত্ত ছিল না। যদি কখনও কেহ অপর কাহারও দেখাদেখি বিপরীত ভাবের আচরণ করিত ত ঠাকুর তাহাতে বিশেষ বিরক্ত হইতেন ও তাহার ভুল বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। যথা, শ্রীযুত গিরিশকে ঠাকুর ভৈরব বলিতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালিকা মাতার মন্দিরে ভাব-সমাধিতে তাঁহাকে একদিন ঐরূপ দেখিয়াছিলেন। শ্রীযুত গিরিশের অনেক আবদার ও কঠিন ভাষা তিনি হাসিয়া সহ্য করিতেন—কারণ তাঁহার ঐরূপ ভাষার আবরণে অপূর্ব্ব কোমল একান্ত-নির্ভরতার ভাব

ভক্তদিগের প্রকৃতি দেখিয়া ঠাকুরের প্রত্যেকের সহিত ভাব-সম্বন্ধ পাতান

যে লুক্কায়িত তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন। গিরিশের দেখাদেখি ঠাকুরের অপর জনৈক প্রিয় ভক্ত একদিন ঐরূপ ভাষা-প্রয়োগ করায় ঠাকুর তাহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত হন ও পরে তাহার ভুল তাহাকে বুঝাইয়া দেন। যাক এখন সে সব কথা, আমাদের বক্তব্য বিষয়ই বলিয়া যাই।

ভাবমুখাবস্থিত ঠাকুর ঐরূপে স্ত্রী বা পুরুষ প্রত্যেক ভক্তের নিজ নিজ প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক ভাব সম্যক বুঝিয়া তাহাদের সহিত তত্তদ্ভাবানুযায়ী একটা সপ্রেম সম্বন্ধ সর্ব্বকালের জন্য পাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। তত্তৎ ভাবসম্বন্ধাশ্রয়ে তাহাদের প্রত্যেককে ভগবদ্দর্শন-লাভের পথে যে কিরূপে কত প্রকারে অগ্রসর করাইয়া দিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে পাঠককে দিয়া আমরা এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। অদ্বৈত-ভাবভূমি হইতে নামিয়া আসিয়াই ঠাকুর স্বয়ং সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসোপলব্ধির জন্য সাধনা করিয়া তত্তৎভাবের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার অনেকদিন পরে যখন ভক্তেরা অনেকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তখন একদিন ঠাকুরের ভাবাবস্থায় ইচ্ছা হয় ভক্তদেরও ভাবসমাধি হউক এবং জগদম্বার নিকট ঐ বিষয়ে প্রার্থনা করেন। তাহার পরই ভক্তদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ঐরূপ হইতে থাকে। ঐরূপ ভাবাবস্থায় তাঁহাদের বাহ্যজগৎ ও দেহাদি-বোধ কতকটা কমিয়া যাইয়া ভিতরের কোন একটি বিশেষ ভাবপ্রবাহ, যথা—কোন মূর্ত্তিচিন্তা, এত পরিস্ফুট হইত যে, ঐ মূর্ত্তি যেন জলন্ত জীবন্তরূপে

ঠাকুর ভক্ত-দিগকে কত প্রকারে ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর করাইতেন

তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন ইত্যাদি তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। ভজন-সঙ্গীতাদি শুনিলেই তাঁহাদের প্রধানতঃ ঐরূপ হইত।

ভক্তদিগের দেবদেবীর মূর্ত্তিদর্শন

ঠাকুরের আর একদল ভক্ত ছিলেন যাঁহাদের সঙ্গীতাদি শুনিলে ওরূপ হইত না, কিন্তু ধ্যানাদি করিবার কালে দেবমূর্ত্ত্যাদির সন্দর্শন হইত। প্রথম প্রথম কেবলমাত্র দর্শনই হইত, পরে ধ্যান যত গাঢ় বা গভীর হইতে থাকিত, তত ঐ সকল মূর্ত্তির নড়াচড়া কথা-কওয়া ইত্যাদিও তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। আবার কেহ কেহ প্রথম প্রথম নানাপ্রকার দর্শনাদি করিতেন, কিন্তু ধ্যান আরও গভীরভাবপ্রাপ্ত হইলে আর ঐরূপ দর্শনাদি করিতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহাদের প্রত্যেকের দর্শন ও অনুভবাদির কথা শ্রবণ করিয়াই বুঝিতেন, কে কোন্ ‘থাক্’ বা শ্রেণীর এবং কাহার পক্ষে কি প্রয়োজন এবং পরেই বা তাঁহারা প্রত্যেকে কি দর্শনাদি করিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে একজনের কথাই বলি। আমাদের একটি বন্ধু[১] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া ধ্যানাদি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথম প্রথম ধ্যানের সময় ইষ্টমূর্ত্তির নানাভাবে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। যেমন যেমন দেখিতেন, কয়েকদিন অন্তর দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উহা ঠাকুরকে জানাইতেন। ঠাকুরও শুনিয়া বলিতেন, “বেশ হইয়াছে”, অথবা “এইরূপ করিস” ইত্যাদি। পরে একদিন ঐ বন্ধুটি ধ্যানের সময় দেখিলেন, যত প্রকার দেবদেবীর

১ স্বামী অভেদানন্দ

মূর্ত্তি একটি মূর্ত্তির অঙ্গে মিলিত হইয়া গেল। ঠাকুরকে ঐকথা নিবেদন করায় ঠাকুর বলিলেন, "যা, তোর বৈকুণ্ঠ-দর্শন হয়ে গেল। ইহার পর আর দর্শন হবে না।"

অনেক ভক্তের বৈকুণ্ঠদর্শন

আমাদের বন্ধু বলেন, "বাস্তবিকও তাহাই হইল—ধ্যান করিতে করিতে কোন মূর্ত্তিই আর দেখিতে পাইতাম না। শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্বাদি অন্যপ্রকারের উচ্চ ভাবসমূহ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। আমার তখন মূর্ত্তিদর্শন করা বেশ লাগিত, যাহাতে আবার ঐরূপ দর্শনাদি হয় তাহার চেষ্টাও খুব করিতাম; কিন্তু করিলে কি হইবে, কিছুতেই আর কোন মূর্ত্তির দর্শন হইত না!"

সাকারবাদী ভক্তদের বলিতেন, "ধ্যান কর্‌বার সময় ভাব্‌বে, যেন মনকে রেশমের রশি দিয়ে ইষ্টের পাদপদ্মে বেঁধে রাখ্‌চ, যেন সেখান থেকে আর কোথাও যেতে না পারে। রেশমের দড়ি বল্‌ছি কেন?—সে পাদপদ্ম যে বড় নরম। অন্য দড়ি দিয়ে বাঁধলে লাগবে তাই।" আবার বলিতেন, "ধ্যান কর্‌বার সময় ইষ্টচিন্তা করে তারপর কি অন্য সময় ভুলে থাক্‌তে হয়? কতকটা মন সেইদিকে সর্ব্বদা রাখবে। দেখেছ তো, দুর্গাপূজার সময় একটা যাগ-প্রদীপ জ্বাল্‌তে হয়। ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদা একটা জ্যোৎ (জ্যোতিঃ) রাখতে হয়, সেটাকে নিব্‌তে দিতে নেই। নিব্‌লে গেরস্তর অকল্যাণ হয়। সেইরকম হৃদয়পদ্মে ইষ্টকে এনে বসিয়ে তাঁর চিন্তারূপ যাগ-প্রদীপ সর্ব্বদা জ্বেলে রাখতে হয়।

সাকার-বাদীদের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ

রেশমের দড়ি ও 'জ্যোৎ' প্রদীপ

সংসারের কাজ কর্‌তে কর্‌তে মাঝে মাঝে ভেতরে চেয়ে দেখ্‌তে হয়, সে প্রদীপটা জ্বল্‌চে কিনা ?”

আবার বলিতেন, “ওগো, তখন তখন ইষ্টচিন্তা কর্‌বার আগে ভাব্‌তুম, যেন মনের ভেতরটা বেশ করে ধুয়ে দিচ্ছি ! মনের ভেতর নানান্ আবর্জ্জনা, ময়লা-মাটি (চিন্তা, বাসনা ইত্যাদি) থাকে কিনা ? সেগুলো সব বেশ করে ধুয়ে ধেয়ে সাফ্ করে তার ভেতর ইষ্টকে এনে বসাচ্চি !—এই রকম কোরো !” ইত্যাদি।

ধ্যান করবার আগে মনটা ধুয়ে ফেলা

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক সময়ে শ্রীভগবানের সাকার ও নিরাকার-ভাব-চিন্তা সম্বন্ধে আমাদের বলেন, “কেহ বা সাকার দিয়ে নিরাকারে পৌঁছায়, আবার কেহ বা নিরাকার দিয়ে সাকারে পৌঁছায়।” ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে বসিয়া একদিন আমাদের এক বন্ধু[১] ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—‘মহাশয়, সাকার বড় না নিরাকার বড় ?’ তাহাতে ঠাকুর বলেন, “নিরাকার দু রকম আছে, পাকা ও কাঁচা। পাকা নিরাকার উঁচু ভাব বটে ; সাকার ধরে সে নিরাকারে পৌঁছুতে হয়। কাঁচা নিরাকারে চোখ্ বুঁজলেই অন্ধকার—যেমন ব্রাহ্মদের[২]।” পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে ঐরূপ

সাকার বড় না নিরাকার বড়

১ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু

২ সত্যের অনুরোধে এ কথাটি আমরা বলিলাম বলিয়া কেহ না মনে করেন, ঠাকুর বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মজ্ঞানীদের নিন্দা করিতেন। কীর্ত্তনান্তে যখন সকল সম্প্রদায়ের সকল ভক্তদের প্রণাম করিতেন, তখন

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

কাঁচা নিরাকার ধরিয়া সাধনায় অগ্রসর ঠাকুরের আর একদল ভক্তও ছিলেন। তাঁহাদের ঠাকুর ক্রীশ্চান পাদ্রীদের মত সাকারভাব চিন্তার নিন্দা অথবা শ্রীভগবানের সাকারমূর্ত্ত্যাদি-অবলম্বনে সাধনায় অগ্রসর ভক্তদিগকে 'পৌত্তলিক' 'অন্ধবিশ্বাসী' ইত্যাদি বলিয়া দ্বেষ করিতে নিষেধ করিতেন। বলিতেন, "ওরে তিনি সাকারও বটে আবার নিরাকারও বটে, আবার তা ছাড়া আরও কি তা কে জানে? সাকার কেমন জানিস্—যেমন জল আর বরফ। জল জমেই বরফ হয়; বরফের ভিতরে বাহিরে জল। জল ছাড়া বরফ আর কিছুই নয়। কিন্তু ছাখ, জলের রূপ নেই (একটা কোন বিশেষ আকার নাই), কিন্তু বরফের আকার আছে। তেমনি ভক্তি-হিমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরের জল জমে বরফের মত নানা আকার ধারণ করে। ঠাকুরের ঐ দৃষ্টান্তটি যে কত লোকের মনে শ্রীভগবানের সাকার নিরাকার উভয় ভাবের একত্রে এক সময়ে সমাবেশ সম্ভবপর বলিয়া ধারণা করাইয়া শান্তি দিয়াছে, তাহা বলিবার নহে।

সাকার ও নিরাকারের সামঞ্জস্য

এখানে আর একটি কথাও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি

'আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম'—একথাটি তাঁহাকে বার বার আমরা বলিতে শুনিয়াছি। সুবিখ্যাত ব্রাহ্মসমাজের নেতা ভক্তপ্রবর কেশবই সর্ব্বপ্রথম ঠাকুরের কথা কলিকাতার জনসাধারণে প্রচার করেন, একথা সকলেই জানেন এবং ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদের মধ্যে শ্রীবিবেকানন্দ-প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মসমাজের নিকট চিরঋণী, একথাও তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

না। ঠাকুরের কাঁচা নিরাকারবাদী ভক্তদলের ভিতর সর্ব্বপ্রধান ছিলেন—শুধু ঐ দলের কেন ঠাকুর তাঁহাকে সকল থাক্ বা শ্রেণীর সকল ভক্তদিগের অগ্রে আসন প্রদান করিতেন—শ্রীযুত নরেন্দ্র বা স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার তখন পাশ্চাত্যশিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে সাকারবাদীদের উপর একটু আধটু কঠিন কটাক্ষ কখন কখন আসিয়া পড়িত। তর্কের সময়েই ঐ ভাবটি তাঁহাতে বিশেষ লক্ষিত হইত। ঠাকুর কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত সাকারবাদী কোন কোন ভক্তের ঘোরতর তর্ক বাধাইয়া দিয়া মজা দেখিতেন। ঐরূপ তর্কে স্বামীজির মুখের সামনে বড় একটা কেহ দাঁড়াইতে পারিতেন না এবং স্বামীজির তীক্ষ্ণ যুক্তির সম্মুখে নিরুত্তর হইয়া কেহ কেহ মনে মনে ক্ষুণ্ণও হইতেন। ঠাকুরও সে কথা অপরের নিকট অনেক সময় আনন্দের সহিত বলিতেন, "অমুকের কথাগুলো নরেন্দর সে দিন ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে কেটে দিলে!—কি বুদ্ধি!" ইত্যাদি। সাকারবাদী গিরিশের সহিত তর্কে কিন্তু স্বামীজিকে একদিন নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল। সেদিন ঠাকুর শ্রীযুত গিরিশের বিশ্বাস আরও দৃঢ় ও পুষ্ট করিবার জন্যই যেন তাঁহার পক্ষে ছিলেন বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, স্বামী বিবেকানন্দ একদিন শ্রীভগবানে বিশ্বাস সম্বন্ধে কথার সময় ঠাকুরের নিকট সাকারবাদীদের বিশ্বাসকে 'অন্ধবিশ্বাস' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঠাকুর তদুত্তরে তাঁহাকে বলেন, "আচ্ছা, অন্ধবিশ্বাসটা কাকে বলিস্ আমায় বোঝাতে পারিস্? বিশ্বাসের তো সবটাই অন্ধ; বিশ্বাসের আবার

স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্ধবিশ্বাস

চক্ষু কি? হয় বল্ 'বিশ্বাস', আর নয় বল্ 'জ্ঞান'। তা নয়, বিশ্বাসের ভেতর আবার কতকগুলো অন্ধ আর কতকগুলোর চোখ আছে—এ আবার কি রকম?" স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "বাস্তবিকই সেদিন আমি ঠাকুরকে অন্ধবিশ্বাসের অর্থ বুঝাইতে যাইয়া ফাঁপরে পড়িয়াছিলাম। ও কথাটার কোনও অর্থই খুঁজিয়া পাই নাই। ঠাকুরের কথাই ঠিক বলিয়া বুঝিয়া সেদিন হইতে আর ও কথাটা বলা ছাড়িয়া দিয়াছি।"

কাঁচা নিরাকারবাদীদেরও ঠাকুর সাকারবাদীদের সহিত সমান চক্ষে দেখিতেন। তাহাদেরও কিরূপভাবে ধ্যান করিলে সহায়ক হইবে বলিয়া দিতেন। বলিতেন, "দ্যাখ্, আমি তখন তখন ভাবতুম, ভগবান যেন সমুদ্রের জলের মত সব জায়গা পূর্ণ করে রয়েছেন, আর আমি যেন একটি মাছ—সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবছি, ভাসছি, সাঁতার দিচ্ছি! আবার কখন মনে হত, আমি যেন একটি কুম্ভ, সেই জলে ডুবে রয়েছি, আর আমার ভিতরে বাহিরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ হয়ে রয়েছেন।" আবার বলিতেন, "দ্যাখ্, ধ্যান করতে বসবার আগে একবার (আপনাকে দেখাইয়া) একে ভেবে নিবি। কেন বলছি?—এখানকার ওপর তোদের বিশ্বাস আছে কি না! একে ভাবলেই তাঁকে (ভগবানকে) মনে পড়ে যাবে। ঐ যে গো, যেমন গরুর পাল দেখলেই রাখালকে মনে পড়ে, ছেলেকে দেখলেই তার বাপের কথা মনে পড়ে, উকীল দেখলেই কাছারীর কথা মনে পড়ে, সেই রকম

নিরাকার-বাদীদের প্রতি উপদেশ

বুঝলে কি না? মন নানান্ জায়গায় ছড়িয়ে থাকে কি না, একে ভাবলেই মনটা এক জায়গায় গুটিয়ে আসবে, আর সেই মনে ঈশ্বরকে চিন্তা করলে তাতে ঠিক ঠিক ধ্যান লাগবে—এই জন্যে বলছি।" আবার বলিতেন, "যাঁকে ভাল লাগে, যে ভাব ভাল লাগে, এক জনকে বা একটাকে পাকা করে ধর, তবে ত আঁট হবে। 'সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।'—ভাব চাই। একটা ভাব নিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। 'যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়। ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।' ভাব চাই, বিশ্বাস চাই, পাকা করে ধরা চাই—তবে ত হবে। ভাব কি জান?—তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতান—এরই নাম। সেইটে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা, যেমন—তাঁর দাস আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি; এই হচ্ছে পাকা আমি, বিদ্যার আমি—এইটি খেতে শুতে বসতে সব সময় স্মরণ রাখা। আর এই যে বামুন আমি, কায়েৎ আমি, অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি—এ সব হচ্ছে অবিদ্যার আমি; এগুলোকে ছাড়তে হয়, ত্যাগ করতে হয়—ওগুলোতে অভিমান-অহঙ্কার বাড়িয়ে বন্ধন এনে দেয়। স্মরণ-মননটা সর্ব্বদা রাখা চাই, খানিকটে মন সব সময় তাঁর দিকে ফিরিয়ে রাখবে—তবে তো হবে। একটা ভাব পাকা করে ধরে তাঁকে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো তাঁর উপর জোর চলবে। এই গ্যাখ না, প্রথম প্রথম একটু-

ঠাকুরের নিজ মূর্ত্তি ধ্যান করিতে উপদেশ

'কাঁচা আমি ও পাকা আমি'; একটা ভাব পাকা করে ধরলে তবে ঈশ্বরের উপর জোর চলে

আধটু ভাব যতক্ষণ, ততক্ষণ 'আপনি, মশাই' ইত্যাদি লোকে বলে থাকে; সেই ভাব যেই বাড়ল, অমনি 'তুমি তুমি'—আর তখন 'আপনি টাপ্‌নি' গুলো বলা আসে না; যেই আরও বাড়ল, আর তখন 'তুমি টুমি'তেও মানে না—তখন 'তুই মুই'! তাঁকে আপনার হতে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো হবে। যেমন নষ্ট মেয়ে, পরপুরুষকে প্রথম প্রথম ভালবাসতে শিখচে—তখন কত লুকোলুকি, কত ভয়, কত লজ্জা, তারপর যেই ভাব বেড়ে উঠলো, তখন আর কিছু নেই! একেবারে তার হাত ধরে সকলের সাম্‌নে কুলের বাইরে এসে দাঁড়ালো! তখন যদি সে পুরুষটা তাকে আদর-যত্ন না করে, ছেড়ে যেতে চায়, তো তার গলায় কাপড় দিয়ে টেনে ধরে বলে, 'তোর জন্যে পথে দাঁড়ালুম, এখন তুই খেতে দিবি কি না বল্‌।' সেই রকম, যে ভগবানের জন্য সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার করে নিয়েচে, সে তাঁর ওপর জোর করে বলে, 'তোর জন্যে সব ছাড়লুম, এখন দ্যাখা দিবি কি-না—বল্‌'!"

নষ্ট মেয়ের দৃষ্টান্ত

কাহারও ভগবদনুরাগের জোর কমিয়াছে দেখিলে বলিতেন, "এ জন্মে না হোক্ পর জন্মে পাব, ও কি কথা? অমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নেই। তাঁর কৃপায় তাঁকে এ জন্মেই পাব, এখনি পাব—মনে এইরকম জোর রাখতে হয়, বিশ্বাস রাখতে হয়, তা না হলে কি হয়? ও দেশে চাষীরা সব গরু কিনতে গিয়ে গরুর ল্যাজে আগে হাত দেয়। কতকগুলো গরু আছে ল্যাজে হাত দিলে কিছু বলে না, গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে—অমনি তারা বোঝে

এ জন্মে ঈশ্বর-লাভ করবো—মনে এই জোর রাখা চাই

সেগুলো ভাল নয়। আর যেগুলোর ল্যাজে হাত দেবামাত্র তিড়িং মিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে—অমনি বোঝে এইগুলো খুব কাজ দেবে—ঐগুলোর ভিতর থেকে পছন্দ করে কেনে। ম্যাদাটে ভাব ভাল নয়; জোর নিয়ে এসে, বিশ্বাস করে বল—তাঁকে পাবই পাব, এখনি পাব—তবে ত হবে।"

এক এক করে বাসনাত্যাগ করা চাই

আবার বলিতেন, "এ দিককার বাসনাকামনাগুলো সব এক এক করে ছাড়বে, তবে ত হবে। কোথা ও গুলোকে সব এক এক করে ছাড়বে—না আরও বাড়াতে চল্‌লে!—তা হলে কেমন করে হবে?"

যখন ধ্যান-ভজন, প্রার্থনাদি করিয়া শ্রীভগবানের সাড়া না পাইয়া মন নিরাশার সাগরে ভাসিত, তখন সাকার নিরাকার উভয় বাদীদেরই বলিতেন, "মাছ ধরতে গেলে প্রথম চার করতে হয়। হয়ত চার করে ছিপ ফেলে বসেই আছে—মাছের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্চে তবে বুঝি পুকুরে মাছ নেই। তারপর হয়ত একদিন দেখলে একটা বড় মাছ ঘাই দিলে—অমনি বিশ্বাস হল পুকুরে মাছ আছে। তারপর হয়ত একদিন ছিপের ফাৎনাটা নড়লো—অমনি মনে হলো চারে মাছ এয়েছে। তারপর হয়ত একদিন ফাৎনাটা ডুবলো, তুলে দেখলে—মাছ টোপ খেয়ে পালিয়েছে; আবার টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে খুব সাবধানে বসে রইল। তারপর একদিন যেমন টোপ খেয়েছে, অমনি টেনে তুলতেই মাছ আড়ায় উঠলো।" কখন বলিতেন, "তিনি খুব কাণখড়কে, সব

চার করে মাছ ধরার মত অধ্যবসায় চাই

ভগবান 'কাণখড়্‌কে' —সব শুনেন

শুনতে পান গো। যত ডেকেছ সব শুনেছেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই দেবেন। অন্ততঃ মৃত্যু সময়েও দেখা দেবেন।” কাহাকেও বলিতেন—“সাকার কি নিরাকার যদি ঠিক করতে না পারিস তো এই বলে প্রার্থনা করিস্ যে, ‘হে ভগবান, তুমি সাকার কি নিরাকার আমি বুঝতে পারি না; তুমি যাহাই হও আমায় কৃপা কর, দেখা দাও’।” আবার কাহাকেও বলিতেন—“সত্য সত্যই ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যায় রে, এই যেমন তোতে আমাতে এখন বসে কথা কইচি এইরকম তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কহা যায়,—সত্য বলছি, মাইরি বলছি।”

গভীর ভাব-প্রবণতার সহিত ঠাকুরের সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা

আর এক কথা—চব্বিশঘণ্টা ‘ভাবমুখে’ থাকিলে ভাবুকতার এত বৃদ্ধি হয় যে, তাহার দ্বারা আর সংসারের অপর কোন কর্ম্ম চলে না, অথবা সে সংসারের ছোটখাট ব্যাপার আর মনে রাখিতে পারে না—সর্ব্বত্র আমরা এইরূপই দেখিতে পাই। উহার দৃষ্টান্ত—ধর্ম্ম-জগতে তো কথাই নাই, বিজ্ঞান, রাজনীতি বা অন্য সকল স্থানেও বিশেষ মনস্বী পুরুষগণের জীবনা-লোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়—তাঁহারা হয়ত নিজের অঙ্গসংস্কার বা নিত্যব্যবহার্য্য জিনিস-পত্রের যথাযথ স্থানে রাখা ইত্যাদি সামান্য বিষয়সকলে একেবারেই অপটু ছিলেন। ঠাকুরের জীবনে কিন্তু দেখিতে পাই যে, অত অধিক ভাবপ্রবণতার ভিতরেও তাঁহার ঐ প্রকার সামান্য বিষয়সকলেরও হুঁশ থাকিত! যখন থাকিত না তখন নিজের দেহ বা জগৎ-সংসারের কোন

বস্তু বা ব্যক্তিরই হুঁশ থাকিত না—যেমন সমাধিতে; আর যখন থাকিত, তখন সকল বিষয়েরই থাকিত! ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এখানে দুই-একটি মাত্র ঐরূপ দৃষ্টান্তেরই আমরা উল্লেখ করিব।

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর হইতে বলরাম বাবুর বাটী গমন করিতেছেন—সঙ্গে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল ও শ্রীযুত যোগানন্দ স্বামী যাইতেছেন। সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া বাগানের 'গেট' পর্য্যন্ত আসিয়াছে মাত্র, ঠাকুর শ্রীযুত যোগানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে, নাইবার কাপড় গামছা এনেছিস তো?" তখন প্রাতঃকাল।

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত

শ্রীযুত যোগেন—না মশাই, গামছা এনেছি, কাপড়খানা আনতে ভুল হয়েছে। তা তারা (বলরাম বাবু) আপনার জন্য একখানা নূতন কাপড় দেখে-শুনে দেবে এখন।

ঠাকুর—ও কি তোর কথা? লোকে বলবে, কোথা থেকে একটা হাবাতে এসেছে। তাদের কষ্ট হবে, আতান্তরে পড়বে—যা, গাড়ী থামিয়ে নেবে গিয়ে নিয়ে আয়।

কাজেই যোগীন স্বামীজি তদ্রূপ করিলেন।

ঠাকুর বলিতেন—ভাল লোক, লক্ষ্মীমন্ত লোক বাড়ীতে এলে সকল বিষয়ে কেমন সুসার হয়ে যায়, কাকেও কিছুতে বেগ পেতে হয় না। আর হাবাতে হতচ্ছাড়াগুলো এলে সকল বিষয়ে বেগ পেতে হয়; যে দিন ঘরে কিছু নেই, তার জন্য গেরস্থকে বিশেষ কষ্ট পেতে হবে; ঠিক সেই দিনেই সে এসে উপস্থিত হয়।

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীযুত প্রতাপ হাজরা নামক এক ব্যক্তি ঠাকুরের সময়ে দক্ষিণেশ্বরে অনেককাল সাধুভাবে কাটাইতেন। আমরা সকলে ইঁহাকে হাজরা মহাশয় বলিয়া ডাকিতাম। ইনিও মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের কলিকাতার ভক্তদিগের নিকট আগমনকালে তাঁহার সঙ্গে আসিতেন। একবার ঐরূপে আসিয়া প্রত্যাগমনকালে নিজের গামছাখানি ভুলিয়া কলিকাতায় ফেলিয়া যান। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ঐ কথা জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন—"ভগবানের নামে আমার পরণের কাপড়ের হুঁশ থাকে না, কিন্তু আমি তো একদিনও নিজের গামছা বা বেটুয়া কলিকাতায় ভুলিয়া আসি না, আর তোর একটু জপ করে এত ভুল!"

ঐ বিষয়ে ২য় দৃষ্টান্ত

শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর শিখাইয়াছিলেন—"গাড়ীতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোনও জিনিসটা নিতে ভুল হয়েছে কি না দেখে-শুনে সকলের শেষে নামবে।" ঠাকুরের অতি সামান্য বিষয়ে এত নজর ছিল।

ঐ বিষয়ে ৩য় দৃষ্টান্ত—শ্রীশ্রীমার প্রতি উপদেশ

এইরূপে 'ভাবমুখে' নিরন্তর থাকিয়াও ঠাকুরের আবশ্যকীয় সকল বিষয়ের হুঁশ থাকিত; যে জিনিসটি যেখানে রাখিতেন তাহা সর্ব্বদা সেইখানেই রাখিতেন, নিজের কাপড়-চোপড় বেটুয়া প্রভৃতি সকল নিত্য ব্যবহার্য্য-দ্রব্যের নিজে খোঁজ রাখিতেন, কোথাও যাইবার আসিবার সময় আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যাদি আনিতে ভুল হইয়াছে কি না সন্ধান লইতেন এবং ভক্তদিগের মানসিক ভাবসমূহের

ঐ বিষয়ে শেষ কথা

যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান রাখিতেন, তেমনি তাহাদের সংসারের সকল বিষয়ের সন্ধান রাখিয়া কিসে তাহাদের বাহ্যিক সকল বিষয়ও সাধনার অনুকূল হইতে পারে তদ্বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা করিতেন।

ঠাকুরের কথা অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, তিনি যেন সর্ব্বপ্রকার ভাবের মূর্ত্তিমান সমষ্টি ছিলেন। ভাবরাজ্যের অত বড় রাজা মানবজগতে আর কখনও দেখা যায় নাই। ভাবময় ঠাকুর 'ভাবমুখে' অবস্থান করিয়া নির্ব্বিকল্প অদ্বৈতভাব হইতে সবিকল্প সকল প্রকার ভাবের পূর্ণ প্রকাশ নিজে দেখাইয়া সকল শ্রেণীর ভক্তদিগকে স্ব স্ব পথের ও গন্তব্য স্থলের সংবাদ দিয়া অন্ধকারে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, নিরাশায় অদৃষ্টপূর্ব্ব আশা এবং সংসারের নিদারুণ দুঃখকষ্টের ভিতর নিরুপম শান্তি আনিয়া দিতেন। ঠাকুর যে সকলের কি ভরসার স্থল ছিলেন তাহা বলিয়া বুঝান দায়। মনোরাজ্যে—

ঠাকুর ভাব-রাজ্যের মূর্ত্তিমান রাজা

তাঁহার যে কি প্রবল প্রতাপ দেখিয়াছি তাহা বলা অসম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—'মনের বাহিরের জড়-শক্তিসকলকে কোন উপায়ে আয়ত্ত করে কোন একটা অদ্ভুত ব্যাপার (miracle) দেখান বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাতে নিয়ে ভাঙ্গত, পিট্‌ত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতন ভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্চর্য্য ব্যাপার (miracle) আমি আর কিছুই দেখি না!'

মানবমনের উপর তাঁহার অপূর্ব্ব আধিপত্য। স্বামী বিবেকানন্দের ঐ বিষয়ক কথা

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ ॥
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥

গীতা—২।২৯

ঠাকুরকে যাঁহারা দু'চারবার মাত্র দেখিয়াছেন অথবা যাঁহারা তাঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন নাই, উপর উপর দেখিয়াছেন মাত্র, তাঁহারা গুরুভাবে ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের লীলার কথা কাহারও মুখে শুনিতে পাইলে একেবারে অবাক হইয়া থাকেন! ভাবেন, 'লোকটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাগুলো বলছে।' আবার যখন দেখেন অনেকে ঐ ভাবের কথা বলিতেছে তখনও মনে করেন, "এরা সব একটা মতলব করে দল পাকিয়েচে, আর শ্রীরাম-কৃষ্ণকে ঠাকুর করে তুলেচে—তিন শ' তেত্রিশ কোটীর ওপর আবার একটা বাড়াতে চলেছে! কেন রে বাপু, অতগুলো ঠাকুরেও কি তোদের শানে না? যাকে ইচ্ছা, যতগুলো ইচ্ছা, ওরি ভিতর থেকে নে না—আবার একটা বাড়ান কেন? কি আশ্চর্য্য!

ঠাকুর 'গুরু' 'বাবা' বা 'কর্ত্তা' বলিয়া সম্বোধিত হইলে বিরক্ত হইতেন। তবে গুরুভাব তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবে?

এরা একবার ভাবেও না গা যে, মিথ্যা কথাগুলো ধরা পড়লে অমন পবিত্র লোকটার উপরে লোকের ভক্তি একেবারে চটে যাবে! আমরাও তো তাঁকে দেখেছি!—সকলের কাছে নীচু, নম্রভাব—একেবারে যেন মাটি, যেন সকলের চাইতে ছোট—এতটুকু অহঙ্কার নেই! তারপর একথা তো তোরাও বলিস্, আর আমরাও দেখেছি যে, 'গুরু' কি 'বাবা' কি 'কর্ত্তা' বলে তাঁকে কেউ ডাকলে তিনি একেবারে সইতেই পারতেন না; বলে উঠতেন, 'ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্ত্তা—আমি হীনের হীন, দাসের দাস, তোমার গায়ের একগাছি ছোট রোমের সমান—একগাছি বড়র সমানও নই!'—বলেই হয়ত আবার তার পায়ের ধূলো তুলে নিজের মাথায় দিতেন! এমন দীনভাব কোথাও কেউ কি দেখেছে? আর সেই লোককে কিনা এরা 'গুরু' 'ঠাকুর',—যা নয় তাই বলচে, যা নয় তাই করচে!"

এইরূপ অনেক বাদানুবাদ চলা অসম্ভব নহে বলিয়াই আমরা ঠাকুরের গুরুভাব-সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহার কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ বাস্তবিকই ঠাকুর যখন সাধারণ ভাবে থাকিতেন, তখন আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে ঠিক ঠিক নারায়ণ-বুদ্ধি স্থির রাখিয়া মানুষের তো কথাই নাই, সকল প্রাণীরই 'দাস আমি' এই ভাব লইয়া থাকিতেন; বাস্তবিকই তখন তিনি আপনাকে হীনের হীন, দীনের দীন জ্ঞানে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিতেন এবং বাস্তবিকই সে সময় তিনি 'গুরু' 'কর্ত্তা' বা 'পিতা' বলিয়া সম্বোধিত হইলে সহিতে পারিতেন না।

সর্ব্বভূতে নারায়ণ-বুদ্ধি স্থির থাকায় ঠাকুরের দাস-ভাব সাধারণ

কিন্তু সাধারণ ভাবে অবস্থানের সময় ঐরূপ করিলেও ঠাকুরের গুরুভাবের অপূর্ব্ব লীলার কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করি? সে অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্যভাবাবেশে যখন তিনি যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কাহাকেও স্পর্শমাত্রেই সমাধি, গভীর ধ্যান বা ভগবদানন্দের অভূতপূর্ব্ব নেশার ঝোঁকে[১] নিমগ্ন করিতেন, অথবা কি এক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাহার মনের তমোগুণ বা মলিনতা এতটা টানিয়া লইতেন যে, সে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বে যেরূপ কখনও অনুভব করে নাই, এ প্রকার একটা মনের একাগ্রতা, পবিত্রতা ও আনন্দ লাভ করিত এবং আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া ঠাকুরের চরণতলে চিরকালের নিমিত্ত আত্মবিক্রয় করিত—তখন তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত এ ঠাকুর পূর্ব্বের সেই দীনের দীন ঠাকুর নহেন; ইঁহাতে কি একটা ঐশ্বরিক শক্তি স্বেচ্ছায় বা লীলায় প্রকটিত হইয়া ইঁহাকে আত্মহারা করিয়া ঐরূপ করাইতেছে; ইনি বাস্তবিকই অজ্ঞানতিমিরান্ধ, ত্রিতাপে তাপিত, ভবরোগগ্রস্ত অসহায় মানবের গুরু, ত্রাতা এবং শ্রীভগবানের পরম পদের দর্শয়িতা! ভক্তেরা ঠাকুরের ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গুরু, কৃপাময়, ভগবান্ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও যথার্থ

কিন্তু দিব্য-ভাবাবেশে তাঁহাতে গুরু-ভাবের লীলা নিত্য দেখা যাইত। ঠাকু-রের তখনকার ব্যবহারে ভক্ত-দিগের কি মনে হইত

১ বাস্তবিকই তখন অধিক পরিমাণে সিদ্ধি খাইলে যেমন নেশা হয়, তেমনি একটা নেশার ঘোর উপস্থিত হইত। কাহারও কাহারও পা-ও টলিতে দেখিয়াছি; ঠাকুরের নিজের তো কথাই ছিল না। ঐরূপ নেশার ঝোঁকে পা এমন টলিত যে, আমাদের কাহাকেও ধরিয়া তখন চলিতে হইত। লোকে মনে করিত, বিপরীত নেশা করিয়াছেন।

দীনভাব এবং এই দিব্য ঐশ্বরিক গুরুভাব যে একত্রে একজনে অবস্থান করিতে পারে, তাহা আমরা বর্ত্তমান যুগে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণে যথার্থই দেখিয়াছি এবং দেখিয়াছি বলিয়াই উহারা কেমনে একত্রে একই মনে থাকে সে বিষয়ে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিতে চেষ্টা করিতেছি। ঐরূপ চেষ্টা করিলেও যতটুকু বুঝিয়াছি ততটুকুও ঠিক ঠিক বুঝাইতে পারিব কি না জানি না; আর সম্যক বুঝা বা বুঝান লেখক ও পাঠক উভয়েরই সাধ্যাতীত; কারণ ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের ভাবের ইয়ত্তা নাই। ঠাকুর বলিতেন, "শ্রীভগবানের 'ইতি' নাই।" আমাদের প্রত্যক্ষ, এ লোকোত্তর পুরুষেরও তদ্রূপ ভাবের 'ইতি' নাই।

ভাবময় ঠাকুরের ভাবের ইতি নাই

সচরাচর লোকে ঠাকুর 'ভাবমুখে' থাকিতেন শুনিলেই ভাবিয়া বসে যে, তিনি জ্ঞানী ছিলেন না। ভগবদনুরাগ ও বিরহে মনে যে সুখদুঃখাদি ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই লইয়া সদা সর্ব্বক্ষণ থাকিতেন। কিন্তু 'ভাবমুখে' থাকাটি যে কি ব্যাপার বা কিরূপ অবস্থায় উহা সম্ভব, তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে বর্ত্তমান বিষয়টি বুঝিতে পারিব; সেজন্য 'ভাবমুখে থাকা' অবস্থাটির সংক্ষেপ আলোচনা এখানে একবার আর এক প্রকারে করিয়া লওয়া যাক। পাঠক মনে মনে ভাবিয়া লউন—তিন দিনের সাধনে ঠাকুরের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইল।

সাধারণের বিশ্বাস—ঠাকুর ভক্ত ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন না। 'ভাবমুখে থাকা' কথনও কিরূপে সম্ভবে বুঝিলে এ কথা আর বলা চলে না

প্র—নির্ব্বিকল্প সমাধিটি কি?

উ—মনকে একেবারে সংকল্পবিকল্পরহিত অবস্থায় আনয়ন করা।

প্র—সংকল্প-বিকল্প কাহাকে বলে?

উ—বাহ্য জগতের রূপরসাদ বিষয়সকলের জ্ঞান বা অনুভব, সুখদুঃখাদি ভাব, কল্পনা, বিচার, অনুমান প্রভৃতি মানসিক চেষ্টা এবং ইচ্ছা বা 'এটা করিব', 'ওটা বুঝিব', 'এটা ভোগ করিব', 'ওটা ত্যাগ করিব' ইত্যাদি মনের সমস্ত বৃত্তিকে।

প্র—বৃত্তিসকল কোন্ জিনিসটা থাকিলে তবে উঠিতে পারে?

উ—'আমি' 'আমি' এই জ্ঞান বা বোধ। 'আমি'-বোধ যদি চলিয়া যায় বা কিছুক্ষণের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তবে সে সময়ের মত কোনও বৃত্তিই আর মনে খেলা বা রাজত্ব করিতে পারে না।

'আমি'-বোধাশ্রয়ে মানসিক বৃত্তিসমূহের উদয়। উহার আংশিক লোপে সবিকল্প ও পূর্ণ লোপে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। সমাধি, মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তির প্রভেদ

প্র—মূর্চ্ছা বা গভীর নিদ্রাকালেও তো 'আমি'-বোধ থাকে না—তবে নির্ব্বিকল্প সমাধিটা ঐরূপ একটা কিছু?

উ—না; মূর্চ্ছা বা সুষুপ্তিতে 'আমি'-বোধ ভিতরে ভিতরে থাকে, তবে মস্তিষ্করূপ (brain) যে যন্ত্রটার সহায়ে মন 'আমি' 'আমি' করে সেটা কিছুক্ষণের জন্য কতকটা জড়ভাবাপন্ন হয় বা চুপ করিয়া থাকে; এইমাত্র—ভিতরে বৃত্তিসমূহ গজ্‌গজ্ করিতে থাকে, ঠাকুর যেমন দৃষ্টান্ত দিতেন, 'পায়রাগুলো মটর খেয়ে গলা ফুলিয়ে বসে আছে বা বক্‌-বকম্ করে আওয়াজ করচে—তুমি মনে করচ তাদের গলার ভিতরে কিছুই নাই—কিন্তু যদি গলায় হাত দিয়ে দেখ তো দেখ্‌বে মটর গজ্‌গজ্ করচে!'

প্র—মূর্চ্ছা বা সুষুপ্তিতে যে 'আমি'-বোধটা ঐরূপে থাকে তা বুঝিব কিরূপে?

উ—ফল দেখিয়া; যথা—ঐ সকল সময়েও হৃদয়ের স্পন্দন, হাতের নাড়ি, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি বন্ধ হয় না—ঐ সকল শারীরিক ক্রিয়াও 'আমি'-বোধটাকে আশ্রয় করিয়া হয়; দ্বিতীয় কথা, মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তির বাহ্যিক লক্ষণ কতকটা সমাধির মত হইলেও ঐ সকল অবস্থা হইতে মানুষ যখন আবার সাধারণ বা জাগ্রৎ অবস্থায় আসে, তখন তাহার মনে জ্ঞান ও আনন্দের মাত্রা পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকে, কিছুমাত্র বাড়ে বা কমে না—কামুকের যেমন কাম তেমনি থাকে, ক্রোধীর যেমন ক্রোধ তেমনি থাকে, লোভীর লোভ সমান থাকে ইত্যাদি। নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা লাভ হইলে কিন্তু ঐ সকল বৃত্তি আর মাথা তুলিতে পারে না; অপূর্ব্ব জ্ঞান ও অসীম আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জগৎকারণ ভগবানের সাক্ষাৎদর্শনে মনে আর পরকাল আছে কি না, ভগবান্ আছেন কি না—এ সকল সংশয়-সন্দেহ উঠে না।

সমাধির ফল—জ্ঞান ও আনন্দের বৃদ্ধি এবং ভগবদ্দর্শন

প্র—আচ্ছা বুঝিলাম, ঠাকুরের নির্ব্বিকল্প সমাধিতে কিছুক্ষণের জন্য 'আমি'-বোধের একেবারে লয় হইল; তাহার পর?

উ—তাহার পর ঐরূপে 'আমি'-বোধটার লোপ হইয়া কারণরূপিণী শ্রীশ্রীজগন্মাতার কিছুক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ দর্শনে ঠাকুর তৃপ্ত না হইয়া সদা-সর্ব্বক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্র—সে চেষ্টার ফলে ঠাকুরের মনের কিরূপ অবস্থা হইল এবং কিরূপ লক্ষণই বা শরীরে প্রকাশিত হইল?

উ—কখন 'আমি'-বোধের লোপ হইয়া শরীরে মৃতব্যক্তির লক্ষণসকল প্রকাশিত হইয়া ভিতরে জগদম্বার পূর্ণ বাধামাত্রশূন্য সাক্ষাৎ দর্শন—আবার কখন অত্যল্পমাত্র 'আমি'-বোধ উদিত হইয়া শরীরে জীবিতের লক্ষণ একটু-আধটু প্রকাশ পাওয়া ও সত্ত্বগুণের অতিশয় আধিক্যে শুদ্ধ স্বচ্ছ পবিত্র মন-রূপ ব্যবধান বা পর্দ্দার ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার কিঞ্চিৎ বাধাযুক্ত দর্শন—এইরূপে কখন 'আমি'-বোধের লোপ, মনের বৃত্তিসকলের একেবারে লয় ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণ দর্শন ও কখন 'আমি'-বোধের একটু উদয়, মনের বৃত্তিসকলের ঈষৎ প্রকাশ ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন ঈষৎ আবরিত হওয়া। এইরূপ বার বার হইতে লাগিল।

ঠাকুরের ছয় মাস নির্ব্বিকল্প সমাধিতে থাকিবার কালের দর্শন ও অনুভব

প্র—কতদিন ধরিয়া ঠাকুর ঐরূপ চেষ্টা করেন?

উ—নিরন্তর ছয়মাস কাল ধরিয়া।

প্র—বল কি? তবে তাঁহার শরীর রহিল কিরূপে? কারণ ছয়মাস না খাইলে তো আর মানবদেহ থাকিতে পারে না এবং তোমরা তো বল যতটা শরীরবোধ আসিলে আহারাদি কার্য্য করা চলে, ঠাকুরের ঐকালে মাঝে মাঝে 'আমি'-বোধের উদয় হইলেও ততটা কখনই আসে নাই।

'আমি'-বোধের সম্পূর্ণ লোপে ঐ কালে তাঁহার শরীর রহিল কিরূপে

উ—সত্যই ঠাকুরের শরীর থাকিত না এবং 'শরীরটা কিছুকাল

থাকুক' এরূপ ইচ্ছার লেশমাত্রও তখন ঠাকুরের মনে ছিল না ; তবে তাঁহার শরীরটা যে ছিল সে কেবল জগদম্বা ঠাকুরের শরীরটার সহায়ে তাঁহার অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ দেখাইয়া বহুজন-কল্যাণ সাধিত করিবেন বলিয়া।

প্র—তা ত বটে, কিন্তু ঐ ছয়মাসকাল জগদম্বা নিজে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া আসিয়া কি ঠাকুরকে জোর করিয়া আহার করাইয়া দিতেন ?

উ—কতকটা সেইরূপই বটে ; কারণ ঐ সময়ে এক জন সাধু কোথা হইতে আপনা আপনি আসিয়া জোটেন, ঠাকুরের ঐরূপ মৃতকল্প অবস্থা যে যোগসাধনা বা শ্রীভগবানের সহিত একত্বানুভবের ফলে তাহা সম্যক বুঝেন এবং ঐ ছয়মাস কাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে থাকিয়া সময়ে সময়ে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে আঘাত পর্য্যন্ত করিয়া একটু আধটু হুঁশ আনিতে নিত্য চেষ্টা করিতেন, আর একটু হুঁশ আসিতেছে দেখিলেই দুই-এক গ্রাস যাহা পারিতেন খাওয়াইয়া দিতেন। একেবারে অপরিচিত জড়প্রায় মৃতকল্প একটি লোককে এইরূপে বাঁচাইয়া রাখিতে সাধুটির এত আগ্রহ, এতটা মাথাব্যথা কেন হইয়াছিল জানি না, তবে ঐরূপ ঘটনাবলীকেই আমরা ভগবদিচ্ছায় সাধিত বলিয়া থাকি। অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার সাক্ষাৎ ইচ্ছা ও শক্তিতেই যে ঐ অসম্ভব সম্ভব হইয়া ঠাকুরের শরীরটা রক্ষা পাইয়াছিল ইহা ছাড়া আর কি বলিব ?

জনৈক যোগী সাধুর আগমন ও ঠাকুরের অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া আহার করাইয়া দেওয়া

প্র—আচ্ছা বুঝিলাম ; তাহার পর ?

উ—তাহার পর শ্রীশ্রীজগদম্বা বা শ্রীভগবান বা যে বিরাট-চৈতন্য ও বিরাট-শক্তি জগদ্রূপে প্রকাশিত আছেন এবং জড় চেতন সকলের মধ্যে ওতপ্রোত-ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আপাতবিভিন্ন নামরূপে অবস্থান করিতেছেন তিনি ঠাকুরকে আদেশ করিলেন—'ভাবমুখে থাক্ !'

শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশ—'ভাব-মুখে থাক্'

প্র—সেটা আবার কি ?

উ—বলিতেছি, কিন্তু ঠাকুরের ঐ সময়কার কথা বুঝিতে হইলে কল্পনাসহায়ে যতদূর সম্ভব ঠাকুরের ঐ সময়ের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া লওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তখন ঠাকুরের কখন 'আমি'-জ্ঞানের লোপ এবং কখন উহার ঈষৎ প্রকাশ হইতেছিল। যখন 'আমি'-বোধটার ঐরূপ ঈষৎ প্রকাশ হইতেছিল তখনও ঠাকুরের নিকট জগৎটা, আমরা যেমন দেখি তেমন দেখাইতেছিল না। দেখাইতেছিল যেন একটা বিরাট মনে নানা ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, ভাসিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, আবার লয় হইতেছে ! অপর সকলের তো কথাই নাই, ঠাকুরের নিজের শরীরটা, মনটা ও আমিত্ববোধটাও ঐ বিরাট মনের ভিতরের একটা তরঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছিল ! পাশ্চাত্য জড়বাদী পণ্ডিতমূর্খের দল যে জগচ্চৈতন্য ও শক্তিকে নিজের বুদ্ধি ও বুদ্ধিপ্রসূত যন্ত্রাদি সহায়ে মাপিতে

একমেবা-দ্বিতীয়ং-বস্তুতে নির্গুণ ও সগুণভাবে স্বগত-ভেদ এবং জগদ্ব্যাপী বিরাট আমিত্ব বর্ত্তমান। ঐ বিরাট আমিত্বই ঈশ্বর বা শ্রীশ্রীজগদম্বার আমিত্ব এবং উহার দ্বারাই জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়

যাইয়া বলিয়া বসে 'ওটা এক হলেও জড়', ঠাকুর এই অবস্থায় পৌঁছিয়া তাঁহারই সাক্ষাৎ স্বরূপ দর্শন বা অনুভব করিলেন—জীবন্ত, জাগ্রত, একমেবাদ্বিতীয়ম্, ইচ্ছা ও ক্রিয়ামাত্রেরই প্রসূতি অনন্ত কৃপাময়ী জগজ্জননী! আর দেখিলেন—সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ নির্গুণ ও সগুণ ভাবে আপনাতে আপনি বিভক্ত থাকায়—ইহাকেই শাস্ত্রে স্বগতভেদ বলিয়াছে—তাঁহাতে একটা আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত-ব্যাপী বিরাট আমিত্ব বিকশিত রহিয়াছে! শুধু তাহাই নহে, সেই বিরাট 'আমিটা' থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে আর সেই ভাবতরঙ্গই স্বল্পাধিক পরিমাণে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিতে পাইয়া মানবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আমি'গুলো উহাকেই বাহিরের জগৎ ও বহির্জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া ধরিতেছে ও বলা-কহা ইত্যাদি করিতেছে! ঠাকুর দেখিলেন বড় 'আমি'টার শক্তিতেই মানবের ছোট 'আমি'গুলো রহিয়াছে ও স্ব-স্ব কার্য করিতেছে এবং বড় 'আমি'টাকে দেখিতে-ধরিতে পাইতেছে না বলিয়াই 'আমি'গুলো ভ্রমে পড়িয়া আপনাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিমান মনে করিতেছে। এই দৃষ্টিহীনতাকেই শাস্ত্র অবিদ্যা ও অজ্ঞান বলেন।

নির্গুণ ও সগুণের মধ্যস্থলে এইরূপে যে বিরাট 'আমিত্ব'টা বর্ত্তমান, উহাই 'ভাবমুখ', কারণ উহা থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবের স্ফুরণ হইতেছে। এই বিরাট আমিই জগজ্জননীর আমিত্ব বা ঈশ্বরের আমিত্ব। এই বিরাট আমিত্বের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন— অচিন্ত্যভেদাভেদ

ঐ বিরাট আমিত্বেরই নাম 'ভাবমুখ'; কারণ সংসারের সকল প্রকার

ভাবই উঁহাকে আশ্রয় করিয়া উদিত হইতেছে

স্বরূপ জ্যোতির্ঘনমূর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুরের আমিত্ব-জ্ঞানের যখন একেবারে লোপ হইতেছিল তখন তিনি এই বিরাট আমিত্বের গণ্ডির পারে অবস্থিত জগদম্বার নিগুর্ণ ভাবে অবস্থান করিতে-ছিলেন—তখন ঐ 'বিরাট আমি' ও তাহার অনন্তভাবতরঙ্গ, যাহাকে আমরা জগৎ বলিতেছি, তাহার কিছুরই অস্তিত্ব অনুভব হইতেছিল না; আর যখন ঠাকুরে 'আমি'-জ্ঞানের ঈষৎ উন্মেষ হইতেছিল তখন তিনি দেখিতে-ছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বার নিগুর্ণ ভাবের সহিত সংযুক্ত এই সগুণ বিরাট 'আমি' ও তদন্তর্গত ভাবতরঙ্গ-সমূহ। অথবা নিগুর্ণভাবে উঠিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের অনুভবে ঐ একমেবাদ্বিতীয়মের ভিতর স্বগতভেদের অস্তিত্বও লোপ হইতেছিল; আর ঐ সগুণ বিরাট আমিত্বের যখন বোধ করিতেছিলেন, তখন দেখিতেছিলেন—যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যে নিগুর্ণ সেই সগুণ, যে পুরুষ সেই প্রকৃতি, যে সাপ স্থির ছিল সেই এখন চলিতেছে, অথবা যিনিই স্বরূপে নিগুর্ণ তিনিই আবার লীলায় সগুণ! শ্রীশ্রীজগদম্বার এই নিগুর্ণ-সগুণ উভয় ভাবে জড়িত স্বরূপের পূর্ণ দর্শন পাইবার পর ঠাকুর আদেশ পাইলেন 'ভাবমুখে থাক্'—অর্থাৎ আমিত্বের একেবারে লোপ করিয়া নিগুর্ণভাবে অবস্তান করিও না; কিন্তু যাহা হইতে যত প্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি হইতেছে সেই বিরাট 'আমিই' তুমি, তাঁহার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা, তাঁহার কার্য্যই তোমার কার্য্য—এই ভাবটি ঠিক ঠিক সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া জীবনযাপন

পূর্ণ নির্ব্বিকল্প এবং ঈষৎ সবিকল্প বা 'ভাবমুখ' অবস্থায় ঠাকুরের অনুভব ও দর্শন

কর ও লোককল্যাণসাধন কর! অতএব 'ভাবমুখে' থাকার অর্থই হইতেছে—মনে সর্ব্বতোভাবে সকল সময় সকল অবস্থায় দেখা, ধারণা বা বোধ করা যে আমি সেই 'বড় আমি' বা 'পাকা আমি'। 'ভাব-মুখ'-অবস্থায় পৌঁছিলে, আমি অমুকের সন্তান, অমুকের পিতা, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র ইত্যাদি সমস্ত কথা একেবারে মন হইতে ধুইয়া-পুঁছিয়া যায় এবং 'আমি সেই বিশ্বব্যাপী আমি' এই কথাটি সর্ব্বদা মনে অনুভব হয়। ঠাকুর তাই আমাদের বার-বার শিক্ষা দিতেন—"ওগো, অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি, ব্রাহ্মণ আমি, শূদ্র আমি, পণ্ডিত আমি, ধনী আমি—এ সব হচ্চে কাঁচা আমি; ওতে বন্ধন নিয়ে আসে। ও সব ছেড়ে মনে করবে তাঁর (ভগবানের) দাস আমি, তাঁর ভক্ত আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি। এই ভাবটি মনে পাকা করে রাখবে।" অথবা বলিতেন, "ওরে, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তা কর্।"

'ভাবমুখে থাক্'—কথার অর্থ

পাঠক হয়ত বলিবেন, ঠাকুর কি তবে ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী ছিলেন না? শ্রীশ্রীজগদম্বার মধ্যে স্বগতভেদ স্বীকার করিয়া ঠাকুর যখন জগন্মাতার নির্গুণ সগুণ দুই ভাবে অবস্থান দেখিতেন, তখন তো বলিতে হইবে তিনি আচার্য্য শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ, যাহাতে জগতের অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় নাই, তাহা মানিতেন না? তাহা নহে। ঠাকুর অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত সকল ভাব বা মতই মানিতেন। তবে বলিতেন, ঐ তিন প্রকার মত

সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত ভাব পর পর আসিয়া উপস্থিত হয়

মানবমনের উন্নতির অবস্থানুযায়ী পর পর আসিয়া উপস্থিত হয়। এক অবস্থায় দ্বৈতভাব আসে—তখন অপর দুই ভাবই মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মোন্নতির উচ্চতর সোপানে উঠিয়া অপর অবস্থায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আসে—তখন নিত্য নির্গুণ বস্তু লীলায় সতত সগুণ হইয়া রহিয়াছেন, এইরূপ বোধ হয়। তখন দ্বৈতবাদ তো মিথ্যা বোধ হয়ই, আবার অদ্বৈতবাদে যে সত্য নিহিত আছে তাহাও মনে উপলব্ধি হয় না। আর মানব যখন ধর্ম্মোন্নতির শেষ সীমায় সাধনসহায়ে উপস্থিত হয় তখন শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণরূপেরই কেবলমাত্র উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে অদ্বৈতভাবে অবস্থান করে। তখন আমি-তুমি, জীব-জগৎ, ভক্তি-মুক্তি, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম—সব একাকার!

মহাজ্ঞানী হনুমানের ঐ বিষয়ক কথা

এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের দাস্যভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন মহাজ্ঞানী হনুমানের ঐ বিষয়ের উপলব্ধিটি দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলিতেন। বলিতেন—শ্রীরামচন্দ্র কোন সময়ে নিজ দাস হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আমায় কি ভাবে দেখ, বা ভাবনা ও পূজা কর?" হনুমান তদুত্তরে বলেন, "হে রাম, যখন আমি দেহবুদ্ধিতে থাকি অথবা আমি এই দেহটা এইরূপ অনুভব করি, তখন দেখি—তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি সেব্য, আমি সেবক; তুমি পূজ্য, আমি পূজক; যখন আমি মন বুদ্ধি ও আত্মাবিশিষ্ট জীবাত্মা বলিয়া আপনাকে বোধ করিতে থাকি, তখন দেখি—তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; আর যখন আমি উপাধিমাত্র-রহিত শুদ্ধ আত্মা, সমাধিতে এই ভাব লইয়া থাকি, তখন দেখি—তুমিও যাহা, আমিও তাহা—তুমি আমি এক, কোনই ভেদ নাই।"

ঠাকুর বলিতেন, "যে ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী সে চুপ হইয়া যায়! অদ্বৈতবাদ বলবার বিষয় নয়। বলতে-কইতে গেলেই দুটো এসে পড়ে, ভাবনা-কল্পনা যতক্ষণ ততক্ষণও ভিতরে দুটো—ততক্ষণও ঠিক অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাই। জগতে একমাত্র ব্রহ্মবস্তু বা শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণভাবই কখন উচ্ছিষ্ট হয় নাই।" অর্থাৎ, মানবের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, অথবা মানব ভাষা দ্বারা উহা প্রকাশ করিতে পারে নাই। কারণ ঐ ভাব মানবের মন-বুদ্ধির অতীত; বাক্যে তাহা কেমন করিয়া বলা বা বুঝান যাইবে? অদ্বৈতভাব সম্বন্ধে ঠাকুর সেজন্য বার বার বলিতেন, "ওরে, ওটা শেষকালের কথা।" অতএব দেখা যাইতেছে ঠাকুর বলিতেন, "যতক্ষণ 'আমি তুমি' 'বলা কহা' প্রভৃতি রহিয়াছে ততক্ষণ নির্গুণ-সগুণ, নিত্য ও লীলা—দুই ভাবই কার্য্যে মানিতে হইবে। ততক্ষণ অদ্বৈতভাব মুখে বলিলেও কার্য্যে, ব্যবহারে তোমাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী থাকিতে হইবে। ঐ সম্বন্ধে ঠাকুর আরও কতই না দৃষ্টান্ত দিতেন! বলিতেন—

অদ্বৈতভাব চিন্তা, কল্পনা ও বাক্যাতীত; যতক্ষণ বলা-কহা আছে ততক্ষণ নিত্য ও লীলা, ঈশ্বরের উভয় ভাব লইয়া থাকিতেই হইবে

"যেমন গানের অনুলোম-বিলোম—সা ঋ গা মা পা ধা নি সা করিয়া সুর তুলিয়া আবার সা নি ধা পা মা গা ঋ সা—করিয়া সুর নামান। সমাধিতে অদ্বৈত-বোধটা অনুভব করিয়া আবার নীচে নামিয়া 'আমি'-বোধটা লইয়া থাকা।

ঐ বিষয়ে ঠাকুরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। যথা—গানের

"যেমন বেলটা হাতে লইয়া বিচার করা যে,

অনুলোম-বিলোম ; বেল, থোড়, প্যাঁজের খোলা

খোলা, বিচি, শাঁস—ইহার কোন্‌টা বেল। প্রথম খোলাটাকে অসার বলিয়া ফেলিয়া দিলাম, বিচিগুলোকেও ঐরূপ করিলাম ; আর শাঁসটুকু আলাদা করিয়া বলিলাম, এইটিই বেলের সার—এই আদৎ বেল। তারপর আবার বিচার আসিল যে, যাহারই শাঁস তাহারই খোলা ও বিচি—খোলা, বিচি ও শাঁস সব একত্র করিয়াই বেলটা ; সেই রকম নিত্য ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া তারপর বিচার—যে নিত্য সেই লীলায় জগৎ।

"যেমন থোড়খানার খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে মাঝটায় পৌঁছুলুম আর সেটাকেই সার ভাবলুম। তারপর বিচার এল—খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল—তুই জড়িয়েই থোড়টা।

"যেমন প্যাঁজটা—খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছুই থাকে না, সেইরকম কোন্‌টা 'আমি' বিচার করে দেখতে গিয়ে শরীরটা নয়, মনটা নয়, বুদ্ধিটা নয় করে ছাড়াতে ছাড়াতে গিয়ে দেখা যায় 'আমি' বলে একটা আলাদা কিছুই নাই—সবই 'তিনি' 'তিনি' 'তিনি' (ঈশ্বর) ; যেমন গঙ্গার খানিকটা জল বেড়া দিয়ে ঘিরে বলা—এটা আমার গঙ্গা !"

যাক্ এখন ওসকল কথা, আমরা পূর্ব্ব-কথার অনুসরণ করি।

ভাবমুখে থাকিয়া যখন বিশ্বব্যাপী আমিত্বের ঠিক ঠিক অনুভব হইত তখন 'এক' হইতে 'বহু'র বিকাশ দেখিয়া ঠাকুর

ভাবমুখে নিগুর্ণ হইতে কয়েকপদ

শ্রীশ্রীজগদম্বার নিগুর্ণভাব হইতে কয়েক পদ নীচে বিদ্যা-মায়ার রাজ্যে যে বিচরণ করিতেন, এ কথা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু সে রাজ্যেও

নিম্নে অবস্থিত থাকিলেও ঐ অবস্থায় অদ্বৈত বস্তুর বিশেষ অনুভব থাকে। ঐ অবস্থায় কিরূপ অনুভব হয়—ঠাকুরের দৃষ্টান্ত

একের বিকাশ ও অনুভব এত অধিক যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে যে যাহা করিতেছে, ভাবিতেছে, বলিতেছে, সে-সকলই আমি করিতেছি, ভাবিতেছি, বলিতেছি বলিয়া ঠাকুরের ঠিক ঠিক মনে হইত! এই অবস্থার অল্প বা আভাসমাত্র অনুভবও অতি অদ্ভুত! ঠাকুর বলিয়াছিলেন, একদিন ঘাসের উপর দিয়া একজন চলিয়া যাইতেছে, আর তাঁহার বুকে বিষম আঘাত লাগিতেছে!—যেন তাঁহার বুকের উপর দিয়াই সে যাইতেছে! বাস্তবিকই তখন তাঁহার বুকে রক্ত জমিয়া কাল দাগ হইয়া তিনি বেদনায় ছটফট করিয়াছিলেন।

ঐ অবস্থা হইতে মায়ার রাজ্যের আরও নিম্নস্তরে নামিয়া যখন থাকিতেন, যখন ঠাকুরের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার দাস আমি, ভক্ত আমি, সন্তান আমি বা অংশ আমি—এই ভাবটি সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত। উহা হইতেও নিম্নে অবিদ্যা-মায়ার বা কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির রাজত্ব। সে রাজ্য ঠাকুর যত্নপূর্ব্বক নিরন্তর অভ্যাসসহকারে ত্যাগ করায় তাঁহার মন তথায় আর কখনও নামিত না বা শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে নামিতে দিতেন না। ঠাকুর যেমন বলিতেন, "যে মার উপর একান্ত নির্ভর করেছে, মা তার পা বেতালে পড়তে দেন না।"

বিদ্যা-মায়ার রাজ্যে আরও নিম্নস্তরে নামিলে তবে ঈশ্বরের দাস, ভক্ত, সন্তান বা অংশ আমি—এইরূপ অনুভব হয়

অতএব বুঝা যাইতেছে, নির্ব্বিকল্প-সমাধিলাভের পর ঠাকুরের ভিতরের ছোট আমি বা কাঁচা আমিটার একেবারে লোপ

হইয়াছে। আর যে আমিত্বটুকু ছিল সেটি আপনাকে 'বড় আমি' বা 'পাকা আমি'টার সঙ্গে চিরসংযুক্ত দেখিত—কখন আপনাকে দেখিত সেই বিশ্বব্যাপী আমিটার অঙ্গ বা অংশ, আবার কখন তাহার নিকট নিকটতর নিকটতম দেশে উঠিয়া সেই বিশ্বব্যাপী 'আমি'তে লীন হইয়া যাইত। এই পথেই ঠাকুরের সকল মনের সকল ভাব আয়ত্তীভূত হইত। কারণ ঐ 'বড় আমি'কে আশ্রয় করিয়াই জগতে সকলের মনের যত প্রকার ভাব উঠিতেছে। ঠাকুর ঐ বিশ্বব্যাপী 'আমি'কে আশ্রয় করিয়া অনুক্ষণ থাকিতে পারিতেন বলিয়াই বিশ্বমনে যত ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, সকলই ধরিতে ও বুঝিতে সক্ষম হইতেন। ঐরূপ উচ্চাবস্থায় 'ভগবানের অংশ আমি', ঠাকুরের এ ভাবটিও ক্রমশঃ লীন হইয়া যাইত, এবং 'বিশ্বব্যাপী আমি' বা শ্রীশ্রীজগন্মাতার আমিত্বই ঠাকুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ গুরুরূপে প্রতিভাত হইত! কাজেই ঠাকুরকে দেখিলে তখন আর 'দীনের দীন' বলিয়া বোধ হইত না। তখন ঠাকুরের চাল-চলন, অপরের সহিত ব্যবহার প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াকলাপই অন্য আকার ধারণ করিত। তখন কল্পতরুর মত হইয়া তিনি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তুই কি চাস্?"—যেন ভক্ত যাহা চাহেন তাহা তৎক্ষণাৎ অমানুষী শক্তিবলে পূরণ করিতে বসিয়াছেন! দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগকে কৃপা করিবার জন্য ঐরূপ ভাবাপন্ন

ঠাকুরের 'কাঁচা আমি'টার এককালে নাশ হইয়া বিরাট 'পাকা আমি'তে অনেককাল অবস্থিতি। ঐ অবস্থাতেই তাঁহাতে গুরু-ভাব প্রকাশ পাইত। অতএব দীনভাব ও গুরুভাব অবস্থানুসারে এক ব্যক্তিতে আসা অসম্ভব নহে

হইতে ঠাকুরকে আমরা নিত্য দেখিয়াছি; আর দেখিয়াছি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে। সেদিন ঠাকুর ঐরূপ ভাবাপন্ন হইয়া তৎকালে উপস্থিত সকল ভক্তদিগকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের ভিতর ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত বা সুপ্ত ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করিয়া দেন। সে এক অপূর্ব্ব কথা! এখানে বসিলে মন্দ হইবে না।

গুরুভাবে ঠাকুরের ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে অপরে ধর্ম্মশক্তি জাগ্রত করিয়া দিবার দৃষ্টান্ত—১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুয়ারীর ঘটনা

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, পৌষ মাস। কিঞ্চিদধিক দুই সপ্তাহ হইল ভক্তেরা শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল সরকার ডাক্তার মহাশয়ের পরামর্শানুসারে ঠাকুরকে কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরে রাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপাল বাবুর বাগানবাটীতে আনিয়া রাখিয়াছেন। ডাক্তার বলিয়াছেন কলিকাতার বায়ু অপেক্ষা বাগান অঞ্চলের বায়ু নির্ম্মল ও যতদূর সম্ভব নির্ম্মল বায়ুতে থাকিলে ঠাকুরের গলরোগের উপশম হইতে পারে। বাগানে আসিবার কয়েক দিন পরেই ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং লাইকোপোডিয়ম (২০০শ) ঔষধ প্রয়োগ করেন। উহাতে গলরোগটার কিছু উপকারও বোধ হয়। ঠাকুর কিন্তু এখানে আসা অবধি বাটীর দ্বিতল হইতে একদিন একবারও নীচের তলে নামেন নাই বা বাগানে বেড়াইয়া বেড়ান নাই। আজ শরীর অনেকটা ভাল থাকায় অপরাহ্ণে বাগানে বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই ভক্তদিগের আজ বিশেষ আনন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের তখন তীব্র বৈরাগ্য—সাংসারিক উন্নতি-কামনাসমূহ ত্যাগ করিয়া ঠাকুরের নিকটে বাস করিতেছেন ও তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য নানা-প্রকার সাধন করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি বৃক্ষতলে ধুনি বা অগ্নি জ্বালাইয়া ধ্যান, জপ, ভজন, পাঠ ইত্যাদিতেই থাকেন। অপর কয়েক জন ভক্তও, যথা—ছোট গোপাল, কালী (অভেদানন্দ) ইত্যাদি, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনয়ন প্রভৃতি করিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করেন এবং আপনারাও যথাসাধ্য ধ্যান-ভজন করেন। গৃহী ভক্তেরা বিষয়-কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত থাকায় সর্ব্বদা ঠাকুরের নিকটে থাকিতে পারেন না; সুবিধা পাইলেই আসা যাওয়া করেন, এবং যাঁহারা ঠাকুরের সেবায় নিরন্তর ব্যাপৃত, তাঁহাদের আহারাদি সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন ও কখন কখন এক-আধ দিন থাকিয়াও যান। আজ ইংরেজী বর্ষের প্রথম দিন বলিয়া ছুটি থাকায় অনেকেই কাশীপুরের বাগানে উপস্থিত হইয়াছেন।

অপরাহ্ণ বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি, একটি পিরান, লালপাড় বসান একখানি মোটা চাদর, কানঢাকা টুপি ও চটি জুতাটি পরিয়া স্বামী অদ্ভুতানন্দের সহিত উপর হইতে ধীরে ধীরে নীচে নামিলেন এবং নীচেকার হল ঘরটি দেখিয়া পশ্চিমের দরজা দিয়া বাগানের পথে বেড়াইতে চলিলেন। গৃহী ভক্তেরা কেহ কেহ ঠাকুর ঐরূপে বেড়াইতে যাইতেছেন দেখিতে পাইয়া সানন্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। শ্রীযুত নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ বালক বা

যুবক ভক্তেরা তখন সমস্ত রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত থাকায় হল ঘরের পাশে যে ছোট ঘরটি ছিল, তাহার ভিতর নিদ্রা যাইতেছেন। শ্রীযুত লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) তাঁহাদিগকে ঐরূপে যাইতে দেখিয়া ঠাকুরের সহিত স্বয়ং আর অধিক দূর যাওয়া অনাবশ্যক বুঝিয়া হল ঘরের সম্মুখের ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটির দক্ষিণ পাড় পর্য্যন্ত আসিয়াই ফিরিলেন এবং অপর একজন যুবক ভক্তকে ডাকিয়া লইয়া ঠাকুর উপরে যে ঘরটিতে থাকেন সেটি ঝাঁটপাট দিয়া পরিষ্কার করিতে ও ঠাকুরের বিছানা প্রভৃতি রৌদ্রে দিতে ব্যাপৃত হইলেন।

গৃহী ভক্তগণের ভিতর শ্রীযুত গিরিশের তখন প্রবল অনুরাগ। ঠাকুর কোনও সময়ে তাঁহার অদ্ভুত বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অন্য ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস! ইহার পর লোকে ওর অবস্থা দেখে অবাক হবে।" বিশ্বাস-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় গিরিশ তখন হইতে ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান—জীবোদ্ধারের জন্য কৃপায় অবতীর্ণ বলিয়া অনুক্ষণ দেখিতেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে নিষেধ করিলেও তাঁহার ঐ ধারণা সকলের নিকট প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইতেন। গিরিশও সেদিন বাগানে উপস্থিত আছেন এবং শ্রীযুত রাম প্রমুখ অন্য কয়েকটি গৃহী ভক্তের সহিত একটি আমগাছের তলায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া উদ্যানমধ্যস্থ প্রশস্ত পথটি দিয়া বাগানের গেটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে প্রায় মধ্যপথে আসিয়া পথের ধারে আমগাছের ছায়ায় শ্রীযুত রাম ও

শ্রীযুত গিরিশকে দেখিতে পাইলেন এবং গিরিশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গিরিশ, তুমি কি দেখেছ (আমার সম্বন্ধে) যে অত কথা (আমি অবতার ইত্যাদি) যাকে তাকে বলে বেড়াও ?"

সহসা ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়াও গিরিশের বিশ্বাস টলিল না। তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাস্তার উপরে আসিয়া ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া করজোড়ে উপবিষ্ট হইলেন এবং গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "ব্যাস বাল্মীকি যাঁহার কথা বলিয়া অন্ত করিতে পারেন নাই, আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিতে পারি !"

গিরিশের ঐরূপ অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা শুনিয়া ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং মন উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন। গিরিশও তখন ঠাকুরের সেই দেবভাবে প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া বার বার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় হাস্যমুখে উপস্থিত সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাদের কি আর বলিব, তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক !" ভক্তেরা সে অভয়বাণী শুনিয়া তখন আনন্দে জয় জয় রব করিয়া কেহ প্রণাম, কেহ পুষ্পবর্ষণ এবং কেহ বা আসিয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিতে লাগিলেন। প্রথম ব্যক্তি পদস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান হইবামাত্র ঠাকুর ঐরূপ অর্দ্ধ-বাহ্যাবস্থায় তাহার বক্ষঃ স্পর্শ করিয়া নীচের দিক হইতে উপর-দিকে হস্ত সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন, চৈতন্য হোক্ !" দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র তাহাকেও ঐরূপ

করিলেন! তৃতীয় ব্যক্তিকেও ঐরূপ! চতুর্থকেও ঐরূপ! এইরূপে সমাগত ভক্তদিগের সকলকে একে একে ঐরূপে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আর সে অদ্ভুত স্পর্শে প্রত্যেকের ভিতর অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া কেহ হাসিতে, কেহ কাঁদিতে, কেহ বা ধ্যান করিতে, আবার কেহ বা নিজে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহেতুক-দয়ানিধি ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য অপর সকলকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন! সে চীৎকার ও জয়রবে ত্যাগী ভক্তেরা কেহ বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কেহ বা হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, উদ্যানপথ-মধ্যে সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া ঐরূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন এবং দেখিয়াই বুঝিলেন, দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কৃপায় ঠাকুরের দিব্য-ভাবাবেশে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব লীলার অভিনয় হইত তাহারই অদ্য এখানে সকলের প্রতি কৃপায় সকলকে লইয়া প্রকাশ! ত্যাগী ভক্তেরা আসিতে আসিতেই ঠাকুরের সে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া আবার সাধারণ সহজ ভাব উপস্থিত হইল। পরে গৃহী ভক্তদিগের অনেককে ঐ সময়ে কিরূপ অনুভব হইয়াছিল তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল,

ঠাকুরের ঐরূপ স্পর্শে ভক্তদিগের প্রত্যেকের দর্শন ও অনুভব

কাহারও সিদ্ধির নেশার মত একটা নেশা ও আনন্দ—কাহারও চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র যে মূর্ত্তির নিত্য ধ্যান করিতেন অথচ দর্শন পাইতেন না, ভিতরে সেই মূর্ত্তির জাজ্বল্য দর্শন—কাহারও ভিতরে পূর্ব্বে অননুভূত একটা পদার্থ বা শক্তি যেন সড় সড় করিয়া উপরে উঠিতেছে, এইরূপ বোধ ও আনন্দ

এবং কাহারও বা পূর্ব্বে যাহা কখনও দেখেন নাই এরূপ একটা জ্যোতির চক্ষু মুদ্রিত করিলেই দর্শন ও আনন্দানুভব হইয়াছিল! দর্শনাদি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন হইলেও একটা অসাধারণ দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইবার অনুভবটি সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ—এ কথাটি বেশ বুঝা গিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের ভিতরের অমানুষী শক্তি বিশেষই যে বাহুস্পর্শ দ্বারা সঞ্চারিত হইয়া প্রত্যেক ভক্তের ভিতর ঐরূপ অপূর্ব্ব মানসিক অনুভব ও পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল, একথাটিও সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছিল। উপস্থিত ভক্ত সকলের মধ্যে দুই জনকে কেবল ঠাকুর "এখন নয়" বলিয়া ঐরূপে স্পর্শ করেন নাই! এবং তাঁহারাই কেবল এ আনন্দের দিনে আপনাদিগকে হতভাগ্য জ্ঞান করিয়া বিষণ্ণ হইয়াছিলেন।[১] ইহা দ্বারা এ বিষয়টিও বুঝা গিয়াছিল যে, কখন্ কাহার প্রতি কৃপায় ঠাকুরের ভিতর দিয়া ঐ দিব্যশক্তির প্রকাশ হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই! সাধারণ অবস্থায় ঠাকুর নিজেও তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ।

কখন কাহাকে কৃপায় ঠাকুর ঐ ভাবে স্পর্শ করিবেন তাহা বুঝা যাইত না

অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে, কাঁচা বা ছোট আমিত্বটাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর 'বিশ্বব্যাপী আমি' বা শ্রীশ্রীজগদম্বার শক্তিপ্রকাশের মহান্ যন্ত্র-স্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন এবং ঐ কাঁচা 'আমি'টাকে একে-বারে ত্যাগ করিয়া যথার্থ 'দীনের দীন' অবস্থায় উপনীত হইয়া-

১ পরে একদিন ঠাকুর ইহাদেরও ঐরূপে স্পর্শ করিয়াছিলেন।

ছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার লোক-গুরু, জগদ্‌গুরু-ভাবটির এইরূপে অপূর্ব্ব বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল! এইরূপে আমিত্বের লোপেই গুরুভাব বা গুরুশক্তির বিকাশ যে, সকল ধর্ম্মগত সকল অবতারপুরুষগণের জীবনেই উপস্থিত হইয়াছিল, জগতের ধর্ম্মেতিহাস এ বিষয়ে চিরকাল সাক্ষ্য দিতেছে।

'কাঁচা আমি'টার লোপ বা নাশেই গুরুভাব-প্রকাশের কথা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে

গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে ধর্ম্মলাভ বা ঈশ্বরলাভ হয় না, একথা আমরা আবহমান কাল ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি।

'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।'

—ইত্যাদি স্তুতিকথা আমরা চিরকালই বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সহিত মন্ত্রদীক্ষাদাতা গুরুর উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করিয়া আসিতেছি। অনেকে আবার বিদেশী শিক্ষার কুহকে পড়িয়া আপনাদের জাতীয় শিক্ষা ও ভাব বিসর্জ্জন দিয়া মানববিশেষকে ঐরূপ বলা মহাপাপের ভিতর গণ্য করিয়া অনেক বাদানুবাদ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই! কারণ কে-ই বা তখন বুঝে যে, কোন কোন মানবশরীরকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইলেও গুরুভাবটি মানবীয় ভাবরাজ্যেরই অন্তর্গত নহে। কে-ই বা তখন জানে যে শরীররক্ষার উপযোগী জল-বায়ু, আহার প্রভৃতি নিত্যাবশ্যকীয় বস্তুসমস্তের ন্যায় মায়াপাশে বদ্ধ ত্রিতাপে তাপিত মানবমনের সমস্ত জ্বালানিবারণ ও শান্তি-লাভের উপায়স্বরূপ হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতা স্বয়ংই ঐ ভাব ও

গুরুভাব মানবীয় ভাব নহে—সাক্ষাৎ জগদম্বার ভাব মানবের শরীর ও মনকে যন্ত্র-স্বরূপে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত

শক্তিরূপে শুদ্ধ, বুদ্ধ, অহমিকাশূন্য মানবমনের ভিতর দিয়া পূর্ণরূপে প্রকাশিত আছেন? এবং কে-ই বা তখন ধারণা করে যে, যাহার মন যতটা পরিমাণে অহঙ্কার ত্যাগ করিতে বা 'কাঁচা আমি'-টাকে ছাড়িতে পারে ততটা পরিমাণেই সে ঐ ভাব ও শক্তিপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ হয়! সাধারণ মানবমনে ঐ দিব্যভাবের যৎসামান্য 'ছিটে ফোঁটা' মাত্র প্রকাশ, তাই আমরা ততটা ধরিতে ছুঁইতে পারি না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর, যীশু প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগাবতারসকলে এবং বর্ত্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণে ঐ দিব্যশক্তির ঐরূপ অপূর্ব্ব লীলা যখন বহুভাগ্যফলে কাহারও নয়নপথে পতিত হয়, তখনই সে প্রাণে-প্রাণে বুঝিয়া থাকে যে, এ শক্তিপ্রকাশ মানবের নহে—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের। তখনই ভবরোগগ্রস্ত পথভ্রান্ত জিজ্ঞাসু মানবের মোহ মলিনতা দূরে অপসারিত হয় এবং সে বলিয়া উঠে, 'হে গুরু, তুমি কখনই মানুষ নও—তুমি তিনি!'

ঈশ্বর করুণায় ঐ ভাবাবলম্বনে মানব-মনের অজ্ঞানমোহ দূর করেন। সেজন্য গুরুভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি একই কথা

অতএব বুঝা যাইতেছে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা যে ভাবরূপে মানব-মনের সকল প্রকার অজ্ঞান-মলিনতা দূর করেন, সেই উচ্চ ভাবেরই নাম গুরুভাব বা গুরুশক্তি। ঐ ভাবকেই শাস্ত্র গুরু নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও মানবকে উহার প্রতি মনের ষোল আনা শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু স্থূলবুদ্ধি, ভক্তি-শ্রদ্ধাদি সবেমাত্র শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে এ প্রকার মানব-মন তো আর একটা অশরীরী ভাবকে ধরিতে, ছুঁইতে, ভালবাসিতে পারে না;

এ জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন দীক্ষাদাতা মানবকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিতে। সেজন্য যাঁহারা বলেন, আমরা গুরুভাবটিকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে পারি, কিন্তু যে দেহটা আশ্রয় করিয়া ঐ ভাব আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় তাহাকে মান্য-ভক্তি কেন করিব—ঐ ভাব তো আর তাঁহার নহে? তাঁহাদিগকে আমরা বলি—'ভাই, করিতে পার কর, কিন্তু দেখিও যেন নিজের মনের জুয়াচুরিতে ঠকিতে না হয়। শক্তি বা ভাব এবং যদবলম্বনে ঐ ভাব প্রকাশিত থাকে তদুভয়কে কখনও তো পৃথক্ পৃথক্ থাকিতে দেখ নাই, তবে কেমন্ করিয়া আগুন ও আগুনের দাহিকাশক্তিকে পৃথক্ করিয়া একটিকে গ্রহণ ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে এবং অপরটিকে ত্যাগ করিবে, তাহা বলিতে পারি না!' যে যাহাকে ভালবাসে বা ভক্তি করে সে প্রেমাস্পদের ব্যবহৃত অতি সামান্য জিনিসটাকেও হৃদয়ে ধারণ করে। তাঁহার স্পৃষ্ট ফুলটা বা কাপড়-চোপড়খানাও সে পবিত্র বলিয়া বোধ করে। তিনি যে স্থান দিয়া চলিয়া যান, সেখানকার মাটিটাও তাহার কাছে বহু মূল্যবান ও বহু আদরের জিনিস বলিয়া বোধ হয়। তবে তিনি যে শরীরটাতে অবস্থান করিয়া তাহার পূজা গ্রহণ করেন ও তাহাকে কৃপা করেন, সেটার প্রতি যে তাহার শ্রদ্ধা-ভক্তি হইবে—এটা কি আবার বুঝাইয়া বলিতে হইবে? যাহারা গুরুভাবটি কি তাহাই বুঝে না, তাহারাই ঐরূপ কথা বলিয়া থাকে। আর যাহার গুরুভাবের প্রতি ঠিক ঠিক ভক্তি হইবে তাহার ঐ ভাবের আধার গুরুর শরীরটার উপরেও ভক্তি-শ্রদ্ধার বিকাশ হইবেই হইবে। ঠাকুর এই বিষয়টি

বিভীষণের ভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদিগকে বুঝাইতেন। যথা—

শ্রীরামচন্দ্রের মানবলীলাসংবরণের অনেককাল পরে কোন সময়ে নৌকা-ডুবি হইয়া একজন মানব লঙ্কার উপকূলে সমুদ্র-তরঙ্গের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। বিভীষণ অমর, তিন কালই তিনি লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছেন—তাঁহার নিকট ঐ সংবাদ পৌছিল। সভাস্থ অনেক রাক্ষসের সুকোমল মানবদেহরূপ খাদ্যের আগমন-সংবাদে জিহ্বায় জল আসিল। রাজা বিভীষণের কিন্তু ঐ সংবাদ শুনিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি গলদশ্রুলোচনে ভক্তি-গদগদ বাক্যে বার বার বলিতে লাগিলেন, 'অহো ভাগ্য!' রাক্ষসেরা তাঁহার ভাব না বুঝিতে পারিয়া সকলে একেবারে অবাক! তৎপরে বিভীষণ তাহাদের বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'যে মানবশরীর আমার রামচন্দ্র ধারণ করিয়া লঙ্কায় পদার্পণ করেন ও আমাকে কৃতার্থ করেন, বহুকাল পরে আজ আবার সেই মানবশরীর দেখিতে পাইব—এ কি কম ভাগ্যের কথা! আমার মনে হইতেছে যেন সাক্ষাৎ রামচন্দ্রই পুনরায় ঐরূপে আসিয়াছেন।' এই বলিয়া রাজা পাত্র-মিত্র সভাসদ্‌সকলকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রোপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বহু সম্মান ও আদর করিয়া উক্ত মানবকে প্রাসাদে লইয়া যাইলেন। পরে তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া নিজে সপরিবারে অনুগত দাসভাবে তাহার সেবা ও বন্দনাদি করিতে লাগিলেন! এইরূপে কিছুকাল

গুরুভক্তি-বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ—বিভীষণের গুরুভক্তির কথা

তাহাকে লঙ্কায় রাখিয়া নানা ধন-রত্ন-উপহার দিয়া সজলনয়নে বিদায় দিলেন এবং অনুচরবর্গের দ্বারা বাটী পৌঁছাইয়া দিলেন!

গল্পটি বলিয়া ঠাকুর আবার বলিতেন, "ঠিক ঠিক ভক্তি হলে এইরূপ হয়। সামান্য জিনিস হতেও তার ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয়ে ভাবে বিভোর হয়। শুনিস নি—'এই মাটিতে খোল হয়' বলে চৈতন্যদেবের ভাব হয়েছিল? এক সময়ে এক জায়গা দিয়ে যেতে যেতে তিনি শুনলেন যে সেই গ্রামে হরিসংকীর্ত্তনের সময় যে খোল বাজে লোকে সেই খোল তৈয়ার ও উহা বিক্রয় করে দিনপাত করে। শুনেই তিনি বলে উঠলেন, 'এই মাটিতে খোল হয়!'—বলেই ভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হলেন। কেন না, উদ্দীপনা হলো; 'এই মাটিতে খোল হয়, সেই খোল বাজিয়ে হরিনাম হয়, সেই হরি সকলের প্রাণের প্রাণ—সুন্দরের চাইতেও সুন্দর!' একেবারে এত কথা মনে হয়ে হরিতে চিত্ত স্থির হয়ে গেল। সেই রকম যার গুরুভক্তি হয় তার গুরুর আত্মীয়-কুটুম্বদের দেখ্‌লে তো গুরুর উদ্দীপনা হবেই, যে গ্রামে গুরুর বাড়ী সে গ্রামের লোকদের দেখলেও ঐরূপ উদ্দীপনা হয়ে তাদের প্রণাম করে, পায়ের ধূলো নেয়, খাওয়ায় দাওয়ায় ও সেবা করে! এই অবস্থা হলে গুরুর দোষ আর দেখতে পাওয়া যায় না। তখনই এ কথা বলা চলে—

ঠিক ঠিক ভক্তিতে অতি তুচ্ছ বিষয়েও ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। 'এই মাটিতে খোল হয়'—বলিয়াই শ্রীচৈতন্যের ভাব

'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ীবাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥'"[১]

---

১ অর্থাৎ নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান বা ঈশ্বর।

নইলে মানুষের তো দোষ-গুণ আছেই। সে তার ভক্তিতে কিন্তু তখন আর মানুষকে মানুষ দেখে না, ভগবান বলেই দেখে। যেমন ন্যাবা-লাগা চোখে সব হলুদবর্ণ দেখে—সেই রকম; তখন তার ভক্তি তাকে দেখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরই সব—তিনিই গুরু, পিতা, মাতা, মানুষ, গরু, জড়, চেতন সব হয়েছেন।”

দক্ষিণেশ্বরে একদিন একজন সরল উদ্ধত যুবক ভক্ত[১] ঠাকুর যে বিষয়টি তাহাকে বলিতেছিলেন তৎসম্বন্ধে নানা আপত্তি-তর্ক উত্থাপিত করিতেছিল। ঠাকুর তিন-চারি বার তাহাকে ঐ বিষয়টি বলিলেও যখন সে বিচার করিতে লাগিল তখন ঠাকুর তাহাকে সুমিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, “তুমি কেমন গা? আমি বল্‌চি আর তুমি কথাটা নিচ্চ না!” যুবকের এইবার ভালবাসায় হাত পড়িল। সে বলিল, “আপনি যখন বল্‌চেন তখন নিলুম বই কি। আগেকার কথাগুলো তর্কের খাতিরে বলেছিলাম।”

অর্জ্জুনের গুরু-ভক্তির কথা

ঠাকুর শুনিয়া প্রসন্নমুখে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “গুরুভক্তি কেমন জান? গুরু যা বল্‌বে তা তখনি দেখতে পাবে—সে ভক্তি ছিল অর্জ্জুনের। একদিন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গে রথে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে আকাশের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, ‘দেখ সখা, কেমন এক ঝাঁক পায়রা উড়্‌ছে!’ অর্জ্জুন অমনি দেখিয়া বলিলেন, ‘হাঁ সখা, অতি সুন্দর পায়রা!’ পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণ আবার দেখিয়া বলিলেন, ‘না সখা, ও তো পায়রা নয়!’ অর্জ্জুন

১ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল

দেখিয়া বলিলেন, 'তাই তো সখা, ও পায়রা নয়।' কথাটি এখন বোঝ—অর্জ্জুন মহা-সত্যনিষ্ঠ, তিনি তো আর কৃষ্ণের খোশামোদ করিয়া ঐরূপ বলিলেন না? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথায় তাঁর এত বিশ্বাস-ভক্তি যে, যেমন যেমন শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন অর্জ্জুনও তখন ঠিক ঠিক তা দেখ্‌তে পেলেন!"

শাস্ত্র যাঁহাকে অজ্ঞানান্ধকার-দূরীকরণসমর্থ গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বোক্তরূপে ঐশ্বরিক ভাববিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা এই—গুরু অনেক নহেন, এক। আধার বা যে যে শরীরাবলম্বনে ঈশ্বরের ঐ ভাব প্রকাশিত হয় তাহা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তোমার গুরু, আমার গুরু পৃথক নহেন—ভাবরূপে এক। মৃন্ময় মূর্ত্তিতে দ্রোণকে আচার্য্য-রূপে গ্রহণ ও ভক্তিপূর্ব্বক একলব্যের ধনুর্ব্বেদ-লাভরূপ মহাভারতীয় কথাটি ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে। অবশ্য একথাটি যুক্তিতে দাঁড়াইলেও ঠিক-ঠিক হৃদয়ঙ্গম হওয়া অনেক সময় ও সাধন-সাপেক্ষ এবং হৃদয়ঙ্গম হইলেও যতক্ষণ মানবের নিজের দেহবোধ থাকে ততক্ষণ, যে শরীরের ভিতর দিয়া গুরুশক্তি তাঁহাকে কৃপা করেন সেই শরীরাবলম্বনেই শ্রীগুরুর পূজা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ঠাকুর এই কথাটির দৃষ্টান্তে নিষ্ঠা-ভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন হনুমানের কথা আমাদিগকে বলিতেন। যথা—

ঈশ্বরীয় ভাব-রূপে গুরু এক। তথাপি নিজ গুরুতে ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা চাই। ঐ বিষয়ে হনু-মানের কথা

লঙ্কাসমরে শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ মহাবীর

মেঘনাদ কর্ত্তৃক কোন সময়ে নাগপাশে আবদ্ধ হন এবং উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নাগকুলের চিরশত্রু গরুড়কে স্মরণ করিয়া আনয়ন করেন। গরুড়কে দেখিবামাত্র নাগকুল ভয়ত্রস্ত হইয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। রামচন্দ্রও নিজভক্ত গরুড়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া গরুড়ের চিরকালপূজিত ইষ্টমূর্ত্তি বিষ্ণুরূপে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ও তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন—যিনি বিষ্ণু তিনিই তখন রামরূপে অবতীর্ণ। হনুমানের কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে ঐরূপে বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে দেখা ভাল লাগিল না এবং কতক্ষণে তিনি পুনরায় রামরূপ পরিগ্রহ করিবেন এই কথাই ভাবিতে লাগিলেন। হনুমানের ঐ প্রকার মনোভাব বুঝিতে রামচন্দ্রের বিলম্ব হইল না। তিনি গরুড়কে বিদায় দিয়াই পুনরায় রামরূপ পরিগ্রহ করিয়া হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, আমার বিষ্ণুরূপ দেখিয়া তোমার ঐরূপ ভাবান্তর হইল কেন ? তুমি মহাজ্ঞানী, তোমার তো আর জানিতে ও বুঝিতে বাকী নাই যে, যে রাম সেই বিষ্ণু।" হনুমান তাহাতে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "সত্য বটে, এক পরমাত্মাই উভয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং সেজন্য শ্রীনাথ ও জানকীনাথে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু তথাপি আমার প্রাণ সতত জানকী-নাথেরই দর্শন চায়—কারণ তিনিই আমার সর্ব্বস্ব। ঐ মূর্ত্তির ভিতর দিয়াই আমি ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥"

এইরূপে গুরুভাবটি শ্রীশ্রীজগন্মাতার শক্তিবিশেষ ও সেই

শক্তি সকল মানবমনেই সুপ্ত বা ব্যক্তভাবে নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই গুরুভক্তিপরায়ণ সাধক শেষে এমন এক অবস্থায় উপনীত হন যে, তখন ঐ শক্তি তাঁহার নিজের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্মের জটিল নিগূঢ় তত্ত্বসকল তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে থাকে। তখন সাধককে আর বাহিরের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্ম-বিষয়ক কোনরূপ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে হয় না। গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

সকল মানবেই গুরুভাব সুপ্তভাবে বিদ্যমান

> যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
> তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥
>
> গীতা—২।৫২

যখন তোমার বুদ্ধি অজ্ঞান-মোহ হইতে বিমুক্ত হইবে তখন আর এটা শুনা উচিত, ওটা শাস্ত্রে আছে ইত্যাদি কথায় আর তোমার প্রয়োজন থাকিবে না, তুমি ঐ সকলের পারে চলিয়া যাইয়া আপনিই তখন সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে; সাধকের তখন ঐরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়।

ঠাকুর ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেন, "শেষে মনই গুরু হয় বা গুরুর কাজ করে। মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কানে, (আর) জগদ্গুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।" কিন্তু সে মন আর এ মনে অনেক প্রভেদ। সে সময়ে মন শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের উচ্চ শক্তিপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ হয়, আর এ সময়ে মন ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া ভোগসুখ ও কামক্রোধাদিতেই মাতিয়া থাকিতে চায়।

ঠাকুরের কথা—শেষে মনই গুরু হয়

ঠাকুর বলিতেন, "গুরু যেন সখী—যতদিন না শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন হয় ততদিন সখীর কাজের বিরাম নাই, সেইরূপ যতদিন না ইষ্টের সহিত সাধকের মিলন হয় ততদিন গুরুর কাজের শেষ নাই।" এইরূপে মহামহিমান্বিত শ্রীগুরু জিজ্ঞাসু ভক্তের হাত ধরিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবরাজ্যে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে তাহাকে ইষ্টমূর্ত্তির সম্মুখে আনিয়া বলেন, "ও শিষ্য, ঐ দেখ!" ইহা বলিয়াই অন্তর্হিত হন।

"গুরু যেন সখী"

ঠাকুরকে একদিন ঐরূপ বলিতে শুনিয়া একজন অনুগত ভক্ত 'শ্রীগুরুর সহিত বিচ্ছেদ তবে তো একদিন অনিবার্য্য' ভাবিয়া ব্যথিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করেন—"গুরু তখন কোথায় যান, মশাই?" ঠাকুর তদুত্তরে বলেন, "গুরু ইষ্টে লয় হন। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিনে এক, একে তিন।"

"গুরু শেষে ইষ্টে লয় হন। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিনে এক, একে তিন"

চতুর্থ অধ্যায়

গুরুভাবের পূর্ব্ববিকাশ

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥—গীতা, ৯।১১

ঠাকুরের ভিতরে গুরুভাবের প্রকাশ বাল্যাবধিই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যৌবনে নির্ব্বিকল্প-সমাধিলাভের পর ঐ ভাবের যে পূর্ণ বিকাশ, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। বাল্যাবধি তাঁহাতে ঐ ভাবের প্রকাশ বলাতে কেহ না মনে করেন, আমরা ঠাকুরকে বাড়াইবার জন্য কথাটি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি। যথার্থ নিরপেক্ষভাবে যদি কেহ ঠাকুরের জীবন আলোচনা করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, ঐ দোষে কখনই তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হইবে না। এ অদ্ভুত অলৌকিক জীবনের ঘটনাবলী যিনি যতদূর পারেন বিচার করিয়া দেখুন না কেন, দেখিবেন বিচার-শক্তিই পরিশেষে হার মানিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে! আমাদের মনও বড় কম সন্দিগ্ধ ছিল না; আমাদের ভিতরের অনেকেই ঠাকুরকে যে ভাবে যাচাইয়া বাজাইয়া লইয়াছেন ঐরূপ করিতে এখনকার কাহারও মন-বুদ্ধিতে উঠিবেই না বলিয়া আমাদের বোধ হয়। ঐরূপে ঠাকুরকে সন্দেহ করা এবং পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজেই

বাল্যাবস্থা হইতেই গুরুভাবের পরিচয় ঠাকুরের জীবনে পাওয়া যায়

পরাজিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হওয়া আমাদের ভিতর কতবার কত লোকেরই ভাগ্যে যে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। 'লীলাপ্রসঙ্গে' ঐ বিষয়ের আভাস আমরা পূর্ব্বেই পাঠককে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়াছি, পরে আরও অনেক দিতে হইবে। পাঠক তখন নিজেই বুঝিয়া লইবেন; এজন্য এ বিষয়ে এখন আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।

"আগে ফল, তারপর ফুল।" সকল অবতার-পুরুষের জীবনেই ঐ ভাব

"আগে ফল, তারপর ফুল—যেমন লাউ-কুমড়ার"—ঠাকুর একথাটি নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটিদের জীবনপ্রসঙ্গে সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন। অর্থ—ঐরূপ পুরুষেরা জগতে আসিয়া কোন বিষয়ে সিদ্ধ হইবার জন্য যাহা কিছু সাধন করেন, তাহা কেবল ইতর-সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য যে, ঐ বিষয়ে ঐরূপ ফললাভ করিতে হইলে এইরূপ চেষ্টা তাহাদের করিতে হইবে। কারণ ঐরূপ পুরুষদিগের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহারা এতটা চেষ্টা জীবনে দেখান, সেই জ্ঞান আজীবন থাকিলে সকল কার্য্য যেরূপভাবে করা যায়, ঐ সকল পুরুষেরা বাল্যাবধি ঠিক তদ্রূপ ব্যবহারই সর্ব্বত্রই সকল বিষয়ে করিয়া আসিয়াছেন। যেন ঐ জ্ঞানলাভ করিবার ফল তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছেন! নিত্যমুক্তদিগের সম্বন্ধেই যখন ঐ কথা সত্য, তখন ঈশ্বরাবতারদের তো কথাই নাই! তাঁহাদের জীবনে ঐরূপ জ্ঞানের প্রকাশ আজীবনই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দেশের সকল যুগের ঈশ্বরাবতারদের সম্বন্ধেই শাস্ত্র একথা সত্য বলিয়া

লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের ঈশ্বরাবতারদিগের অনেক ব্যবহারের মধ্যে একটা সৌসাদৃশ্য আছে। যথা—স্পর্শ দ্বারা ধর্ম্মজীবন-সঞ্চারের কথা যীশু, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের জীবনেই দেখিতে পাই। ঐরূপ, তাঁহাদের জন্মগ্রহণকালে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির ঐ বিষয় আলৌকিক উপায়ে জ্ঞাত হইবার কথা, বাল্যাবধি তাঁহাদের ভিতর গুরুভাব প্রকাশিত থাকিবার কথা, তাঁহারা যে মানবসাধারণকে উন্নত করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ পথ দেখাইতে কৃপায় অবতীর্ণ, এ বিষয়টি বাল্যাবধি উপলব্ধি করিবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাই একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ঠাকুরের জীবনে বাল্যাবধি গুরুভাব প্রভৃতির প্রকাশ থাকার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কারণ 'অবতার'পুরুষদিগের থাক বা শ্রেণীই একটা পৃথক। সাধারণ মানবের জীবনে ঐরূপ ঘটনা কখনও সম্ভবে না বলিয়া অবতারপুরুষদিগের জীবনেও ঐরূপ হওয়া অসম্ভব মনে করিলে বিষম ভ্রমে পড়িতে হইবে।

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের প্রথম বিকাশ—কামারপুকুরে

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের প্রথম জলন্ত নিদর্শন দেখিতে পাই তাঁহার জন্মভূমি কামারপুকুরে। তাঁহার তখন উপনয়ন হইয়া গিয়াছে; অতএব বয়স ৯।১০ বৎসর হইবে। গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাটীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদঞ্চলের খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের নিমন্ত্রণ হয় এবং অনেক পণ্ডিতের একত্র সমাবেশ হইলে যাহা হইয়া থাকে—খুব তর্কের

হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। অনেক তর্কেও শাস্ত্রীয় প্রশ্নবিশেষের কোনরূপ মীমাংসা হইতেছিল না, এমন সময় বালক শ্রীরামকৃষ্ণ বা গদাধর পরিচিত জনৈক পণ্ডিতকে বলেন, "কথাটার এই ভাবে মীমাংসা হয় না কি?" সভায় পল্লীর অনেক বালকই কৌতূহলাকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিল এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া পণ্ডিতদিগের উচ্চরবে বাগ্‌যুদ্ধটার বিন্দুমাত্র অর্থবোধ না হওয়ায় কেহ বা উহাকে একটা রঙ্গরসের মধ্যে ভাবিয়া হাসিতেছিল, কেহ বা বিরক্ত হইয়া পণ্ডিতদিগের অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া সোরগোল করিতেছিল, আবার কেহ বা একেবারে অন্যমনা হইয়া আপনাদের ক্রীড়াতেই মন দিয়াছিল। কাজেই এ অপূর্ব্ব বালক যে পণ্ডিতদিগের সকল কথা ধৈর্য্যসহকারে শুনিয়াছে, বুঝিয়াছে এবং মনে ভাবিয়া একটা সুমীমাংসায় উপনীত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া পণ্ডিতটি প্রথম অবাক হইলেন; তাহার পর নিজের পরিচিত পণ্ডিতদের নিকট গদাধরের মীমাংসার কথা বলিতে লাগিলেন; তাহার পর তাঁহারা সকলে উহাই ঐ বিষয়ের একমাত্র মীমাংসা বুঝিয়া অপরাপর সকল পণ্ডিতকে ঐ বিষয় বুঝাইয়া বলিলেন। তখন ঐ প্রশ্নের উহাই যে একমাত্র সমাধান তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন এবং কাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঐ অপূর্ব্ব সমাধান প্রথম দেখিতে পাইল, তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং যখন নিশ্চিত জানিতে পারিলেন উহা বালক গদাধরই করিয়াছে, তখন কেহ বা স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া বালককে দৈবশক্তিসম্পন্ন ভাবিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন,

লাহাবাবুদের বাটীতে পণ্ডিতসভায় শাস্ত্রবিচার

আবার কেহ বা আনন্দপরিপূরিত হইয়া বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন!

ঈশার জীবনে ঐরূপ ঘটনা। জেরুজালেমের য়াভে-মন্দির

কথাটি আর একটু আলোচনা আবশ্যক। ক্রীশ্চান ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ভগবদবতার ঈশার জীবনেও ঠিক এইরূপ একটি কথা বাইবেলে[১] লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন দ্বাদশবর্ষ। তাঁহার দরিদ্র ধর্ম্মপরায়ণ পিতামাতা ইয়ুসুফ ও মেরি সে-বৎসর তাঁহাকে লইয়া অন্যান্য যাত্রীদের সহিত পদব্রজে নিজেদের বাসভূমি গ্যালিলি প্রদেশস্থ নাজারেথ্ নামক গণ্ডগ্রাম হইতে জেরুজালেম তীর্থের সুবিখ্যাত মন্দিরে দেবদর্শন ও পূজা বলি ইত্যাদি দিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। য়্যাহুদিদিগের এই তীর্থ হিন্দুদিগের তীর্থ-সকলের ন্যায়ই ছিল। এখানে সুবর্ণকৌটায় য়াভে দেবতার আবির্ভাব ভক্তসাধক প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত এবং উহার সম্মুখে একটি বেদীর উপর ধূপ-ধুনা জ্বালাইয়া পত্র-পুষ্প-ফলমূল ও মেষ-পায়রা প্রভৃতি পশু-পক্ষ্যাদি বলি দিয়া উক্ত দেবতার পূজা করিত। হিন্দুদিগের ৺কামাখ্যা পীঠ ও ৺বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি তীর্থে অদ্যাপি পায়রা প্রভৃতি পক্ষী বলি দেওয়া এখনও প্রচলিত।

সেকালের য়্যাহুদি তীর্থ-যাত্রী

ইয়সুফ্ ও মেরি শাস্ত্রানুসারে দর্শন, পূজা, বলি ও হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সঙ্গীদিগের সহিত নিজ গ্রামাভিমুখে ফিরিলেন। সে সময়ে নানা দিগ্‌দেশ হইতে জেরুজালেমদর্শনে আগত যাত্রীদিগের অবস্থা অনেকটা রেল হইবার পূর্ব্বে পদব্রজে ৺পুরী প্রভৃতি

১ লূক্ ২—৪২

তীর্থদর্শনে অগ্রসর যাত্রীদিগের মতই ছিল। সেই মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-কূপ-তড়াগাদিশোভিত একই প্রকার দীর্ঘ পথ, সেই মধ্যে মধ্যে বিশ্রামস্থান, চটী বা সরাই—ধর্ম্মশালারও অভাব ছিল না শুনা যায়—সেই তীর্থযাত্রীর সহচর পাণ্ডা, সেই চাল-ডাল-আটা প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যকীয় খাদ্যাদিদ্রব্য-প্রাপ্তিস্থান মুদির দোকান, সেই ধূলা, সেই ধর্ম্মভাববিস্মরণকারী নিদ্রালস্যের বৈরী যাত্রীদিগের পরমবন্ধু মশককুল, সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের যাত্রিবর্গের দস্যু-তস্করাদি হইতে পরস্পরের সাহায্যলাভ করিতে পারিবে বলিয়া দলবদ্ধ হইয়া গমন এবং পরিশেষে সেই যাত্রীদিগের একান্ত ঈশ্বরনির্ভরতা ও ভগবদ্ভক্তি!

ঈশার পিতা-মাতা আপন দলের সহিত প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ঈশাকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, বোধ হয় অপর কোন যাত্রী বালকের সহিত দলের পশ্চাতে আসিতেছে। কিন্তু অনেক দূর চলিয়া আসিয়াও যখন ঈশাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন বিশেষ ভাবিত হইয়া তন্নতন্ন করিয়া দলমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন ঈশা তাঁহাদের সঙ্গে নাই। কাজেই ব্যাকুল হইয়া পুনরায় জেরুজালেম অভিমুখে ফিরিলেন। সেখানে নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও বালকের তত্ত্ব পাইলেন না। পরিশেষে মন্দিরমধ্যে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখেন বালক ঈশা শাস্ত্রজ্ঞ সাধককুলের ভিতর বসিয়া শাস্ত্রবিচার করিতেছে এবং শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নসকলের (যাহা পণ্ডিতেরাও সমাধান করিতে পারিতেছেন না) অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মোহিত করিতেছে!

য়াভে-মন্দিরে ঈশার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা

পণ্ডিত মোক্ষমূলর তৎকৃত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীতে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বাল্যলীলার সহিত ঈশার বাল্যলীলার সৌসাদৃশ্য পাইয়া ঐ বিষয়ের সত্যতায় বিশেষ সন্দিহান হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, একটু কটাক্ষ করিয়াও বলিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ইংরাজীবিদ্যাভিজ্ঞ শিষ্যেরা গুরুর মান বাড়াইবার জন্য ঈশার বাল্যলীলার কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ইচ্ছা করিয়াই জুড়িয়া দিয়াছেন! পণ্ডিত ঐরূপে আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও আমরা নাচার, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের ঐরূপ বাল্যলীলার কথা আমরা ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরের অনেক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি এবং ঠাকুরও কখন-কখন ঐ বিষয় আমাদের কাহারও কাহারও নিকট নিজমুখে বলিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই এখানে ক্ষান্ত থাকা ভাল।

পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মতখণ্ডন

ঠাকুরের জীবনালোচনা করিতে যাইয়া সকলেরই মনে হয়—ঠাকুর বিবাহিত হইলেন কেন? স্ত্রীর সহিত যাঁহার কোনকালেই শরীরসম্বন্ধ রাখিবার সঙ্কল্প ছিল না, তিনি কেন বিবাহ করিলেন ইহার কারণ বাস্তবিকই খুঁজিয়া পাওয়া ভার। যদি বল, যৌবনে পদার্পণ করিয়াই ঠাকুর 'ভগবান' 'ভগবান' করিয়া উন্মাদপ্রায় হইলেন বলিয়াই আত্মীয়েরা জোর করিয়া বিবাহ দিলেন, তদুত্তরে আমরা বলি ওটা একটা কথাই নয়। জোর করিয়া একটা ছোট কাজও তাঁহাকে বাল্যাবধি কেহ করাইতে পারে নাই। যখন যাহা করিবেন মনে করিয়াছেন, তাহা কোনও না কোন উপায়ে নিশ্চিত সাধিত করিয়াছেন। উপনয়নকালে

ঠাকুর বিবাহ করিলেন কেন? আত্মীয়দিগের অনুরোধে?—না

ধনী নাম্নী জনৈকা কামারজাতীয়া কন্যাকে ভিক্ষামাতা করাতেই দেখ না। কামারপুকুরে কলিকাতার ন্যায় সমাজবন্ধন শিথিল ছিল না যে, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে; ঠাকুরের পিতামাতাও কম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন না, বংশগত প্রথাও ছিল—কোনও না কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে ভিক্ষামাতারূপে নির্দ্দিষ্ট করা এবং বালক গদাধরের অভিভাবকদিগের সকলেই বালকের কামারকন্যার নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষাগ্রহণের বিরোধী ছিলেন। তথাপি কেবলমাত্র গদাধরের নির্ব্বন্ধে ধনীর ভিক্ষামাতা হওয়া সাব্যস্ত হইল—ইহা একটি কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! এইরূপে সকল ঘটনায় যখন দেখিতে পাই, ঠাকুরের ইচ্ছা ও কথাই সকল বিষয়ে অপর সকলের বিপরীত ভাব ও ইচ্ছাকে চিরকাল ফিরাইয়া দিয়াছে, তখন কেমন করিয়া বলি তাঁহার জীবনের অত বড় ঘটনাটা আত্মীয়দিগের ইচ্ছা ও অনুরোধের জোরে হইয়াছে?

আবার, যদি বল ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে সর্ব্বস্বত্যাগের ভাবটা যে ঠাকুরের আজীবন ছিল, এ কথাটা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? ঐ কথাটা স্বীকার না করিয়া যদি বল যে, মানবসাধারণের ন্যায় ঠাকুরেরও বিবাহাদি করিয়া সংসার-সুখভোগ করিবার ইচ্ছাটা প্রথম প্রথম ছিল, কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তাঁহার মনের গতির হঠাৎ একটা আমূল পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল; সংসার-বৈরাগ্য ও ঈশ্বরানুরাগের একটা প্রবল ঝটিকা তাঁহার প্রাণে বহিয়া তাঁহাকে এমন আত্মহারা করিয়া ফেলিল যে, তাঁহার

ভোগবাসনা ছিল বলিয়া? —না

পূর্ব্বেকার বাসনাসমূহ একেবারে চিরকালের মত কোথায় উড়িয়া যাইল। ঠাকুরের বিবাহটা ঐ বিরাগ-অনুরাগের ঝড়টা বহিবার আগেই হইয়াছিল বলিলেই তো সকল কথা মিটিয়া যায়? আমরা বলি—কথাটি আপাততঃ বেশ যুক্তিযুক্ত বোধ হইলেও তৎসম্বন্ধে কতকগুলি অখণ্ডনীয় আপত্তি আছে। প্রথম—চব্বিশ বৎসর বয়সে ঠাকুরের বিবাহ হয়, তখন বৈরাগ্যের ঝড় তাঁহার প্রাণে তুমুল বহিতেছে। আর আজীবন যিনি নিজের জন্য কাহাকেও এতটুকু কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হইতেন, তিনি যে কিছুমাত্র না ভাবিয়া একজন পরের মেয়ের চিরকাল দুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা বুঝিয়াও ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইলেন, ইহা হইতেই পারে না। দ্বিতীয়—ঠাকুরের জীবনের কোন ঘটনাটাই যে নিরর্থক হয় নাই, একথা আমরা যতই বিচার করিয়া দেখি ততই বুঝিতে পারি। তৃতীয়—তিনি ইচ্ছা করিয়াই যে বিবাহ করিয়াছিলেন ইহা সুনিশ্চিত; কারণ বিবাহের পাত্রী অনুসন্ধান-কালে নিজের ভাগিনেয় হৃদয় ও বাটীর অন্যান্য সকলকে বলিয়া দেন যে, তাঁহার বিবাহ জয়রামবাটীনিবাসী শ্রীযুত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত হইবে—ইহা পূর্ব্ব হইতে স্থির আছে। কথাটি শুনিয়া পাঠক অবাক্ হইবে, অথবা অবিশ্বাস করিয়া বলিবে—"কেবলই অদ্ভুত কথার অবতারণা! বিংশ শতাব্দীতে ও সকল কথা কি চলে?" তদুত্তরে আমাদের বলিতে হয়, "তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর বাপু, কিন্তু ঘটনা বাস্তবিকই ঐরূপ হইয়াছিল। এখনও অনেকে বাঁচিয়া

বিবাহের পাত্রী-অন্বেষণের সময় ঠাকুরের কথা—"কুটো বেঁধে রাখা আছে, দেখ্‌গে যা।" অতএব স্বেচ্ছায় বিবাহ করা

আছেন যাঁহারা ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখই না কেন ?" পাত্রীর অন্বেষণে যখন কোনটিই আত্মীয়দিগের মনোমত হইতেছিল না, তখন ঠাকুর স্বয়ং বলিয়া দেন অমুক গাঁয়ের অমুকের "মেয়েটি কুটো বেঁধে[১] রাখা আছে দেখ্‌গে যা !" অতএব বুঝাই যাইতেছে ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বিবাহ হইবে এবং কোথায় কাহার কন্যার সহিত হইবে। তিনি তাহাতে কোন আপত্তিও করেন নাই। অবশ্য ঐরূপ জানিতে পারা তাঁহার ভাবসমাধিকালেই হইয়াছিল।

প্রারব্ধ কর্ম্ম-ভোগের জন্যই কি ঠাকুরের বিবাহ ?

তবে ঠাকুরের বিবাহ হইবার অর্থ কি ? শাস্ত্রজ্ঞ কোন পাঠক এইবার হয়ত বিরক্ত হইয়া বলিবেন—তুমি তো বড় অর্ব্বাচীন হে ! সামান্য কথাটা লইয়া এত গোল করিতেছ ? শাস্ত্র-টাস্ত্র একটু আধটু দেখিয়া সাধু-মহাপুরুষের জীবনের ঘটনা লিখিতে কলম ধরিতে হয়। শাস্ত্র বলেন—ঈশ্বরদর্শন বা পূর্ণজ্ঞান হইলে জীবের সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্মের ক্ষয় হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ জীবকে জ্ঞানলাভ হইলেও এই দেহে করিতে হয়। একটা ব্যাধের পিঠে বাঁধা তূণে কতকগুলি তীর রহিয়াছে, হাতে একটি তীর এখনি ছুড়িবে বলিয়া লইয়াছে, আর একটি তীর বৃক্ষোপরি একটি

১ পাড়াগাঁয়ে প্রথা আছে, শশা প্রভৃতি গাছের যে ফলটি ভাল বুঝিয়া ভগবানের ভোগ দিবে বলিয়া কৃষক মনে করে, স্মরণ রাখিবার জন্য সেটিতে একটি কুটো বাঁধিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখে। ঐরূপ করায় কৃষক নিজে বা তাহার বাটীর আর কেহ সেটি ভুলক্রমে তুলিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলে না। ঠাকুর ঐ প্রথা স্মরণ করিয়াই ঐ কথা বলেন। অর্থ—অমুকের মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে একথা পূর্ব্ব হইতে স্থির হইয়া আছে, অথবা অমুক কন্যাটি তাঁহার বিবাহের পাত্রীস্বরূপে দৈবকর্তৃক রক্ষিত আছে।

পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া সে এইমাত্র ছুড়িয়াছে। এমন সময় ধর ব্যাধের মনে হঠাৎ বৈরাগ্যের উদয় হইয়া সে ভাবিল আর হিংসা করিবে না। হাতের তীরটি সে ফেলিয়া দিল, পিঠের তীরগুলিও ঐরূপে ত্যাগ করিল, কিন্তু যে তীরটি সে পাখীটাকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল সেটাকে কি আর ফিরাইতে পারে? পিঠের তীরগুলি যেন তাহার জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্ম, আর হাতের তীরটি আগামী কর্ম্ম বা যে কর্ম্মসকলের ফল সে এইভাবে ভোগ করিবে—ঐ উভয় কর্ম্মগুলি জ্ঞানলাভে নাশ হয়। কিন্তু তাহার প্রারব্ধ কর্ম্মগুলি হইতেছে—যে তীরটি সে ছুড়িয়া ফেলিয়াছে তাহার মত; তাহাদের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় মহাপুরুষেরা কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মসকলের ভোগই শরীরে করিয়া থাকেন। ঐ ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী এবং তাঁহারা বুঝিতে বা জানিতেও পারেন যে, তাঁহাদের প্রারব্ধ অনুসারে তাঁহাদের জীবনে কিরূপ ঘটনাবলী আসিয়া উপস্থিত হইবে। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপে নিজ বিবাহ কোন্ পাত্রীর সহিত কোথায় হইবে, তাহা বলিয়া দেওয়াটা কিছু বিচিত্র নহে।

ঐ কথার উত্তরে আমরা বলি—অবশ্য শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিকই নিতান্ত অনভিজ্ঞ। কিন্তু যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে যথার্থ জ্ঞানী পুরুষকে প্রারব্ধ কর্ম্মসকলেরও ফল-ভোগ করিতে হয় না। কারণ সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিবে যে মন, সে মন যে তিনি চিরকালের নিমিত্ত ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছেন—তাহাতে আর সুখ-দুঃখাদির স্থান কোথা? তবে যদি বল—তাঁহার শরীরটায়ও

না—যথার্থ জ্ঞানী পুরুষের প্রারব্ধ ভোগ করা-না-করা ইচ্ছাধীন

প্রারব্ধ ভোগ হয়, তাহাই বা কিরূপে হইবে? তিনি যদি ইচ্ছা করিয়া অল্পমাত্র আমিত্ব কোন বিশেষ কারণে—যথা, পরোপকারাদির নিমিত্ত—রাখিয়া দেন, তবেই তাঁহার আবার শরীরমনের উপলব্ধি হয় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হয়। অতএব যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ ইচ্ছা হইলে প্রারব্ধ ভোগ বা ত্যাগ করিতে পারেন; তাঁহাদের ঐরূপ ক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্যই তাঁহাদিগকে 'লোকজিৎ', 'মৃত্যুঞ্জয়', 'সর্ব্বজ্ঞ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

ঠাকুরের তো কথাই নাই: কারণ, তাঁহার কথা—'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ'

আর এক কথা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজের অনুভব যদি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাকে আর জ্ঞানী পুরুষ বলা চলে না; ঐ শ্রেণীমধ্যেই তাঁহাকে আর স্থান দিতে পারা যায় না। কেননা, তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি, "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রাম-কৃষ্ণ", অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বে রামরূপে এবং কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই বর্ত্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া অপূর্ব্ব লীলার বিস্তার করিতেছেন। কথাটি বিশ্বাস করিলে তাঁহাকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব ঈশ্বরাবতার বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর ঐরূপ করিলে, তাঁহাকে প্রারব্ধাদি কোন কর্ম্মেরই বশীভুত আর বলা চলে না। অতএব ঠাকুরের বিবাহ সম্বন্ধে অন্যপ্রকার মীমাংসাই আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি এবং তাহাই এখানে বলিব।

বিবাহের কথা আমাদের নিকট উত্থাপন করিয়া ঠাকুর অনেক

সময় রঙ্গরসও করিতেন। উহাও বড় মধুর। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন মধ্যাহ্নে ভোজন করিতে বসিয়াছেন; নিকটে শ্রীযুত বলরাম বসু ও অন্যান্য কয়েকটি ভক্ত বসিয়া তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতেছেন। সেদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কামারপুকুরে যাত্রা করিয়াছেন কয়েক মাসের জন্য, কারণ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের বিবাহ।

বিবাহের কথা লইয়া ঠাকুরের রঙ্গরস

ঠাকুর—(বলরাম বাবুকে লক্ষ্য করিয়া) আচ্ছা, আবার বিয়ে কেন হলো বল দেখি? স্ত্রী আবার কিসের জন্য হলো? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই—আবার স্ত্রী কেন?

বলরাম ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া আছেন।

ঠাকুর—ওঃ, বুঝেছি; (থাল হইতে একটু ব্যঞ্জন তুলিয়া ও বলরামকে দেখাইয়া) এই—এর জন্যে হয়েছে! নইলে কে আর এমন করে রেঁধে দিত বল? (বলরাম বাবু প্রভৃতি ভক্তগণের হাস্য) হাঁ গো, কে আর এমন করে খাওয়াটা দেখত। ওরা সব আজ চলে গেল—(ভক্তেরা কে চলিয়া গেল বুঝিতে না পারায়) রামলালের খুড়ী গো; রামলালের বিয়ে হবে—তাই সব কামারপুকুরে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, কিছুই মনে হলো না! সত্যি বলছি; যেন কে তো কে গেল! কিন্তু তারপর কে রেঁধে দেবে বলে ভাবনা হল! কি জান?—সব রকম খাওয়া তো আর পেটে সয় না, আর সব সময় খাওয়ার হুঁশও থাকে না। ও (শ্রীশ্রীমা) বোঝে কি রকম খাওয়া সয়; এটা ওটা করে দেয়; তাই মনে হলো—কে ক'রে দেবে!

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলেন, "বিয়ে করতে কেন হয় জানিস্? ব্রাহ্মণশরীরের দশ রকম সংস্কার আছে—বিবাহ তারই মধ্যে একটা। ঐ দশ রকম সংস্কার হলে তবে আচার্য্য হওয়া যায়।" আবার কখন কখন বলিতেন, "যে পরমহংস হয়, পূর্ণ জ্ঞানী হয়, সে হাড়ি-মেথরের অবস্থা থেকে রাজা, মহারাজা, সম্রাটের অবস্থা পর্য্যন্ত সব ভুগে দেখে এসেছে। নইলে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য আসবে কেন? যেটা দেখে নি (ভোগ করে নি), মন সেইটে দেখতে চাইবে ও চঞ্চল হবে;—বুঝলে? ঘুঁটিটা সব ঘর ঘুরে তবে চিকে উঠে—খেলার সময় দেখনি? সেই রকম।"

দশপ্রকারের সংস্কার পূর্ণ করিবার জন্যই সাধারণ আচার্য্যদিগের বিবাহ করা। ঠাকুরের বিবাহও কি সেজন্য?—না

সাধারণ গুরুদিগের বিবাহ করিবার ঐরূপ কারণ ঠাকুর নির্দ্দেশ করিলেও, ঠাকুরের নিজের বিবাহের বিশেষ কারণ যাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই এখন বলিব। বিবাহটা ভোগের জন্য নয়—একথা শাস্ত্র আমাদের প্রতি পদে শিক্ষা দিতেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি-রক্ষারূপ নিয়ম-প্রতিপালন ও গুণবান্ পুত্র উৎপাদন করিয়া সমাজের কল্যাণসাধন করাই হিন্দুর বিবাহরূপ কর্ম্মটার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—শাস্ত্র বার বার এই কথাই আমাদের বলিয়া দিতেছেন। তবে কি উহাতে তাঁহার নিজ স্বার্থ কিছুমাত্র থাকিবে না—শাস্ত্র এইরূপ অসম্ভব কথা বলেন? না, তাহা নহে। শাস্ত্রকার ঋষিগণ

ধর্ম্মাবিরুদ্ধ ভোগসহায়ে ত্যাগে পৌছাইবার জন্যই হিন্দুর বিবাহ

দুর্ব্বল মানবচরিত্রের অন্তঃস্তর পর্য্যন্ত দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, দুর্ব্বল মানব স্বার্থ ভিন্ন এ জগতে আর কোন কথাই বুঝে না; লাভ-লোকসান না খতাইয়া অতি সামান্য কার্য্যেও অগ্রসর হয় না। শাস্ত্রকার ঐ কথা বুঝিয়াও যে পূর্ব্বোক্ত আদেশ করিয়াছেন তাহার কারণ—তিনি এ কথাও বুঝিয়াছেন যে, ঐ স্বার্থ টাকে যদি একটা মহান্ উদ্দেশ্যের সহিত সর্ব্বদা জড়িত রাখিতে পারে তবেই মঙ্গল; নতুবা মানবকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে পড়িয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হইবে। নিজের নিত্য-মুক্ত আত্মস্বরূপ ভুলিয়াই মানব ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বাহ্যজগতের রূপ-রসাদি ভোগের নিমিত্ত ছুটিতেছে, আর মনে করিতেছে—ঐ সকল বড়ই মধুর, বড়ই মনোরম! কিন্তু জগতের প্রত্যেক সুখটাই যে দুঃখের সঙ্গে চিরসংযুক্ত, সুখটা ভোগ করিতে গেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখটাও লইতে হইবে—এ কথা কয়টা লোক ধরিতে বা বুঝিতে পারে? শ্রীযুত বিবেকানন্দ স্বামীজি বলিতেন, "দুঃখের মুকুট মাথায় পরে সুখ এসে মানুষের কাছে দাঁড়ায়,"—মানুষ তখন সুখকে লইয়াই ব্যস্ত! তাহার মাথায় যে দুঃখের মুকুট, উহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলে পরিণামে যে দুঃখটাকেও লইতে হইবে—একথা তখন সে আর ভাবিবার অবসর পায় না। শাস্ত্র সেজন্য তাহাকে ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন, 'সুখলাভটাই নিজের স্বার্থ—একথা মনে কর কেন? সুখ বা দুঃখের একটা লইতে গেলে যে অপরটাকেও লইতে হইবে। স্বার্থ টাকে একটু উচ্চ সুরে বাঁধিয়া ভাব না যে, সুখটাও আমার

বিচার-সংযুক্ত ভোগ করিতে করিতে কালে বোধ হয়—"দুঃখের মুকুট পরিয়া সুখ আসে"

শিক্ষক, দুঃখটাও আমার শিক্ষক; আর যাহাতে ঐ দুয়ের হস্ত হইতে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্রাণ পাওয়া যায়—তাহাই আমার স্বার্থ বা জীবনের উদ্দেশ্য।' অতএব বুঝা যাইতেছে—বিবাহিত জীবনে বিচারসংযুক্ত ভোগের দ্বারা এবং সুখ-দুঃখপূর্ণ নানা অবশ্যম্ভাবী অবস্থার অনুভবের দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর সংসারের সকল আপাতসুখের উপর বিরক্ত হইয়া যাহাতে জীব ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে পূর্ণ হয় এবং তাঁহাকেই সারাৎসার জানিয়া তাঁহার দর্শন-লাভের দিকে মহোৎসাহে অগ্রসর হয়, ইহা শিক্ষা দেওয়াই শাস্ত্র-কারের উদ্দেশ্য। বিচার করিতে করিতে সংসারের কোনও বিষয়টা ভোগ করিতে যাইলেই যে মন ঐ বিষয় ত্যাগ করিবে একথা নিশ্চিত; এজন্যই ঠাকুর বলিতেন, "ওরে, সদসদ্‌বিচার চাই।

ভোগসুখ ত্যাগ করিতে মনকে কি ভাবে বুঝাইতে হয়, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ

সর্ব্বদা বিচার করে মনকে বলতে হয় যে, মন তুমি এই জিনিসটা ভোগ করবে, এটা খাবে, ওটা পরবে বলে ব্যস্ত হচ্ছ—কিন্তু যে পঞ্চভূতে আলু পটল চাল ডাল ইত্যাদি তৈরী হয়েছে, সেই পঞ্চভূতেই আবার সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি তৈরী হয়েছে; যে পঞ্চভূতের হাড়-মাস-রক্ত-মজ্জায় নারীর সুন্দর শরীর হয়েছে, তাতেই আবার তোমার, সকল মানুষের ও গরু ছাগল ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীরও শরীর হয়েছে; তবে কেন ওগুলো পাবার জন্য এত হাঁই-ফাঁই কর? ওতে তো আর সচ্চিদানন্দলাভ হবে না! তাতেও যদি না মানে তো বিচার করতে করতে দু-একবার ভোগ করে সেটাকে ত্যাগ করতে হয়। যেমন ধর, রসগোল্লা খাবে বলে মন ভারি ধরেছে,

কিছুতেই আর বাগ্ মানচে না—যত বিচার করচ সব যেন ভেসে যাচ্চে; তখন কতকগুলো রসগোল্লা এনে এগাল ওগাল করে চিবিয়ে খেতে খেতে মনকে বলবে—'মন, এরই নাম রসগোল্লা; এ-ও আলু-পটলের মত পঞ্চভূতের বিকারে তৈরী হয়েছে; এ-ও খেলে শরীরে গিয়ে রক্ত-মাংস-মল-মূত্র হবে; যতক্ষণ গালে আছে ততক্ষণই এটা মিষ্টি—গলার নীচে নাব্‌লে আর ঐ আস্বাদের কথা মনে থাকবে না; আবার বেশী খাও তো অসুখ হবে; এর জন্য এত লালায়িত হও! ছিঃ ছিঃ!—এই খেলে, আর খেতে চেও না।' (সন্ন্যাসী ভক্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া) সামান্য সামান্য বিষয়গুলো এই রকম করে বিচারবুদ্ধি নিয়ে ভোগ করে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু বড় বড় গুলোতে ও রকম করা চলে না; ভোগ করতে গেলেই বন্ধনে পড়ে যেতে হয়। সে জন্য বড় বড় বাসনা-গুলোকে বিচার করে, তাতে দোষ দেখে, মন থেকে তাড়াতে হয়।"

শাস্ত্র বিবাহের ঐরূপ উচ্চ উদ্দেশ্য উপদেশ করিলেও কয়টা লোকের মনে সে কথা আজকাল স্থান পায়? কয়জন বিবাহিত

বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার প্রথার উচ্ছেদ হওয়াতেই হিন্দুর বর্ত্তমান জাতীয় অবনতি

জীবনে যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আপনা-দিগকে এবং জনসমাজকে ধন্য করিয়া থাকেন? কয়জন স্ত্রী স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে লোক-হিতকর উচ্চব্রতে—ঈশ্বরলাভের কথা দূরে থাকুক—প্রেরণা দিয়া থাকেন? কয়জন পুরুষই বা 'ত্যাগই জীবনের উদ্দেশ্য' জানিয়া স্ত্রীকে তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন? হায় ভারত! পাশ্চাত্যের ভোগ-সর্ব্বস্ব জড়বাদ ধীরে ধীরে তোমার অস্থি-মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া

তোমাকে কি মেরুদণ্ডহীন পশুবিশেষে পরিণত করিয়াছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! সাধে কি আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সন্ন্যাসি-ভক্তদিগকে বর্ত্তমান বিবাহিত জীবনে দোষ দেখাইয়া বলিতেন, "ওরে, (ভোগটাকে সর্ব্বস্ব বা জীবনের উদ্দেশ্য করাই যদি দোষ হয়, তবে বিবাহের সময়) একটা ফুল ফেলে সেটা কর্‌লেই কি শুদ্ধ হয়ে গেল—তার দোষ কেটে গেল?" বাস্তবিক বিবাহিত জীবনে ইন্দ্রিয়পরতা আর কখনও ভারতে এত প্রবল হইয়াছিল কি না সন্দেহ। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ভিন্ন বিবাহের যে অপর একটা মহাপবিত্র, মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে—এ কথা আমরা আজকাল একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি, আর দিন দিন ঐ কারণে পশুরও অধম হইতে বসিয়াছি! নব্য ভারত-ভারতীর ঐ পশুত্ব ঘুচাইবার জন্যই লোকগুরু ঠাকুরের বিবাহ। তাঁহার জীবনের সকল কার্য্যের ন্যায় বিবাহরূপ কার্য্যটাও লোক-কল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত।

নিজে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া ঐ আদর্শ পুনরায় প্রচলনের জন্যই ঠাকুরের বিবাহ

ঠাকুর বলিতেন, "এখানকার যা কিছু করা সে তোদের জন্য। ওরে, আমি ষোল টাং কর্‌লে তবে যদি তোরা এক টাং করিস্। আর, আমি যদি দাঁড়িয়ে মুতি তো তোরা শালারা পাক্ দিয়ে দিয়ে তাই কর্‌বি।" এই জন্যই ঠাকুরের বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য ঘাড়ে লইয়া মহোচ্চ আদর্শসকলের চক্ষুর সম্মুখে অনুষ্ঠান করিয়া দেখান। ঠাকুর যদি স্বয়ং বিবাহ না করিতেন তাহা হইলে গৃহস্থ মানব বলিত, 'বিবাহ তো করেন নাই, তাই অত ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলা চলিতেছে। স্ত্রীকে

আপনার করিয়া এক সঙ্গে একত্র তো বাস কখন করেন নাই, তাই আমাদের উপর লম্বা লম্বা উপদেশ দেওয়া চলিতেছে।' সে জন্যই ঠাকুর শুধু যে বিবাহ করিয়াছিলেন মাত্র তাহা নহে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণদর্শনলাভের পর যখন দিব্যোন্মাদাবস্থা তাঁহার সহজ হইয়া গেল, তখন পূর্ণযৌবনা বিবাহিতা স্ত্রীকে দক্ষিণেশ্বরে নিজ সমীপে আনাইয়া রাখিলেন, তাঁহাতে জগদম্বার আবির্ভাব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীষোড়শী মহাবিদ্যাজ্ঞানে পূজা ও আত্মনিবেদন করিলেন, আটমাস কাল নিরন্তর একত্র বাস ও তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন পর্য্যন্ত করিলেন এবং স্ত্রীর শিক্ষা এবং প্রাণের শান্তি ও আনন্দের জন্য অতঃপর কামারপুকুরে এবং কখন কখন শ্বশুরালয় জয়রামবাটীতেও স্বয়ং যাইয়া দুই-এক মাস কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুর স্ত্রীর সহিত এইরূপে একত্র বাস করেন, তখনকার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীমা এখনও স্ত্রী-ভক্তদিগকে বলিয়া থাকেন, "সে যে কি অপূর্ব্ব দিব্যভাবে থাকৃতেন, তাহা বলে বোঝাবার নয়! কখন ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখন হাসি, কখন কান্না, কখন একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম, সমস্ত রাত! সে কি এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌ত, আর ভাব্‌তুম কখন্ রাত্‌টা পোহাবে! ভাবসমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না; এক দিন তাঁর আর সমাধি ভাঙ্গে না দেখে ভয়ে কেঁদে কেটে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে

স্ত্রীর সহিত ঠাকুরের শরীর-সম্বন্ধ-রহিত অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমসম্বন্ধ। ঐ বিষয়ক কথা

কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়! তারপর ঐরূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি নিজে শিখিয়ে দিলেন—এই রকম ভাব দেখ্‌লে এই নাম শুনাবে, এই রকম ভাব দেখ্‌লে এই বীজ শুনাবে। তখন আর তত ভয় হত না, ঐ সব শুনালেই তাঁর আবার হুঁশ হত। তারপর অনেকদিন এইরূপে গেলেও, কখন তাঁর কি ভাবসমাধি হবে বলে সারা রাত্তির জেগে থাকি ও ঘুমুতে পারি না—একথা একদিন জান্‌তে পেরে, নহবতে আলাদা শুতে বল্‌লেন!" পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা বলেন, এইরূপে প্রদীপে শল্‌তেটি কি ভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ী যাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে প্রভৃতি সংসারের সকল কথা হইতে ভজন, কীর্ত্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্য্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।—হে গৃহী মানব, কয়জন তোমরা এই ভাবে নিজ নিজ স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া থাক? তুচ্ছ শরীরসম্বন্ধটা যদি আজ হইতে কোন কারণে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কয় জন তোমরা স্ত্রীকে ঐরূপে মান্য, ভক্তি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা আজীবন দিতে পার? সেই জন্যই বলি, এ অপূর্ব্ব যুগাবতারের বিবাহ করিয়া, একদিনের জন্যও শরীর-সম্বন্ধ না পাতাইয়া, স্ত্রীর সহিত এই অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেম-লীলার বিস্তার কেবল তোমারই জন্য। তুমিই শিখিতে পারিবে বলিয়া যে—ইন্দ্রিয়পরতা ভিন্ন বিবাহের অপর মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে এবং এই উচ্চ আদর্শে

গৃহী মানবের শিক্ষার জন্যই ঠাকুরের ঐরূপ প্রেমলীলাভিনয়

লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যাহাতে তুমিও বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিয়া স্ত্রী-পুরুষে ধন্য হইতে পার এবং মহা মেধাবী, মহা তেজস্বী, গুণবান্ সন্তানের পিতা-মাতা হইয়া ভারতের বর্ত্তমান হীনবীর্য্য, হতশ্রী, হৃতশক্তিক সমাজকে ধন্য করিতে পার, সেইজন্য। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি রূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে লীলা লোকগুরুদিগের জগৎকে দেখাইবার প্রয়োজন হয় নাই, তাহাই এই যুগে তোমার প্রয়োজনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে প্রদর্শিত হইয়াছে। আজীবন-ব্যাপী কঠোর তপস্যা ও সাধনাবলে উদ্বাহবন্ধনের অদৃষ্টপূর্ব্ব পবিত্র 'ছাঁচ' জগতে এই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছে। এখন, ঠাকুর যেমন বলিতেন—তোমরা নিজ নিজ জীবন সেই আদর্শ ছাঁচে ফেল, আর নূতনভাবে গঠিত করিয়া তোল।

ঠাকুরের আদর্শে বিবাহিত জীবন গঠন করিতে এবং অন্ততঃ আংশিক-ভাবেও ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে। নতুবা আমাদের কল্যাণ নাই

'কিন্তু'—গৃহমেধিমানব এখনও বলিতেছে—'কিন্তু—'! ওঃ, বুঝিয়াছি এবং শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সাধন-ভজন সম্বন্ধে যেমন বলিতেন তাহাই তদুত্তরে বলিতেছি, "তোরা মনে করেছিস্ বুঝি প্রত্যেকে এক একটা রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি? সে নয় মণ তেলও পুড়্বে না, রাধাও নাচ্বে না। রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতে একটাই হয়—বনে একটা সিঙ্গিই (সিংহ) থাকে।" হে গৃহী মানব, আমরাও তোমার 'কিন্তু'-র উত্তরে সেইরূপ বলিতেছি—ঠাকুরের ন্যায় স্ত্রীর সহিত বাস করিয়া একেবারে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য রাখা তোমার যে সাধ্যাতীত তাহা

ঠাকুর বিলক্ষণ জানিতেন এবং জানিয়াও যে ঐরূপ করিয়া তোমায় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল তুমি অন্ততঃ 'এক টাং' বা আংশিকভাবে উহার অনুষ্ঠান করিবে বলিয়া। কিন্তু জানিও, ঐ উচ্চ আদর্শের অনুষ্ঠান করিয়া যদি তুমি স্ত্রীজাতিকে জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রতিরূপ বলিয়া না দেখিতে এবং হৃদয়ের যথাসাধ্য নিঃস্বার্থ ভালবাসা না দিতে চেষ্টা কর, জগতের মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীমূর্ত্তিসকলকে তোমার ভোগমাত্রৈকসহায়া পরাধীনা দাসী বলিয়া ভাবিয়া চিরকাল পশুভাবেই দেখিতে থাক, তবে তোমার আর গতি নাই; তোমার বিনাশ ধ্রুব এবং অতি নিকটে। শ্রীকৃষ্ণের কথা উপেক্ষা করিয়া যদুবংশের কি হইল, তাহা ভাবিও, ঈশার কথা উপেক্ষা করিয়া য়্যাহুদী জাতিটার কি দুর্দ্দশা, তাহা স্মরণ রাখিও। যুগাবতারকে উপেক্ষা করা সর্ব্ব-কালেই জাতিসকলের ধ্বংসের কারণ হইয়াছে।

আর একটি প্রশ্নের এখানে উত্তর দিয়াই আমরা উদ্বাহবন্ধনের ভিতর দিয়া ঠাকুরের গুরুভাবের অদৃষ্টপূর্ব্ব বিকাশের কথা সাঙ্গ করিয়া ঐ বিষয়ের অপর কথাসকল বলিব।

বিবাহ করিয়া ঠাকুরের শরীর-সম্বন্ধ সম্পূর্ণ রহিত হইয়া থাকা সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি ও তাহার খণ্ডন

রূপ-রসাদি বিষয়ের দাস, বহির্ম্মুখ মানবমনে এখনও নিশ্চিত উদয় হইতেছে যে, ঠাকুর যদি বিবাহই করিলেন, তবে একটিও অন্ততঃ সন্তানোৎপাদন করিয়া স্ত্রীর সহিত শরীরসম্বন্ধ ত্যাগ করিলে ভাল হইত। ঐরূপ করিলে বোধ হয় ভগবানের সৃষ্টিরক্ষা করাটা যে মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য, তাহা দেখান হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রমর্য্যাদাটাও রক্ষা পাইত।

পূজা করে, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝা যায়, সে লোকটা বাহিরে যে আদর্শ দেখায় তাহাতে কিছুমাত্র ভেল নাই। ঠাকুরের সম্বন্ধে সেজন্য ঐ কথা যত নিশ্চয় করিয়া আমরা বলিতে পারি, এমন আর কাহারও সম্বন্ধে নহে। পরিণীতা পত্নীর সহিত ঠাকুরের অপূর্ব্ব প্রেমলীলার অনেক কথা বলিবার থাকিলেও, ইহা তাহার স্থান নহে। সেজন্য এখানে ঐ বিষয়ের ভিতর দিয়া ঠাকুরের অদ্ভুত গুরুভাব-বিকাশের কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিয়াই আমরা ক্ষান্ত রহিলাম।

পঞ্চম অধ্যায়

যৌবনে গুরুভাব

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌॥—গীতা, ৭।২৫

গুরু ও নেতা হওয়া মানবের ইচ্ছাধীন নহে

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের বিশেষ বিকাশ আরম্ভ হয় যেদিন হইতে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় ব্রতী হইয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। ঠাকুরের তখন সাধনার কাল—ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদাবস্থা। কিন্তু হইলে কি হয়? যিনি গুরু, তিনি চিরকালই গুরু—যিনি নেতা, তিনি বাল্যকাল হইতেই নেতা। লোকে কমিটি করিয়া পরামর্শ আটিয়া যে তাঁহাকে গুরু বা নেতার আসন ছাড়িয়া দেয়, তাহা নহে। তিনি যেমন আসিয়া লোকসমাজে দণ্ডায়মান হন, অমনি মানবসাধারণের মন তাঁহার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হয়; অমনি নতশিরে তাহারা তাঁহার নিকট শিক্ষাগ্রহণ ও তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতে থাকে—ইহাই নিয়ম। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, মানুষ মানুষকে যে নেতা বা গুরু করিয়া তোলে, তাহা নহে; যাঁহারা গুরু বা নেতা হন, তাঁহারা ঐ অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। 'A leader is always born and never created.'—সেজন্য দেখা যায়,

অপর সাধারণে যে সকল কাজ করিলে সমাজ চটিয়া দণ্ডবিধান করে, লোকগুরুরা সেই সকল কাজ করিলেও অবনতশিরে তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া থাকে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।'

—তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই সৎকার্য্যের প্রমাণ বা পরিমাপক হইয়া দাঁড়ায় এবং লোকে তদ্রূপ আচরণই তদবধি করিতে থাকে। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, কিন্তু বাস্তবিকই ঐরূপ চিরকাল হইয়া আসিয়াছে এবং পরেও হইতে থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'আজ হইতে ইন্দ্রের পূজা বন্ধ হইয়া গোবর্দ্ধনের পূজা হইতে থাকুক'—লোকে তাহাই করিতে লাগিল! বুদ্ধ বলিলেন, 'আজ হইতে পশুহিংসা বন্ধ হউক,' অমনি 'যজ্ঞে হনন করিবার জন্যই পশুগণের সৃষ্টি,' 'যজ্ঞার্থে পশবো স্রষ্টাঃ'রূপ নিয়মটি সমাজ পাল্টাইয়া বাঁধিল! যীশু মহাপবিত্র উপবাসের দিনে শিষ্যদিগকে ভোজন করিতে অনুমতি দিলেন—তাহাই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইল! মহম্মদ বহু বিবাহ করিলেন, তবুও লোকে তাঁহাকে ধর্ম্মবীর, ত্যাগী ও নেতা বলিয়া মান্য করিতে থাকিল! সামান্য বা মহৎ সকল বিষয়েই ঐরূপ—তাঁহারা যাহা বলেন ও করেন, তাহাই সদাচরণের আদর্শ।

কেন যে ঐরূপ হয় তাহাও ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি—লোকগুরুদিগের ক্ষুদ্র স্বার্থপর 'আমি'টা চিরকালের মত একেবারে বিনষ্ট হইয়া তাহার স্থলে বিরাটভাবমুখী 'আমিত্ব'টার বিকাশ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে 'আমি'টার দশের কল্যাণ-খোঁজাই

স্বভাব। আর, ফুল ফুটিলে ভ্রমর যেমন আপনিই জানিতে পারিয়া মধুলোভে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়, ফুলকে আর ভ্রমরের নিকট সাদর নিমন্ত্রণ পাঠাইতে হয় না, সেইরূপ যেমনি কাহারও ভিতর ঐ বিরাট 'আমি'টার বিকাশ হয়, অমনি সংসারে তাপিত লোকসকল আপনিই তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়া শান্তিলাভের নিমিত্ত ছুটিয়া আসে। সাধারণ মানবের ভিতর ঐ বিরাট 'আমি'টার একটু আধটু ছিটে-ফোঁটার মত বিকাশ অনেক কষ্টে আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু লোকগুরুদিগের জীবনে বাল্য হইতেই উহার কিছু না কিছু বিকাশ, যৌবনে অধিকতর প্রকাশ এবং পরিশেষে পূর্ণ প্রকাশে অদ্ভুত লীলাসকল দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদিগকে একেবারে অপৃথকভাবে দেখিতে থাকি। কারণ তখন ঐ অমানুষ-ভাবপ্রকাশ তাঁহাদের এত সহজ হইয়া দাঁড়ায় যে, উহা খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, নিঃশ্বাস-ফেলার মত একটা সাধারণ নিত্যকর্ম্মের মধ্যে হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই সাধারণ মানুষ আর কি করিবে?—দেখে যে, তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থের মাপকাঠি দ্বারা তাঁহাদের দেবচরিত্র মাপা চলে না এবং তজ্জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি-বিশ্বাস ও শরণগ্রহণ করে!

লোকগুরুদিগের ভিতরে বিরাট ভাবমুখী আমিত্বের বিকাশ সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়, সাধারণের ঐরূপ হয় না

ঠাকুরের জীবনালোচনায়ও আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই—যৌবনে সাধকাবস্থায় দিনের পর দিন ঐ ভাবের ক্রমে ক্রমে বিকাশ হইতে হইতে দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনান্তে ঐ ভাবের

পূর্ণ প্রকাশ হইয়া উহা একেবারে সহজ হইয়া দাঁড়ায়। তখন কখন যে তিনি কোন্ 'আমি'-বুদ্ধিতে রহিয়াছেন বা কখন যে তাঁহাতে বিরাট 'আমি'-টার সহায়ে গুরুভাবাবেশ হইল, তাহা অনেক সময়ে সাধারণ মানব-মনবুদ্ধির গোচর হইত না। কিন্তু ওটা ঐ ভাবের পূর্ণ পরিণত অবস্থার কথা এবং যেখানকার কথা সেইখানেই উহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে; এখন, যৌবনে সাধকাবস্থায় ঐ ভাবে আত্মহারা হইয়া তিনি অনেক সময়ে যেরূপ আচরণ করিতেন, তাহারই কিছু পাঠককে অগ্রে বলা আবশ্যক।

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের পূর্ণ-বিকাশ হইয়া উহা সহজভাব হইয়া দাঁড়ায় কখন

যৌবনে ঠাকুরের গুরুভাবের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুরানাথ বা মথুরবাবুকে লইয়া। অবশ্য ইঁহাদের দুইজনের কাহাকেও দেখা আমাদের কাহারও ভাগ্যে হয় নাই। তবে ঠাকুরের নিজ মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, প্রথম দর্শনেই ইঁহাদের মনে ঠাকুরের প্রতি একটা ভালবাসার উদয় হইয়া ক্রমে ক্রমে উহা এতই গভীরভাব ধারণ করে যে, এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। মানুষকে মানুষ যে এতটা ভক্তি-বিশ্বাস করিতে, এতটা ভালবাসিতে পারে, তাহা আমাদের অনেকের মনে বোধ হয় ধারণা না হইয়া একটা রূপকথার মত মনে হইবে। অথচ উপর উপর দেখিলে ঠাকুর তখন একজন সামান্য নগণ্য পূজক ব্রাহ্মণমাত্র এবং তাঁহার

সাধনকালে ঐ ভাব—রাণী রাসমণি ও তদীয় জামাতা মথুরের সহিত ব্যবহারে

সমাজে জাত্যংশে বড় না হইলেও ধনে, মানে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সমাজের অগ্রণী বলিলে চলে।

আবার এদিকে ঠাকুরের স্বভাবও বাল্যাবধি অতি বিচিত্র। ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, নামের শেষে বড় বড় উপাধি প্রভৃতি যে সকল লইয়া লোকে লোককে বড় বলিয়া গণ্য করে, তাঁহার গণনায়, তাঁহার চক্ষে ওগুলো চিরকালই ধর্ত্তব্যের মধ্যে বড় একটা ছিল না।

ঠাকুরের অপূর্ব্ব স্বভাব

ঠাকুর বলিতেন, "মনুমেণ্টে উঠে দেখলে তিনতলা চারতলা বাড়ী, উঁচু উঁচু গাছ ও জমির ঘাস, সব এক সমান হয়ে গেছে দেখায়"; আমরাও দেখি, ঠাকুরের নিজের মন বাল্যাবধি সত্য-নিষ্ঠা ও ঈশ্বরানুরাগ সহায়ে সর্ব্বদা এত উচ্চে উঠিয়া থাকিত যে সেখান হইতে ধন-মান-বিদ্যাদির একটু আধটু তারতম্য—যাহা লইয়া আমরা একেবারে ফুলিয়া ফাটিয়া যাইবার মত হই ও 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করি—সব এক সমান দেখা যাইত। অথবা ঠাকুরের মন চিরকাল প্রত্যেক কার্য্যটা কেন করিব ও প্রত্যেক ব্যক্তি ও পদার্থের সহিত সম্বন্ধের চরম পরিণতিতে কি কতদূর দাঁড়াইবে—তাহা ভাবিয়া অপরের ঐ ঐ বিষয়ে কিরূপ বা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিয়া একটা বদ্ধমূল ধারণায় পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত হইত। কাজেই ঐ সকল বিষয় যে, উদ্দেশ্য ও চরম-পরিণতি লুকাইয়া মধুর ছদ্মবেশে তাঁহাকে ভুলাইয়া অন্ততঃ কিছু-কালের জন্যও মিছামিছি ঘুরাইবে, তাহার কোনও পথই ছিল না। পাঠক বলিবে—'কিন্তু ওরূপ বুদ্ধিতে সকল বিষয়ের দোষগুলিই তো আগে চক্ষে পড়িয়া মানুষকে জড়ভাবাপন্ন করিয়া তুলিবে,

জগতের কোন কার্য্য করিতেই আর অগ্রসর হইতে দিবে না।' বাস্তবিকই তাহা। মন যদি পূর্ব্ব হইতে বাসনাশূন্য বা পবিত্র না হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরলাভরূপ মহৎ উদ্দেশ্যে যদি উহার গোড়া বাঁধা না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ বুদ্ধি বাস্তবিকই মানবকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া উদ্যমরহিত এবং কখন কখন উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী করিয়া তুলে। নতুবা পবিত্রতা ও উচ্চ লক্ষ্যে যদি মনের সুর চড়াইয়া বাঁধা থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ সকল বিষয়ের অন্তস্তলস্পর্শী দোষদর্শী বুদ্ধিই মানবকে ঈশ্বরদর্শনের পথে দ্রুতপদে অগ্রসর করাইয়া দেয়। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐজন্য শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন মানবকেই সর্ব্বদা সংসারে 'জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শন' করিয়া বৈরাগ্যবান হইতে বলিয়াছেন। ঠাকুরের চরিত্রে বাল্যাবধি ঐ দোষদৃষ্টি কতদূর পরিস্ফুট তা দেখ;—লেখা-পড়া করিতে গিয়া কোথায় 'তর্কালঙ্কার', 'বিদ্যাবাগীশ' প্রভৃতি উপাধি ও নাম-যশের দিকে দৃষ্টি পড়িবে, তাহা না হইয়া দেখিতে পাইলেন, বড় বড় 'তর্কবাগীশ', 'ন্যায়চুঞ্চু' মহাশয়দের ন্যায়-বেদান্তের লম্বা লম্বা কথা আওড়াইয়া ধনীর দ্বারে খোশামুদি করিয়া 'চাল কলা বাঁধা' বা জীবিকার সংস্থান করা! বিবাহ করিতে যাইয়া কোথায় সংসারের ভোগসুখ আমোদ-প্রমোদের দিকে নজর পড়িবে, তাহা না হইয়া দেখিলেন দুদিনের সুখের নিমিত্ত চিরকালের মত বন্ধন গলায় পরা, অভাব-বৃদ্ধি করিয়া টাকার চিন্তায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান ও সেই দুই দিনের সুখেরও অনিশ্চয়তা। টাকাতে সংসারে সব করিতে ও সব হইতে পারা যায় দেখিয়া কোথায় কোমর বাঁধিয়া রোজগারে

লাগিয়া যাইবেন,—না, দেখিলেন টাকাতে কেবল ভাত, ডাল, কাপড় ও ইট, মাটি, কাঠ-লাভই হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরলাভ হয় না। সংসারে গরীব-দুঃখীর প্রতি দয়া করিয়া পরের দুঃখমোচন করিয়া 'দাতা' 'পরোপকারী' ইত্যাদি নাম কিনিবেন—না, দেখিলেন আজীবন চেষ্টার ফলে বড় জোর দু'চারটে ফ্রী-স্কুল ও দু'চারটে দাতব্য ডাক্তারখানা, না হয় দু'চারটে অতিথিশালা স্থাপন করা যায়; তারপর মৃত্যু। জগতের যেমন অভাব ছিল, তেমনিই থাকিল!—এইরূপ সকল বিষয়ে।

ধনী ও পণ্ডিতদের ঠাকুরকে চিনিতে পারা কঠিন। উহার কারণ

ঐরূপ স্বভাবাপন্ন ঠাকুরকে কাজেই ঠিক ঠিক ধরা বা বুঝা সাধারণ মানবের বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ আবার বিদ্যাভিমানী ও ধনীদের; কারণ স্পষ্ট কথা সংসারে কাহারও নিকট শুনিতে না পাইয়া লোকমান্য ও ধনমদে শুনিবার ক্ষমতাটি পর্য্যন্ত তাঁহারা অনেকস্থলে হারাইয়া বসেন। কাজেই তাঁহারা ঠাকুরকে অনেক সময় না বুঝিতে পারিয়া যে অসভ্য, পাগল বা অহঙ্কারী মনে করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। সেজন্যই রাণী রাসমণি ও মথুর বাবুর ভক্তি-ভালবাসা দেখিয়া আরও অবাক হইতে হয়। মনে হয়, ঈশ্বরকৃপায় মহাভাগ্যোদয় হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা ঠাকুরের উপর ভালবাসা শুধু যে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার দিব্য গুরুভাবের পরিচয় দিন দিন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মবিক্রয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। নতুবা, যে ঠাকুর কালীবাটী-প্রতিষ্ঠার দিনে আপনার অগ্রজ পূজায় ব্রতী হইলে এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদ ভোজন

করিলেও শূদ্রান্ন ভোজন করিতে হইবে বলিয়া তথায় উপবাস করিয়াছিলেন এবং পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত ঐ নিমিত্ত কালীবাটীর গঙ্গাতীরে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছিলেন, যে ঠাকুর মথুর বাবু বার বার ডাকিলেও বিষয়ী লোক বলিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং পরে মা কালীর পূজায় ব্রতী হইবার জন্য তাঁহার সাদর অনুরোধ বার বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, অভিমান এবং ধনমদ ত্যাগ করিয়া সেই ঠাকুরকে প্রথম হইতে ভালবাসা এবং বরাবর ঐ ভাব ঠিক রাখা রাণী রাসমণি ও মথুর বাবুর সহজ হইত না।

বিবাহের পর ঠাকুরের অবস্থা। মথুরের উহা লক্ষ্য করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। অপর সাধারণের ঠাকুরের বিষয়ে মতামত

ঠাকুরের তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পূর্ণ যৌবন। বিবাহ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং মা-কালীর পূজায় ব্রতী হইয়াছেন; পূজায় ব্রতী হইয়াই আবার ঈশ্বরপ্রেমে পাগলের মত হইয়াছেন। ঈশ্বরলাভ হইল না বলিয়া কখন কখন ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া মুখ ঘস্ড়াইয়া 'মা' 'মা' বলিয়া এত ক্রন্দন করেন যে, লোক দাঁড়াইয়া যায়! লোকে ব্যথিত হইয়া বলাবলি করে, 'আহা, লোকটির কোন উৎকট রোগ হইয়াছে নিশ্চয়; পেটের শূলব্যথায় মানুষকে অমনি অস্থির করে।' কখন বা পূজার সময় যত ফুল নিজের মাথায় চাপাইয়া নিস্পন্দ হইয়া যান। কখন বা সাধকদিগের পদাবলী উন্মত্তভাবে কতক্ষণ ধরিয়া গাহিতে থাকেন। নতুবা যখন কতকটাও সাধারণভাবে থাকেন তখন যাহার সহিত যেমন ব্যবহার করা উচিত, যাহাকে যেমন মান

দেওয়া রীতি, সে সমস্ত পূর্ব্বের ন্যায়ই করেন। কিন্তু জগন্মাতার ধ্যানে যখন ঐরূপ ভাবাবেশ হয়—এবং সে ভাবাবেশ যে, দিনের ভিতর এক আধবার একটু আধটু হইত, তাহা নহে—তখন ঠাকুরের আর কোন ঠিক-ঠিকানাই থাকে না, কাহারও কোন কথা শুনেন না বা উত্তর দেন না। কিন্তু তখনও সে দেবচরিত্রের মাধুর্য্যের অনেক সময় লোকে পরিচয় পায়; তখনও যদি কেহ বলে, 'মা-র নাম দুটো শুনাও না'—অমনি ঠাকুর তাহার প্রীতির জন্য মধুর কণ্ঠে গান ধরেন এবং গাহিতে গাহিতে গানের ভাবে নিজে বিভোর হইয়া আত্মহারা হন।

ইতিপূর্ব্বেই রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুর কর্ণে হীনবুদ্ধি নিম্ন-পদস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং ঠাকুরবাড়ীর প্রধান কর্ম্মচারী খাজাঞ্চী মহাশয়ও পূজার সময় ঠাকুরের অনাচারের অনেক কথা তুলিয়া বলিয়াছেন 'ছোট ভট্‌চাজ্[১] সব মাটি করলে; মা-র (কালীর) পূজা, ভোগ, রাগ কিছুই হইতেছে না; ওরূপ অনাচার করলে মা কি কখন পূজা ভোগ গ্রহণ করেন?' ইত্যাদি। কিন্তু বলিয়াও কিছুমাত্র সফলমনোরথ হন নাই; কারণ মথুরবাবু স্বয়ং মাঝে মাঝে কাহাকেও কোন সংবাদ না দিয়া হঠাৎ মন্দিরে আসিয়া অন্তরালে থাকিয়া ঠাকুরের পূজার সময় ভক্তিবিহ্বল বালকের ন্যায় ব্যবহার ও শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি আব্‌দার অনুরোধাদি দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহাদের আজ্ঞা করিয়াছেন—'ছোট ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেভাবে যাহাই করুন

১ ঠাকুরের অগ্রজকে 'বড় ভট্টাচার্য্য' বলিয়া ডাকায় ঠাকুর তখন এই নামে নির্দ্দিষ্ট হইতেন।

না কেন, তোমরা তাঁহাকে বাধা দিবে না বা কোন কথা বলিবে না। আগে আমাকে জানাইবে, পরে আমি যেমন বলি তেমনি করিবে।'

রাণী রাসমণিও মধ্যে মধ্যে আসিয়া মা-র শিঙ্গার (ফুলের সাজ) ইত্যাদি দেখিয়া এবং ঠাকুরের মধুর কণ্ঠে মা-র নাম শুনিয়া এতই মোহিত হইয়াছেন যে, যখনই কালীবাড়ীতে আসেন তখনই ছোট ভট্টাচার্য্যকে নিকটে ডাকাইয়া মা-র নাম (গান) করিতে অনুরোধ করেন। ঠাকুরও গান করিতে করিতে কাহাকেও যে শুনাইতেছেন একথা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকেই যেন শুনাইতেছেন, এই ভাবে গান গাহিতে থাকেন। এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, জগৎ-রূপ বৃহৎ সংসারের ন্যায় ঠাকুর-বাড়ীর ক্ষুদ্র সংসারেও যে যাহার কাজ লইয়াই ব্যস্ত এবং সাংসারিক কাজকর্ম্ম ও স্বার্থচিন্তা বাদে যতটুকু সময় পায় তাহাতে পরনিন্দা পরচর্চ্চাদি রুচিকর বিষয়সকলের আন্দোলন করিয়া নিজ নিজ মনের একদেশিতার অবসাদ দূর করিয়া থাকে। কাজেই ছোট ভট্টাচার্য্যের ভিতরে ঈশ্বরপ্রেমে যে কি পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার খবর রাখে কে? 'ও একটা উন্মাদ, বাবুদের কেমন একটা সুনজরে পড়িয়াছে, তাই এখনও চাকরিটি বজায় আছে; তাই বা কদিন? কোন্ দিন একটা কি কাণ্ড করিয়া বসিবে ও তাড়িত হইবে! বড়লোকের মেজাজ—কিছু কি ঠিক-ঠিকানা আছে? খুশী হইতেও যতক্ষণ, আর গরম হইতেও ততক্ষণ'—ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তাই

কর্ম্মচারীদের ভিতর কখন কখন হইয়া থাকে, এই মাত্র। ঠাকুরের ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয়ও তৎপূর্ব্বেই ঠাকুরবাটীতে আসিয়া জুটিয়াছে।

আজ রাণী রাসমণি স্বয়ং ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়াছেন। কর্ম্ম-চারীরা সকলে শশব্যস্ত। যে ফাঁকিদার সে-ও আজ আপন কর্ত্তব্য অতি যত্নের সহিত করিতেছে। গঙ্গায় স্নানান্তে রাণী কালীঘরে দর্শন করিতে যাইলেন। তখন ৺কালীর পূজা ও বেশ হইয়া গিয়াছে। জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া রাণী মন্দিরমধ্যে শ্রীমূর্ত্তির নিকটে আসনে আহ্নিক-পূজা করিতে বসিলেন এবং ছোট ভট্টাচার্য্য বা ঠাকুরকে নিকটে দেখিয়া মা-র নাম গান করিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরও রাণীর নিকটে বসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকদিগের পদাবলী গাহিতে লাগিলেন; রাণী পূজা-জপাদি করিতে করিতে ঐ সকল শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিলে ঠাকুর হঠাৎ গান থামাইয়া বিরক্ত হইয়া উগ্রভাবে রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কেবল ঐ ভাবনা, এখানেও ঐ চিন্তা?"—বলিয়াই রাণীর কোমল অঙ্গে করতল দ্বারা আঘাত করিলেন। সন্তানের কোনরূপ অন্যায়াচরণ দেখিয়া পিতা যেরূপ কুপিত হইয়া কখন কখন দণ্ডবিধান করেন, ঠাকুরেরও এখন ঠিক সেই ভাব; কিন্তু কে-ই বা তাহা বুঝে!

গুরুভাবে ঠাকুরের রাণী রাসমণিকে দণ্ডবিধান

মন্দিরের কর্ম্মচারী ও রাণীর পরিচারিকারা সকলে হৈ-চৈ করিয়া উঠিল। দ্বারপাল শশব্যস্তে ঠাকুরকে ধরিতে ছুটিল। বাহিরের কর্ম্মচারীরাও মন্দিরমধ্যে এত গোল কিসের ভাবিয়া

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেদিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু ঐ গোল-যোগের প্রধান কারণ যাঁহারা—ঠাকুর ও রাণী রাসমণি—তাঁহারা উভয়েই এখন স্থির, গম্ভীর। কর্ম্মচারীদের বকাবকি ছুটাছুটির দিকে লক্ষ্য না করিয়া একেবারে উদাসীন থাকিয়া ঠাকুর আপনাতে আপনি স্থির ও তাঁহার মুখে মৃদু মৃদু হাসি; শ্রীশ্রীজগদম্বার ধ্যান না করিয়া আজ কেবলই একটি বিশেষ মোকদ্দমার ফলাফলের বিষয় ধ্যান করিতে-ছিলেন, রাণী রাসমণি নিজের অন্তর পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখিতে পাইয়া ঈষৎ অপ্রতিভ ও অনুতাপে গম্ভীর! আবার ঠাকুর ঐ কথা কি করিয়া জানিতে পারিলেন ভাবিয়া রাণীর ঐ ভাবের সহিত কতক বিস্ময়ের ভাবও মনে বর্ত্তমান। পরে কর্ম্মচারীদের গোলযোগে রাণীর চমক ভাঙ্গিল ও বুঝিলেন—নিরপরাধ ঠাকুরের প্রতি এই ঘটনায় হীনবুদ্ধি লোকদিগের বিশেষ অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া সকলকে গম্ভীরভাবে আজ্ঞা করিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোন দোষ নাই। তোমরা উঁহাকে কেহ কিছু বলিও না।" পরে মথুর বাবুও নিজ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট হইতে ঘটনাটির সকল কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া কর্ম্মচারী-দিগের উপর পূর্ব্বোক্ত হুকুমই বাহাল রাখিলেন। ইহাতে তাহাদের কেহ কেহ বিশেষ দুঃখিত হইল; কিন্তু কি করিবে, 'বড় লোকের বড় কথায় আমাদের কাজ কি' ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিল।

উহার ফল

ঘটনাটি শুনিয়া পাঠক হয়ত ভাবিবে—এ আবার কোন্‌দিশি গুরুভাব? লোকের অঙ্গে আঘাত করিয়া এ আবার কি প্রকার

গুরুভাবের প্রকাশ? আমরা বলি—জগতের ধর্ম্মেতিহাস পাঠ কর, দেখিবে লোকগুরু আচার্য্যদিগের জীবনে এরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর জীবনে কাজিদলন, গুরুভাবে আত্মহারা হইয়া অদ্বৈত প্রভুকে প্রহার করিয়া ভক্তিদান প্রভৃতির কথা স্মরণ কর। ভাবিয়া দেখ, মহামহিম ঈশার জীবনেও ঐরূপ ঘটনার অভাব নাই।

শ্রীচৈতন্ত ও ঈশার জীবনে ঐরূপ ঘটনা

শিষ্যপরিবৃত ঈশা জেরুজেলামের 'য়্যাভে' দেবতার মন্দিরে দর্শন-পূজাদি করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। ৺বারাণসী, শ্রীবৃন্দাবনাদি তীর্থে দেবস্থানসকল দর্শন করিতে যাইয়া হিন্দুর মনে যেরূপ অপূর্ব্ব পবিত্র ভাবের উদয় হয়, য়্যাহুদি-মনে জেরু-জেলামের মন্দির-দর্শনেও ঠিক তদ্রূপ হইবে—ইহাতে আর সন্দেহ কি? তাহার উপর আবার ভাবমুখে অবস্থিত ঈশার মন! দূর হইতে মন্দির দর্শনেই ঈশা ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া দেবদর্শন করিতে ছুটিলেন। মন্দিরের বাহিরে, দ্বারে, প্রাঙ্গণমধ্যে কত লোক কত প্রকারে দু'পয়সা রোজগার প্রভৃতি দুনিয়াদারিতেই ব্যস্ত; পাণ্ডা পুরোহিতেরা দেবদর্শন হউক আর নাই হউক, যাত্রীদিগের নিকট হইতে দু'পয়সা ঠকাইয়া লইতেই নিযুক্ত। আর দোকানি পসারিরা পূজার পশু পুষ্পাদি দ্রব্যসম্ভার এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া কিসে দু'পয়সা অধিক লাভ করিব, এই চিন্তাতেই ব্যাপৃত। ভগবানের মন্দিরে তাঁহার নিকটে রহিয়াছি—একথা ভাবিতে কাহার আর মাথাব্যথা পড়িয়াছে? যাহা হউক, ভাববিভোর ঈশার চক্ষে মন্দির প্রবেশ-কালে এ সকল কিছুই পড়িল না। সরাসর মন্দিরমধ্যে যাইয়া

দেবদর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মারূপে তিনি অন্তরে রহিয়াছেন দেখিতে পাইয়া আত্মহারা হইলেন। মন্দির ও তন্মধ্যগত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন; কারণ এখানে আসিয়াই ত তিনি প্রাণারামের দর্শন পাইলেন! পরে মন যখন আবার নীচে নামিয়া ভিতরের ভাবপ্রকাশ বাহিরের ব্যক্তি ও বস্তুর ভিতর দেখিতে যাইল, তখন দেখেন সকলই বিপরীত। কেহই তাঁহার প্রাণারামের সেবায় নিযুক্ত নহে; সকলেই কাম-কাঞ্চনের সেবাতেই ব্যাপৃত; তখন নিরাশা ও দুঃখে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। ভাবিলেন—একি? তোরা বাহিরে সংসারের ভিতর যাহা করিস্ কর্ না, কিন্তু এখানে যেখানে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ—এখানে আবার এ সকল দুনিয়াদারি কেন? কোথায় এখানে আসিয়া দু'দণ্ড তাঁহার চিন্তা করিয়া সংসারের জ্বালা দূর করিবি, তাহা না হইয়া এখানেও সংসার আনিয়া পুরিয়াছিস্!—ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় ক্রোধে পূর্ণ হইল এবং বেত্রহস্তে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনি সকল দোকানি পসারিদের বলপূর্ব্বক মন্দিরের বাহিরে তাড়াইয়া দিলেন। তাহারাও তখন তাঁহার কথায় ক্ষণিক চৈতন্য লাভ করিয়া যথার্থই দুষ্কর্ম্ম করিতেছি ভাবিতে ভাবিতে সুড় সুড় করিয়া বাহিরে গমন করিল; অতি বদ্ধ জীব—যাহার কথায় চৈতন্য হইল না, সে তাঁহার কশাঘাতে ঐ জ্ঞানলাভ করিয়া বহির্গমন করিল। কিন্তু কেহই ক্রোধপূর্ণ হইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হইল না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও এইরূপে আহত ব্যক্তির জ্ঞানলাভ হইয়া তাঁহাকে ভগবদ্বুদ্ধিতে স্তবস্তুতি করার কথা, অতি বদ্ধ জীবকুলের তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে আসিয়া তাঁহার হাস্যে বা কথায় স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যাইবার কথা প্রভৃতি অনেক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। যাক এখন ঐ সকল পৌরাণিকী কথা।

গুরুভাবের প্রেরণায় আত্মহারা ঠাকুরের অদ্ভুত প্রকারে শিক্ষাপ্রদান ও রাণী রাসমণির সৌভাগ্য

গুরুভাবে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া ঠাকুর যে কি ভাবে অপরের সহিত ব্যবহার ও শিক্ষাদি প্রদান করিতেন, এই ঘটনাটি উহার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। ঘটনাটি তলাইয়া দেখিলে বড় কম ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। কোথায় একজন সামান্য বেতনমাত্রভোগী নগণ্য পূজারী ব্রাহ্মণ এবং কোথায় রাণী রাসমণি—যাঁহার ধন, মান, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, সাহস ও প্রতাপে কলিকাতার তখনকার মহা মহা বুদ্ধিমানেরাও স্তম্ভিত। এরূপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ যে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতেই পারিবে না, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হয়; অথবা যদি কখন কোন কারণে তাঁহার সমীপস্থ হয় তো চাটুকারিতা প্রভৃতি উপায়ে তাঁহার তিলমাত্র সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে এবং তন্নিমিত্তই অবসর অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। তাহা না হইয়া একেবারে তদ্বিপরীত! তাঁহার অন্যায় আচরণের খালি প্রতিবাদ নহে, শারীরিক দণ্ডবিধান! ঠাকুরের দিক হইতে দেখিলে ইহা যেমন অল্প বিস্ময়ের কথা মনে হয় না, রাণীর দিক হইতে দেখিলে ঐরূপ ব্যবহারে যে তাঁহার

মনে ক্রোধ-অভিমান-হিংসাদির উদয় হইল না, ইহাও একটি কম কথা বলিয়া মনে হয় না। তবে পূর্ব্বেই যেমন আমরা বলিয়া আসিয়াছি—স্বার্থগন্ধহীন বিরাট 'আমি'টার সহায়ে যখন মহাপুরুষদিগের মনে এইরূপে গুরুভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইচ্ছা না থাকিলেও সাধারণ মানবকে তাঁহার নিকট নতশির হইতে হইবেই হইবে; রাণীর ন্যায় ভক্তিমতী সাত্ত্বিকপ্রকৃতির তো কথাই নাই। কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থনিবদ্ধদৃষ্টি মানব-মন তখন তাঁহাদের কৃপা ও শক্তিতে উন্নত হইয়া তাঁহারা যাহা করিতে বলিতেছেন তাহাতেই তাহার বাস্তবিক স্বার্থ—এ কথাটি আপনা-আপনি বুঝিতে পারে। কাজেই তখন তদ্রূপ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর থাকে না। আর এক কথা, ঠাকুর যেমন বলিতেন—"তাঁহার (ঈশ্বরের) বিশেষ অংশ ভিতরে না থাকিলে কেহ কখন কোন বিষয়ে বড় হইতে পারে না, বা মান, ক্ষমতা প্রভৃতি হজম[১] করিতে পারে না!" সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্না রাণীর ভিতর ঐরূপ ঐশী শক্তি বিদ্যমান ছিল বলিয়াই তিনি এরূপ কঠোরভাবে প্রকাশিত হইলেও ঠাকুরের গুরুভাবে কৃপা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "রাণী রাসমণি শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্ট নায়িকার একজন। ধরাধামে তাঁহার পূজা-প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন। জমিদারীর দলিল-পত্রাদি অঙ্কিত করিবার তাঁহার যে শীলমোহর ছিল তাহাতেও লেখা ছিল—'কালীপদ-

১ মান প্রভৃতি হজম করা অর্থাৎ এ সকল লাভ করিয়াও মাথা ঠিক রাখা; অহঙ্কৃত হইয়া ঐ সকলের অপব্যবহার না করা।

অভিলাষী, শ্রীমতী রাসমণি দাসী।' রাণীর প্রতি কার্য্যেই ঐরূপে জগন্মাতার উপর অচলা ভক্তি প্রকাশ পাইত।"

আর এক কথা—সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরে তন্ময় মনের নানা ভাবে অবস্থানের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। আচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্কর তৎকৃত 'বিবেকচূড়ামণি' নামক গ্রন্থে উহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

ঈশ্বরে তন্ময় মনের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রমত

দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥ ৫৪০

—ঈশ্বরলাভ বা জ্ঞানলাভে সিদ্ধকাম পুরুষদিগের কেহ বা জ্ঞানরূপ বস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া, আবার কেহ বা বল্কল বা সাধারণ লোকের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া, কেহ বা উন্মাদের ন্যায়, আবার কেহ বা বহির্দৃষ্টে কামকাঞ্চনগন্ধহীন বালক, বা শৌচাচারবিবর্জ্জিত পিশাচের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন।

'বিরাট আমি'টার সহিত তন্ময়ভাবে অনেকক্ষণ অবস্থান করায় সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে ইঁহাদের ঐরূপ অবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু ঈশ্বরের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণসমর্থ গুরুভাব ইঁহাদের ভিতর দিয়াই বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ক্ষুদ্র স্বার্থময় 'আমি'টার লোপ বা বিনাশেই জগদ্ব্যাপী বিরাট আমিত্ব এবং তৎসহ লোককল্যাণসাধনকারী শ্রীগুরুভাবের প্রকাশ। ঐ সকল জ্ঞানী পুরুষদিগের ভিতর আবার যাঁহারা ঈশ্বরেচ্ছায়

লোকগুরুদিগের এবং বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহার বুঝা এত কঠিন কেন

সর্ব্বদা গুরু বা ঋষি-পদবীতে অবস্থান করেন, তাঁহাদের আবার অপরের শিক্ষার নিমিত্ত সদ্বিষয়ে তীব্রানুরাগ, অসদ্বিষয়ে তীব্র বিরাগ বা ক্রোধ, আচার, নিষ্ঠা, নিয়ম, তর্ক, যুক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য ইত্যাদি সকল ভাবই অবস্থানুযায়ী সাধারণ পুরুষদিগের ন্যায় দেখাইতে হয়। 'দেখাইতে হয়' বলিতেছি এজন্য যে, ভিতরে, 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মভাবে ভাল-মন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্যাদি মায়া-রাজ্যের অন্তর্গত সকল পদার্থে ও ভাবে একাকার জ্ঞান বা দৃষ্টি পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিলেও, অপরকে মায়ারাজ্যের পারে যাইবার পথ দেখাইবার জন্য ঐ সকল ভাব লইয়া তাঁহারা কাল-যাপন করিয়া থাকেন। সাধারণ গুরু বা ঋষিদিগেরই যখন ঐরূপে লোককল্যাণের নিমিত্ত অনেক সময় কালযাপন করিতে হয়, তখন ঈশ্বরাবতার বা জগদ্‌গুরুপদবীস্থ আচার্য্যকুলের তো কথাই নাই। এজন্য তাঁহাদের বুঝা, ধরা সাধারণ মানবের এত কঠিন হইয়া উঠে; বিশেষতঃ আবার বর্ত্তমান যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চেষ্টা ও ব্যবহারাদি ধরা ও বুঝা। কারণ অবতারকুলে যে সকল বাহ্যিক ঐশ্বর্য্য, শক্তি বা বিভূতির প্রকাশ শাস্ত্রে এ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে, সে সকল ইঁহাতে এত গুপ্তভাবে প্রকাশিত ছিল যে, যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইঁহার কৃপালাভ করিয়া ইঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে নিবদ্ধ না হইলে, ইঁহাকে দুই-চারি বার ভাসা ভাসা উপর উপর মাত্র দেখিয়া কাহারও ঐ সকলের পরিচয় পাইবার উপায় ছিল না। দেখ না, বাহ্যিক কোন্ গুণ দেখিয়া তুমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? বিদ্যার—একেবারে নিরক্ষর বলিলেই চলে! শ্রুতিধরত্ব গুণে বেদ বেদান্তাদি

সকল শাস্ত্র শুনিয়া যে তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, একথা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে? বুদ্ধিতে তাঁহাকে ধরিবে? "আমি কিছু নহি, কিছু জানি না—সব আমার মা জানেন"—সর্ব্বদা এইরূপ বুদ্ধির যাঁহাতে প্রকাশ, তাঁহার নিকট তুমি কোন্ বিষয়ে কি বুদ্ধি লইতে যাইবে? আর লইতে যাইলেও তিনি যখন বলিবেন, "মাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন", তখন কি তুমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থির রাখিয়া ঐরূপ করিতে পারিবে? তুমি ভাবিবে—"কি পরামর্শই দিলেন! ও কথা তো আমরা সকলে 'কথামালা' 'বোধোদয়' পড়িবার সময় হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ, ইচ্ছা করিলে সকল বিষয় জানাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু ঐ কথা লইয়া কাজ করিতে যাইলে কি চলে?" ধনে, নাম-যশে তাঁহাকে ধরিবে? ঠাকুরের নিজের তো ও সকল খুবই ছিল! আবার ও সকল তো ত্যাগ করিতেই প্রথম হইতেই উপদেশ! এইরূপ সকল বিষয়ে। কেবল আকৃষ্ট হইয়া ধরিবার একমাত্র উপায় ছিল—তাঁহার পবিত্রতা, ঈশ্বরানুরাগ ও প্রেম দেখিয়া। ইহাতে তুমি যদি আকৃষ্ট হইলে তো হইলে, নতুবা তাঁহাকে ধরা ও বুঝা তোমার পক্ষে বহু দূরে! তাই বলি রাণী রাসমণি যে ঐরূপ কঠোরভাবে প্রকাশিত ঠাকুরের গুরুভাব ধরিতে পারিলেন এবং তিনি ঐরূপে যে শিক্ষা দান করিলেন, তাহা অভিমান-অহঙ্কারে ভাসাইয়া না দিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইলেন—ইহা তাঁহার কম ভাগ্যোদয়ের কথা নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গুরুভাব ও মথুরানাথ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥—গীতা, ১০।১৯

'বড় ফুল ফুটতে দেরী লাগে।'

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের ধীর বিকাশ রাণী রাসমণি ও মথুর বাবুর চক্ষের সম্মুখেই অনেকটা হইতে থাকে। উচ্চাঙ্গের ভাববিকাশ সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "বড় ফুল ফুটতে দেরী লাগে, সারবান্ গাছ অনেক দেরীতে বাড়ে।" ঠাকুরের জীবনেও অদৃষ্টপূর্ব্ব গুরুভাবের বিকাশ হইতে বড় কম সময় ও সাধনা লাগে নাই; দ্বাদশবৎসরব্যাপী নিরন্তর কঠোর সাধনার আবশ্যক হইয়াছিল। সে সাধনার যথাসাধ্য পরিচয় দিবার ইহা স্থান নহে। এখানে চিৎসূর্য্যের কিরণমালায় সম্যক্ সমুদ্ভাসিত গুরুভাবরূপ কুসুমটির সহিতই আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ; তাহার কথাই বিশেষ করিয়া বলিয়া যাইব। তবে ঐ ভাববিকাশের কথা পূর্ব্বাবধি শেষ পর্য্যন্ত বলিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে কোনও কোন কথা আসিয়া পড়িবে। যে সকল ভক্তের সহিত ঠাকুরের ঐ ভাবের পূর্ব্ব-পূর্ব্বাবস্থার সময়ে সম্বন্ধ, তাহাদের কথাও কিছু না কিছু আসিয়া পড়িবে নিশ্চয়।

মথুর বাবুর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ এক অদ্ভুত ব্যাপার! মথুর ধনী অথচ উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন, বিষয়ী হইলেও ভক্ত, হঠকারী হইয়াও বুদ্ধিমান, ক্রোধপরায়ণ হইলেও ধৈর্য্যশীল এবং ধীরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। মথুর ইংরাজী-বিদ্যাভিজ্ঞ ও তার্কিক, কিন্তু কেহ কোন কথা বুঝাইয়া দিতে পারিলে উহা বুঝিয়াও বুঝিব না—এরূপ স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন না; ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ভক্ত, কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে যে যাহা বলিবে তাহাই যে চোখ-কান বুজিয়া অবিচারে গ্রহণ করিবেন, তাহা ছিল না, তা তিনি ঠাকুরই হউন বা গুরুই হউন বা অন্য যে কেহই হউন; উদার-প্রকৃতি ও সরল, কিন্তু তাই বলিয়া বিষয়-কর্ম্মে বা অন্য কোন বিষয়ে যে বোকার মত ঠকিয়া আসিবেন, তাহা ছিলেন না, বরং বিষয়ী জমিদারগণ যে কূটবুদ্ধি এবং সময়ে সময়ে অসদুপায়-সহায়ে প্রতিনিয়ত বিষয়বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, সে সকলেরও তাঁহাতে কখন কখন প্রকাশ দেখা গিয়াছে। বাস্তবিকই পুত্রহীনা রাণী রাসমণির অন্যান্য জামাতা বর্ত্তমান থাকিলেও, বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধান ও সুবন্দোবস্তে কনিষ্ঠ মথুর বাবুই তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন এবং শাশুড়ী ও জামাই উভয়ের বুদ্ধি একত্রিত হওয়াতেই রাণী রাসমণির নামের তখন এতটা দপ্‌দপা হইয়া উঠিয়াছিল।

মথুরের সহিত ঠাকুরের অদ্ভুত সম্বন্ধ। মথুর কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল

পাঠক হয়ত বলিবে—'এ ধান ভান্‌তে শিবের গীত' কেন? ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে আবার মথুর বাবু কেন? কারণ গুটী কাটিয়া ভাবরূপী প্রজাপতিটি যখন বাহির হইয়াছিল,

তখন মথুরই তাহার ভাবী সৌন্দর্য্যের আভাস কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রধান রক্ষক ও সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন। রাণী রাসমণি একটা মহা শুদ্ধ পবিত্র প্রেরণায় এ অদ্ভুত চরিত্রের বিকাশ ও প্রসারোপযোগী স্থান নির্ম্মাণ করিলেন, আর তাঁহার জামাতা মথুর ঐরূপ উচ্চ প্রেরণায় সেই দেবচরিত্র-বিকাশের সময় অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইল, তৎসমস্ত যোগাইলেন। অবশ্য এ কথা আমরা এখন এতদিন পরে ধরিতে পারিতেছি; তাঁহারা উভয়ে কিন্তু এই বিষয়ের আভাস কখন কখন কিছু কিছু পাইলেও ঐ সকল কার্য্য যে কেন করিতেছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পরেও যে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। যুগে যুগে সকল মহাপুরুষদিগের জীবনালোচনা করিতে যাইলেই ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, কি একটা অজ্ঞাত শক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া কোথা হইতে তাঁহাদের সকল বিষয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, সকল সময়ে সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, অপর সকল ব্যক্তির শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁহাদের অধীনে আনিয়া দেন; অথচ ঐ সকল ব্যক্তি জানিতেও পারে না যে, তাহারা নিজে স্বাধীন-ভাবে, প্রেমে বা ঐ সকল দেবচরিত্রের উপর বিদ্বেষে যাহা করিয়া যাইতেছে, তাহা তাঁহাদেরই জন্য—তাঁহাদেরই কার্য্যের সহায়ক হইবে বলিয়া—তাঁহাদেরই গন্তব্য পথের বাধা-বিঘ্নগুলি সরাইয়া

ঠাকুরের গুরু-ভাব-বিকাশে রাণী রাসমণি ও মথুরের অজ্ঞাতভাবে সহায়তা। বন্ধু বা শত্রুভাবে সম্বন্ধ যাবতীয় লোক অবতার-পুরুষের শক্তি-বিকাশের সহায়তা করে

তাঁহাদের ভিতরের শক্তি উদ্দীপিত করিবে বলিয়া!—আর মানুষ বহুকাল পরে উহা বুঝিতে পারিয়া অবাক হইয়া থাকে। কৈকেয়ীর শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠাইবার ফল দেখ; বসুদেব দেবকীকে কারাগারে রাখিয়া কংসের আজীবন চেষ্টার শেষ দেখ; সিদ্ধার্থের পাছে বৈরাগ্যোদয় হয় বলিয়া রাজা শুদ্ধোদনের প্রমোদকানন-নির্ম্মাণ দেখ; ক্রূর কাপালিক বৌদ্ধদিগের আচার্য্য শঙ্করকে অভিচারাদি সহায়ে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা দেখ; রাজ-পুরুষাদির সহায়ে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মপ্রচারের বিদ্বেষ ও বিপক্ষতাচরণের ফল দেখ; আর দেখ মহামহিম ঈশাকে মিথ্যা-পরাধে নিহত করিবার ফল!—সর্ব্বত্রই 'উল্টা বুঝিলু রাম'[১] হইয়া গেল! অথচ মহাপরাক্রান্ত বুদ্ধিমান্ বিপক্ষ ও স্নেহপরবশ স্বপক্ষকুল কূটনীতি বা বিষয়বুদ্ধি-সহায়ে চিরকালই অন্যরূপ

১ নিম্নলিখিত গল্পটি হইতে প্রচলিত উক্তিটির উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—এক বৈরাগী সাধু বহুকাল পর্য্যন্ত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গের সাথী—তসলা, লোটা প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির মোটটি নিজেই বহন করিতেন। একদিন সাধুর মনে হইল, একটি ঘোড়া পাই তো মোটটি আর নিজে বহিয়া কষ্ট পাই না। ভাবিয়াই 'এক ঘোড়া দেলায় দে রাম' বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘোড়া-ভিক্ষার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। তখন সেই স্থান দিয়া রাজার পল্টন যাইতেছিল। পথিমধ্যে একটি ঘোটকীর শাবক হওয়ায় উহার আরোহী ভাবিতে লাগিল, "তাইত, পল্টন এখনি এ স্থান হইতে অন্যত্র কুচ করিবে; ঘোটকী হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু সদ্যোজাত শাবকটিকে কেমন করিয়া লইয়া যাই?" ভাবিয়া চিন্তিয়া শাবকটিকে বহন করিবার জন্য একটি লোকের অন্বেষণে বাহির হইয়াই 'ঘোড়া দেলায় দে রাম'-সাধুর সহিত দেখা হইল এবং সাধুকে বলিষ্ঠ দেখিয়া কোন বিচার না করিয়া একেবারে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে দিয়া শাবকটি বহন করাইয়া লইয়া চলিল। সাধু তখন ফাঁপরে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন—'উল্টা বুঝিলু রাম!' কোথায় ঘোড়া তাঁহার মোটটি ও তাঁহাকে বহন করিবে, না, তাঁহাকে ঘোটকী-শাবক বহন করিতে হইল!

ভাবিয়া অন্য উদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভাবিতে ও করিতে থাকিবে। তবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থসকলে যেরূপ লিপিবদ্ধ আছে—শত্রুভাবে, ঐ ঐশী শক্তির উদ্দেশ্য ও গতিবিধির বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া যাইতে হয়, আর ভক্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত ঐ ঐশী শক্তির অনুগামী হইয়া কখনও কখনও উহার কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এই মাত্র এবং ঐ জ্ঞানের সহায়ে ক্রমে ক্রমে বাসনাবর্জ্জিত হইয়া মুক্তি ও চির-শান্তির অধিকারী হইয়া থাকে। মথুর বাবুর ক্রিয়াকলাপও শেষ ভাবের হইয়াছিল।

অবতার-মহাপুরুষদিগের জীবনেই যে কেবল এই দৈবী শক্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। তবে তাঁহাদের জীবনে উহার উজ্জ্বল খেলা সহজে ধরিতে পারিয়া আমরা অবাক্ হই—এই পর্য্যন্ত। নতুবা আপন আপন দৈনন্দিন জীবন এবং জগতের ব্যবহারিক জীবনের ইতিহাসের আলোচনা করিলেও আমরা ঐ বিষয়ের যৎসামান্য প্রকাশ দেখিতে পাই। বহুদর্শিতা বা মানবজীবনের বহু ঘটনার তুলনায় আলোচনায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানব ঐ দৈবী শক্তির হস্তে সর্ব্বক্ষণই ক্রীড়াপুত্তলীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে! অবতার-মহাপুরুষ-দিগের জীবনের সহিত সাধারণ মানবজীবনের ঐরূপ সৌসাদৃশ্য থাকাটাও কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। কারণ তাঁহাদের অলৌকিক জীবনাবলীই ত ইতরসাধারণের জীবন-গঠনের ছাঁচ (type or model)-স্বরূপ। তাঁহাদের জীবনাদর্শেই তো সাধারণ মানব

সাধারণ মানব-জীবনেও ঐরূপ। কারণ উহার সহিত অবতারপুরুষের জীবনের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে

আপন জীবনগঠনের প্রয়াস পাইতেছে ও চিরকালই পাইবে। দেখ না, নানা জাতির নানা ভাবের সম্মিলনভূমি বিশাল ভারত-জীবন রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি কয়েকটি মহাপুরুষ কেমন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। আবার ঐ সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহা-পুরুষদিগের জীবনাদর্শসকলের একত্র সম্মিলনে অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন ভাবে গঠিত বর্ত্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ কেমন দ্রুতপদে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া এই স্বল্পকাল মধ্যেই ভারত-ভারতীর জীবন অধিকার করিয়া বসিতেছে। কালে ইহা কি ভাবে কতদূর যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা তোমার সাধ্য হয় বল; আমরা কিন্তু হে পাঠক, উহা বুঝিতে ও বলিতে সম্পূর্ণ অপারক।

মথুর ভক্ত ছিল বলিয়া নির্ব্বোধ ছিল না

আর এক কথা—মথুর বাবু ঠাকুরকে যেরূপ অকপটে 'পাঁচ-সিকে পাঁচ আনা' ভক্তি-বিশ্বাস করিতেন, তাহা শুনিয়া আমাদের ন্যায় সন্দেহদুষ্ট মন প্রথমেই ভাবিয়া ফেলে—'লোকটা বোকা বাঁদর গোছ একটা ছিল আর কি, নতুবা মানুষে মানুষ এতটা বিশ্বাস-ভক্তি করিতে পারে কখন? আমরা যদি হইতাম ত একবার দেখিয়া লইতাম—শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেমন করিয়া নিজ চরিত্রবলে অতটা ভক্তি-বিশ্বাসের উদয় আমাদের প্রাণে করিতে পারিতেন!'—যেন প্রাণের ভিতর ভক্তি-বিশ্বাসের উদয় হওয়াটা একটা বিশেষ নিন্দার ব্যাপার। সেজন্য ঠাকুরের নিকট হইতে মথুর বাবুর বিষয় আমরা যতটুকু যেরূপ শুনিয়াছি ও বুঝিয়াছি, তাহাই এখানে পাঠককে বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি যে, মথুর বাবু ঐরূপ স্বভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি

আমাদের অপেক্ষা বড় কম বুদ্ধিমান বা সন্দিগ্ধমনা ছিলেন না। তিনিও ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও কার্য্যকলাপে সন্দেহবান হইয়া তাঁহাকে প্রথম প্রথম প্রতিপদে বড় কম যাচাইয়া লন নাই। কিন্তু করিলে কি হইবে? কখনও কোন যুগে মানব যেরূপ নয়ন-গোচর করে নাই বিজ্ঞাননাদিনী প্রেমাবর্ত্তশালিনী মহা ওজস্বিনী ঠাকুরের ভাব-মন্দাকিনীর গুরুগম্ভীর বেগ মথুরের সন্দেহ-ঐরাবত আর কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? অল্পকালেই স্খলিত, মথিত, ধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া চিরকালের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল! কাজেই সর্ব্বতোভাবে পরাজিত মথুর তখন আর কি করিতে পারে? অনন্যমনে ঠাকুরের শ্রীপদে শরণ লইয়াছিল। অতএব মথুরের কথা বলিলেও আমরা ঠাকুরের গুরুভাবেরই কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

ঠাকুরের প্রতি মথুরের প্রথমাকর্ষণ কি দেখিয়া—এবং উহার ক্রমপরিণতি

ঠাকুরের সরল বালকভাব, মধুর প্রকৃতি এবং সুন্দর রূপে মথুর প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে সাধনার প্রথমাবস্থায় ঠাকুরের যখন কখন কখন দিব্যোন্মাদাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, যখন শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া এবং আপনার ভিতর তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া তিনি কখন কখন আপনাকেই পূজা করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, যখন অনুরাগের প্রবল বেগে তিনি বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রেমপূর্ণ নানারূপ অবৈধ, সাধারণ নয়নে অহেতুক আচরণ দৈনন্দিন জীবনে করিয়া ফেলিয়া ইতর-সাধারণের নিন্দা ও সন্দেহ-ভাজন হইতে লাগিলেন, তখন বিষয়ী

মথুরের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ন্যায়পরতা বলিয়া উঠিল, 'যাঁহাকে প্রথম দর্শনে সুন্দর সরলপ্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছি, স্বচক্ষে না দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করা হইবে না।' সেই জন্যই মথুরের গোপনে গোপনে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিয়া ঠাকুরের কার্য্যকলাপ তন্ন তন্ন ভাবে নিরীক্ষণ করা এবং ঐরূপ করিবার ফলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, 'যুবক গদাধর অনুরাগ ও সরলতার মূর্ত্তিমান জীবন্ত প্রতিমা; ভক্তি-বিশ্বাসের আতিশয্যেই ঐরূপ করিয়া ফেলিতেছেন।' তাই বুদ্ধিমান বিষয়ী মথুরের তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা যে, 'যা রয় সয়, তাই করা ভাল; ভক্তি-বিশ্বাস করাটা ভাল কথা, কিন্তু একেবারে আত্মহারা হইলে চলে কি? উহাতে লোকের নিন্দাভাজন তো হইতে হইবেই, আবার দশে যাহা বলে তাহা না শুনিয়া নিজের মনোমত আচরণ বরাবর করিয়া যাইলে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পাগলও হইবার সম্ভাবনা।' কিন্তু ঐ সকল কথা ঐরূপে বুঝাইলেও মথুরের অন্তর্নিহিতা সুপ্তা ভক্তি সংসর্গগুণে জাগরিতা হইয়া কখন কখন বলিয়া উঠিত, কিন্তু রামপ্রসাদ প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধককুলেরও তো ভক্তিতে এইরূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহারের কথা শুনা গিয়াছে; শ্রীগদাধরের ঐরূপ আচরণ ও অবস্থাও তো সেইরূপ হইতে পারে!' কাজেই, মথুর ঠাকুরের আচরণে বাধা না দিয়া কতদূর কি দাঁড়ায় তাহাই দেখিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন এবং দেখিয়া শুনিয়া পরে যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে তাহাই করিবেন, ইহাই স্থির করিলেন। বিষয়ী প্রভুর অধীনস্থ সামান্য কর্ম্মচারীর উপর ঐরূপ ব্যবহার কম ধৈর্য্যের পরিচায়ক নহে।

ভক্তির একটা সংক্রামিকা শক্তি আছে। শারীরিক বিকার-সকলের ন্যায় মানসিক ভাবসমূহেরও এক হইতে অন্যে সংক্রমণ আমরা নিত্য দেখিতে পাই। কারণ একই পদার্থের বিকারে একই নিয়মে যে স্থূল ও সূক্ষ্ম সমগ্র জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, ইহা আজকাল আর কেবলমাত্র বৈদিক ঋষিদিগের অনুভূতি দ্বারা প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই—জড়বিজ্ঞানও একথা প্রায় প্রমাণিত করিয়া আনিয়াছে। অতএব একের ভক্তিরূপ মানসিক ভাব জাগ্রত হইয়া অন্যের মধ্যে নিহিত সুপ্ত ঐ ভাবকে যে জাগ্রত করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি! এই জন্যই শাস্ত্র সাধুসঙ্গকে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার বিশেষ সহায়ক বলিয়া এত করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মথুরের ভাগ্যেও যে ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল ইহা বেশ অনুমিত হয়। তিনি ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ যতই দিন দিন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভিতরের ভক্তি-ভাব তাঁহার অজ্ঞাতসারে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার পর পর কার্য্যসকলে আমরা ইহা বেশ পরিচয় পাইয়া থাকি। তবে বিষয়ী মনের যেমন হয়—এই ভক্তিবিশ্বাসের উদয়, আবার পরক্ষণেই সন্দেহ—এইরূপ বারবার হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত দোলায়মান থাকিয়া তবে যে মথুরের হৃদয়ে ঠাকুরের আসন দৃঢ় ও অবিচল হয়, ইহা সুনিশ্চিত। সেইজন্যই দেখিতে পাই ঠাকুরের ব্যাকুল অনুরাগ ও আচরণাদি প্রথম প্রথম মথুরের নয়নে ভক্তির আতিশয্য বলিয়া বোধ হইলেও ঠাকুরের জীবনে দিন দিন ঐ সকলের যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অমনি মথুরানাথের

ভক্তির সংক্রামিকা শক্তিতে মথুরের পরিবর্ত্তন

মনে সন্দেহের উদয়—ইহার ত বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে না? কিন্তু এ সন্দেহে তাঁহার মনে দয়ারই উদয় হয় এবং সুচিকিৎসকের সহায়ে ঠাকুরের শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া যাহাতে ঐ সকল মানসিক বিকার প্রশমিত হয়, মথুর সেই বিষয়েই মনোনিবেশ করেন।

বর্ত্তমান ভাবে শিক্ষিত মথুরের ঠাকুরের সহিত তর্ক-বিচার। প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্ত্তন ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়া থাকে। লাল জবাগাছে সাদা জবা

ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি মথুর বাবুর মন্দ ছিল না এবং ইংরাজী বিদ্যার সহায়ে পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালী ও ভাবস্রোত মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া 'আমিও একটা কেও-কেটা নই, অপর সকলের সহিত সমান'—এইরূপ যে একটা স্বাধীনভাব মানুষের মনে আনিয়া দেয়, সে ভাবটাও মথুর বাবুর কম ছিল না। সেজন্য যুক্তি-তর্কাদি দ্বারা ঠাকুরকে ঐরূপে ঈশ্বরভক্তিতে একেবারে আত্মহারা হওয়ার পথ হইতে নিরস্ত করিবার প্রয়াসও আমরা মথুর বাবুর ভিতর দেখিতে পাইয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে ঠাকুর ও মথুর বাবুর জাগতিক ব্যাপারে ঈশ্বরকে স্বকৃত নিয়মের (Law) বাধ্য হইয়া চলিতে হয় কি না—এ বিষয়ে কথোপকথনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঠাকুর বলিতেন, "মথুর বলেছিল, 'ঈশ্বরকেও আইন মেনে চল্‌তে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন, তা রদ্ করবার তাঁরও ক্ষমতা নেই।' আমি বল্লুম, 'ও কি কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছে কল্লে সে তখনি তা রদ্ কর্‌তে পারে বা তার জায়গায় আর একটা আইন কর্‌তে পারে।' ও কথা সে

কিছুতেই মান্‌লে না। বল্লে, 'লালফুলের গাছে লালফুলই হয়, সাদা ফুল কখনও হয় না ; কেননা, তিনি নিয়ম করে দিয়েছেন। কৈ, লালফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি এখন করুন দেখি?' আমি বল্লুম, 'তিনি ইচ্ছে করলে সব কর্‌তে পারেন, তাও কর্‌তে পারেন।' সে কিন্তু ও কথা নিলে না। তার পরদিন ঝাউতলার দিকে শৌচে গেছি; দেখি যে একটা লাল জবাফুলের গাছে, একই ডালে দুটো ফেঁকড়িতে দুটি ফুল—একটি লাল, আর একটি ধপ্‌ধপে সাদা, এক ছিটেও লাল দাগ তাতে নেই। দেখেই ডালটি শুদ্ধ ভেঙ্গে এনে মথুরের সামনে ফেলে দিয়ে বল্লুম, 'এই দেখ।' তখন মথুর বল্লে, 'হাঁ বাবা, আমার হার হয়েছে!'" এইরূপে শারীরিক বিকারেই যে ঠাকুরের মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া ঐরূপ ভক্তির আতিশয্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে, কখন কখন এ বিশ্বাসে মথুর যে তাঁহার সহিত নানা বাদানুবাদ করিয়া তাঁহার ঐ ভাব ফিরাইবার চেষ্টা করিতেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

ঠাকুরের অবস্থা লইয়া মথুরের নিত্য বাধ্য হইয়া আন্দোলন

এইরূপে কতক কৌতূহলে, কতক ঠাকুরের ভাববিহ্বলতাটা শারীরিক রোগবিশেষ মনে করিয়া দয়ায় এবং কখন কখন ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থা ঠিক ঠিক ঈশ্বরভক্তির ফল ভাবিয়া বিস্ময় ও ভক্তি-পূর্ণ হইয়া বিষয়ী মথুর তাঁহার সহিত ক্রমে ক্রমে অনেক কাল কাটাইতে এবং তাঁহার বিষয়ে অনেক চিন্তা ও আন্দোলনও যে করিতে থাকেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আর স্থির নিশ্চিন্তই বা থাকেন কিরূপে? ঠাকুর যে নবানুরাগের প্রবল

প্রবাহে নিত্যই এক এক নূতন ব্যাপার করিয়া বসেন! আজ পূজার আসনে বসিয়া আপনার ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন-লাভ করিয়া পূজার সামগ্রীসকল নিজেই ব্যবহার করিয়াছেন, কাল তিন ঘণ্টা কাল ধরিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার আরতি করিয়া মন্দিরের কর্ম্মচারীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, পরশু ভগবানলাভ হইল না বলিয়া ভূমে গড়াগড়ি দিয়া মুখ ঘস্ড়াইতে ঘস্ড়াইতে এমন ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়াছেন যে, চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে! এইরূপ এক এক দিনের এক এক ব্যাপারের কত কথাই না ঠাকুরের নিকট আমরা শুনিয়াছি!

'মহিম্নঃস্তোত্র' পড়িতে পড়িতে ঠাকুরের সমাধি ও মথুর

একদিন শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর 'মহিম্নঃস্তোত্র' পাঠ করিয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। পাঠ করিতে করিতে ক্রমে যখন এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, তখন একেবারে অপূর্ব্ব ভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥ ৩২

হে মহাদেব, সমুদ্রগভীর পাত্রে বিশাল হিমালয়শ্রেণীর মত পুঞ্জ পুঞ্জ কালি রাখিয়া, কোনরূপ অসম্ভব পদার্থের কামনা করিলেও যাঁহার তৎক্ষণাৎ তাহা সৃষ্টি বা রচনা করিয়া যাচকের মনোরথ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে—সেই কল্পতরু-শাখার কলম ও পৃথিবীপৃষ্ঠসদৃশ আয়ত বিস্তৃত কাগজ লইয়া, স্বয়ং বাগ্‌দেবী

সরস্বতী যদি তোমার অনন্ত মহিমার কথা লিখিয়া শেষ করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলেও কখনও তাহা করিতে পারেন না!

শ্লোকটি পড়িতে পড়িতে ঠাকুর শিবমহিমা হৃদয়ে জ্বলন্ত অনুভব করিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া স্তব, স্তবের সংস্কৃত, পর-পর আবৃত্তি করা প্রভৃতি সকল কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া কেবলই বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহাদেব গো! তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলব!"—আর তাঁহার গণ্ড বহিয়া দরদরিত ধারে নয়নাশ্রু অবিরাম বক্ষে এবং বক্ষ হইতে বস্ত্র ও ভূমিতে পড়িয়া মন্দিরতল সিক্ত করিতে লাগিল! সে ক্রন্দনের রোল, পাগলের ন্যায় গদগদ বাক্য ও অদৃষ্টপূর্ব্ব আচরণে ঠাকুরবাড়ীর ভৃত্য ও কর্ম্মচারীরা চতুর্দ্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া কেহ বা অবাক হইয়া শেষটা কি হয় দেখিতে লাগিল, কেহ বা 'ও ছোট ভট্‌চাজের পাগলামি! আমি বলি আর কিছু—আজ কিছু বেশী বাড়াবাড়ি দেখচি'; কেহ বা 'শেষে শিবের ঘাড়ে চড়ে বসবে না তো হে? হাত ধরে টেনে আনা ভাল' ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিল এবং রঙ্গ-রসের ঘটাও যে হইতে থাকিল, তাহা আর বলিতে হইবে না!

ঠাকুরের কিন্তু বাহিরের হুঁশ আদৌ নাই। শিবমহিমানুভবে তন্ময় মন তখন বাহ্যজগৎ ছাড়িয়া বহু উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে—সেখানে এ জগতের মলিন ভাবরাশি ও কথাবার্ত্তা কখনও পৌছে না। কাজেই কে কি ভাবিতেছে, বলিতেছে বা ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহা তাঁহার কানে যাইবে কিরূপে?

মথুর বাবু সেদিন ঠাকুরবাড়ীতে; তিনিও ঐ গোলমাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লইয়া, শুনিতে পাইয়াই সেখানে উপস্থিত হইলেন। কর্ম্মচারীরা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। মথুর বাবু আসিয়াই ঠাকুরকে ঐ ভাবাপন্ন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ঐ সময়ে কোন কর্ম্মচারী ঠাকুরকে শিবের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সরাইয়া আনার কথা কহায় বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যাহার মাথার উপর মাথা আছে, সে-ই যেন এখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে স্পর্শ করিতে যায়।" কর্ম্মচারীরা কাজেই ভীত হইয়া আর কিছু বলিতে বা করিতে সাহসী হইল না। পরে কতক্ষণ বাদে ঠাকুরের বাহ্যজগতের হুঁশ আসিল এবং ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারীদের সহিত মথুর বাবুকে সেখানে দণ্ডায়মান দেখিয়া বালকের ন্যায় ভীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "আমি বেসামাল হয়ে কিছু করে ফেলেছি কি?" মথুরও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "না, বাবা, তুমি স্তব পাঠ কর্‌ছিলে; পাছে কেহ না বুঝিয়া তোমায় বিরক্ত করে, তাই আমি এখানে দাঁড়াইয়াছিলাম!"

ঠাকুরের নিকটে অপরের সহজে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত

ঠাকুর আমাদের নিকট একদিন তাঁহার সাধনকালের অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তখন তখন (সাধন-কালে) যারা এখানে আস্‌ত, এখানকার সঙ্গে থেকে তাদের অতি শীঘ্র ঈশ্বর-উদ্দীপন হোত। বরানগর থেকে দুজন আস্‌ত—তারা জেতে খাট, কৈবত্ কি তামলি এমনি একটা; বেশ ভাল; খুব ভক্তি-বিশ্বাস কর্‌ত ও প্রায়ই আস্‌ত। একদিন পঞ্চবটীতে তাদের সঙ্গে বসে আছি—আর তাদের ভেতর একজনের

একটা অবস্থা হলো! দেখি বুকটা লাল হয়ে উঠেছে, চোখ ঘোর লাল, ধারা বেয়ে পড়ছে, কথা কইতে পাচ্ছে না, দাঁড়াতে পাচ্ছে না, দু'বোতল মদ খাইয়ে দিলে যেমন হয় তেমনি! কিছুতেই তার আর সে ভাব ভাঙ্গে না। তখন ভয় পেয়ে মাকে বলি, 'মা, একে কি কল্লি? লোকে বল্‌বে, আমি কি করে দিয়েছি! ওর বাপ-টাপ সব বাড়ীতে আছে, এখনই বাড়ী যেতে হবে।' তার বুকে হাত বুলিয়ে দিই আর মাকে ঐ রকম বলি। তবে কতক্ষণ বাদে সে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ী যায়।"

মথুরের ঠাকুরকে একাধারে শিব-শক্তি-রূপে দর্শন

ঠাকুরের জলন্ত জীবনের সংস্পর্শে মথুর বাবুরও যে ঐরূপ একটা অদ্ভুত অবস্থার একসময়ে উদয় হইয়া তাঁহার বিশ্বাস-ভক্তি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, ইহা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। সর্ব্বদাই আপন ভাবে বিভোর ঠাকুর একদিন তাঁহার ঘরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে যে লম্বা বারাণ্ডাটি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত আছে, তথায় আপন মনে গোঁ-ভরে পদচারণ করিতেছিলেন! ঠাকুরবাড়ী ও পঞ্চবটীর মধ্যে যে একটি পৃথক বাড়ী আছে, যাহাকে এখনও 'বাবুদের কুঠি' বলিয়া ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারীরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাহারই একটি প্রকোষ্ঠে মথুর বাবু তখন একাকী আপন মনে বসিয়াছিলেন। মথুর বাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে ঠাকুর যেখানে বেড়াইতেছিলেন সে স্থানটির ব্যবধান বড় বেশী না হওয়ায় বেশ নজর হইতেছিল। কাজেই মথুর বাবু কখনও ঠাকুরের ঐরূপ গোঁ-ভরে বিচরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, আবার কখনও বা

বিষয়-সম্বন্ধীয় এ কথা সে কথার মনে মনে আন্দোলন করিয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন। মথুর বাবু যে বৈঠকখানায় বসিয়া ঠাকুরকে মাঝে মাঝে ঐরূপে লক্ষ্য করিতেছেন, ঠাকুর তাহা আদৌ জ্ঞাত ছিলেন না। আর জানা থাকিলেই বা কি?—দুইজনের সাংসারিক, সামাজিক ও অন্য সর্ব্বপ্রকার অবস্থার অন্তর এতদূর যে, জানা থাকিলেও কেহ কাহারও জন্য বড় বেশী ব্যতিব্যস্ত হইবার কারণ ছিল না। সে পক্ষে বরং ঠাকুরেরই, ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় ও অন্যমনা না থাকিলে, মথুর বাবুর কথা টের পাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া সে স্থান হইতে সরিয়া যাইবার কথা ছিল। কারণ ধনী, মানী, বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু, যাঁহাকে ঠাকুরবাড়ীর ও রাণীর সমস্ত বিষয়ের মালিক বলিলেও চলে এবং যাঁহার সুনয়নে পড়িয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর এখনও ঐ স্থান হইতে তাড়িত হন নাই, তাঁহার সম্মুখে একজন সামান্য নগণ্য দরিদ্র পূজক ব্রাহ্মণ, যাঁহাকে লোকে তখন নির্ব্বোধ, উন্মাদ, অনাচারী বলিয়াই জানিত ও বিদ্রূপাদি করিতেও ছাড়িত না, কেমন করিয়া ভীত, সঙ্কুচিত না হইয়া থাকে? কিন্তু ঘটনা অভাবনীয়, অচিন্তনীয় হইয়া দাঁড়াইল—মথুর বাবুই হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়াইয়া ঠাকুরের নিকট আগমন করিলেন এবং প্রণত হইয়া তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বলেন, "বল্লুম, তুমি এ কি কর্‌চ? তুমি বাবু, রাণীর জামাই, লোকে তোমায় এমন করতে দেখলে কি বল্‌বে? স্থির হও, ওঠ।" সে কি তা শোনে! তারপর ঠাণ্ডা হয়ে সকল কথা ভেঙ্গে বললে—অদ্ভুত দর্শন হয়েছিল! বললে—'বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ

আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখচি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা! আর যাই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্চ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব! প্রথম ভাবলুম চোখের ভ্রম হয়েছে; চোখ ভাল করে পুঁছে ফের দেখলুম—দেখি তাই! এইরূপ যতবার করলুম দেখলুম তাই।' এই বলে আর কাঁদে! আমি বল্লুম 'আমি তো কৈ কিছু জানি না, বাবু'—কিন্তু সে কি শোনে! ভয় হল, পাছে এ কথা কেউ জেনে গিন্নিকে, রাণী রাসমণিকে বলে দেয়। সেই বা কি ভাববে—হয়ত বলবে কিছু গুণ টুন্ করেছে! অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলায় তবে সে ঠাণ্ডা হয়! মথুর কি সাধে এতটা করত—ভালবাসত? মা তাকে অনেক সময় অনেক রকম দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল। মথুরের ঠিকুজীতে কিন্তু লেখা ছিল, বাবু, তার ইষ্টের তার উপর এতটা কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীর ধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে।"

ঐ দর্শনের ফল

এখন হইতে মথুরের বিশ্বাস অনেকটা পাকা হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, ইহাই তাঁহার প্রথম আভাস পাওয়া যে প্রথম দর্শনেই যাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, অপরে না বুঝিয়া নিন্দা করিলেও যাঁহার মনোভাব ও আচরণ তিনি অনেক সময় ধরিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন, সে ঠাকুর বাস্তবিকই সামান্য নহেন; জগদম্বা তাঁহারই প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুরের শরীরের ভিতরে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে হয়, মন্দিরের পাষাণময়ীই বা শরীর ধারণ করিয়া তাঁহার জন্মপত্রিকার কথামত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে

ফিরিতেছেন!—এখন হইতে ঠাকুরের সহিত মথুর বাবুর ঘনিষ্ঠতা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল।

মথুরের মহাভাগ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ

মথুরের বাস্তবিকই মহাভাগ্যোদয় হইয়াছিল! শাস্ত্র বলেন, যতদিন শরীর থাকিবে ততদিন ভাল-মন্দ দুই প্রকার কর্ম্ম মানুষকে করিতে হইবেই হইবে—সাধারণ মানুষের তো কথাই নাই, মুক্ত পুরুষদিগেরও! সাধারণ মানব স্বয়ংই নিজ সুকৃত-দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে। এখন মুক্ত পুরুষদিগের শরীরকৃত পাপপুণ্যে ফলভোগ করে কে? তাঁহারা তো আর নিজে উহা করিতে পারেন না? কারণ সুখদুঃখাদি ভোগ করিবে যে অভিমান-অহংকার, তাহা তো চিরকালের মত তাঁহাদের ভিতর হইতে উড়িয়া-পুড়িয়া গিয়াছে; তবে উহা করে কে? আবার কর্ম্মফল তো অবশ্যম্ভাবী এবং মুক্ত পুরুষদিগের শরীরটা যতদিন জীর্ণ পত্রের মত পড়িয়া না যায়, ততদিন তো উহার দ্বারা ভাল-মন্দ কতকগুলি কাজ হইবেই হইবে। শাস্ত্র এখানে বলেন—যে সকল বদ্ধ পুরুষেরা তাঁহাদের সেবা করে, ভালবাসে, তাহারাই মুক্তাত্মাদিগের কৃত শুভকর্ম্মের এবং যাঁহারা তাঁহাদের দ্বেষ করে, তাহারাই তাঁহাদের শরীরকৃত অশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে।[১] সাধারণ মুক্ত

১ বেদান্তসূত্র, ৩য় অধ্যায়, ৩য় পাদ, ২৬ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে—তথা শাট্যায়নিনঃ পঠন্তি—"তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইতি। তথৈব কৌষীতকিনঃ—"তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে তস্য প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতম্" ইতি।

পরবর্ত্তী ভাষ্যেও ঐ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

পুরুষদিগের সেবার দ্বারাই যদি ঐরূপ ফললাভ হয়; তবে ঈশ্বরাবতারদিগের ভক্তিপ্রীতিপূর্ণ সেবার যে কতদূর ফল তাহা কে বলিতে পারে ?

ঠাকুরের দিন-দিন গুরুভাবের অধিকতর বিকাশ ও মথুরের তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া অনুভব

দিনের পর দিন যতই চলিয়া যাইতে লাগিল, মথুর বাবুও ততই ঠাকুরের গুরুভাবের পরিচয় স্পষ্ট—স্পষ্টতর পাইতে থাকিয়া, ঠাকুরের প্রতি অবিচলা ভক্তি করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা হইয়া গেল; যথা—ভগবদ্বিরহে ঠাকুরের বিষম গাত্রদাহ ও তাহার চিকিৎসা; ব্রাহ্মণী ভৈরবীর দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন ও বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মথুর বাবুর দ্বারা আহূত পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে ঠাকুরের অবতারত্ব-প্রতিপাদন; মহা বৈদান্তিক জ্ঞানী তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ; ঠাকুরের বৃদ্ধা জননীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও বাস ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের দিন হইতে মথুরানাথ ঠাকুরের জীবনের প্রায় সকল দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সহিতই বিশেষভাবে সম্বদ্ধ। ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য মথুর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও ডাক্তার ৺মহেন্দ্রলাল সরকারকে দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; ঠাকুরের শ্রীশ্রীজগদম্বাকে, পশ্চিমী স্ত্রীলোকেরা যেরূপ পাঁইজোর প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করেন, সেইরূপ পরাইবার সাধ হইল—মথুর তৎক্ষণাৎ তাহা গড়াইয়া দিলেন; ঠাকুর বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখীভাব-সাধনকালে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় বেশভূষা করিবেন এরূপ ইচ্ছা হইল—মথুরানাথ তৎক্ষণাৎ

এক 'সুট' ডায়মনকাটা অলঙ্কার, বেনারসী শাড়ী, ওড়না প্রভৃতি আনাইয়া দিলেন; পানিহাটির উৎসব দেখিবার ঠাকুরের সাধ জানিয়া মথুর তৎক্ষণাৎ তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই যে ক্ষান্ত থাকিলেন তাহা নহে, পাছে সেখানে ভিড়-ভাড়ে তাঁহার কষ্ট হয় ভাবিয়া নিজে গুপ্তভাবে দারোয়ান সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের শরীররক্ষা করিতে যাইলেন। এইরূপে প্রতি ব্যাপারে মথুরের অদ্ভুত সেবার কথা যেমন আমরা একদিকে শুনিয়াছি, তেমনি আবার অপরদিকে নষ্টস্বভাবা স্ত্রীলোকদিগকে লাগাইয়া ঠাকুরের মনে অসৎ ভাবের উদয় হয় কি না পরীক্ষা করার কথা, ঠাকুরবাড়ীর দেবোত্তর সম্পত্তি ঠাকুরের নামে সমস্ত লিখিয়া পড়িয়া দিবার প্রস্তাবে ঠাকুর ভাবাবস্থায় "কি! আমাকে বিষয়ী করিতে চাস্?"—বলিয়া মথুরের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করিতে যাইবার কথা জমিদারী-সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া নরহত্যার অপরাধে রাজদ্বারে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবার ভয়ে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার-কামনায় ঠাকুরের নিকট সকল দোষ স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া মথুরের ঐ বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাও ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। ঐ সকল ঘটনা হইতেই আমরা মথুর বাবুর মনে যে ঠাকুরের প্রতি ক্রমে ক্রমে ভক্তি দৃঢ়া অচলা হইয়া আসিতেছিল ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। আর ঐরূপ না হইয়া অন্যরূপই বা হয় কিরূপে? ঠাকুরের অদ্ভুত অলৌকিক দেবদুর্লভ স্বভাব যেমন একদিকে মথুরের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিনের পর দিন অধিকতর সমুজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল,

অপরদিকে তেমনি ঠাকুরের অপার অহেতুক ভালবাসা মথুরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। মথুর দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিয়াও ইঁহাকে ত্যাগীর ভাব হইতে হটাইতে পারিলাম না, সুন্দরী নারীগণের দ্বারা ইঁহার মনের বিকার উপস্থিত করিতে পারিলাম না, পার্থিব মান-যশেও—কারণ মানুষকে মানুষ ভগবান বলিয়া পূজা করা অপেক্ষা অধিক মান আর কি দিতে পারে—ইঁহাকে কিছুমাত্র টলাইতে বা অহঙ্কৃত করিতে পারিলাম না, পার্থিব কোন বিষয়েরই ইনি প্রার্থী নন—অথচ তাঁহার চরিত্রের সমস্ত দুর্ব্বলতার কথা জানিয়াও তাঁহাকে ঘৃণা করিতেছেন না, আপনার হইতেও আপনার করিয়া ভালবাসিতেছেন, বিপদ হইতে বার বার উদ্ধার করিতেছেন, আর কিসে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয় তাহাই চিন্তা করিতেছেন!—ইহার কারণ কি? বুঝিলেন, ইনি মনুষ্যশরীরধারী হইলেও 'যে দেশে রজনী নাই' সেই দেশের লোক! ইঁহার ত্যাগ অদ্ভুত, সংযম অদ্ভুত, জ্ঞান অদ্ভুত, ভক্তি অদ্ভুত, সকল প্রকার কর্ম্ম অদ্ভুত এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ন্যায় দুর্ব্বল অথচ অহঙ্কৃত জীবের উপর ইঁহার করুণা ও ভালবাসা অদ্ভুত!

আর একটি কথাও মথুরানাথ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন—এ অদ্ভুত চরিত্রের মাধুর্য্য! এমন অলৌকিক ঐশী শক্তির বিকাশ ইঁহার ভিতর দিয়া হইলেও ইনি নিজে যে বালক, সেই বালক! এতটুকু অহঙ্কার নাই—এ কি চমৎকার ব্যাপার! নিজের ভিতর যে কোন ভাব উঠুক না কেন, পঞ্চম-বর্ষীয় শিশুর ন্যায় তাঁহার এতটুকু লুকানো নাই। ভিতরে-

বাহিরে নিরন্তর এক ভাব। যাহা মনে, তাহাই অকপটে মুখে ও কার্য্যে প্রকাশ—অথচ অন্যের যাহাতে কোনরূপ হানি হইতে পারে তাহা কখনও বলা নাই—নিজের শারীরিক কষ্ট হইলেও তাহা বলা নাই! ইহা কি মানবে সম্ভব?

মথুরের ভক্তি-বৃদ্ধি দেখিয়া হালদার পুরোহিত

মথুরানাথের কালীঘাটের হালদার পুরোহিত ঠাকুরের প্রতি মথুর বাবুর অবিচলা ভক্তি দেখিয়া হিংসায় জরজর; ভাবে—'লোকটা বাবুকে কোনরূপ গুণ্ টুন্ করিয়া ঐরূপ বশীভূত করিয়াছে'; ভাবে—'তাই তো, বাবুটাকে হাত করবার আমার এতকালের চেষ্টাটা এই লোকটার জন্য সব পণ্ড? আবার সরল বালকের ভান দেখায়। যদি এতই সরল তো বলে দিক 'বশীকরণের' ক্রিয়াটা। আমার যত বিদ্যা সব ঝেড়ে ঝুড়ে বাবুটা একটু বাগে আসছিল, এমন সময় এ আপদ কোথা হতে এল?'

এদিকে মথুরের ভক্তিবিশ্বাস যতই বাড়িতে থাকিল, ততই ঠাকুরের সঙ্গে সদাসর্ব্বক্ষণ কি করিয়া থাকিতে পাইব, কি করিয়া তাঁহার আরও অধিক সেবা করিতে পাইব—এই সকল চিন্তাই বলবতী হয়। সেজন্য মাঝে মাঝে ঠাকুরকে অনুরোধ-নির্ব্বন্ধ করিয়া কলিকাতায় জানবাজারের বাটীতে নিজের কাছে আনিয়া রাখেন; অপরাহ্ণে 'বাবা, চল বেড়াইয়া আসি' বলিয়া সঙ্গে করিয়া গড়ের মাঠ প্রভৃতি কলিকাতার নানাস্থানে বেড়াইয়া লইয়া আসেন। 'বাবাকে কি যাহাতে তাহাতে খাইতে দেওয়া চলে?'—ভাবিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের এক 'সুট' বাসন নূতন গড়াইয়া তাহাতে ঠাকুরকে অন্ন-পানীয় দেন; উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিচ্ছদ

প্রভৃতি পরাইয়া দেন, আর বলেন—'বাবা, তুমিই তো এই সকলের (বিষয়ের) মালিক, আমি তোমার দেওয়ান বই তো নয়; এই দেখ না তুমি সোনার থালে, রূপার বাটি-গেলাসে খাইবার পর ঐ সকলের দিকে আর না দেখিয়া ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেলে, আর আমি আবার তুমি খাইবে বলিয়া সে সমস্ত মাজাইয়া ঘসাইয়া তুলিয়া রাখি, চুরি গেল কি না দেখি, ভাঙ্গা ফুটা হইল কি না খবর রাখি, আর এই সব লইয়াই ব্যস্ত থাকি।'

বেনারসী শালের দুর্দ্দশা

এই সময় এক জোড়া বেনারসী শালের দুর্দ্দশার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম। মথুর উহা সহস্র মুদ্রা মূল্যে ক্রয় করেন এবং অমন ভাল জিনিস আর কাহাকে দিব ভাবিয়া, নিজের হাতে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে উহা জড়াইয়া দিয়া মহানন্দ লাভ করেন। শাল জোড়াটি বাস্তবিকই মূল্যবান—কারণ উহার তখনকার (৫০ বৎসর পূর্ব্বের) দামই যখন অত ছিল, তখন বোধ হয় সে প্রকার জিনিস এখন আর দেখিতেই পাওয়া যায় না। শালখানি পরিয়া ঠাকুর প্রথম বালকের মত মহা আনন্দিত হইয়া এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, বার বার উহা নিজে দেখিতে লাগিলেন এবং অপরকে ডাকিয়া দেখাইতে ও মথুর বাবু উহা এত দরে কিনিয়া দিয়াছেন ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বালকের ন্যায় ঠাকুরের মনে অন্য ভাবের উদয় হইল! ভাবিলেন—"এতে আর আছে কি? কতকগুলো ছাগলের লোম বই তো নয়? যে পঞ্চভূতের বিকারে সকল জিনিস, সেই পঞ্চভূতেই তো এটাও তৈরী হয়েছে; আর শীত-নিবারণ—তা লেপকম্বলেও যেমন হয়,

এতেও তেমনি; অন্য সকল জিনিসের ন্যায় এতেও সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না; বরং গায়ে দিলে মনে হয় আমি অপর সকলের চেয়ে বড়, আর অভিমান অহঙ্কার বেড়ে মানুষের মন ঈশ্বর থেকে দূরে গিয়ে পড়ে! এতে এত দোষ!" এই সকল কথা ভাবিয়া শালখানি ভূমিতে ফেলিয়া—ইহাতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, 'থু থু' বলিয়া থুতু দিতে ও ধূলিতে ঘসিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া পুড়াইবার উপক্রম করিলেন! এমন সময় কে সেখানে আসিয়া পড়িয়া উহা তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধার করে! মথুর বাবু শালখানির ঐরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে জানিয়াও কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। বলিয়াছিলেন—'বাবা বেশ করেছেন।'

ঠাকুরের নির্লিপ্ততা

উপরে লিখিত ঘটনাদি হইতেই বেশ বুঝা যায়—মথুর বাবুর ঠাকুরকে নানা ভোগ-সুখ ও আরামের ভিতর রাখিবার চেষ্টা করিলেও ঠাকুরের মন কত উচ্চে, কোথায় নিরন্তর থাকিত! যেখানেই থাকুক না কেন, এ মন সর্ব্বদা আপন ভাবে বিভোর। অপর সকল যেখানে কেবল অন্ধকারের উপর অন্ধকাররাশিই পুঞ্জীকৃত দেখে, সেখানে এ মন দেখে—আলোয় আলো—ছায়াবিহীন হ্রাসবৃদ্ধি-রহিত আলো—যে আলোর সম্মুখে চন্দ্র-সূর্য্য-তারকার উজ্জ্বলতা, বিদ্যুতের চক্‌মকানি, অগ্নির তো 'কা কথা'—সব মিটমিটে, প্রায় অন্ধকারতুল্য! সেই আলোকময় রাজ্যেই এ মনের নিরন্তর থাকা! আর এই হিংসাদ্বেষকপটতাপূর্ণ কামক্রোধের চির-আবাসভূমি এই রাজ্যে, যেন এ মনের দু'দিনের জন্য করুণায় বেড়াইতে আসা, এইমাত্র! অতএব মথুর বাবুর ভোগসুখ-

বিলাসিতাপূর্ণ জানবাজারের বাড়ীতে থাকিলেও যে ঠাকুর সেই ঠাকুর—নির্লিপ্ত, নিরহঙ্কার, আপন ভাবে আপনি নিশি-দিন মাতোয়ারা!

হালদার পুরোহিতের শেষ কথা

জানবাজারের বাড়ীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর একদিন অর্দ্ধবাহ্য দশায় পড়িয়া আছেন, নিকটে কেহ নাই। ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গিতেছে; বাহ্যজগতের অল্পে অল্পে হুঁশ আসিতেছে। এমন সময় পূর্ব্বোক্ত হালদার পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে একাকী তদবস্থ দেখিয়াই ভাবিল, ইহাই সময়। নিকটে যাইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বার বার বলিতে লাগিল—'অ বামুন, বল্ না—বাবুটাকে কি করে হাত কর্‌লি? কি করে বাগালি, বল্ না? ঢঙ্ করে চুপ করে রইলি যে? বল্ না?' বার বার ঐরূপ বলিলেও ঠাকুর যখন কিছুই বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না—কারণ ঠাকুরের তখন কথা কহিবার মত অবস্থাই ছিল না—তখন কুপিত হইয়া 'যা শালা বল্লি না' বলিয়া সজোরে পদাঘাত করিয়া অন্যত্র গমন করিল। নিরভিমান ঠাকুর মথুর বাবু এ কথা জানিতে পারিলে ক্রোধে ব্রাহ্মণের উপর একটা বিশেষ অত্যাচার করিয়া বসিবে বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে—কিছুকাল পরে—অন্য অপরাধে মথুর বাবুর কোপে পড়িয়া ব্রাহ্মণ তাড়িত হইলে একদিন কথায় কথায় মথুরানাথকে ঐ কথা বলেন। শুনিয়া মথুর ক্রোধে বলিয়াছিলেন, "বাবা, এ কথা আমি আগে জানলে বাস্তবিকই ব্রাহ্মণের মাথা থাকত না।"

ঠাকুরের গুরুভাবে অপার করুণার কথা সস্ত্রীক মথুর বাবু প্রাণে প্রাণে যে কতদূর অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে যে কতদূর আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি—ঠাকুরের নিকট তাঁহাদের উভয়ের কোন কথা গোপন না রাখায়। উভয়েই জানিতেন ও বলিতেন, "বাবা মানুষ নন; ওঁর কাছে কথা লুকিয়ে কি করবো? উনি সকল জান্‌তে পারেন, পেটের কথা সব টের পান!"

মথুরানাথ ও তৎপত্নী জগদম্বা দাসীর ঠাকুরের উপর ভক্তি ও ঠাকুরের ঐ পরিবারের সহিত ব্যবহার

তাঁহারা উভয়ে যে ঐ প্রকারে কথার কথা মাত্র বলিতেন তাহা নহে—কার্য্যতঃও সকল বিষয়ে ঠিক ঠিক ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতেন। বাবাকে লইয়া একত্রে আহার-বিহার এবং এক শয্যায় কতদিন শয়ন পর্য্যন্ত উভয়ে করিয়াছেন! বাবা সকল সময়ে সর্ব্বাবস্থায় অন্দরে অবাধ গমনাগমন করিবেন, তাহাতে কি? উনি অন্দরে না যাইলেই বা কি?—বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ সকলের সকল প্রকার মনোভাব যে জানেন ইহার পরিচয় তাঁহারা অনেক সময় পাইয়াছেন। আর পুরুষের, স্ত্রীলোকদের সহিত মিশিবার যে প্রধান অনর্থ—মানসিক বিকার, সে সম্বন্ধে বাবাকে ঘরের দেয়াল বা অন্য কোন অচেতন পদার্থবিশেষ বলিলেও চলে! অন্দরের কোন স্ত্রীলোকেরই মনে তো বাবাকে দেখিয়া, অপর কোন পুরুষকে দেখিয়া যেরূপ সঙ্কোচ-লজ্জার ভাব আসে, সেরূপ আসে না। মনে হয় যেন তাঁহাদেরই একজন, অথবা একটি পাঁচ বছরের

ছেলে! কাজেই সখীভাবে ভাবিত ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা পরিয়া ৺দুর্গাপূজার সময়ে অন্দরের স্ত্রীলোকদিগের সহিত বাহিরে আসিয়া প্রতিমাকে চামর-বীজন করিতেছেন, কখন বা কোন যুবতীর স্বামীর আগমনে তাহাকে সাজাইয়া-গুজাইয়া বেশভূষা পরাইয়া স্বামীর সাহত কি ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে হয়, তাহা কানে কানে শিখাইতে শিখাইতে শয়নমন্দিরে স্বামীর পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া আসিতেছেন—এরূপ অনেক কথা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে জানিয়া আমরা ইঁহাদের ঠাকুরের উপর কি এক অপূর্ব্ব ভাব ছিল, ভাবিয়া অবাক্ হইয়া থাকি! ঠাকুরের গুরুভাবে এই সকল স্ত্রীলোকদিগের মনে তাঁহার প্রতি দেবতাজ্ঞান যেমন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তেমনি আবার তাঁহার অহেতুক ভালবাসার বিশেষ পরিচয় পাইয়া ইঁহারা তাঁহাকে কতদূর আপনার হইতেও আপনার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কতদূর নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকটে উঠা-বসা ও অন্য সকল চেষ্টা ব্যবহারাদি করিতেন, তাহা আমরা কল্পনাতেও ঠিক ঠিক আনিতে পারি না।

ঠাকুরে বিপরীত ভাবের একত্র সমাবেশ

একদিকে ঠাকুরের মথুর বাবুর বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত যেমন অমানুষী কামগন্ধহীন স্বার্থমাত্রশূন্য সখীর ন্যায় ভালবাসার প্রকাশ, অপর দিকে আবার বাহিরে পুরুষদিগের নিকট পণ্ডিতমণ্ডলীর মাঝে দিব্যজ্ঞান ও অনুপম বুদ্ধির সহিত ব্যবহারাদি দেখিলে মনে হয়, এ বহু-বিপরীত ভাবের একত্র সম্মিলন তাঁহার ভিতরে কিরূপে হইয়াছিল? এ বহুরূপী ঠাকুর কে?

গুরুভাব ও মথুরানাথ

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে ৺রাধাগোবিন্দের বিগ্রহমূর্ত্তিদ্বয় তখন প্রতিদিন প্রাতে পার্শ্বের শয়নঘর হইতে মন্দিরমধ্যে সিংহাসনে আনিয়া বসান হইত এবং পূজা ভোগ-রাগাদির অন্তে দুই প্রহরে পুনরায় শয়নমন্দিরে বিশ্রামের জন্য রাখিয়া আসা হইত। আবার অপরাহ্নে বেলা চারিটার পর সেখান হইতে সিংহাসনে আনিয়া পুনরায় সান্ধ্য আরাত্রিক ও ভোগ-রাগাদির অন্তে রাত্রে রাখিয়া আসা হইত।

দক্ষিণেশ্বরে বিগ্রহমূর্ত্তি ভগ্ন হওয়ায় বিধান লইতে পণ্ডিত-সভার আহ্বান

মন্দিরের মর্ম্মর পাথরের মেজে একদিন জল পড়িয়া পিছল হওয়ায় ঠাকুর লইয়া যাইবার সময় পড়িয়া গিয়া পূজক ব্রাহ্মণ ৺গোবিন্দজীর মূর্ত্তিটির পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন! একেবারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পূজারী তো নিজে আঘাত পাইলেন, আবার ভয়ে কম্পমান! বাবুদের নিকট সংবাদ পৌঁছিল। কি হইবে? ভাঙ্গা বিগ্রহে তো পূজা চলে না—এখন উপায়? রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু উপায়-নির্দ্ধারণের জন্য শহরের সকল খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সম্ভ্রমে আহ্বান করিয়া সভা করিলেন। যে সকল পণ্ডিতেরা কার্য্যবশতঃ উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তাঁহাদেরও মতামত সংগৃহীত হইতে লাগিল। একেবারে হৈ-চৈ ব্যাপার এবং পণ্ডিতবর্গের সম্মানরক্ষার জন্য বিদায়-আদায়ে টাকারও শ্রাদ্ধ! পণ্ডিতেরা পাঁজি-পুঁথি খুলিয়া বারবার বুদ্ধির গোড়ায় নস্য দিয়া বিধান দিলেন—'ভগ্ন মূর্ত্তিটি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া হউক এবং তৎস্থলে অন্য নূতন মূর্ত্তি স্থাপিত হউক।' কারিকরকে নূতন মূর্ত্তিগঠনের আদেশ দেওয়া হইল।

সভাভঙ্গকালে মথুর বাবু রাণীমাতাকে বলিলেন", ছোট ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা তো হয় নাই? তিনি কি বলেন জানিতে হইবে"—বলিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর ভাবমুখে বলিতে লাগলেন, "রাণীর জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেল্‌ত, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে তার জায়গায় এনে বসান হত—না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত? এখানেও সেই রকম করা হোক—মূর্ত্তিটি জুড়ে যেমন পূজা হচ্ছে তেমনি পূজা করা হোক। ত্যাগ করতে হবে কিসের জন্য?" সকলে ব্যবস্থা শুনিয়া অবাক! তাই তো, কাহারও মাথায় তো এ সহজ যুক্তিটি আসে নাই? মূর্ত্তিটি যদি ৺গোবিন্দজীর দিব্য আবির্ভাবে জীবন্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে সে আবির্ভাব তো ভক্তের হৃদয়ের গভীর ভক্তি-ভালবাসা-সাপেক্ষ, ভক্তের প্রতি কৃপা বা করুণায় হৃদয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা থাকিলে সে আবির্ভাব ভগ্ন মূর্ত্তিতেই বা না হইতে পারে কেন? মূর্ত্তিভঙ্গের দোষাদোষ তো আর সে আবির্ভাবকে স্পর্শ করিতে পারে না! তারপর, যে মূর্ত্তিটিতে শ্রীভগবানের এতকাল পূজা করিয়া হৃদয়ের ভালবাসা দিয়া আসিয়াছি, আজ তাহার অঙ্গবিশেষের হানি হওয়াতে যথার্থ ভক্তের হৃদয় হইতে কি ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে হানি হইতে পারে? আবার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তকে ঠাকুরের আত্মবৎ সেবা করিতেই উপদেশ দিয়া থাকেন। আপনি যখন যে অবস্থায় যাহা করিতে ভালবাসি, ঠাকুরও তাহাই ভালবাসেন ভাবিয়া

ঠাকুরের মীমাংসা ও ঐ বিষয়ের শেষ কথা

সেইরূপ করিতেই বলেন। সে পক্ষ হইতেও মূর্ত্তিটির ত্যাগের ব্যবস্থা হইতে পারে না। অতএব স্মৃতিতে যে ভগ্ন মূর্ত্তিতে পূজাদি করিবে না বলিয়া বিধান আছে তাহা প্রেমহীন, ভক্তিপথে সবেমাত্র অগ্রসর ভক্তের জন্যই নিশ্চয়। যাহা হউক, অভিমানী পণ্ডিতবর্গের কাহারও কাহারও ঠাকুরের মীমাংসার সহিত মতভেদ হইল, কেহ বা আবার মতভেদ-প্রকাশে বিদায়-আদায়ের ক্রটি হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া স্বীয় মত পরিষ্কার প্রকাশ করিলেন না! আর যাঁহারা পাণ্ডিত্যের সহায়ে একটু যথার্থ জ্ঞান-ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঠাকুরের ঐ মীমাংসা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পরে ঠাকুর স্বহস্তে মূর্ত্তিটি জুড়িয়া দিলেন ও তাঁহার পূজাদি পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। কারিকর নূতন মূর্ত্তি একটি গড়িয়া আনিলে, উহা ৺গোবিন্দজীর মন্দিরমধ্যে একপার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইল মাত্র —উহার প্রতিষ্ঠা আর করা হইল না। রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু পরলোকগমন করিলে, তাঁহাদের বংশধরগণের কেহ কেহ কখন কখন ঐ নূতন মূর্ত্তিটির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন না কোন সাংসারিক বিঘ্ন সেই সেই কালে উপস্থিত হওয়ায় ঐ কার্য্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাজেই ৺গোবিন্দজীর নূতন মূর্ত্তিটি এখনও সেইভাবেই রাখা আছে।

সপ্তম অধ্যায়

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ —গীতা, ১০।২০

জানবাজারে মথুরের বাটীতে ঠাকুরকে লইয়া ৺দুর্গোৎসবের কথা

এ বৎসর মথুরানাথের জানবাজারের বাটীতে ৺দুর্গোৎসবে বিশেষ আনন্দ। কারণ শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় বৎসরে বৎসরে আবালবৃদ্ধবনিতার যে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তাহা তো আছেই, তাহার উপর 'বাবা' আবার কয়েকদিন হইতে মথুরের বাটী পবিত্র করিয়া ঐ আনন্দ সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কাজেই আনন্দের আর পরিসীমা নাই। মা-র নিকটে বালক যেমন আনন্দে আটখানা হইয়া নির্ভয়ে আব্দার, অনুরোধ ও হেতুরহিত হাস্য-নৃত্যাদির চেষ্টা করিয়া থাকে, নিরন্তর ভাবাবেশে প্রতিমাতে জগন্মাতার সাক্ষাৎ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া 'বাবার' সেইরূপ অপূর্ব্ব আচরণে প্রতিমা বাস্তবিকই জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া যেন হাসিতেছেন! আর ঐ প্রতিমাতে মা-র আবেশ ও ঠাকুরের দেবদুর্লভ শরীর-মনে মা-র আবেশ একত্র সম্মিলিত হওয়ায় পূজার দালানের বায়ুমণ্ডল কি একটা অনির্ব্বচনীয়, অনির্দ্দেশ্য সাত্ত্বিক ভাবপ্রকাশে পূর্ণ বলিয়া অতি জড়মনেরও

অনুভূতি হইতেছে। দালান জম্ জম্ করিতেছে—উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আর বাটীর সর্ব্বত্র যেন সেই অদ্ভুত প্রকাশে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে!

হইবারই কথা। ধনী মথুরের রাজসিক ভক্তি, ঘর দ্বার ও মা-র প্রতিমা বিচিত্র সাজে সাজাইতে, পত্র পুষ্প ফল মূল মিষ্টান্নাদি পূজার দ্রব্যসম্ভারের অপর্য্যাপ্ত আয়োজনে এবং নহবতাদি বাদ্য-ভাণ্ডের বাহুল্যে মনোনিবেশ করিয়া বাহিরের কিছুরই যেমন ত্রুটি রাখে নাই, তেমনি আবার এ অদ্ভুত ঠাকুরের অলৌকিক দেবভাব বাহিরের ঐ জড় জিনিসসকলকে স্পর্শ করিয়া উহাদের ভিতর সত্যসত্যই একটা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছে! কাজেই তুষারমণ্ডিত হিমালয়বক্ষে চিরশ্যামল দেবদারুকুঞ্জের গম্ভীর সৌন্দর্য্যে সাধু-তপস্বীর গৈরিক বসন যে শান্তিময় শোভা আনয়ন করে, সুন্দরী রমণীর কোলে স্তন্যপায়ী সুন্দর শিশু যে করুণামাখা সৌন্দর্য্যের বিস্তার করে, সুন্দর মুখে পবিত্র মনোভাব যে অপূর্ব্ব প্রকাশ আনিয়া দেয়, মথুর বাবুর মহাভাগ্যোদয়ে তাঁহার ভবনে আজ সেই সৌন্দর্য্যের বিচিত্র সমাবেশ! পূজাসংক্রান্ত নানা কার্য্যের সুবন্দোবস্তে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিলেও বাবু ও তাঁহার গৃহিণী যে ঐ ভাবসৌন্দর্য্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এক অব্যক্ত আনন্দে পূর্ণ হইতেছিলেন, একথা আর বলিতে হইবে না।

দিবসের পূজা শেষ হইল। তাঁহারাও কোনরূপে একটু সময় করিয়া ‘বাবার’ ও জগন্মাতার শ্রীচরণে মহানন্দে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

সন্ধ্যা সমাগতা। এইবার শ্রীশ্রীজগন্মাতার আরাত্রিক হইবে।

'বাবা' এখন অন্দরে বিচিত্রভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার পুরুষ-শরীরের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন! কথায়, চেষ্টায় কেবলই প্রকাশ—যেন তিনি জন্মে-জন্মে যুগে যুগে শ্রীশ্রীজগন্মাতার দাসী বা সখী; জগদম্বাই তাঁহার প্রাণ-মন, সর্ব্বস্বের সর্ব্বস্ব; মা-র সেবার জন্যই তাঁহার দেহ ও জীবনধারণ।

ঠাকুরের ভাব-সমাধি ও রূপ

ঠাকুরের মুখমণ্ডল ভাবে প্রেমে সমুজ্জ্বল, অধরে মৃদু মৃদু হাসি; চক্ষের চাহনি, হাত-পা-নাড়া, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীলোকদিগের ন্যায়! ঠাকুরের পরিধানে মথুরবাবু-প্রদত্ত সুন্দর গরদের চেলি—স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় করিয়া পরিয়াছেন—কে বলিবে যে, তিনি পুরুষ! ঠাকুরের রূপ তখন বাস্তবিকই যেন ফাটিয়া পড়িত—এমন সুন্দর রং ছিল; ভাবাবেশে সেই রং আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, শরীর দিয়া যেন একটা জ্যোতিঃ বাহির হইত! সে রূপ দেখিয়া লোকে চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিত না, অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত! শ্রীশ্রীমা-র মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীঅঙ্গে যে স্বর্ণ-ইষ্ট-কবচখানি তখন সর্ব্বদা ধারণ করিতেন, তাহার সোনার রঙে ও গায়ের রঙে যেন মেশামেশি হইয়া এক হইয়া যাইত! ঠাকুরের নিজ মুখেও শুনিয়াছি—"তখন তখন এমন রূপ হয়েছিল রে, যে লোকে চেয়ে থাকত; বুক মুখ সব সময় লাল হয়ে থাকত, আর গা দিয়ে যেন একটা জ্যোতিঃ বেরুত! লোকে চেয়ে থাকত বলে একখানা মোটা চাদর সর্ব্বক্ষণ মুড়ি দিয়ে থাকতুম, আর মাকে বলতুম, 'মা, তোর বাহিরের রূপ তুই নে, আমাকে ভিতরের রূপ দে', গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চাপ্ড়ে চাপ্ড়ে

বলতুম, 'ভিতরে ঢুকে যা, ভিতরে ঢুকে যা'; তবে কতদিন পরে ওপরটা এই রকম মলিন হয়ে গেল।"

রূপের কথায় ঠাকুরের জীবনের আর একটি ঘটনা এখানে মনে আসিতেছে। এই সময় প্রতি বৎসর বর্ষার সময় ঠাকুর তিন-চারি মাস কাল জন্মভূমি কামারপুকুরে কাটাইয়া আসিতেন। কামারপুকুরে থাকিবার সময় মাঝে মাঝে শিওর গ্রামে ভাগিনেয় হৃদয়ের বাড়ীতেও যাইতেন। ঠাকুরের শ্বশুরালয় জয়রামবাটী গ্রামের ভিতর দিয়া শিওড়ে যাইবার পথ। সেখানকার লোকেরাও উপরোধ-অনুরোধ করিয়া ঠাকুরকে সেখানে কয়েক দিন এ অবসরে বাস করাইয়া লইতেন। ঠাকুরের পরম অনুগত ভক্ত ভাগিনেয় হৃদয় তখন সর্ব্বদা ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সেবা করিতেন।

কামারপুকুরে ঠাকুরের রূপ-গুণে জনতার কথা

কামারপুকুরে থাকিবার কালে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাঁহার মুখের দুটো কথা শুনিবার জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের ভিড় লাগিয়াই থাকিত। প্রত্যূষেই প্রতিবাসী স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর পাট-ঝাঁট সারিয়া স্নান করিয়া জল আনিবার জন্য কলসী কক্ষে লইয়া আসিতেন ও কলসীগুলি ঠাকুরের বাটীর নিকট হালদারপুকুরের পাড়ে রাখিয়া চাটুয্যেদের বাড়ীতে আসিয়া বসিতেন এবং ঠাকুরের বাটীর মেয়েদের ও ঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তায় এক-আধ ঘণ্টা কাল কাটাইয়া পরে স্নানে যাইতেন। এইরূপ নিত্য হইত। এই অবকাশে আবার কেহ কেহ রাত্রে বাটীতে কোন ভালমন্দ মিষ্টান্নাদি তৈয়ার করা হইলে, তাহার

অগ্রভাগ তুলিয়া রাখিয়া তাহা লইয়া আসিয়া ঠাকুরকে দিয়া যাইতেন। রঙ্গরসপ্রিয় ঠাকুর ইঁহারা রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে আসিয়া উপস্থিত হন দেখিয়া, কখন কখন রঙ্গ করিয়া বলিতেন—"শ্রীবৃন্দাবনে নানাভাবে নানা সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের মিলন হত—পুলিনে জল আনতে গিয়ে গোষ্ঠ-মিলন, সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর যখন গরু চরিয়ে ফিরতেন তখন গোধূলি-মিলন, তারপর রাত্রে রাসে মিলন—এই রকম, এই রকম সব আছে। তা, হাঁগা, এটা কি তোদের স্নানের সময়ের মিলন নাকি?" তাঁহারা ঠাকুরের কথা শুনিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেন। মেয়েরা দিবসের রন্ধনাদি করিতে চলিয়া যাইবার পর পাড়ার পুরুষেরা ঠাকুরের নিকট আসিয়া যাহার যতক্ষণ ইচ্ছা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিত। অপরাহ্নে আবার স্ত্রীলোকেরা আসিত এবং সন্ধ্যার পর রাত্রে আবার পুরুষদের কেহ কেহ আসিয়া উপস্থিত হইত। আর দূর-দূরান্তর হইতে যে সকল স্ত্রী-পুরুষেরা আসিত, তাহারা প্রায় অপরাহ্নে আসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চলিয়া যাইত। এইরূপে সমস্ত দিন রথ দোলের ভিড় লাগিয়া থাকিত।

ঠাকুরের রূপ লইয়া ঘটনা ও তাঁহার দীনভাব

একবার কামারপুকুর হইতে ঐরূপে জয়রামবাটী ও শিওড় যাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। অনুক্ষণ ভাবসমাধিতে থাকায় ঠাকুরের অঙ্গ বালক বা স্ত্রীলোকের ন্যায় সুকোমল হইয়া গিয়াছিল। অল্প দূর হইলেও পাল্কি, গাড়ী ভিন্ন যাইতে পারিতেন না। সেজন্য জয়রামবাটী হইয়া শিওড় যাইবার জন্য পাল্কি আনা হইয়াছে। হৃদয় সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত। ঠাকুর আহারান্তে

পান খাইতে খাইতে লাল চেলি পরিয়া, হস্তে সুবর্ণ ইষ্ট-কবচ ধারণ করিয়া পাল্কিতে উঠিতে আসিলেন; দেখেন রাস্তায় পাল্কির নিকটে ভিড় লাগিয়া গিয়াছে; চারিদিকে স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন— "হৃদু, এত ভিড় কিসের রে?"

হৃদয়—কিসের আর? এই তুমি আজ ওখানে যাবে, (লোকদিগকে দেখাইয়া) এরা এখন আর তোমাকে কিছুদিন দেখতে পাবে না, তাই সব তোমায় দেখতে এসেছে।

ঠাকুর—আমাকে ত রোজ দেখে; আজ আবার কি নূতন দেখবে?

হৃদয়—এই চেলি পরে সাজলে গুজলে, পান খেয়ে তোমার ঠোঁট দু'খানি লাল টুকটুকে হলে খুব সুন্দর দেখায়; তাই সব দেখবে আর কি?

তাঁহার সুন্দর রূপে ইহারা আকৃষ্ট, শুনিয়াই ঠাকুরের মন এক অপূর্ব্বভাবে পূর্ণ হইল। ভাবিলেন—হায় হায়! এরা সব এই দুই দিনের বাহিরের রূপটা লইয়াই ব্যস্ত, ভিতরে যিনি রহিয়াছেন তাঁহাকে কেহ দেখিতে চায় না।

রূপে বিতৃষ্ণা ত তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই ছিল; এই ঘটনায় তাহা আরও সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল। বলিলেন—

"কি? একটা মানুষকে মানুষ দেখবার জন্য এত ভিড় করবে? যা, আমি কোথাও যাব না। যেখানে যাব সেই-খানেই ত লোকে এই রকম ভিড় করবে।"—বলিয়াই ঠাকুর বাটীর ভিতরে নিজ কক্ষে যাইয়া কাপড়-চোপড় সব খুলিয়া ক্ষোভে

দুঃখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। দীনভাবে পূর্ণ ঠাকুর সে দিন বাস্তবিকই জয়রামবাটী ও শিওড়ে যাইলেন না; হৃদয় ও বাটীর সকলে কত মতে বুঝাইল, সকলি ভাসিয়া গেল। আপনার শরীরটার উপর এ অলৌকিক পুরুষের যে কি তুচ্ছ, হেয় বুদ্ধি ছিল, তাহা একবার হে পাঠক, ভাবিয়া দেখ। আর ভাব আমাদের কথা, কি রূপ রূপ করিয়া পাগল! —কি মাজা, ঘসা, আর্শি, চিরুণী, ক্ষুর, ভাঁড়, বেসন, সাবান, এসেন্স্, পোমেডের ছড়াছড়ি; আর পাশ্চাত্যের অনুকরণে 'হাড় মাসের খাঁচাটার' উপর নিত্য ভ্রমের বাড়াবাড়ি করিয়া একেবারে উৎসন্ন যাইবার হুড়াহুড়ি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিয়া শুদ্ধ পবিত্রভাবে পূর্ণ থাকা, আর এটা—দুই কি এক কথা হে বাপু? যাক্ আমরা জানবাজারের পূর্ব্ব কথাই বলি।

জগদম্বার আরাত্রিক আরম্ভ হয় হয়, ঠাকুরের কিন্তু সে ভাব আর ভাঙ্গে না। মথুর বাবুর পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ঠাকুরকে কোনরূপে প্রকৃতিস্থ করিয়া বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত আরতি দেখিতে যাইবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশের বিরাম নাই দেখিয়া এবং তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া যাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন।

ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গাইতে জগদম্বা দাসীর কৌশল

ভাবিলেন—করি কি? আমি যাহাকেই রাখিয়া চলিয়া যাইব, একবার আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিলেই সে নিশ্চয়ই তথায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিবে। আর 'বাবা'ও ত ভাবে বিহ্বল হইলে নিজেকে নিজে সামলাইতে পারেন না। একবার ত ঐরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় গুলের আগুনের উপর পড়িয়া যাইয়াও হুঁশ

হয় নাই, পরে সে ঘা কতদিনে কত চিকিৎসায় সারিয়াছে। একাকী রাখিয়া যাইলে এ আনন্দের দিনে পাছে ঐরূপ একটা বিভ্রাট হয়, তখন উপায়? কর্ত্তাই বা কি বলিবেন? এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মনে একটা উপায় আসিয়া জুটিল। তাড়াতাড়ি নিজের বহুমূল্য গহনাসকল বাহির করিয়া বাবাকে পরাইতে পরাইতে তাঁহার কানের গোড়ায় বার বার বলিতে লাগিলেন, "বাবা, চল; মার যে আরতি হইবে, মাকে চামর করিবে না?"

ঠাকুরের সমাধি হইতে সাধারণ অবস্থায় নামিবার প্রকার শাস্ত্রসম্মত

ভাবাবেশে ঠাকুর যতই কেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হউন না, যে মূর্ত্তি ও ভাবে তাঁহার মন সমাধিস্থ হইয়াছে, তাহা ছাড়া অপর সকল বস্তু, ব্যক্তি ও ভাব-সম্বন্ধ হইতে তাঁহার মন যতই কেন দূরে যাইয়া পড়ুক না, এটা কিন্তু সকল সময়েই দেখা গিয়াছে যে, ঐ মূর্ত্তির নাম বা ঐ মূর্ত্তির ভাবের অনুকূল কথা কয়েকবার ঠাকুরের কানের কাছে বলিলেই, তখনই তাঁহার মন উহাতে আকৃষ্ট হইত এবং উহা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হইত। একাগ্রচিত্তের নিয়ম ও আচরণ যে ঐরূপ হইয়া থাকে, তাহা মহামুনি পতঞ্জলি প্রভৃতির যোগশাস্ত্রে সবিস্তার না হউক সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অতএব শাস্ত্রজ্ঞ পাঠকের ঠাকুরের মনের ঐরূপ আচরণের কথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আর বহু পুণ্যফলে যাঁহারা কিছুমাত্রও চিত্তের একাগ্রতা জীবনে লাভ বা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা আরও সহজে এ কথা বুঝিতে পারিবেন। অতএব আমরা প্রকৃত ঘটনারই অনুসরণ করি।

মথুর বাবুর পত্নীর কথা ঠাকুরের কর্ণে প্রবেশ করিল। অমনি তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা ঠাকুর-দালানে পৌছিবামাত্র আরতি আরম্ভ হইল। ঠাকুরও স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া চামরহস্তে প্রতিমাকে বীজন করিতে লাগিলেন। দালানের এক দিকে স্ত্রীলোকেরা এবং অপর দিকে মথুরবাবু-প্রমুখ পুরুষেরা দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার আরতি দেখিতে লাগিলেন। সহসা মথুর বাবুর নয়ন স্ত্রীলোকদিগের দিকে পড়িবামাত্র দেখিলেন তাঁহার পত্নীর পার্শ্বে বিচিত্রবস্ত্রভূষণে অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে করিতে কে দাঁড়াইয়া চামর করিতেছেন! বার বার দেখিয়াও যখন বুঝিতে পারিলেন না তিনি কে, তখন ভাবিলেন হয়ত তাঁহার পত্নীর পরিচিতা কোন সঙ্গতিপন্ন লোকের গৃহিণী নিমন্ত্রিতা হইয়া আসিয়াছেন।

সখীভাবে ঠাকুরের ৺দুর্গাদেবীকে চামর করা

আরতি সাঙ্গ হইল। অন্তঃপুরবাসিনীরা শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্টস্থানে চলিয়া গেলেন ও নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। ঠাকুরও ঐরূপ অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় মথুর বাবুর পত্নীর সহিত ভিতরে যাইলেন এবং ক্রমে সম্পূর্ণ সাধারণ ভাবে প্রকৃতিস্থ হইয়া অলঙ্কারাদি খুলিয়া রাখিয়া বাহিরে পুরুষদিগের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং নানা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ তুলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকে সরলভাবে বুঝাইয়া সকলের চিত্তহরণ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মথুর বাবু কার্য্যান্তরে অন্দরে গিয়া কথায়-

কথায় তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরতির সময় তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে চামর করিতেছিলেন ?" মথুর বাবুর পত্নী তাহাতে হাসিয়া বলিলেন, "তুমি চিনিতে পার নাই? বাবা ভাবাবস্থায় ঐরূপে চামর করিতেছিলেন। তা হইতেই পারে, মেয়েদের মত কাপড়-চোপড় পরিলে বাবাকে পুরুষ বলিয়া মনে হয় না।" এই বলিয়া মথুর বাবুকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। মথুর বাবু একেবারে অবাক্ হইয়া বলিলেন, "তাইত বলি—সামান্য বিষয়েও না ধরা দিলে বাবাকে চেনে কার সাধ্য! দেখ না, চব্বিশ ঘণ্টা দেখে ও একত্র থেকেও তাঁকে আজ চিনতে পারলুম না!"

মথুরের তাঁহাকে ঐ অবস্থায় চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পরমানন্দে কাটিয়া গিয়াছে। আজ বিজয়া দশমীর প্রাতঃকাল। পুরোহিত তাড়াতাড়ি শ্রীশ্রীজগদম্বার সংক্ষেপ পূজা সারিয়া লইতেছে, কারণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দর্পণ-বিসর্জ্জন করিতে হইবে। পরে সন্ধ্যার পর প্রতিমাবিসর্জ্জন। মথুর বাবুর বাটীর সকলেরই মনে যেন একটা বিষাদের ছায়া—কিসের যেন একটা অব্যক্ত অপরিস্ফুট অভাব, যেন একটা হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সহিত অপরিহার্য্য আশু বিচ্ছেদাশঙ্কা! পৃথিবীর অতি বিশুদ্ধ আনন্দের পশ্চাতেও এইরূপ একটা বিষাদছায়া সর্ব্বদা সংলগ্ন আছে। এই নিয়মের বশেই বোধ হয় অতি বড় ঈশ্বর-প্রেমিকের জীবনেও সময়ে সময়ে অসহ্য ঈশ্বরবিরহের সন্তাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। আর কঠিন মানব আমাদের হৃদয়ও বিজয়ার

বিজয়া দশমী

দিনে প্রতিমাবিসর্জ্জন দিতে যাইয়া উষ্ণ অশ্রু বর্ষণ করে—মথুর-পত্নীর তো কথাই নাই—আজ প্রাতঃকাল হইতে হস্তে কর্ম্ম করিতে করিতে অঞ্চলে অনেকবার নয়নাশ্রু মুছিয়া চক্ষু পরিষ্কার করিয়া লইতে হইতেছে।

বাহিরে মথুর বাবুর কিন্তু অতকার কথা এখনও ধারণা হয় নাই। তিনি পূর্ব্ববৎই আনন্দে উৎফুল্ল! শ্রীশ্রীজগদম্বাকে গৃহে আনিয়া এবং 'বাবা'র অলোকসামান্য সঙ্গ ও অচিন্ত্য কৃপাবলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপনাতে আপনি ভরপুর হইয়া রহিয়াছেন। বাহিরে কি হইবে না হইবে, তাহা এখন খোঁজে কে? খুঁজিবার আবশ্যকই বা কি? মাকে ও বাবাকে লইয়া এইরূপেই দিন কাটিবে। এমন সময় পুরোহিতের নিকট হইতে সংবাদ আসিল—এইবার মা-র বিসর্জ্জন হইবে, বাবুকে নীচে আসিয়া মাকে প্রণাম-বন্দনাদি করিয়া যাইতে বল।

মথুরের আনন্দে ঐ বিষয়ে হুঁশ না থাকা

কথাটা মথুর বাবু প্রথম বুঝিতেই পারিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার হুঁশ হইল—আজ বিজয়া দশমী! আর সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে এক বিষম আঘাত পাইলেন। শোকে দুঃখে পূর্ণ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আজ মাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে—কেন? বাবা ও মা-র কৃপায় আমার তো কিছুরই অভাব নাই। মনের আনন্দের যেটুকু অভাব ছিল, তাহা তো বাড়ীতে মা-র শুভাগমনে পূর্ণ হইয়াছে। তবে আবার কেন মাকে বিসর্জ্জন দিয়া

দেবীমূর্ত্তি-বিসর্জ্জন দিবে না বলিয়া মথুরের সংকল্প

বিষাদ ডাকিয়া আনি? না, এ আনন্দের হাট আমি ভাঙ্গিতে পারিব না। মা-র বিসর্জ্জন! মনে হইলেও যেন প্রাণ কেমন করিয়া উঠে!" এরূপ নানা কথা ভাবিতে ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এদিকে সময় উত্তীর্ণ হয়। পুরোহিত লোকের উপর লোক পাঠাইতেছেন—বাবু একবার আসিয়া দাঁড়ান, মা-র বিসর্জ্জন হইবে। মথুর বিষম বিরক্ত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি মাকে বিসর্জ্জন দিতে দিব না। যেমন পূজা হইতেছে, তেমনি পূজা হইবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ বিসর্জ্জন দেয় তো বিষম বিভ্রাট হইবে—খুনোখুনি পর্য্যন্ত হইতে পারে।" এই বলিয়া মথুর বাবু গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য বাবুর ঐরূপ ভাবান্তর দেখিয়া সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল এবং পূজার দালানে যাইয়া সকল কথা পুরোহিত মহাশয়কে জানাইল। সকলে অবাক!

তখন সকলে পরামর্শ করিয়া বাবু বাটীর ভিতরে যাঁহাদের সম্মান করিতেন তাঁহাদের বুঝাইতে পাঠাইলেন। তাঁহারাও যাইলেন, বুঝাইলেন কিন্তু বাবুর সে ভাবান্তর দূর করিতে পারিলেন না। বাবু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "কেন?" আমি মা-র নিত্যপূজা করিব। মা-র কৃপায় আমার যখন সে

সকলে বুঝাইলেও মথুরের উত্তর

ক্ষমতা আছে তখন কেন বিসর্জ্জন দিব?" কাজেই তাঁহারা আর কি করেন, বিমর্ষভাবে ফিরিয়া আসিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন—মাথা খারাপ হইয়াছে! কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই বা উপায় কি? হঠকারী মথুরকে বাটীর সকলেরই ভালরকম জানা ছিল। সকলেই

জানিত, ক্রুদ্ধ হইলে বাবুর দিক্-বিদিক্-জ্ঞান থাকে না। কাজেই তাঁহার অনভিমতে দেবীর বিসর্জ্জনের হুকুম দিয়া কে তাঁহার কোপে পড়িবে, বল? সে বিষয়ে কেহই অগ্রসর হইলেন না। গিন্নির নিকট অতিরঞ্জিত হইয়া সংবাদ পৌঁছিল; তিনি ভয়ে ভয়ে অভিভূতা হইয়া ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন; কারণ 'বাবা' ভিন্ন তাঁহাদের বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার আর কে আছে?—বাবুর যদি বাস্তবিকই মাথা খারাপ হইয়া থাকে?

ঠাকুর যাইয়াই দেখিলেন মথুরের মুখ গম্ভীর, রক্তবর্ণ, দুই চক্ষু লাল এবং কেমন যেন উন্মনা হইয়া ঘরের ভিতর বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মথুর কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, যে যাহাই বলুক, আমি মাকে প্রাণ থাকিতে বিসর্জ্জন দিতে পারিব না। বলিয়া দিয়াছি নিত্যপূজা করিব। মাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব?"

ঠাকুরের মথুরকে বুঝান

ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ওঃ—এই তোমার ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বল্লে? আর বিসর্জ্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখন থাকতে পারে? এ তিন দিন বাইরে দালানে ব'সে তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে—সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে ব'সে তোমার পূজা নেবেন।"

কি এক অদ্ভুত মোহিনী শক্তিই যে ঠাকুরের স্পর্শে ও কথায়

ছিল, তাহা বলিয়া বুঝান কঠিন! দেখা গিয়াছে, অনেক সময় লোকে আসিয়া তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া খুব তর্ক করিতেছে—তাঁহার সিদ্ধান্ত কিছুতেই লইতেছে না, ঠাকুর তখন কৌশলে কোনরূপে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া দিতেন; আর অমনি তখন হইতে তাহার মনের স্রোত যেন ফিরিয়া যাইত এবং ঐ ব্যক্তি কথাটা গুটাইত—ঠাকুরের কথা বা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়া! ঐ বিষয়ে তিনি আমাদের কাহারও কাহারও নিকট বলিয়াছেনও—"কথা কইতে কইতে অমন করে ছুঁয়ে দি কেন জানিস? যে শক্তিতে ওদের অমন গোঁ-টা থাকে, সেইটের জোর কমে গিয়ে ঠিক ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে।" এইরূপে স্পর্শমাত্রেই অপরের যথার্থ সত্য উপলব্ধি করিবার পথের অন্তরায়স্বরূপে দণ্ডায়মান শক্তিসমূহকে নিজের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহাদের প্রভাব কমাইয়া দেওয়া বা ঐ সকলকে চিরকালের মত একেবারে হরণ করার সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত ঠাকুরের জীবনে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। দেখিয়াছি, যে সকল কথা অপরের মুখ হইতে বাহির হইয়া কাহারও মনে কোনরূপ ভাবোদয় করিল না, সেই সকলই আবার তাঁহার মুখ-নিঃসৃত হইয়া মানবহৃদয়ে এমন অদম্য আঘাত করিয়াছে যে, সেইক্ষণ হইতে শ্রোতার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! সে সকল পাঠককে সবিস্তারে বলিবার জন্য কোন সময় চেষ্টা করিব। এখন মথুর বাবুর কথাই বলিয়া যাই।

ঠাকুরের কথা ও স্পর্শের অদ্ভুত শক্তি

ঠাকুরের কথায় ও স্পর্শে মথুর ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন।

তাঁহার ঐরূপে প্রকৃতিস্থ হওয়া ঠাকুরের ইচ্ছা এবং স্পর্শে কোনরূপ দর্শনাদি হইয়াছিল কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে মনে হয়, উহাই সম্ভব। মনে হয় শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়কন্দর অপূর্ব্ব আলোকে উজ্জ্বল করিয়া বিদ্যমান—দেখিতে পাইয়াই তাঁহার আনন্দ আরও শতগুণে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়া বাহিরের প্রতিমা রক্ষা করিবার মনে যে ঝোঁক উঠিয়াছিল, তাহা কমিয়া গিয়াছিল। যথার্থ গুরু এইরূপে উচ্চতর লক্ষ্যের উজ্জ্বল ছটায় শিষ্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া দেন। কাজেই তখন নিম্নাঙ্গের ভাব দর্শনাদি তাহার মন হইতে আপনা আপনি খসিয়া যায়।

মথুর প্রকৃতিস্থ কিরূপে হইয়াছিল

মথুরের ভক্তি বিশ্বাস আমাদের চক্ষে অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইলেও উহা যে নানারূপে ঠাকুরকে যাচাইবার ফলেই উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মথুর ধন দিয়া, সুন্দরী রমণী দিয়া, নিজের ও বাটীর সকলের উপর অকুণ্ঠ প্রভুতা দিয়া, ঠাকুরের আত্মীয়বর্গ—যথা, হৃদয় প্রভৃতির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া, সকল ভাবে ঠাকুরকে যাচাইয়া দেখিয়াছিলেন—ইনি অপর সাধারণের ন্যায় বাহ্যিক কিছুতেই ভুলেন না। বাহ্যিক ভাব-ভক্তির কপটাবরণ ইঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে অধিকক্ষণ আত্মগোপন করিয়া রাখিতে পারে না। আর নরহত্যাদি দুষ্কর্ম্ম করিয়াও মন-মুখ এক করিয়া যথার্থ সরল-ভাবে যদি কেহ ইঁহার শরণ গ্রহণ করে, তবে তাহার সাত খুন মাপ করিয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, দিন দিন উচ্চ লক্ষ্য

মথুরের ভক্তি-বিশ্বাসের অবিচলতা—ঠাকুরকে পরীক্ষার ফলে

চিনিবার ও ধরিবার সামর্থ্য দেন এবং কি এক বিচিত্র শক্তিবলে তাহার জন্য অসম্ভবও সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়!

ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া এবং ভাবসমাধিতে তাঁহার অসীম আনন্দানুভব দেখিয়া বিষয়ী মথুরেরও এক সময়ে ইচ্ছা হইয়াছিল, ব্যাপারটা কি একবার দেখিবে ও বুঝিবে। মথুরের তখন হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, বাবা ইচ্ছামাত্রেই ওসকল করিয়া দিতে পারেন। কারণ শিব বল, কালী বল, ভগবান্ বল, কৃষ্ণ বল, রাম বল—সবই তো উনি নিজে!—তবে আর কি! কৃপা করিয়া কাহাকেও নিজের কোন মূর্ত্তি যে দেখাইতে পারিবেন, ইহার আর বিচিত্রতা কি! বাস্তবিক ইহা এক কম অদ্ভুত ব্যাপার নহে। ঠাকুরের দর্শনলাভের পর যাহারাই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছে, তাহাদেরই ক্রমে ক্রমে এইরূপ ধারণার উদয় হইত। সকলেরই মনে হইত, উঁহার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়—উনি ইচ্ছামাত্রেই ধর্ম্মজগতের সমস্ত সত্যই কাহাকেও উপলব্ধি করাইয়া দিতে পারেন। আধ্যাত্মিক শক্তি ও নিজ পূত চরিত্রবলে একজনের প্রাণেও ঐরূপ ভাবের উদয় করিতে পারা কঠিন—তো অনেকের প্রাণে! উহা কেবল এক অবতার-পুরুষেই সম্ভবে। তাঁহাদের অবতারত্বের বিশিষ্ট প্রমাণসমূহের মধ্যে ইহা একটি কম প্রমাণ নহে। আর এ মিথ্যা, শঠতা ও প্রতারণার রাজ্যে তাঁহাদের নামে অনেক ভেল জুয়াচুরি চলিবে দেখিতে পাইয়াই, তাঁহারা সকলের সমক্ষে ডঙ্কা মারিয়া বলিয়া যান, "আমার অদর্শনের পর অনেক ভণ্ড 'আমি অবতার, আমি দুর্ব্বল জীবের শরণ ও মুক্তি-

মথুরের ভাব-সমাধি-লাভের ইচ্ছা

ত্রাতা' বলিয়া তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ; সাবধান, তাহাদের কথায় ভুলিও না।"[১]

মথুরের মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইবামাত্র ঠাকুরকে যাইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বাবা, আমার যাহাতে ভাবসমাধি হয় তাহা তোমায় করিয়া দিতেই হইবে।" ঠাকুর ঐরূপ স্থলে সকল সময়েই যেমন বলিতেন সেই-রূপই বলিয়াছিলেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বলিলেন, "ওরে কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁতবামাত্রই কি গাছ হয়ে তার ফল খেতে পাওয়া যায়? কেন, তুই ত বেশ আছিস্—এদিক্-ওদিক দুদিক চল্‌ছে। ও সব হলে এদিক (সংসার) থেকে মন উঠে যাবে, তখন তোর বিষয়-আশয় সব রক্ষা করবে কে? বার ভূতে সব যে লুটে খাবে! তখন কি কর্‌বি?"

ঐজন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা

ও সব কথা সেদিন শুনে কে? মথুর একেবারে 'না-ছোড়-বান্দা'—'বাবা'কে ভাবসমাধি করিয়া দিতেই হইবে। ঐরূপ বুঝানয় ফল হইল না দেখিয়া ঠাকুর আর এক গ্রাম চড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "ওরে, ভক্তেরা কি দেখতে চায়? তারা সাক্ষাৎ সেবাই চায়। দেখলে শুন্‌লে (ঈশ্বরের) ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভয় আসে, ভালবাসা চাপা পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীরা বিরহে আকুল! শ্রীকৃষ্ণ তাদের অবস্থা জেনে উদ্ধবকে বুঝাতে পাঠালেন। উদ্ধব জ্ঞানী কি না! বৃন্দাবনের

উদ্ধব ও গোপীদের দৃষ্টান্তে ঠাকুরের তাহাকে বুঝান

১ ঈশা—(Matthew XXIV—11, 23, 24, 25, 26)

ভাব, খাওয়ান, পরান ইত্যাদি উদ্ধব বুঝ্‌তে পার্‌ত না। গোপীদের শুদ্ধ ভালবাসাটাকে মায়িক ও ছোট বলে দেখ্‌ত; তারও দেখে শুনে শিক্ষা হবে, সেও এক কথা। উদ্ধব গিয়ে গোপীদের বুঝাতে লাগ্‌ল—'তোমরা সব কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে অমন কেন কর্‌ছ? জান ত, তিনি ভগবান—সর্ব্বত্র আছেন; তিনি মথুরায় আছেন আর বৃন্দাবনে নেই, এটা ত হতে পারে না! অমন করে হা-হুতাশ না করে একবার চক্ষু মুদে দেখ দেখি—দেখ্‌বে, তোমাদের হৃদয়মাঝে সেই নবঘনশ্যাম মুরলীবদন বনমালী সর্ব্বদা রয়েছেন' ইত্যাদি। তাই শুনে গোপীরা বলেছিল, 'উদ্ধব, তুমি কৃষ্ণসখা, জ্ঞানী, তুমি এ সব কি কথা বোল্‌চো! আমরা কি ধ্যানী, না জ্ঞানী, না ঋষি-মুনির মত জপ-তপ করে তাঁকে পেয়েছি? আমরা যাঁকে সাক্ষাৎ সাজিয়েছি-গুজিয়েছি, খাইয়েছি, পরিয়েছি, ধ্যান করে তাঁকে আবার ঐ সব কর্‌তে যাব? আমরা তা কি আর কর্‌তে পারি? যে মন দিয়ে ধ্যান-জপ কর্‌ব, সে মন আমাদের থাক্‌লে তো তা দিয়ে ঐ সব কর্‌ব! সে মন যে অনেক দিন হল, কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করেছি! আমাদের বল্‌তে আমাদের কি আর কিছু আছে যে, তাইতে অহং-বুদ্ধি করে জপ কোর্‌বো?' উদ্ধব তো শুনে অবাক্! তখন সে গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা যে কত গভীর ও কি বস্তু, তা বুঝ্‌তে পেরে তাদের গুরু বলে প্রণাম করে চলে এল। এতেই দেখ না, ঠিক ঠিক ভক্ত কি তাঁকে দেখ্‌তে চায়? তাঁর সেবাতেই তার পরমানন্দ। তার অধিক—দেখা, শুনা, সে চায় না; তাতে তার ভাবের হানি হয়।"

ইহাতেও যখন মথুর বুঝিলেন না, তখন ঠাকুর বলিলেন, "তা কি জানি বাবু? মাকে বলব, তিনি যা হয় করবেন।"

তাহার কয়েক দিন পরেই মথুরের একদিন ভাবসমাধি! ঠাকুর বলিতেন, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। গিয়ে দেখি, যেন সে মানুষ নয়! চক্ষু লাল, জল পড়ছে; ঈশ্বরীয় কথা কইতে কইতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্চে! আর বুক থর্ থর্ করে কাঁপচে। আমাকে দেখে একেবারে পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বল্লে, 'বাবা, ঘাট্ হয়েছে! আজ তিন দিন ধরে এই রকম, বিষয়কর্ম্মের দিকে চেষ্টা কর্‌লেও কিছুতেই মন যায় না। সব খানে খারাপ হয়ে গেল। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার চাই নে।' বল্লুম—'কেন? তুই যে ভাব হোক বলেছিলি?' তখন সে বল্লে, 'বলেছিলুম, আনন্দও আছে; কিন্তু হলে কি হয়, এদিকে যে সব যায়! বাবা, ও তোমার ভাব তোমাকেই সাজে। আমাদের ওসবে কাজ নেই! ফিরিয়ে নাও।' তখন আমি হাসি আর বলি, 'তোকে তো এ কথা আগেই বলেছি।' সে বল্লে, 'হাঁ বাবা, কিন্তু তখন কি অত-শত জানি যে, ভূতের মত এসে ঘাড়ে চাপবে? আর তার গোঁয়ে আমায় চব্বিশ ঘণ্টা ফির্‌তে হবে? —ইচ্ছা করলেও কিছু কর্‌তে পার্‌বো না!' তখন তার বুকে আবার হাত বুলিয়ে দি!"

মথুরের ভাবসমাধি হওয়া ও প্রার্থনা

বাস্তবিক ভাব বা সমাধি হইলেই হয় না। উহার বেগ সহ্য করিতে—উহাকে রক্ষা করিতে পারে কয়টা লোক? এতটুকু বাসনার পশ্চাৎ-টান থাকিতে উহা পারা অসম্ভব। ঈশ্বরীয় পথের

পথিককে শাস্ত্র সেজন্যই পূর্ব্ব হইতে নির্ব্বাসনা হইতে বলিয়াছেন।

ত্যাগী না হইলে ভাবসমাধি স্থায়ী হয় না

বলিয়াছেন, 'ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ'— একমাত্র ত্যাগ বৈরাগ্যই অমৃতত্ব দিতে সমর্থ। ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসে নিম্নাঙ্গের সমাধি হইল, কিন্তু ভিতরে ধন হোক, মান হোক, ইত্যাদি বাসনার রাশি গজ্‌ গজ্‌ করিতেছে, এরূপ লোকের ঐ ভাব কখনই স্থায়ী হয় না। আচার্য্য শঙ্কর যেমন বলিয়াছেন—

আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্ ভবাব্ধিপারং প্রতিযাতুমুদ্যতান্।
আশাগ্রাহো মজ্জয়তেঽন্তরালে, নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্ত্য বেগাৎ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৭৯

অর্থাৎ, যথার্থ বৈরাগ্যরূপ সম্বল অগ্রে সংগ্রহ না করিয়া ভবসমুদ্রের পারে যাইবার জন্য যাহারা অগ্রসর হয়, বাসনা-কুম্ভীর তাহাদের

ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্ত— কাশীপুরের বাগানে আনীত জনৈক ভক্ত-যুবকের কথা

ঘাড়ে ধরিয়া ফিরাইয়া বলপূর্ব্বক অতলজলে ডুবাইয়া দেয়। বাস্তবিক, কতই না ঐরূপ দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের নিকট দেখিয়াছি! কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর তখন অবস্থান করিতেছেন; একদিন কয়েকজন বৈষ্ণব ভক্ত একটি উন্মনা যুবককে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত। ইঁহাদের পূর্ব্বে কখন আসিতে আমরা দেখি নাই। আসিবার কারণ, সঙ্গী যুবকটিকে একবার ঠাকুরকে দেখাইবেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক কি অবস্থা সহসা উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের মতামত শ্রবণ করিবেন। ঠাকুরের নিকট সংবাদ দেওয়া গেল।

যুবকটিকে দেখিলাম—বুক ও মুখ লাল, দীনভাবে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিতেছে; ভগবানের নামে ঘন ঘন কম্পন ও পুলক এবং দুনয়নে অবিশ্রান্ত জলধারা বহায় চক্ষুদ্বয় রক্তিম ও কিঞ্চিৎ স্ফীতও হইয়াছে। দেখিতে শ্যামবর্ণ, না স্থূল, না কৃশ, মুখমণ্ডল ও অবয়বাদি সুশ্রী ও সুগঠিত, মস্তকে শিখা। পরিধানে একখানি মলিন সাদাধুতি, গায়ে উত্তরীয় ছিল না বলিয়াই মনে হয়; পায়ে জুতা নাই এবং শরীর-সংস্কার বা রক্ষার বিষয়ে একেবারে উদাসীন! শুনিলাম—হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে একদিন সহসা এইরূপ উত্তেজিত অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। তদবধি আহার এক প্রকার নাই বলিলেই হয়, নিদ্রা নাই এবং ভগবানলাভ হইল না বলিয়া দিবারাত্র কান্নাকাটি ও ভূমিতে গড়াগড়ি! আজ কয়েকদিন হইল, ঐরূপ হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের আতিশয্যে মানবশরীরে যে সকল বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্বিষয় ধরিবার ও চিনিবার শক্তি ঠাকুরের যেমন দেখিয়াছি, এমন আর কুত্রাপি দেখি নাই। গুরুগীতাদিতে শ্রীগুরুকে 'ভবরোগ-বৈদ্য' ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে; তাহার ভিতর যে এত গূঢ় অর্থ আছে, তাহা ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভের পূর্ব্বে একটুও বুঝি নাই। শ্রীগুরু যে বাস্তবিকই মানসিক রোগের বৈদ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাবে মানবমনে যে যে বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা দেখিবামাত্র চিনিয়া, লক্ষণ দেখিয়া ধরিয়া অনুকূল হইলে উহা যাহাতে সাধকের মনে

আধ্যাত্মিক ভাবের আতিশয্যে উপস্থিত বিকারসকল চিনিবার ঠাকুরের শক্তি। গুরু যথার্থই ভবরোগ-বৈদ্য

সহজ হইয়া দাঁড়ায় ও তাহাকে উচ্চতর ভাবসোপানে আরোহণ করিবার ক্ষমতা দেয়, তাহার এরূপে ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং প্রতিকূল বুঝিলে তাহা যাহাতে সাধকের অনিষ্টসাধন না করিয়া ধীরে ধীরে অপনীত হইয়া যায় তদ্বিষয়েরও ব্যবস্থা করেন, একথা পূর্ব্বে কিছুই জানা ছিল না। ঠাকুরকে প্রতিদিন ঐরূপ করিতে দেখিয়াই মনে সে কথার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। দেখিয়াছি—পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ হইলে অমনি ঠাকুর ব্যবস্থা করিতেছেন, 'তুই এখন কয়েক দিন কাহারও হাতে খাস্ নি, নিজে রেঁধে খাস্। এ অবস্থায় বড় জোর নিজের মার হাতে খাওয়া চলে, অপর কারও হাতে খেলেই ঐ ভাব নষ্ট হয়ে যায়। পরে ঐটে সহজ হয়ে দাঁড়ালে, তখন আর ভয় নেই।' গোপালের মার বায়ুবৃদ্ধিতে শারীরিক যন্ত্রণা দেখিয়া বলিতেছেন, "ও যে তোমার হরি-বাই, ও গেলে কি নিয়ে থাকবে? ও থাকা চাই; তবে যখন বিশেষ কষ্ট হবে, তখন যা হোক কিছু খেও।" জনৈক ভক্তের বাহ্যিক শৌচে অত্যন্ত অভ্যাস ও অনুরাগের জন্য শরীর ভুলিয়া মন একেবারে ঈশ্বরে তন্ময় হয় না দেখিয়া গোপনে ব্যবস্থা করিতেছেন, "লোকে যেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করে, সেইখানকার মাটিতে তুমি একদিন ফোঁটা পরে ঈশ্বরকে ডেকো।" একজনের সংকীর্ত্তনে উদ্দাম শারীরিক বিকার তাহার উন্নতির প্রতিকূল দেখিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন, "শালা, আমায় ভাব দেখাতে এসেছেন। ঠিক ঠিক ভাব হলে কখন এমন হয়?—ডুবে যায়; স্থির হয়ে যায়। ও কি? স্থির হ, শান্ত হয়ে যা। (অপর সকলকে লক্ষ্য

করিয়া) এ সব কেমন ভাব জান ? যেমন এক ছটাক দুধ কড়ায় করে আগুনে বসিয়ে ফোটাচ্চে ; মনে হচ্চে যেন কতই দুধ, এক কড়া ; তারপর নামিয়ে দেখ, একটুও নেই ; যেটুকু দুধ ছিল, সব কড়ার গায়েই লেগে গেছে।" একজনের মনোভাব বুঝিয়া বলিতেছেন, "যাঃ শালা, খেয়ে লে, পরে লে, সব করে লে, কিন্তু কোনটাই ধর্ম্ম কচ্চিস্ বলে করিস্ নি" ইত্যাদি কত লোকের কত কথাই বা বলিব !

ঐ যুবকের অবস্থা সম্বন্ধে ঠাকুরের মীমাংসা

সেই যুবককে দেখিয়াই এক্ষেত্রে ঠাকুর বলিলেন, "এ যে দেখ্‌ছি মধুর ভাবের[১] পূর্ব্বাভাস ! কিন্তু এ অবস্থা এর থাকবে না, রাখ্‌তে পারবে না। এ অবস্থা রক্ষা করা বড় কঠিন। স্ত্রীলোককে ছুঁলেই (কামভাবে) এ ভাব আর থাক্‌বে না। একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।" যাহা হউক, আগন্তুক ভক্তগণ ঠাকুরের কথায় যুবকটির যে মাথা খারাপ হয় নাই, এ বিষয়টি জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ফিরিলেন। তাহার পর কিছু কাল গত হইলে সংবাদ পাওয়া গেল—ঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে—যুবকটির কপাল ভাঙ্গিয়াছে ! সংকীর্ত্তনের ক্ষণিক উত্তেজনায় সে ভাগ্যক্রমে যত উচ্চে উঠিয়াছিল, হায় হায়—

১ বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধারাণীর যে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ঊনবিংশ প্রকার অষ্টসাত্ত্বিক শারীরিক বিকার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে প্রকাশ পাইত, যথা—হাস্য, ক্রন্দন, অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, মূর্চ্ছা ইত্যাদি—বৈষ্ণব-শাস্ত্রে উহাই মধুরভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মধুর ভাবের পরাকাষ্ঠাকেই মহাভাব বলে। ঐ মহাভাবেই নবিংশ প্রকার শারীরিক বিকার ঈশ্বর-প্রেমে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা জীবের সর্ব্বাঙ্গীণ হওয়া অসম্ভব বলিয়া কথিত আছে।

ভাবাবসাদে দুর্ভাগ্যক্রমে আবার ততই নিম্নে নামিয়াছে! পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ঐরূপ হইবার ভয়েই সর্ব্বদা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং ঐরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা দিতেন।

ঠাকুরের মথুরকে সকল বিষয় বালকের মত খুলিয়া বলা ও মতামত লওয়া

মথুরের যেমন 'বাবা'র নিকট কোন বিষয় গোপন ছিল না, 'বাবা'রও আবার মথুরের উপর ভাবসমাধির কাল ভিন্ন অপর সকল সময়ে, মাতার নিকট বালক যেমন, সখার নিকট সখা যেমন অকপটে সকল কথা খুলিয়া বলে, পরামর্শ করে, মতামত সাদরে গ্রহণ করে ও ভালবাসার উপর নির্ভর করে, তেমনি ভাব ছিল। পরাবিদ্যার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিলে মানবের অবস্থা যে উন্মাদ, পিশাচ বা বালকবৎ সাধারণ-নয়নে প্রতীত হইয়া থাকে, শাস্ত্রের একথা আমরা পাঠককে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, জগৎপূজ্য আচার্য্য শঙ্কর এ কথাও স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঐরূপ মানব অতুল রাজ-বৈভব উপভোগ করিয়া বা কৌপীনমাত্রৈক সম্বল ও ভিক্ষান্নে উদরপোষণ করিয়া ইতর-সাধারণে যাহাকে বড় সুখের অবস্থা বা বড় দুঃখের অবস্থা বলিয়া গণ্য করে, তাহার ভিতর থাকিয়াও কিছুতেই বিচলিত হন না; সর্ব্বদা আত্মানন্দে আপনাতে আপনি বিভোর হইয়া থাকেন।

> ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ
> ক্বচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।
> ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত
> শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ॥
>
> —বিবেকচূড়ামণি, ৫৪২

অর্থাৎ, 'মুক্ত ব্যক্তি কখন মূঢ়ের ন্যায়, আবার কখন পণ্ডিতের ন্যায়, আবার কখন বা রাজবৎ বিভবশালী হইয়া বিচরণ করেন। তাঁহাকে কখন পাগলের ন্যায়, আবার কখন ধীর, স্থির, বুদ্ধিমানের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। আবার কখনও বা তাঁহাকে নিত্যাবশ্যকীয় আহার্য্য প্রভৃতির জন্যও যাচ্ঞারহিত হইয়া অজগরের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখা যায়। তিনি কোথাও বা বহুমান প্রাপ্ত হন, আবার কোথাও বা অপমানিত হন, আবার কোথাও বা একেবারে অপরিচিত ভাবে থাকেন; এইরূপে সকল অবস্থায় তিনি পরমানন্দে বিভোর ও অবিচলিত থাকেন।' জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেই যখন ঐ কথা, তখন মহামহিম অবতার-পুরুষদিগের সর্ব্বাবস্থায় অবিচলিত থাকা ও বালকবৎ ব্যবহার করাটা আর অধিক কথা কি? অতএব মথুরের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু মথুরের তাঁহার সহিত ঐরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিয়া এত কাল কাটাইতে পারাটা বড় কম ভাগ্যের কথা নহে।

মথুরের কল্যাণের দিকে ঠাকুরের কতদূর দৃষ্টি ছিল

কি একটা মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুরের মথুরের সহিত ছিল! সাধনকালে এবং পরেও কখন কোন জিনিসের আবশ্যক হইলে, অমনি তাহা মথুরকে বলা ছিল। সমাধিকালে বা অন্য সময়ে যাহা কিছু দর্শনাদি ও ভাব উপস্থিত হইত, তাহা মথুরকে বলিয়া "এটা কেন হল, বল দেখি?" "ওটা তোমার মনে কি হয়—বল দেখি?" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা ছিল। তাহার পয়সার যাহাতে সদ্ব্যয় হয়, দেবসেবার পয়সাতে যাহাতে যথার্থ দেবসেবা হইয়া অতিথি,

কাঙ্গাল, সাধু-সন্ত প্রভৃতি পালিত হয় ও তাহার পুণ্যসঞ্চয় হইয়া কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে ঠাকুরের লক্ষ্য থাকিত। এইরূপ সকল বিষয়ে কত কথাই না আমরা শুনিয়াছি। পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও মথুরের শরীর যাইবার অনেক পরে যখন আমরা সকলে ঠাকুরের নিকট গিয়াছি, তখনও ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ঐ ভাবের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। একটি দৃষ্টান্ত দিলে এখানে মন্দ হইবে না।

ঐ বিষয়ক দৃষ্টান্ত—ফলহারিণী পূজার প্রসাদ ঠাকুরের চাহিয়া লওয়া

মথুরের আমল হইতে বন্দোবস্ত ছিল, ৺মা কালী ও ৺রাধা-গোবিন্দের ভোগ-রাগাদির পর বড় থালে করিয়া এক থাল প্রসাদী অন্নব্যঞ্জন ও এক থাল ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের ঘরে নিত্য আসিবে; ঠাকুর নিজে ও তাঁহার নিকট যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন তাঁহারা প্রসাদ পাইবেন। তদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে মা কালী ও রাধাগোবিন্দজীকে যে বিশেষ ভোগ-রাগাদি দেওয়া হইত, তাহারও কিয়দংশ ঐরূপে ঠাকুরের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত।

বর্ষাকাল। আজ ফলহারিণী পূজার দিন। এ দিনে ঠাকুর-বাড়ীতে বেশ একটি ছোট-খাট আনন্দোৎসব হইত। শ্রীশ্রীজগন্মাতা কালিকার বিশেষ পূজা করিয়া নানাপ্রকারের ফল-মূল ভোগ-নিবেদন করা হইত। আজও তদ্রূপ হইতেছে। নহবৎ বাজিতেছে। ঠাকুরের নিকট অদ্য যোগানন্দ স্বামীজি প্রভৃতি কয়েটি ভক্ত উপস্থিত আছেন।

বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে ঠাকুরের শরীর-মনে বিশেষ বিশেষ

দেবভাব প্রকাশিত হইত। বৈষ্ণবদিগের পর্ব্বদিনে বৈষ্ণবভাব এবং শাক্তদিগের পর্ব্বদিনে শক্তিসম্বন্ধীয় ভাবসমূহ প্রকাশিত হইত। যথা—শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময়, বিশেষতঃ ঐ পূজার সন্ধিক্ষণে, অথবা ৺কালীপূজাদিকালে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার ভাবে আবিষ্ট, নিস্পন্দ ও কখন কখন বরাভয়কর পর্য্যন্ত হইয়া যাইতেন; জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্বদিনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর ভাবে আরূঢ় হওয়ায় কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ তাঁহার শরীরে দেখা যাইত—এইরূপ। আবার ঐ ঐ ভাবাবেশ এত সহজে স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইত যে, উহা যে কোনরূপ বিশেষ চেষ্টার ফলে হইতেছে, একথা আদৌ মনে হইত না; বরং এমন দেখা গিয়াছে, ঐরূপ পর্ব্বদিনে ঠাকুর আমাদের সহিত অন্য নানা প্রসঙ্গে কথায় খুব মাতিয়াছেন, ঐ দিনে ঈশ্বরের যে বিশেষ লীলাপ্রকাশ হইয়াছিল, সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মন ঐ সকল বাহিরের ব্যাপার হইতে গুটাইয়া একেবারে ঈশ্বরের ঐ ভাবে যাইয়া তন্ময় হইয়া পড়িল! কে যেন জোর করিয়া ঐরূপ করাইয়া দিল! কলিকাতায় শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে আমরা ঐরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ একঘর লোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণে হঠাৎ ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ হইল! তখনকার সেই হাস্যচ্ছটায় বিকশিত জ্যোতিঃপূর্ণ তাঁহার মুখমণ্ডল ও তাহার পূর্ব্বক্ষণের অসুস্থতা-নিবন্ধন কালিমাপ্রাপ্ত বদন দেখিয়া

বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে ঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভাবসমাধির স্বভাবতঃ উদয়

কে বলিবে যে, ইনি সেই লোক—কে বলিবে ইহার কোন অসুস্থতা আছে!

অদ্যকার ফলহারিণী পূজার দিনেও ঠাকুরের শরীর-মনে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ ভাবাবেশ হইতেছে; কখন বা তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় মা-র নাম গাহিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া সে অপূর্ব্ব বদনশ্রীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন এবং সে অদৃষ্টপূর্ব্ব দেবমানবের সঙ্গগুণে মনে কতপ্রকার অপূর্ব্ব দিব্যভাব অনুভব করিতেছেন। মা-র পূজা সাঙ্গ হইতে প্রায় রাত্রি শেষ হইল। একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই প্রভাত।

বেলা প্রায় ৮।৯টার সময় ঠাকুর দেখিলেন যে, তাঁহার ঘরে যে প্রসাদী ফল-মূলাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা তখনও পৌঁছায় নাই। কালীঘরের পূজারী ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না; বলিলেন—"সমস্ত প্রসাদী দ্রব্য দপ্তরখানায় খাজাঞ্চী মহাশয়ের নিকট যথারীতি প্রেরিত হইয়াছে; সেখান হইতে সকলকে, যাহার যেমন পাওনা বরাদ্দ আছে, বিতরিত হইতেছে; কিন্তু এখানকার (ঠাকুরের) জন্য এখনও কেন আসে নাই, বলিতে পারি না।" রামলাল দাদার কথা শুনিয়াই ঠাকুর ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলেন। "কেন এখনও দপ্তরখানা হইতে প্রসাদ আসিল না?"—ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আর ঐ কথাই আলোচনা করেন! এইরূপে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন—তখনও আসিল না,

দেবভাব প্রকাশিত হইত। বৈষ্ণবদিগের পর্ব্বদিনে বৈষ্ণবভাব এবং শাক্তদিগের পর্ব্বদিনে শক্তিসম্বন্ধীয় ভাব-সমূহ প্রকাশিত হইত। যথা—শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময়, বিশেষতঃ ঐ পূজার সন্ধিক্ষণে, অথবা ৺কালী-পূজাদিকালে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার ভাবে আবিষ্ট, নিস্পন্দ ও কখন কখন বরাভয়কর পর্য্যস্ত হইয়া যাইতেন; জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্বদিনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর ভাবে আরূঢ় হওয়ায় কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ তাঁহার শরীরে দেখা যাইত—এইরূপ। আবার ঐ ঐ ভাবাবেশ এত সহজে স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইত যে, উহা যে কোনরূপ বিশেষ চেষ্টার ফলে হইতেছে, একথা আদৌ মনে হইত না; বরং এমন দেখা গিয়াছে, ঐরূপ পর্ব্বদিনে ঠাকুর আমাদের সহিত অন্য নানা প্রসঙ্গে কথায় খুব মাতিয়াছেন, ঐ দিনে ঈশ্বরের যে বিশেষ লীলাপ্রকাশ হইয়াছিল, সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মন ঐ সকল বাহিরের ব্যাপার হইতে গুটাইয়া একেবারে ঈশ্বরের ঐ ভাবে যাইয়া তন্ময় হইয়া পড়িল! কে যেন জোর করিয়া ঐরূপ করাইয়া দিল! কলিকাতায় শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে আমরা ঐরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ একঘর লোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণে হঠাৎ ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ হইল! তখনকার সেই হাস্যচ্ছটায় বিকশিত জ্যোতিঃপূর্ণ তাঁহার মুখমণ্ডল ও তাঁহার পূর্ব্বক্ষণের অসুস্থতা-নিবন্ধন কালিমাপ্রাপ্ত বদন দেখিয়া

বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে ঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভাবসমাধির স্বভাবতঃ উদয়

কে বলিবে যে, ইনি সেই লোক—কে বলিবে ইহার কোন অসুস্থতা আছে!

অদ্যকার ফলহারিণী পূজার দিনেও ঠাকুরের শরীর-মনে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ ভাবাবেশ হইতেছে; কখন বা তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় মা-র নাম গাহিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া সে অপূর্ব্ব বদনশ্রীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন এবং সে অদৃষ্টপূর্ব্ব দেবমানবের সঙ্গগুণে মনে কতপ্রকার অপূর্ব্ব দিব্যভাব অনুভব করিতেছেন। মা-র পূজা সাঙ্গ হইতে প্রায় রাত্রি শেষ হইল। একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই প্রভাত।

বেলা প্রায় ৮।৯টার সময় ঠাকুর দেখিলেন যে, তাঁহার ঘরে যে প্রসাদী ফল-মূলাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা তখনও পৌছায় নাই। কালীঘরের পূজারী ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না; বলিলেন—"সমস্ত প্রসাদী দ্রব্য দপ্তরখানায় খাজাঞ্চী মহাশয়ের নিকট যথারীতি প্রেরিত হইয়াছে; সেখান হইতে সকলকে, যাহার যেমন পাওনা বরাদ্দ আছে, বিতরিত হইতেছে; কিন্তু এখানকার (ঠাকুরের) জন্য এখনও কেন আসে নাই, বলিতে পারি না।" রামলাল দাদার কথা শুনিয়াই ঠাকুর ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলেন। "কেন এখনও দপ্তরখানা হইতে প্রসাদ আসিল না?"—ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আর ঐ কথাই আলোচনা করেন! এইরূপে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন—তখনও আসিল না,

তখন চটিজুতাটি পরিয়া নিজেই খাজাঞ্চীর নিকট আসিয়া উপস্থিত ! বলিলেন, "হ্যাগা, ও ঘরের (নিজের কক্ষ দেখাইয়া) বরাদ্দ পাওনা এখনও দেওয়া হয় নি কেন? ভুল হল নাকি? চিরকেলে মামুলি বন্দোবস্ত, এখন ভুল হয়ে বন্ধ হবে—বড় অন্যায় কথা!" খাজাঞ্চী মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন— "এখনও আপনার ওখানে পৌছায় নি? বড় অন্যায় কথা! আমি এখনি পাঠাইয়া দিতেছি।"

ঠাকুরের ঐরূপে প্রসাদ চাহিয়া লওয়ায় যোগানন্দ স্বামীর চিন্তা

স্বামী যোগানন্দ তখন বালক। সৎকুলে বনেদী সাবর্ণ চৌধুরীদের ঘরে জন্ম, কাজেই মনে বেশ একটু অভিমানও ছিল। ঠাকুরবাড়ীর খাজাঞ্চী, কর্ম্মচারী, পূজারী প্রভৃতিদের বড়-একটা মানুষ বলিয়াই বোধ হইত না। তবে ঠাকুরের ভালবাসায় ও অহেতুক কৃপায় তাঁহার শ্রীপদে মাথা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন; এবং রাসমণির বাগানের একপ্রকার পার্শ্বেই তাঁহাদের বাড়ী বলিলেও চলে; কাজেই ঠাকুরের নিকট নিত্য যাওয়া-আসার বেশ স্থবিধা। আর না যাইয়াই বা করেন কি? ঠাকুরের অদ্ভুত আকর্ষণ যে জোর করিয়া নিয়মিত সময়ে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু ঠাকুরকে মানেন বলিয়া কি আর ঠাকুরবাড়ীর লোকদের সঙ্গে প্রীতির সহিত আলাপ করা চলে? অতএব 'প্রসাদী ফল-মূলাদি কেন আসিল না' বলিয়া ঠাকুর ব্যস্ত হইলে তিনি বলিয়াই ফেলিলেন—"তা নাই বা এল মশায়, ভারি তো জিনিস! আপনার তো ও সকল পেটে সয় না, ওর কিছুই ত খান না—তখন নাই বা দিলে?" আবার ঠাকুর যখন তাঁহার

ঐরূপ কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া অল্পক্ষণ পরে নিজে খাজাঞ্চীকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইলেন, তখন যোগীন ভাবিতে লাগিলেন—'কি আশ্চর্য্য! ইনি আজ সামান্য ফল-মূল-মিষ্টান্নের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? যাঁকে কিছুতে বিচলিত হতে দেখে নি, তাঁর আজ এ ভাব কেন?' ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ কোনই কারণ না খুঁজিয়া পাইয়া শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন—'বুঝিয়াছি! ঠাকুরই হন, আর যত বড় লোকই হন, আকরে টানে আর কি! বংশানুক্রমে চাল-কলা-বাঁধা পূজারী ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, সে বংশের গুণ একটু না একটু থাকবে ত? তাই আর কি! বড় বড় বিষয়ে ব্যস্ত হন না, কিন্তু এ সামান্য বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন! তা নহিলে, নিজে ওসব থাবেন না, নিজের কোন দরকারেই লাগবে না, তবু তার জন্য এত ভাবনা কেন? বংশানুগত অভ্যাস!'

যোগীন বা যোগানন্দ স্বামীজি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি জানিস, রাসমণি দেবতার ভোগ হয়ে সাধু-সন্ত ভক্ত লোকে প্রসাদ পাবে বলে এতটা বিষয় দিয়ে গেছে। এখানে যা প্রসাদী জিনিস আসে, সে সব ভক্তেরাই খায়, ঈশ্বরকে জানবে বলে যারা সব এখানে আসে, তারাই খায়। এতে রাসমণির যে জন্য দেওয়া, তা সার্থক হয়। কিন্তু তার পর ওরা (ঠাকুরবাড়ীর বামুনেরা) যা সব নিয়ে যায়, তার কি

ঠাকুরের ঐরূপ করিবার কারণ-নির্দ্দেশ

ওরূপ ব্যবহার হয়? চাল বেচে পয়সা করে! কারু কারু আবার বেশ্যা আছে; ঐ সব নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ায়; এই সব করে। রাসমণির যে জন্য দান, তার কিছুও অন্ততঃ সার্থক হবে বলে এত করে ঝগড়া করি।" যোগীন স্বামীজি শুনিয়া অবাক্! ঠাকুরের এ কাজেরও এত গূঢ় অর্থ!

মথুরের সহিত ঠাকুরের অদ্ভুত সম্বন্ধ

এইরূপে কি একটা মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুর মথুরের সহিত পাতাইয়াছিলেন! মথুরের ভালবাসা ঘনীভূত হইয়া শেষে যে 'বাবা'-অন্ত প্রাণ হইয়াছিল, তাহা যে ঠাকুরের এইরূপ অহেতুক কৃপার ফলে, একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহার পর ঠাকুরের বালকবৎ অবস্থা মথুরকে কম আকর্ষণ করে নাই। সাংসারিক সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ বালকের প্রতি কাহার মন না আকৃষ্ট হয়? নিকটে থাকিলে—ক্রীড়া-মত্ততায় পাছে তাঁহার কোনও অনিষ্ট হয় বলিয়া ভয়চকিত নয়নে তাঁহার অকারণ-মধুর চেষ্টাদি দেখিতে ও তাঁহাকে রক্ষা করিতে কে না ত্রস্ত-ভাবে অগ্রসর হয়? আর ঠাকুরের বালকভাবটাতে তো আর কৃত্রিমতা বা ভানের লেশমাত্র ছিল না। যখন তিনি ঐ ভাবে থাকিতেন, তখন তাঁহাকে ঠিক ঠিক আত্মরক্ষণাসমর্থ বালক বলিয়াই বোধ হইত। কাজেই তেজীয়ান, বুদ্ধিমান মথুরের তাঁহাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করিবার স্বতঃই যে একটা চেষ্টার উদয় হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? অতএব একদিকে মথুর যেমন ঠাকুরের দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিতেন, অপরদিকে তেমনি আবার তিনি 'বাবা'কে অনভিজ্ঞ বালক জানিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিতে

প্রস্তুত থাকিতেন। সর্ব্বজ্ঞ গুরুভাব ও অল্পজ্ঞ বালকভাবের 'বাবা'তে এইরূপ বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া মথুর বোধ হয় মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, সাংসারিক সকল ব্যাপারে, এমন কি দেহরক্ষাদি-বিষয়েও তাঁহাকে, 'বাবা'কে রক্ষা করিতে হইবে; আর মানব-চক্ষু ও শক্তির অন্তরালে অবস্থিত সূক্ষ্ম পারমার্থিক ব্যাপারে 'বাবা'ই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। অতএব একই কালে দেব ও মানব, সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ মহাজটিল বিপরীত ভাবসমষ্টির অপরূপ সম্মিলনভূমি এ অদ্ভুত 'বাবা'র প্রতি মথুরের ভালবাসাটাও যে একটা জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল, একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ভাবমুখে অবস্থিত বরাভয়কর 'বাবা' মথুরের উপাস্য হইলেও, বালকভাবাবিষ্ট সরলতা ও নির্ভরতার ঘনমূর্ত্তি সেই 'বাবা'কেই আবার সময়ে সময়ে মথুরকে নানা কথায় ভুলাইতে ও বুঝাইতে হইত। 'বাবা'র জিজ্ঞাসিত বিষয়সকল বুঝাইবার উদ্ভাবনী শক্তিও মথুরের ভালবাসায় বেশ যোগাইত। মথুরের সহিত কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বহির্দ্দেশে গমন করিয়া 'বাবা' একদিন চিন্তায় মুখখানি শুষ্ক করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মথুরকে বলিলেন, "একি ব্যারাম হল, বল দেখি? দেখলুম, প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে শরীর থেকে যেন একটা পোকা বেরিয়ে গেল। শরীরের ভিতরে এমন তো কারুর পোকা থাকে না। আমার একি হল?" ইতিপূর্ব্বেই যে 'বাবা' হয়ত গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল অপূর্ব্ব সরলভাবে বুঝাইয়া মোহিত ও মুগ্ধ করিতেছিলেন, সেই 'বাবা'ই এখন বালকের ন্যায় নিষ্কারণ

মথুরের কামকীটের কথা বলিয়া বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে বুঝান

ভাবিয়া অস্থির!—মথুরের আশ্বাসবাক্য এবং বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছেন! মথুর শুনিয়াই বলিলেন, "ও তো ভালই হয়েছে, বাবা! সকলের অঙ্গেই কামকীট আছে। উহাই তাদের মনে নানা কুভাবের উদয় করে, কুকাজ করায়। মা-র কৃপায় তোমার অঙ্গ থেকে সেই কামকীট বেরিয়ে গেল! এতে এত ভাবনা কেন?" 'বাবা' শুনিয়াই বালকের ন্যায় আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ; ভাগ্‌গিস্ তোমায় একথা বল্লুম, জিজ্ঞাসা করলুম!" বলিয়া বালকের ন্যায় ঐ কথায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মথুরের সহিত ঠাকুরের ভক্তদিগের আগমনের কথা

কথায় কথায় একদিন 'বাবা' বলিলেন, "দেখ, মা সব আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এখানকার (ঠাকুরের নিজের) সব ঢের অন্তরঙ্গ আছে, তারা সব আস্‌বে, এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, শুনবে, প্রত্যক্ষ কর্‌বে; প্রেমভক্তি লাভ কর্‌বে; (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা দিয়ে মা অনেক খেলা খেল্‌বে, অনেকের উপকার কর্‌বে, তাই এ খোলটা এখনও ভেঙ্গে দেয় নি—রেখেছে। তুমি কি বল? এ সব কি মাথার ভুল, না ঠিক দেখেছি, বল দেখি?"

মথুর বলিলেন, "মাথার ভুল কেন হবে, বাবা? মা যখন তোমায় এ পর্য্যন্ত কোনটাই ভুল দেখান নাই, তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে; এখনও তারা সব দেরী কর্‌চে কেন? (অন্তরঙ্গ ভক্তেরা) শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসুক না, তাদের নিয়ে আনন্দ করি।"

'বাবা'ও বুঝিয়া গেলেন, মা ওসব ঠিক দেখাইয়াছেন। বলিলেন, "কি জানি বাবু, কবে তারা সব আস্‌বে; মা বলেছেন, দেখিয়েছেন; মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।"

ঠাকুরের বালকভাবের দৃষ্টান্ত—সুষনি শাক তোলার কথা

রাণী রাসমণির পুত্র ছিল না, চার কন্যা ছিল। মথুর বাবু তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয়া ও কনিষ্ঠাকে পর পর বিবাহ করিয়াছিলেন। অবশ্য একজনের মৃত্যু হইলে অপরকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জামাতাদিগের ভিতর বিষয় লইয়া পরে পাছে কোন গণ্ডগোল বাধে, এজন্য বুদ্ধিমতী রাণী স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে প্রত্যেকের ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়া যান। ঐরূপে বিষয়ভাগ হওয়ার পরে একদিন মথুর বাবুর পত্নী বা সেজগিন্নী অপরের ভাগের এক পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইয়া সুন্দর সুষনি শাক হইয়াছে দেখিয়া তুলিয়া লইয়া আসেন। কেবল ঠাকুর তাঁহার ঐ কার্য্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ কার্য্য দেখিয়াই ঠাকুরের মনে নানা তোলাপাড়া উপস্থিত। না বলিয়া ওরূপে অপরের বিষয় সেজগিন্নী লইয়া গেল—বড় অন্যায়! না বলিয়া ওরূপে লইলে যে চুরি করা হয় তাহা ভাবিল না। আর অপরের জিনিসে লোভ করা কেন বাবু?—ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐরূপ নানা কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় রাণীর যে কন্যার ভাগে ঐ পুষ্করিণী পড়িয়াছে, তাঁহার সহিত দেখা। অমনি ঠাকুর তাঁহার নিকট এ বিষয়ের আদ্যোপান্ত বলিলেন। তিনি শুনিয়া এবং সেজগিন্নী যেন কতই অন্যায় করিয়াছে বলিয়া ঠাকুরের ঐরূপ গম্ভীর ভাব

দেখিয়া হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'তাই তো বাবা, সেজ বড় অন্যায় করেছে।' এমন সময় সেজগিন্নীও তথায় আসিয়া উপস্থিত। তিনিও ভগ্নীর হাস্যের কারণ শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন, "বাবা, এ কথাটিও কি তোমার ওকে বলে দিতে হয়? আমি পাছে ও দেখতে পায় বলে লুকিয়ে শাকগুলি চুরি করে নিয়ে এলুম, আর তুমি কিনা তাই বলে দিয়ে আমাকে অপদস্থ করলে!" এই বলিয়া দুই ভগ্নীতে হাস্যের রোল তুলিলেন; তখন ঠাকুর বলিলেন, "তা, কি জানি বাবু, যখন বিষয় সব ভাগ-যোগ হয়ে গেল, তখন ওরূপে না বলে নেওয়াটা ভাল নয়; তাই বলে দিলুম যে, উনি শুনে যা হয় বোঝা-পড়া করুন।" রাণীর কন্যারা 'বাবা'র কথায় আরও হাসিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, বাবার কি সরল উদার স্বভাব!

এক পক্ষে 'বাবা'র এইরূপ বালকভাব—অপর দিকে আবার অন্য জমীদারের সহিত বিবাদে মথুরের হুকুমে লাঠালাঠি ও খুন হইয়া যাওয়ায় বিপদে পতিত মথুর আসিয়া 'বাবা'কে ধরিলেন, 'বাবা, রক্ষা কর।' 'বাবা' প্রথম চটিয়া মথুরকে নানা ভৎর্সনা করিলেন। বলিলেন, "তুই শালা রোজ একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে এসে বল্‌বি 'রক্ষা কর'—আমি কি কর্‌তে পারি রে শালা? যা, নিজে বুঝগে যা—আমি কি জানি?" তারপর মথুরের নির্ব্বন্ধে বলিলেন, "যা, মা-র ইচ্ছায় যা হয় হবে।" বাস্তবিকই সে বিপদ কাটিয়া গেল।

সাংসারিক বিপদে মথুরের ঠাকুরের শরণাপন্ন হওয়া

ঠাকুরের উভয় ভাবের পরিচায়ক এইরূপ কত দৃষ্টান্তই না বলা যাইতে পারে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই মথুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, বহুরূপী 'বাবা'র কৃপাতেই তাঁহার যাহা কিছু—ধন বল, মান বল, প্রতাপ বল, আর যা কিছুই বল। সুতরাং বাবাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলিয়া রাজসম্মান দেওয়া ও অচল ভক্তি-বিশ্বাস করাটা মথুরের পক্ষে একটা বিচিত্র ব্যাপার হয় নাই। বিষয়ী লোকের ভক্তির দৌড় ভক্তিভাজনের প্রতি অর্থ-ব্যয়েই বুঝিতে পারা যায়। তাহাতে আবার মথুর—সুচতুর হিসাবী বুদ্ধিমান্ বিষয়ী ব্যক্তি সচরাচর যেমন হইয়া থাকে—একটু কৃপণও ছিলেন। কিন্তু 'বাবা'র বিষয়ে মথুরের অকাতরে ধনব্যয় দেখিয়া তাঁহার ভক্তিবিশ্বাস যে বাস্তবিকই আন্তরিক ছিল, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। 'বাবা'কে যাত্রা শুনাইতে সাজ-গোজ পরাইয়া বসাইয়া, গায়কদের প্যালা বা পুরস্কার দিবার জন্য মথুর তাঁহার সামনে দশ দশ টাকার থাক্ করিয়া একেবারে একশত বা ততোধিক টাকা সাজাইয়া দিলেন। 'বাবা' যাত্রা শুনিয়া যাইতে যাইতে যেমনি কোন হৃদয়স্পর্শী গান বা কথায় মুগ্ধ ও ভাবাবিষ্ট হইলেন, অমনি হয় তো সে সমস্ত টাকাগুলিই একেবারে হাত দিয়া গায়কের দিকে ঠেলিয়া তাহাকে পুরস্কার দিয়া ফেলিলেন! মথুরের তাহাতে বিরক্তি নাই। 'বাবার যেমন উঁচু মেজাজ, তেমনি তাহার মতই প্যালা দেওয়া হইয়াছে' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আবার ঐরূপ টাকা সাজাইয়া দিলেন। ভাবমুখে অবস্থিত 'বাবা'—যিনি "টাকা মাটি, মাটি টাকা"

কৃপণ মথুরের ঠাকুরের জন্য অজস্র অর্থব্যয়ের দৃষ্টান্ত

করিয়া একেবারে লোভশূন্য হইয়াছেন—তাঁহার সম্মুখে উহা আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? আবার হয় তো ভাবতরঙ্গের উন্মাদ-বিহ্বলতায় আত্মহারা হইয়া সমস্ত টাকা এককালে দিয়া ফেলিলেন। পরে কাছে টাকা নাই দেখিয়া হয় তো গায়ের শাল ও পরনের বহুমূল্য কাপড় পর্য্যন্ত খুলিয়া দিয়া কেবল মাত্র ভাবাম্বর ধারণ করিয়া নিস্পন্দ সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। মথুর তাঁহার টাকার সার্থকতা হইল ভাবিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া 'বাবা'কে বীজন করিতে লাগিলেন।

ঐ বিষয়ক অন্যান্য দৃষ্টান্ত

কৃপণ মথুরের 'বাবা'র সম্বন্ধে এইরূপ উদারতার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। মথুর 'বাবা'কে সঙ্গে লইয়া ৺কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থপর্য্যটনে যাইয়া 'বাবা'র কথায় ৺কাশীতে 'কল্পতরু' হইয়া দান করিলেন; আবশ্যকীয় পদার্থ যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিলেন। 'বাবা'কে সে সময়ে কিছু চাহিতে অনুরোধ করায় 'বাবা' কিছুরই অভাব খুঁজিয়া পাইলেন না। বলিলেন, "একটি কমণ্ডলু দাও।" 'বাবা'র ত্যাগ দেখিয়া মথুরের চক্ষে জল আসিল।

ঠাকুরের ইচ্ছায় মথুরের বৈদ্যনাথে দরিদ্রসেবা

মথুরের সহিত কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থদর্শনে যাইবার কালে ৺বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় গ্রামবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়া 'বাবা'র হৃদয় একেবারে করুণায় পূর্ণ হইল। মথুরকে বলিলেন, "তুমি তো মা-র দেওয়ান। এদের এক মাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেট্‌টা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।" মথুর প্রথম একটু পেছ্‌পাও

হইলেন। বলিলেন, "বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখ্‌ছি অনেকগুলি লোক—এদের খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে পড়তে পারে। এ অবস্থায় কি বলেন?" সে কথা শুনে কে? বাবার তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব করুণার আবেশ হইয়াছে। বলিলেন, "দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।" এই বলিয়া বালকের ন্যায় গোঁ ধরিয়া দরিদ্রদের মধ্যে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার ঐরূপ করুণা দেখিয়া মথুর তখন কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া 'বাবা'র কথামত সকল কার্য্য করিলেন। 'বাবা'ও গ্রামবাসীদের আনন্দ দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে মথুরের সহিত ৺কাশী গমন করিলেন। শুনিয়াছি মথুরের সহিত রাণাঘাটের সন্নিহিত তাঁহার জমীদারীভুক্ত কোন গ্রামে অন্য এক সময়ে বেড়াইতে যাইয়া গ্রামবাসীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয়ে ঐরূপ করুণার আর একবার উদয় হইয়াছিল এবং মথুরের দ্বারা আর একবার ঐরূপ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন।

গুরুভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর এইরূপ মধুর সম্বন্ধে মথুরকে চিরকালের মত আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সাধনকালে এক সময়ে ঠাকুরের মনে যে অদ্ভুত ভাবের সহসা উদয় হইয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থনা করাইয়াছিল, "মা, আমাকে শুক্‌নো সাধু করিস্ নি, রসে বসে রাখিস্"—মথুরানাথের সহিত এই প্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব সম্বন্ধ তাহারই পরিণত ফলবিশেষ। কারণ

সেই প্রার্থনার ফলেই ৺জগন্মাতা ঠাকুরকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার দেহরক্ষাদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য চারিজন রসদ্দার তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে এবং মথুরানাথই তাঁহাদের ভিতর প্রথম ও অগ্রণী। দৈবনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ না হইলে কি এতকাল এ সম্বন্ধ এরূপ অক্ষুণ্ণভাবে কখন থাকিতে পারিত? হায় পৃথিবী, এরূপ বিশুদ্ধ মধুর সম্বন্ধ এতকাল কয়টাই বা তুমি নয়নগোচর করিয়াছ! আর বলি, হায় ভোগবাসনা, তুমি কি বজ্রবন্ধনেই না মানবমনকে বাঁধিয়াছ! এই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব অহেতুক ভালবাসার ঘনীভূত প্রতিমা এমন অদ্ভুত ঠাকুরকে দেখিয়া ও তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়া এখনও আমাদের মন তোমাকে ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহে না।

ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ দৈবনির্দ্দিষ্ট; ভোগবাসনা ছিল বলিয়া মথুরের পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে ঠাকুর

জনৈক বন্ধু ঠাকুরের নিজমুখ হইতে একদিন মথুরানাথের অপূর্ব্ব কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মহাভাগ্যের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত ও বিভোর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "(মৃত্যুর পর) মথুরের কি হল মশায়? তাকে নিশ্চয়ই বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না!" ঠাকুর শুনিয়া উত্তর করিলেন, "কোথাও একটা রাজা হয়ে জন্মেছে আর কি! ভোগবাসনা ছিল।" এই বলিয়াই ঠাকুর অন্য কথা পাড়িলেন।

অষ্টম অধ্যায়

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞ্র্ানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥ —গীতা, ১৫।১৫

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যিনি গুরু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বাল্যাবধিই তাঁহার ভিতর ঐ ভাবের পরিচয় বেশ পাওয়া গিয়া থাকে। মহাপুরুষ অবতারকুলের ত কথাই নাই। তাঁহাদের মধ্যে যিনি জনসমাজে যে ভাবপ্রতিষ্ঠার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, বাল্যাবধিই তাঁহাতে যেন ঐ ভাব প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরেন্দ্রিয়াদির পূর্ণতা, দেশকালাদি অবস্থাসকলের অনুকূলতা প্রভৃতি কারণসমূহ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের জীবনে ঐ ভাব পূর্ণ পরিস্ফুট হইবার সহায়তা করিতে পারে; কিন্তু ঐ সকল কারণই যে তাঁহাদের ভিতর ঐ ভাবের জন্ম দিয়া এ জীবনে তাঁহাদের গুরু করিয়া তুলে, তাহা নহে। দেখা যায়, উহা যেন তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি, উহা লইয়াই তাঁহারা যেন জীবন আরম্ভ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান জীবনে ঐ ভাবোৎপত্তির কারণানুসন্ধান করিলে সহস্র চেষ্টাতেও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

গুরুভাব অবতারপুরুষদিগের নিজস্ব সম্পত্তি

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবোৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে যাইলেও ঠিক এরূপ দেখা যায়। বাল্যে দেখ, যৌবনে দেখ, সাধনকালে দেখ, সকল সময়েই ঐ ভাবের অল্পাধিক বিকাশ তাঁহার জীবনে দেখিতে পাইয়া অবাক্ হইতে হয়; আর কিরূপে ঐ ভাবের প্রথম আরম্ভ তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইল, এ কথা ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। বাল্যজীবনের উল্লেখ এখানে করিয়া আমাদের পুঁথি বাড়াইতে ইচ্ছা নাই। তবে ঠাকুরের যৌবন এবং সাধনকাল, যে কালের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মথুর বাবুকে লইয়া কত প্রকার গুরুভাবের লীলার বিকাশ হইয়াছিল, সেই কালেরই অনেক কথা এখনও বলিতে বাকি আছে এবং তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিলে মন্দ হইবে না।

ঠাকুরের বহু গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ

মন্ত্রদাতা গুরু এক হইলেও উপগুরু বা শিক্ষাগুরু অনেক করা যাইতে পারে—এ বিষয়টি ঠাকুর অনেক সময়ে আমাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতের অবধূতোপাখ্যানের কথা তুলিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেন। ভাগবতে লেখা আছে, ঐ অবধূত ক্রমে ক্রমে চব্বিশ জন উপগুরুর নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা পর পর লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনেও আমরা ঐরূপে বিশেষ বিশেষ সাধনোপায় ও সত্যোপলব্ধির জন্য বহু গুরুগ্রহণের অভাব দেখি না। তন্মধ্যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী, 'ল্যাংটা' তোতাপুরী ও মুসলমান গোবিন্দের নামই আমরা অনেক সময় তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। অপরাপর হিন্দুসম্প্রদায়ের সাধনোপায়সমূহ অন্যান্য গুরুগণের নিকট

হইতে শিক্ষা করিলেও ঠাকুর তাঁহাদের নাম বড় একটা উল্লেখ করিতেন না। কেবলমাত্র বলিতেন যে, তিনি অন্যান্য গুরুগণের নিকট হইতে অন্যান্য মতের সাধন-প্রণালী জানিয়া লইয়া তিন তিন দিন মাত্র সাধন করিয়াই ঐ সকল মতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সকল গুরুগণের নাম ঠাকুরের মনে ছিল না অথবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে বলিয়াই ঠাকুর উল্লেখ করিতেন না, তাহা এখন বলা কঠিন। তবে এটা বুঝা যায় যে, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধও ঠাকুরের অতি অল্প কালের নিমিত্ত হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাদের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী বা 'বামনী'

ঠাকুরের শিক্ষাগুরুগণের ভিতর আবার ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকটে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। কত কাল, তাহা ঠিক নির্দ্দেশ করিয়া বলা সুকঠিন; কারণ, ঠাকুরের শ্রীচরণপ্রান্তে আমাদের আশ্রয়গ্রহণ করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন এবং পুনরায় আর ফিরিয়া আসেন নাই। ইহার পরে ঠাকুর তাঁহার আর একবার মাত্র সন্ধান পাইয়াছিলেন; তখন ঐ ব্রাহ্মণী ভৈরবী ৺কাশীধামে তপস্যায় কাল কাটাইতেছিলেন।[১]

ব্রাহ্মণী ভৈরবী যে বহুকাল দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে এবং তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতটে—যথা, দেবমণ্ডলের ঘাট প্রভৃতি স্থলে বাস করিয়াছিলেন, ইহা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে চৌষট্টিখানা প্রধান প্রধান তন্ত্রোক্ত যত কিছু সাধন-প্রণালী সকলই একে একে অনুষ্ঠান

১ সাধকভাব (১০ম সংস্করণ), ৩৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—প্রঃ

করাইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবমতসম্বন্ধীয় তন্ত্রাদিতেও সুপণ্ডিত ছিলেন; তবে ঠাকুরকে সখীভাব প্রভৃতি সাধনকালেও কোন কোন স্থলে সহায়তা করিয়াছিলেন কিনা, ঐ বিষয়ে কোন কথা স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই।[১] শুনিয়াছি যে ঠাকুরকে ঐরূপে সাধনকালে সহায়তা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পরেও তিনি কয়েক বৎসর, সর্ব্বশুদ্ধ কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর কাল, বহু সম্মানে দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়াছিলেন এবং ঐ কালের মধ্যে কখন কখন ঠাকুর এবং তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরে পর্য্যন্ত যাইয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যেও বাস করিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এই সময় হইতে ব্রাহ্মণীকে আপন শ্বশ্রূর ন্যায় সম্মান এবং মাতৃসম্বোধন করিতেন।

'বামনী'র ঠাকুরকে সহায়তা

ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবদিগের সাধন-প্রণালী অনুসরণ করিয়া সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাবসমূহের রসও কিছু কিছু নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে দেবমণ্ডলের ঘাটে অবস্থানকালে তিনি ঠাকুরের প্রতি বাৎসল্যরসে মুগ্ধ হইয়া ননী হস্তে লইয়া নয়নাশ্রুতে বসন সিক্ত করিতে করিতে 'গোপাল' 'গোপাল' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেন, আর এ দিকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে সহসা ঠাকুরের মন ব্রাহ্মণীকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত। শুনিয়াছি, তখন তিনি, বালক যেমন জননীর নিকট উপস্থিত হয়, তেমনি একছুটে ঐ এক মাইল পথ অতিক্রম

'বামনী'র বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত ভাবে অভিজ্ঞতা

১ সাধকভাব (১০ম সং), দ্বাদশ অধ্যায়, ২৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—প্রঃ

করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন এবং নিকটে বসিয়া ননী ভোজন করিতেন। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণীও কখন কখন কোথা হইতে যোগাড় করিয়া লাল বারাণসী চেলী ও অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার ভক্ষ্যভোজ্যাদি হস্তে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইয়া যাইতেন। ঠাকুর বলিতেন, তাঁহার আলুলায়িত কেশ এবং ভাববিহ্বল অবস্থা দেখিয়া তখন তাঁহাকে গোপালবিরহে কাতরা নন্দরাণী যশোদা বলিয়াই লোকের মনে হইত।

'বামনী'র রূপ-গুণ দেখিয়া মথুরের সন্দেহ

ব্রাহ্মণী গুণে যেমন, রূপেও তেমনি অসামান্যা ছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, মথুর বাবু প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণীর রূপলাবণ্য-দর্শনে এবং তাঁহার একাকিনী অসহায় অবস্থায় যথা তথা ভ্রমণাদি শুনিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। একদিন নাকি বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াও ফেলিয়াছিলেন, "ভৈরবী, তোমার ভৈরব কোথায়?" ব্রাহ্মণী তখন মা কালীর মন্দির হইতে দর্শনাদি করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন। হঠাৎ ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াও কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা রাগান্বিতা না হইয়া স্থিরভাবে মথুরের প্রতি প্রথম নিরীক্ষণ করিলেন, পরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পদতলে শবরূপে পতিত মহাদেবকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া মথুরকে দেখাইয়া দিলেন। সন্দিগ্ধমনা বিষয়ী মথুরও অল্পে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। বলিলেন, "ও ভৈরব তো অচল।" ব্রাহ্মণী তখন ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "যদি অচলকে সচল করিতেই না

পারিব তবে আর ভৈরবী হইয়াছি কেন ?” ব্রাহ্মণীর এইরূপ ধীর গম্ভীর ভাব ও উত্তরে মথুর লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। পরে দিন দিন তাঁহার উচ্চ প্রকৃতি ও অশেষ গুণের পরিচয় যতই পাইতে থাকিলেন, ততই মথুরের মনে আর ঐরূপ দুষ্ট সন্দেহ রহিল না।

'বামনী'র পূর্ব্বপরিচয়

ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিলেই 'বড় ঘরের মেয়ে' বলিয়া সকলের নিঃসংশয় ধারণা হইত। বাস্তবিকও তিনি তাহাই ছিলেন। কিন্তু কোন্ গ্রামে কাহার ঘর পুত্রীরূপে আলো করিয়াছিলেন, ঘরণীরূপে কাহারও ঘর কখনও উজ্জ্বল করিয়াছিলেন কি না এবং প্রৌঢ় বয়সে এইরূপে সন্ন্যাসিনী হইয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিবার ও সংসারে বীতরাগ হইবার কারণই বা কি হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠাকুরের নিকট হইতে কখনও শুনি নাই। আবার এত লেখাপড়াই বা শিখিলেন কোথায় এবং সাধনেই বা এত উন্নতিলাভ কোথায়, কবে করিলেন—তাহাও আমাদের কাহারও কিছুমাত্র জানা নাই।

ব্রাহ্মণী উচ্চদরের সাধিকা

সাধনে যে ব্রাহ্মণী বিশেষ উন্নতা হইয়াছিলেন, একথা আর বলিতে হইবে না। দৈবকর্ত্তৃক ঠাকুরের গুরুরূপে মনোনীত হওয়াতেই তাহার পরিচয় বিশেষরূপে পাওয়া যায়। আবার যখন ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই যোগবলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জীবৎকালে তাঁহাকে ঠাকুরপ্রমুখ তিন ব্যক্তিকে সাধনায়

সহায়তা করিতে হইবে এবং ঐ তিন ব্যক্তির সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে সাক্ষাৎ হইবামাত্র ব্রাহ্মণী তাঁহাদের চিনিয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন, তখন আর এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

'বামনী'র যোগলব্ধ দর্শন

ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই চন্দ্র ও গিরিজার কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "বাবা, তাদের দুজনকে ইহার পূর্ব্বেই পেয়েছি; আর তোমাকে এত দিন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেম, আজ পেলাম। তাদের সঙ্গে পরে তোমায় দেখা করিয়ে দেব।" বাস্তবিকও পরে ঐ দুই ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে আনিয়া ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সহিত দেখা করাইয়া দেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইঁহারা দুই জনেই উচ্চদরের সাধক ছিলেন। কিন্তু সাধনার পথে অনেকদূর অগ্রসর হইলেও ঈশ্বরের দর্শনলাভে সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। বিশেষ বিশেষ শক্তি বা সিদ্ধাই লাভ করিয়া পথভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণীর শিষ্য চন্দ্রের কথা

ঠাকুর বলিতেন, চন্দ্র ভাবুক ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন। তাঁহার 'গুটিকা-সিদ্ধি'-লাভ হইয়াছিল। মন্ত্রপূত গুটিকাটি অঙ্গে ধারণ করিয়া তিনি সাধারণ নয়নের দৃষ্টিবহির্ভূত বা অদৃশ্য হইতে পারিতেন এবং ঐরূপে অদৃশ্য হইয়া সযত্নে রক্ষিত, দুর্গম স্থানেও গমনাগমন করিতে পারিতেন। কিন্তু ঈশ্বরলাভের পূর্ব্বে ক্ষুদ্র মানব-মন ঐ প্রকার সিদ্ধাইসকল লাভ করিলেই যে অহঙ্কৃত হইয়া উঠে এবং অহঙ্কারবৃদ্ধিই যে মানবকে বাসনাজালে জড়িত করিয়া উচ্চ লক্ষ্যে

অগ্রসর হইতে দেয় না এবং পরিশেষে তাহার পতনের কারণ হয়, একথা আর বলিতে হইবে না। অহঙ্কারবৃদ্ধিতেই পাপের বৃদ্ধি এবং উহার হ্রাসেই পুণ্যলাভ, অহঙ্কারবৃদ্ধিতেই ধর্ম্মহানি এবং অহঙ্কারনাশেই ধর্ম্মলাভ, স্বার্থপরতাই পাপ এবং স্বার্থনাশই পুণ্য, " 'আমি' মলে ফুরায় জঞ্জাল"—এসব কথা ঠাকুর আমাদের বার বার কত প্রকারেই না বুঝাইতেন। বলিতেন, "ওরে, অহঙ্কারকেই শাস্ত্রে চিজ্জড়গ্রন্থি বলেছে; চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা এবং জড় অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি; ঐ অহঙ্কার এতদুভয়কে একত্রে বাঁধিয়া রাখিয়া মানব-মনে 'আমি দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদিবিশিষ্ট জীব'—এই ভ্রম স্থির করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বিষম গাঁটটা না কাটতে পারলে এগুনো যায় না। ঐটেকে ত্যাগ করতে হবে। আর মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, সিদ্ধাইগুলো বিষ্ঠাতুল্য হেয়। ওসকলে মন দিতে নেই। সাধনায় লাগলে ওগুলো কখন কখন আপনা আপনি এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু ওগুলোয় যে মন দেয়, সে ঐখানেই থেকে যায়, ভগবানের দিকে আর এগুতে পারে না।" স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানই জীবনস্বরূপ ছিল; খাইতে শুইতে বসিতে সকল সময়েই তিনি ঈশ্বরধ্যানে মন রাখিতেন, কতকটা মন সর্ব্বদা ভিতরে ঈশ্বরের চিন্তায় রাখিতেন। ঠাকুর বলিতেন তিনি 'ধ্যানসিদ্ধ।' ধ্যান করিতে করিতে সহসা একদিন তাঁহার দূরদর্শন ও শ্রবণের (বহু দূরে অবস্থিত ব্যক্তিসকল কি করিতেছে, বলিতেছে, ইহা দেখিবার ও শ্রবণ করিবার) ক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত। ধ্যান করিতে বসিয়া একটু ধ্যান জমিলেই মন এমন এক ভূমিতে

সিদ্ধাই যোগভ্রষ্টকারী

উঠিত যে, তিনি দেখিতেন অমুক ব্যক্তি অমুক বাটীতে বসিয়া অমুক প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা কাহতেছেন। ঐরূপ দেখিয়াই আবার প্রাণে ইচ্ছার উদয় হইত, যাহা দেখিলাম তাহা সত্য কি মিথ্যা, জানিয়া আসি। আর অমনি ধ্যান ছাড়িয়া তিনি সেই সেই স্থলে আসিয়া দেখিতেন, যাহা ধ্যানে দেখিয়াছেন তাহার সকলই সত্য, এতটুকু মিথ্যা নহে। কয়েক দিবস ঐরূপ হইবার পর ঠাকুরকে ঐ কথা বলিবামাত্র ঠাকুর বলিলেন, "ও সকল ঈশ্বরলাভ-পথের অন্তরায়। এখন কিছুদিন আর ধ্যান করিস্ নি।"

গুটিকাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রেরও অহঙ্কার বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, চন্দ্রের মনে ক্রমে কাম-কাঞ্চনাসক্তি বাড়িয়া যায় এবং এক অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া ঐ সিদ্ধাইপ্রভাবে তাহার বাটীতে যাতায়াত করিতে থাকেন এবং ঐরূপে অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার বৃদ্ধিতে ক্রমে ঐ সিদ্ধাইও হারাইয়া বসিয়া নানারূপে লাঞ্ছিত হন।

সিদ্ধাই-লাভে চন্দ্রের পতন

গিরিজারও অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ঠাকুর আমাদের বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, একদিন ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর নিকটবর্ত্তী শ্রীযুক্ত শম্ভু মল্লিকের বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। শম্ভু মল্লিক ঠাকুরকে বড়ই ভালবাসিতেন এবং ঠাকুরের কোনরূপ সেবা করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। শম্ভু বাবু ২৫০৲ দিয়া কালীবাড়ীর নিকট কিছু জমি খাজনা করিয়া লইয়া তাহার উপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর থাকিবার জন্য ঘর

'বামনী'র শিষ্য গিরিজার কথা

করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখন তখন গঙ্গাস্নান করিতে এবং ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে ঐ ঘরেই বাস করিতেন। ঐ স্থানে থাকিবার কালে এক সময়ে তিনি কঠিন রক্তামাশয় পীড়ায় আক্রান্তা হন; তখন শম্ভু বাবুই চিকিৎসা, পথ্যাদি সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শম্ভু বাবুর ভক্তিমতী পত্নীও ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতেন, প্রতি জয়মঙ্গলবারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এখানে থাকিলে তাঁহাকে লইয়া গিয়া দেবীজ্ঞানে পূজা করিতেন। এতদ্ভিন্ন শম্ভু বাবু ঠাকুরের কলিকাতায় গমনাগমনের গাড়ীভাড়া এবং খাদ্যাদির যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তাহাই যোগাইতেন। অবশ্য মথুর বাবুর শরীরত্যাগের পরই শম্ভু বাবু ঠাকুরের ঐরূপ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। শম্ভুকে ঠাকুর তাঁহার 'দ্বিতীয় রসদ্দার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন এবং তখন তখন প্রায়ই তাঁহার উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপে কয়েক ঘণ্টাকাল কাটাইয়া আসিতেন।

গিরিজার সহিত সেদিন শম্ভুবাবুর বাগানে বেড়াইতে যাইয়া কথায়-বার্ত্তায় অনেক কাল কাটিয়া গেল। ঠাকুর বলিতেন, "ভক্তদের গাঁজাখোরের মত স্বভাব হয়। গাঁজা-খোর যেমন গাঁজার কল্‌কেতে ভরপূর এক দম লাগিয়ে কল্‌কেটা অপরের হাতে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে—অপর গাঁজাখোরের হাতে ঐরূপে কল্‌কেটা না দিতে পারলে যেমন তার একলা নেশা করে সুখ হয় না, ভক্তে-রাও সেইরূপ একসঙ্গে জুটলে একজন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, ভাবে

গিরিজার সিদ্ধাই

৺শম্ভুচন্দ্র মল্লিক

তন্ময় হয়ে বলে ও আনন্দে চুপ করে এবং অপরকে ঐ কথা বলতে অবসর দেয় ও শুনে আনন্দ পায়।" সেদিন শম্ভু বাবু, গিরিজা ও ঠাকুর একসঙ্গে ঐরূপে মিলিত হওয়ায় কোথা দিয়া যে কাল কাটিতে লাগিল তাহা কেহই টের পাইলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা ও এক প্রহর রাত্রি হইল, তখন ঠাকুরের ফিরিবার হুঁশ হইল। শম্ভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিরিজার সহিত রাস্তায় আসিলেন এবং কালীবাটীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বেজায় অন্ধকার। পথের কিছুই দেখিতে না পাওয়ায় প্রতি পদে পদস্খলন ও দিক্‌ভুল হইতে লাগিল। অন্ধকারের কথা খেয়াল না করিয়া, ঈশ্বরীয় কথার ঝোঁকে চলিয়া আসিয়াছেন, শম্ভুর নিকট হইতে একটা লণ্ঠন চাহিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন—এখন উপায়? কোনরূপে গিরিজার হাত ধরিয়া হাতড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বেজায় কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ঐরূপ কষ্ট দেখিয়া গিরিজা বলিলেন, "দাদা, একবার দাঁড়াও, আমি তোমায় আলো দেখাইতেছি।"—এই বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে জ্যোতির একটা লম্বা ছটা নির্গত করিয়া পথ আলোকিত করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "সে ছটায় কালীবাটীর ফটক পর্য্যন্ত বেশ দেখা যাইতে লাগিল ও আমি আলোয় আলোয় চলিয়া আসিলাম।"

এই কথা বলিয়াই কিন্তু ঠাকুর আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "কিন্তু তাদের ঐরূপ ক্ষমতা আর বেশী দিন রইল না, এখানকার (তাঁহার নিজের) সঙ্গে কিছুদিন থাকতে থাকতে ঐ সকল সিদ্ধাই চলে গেল।" আমরা ঐরূপ হইবার কারণ

জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, (নিজের শরীর দেখাইয়া) "মা এর ভেতরে তাদের কল্যাণের জন্য তাদের সিদ্ধাই বা শক্তি আকর্ষণ করে নিলেন। আর ঐরূপ হবার পর তাদের মন আবার ঐ সব ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল।"

গুরুভাবে ঠাকুরের চন্দ্র ও গিরিজার সিদ্ধাই-নাশ

এই বলিয়াই ঠাকুর আবার বলিলেন, "ও-সকলে আছে কি? ও-সব সিদ্ধাইয়ের বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে চলে যায়। একটা গল্প শোন্—একজনের দুই ছেলে ছিল। বড়র যৌবনেই বৈরাগ্য হলো ও সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল। আর ছোট লেখা-পড়া শিখে ধার্ম্মিক বিদ্বান হয়ে বিবাহ করে সংসারধর্ম্ম করতে লাগ্‌লো। এখন সন্ন্যাসীদের নিয়ম—বার বৎসর অন্তে, ইচ্ছা হলে একবার জন্মভূমি দর্শন করতে যায়। ঐ সন্ন্যাসীও ঐরূপে বার বৎসর বাদে জন্মভূমি দেখ্‌তে আসে এবং ছোট ভায়ের জমী, চাষ-বাস, ধন-ঐশ্বর্য্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে তার নাম ধরে ডাকতে লাগল। নাম শুনে ছোট ভাই বাইরে এসে দেখে—তার বড় ভাই। অনেক দিন পরে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা—ছোট ভায়ের আর আনন্দের সীমা রইল না। দাদাকে প্রণাম করে বাড়ীতে এনে বসিয়ে তার সেবাদি করতে লাগল। আহারান্তে দুই ভায়ে নানা প্রসঙ্গ হতে লাগল। তখন ছোট বড়কে জিজ্ঞাসা করলে, 'দাদা, তুমি যে এই সংসারের ভোগ-সুখ সব ত্যাগ করে এতদিন সন্ন্যাসী হয়ে ফিরলে, এতে কি লাভ

সিদ্ধাই ভগবানলাভের অন্তরায়: ঐ বিষয়ে ঠাকুরের 'পায়ে হেঁটে নদী পারের' গল্প

কর্‌লে আমাকে বল।' শুনেই দাদা বললে, 'দেখ্‌বি? তবে আমার সঙ্গে আয়।'—বলেই ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর নিকটে নদীতীরে এসে উপস্থিত হল এবং 'এই দেখ্' বলেই নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে পরপারে চলে গেল। গিয়ে বললে, 'দেখ্‌লি?' ছোট ভাইও পার্শ্বে খেয়া নৌকার মাঝিকে আধ পয়সা দিয়ে নদী পেরিয়ে বড় ভায়ের নিকটে গিয়ে বললে, 'কি দেখ্‌লুম?' বড় বললে, 'কেন? এই হেঁটে নদী পেরিয়ে আসা?' তখন ছোট ভাই হেসে বললে, 'দাদা, তুমিও তো দেখলে—আমি আধ পয়সা দিয়ে এই নদী পেরিয়ে এলুম। তা তুমি এই বার বৎসর এত কষ্ট সয়ে এই পেয়েছ? আমি যা আধ পয়সায় অনায়াসে করি, তাই পেয়েছ? ও ক্ষমতার দাম তো আধ পয়সা মাত্র!' ছোটর ঐ কথায় বড় ভায়ের তখন চৈতন্য হয় এবং ঈশ্বরলাভে মন দেয়।"

ঐরূপে কথাচ্ছলে ঠাকুর কত প্রকারেই না আমাদের বুঝাইতেন যে, ধর্ম্মজগতে ঐ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষমতালাভ অতি তুচ্ছ, হেয়, অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। ঠাকুরের আর একটি গল্পও আমরা এখানে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না—"একজন যোগী যোগসাধনায় বাকসিদ্ধি লাভ করেছিল। যাকে যা বল্‌তো তাই তৎক্ষণাৎ হোত; এমন কি কাকেও যদি বল্‌ত 'মর্', তো সে অমনি মরে যেত, আবার যদি তখনি বল্‌ত 'বাঁচ', তো তখনি বেঁচে উঠত। একদিন ঐ যোগী পথে যেতে একজন ভক্ত সাধুকে দেখতে পেলে। দেখলে তিনি

সিদ্ধাইয়ে অহঙ্কার-বৃদ্ধি-বিষয়ে ঠাকুরের 'হাতী-মরা-বাঁচার' গল্প

সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম জপ ও ধ্যান কচ্ছেন। শুন্‌লে, ঐ ভক্ত সাধুটি ঐ স্থানে অনেক বৎসর ধরে তপস্যা কচ্ছেন। দেখে-শুনে অহঙ্কারী যোগী ঐ সাধুটির কাছে গিয়ে বললে, 'ওহে, এতকাল ধরে ত ভগবান ভগবান কর্‌চ, কিছু পেলে বল্‌তে পার?" ভক্ত সাধু বললেন, 'কি আর পাব বলুন। তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া ছাড়া আমার ত আর অন্য কোন কামনা নেই। আর তাঁকে পাওয়া তাঁর কৃপা না হলে হয় না। তাই পড়ে পড়ে তাঁকে ডাকৃচি, দীন হীন বলে যদি কোন দিন কৃপা করেন।' যোগী ঐ কথা শুনেই বললে, 'যদি নাই কিছু পেলে, তবে এ পণ্ডশ্রমের আবশ্যক? যাতে কিছু পাও তার চেষ্টা কর।' ভক্ত সাধুটি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বললেন, 'আচ্ছা মশায়, আপনি কি পেয়েছেন—শুন্‌তে পাই কি?' যোগী বললে, 'শুন্‌বে আর কি—এই দেখ।' এই বলে নিকটে বৃক্ষতলে একটা হাতী বাঁধা ছিল, তাকে বললে, 'হাতী, তুই মর্।' অমনি হাতীটা মরে পড়ে গেল। যোগী দম্ভ করে বললে, 'দেখ্‌লে? আবার দেখ।' বলেই মরা হাতীটাকে বললে, 'হাতী, তুই বাঁচ।' অমনি হাতীটা বেঁচে পূর্ব্বের ন্যায় গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল! যোগী বললে, 'কি হে, দেখলে তো?' ভক্ত সাধু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন; এখন বল্লেন, 'কি আর দেখলুম বলুন—হাতীটা একবার মলো, আবার বাঁচলো, কিন্তু বল্‌বেন কি, হাতীর ঐরূপ মরা-বাঁচায় আপনার কি এসে গেল? আপনি কি ঐরূপ শক্তিলাভ করে বার বার জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন? জরা-ব্যাধি কি আপনাকে ত্যাগ করেছে? না আপনার

অখণ্ড-সচ্চিদানন্দস্বরূপ দর্শন হয়েছে ?' যোগী তখন নির্ব্বাক হয়ে রইল এবং তার চৈতন্য হল।"

চন্দ্র[১] ও গিরিজা এইরূপে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় ঈশ্বরীয় পথে অনেকদূর অগ্রসর হইলেও সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই।

---

১ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাত্রা করেন। উহারই কিছুকাল পরে বেলুড় মঠে একদিন এক ব্যক্তি সহসা আসিয়া আপনাকে 'চন্দ্র' বলিয়া পরিচয় দেন এবং প্রায় মাসাবধিকাল তথায় বাস করেন। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন সর্ব্বদা মঠেই থাকিতেন। তাঁহার সহিত ঐ ব্যক্তির গোপনে অনেক কথাবার্ত্তাও হইতে দেখিয়াছি। শুনিয়াছি তিনি স্বামীজিকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেন —"আপনি কি এখানে কিছু টের পান? অর্থাৎ, ঠাকুরের জাগ্রত সত্তা কিছু অনুভব করেন?"—ইত্যাদি।

তিনি বলিতেন, ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তাহার সমুদয় কথাই সত্য ঘটিয়াছে। কেবল মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে দর্শন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ঐ কথাটিই সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে তাঁহার তখনও বাকি আছে। লোকটি মঠের ঠাকুরঘরে গিয়া প্রতিদিন অনেকক্ষণ অতি ভক্তির সহিত জপ-ধ্যান করিতেন। ঐ সময় তাঁহার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রুও পড়িত। ঠাকুরের সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইনি তৎসম্বন্ধে যাহা জানিতেন তাহা অতি আনন্দের সহিত বলিতেন। ইহাকে অতি শান্ত প্রকৃতির লোক বলিয়াই আমাদের বোধ হইয়াছিল। লোকটিকে সর্ব্বদা একস্থানে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে এবং সময়ে সময়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে দেখিয়া এক সময়ে একজন ইঁহাকে উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন—"মহাশয়ের কি আফিম খাওয়া অভ্যাস আছে?" উহাতে তিনি অতি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন—"আমি আপনাদের নিকট কি অপরাধে অপরাধী হইয়াছি যে ঐরূপ কথা বলিতেছেন?"

ঠাকুরঘরে যাইয়া প্রথম প্রণামকালে তিনি ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তিকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং ভাবে-প্রেমে আবিষ্ট হইয়া অজস্র নয়নাশ্রু বর্ষণ করেন। তাঁহাকে দেখিলে সাধারণ লোকের ন্যায়ই বোধ হইত। গৈরিক বা তিলকাদির আড়ম্বর ছিল না। পরিধানে সামান্য একখানি ধুতি ও উড়ানি এবং হাতে ছাতি ও একটি কাম্বিসের ব্যাগ মাত্র ছিল। ব্যাগের ভিতর আর একখানি

ঠাকুরের জ্বলন্ত দর্শনলাভ করিয়া এবং তাঁহার দিব্যশক্তিবলে অহঙ্কারের মূল ঐ সকল সিদ্ধাইয়ের নাশ হওয়াতেই তাঁহাদের ঐ বিষয়ের চৈতন্য হয় এবং দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় ঈশ্বরীয় পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

'বামনী'র নির্ব্বিকল্প অদ্বৈতভাব লাভ হয় নাই; তদ্বিষয়ে প্রমাণ

ভৈরবী ব্রাহ্মণী স্বয়ং সাধনে বহুদূর অগ্রসর হইলেও অখণ্ড সচ্চিদানন্দলাভে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত যে হন নাই, তাহারও পরিচয় আমরা বেশ পাইয়া থাকি। বেদান্তের শেষভূমি, নির্ব্বিকল্প অবস্থার অধিকারী 'ল্যাংটা' তোতাপুরী যখন ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে প্রথম আগমন করেন, তখন ঠাকুরের ব্রাহ্মণীর সহায়তায় তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে সিদ্ধিলাভ হইয়া গিয়াছে। তোতাপুরী ঠাকুরকে দেখিয়াই বেদান্ত-পথের অতি উত্তম অধিকারী বলিয়া চিনিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রদান করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিসাধনের বিষয় উপদেশ করেন, তখন ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে ঐ বিষয় হইতে নিরস্ত করিবার অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "বাবা, (ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে পুত্রজ্ঞানে ঐরূপ সম্বোধন করিতেন) ওর কাছে বেশী যাওয়া-আসা করো না, বেশী মেশামিশি করো

পরিধেয় ধুতি, গামছা ও বোধ হয় একটি জল খাইবার ঘটি মাত্র ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ঐরূপে প্রায়ই তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইঁহাকে বিশেষ আদর-সম্মান করিয়া মঠেই চিরকাল থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইনিও সম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, "দেশের জমীগুলোর একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া এখানে থাকিব।" কিন্তু তদবধি আর ঐ ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত মঠে আসেন নাই। প্রসঙ্গোক্ত চন্দ্র সম্ভবতঃ তিনিই হইবেন।

না; ওদের সব শুষ্ক পথ। ওর সঙ্গে মিশলে তোমার ঈশ্বরীয় ভাব-প্রেম সব নষ্ট হয়ে যাবে।” ইহাতেই বেশ অনুমিত হয় যে, বিদুষী ব্রাহ্মণী ভগবদ্ভক্তিতে অসামান্যা হইলেও একথা জানিতেন না বা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, বেদান্তোক্ত যে নির্ব্বিকল্প অবস্থাকে তিনি শুষ্কমার্গ বলিয়া নির্দ্দেশ ও ধারণা করিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থ পরাভক্তি-লাভের প্রথম সোপান,—শুদ্ধ-বুদ্ধ আত্মারাম পুরুষেরাই কেবলমাত্র ঈশ্বরকে সকল প্রকার হেতু-শূন্য হইয়া ভক্তি-প্রেম করিতে পারেন এবং ঠাকুর যেমন বলিতেন “শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান—দুইই এক পদার্থ।” আমাদের অনুমান, ব্রাহ্মণী একথা বুঝিতেন না এবং বুঝিবেন না বলিয়াই ঠাকুর মস্তক মুণ্ডিত করিয়া গৈরিক-ধারণ ও পুরী স্বামীজির নিকট হইতে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প সমাধি-সাধনের সময় নিজ গর্ভধারিণী মাতার নিকট যেমন উহা গোপন করিয়াছিলেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিকটেও তেমনি ঐ বিষয় গোপন রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুরের বৃদ্ধা মাতা ঐ সময়ে দক্ষিণেশ্বরের উত্তর দিকের নহবৎখানার উপরে থাকিতেন এবং ঠাকুর ঐরূপে বেদান্তসাধনকালে তিন দিন গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সকলের চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিয়াছিলেন। কেবল পুরী গোস্বামী মাত্র ঐ সময়ে তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে গমনাগমন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ঠাকুর ব্রাহ্মণীর ঐ কথায় কর্ণপাতও করেন নাই।

ঠাকুরের মুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তন্ত্রোক্ত বীরভাবের উপাসিকা ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তন্ত্রে

পশু, বীর ও দিব্য এই তিন ভাবে ঈশ্বরসাধনার পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। পশুভাবের সাধকে কাম-ক্রোধাদি পশুভাবের আধিক্য থাকে; সেজন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে থাকিবেন এবং বাহ্যিক শৌচাচার প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ভগবানের নামজপ, পুরশ্চরণাদিতে প্রবৃত্ত থাকিবেন। বীর-ভাবের সাধকে কাম-ক্রোধাদি পশুভাবের অপেক্ষা ঈশ্বরানুরাগ প্রবল থাকে। কাম-কাঞ্চন, রূপ-রসাদির আকর্ষণ তাঁহার ভিতর ঈশ্বরানুরাগকেই প্রবলতর করিয়া দেয়। সেজন্য তিনি কাম-কাঞ্চনাদির প্রলোভনের ভিতর বাস করিয়া উহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে অবিচলিত থাকিয়া ঈশ্বরে সমগ্র মন-প্রাণ অর্পণ করিতে চেষ্টা করিবেন। দিব্যভাবের সাধক কেবলমাত্র তিনিই হইতে পারেন, যাঁহাতে ঈশ্বরানুরাগের প্রবল প্রবাহে কাম-ক্রোধাদি একেবারে চিরকালের মত ভাসিয়া গিয়াছে এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় যাঁহাতে ক্ষমার্জ্জব-দয়া-তোষ-সত্যাদি সদ্‌গুণসমূহের অনুষ্ঠান স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোটামুটি বলিতে গেলে ঐ তিন ভাব সম্বন্ধে ইহাই বলা যায়। বেদান্তোক্ত উত্তম অধিকারীই তন্ত্রোক্ত দিব্যভাবের ভাবুক; মধ্যম অধিকারীই বীরভাবের এবং অধমাধিকারীই পশুভাবের সাধক।

তন্ত্রোক্ত পশু, বীর ও দিব্যভাব-নির্ণয়

বীরভাবের সাধকাগ্রণী হইলেও ভৈরবী ব্রাহ্মণী তখনও দিব্যভাবের অধিকারিণী হইতে পারেন নাই। ঠাকুরের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সহায়তালাভ করিয়াই ব্রাহ্মণীর ক্রমে দিব্যভাবের অধিকারলাভের বাসনা আসিয়া উপস্থিত হয়।

ব্রাহ্মণী দেখিলেন—গ্রহণের কথা দূরে থাকুক, সিদ্ধি বা কারণের নাম মাত্রেই ঠাকুর জগৎকারণ-ঈশ্বরভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন; সতী বা নটী কোন স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিবামাত্রই তাঁহার মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার হ্লাদিনী ও সন্ধিনী শক্তির কথার উদয় হইয়া তাঁহাতে সন্তানভাবই আনিয়া দেয় এবং কাঞ্চনাদি-ধাতুসংস্পর্শে সুপ্তাবস্থায়ও তাঁহার হস্তাদি অঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এ জলন্ত পাবকের নিকট থাকিয়া কাহার না ঈশ্বরানুরাগ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে? কে না এই দুই দিনের বিষয়-বিভবাদির প্রতি বীতরাগ হইয়া ঈশ্বরকেই আপনার হইতে আপনার, চিরকালের আত্মীয় বলিয়া ধারণা না করিয়া থাকিতে পারে? এজন্যই ব্রাহ্মণীর জীবনের অবশিষ্টকাল তীব্র তপস্যায় কাটাইবার কথা আমরা শুনিতে পাইয়া থাকি।

বীরসাধিকা 'বামনী' দিব্যভাবের অধিকারিণী হইতে তখনও সমর্থা হয় নাই

ঠাকুর অপর কাহারও সহিত বেশী মেশামিশি করিলে বা অন্য কোন ঈশ্বরভক্ত সাধককে অধিক সম্মান প্রদর্শন করিলে ব্রাহ্মণীর মনে হিংসার উদয় হইত, একথাও আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ন্যাওটো ছেলে বড় হইয়া বাটীর অপর কাহাকেও ভালবাসিলে বা আদর-যত্ন করিলে তাহার ঠাকুরমা বা অন্য কোন-বৃদ্ধা আত্মীয়ার (যাহার নিকটে সে এতদিন পালিত হইয়া আসিয়াছে) মনে যেরূপ ঈর্ষা, দুঃখ ও কষ্ট উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণীরও ঠাকুরের প্রতি ঐ ভাব যে সেই প্রকারের, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু ব্রাহ্মণীর ন্যায় অত উচ্চদরের সাধিকার

ঐ বিষয়ে প্রমাণ

মনে ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল না। যিনি ঠাকুরকে খাইতে, শুইতে, বসিতে, দিবারাত্র চব্বিশঘণ্টা এতকাল ধরিয়া সকল অবস্থায় সকল ভাবে দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাঁহার ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল না। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ঠাকুরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাদি অপরের ন্যায় 'এই আছে এই নাই' গোছের ছিল না। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ঠাকুর তাঁহার উপর যে ভক্তি-শ্রদ্ধা একবার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা চির-কালের মতই অর্পিত হইয়াছিল—তাহাতে আর জোয়ার-ভাঁটা খেলিত না। কিন্তু হায়, মায়িক ভালবাসা ও স্ত্রীলোকের মন, তোমরা সর্ব্বদাই ভালবাসার পাত্রকে চিরকালের মত বাঁধিয়া নিজস্ব করিয়া রাখিতে চাও। এতটুকু স্বাধীনতা তাহাকে দিতে চাও না। মনে কর, স্বাধীনতা পাইলেই তোমাদের ভালবাসার পাত্র আর তোমাদের থাকিবে না, অপর কাহাকেও তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া ফেলিবে। তোমরা বুঝ না যে, তোমাদের অন্তরের দুর্ব্বলতাই তোমাদিগকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া দেয়। তোমরা বুঝ না যে, যে ভালবাসা ভালবাসার পাত্রকে স্বাধীনতা দেয় না—যাহা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া সে যাহা চাহে তাহাতে আনন্দানুভব করিতে জানে না বা শিখে না, তাহা প্রায়ই স্বল্পকালে বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব যদি যথার্থই কাহাকেও প্রাণের ভালবাসা দিয়া থাক, তবে নিশ্চিন্ত থাকিও, তোমার ভালবাসার পাত্র তোমারই থাকিবে এবং ঐ শুদ্ধ স্বার্থ-সম্পর্কশূন্য ভালবাসা শুধু তোমাকে নহে, তাহাকেও চরমে ঈশ্বর-দর্শন ও সর্ব্ববন্ধনবিমুক্তি পর্য্যন্ত আনিয়া দিবে।

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

ব্রাহ্মণী উচ্চদরের প্রেমিক সাধিকা হইলেও যে পূর্ব্বোক্ত কথাটি বুঝিতেন না, বা বুঝিয়াও ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিকই তাঁহার ঐ ধারণার অভাব ছিল; এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুরুপদে ভাগ্যক্রমে বৃত হইয়া 'তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাঁহার কথা সকলে সর্ব্বদা মানিয়া চলুক, না চলিলে তাহাদের কল্যাণ নাই'—এই প্রকার ভাবসমূহও তাঁহার মনে ধীরে-ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। আমরা শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে যে কখন কখন শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহাতেও তিনি ঈর্ষান্বিতা হইতেন। শুনিয়াছি, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁহার ঐ প্রকার ভাবপ্রকাশে সর্ব্বদা ভীতা, সঙ্কুচিতা হইয়া থাকিতেন। যাহা হউক, পরিশেষে ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণী তাঁহার মনের এই দুর্ব্বলতার কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন, এ অবস্থায় ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে থাকিলেই তবে তিনি তাঁহার এই মনোভাব-জয়ে সমর্থা হইবেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের প্রতি তাঁহার এই প্রকার আকর্ষণ সোনার শিকলে বন্ধনের ন্যায় হইলেও, উহা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা বেশ বুঝিতে পারি, এজন্যই ব্রাহ্মণী পরিশেষে দক্ষিণেশ্বর ও ঠাকুরের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং 'রম্‌তা সাধু ও বহ্‌তা জল কখন মলিন হয় না'[১] ভাবিয়া অসঙ্গ হইয়া তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন ও তপস্যায়

ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণীর নিজ আধ্যাত্মিক অভাব-বোধ ও তপস্যা করিতে গমন

১. সংসারবিরাগী সাধুদিগের ভিতর প্রচলিত একটি উক্তি। 'রম্‌তা'—অর্থাৎ

কালাতিপাত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের গুরুভাবসহায়েই যে ব্রাহ্মণীর এইপ্রকার চৈতন্যের উদয় হয়, ইহা আর বলিতে হইবে না।

তোতাপুরী গোস্বামীর কথা

তোতাপুরী লম্বা-চওড়া সুদীর্ঘ পুরুষ ছিলেন। চল্লিশ বৎসর ধ্যান-ধারণা এবং অসঙ্গভাবে বাস করিবার ফলে তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মন স্থির, বৃত্তিমাত্রহীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তত্রাপি তিনি নিত্য ধ্যানানুষ্ঠান এবং সমাধিতে অনেককাল কাটাইতেন। সর্ব্বদা বালকের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে 'ল্যাংটা' নামে নির্দ্দেশ করিতেন। বিশেষতঃ আবার গুরুর নাম সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে নাই, বা নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে নাই বলিয়াই বোধ হয় ঐরূপ করিতেন। ঠাকুর বলিতেন, 'ল্যাংটা' কখন ঘরের ভিতর থাকিতেন না এবং নাগাসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদা অগ্নিসেবা করিতেন। নাগা-সাধুরা অগ্নিকে মহা পবিত্রভাবে দর্শন করে এবং সেজন্য যেখানেই যখন থাকুক না কেন, কাষ্ঠাহরণ করিয়া নিকটে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখে। ঐ অগ্নি সচরাচর 'ধুনি' নামে অভিহিত হয়। নাগা সাধু ধুনিকে সকাল সন্ধ্যা আরতি করিয়া থাকে এবং ভিক্ষালব্ধ আহার্য্য-সমুদয় প্রথমে ধুনিরূপী অগ্নিকে নিবেদন করিয়া তবে স্বয়ং গ্রহণ করে। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে 'ল্যাংটা' সেজন্য

নিরন্তর যিনি একস্থানে না থাকিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, এই প্রকার সাধুতে এবং যে জলে প্রবাহ বা নিরন্তর স্রোত বহিতেছে, এইরূপ জলে কখনও মলিনতা দাঁড়াইতে পারে না। নিত্যপর্য্যটনশীল সাধুর মন কখনও কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে আসক্ত হয় না, ইহাই অর্থ।

পঞ্চবটীর বৃক্ষতলেই আসন করিয়া অবস্থান করিতেন এবং পার্শ্বে ধুনি জ্বালাইয়া রাখিতেন। রৌদ্র হউক, বর্ষা হউক 'ল্যাংটার' ধুনি সমভাবেই জ্বলিত। আহার বল, শয়ন বল 'ল্যাংটা' ঐ ধুনির ধারেই করিতেন। আর যখন গভীর নিশীথে সমগ্র বাহ্যজগৎ বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে সকল চিন্তা ভুলিয়া মাতৃ-ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় সুখশয়ন লাভ করিত, 'ল্যাংটা' তখন উঠিয়া ধুনি অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া অচল অটল সুমেরুবৎ আসনে বসিয়া নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির মনকে সমাধিমগ্ন করিতেন। দিনের বেলায়ও 'ল্যাংটা' অনেক সময় ধ্যান করিতেন, কিন্তু লোকে না জানিতে পারে এমন ভাবে করিতেন। সেজন্য পরিধেয় চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ধুনির ধারে শবের ন্যায় লম্বা হইয়া 'ল্যাংটা'কে শয়ন করিয়া থাকিতে অনেক সময় দেখা যাইত। লোকে মনে করিত, 'ল্যাংটা' নিদ্রা যাইতেছেন।

ল্যাংটা' নিকটে একটি জলপাত্র বা 'লোটা', একটি সুদীর্ঘ চিম্‌টা এবং আসন করিয়া বসিবার জন্য একখণ্ড চর্ম্মমাত্র রাখিতেন এবং একখানি মোটা চাদরে সর্ব্বদা স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া থাকিতেন। লোটা ও চিম্‌টাটি 'ল্যাংটা' নিত্য মাজিয়া ঝক্‌ঝকে রাখিতেন। 'ল্যাংটা'র ঐরূপ নিত্য ধ্যানানুষ্ঠান দেখিয়া ঠাকুর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিলেন, "তোমার ত ব্রহ্মলাভ হয়েছে, সিদ্ধ হয়েছ, তবে কেন আবার নিত্য ধ্যানাভ্যাস কর?" 'ল্যাংটা' ইহাতে ধীরভাবে ঠাকুরের

ঠাকুর ও পুরী গোস্বামীর পরস্পর ভাব-আদান-প্রদানের কথা

দিকে চাহিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া লোটাটি দেখাইয়া বলিলেন, "কেমন উজ্জ্বল দেখ্‌ছ? আর যদি নিত্য না মাজি?—মলিন হয়ে যাবে, না? মনও সেইরূপ জানবে। ধ্যানাভ্যাস করে মনকেও ঐরূপে নিত্য না মেজে-ঘসে রাখলে মলিন হয়ে পড়ে।" তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর 'ল্যাংটা' গুরুর কথা মানিয়া লইয়া বলিলেন, "কিন্তু যদি সোনার লোটা হয়? তা হলে তো আর নিত্য না মাজলেও ময়লা ধরে না।" 'ল্যাংটা' হাসিয়া স্বীকার করিলেন, "হাঁ, তা বটে।" নিত্য ধ্যানাভ্যাসের উপকারিতা সম্বন্ধে 'ল্যাংটা'র কথাগুলি ঠাকুরের চিরকাল মনে ছিল এবং বহুবার তিনি উহা 'ল্যাংটা'র নাম করিয়া আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। আর আমাদের ধারণা—ঠাকুরের 'সোনার লোটায় ময়লা ধরে না' কথাটি 'ল্যাংটা'র মনেও চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। 'ল্যাংটা' বুঝিয়াছিল, ঠাকুরের মন বাস্তবিকই সোনার লোটার মত উজ্জ্বল। গুরু-শিষ্যে এইরূপ আদান-প্রদান ইঁহাদের ভিতরে প্রথমাবধিই চলিত।

বেদান্তশাস্ত্রে আছে—ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মানুষ একেবারে ভয়শূন্য হয়; সম্পূর্ণ অভীঃ হইবার উহাই একমাত্র পথ। বাস্তবিক কথা।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নির্ভীকতা ও বন্ধনবিমুক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র

যিনি জানিতে পারেন যে, তিনি স্বয়ং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাব, অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী অজরামর আত্মা, তাঁহার মনে ভয় কিসে, কাহারই বা দ্বারা হইবে? যিনি এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু বা ব্যক্তি জগতে নাই—ইহা সত্য সত্যই দেখিতে পান, সর্ব্বদা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, তাঁহার ভয় কি করিয়া, কোথায়ই বা

হইবে? খাইতে, শুইতে, বসিতে, নিদ্রায়, জাগরণে, সর্ব্বাবস্থায়, সকল সময়ে তিনি দেখেন—তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ; সকলের ভিতর, সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা তিনি পূর্ণ হইয়া আছেন; তাঁহার আহার নাই, বিহার নাই, নিদ্রা নাই, জাগরণ নাই, অভাব নাই, আলস্য নাই, শোক নাই, হর্ষ নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই—মানব পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধি সহায়ে যাহা কিছু দেখে, শুনে, চিন্তা বা কল্পনা করে, তাহার কিছুই নাই। এই প্রকার অনুভবকেই শাস্ত্র 'নেতি নেতি'র বিরামাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহারই পরে পূর্ণস্বরূপ আত্মার অবস্থান ও প্রত্যক্ষদর্শন বলিয়াছেন। এই আত্মদর্শন সদা-সর্ব্বক্ষণ হওয়ার নামই 'জ্ঞানে অবস্থান' এবং এই প্রকার জ্ঞানে অবস্থান হইলেই সর্ব্ববন্ধনবিমুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠাকুর বলিতেন—এই প্রকার জ্ঞানে অবস্থান সম্পূর্ণরূপে হইলে জীবের শরীর একুশ দিন মাত্র থাকিয়া শুষ্ক পত্রের ন্যায় পড়িয়া যায় বা নষ্ট হইয়া যায় এবং আর সে এ সংসারের ভিতর অহং-জ্ঞান লইয়া ফিরিয়া আসে না। জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের মধ্যে মধ্যে স্বল্পকালের নিমিত্ত এই জ্ঞানে অবস্থান ও আত্মার দর্শন হইতে হইতে পরিশেষে পূর্ণ অবস্থান ও দর্শন আসিয়া উপস্থিত হয়। আর নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটি পুরুষ, যাঁহারা কোন বিশেষ সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুজনের কল্যাণসাধন করিতেই জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাও বাল্যাবধি মধ্যে মধ্যে স্বল্পকালের জন্য এই জ্ঞানে অবস্থান করেন এবং যে কর্ম্মের জন্য আসিয়াছেন, সেই কর্ম্ম শেষ হইলে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানস্বরূপে

অবস্থান করেন। আবার, যাঁহাদের অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিয়া জগৎ এ পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারে নাই—তাঁহারা ঈশ্বর স্বয়ং মানব-কল্যাণের নিমিত্ত মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, অথবা অত্যদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন মানব; সেই অবতার পুরুষেরা এই পূর্ণ জ্ঞানাবস্থায় বাল্যাবধি ইচ্ছামাত্র উঠিতে, যতকাল ইচ্ছা থাকিতে এবং পুনরায় ইচ্ছামত লোককল্যাণের নিমিত্ত জন্ম-জরা-শোক-হর্ষাদির মিলনভূমি সংসারে আসিতে পারেন। ঠাকুরের শিক্ষাগুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী চল্লিশ বৎসর কঠোর সাধনার ফলে পূর্ব্বোক্ত জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহার আহার বিহার, শয়ন উপবেশন প্রভৃতি সকল কার্য্যই মানব-সাধারণের ন্যায় ছিল না। নিত্যমুক্ত বায়ুর ন্যায় তিনি বাধাশূন্য হইয়া যত্র তত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন; বায়ুর ন্যায়ই তাঁহাকে সংসারের দোষ-গুণ কখনও স্পর্শ করিতে পারিত না এবং বায়ুর ন্যায়ই তিনি কখন একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কারণ ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, তোতা তিন দিনের অধিক কোথাও অবস্থান করিতে পারিতেন না। ঠাকুরের অদ্ভুতাকর্ষণে কিন্তু তোতা দক্ষিণেশ্বরে একাদিক্রমে এগার মাস কাল অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তিই ছিল!

তোতাপুরীর উচ্চ অবস্থা

তোতার নির্ভীকতা সম্বন্ধে ঠাকুর অনেক কথা আমাদের বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি ভুতুড়ে ঘটনাও বলেন; তাহা এই—গভীর নিশীথে তোতা একদিন ধুনি উজ্জ্বল করিয়া ধ্যানে

বসিবার উপক্রম করিতেছেন ; জগৎ নীরব, নিস্তব্ধ ; ঝিল্লী ও মধ্যে মধ্যে মন্দির-চূড়ায় অবস্থিত পেচকের গম্ভীর নিঃস্বন ভিন্ন আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। বায়ুরও সঞ্চার নাই। সহসা পঞ্চবটীর বৃক্ষশাখাসকল আলোড়িত হইতে লাগিল এবং দীর্ঘাকার মানবাকৃতি এক পুরুষ বৃক্ষের উপর হইতে নিম্নে নামিয়া তোতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ধীর পদবিক্ষেপে পুরী গোস্বামীর ধুনির পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। 'ল্যাংটা' নিজেরই ন্যায় উলঙ্গ সেই পুরুষপ্রবরকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি ?' পুরুষ উত্তর করিলেন, 'আমি দেবযোনি, ভৈরব ; এই দেবস্থানরক্ষার নিমিত্ত বৃক্ষোপরি অবস্থান করি।' 'ল্যাংটা' কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, 'উত্তম কথা ; তুমিও যা, আমিও তাই—তুমিও ব্রহ্মের এক প্রকাশ, আমিও তাই ; এস, বস, ধ্যান কর।' পুরুষ হাসিয়া বায়ুতে যেন মিলাইয়া গেলেন। 'ল্যাংটা'ও ঐ ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ধ্যানে মনো-নিবেশ করিলেন। পরদিন প্রাতে 'ল্যাংটা' ঠাকুরকে ঐ ঘটনা বলেন। ঠাকুরও শুনিয়া বলিলেন, "হাঁ, উনি ঐখানে থাকেন বটে ; আমিও উঁহার দর্শন অনেকবার পেয়েছি। কখন কখন কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার বিষয়ও উনি আমাকে বলে দিয়েছেন। কোম্পানি বারুদখানার (Powder Magazine) জন্য পঞ্চবটীর সমস্ত জমিটি একবার নেবার চেষ্টা করে। আমার তাই শুনে বিষম ভাবনা হয়েছিল ; সংসারের কোলাহল থেকে দূরে নির্জ্জন স্থানটিতে বসে মাকে ডাকি, তা আর হবে না—সেই জন্য।

তোতার নির্ভীকতা—ভৈরব-দর্শনে

মথুর তো রাণী রাসমণির তরফ থেকে কোম্পানির সঙ্গে খুব মামলা লাগিয়ে দিলে, যাতে কোম্পানি জমিটি না নেয়। সেই সময়ে একদিন ঐ ভৈরব গাছে বসে আছেন দেখতে পাই; আমাকে সঙ্কেতে বলেছিলেন, 'কোম্পানি জায়গা নিতে পারবে না, মামলায় হেরে যাবে।' বাস্তবিকও তাহাই হ'ল।"

'ল্যাংটা'র জন্মস্থান পশ্চিমে কোন্ স্থানে ছিল, ঠাকুরের নিকট সে সম্বন্ধে আমরা কিছু শুনি নাই। ঠাকুরও হয়ত ঐ বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কোন আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। বিশেষতঃ আবার পূর্ব্ব নাম-ধাম-গোত্রাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সন্ন্যাসীরা উহার উল্লেখ করেন না; বলেন, 'সন্ন্যাসীকে ঐ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা এবং সন্ন্যাসীর তদ্বিষয়ে উত্তর দেওয়া—উভয়ই শাস্ত্রনিষিদ্ধ!' ঠাকুর হয় তো সেইজন্যই ঐ প্রশ্ন 'ল্যাংটা'কে কখন করেন নাই। তবে বেলুড় মঠস্থ ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ঠাকুরের দেহান্তের পর ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণকালে প্রাচীন সন্ন্যাসী-পরমহংসগণের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ পুরী গোস্বামী পাঞ্জাব প্রদেশের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের লোক ছিলেন। তাঁহার গুরুস্থান বা গুরুর আবাস কুরুক্ষেত্রের নিকট লুধিয়ানা নামক স্থানে ছিল। তাঁহার গুরুও একজন বিখ্যাত যোগী পুরুষ ছিলেন এবং ঐ স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত মঠটি তিনি নিজে স্থাপন করেন বা তাঁহার গুরুর গুরু কেহ স্থাপন করেন, সে বিষয়ে ঠিক জানা যায় নাই। তবে শ্রীমৎ

তোতাপুরীর গুরুর কথা

তোতাপুরীর গুরু যে ঐ মঠের মোহন্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্মানে এখনও যে ঐ স্থানে বৎসর বৎসর চতুষ্পার্শস্থ গ্রামবাসীদের একটি মেলা হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে প্রাচীন সাধুগণ তাঁহাদের বলিয়াছিলেন। তিনি তামাক খাইতেন বলিয়া গ্রামবাসীরা মেলার সময় তামাক আনিয়া তাঁহার 'সমাজে' এখনও উপহার দিয়া থাকে। গুরুর দেহান্তে শ্রীমৎ তোতাপুরীই ঐ মঠের মোহন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিজের কথাতেও মনে হয়, তিনি সন্ন্যাসিমণ্ডলীর অধীশ্বর নিজ গুরুর নিকট বাল্যেই বেদান্ত-শাস্ত্রোপদেশ পাইয়াছিলেন এবং বহুকাল তাঁহার অধীনে বাস করিয়া স্বাধ্যায়রত থাকেন ও সাধন-রহস্য অবগত হন। কারণ ঠাকুরকে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মণ্ডলীতে সাত শত সন্ন্যাসী বাস করিয়া গুরুর আদেশমত বেদান্তনিহিত সত্যসকল জীবনে অনুভবের জন্য ধ্যানাদি নিত্যানুষ্ঠান করিত। উক্ত মণ্ডলীতে ধ্যান-শিক্ষাদিদানও যে বড় সুন্দর প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইত, এ বিষয়েও 'ল্যাংটা' ঠাকুরকে কিছু কিছু আভাস দিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ কথা অনেক সময়ে আমাদের নিকট গল্প বা উপদেশ-চ্ছলে বলিতেন। বলিতেন, "ল্যাংটা বল্‌ত, তাদের দলে সাতশ ল্যাংটা ছিল। যারা প্রথম ধ্যান শিখতে আরম্ভ করচে, তাঁদের গদির উপর বসিয়ে ধ্যান করাত। কেননা কঠিন আসনে বসে ধ্যান করলে পা টন্ টন্ করবে; আর ঐ টন্‌টনানিতে অনভ্যস্ত মন ঈশ্বরে না গিয়ে শরীরের দিকে এসে পড়বে। তারপর তার

নিজ গুরুর মঠ ও মণ্ডলীসম্বন্ধে তোতাপুরীর কথা

যত ধ্যান জমৃত ততই তাকে কঠিন হতে কঠিনতর আসনে বসে ধ্যান করতে দেওয়া হ'ত। শেষ কালে শুধু চর্ম্মাসন ও খালি মাটিতে পর্য্যন্ত বসে তাকে ধ্যান করতে হ'ত। আহারাদি সকল বিষয়েও ঐরূপ নিয়মে অভ্যাস করাত। পরিধানেও শিষ্যদের সকলকে ক্রমে ক্রমে উলঙ্গ হয়ে থাকতে অভ্যাস করান হত। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাত, কুল, শীল, মান ইত্যাদি অষ্টপাশে মানুষ জন্মাবধি বদ্ধ আছে কি না? এক এক করে সেগুলোকে সব ত্যাগ করতে শিক্ষা দেওয়া হত। তারপর ধ্যানাদিতে মন পাকা হয়ে বসলে তাকে প্রথম অপর সাধুদের সঙ্গে, তারপর একা একা, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে আসতে হ'ত। ল্যাংটাদের এই রকম সব নিয়ম ছিল।" ঐ মণ্ডলীর মোহন্ত-নির্ব্বাচনের প্রথাও ঠাকুর পুরীজীর নিকট শুনিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ঐ সম্বন্ধে আমাদের একদিন এইরূপ বলেন, "ল্যাংটাদের ভেতর যার ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা হয়েছে দেখতো, গদি খালি হলে তাকেই সকলে মিলে মোহন্ত করে ঐ গদিতে বসাত। তা না হলে টাকা, মান, ক্ষমতা হাতে পড়ে ঠিক থাকতে পারবে কি করে? মাথা বিগ্‌ড়ে যাবে যে? সে জন্য যার মন থেকে কাঞ্চন ঠিক ঠিক ত্যাগ হয়েছে দেখতো, তাকেই গদিতে বসিয়ে টাকা-কড়ির ভার দিত। কেননা, সে-ই ঐ টাকা দেবতা ও সাধুদের সেবায় ঠিক ঠিক খরচ করতে পারবে।"

পুরী গোস্বামীর ঐসকল কথায় বেশ বুঝা যায়, তিনি বাল্যাবধি সংসারের মায়া-মোহ-ঈর্ষা-দ্বেষাদি হইতে দূরে যেন এক স্বর্গীয় রাজ্যে গুরুর স্নেহে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চলে প্রথা আছে যে, যে দম্পতির যথাসময়ে সন্তান জন্মে না, তাঁহারা দেবস্থানে কামনা করেন যে, তাঁহাদের প্রণয়ের প্রথম ফলস্বরূপ সন্তানকে সন্ন্যাসী করিয়া ঈশ্বরের সেবায় অর্পণ করিবেন এবং কার্য্যেও ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুরী গোস্বামী কি সেইরূপে গুরুর নিকট অর্পিত হইয়াছিলেন? কে বলিবে! তবে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী প্রভৃতির কোন কথা ঠাকুরের নিকট কখনও উল্লেখ না করাতে ঐরূপই অনুমিত হয়।

তোতাপুরীর পূর্ব্বপরিচয়

পূর্ব্বকৃত পুণ্যসংস্কারের ফলে গোস্বামীজীর মনটিও তেমনি সরল, বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল। আচার্য্য শঙ্কর তৎকৃত 'বিবেক-চূড়ামণি' গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, 'জগতে মনুষ্যত্ব, ঈশ্বরলাভেচ্ছা এবং সদ্‌গুরু-আশ্রয়—এই তিন বস্তু একত্রে লাভ করা বড়ই দুর্লভ; ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত হয় না।' পুরী গোস্বামী শুধু যে ঐ তিন পদার্থ ভাগ্যক্রমে একসঙ্গে পাইয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু এই সকলের যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ পাইয়া মানবজীবনের চরমোদ্দেশ্য মুক্তিলাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে যেমন যেমন উপদেশ করিতেন, তাঁহার মনও ঠিক ঠিক উহা ধারণা করিয়া সর্ব্বদা কার্য্যে পরিণত করিত। মনের জুয়াচুরি ভণ্ডামিতে তাঁহাকে কখনও বেশী ভুগিতে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৈষ্ণবদিগের ভিতর একটি কথা আছে—

তোতাপুরীর মন

"গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হ'ল।
একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল॥"

—'একের' অর্থাৎ নিজ মনের দয়া না হওয়াতে জীব বিনষ্ট হইল। পুরী গোস্বামীকে এরূপ পাজি মনের হাতে পড়িয়া কখনও ভুগিতে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সরল মন সরলভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গুরুনির্দ্দিষ্ট গন্তব্য পথে ধীরপদে অগ্রসর হইয়াছিল, যাইতে যাইতে একবারও পশ্চাতে সংসারের পাপ-প্রলোভনাদির দিকে অতৃপ্ত লালসার কটাক্ষপাত করে নাই। কাজেই গোঁসাইজী নিজ পুরুষকার, উদ্যম, আত্মনির্ভরতা ও প্রত্যয়কেই সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া জানিয়াছিলেন। মন বাঁকিয়া দাঁড়াইলে ঐ পুরুষকার যে প্রবল প্রবাহের মুখে তৃণগুচ্ছের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়, আত্মনির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয়ের স্থলে যে আপনার ক্ষমতার উপর ঘোর অবিশ্বাস আসিয়া জীবকে সামান্য কীটাপেক্ষা দুর্ব্বল করিয়া তুলে—একথা গোঁসাইজী জানিতেন না। ঈশ্বরকৃপায় বহির্জগতের সহস্র বিষয়ের অনুকূলতা না পাইলে জীবের শত-সহস্র উদ্যমও যে আশানুরূপ ফল প্রসব না করিয়া বিপরীত ফলই প্রসব করিতে থাকে এবং তাহাকে বন্ধনের উপর আরও ঘোরতর বন্ধন আনিয়া দেয়, পুরী গোস্বামী নিজ জীবনের দিকে চাহিয়া একথা কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কেনই বা ভাবিবেন? তিনি যখনই যাহা ধরিয়াছেন—আজন্ম তখনই তাহা করিতে পারিয়াছেন; যখনই যাহা মানবের কল্যাণকর বলিয়া বুঝিয়াছেন তখনই তাহা নিজ জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। কাজেই 'মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না' এমন একটা অবস্থা যে মানবের হইতে পারে, 'মন মুখ এক' করিতে না পারিয়া সে যে

শত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা ভিতরে নিরন্তর অনুভব করিতে পারে, মনের ভিতর সহস্রটা কর্ত্তা এবং শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়টা স্ব স্ব প্রধান হইয়া কেহ কাহারও কথা না মানিয়া চলিয়া তাহাকে যে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া হতাশার অন্ধতামিস্রে ফেলিয়া ঘোর যন্ত্রণা দিতে পারে—একথা গোঁসাইজী কখনও কল্পনায়ও আনিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। অথবা আনিতে পারিলেও শুনে শিখা, দেখে শিখা ও ঠেকে শিখার ভিতর অনেক তফাৎ। কাজেই পুরী গোস্বামীর মনে অবস্থিত মানবের ঐরূপ অবস্থার ছবিতে এবং যে ঐ প্রকারে বাস্তবিক নিরন্তর ভুগিতেছে, তাহার মনের ছবিতে ঐরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। পুরী গোস্বামী সেজন্য পরমেশ-শক্তি অনাদ্যবিদ্যা মায়ার দুরন্ত প্রভাববিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞই ছিলেন এবং সেজন্য দুর্ব্বল মানব-মনের কার্য্যকলাপের প্রতি তিনি কঠোর দ্বেষ-দৃষ্টি ভিন্ন কখন করুণার সহিত দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ঠাকুরের গুরুভাবের সম্পর্কে আসিয়াই তাঁহার এই অভাব অপনীত হয় এবং তিনি পরিশেষে মায়ার শক্তি মানিয়া ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ জানিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটী হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা এক্ষণে ঐ বিষয়েই বলিতে আরম্ভ করিব।

ব্রাহ্মণী ভৈরবী ঠাকুরকে যেমন বলিয়াছিলেন, আকুমার ব্রহ্মচারী কঠোর যতি তোতার বাস্তবিকই ভগবদ্ভক্তিমার্গকে একটা কিম্ভূতকিমাকার পথ বলিয়া ধারণা ছিল! ভক্তি-ভালবাসা

যে মানবকে ভালবাসার পাত্রের জন্য সংসারের সকল বিষয়, এমন কি আত্মতৃপ্তি পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে শিখাইয়া চরমে ঈশ্বর-দর্শন আনিয়া দেয়, যথার্থ ভক্তসাধক যে ভক্তির চরম পরিণতিতে শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানেরও অধিকারী হইয়া থাকেন এবং সেজন্য তাঁহারও সাধনসহায় জপ-কীর্ত্তন-ভজনাদি যে উপেক্ষার বিষয় নহে—এ কথা তোতা বুঝিতেন না। না বুঝিয়া গোঁসাইজী ভক্তের ভাববিহ্বল চেষ্টাদিকে সময়ে সময়ে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িতেন না। অবশ্য এ কথায় পাঠক না বুঝিয়া বসেন যে, পুরী গোস্বামী এক প্রকার নাস্তিক গোছের ছিলেন বা তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ ছিল না। শমদমাদিসম্পত্তিসহায় শান্তপ্রকৃতি গোঁসাইজী স্বয়ং ভক্তির শান্তভাবের পথিক ছিলেন এবং অপরে ঐ ভাবের ঈশ্বরভক্তিই বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু কল্পনাসহায়ে জগৎকর্ত্তা মহান্ ঈশ্বরকে নিজ সখা, পুত্র, স্ত্রী বা স্বামি-ভাবে ভজনা করিয়াও সাধক যে তাঁহার দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে পারে, একথা পুরীজীর মাথায় কখন ঢোকে নাই। ঐরূপ ভক্তের নিজ ভাবপ্রণোদিত ঈশ্বরের প্রতি আবদার-অনুরোধ, তাঁহাকে লইয়া বিরহ, ব্যাকুলতা, অভিমান, অহঙ্কার এবং ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম হাস্য-ক্রন্দন-নৃত্যাদি চেষ্টাকে তিনি পাগলের খেয়াল বা প্রলাপের মধ্যেই গণ্য করিতেন এবং উহাতে যে ঐরূপ অধিকারী সাধকের আশু অভীষ্ট ফল-লাভ হইতে পারে, একথা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না। কাজেই ব্রহ্মশক্তি জগদম্বিকাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করা এবং

তোতাপুরীর ভক্তিমার্গে অনভিজ্ঞতা

ভক্তিপথের ঐরূপ চেষ্টাদির কথা লইয়া পুরীজীর সহিত ঠাকুরের অনেক সময় ঠোকাঠুকি লাগিয়া যাইত।

ঐ বিষয়ে প্রমাণ—'কেঁও রোটী ঠোক্‌তে হো'

ঠাকুর বাল্যাবধি সকাল-সন্ধ্যায় করতালি দিতে দিতে এবং সময়ে সময়ে ভাবে নৃত্য করিতে করিতে 'হরিবোল হরিবোল', 'হরি গুরু, গুরু হরি', 'হরি প্রাণ হে, গোবিন্দ মম জীবন', 'মন কৃষ্ণ—প্রাণ কৃষ্ণ—জ্ঞান কৃষ্ণ—ধ্যান কৃষ্ণ—বোধ কৃষ্ণ—বুদ্ধি কৃষ্ণ', 'জগৎ তুমি—জগৎ তোমাতে', 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' ইত্যাদি উচ্চৈঃস্বরে বার বার কিছুকাল বলিতেন। বেদান্তজ্ঞানে অদ্বৈতভাবে নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের পরও নিত্য ঐরূপ করিতেন। একদিন পঞ্চবটীতে পুরীজীর নিকট অপরাহ্ণে বসিয়া নানা ধর্ম্মকথা-প্রসঙ্গে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া ঠাকুর বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া করতালি দিয়া ঐরূপে ভগবানের স্মরণ-মনন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া পুরীজী অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—যিনি বেদান্তপথের এত উত্তম অধিকারী, যিনি তিন দিনেই নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিলেন, তাঁহার আবার হীনাধিকারীর মত এ সব অনুষ্ঠান কেন? প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াও ফেলিলেন, 'আরে, কেঁও রোটী ঠোক্‌তে হো?'—অর্থাৎ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্ত্রীপুরুষে অনেক সময়ে চাকি-বেলুন প্রভৃতির সাহায্য না লইয়া ময়দার নেচি হাতে লইয়া পটাপট্ আওয়াজ করিতে করিতে চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে যেমন রুটি তৈয়ার করে, সেই রকম কেন কর্‌চ? ঠাকুর শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম কর্‌চি,

আর তুমি কিনা বলছ—আমি রুটি ঠুকছি!" পুরীজীও ঠাকুরের বালকের ন্যায় কথায় হাসিতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠান অর্থশূন্য নহে; উহার ভিতর এমন কোনও গূঢ়-ভাব আছে, যাহা তাঁহার রুচিকর নয় বলিয়া তিনি ধরিতে-বুঝিতে পারিতেছেন না। উহার ঐরূপ কার্য্যে প্রতিবাদ না করাই ভাল।

আর একদিন সন্ধ্যার পর ঠাকুর পুরীজীর ধুনির ধারে বসিয়া আছেন। ঈশ্বরপ্রসঙ্গে ঠাকুর এবং গোঁসাইজী উভয়ের মন খুব উচ্চে উঠিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে প্রায় তন্ময়ত্ব অনুভব করিতেছে। পার্শ্বে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া ধুনির অগ্নিমধ্যস্থ আত্মাও যেন তাঁহাদের আত্মার সহিত একত্বানুভব করিয়া আনন্দে শত জিহ্বা প্রকাশ করিয়া হাসিতেছেন! এমন সময় বাগানের চাকরবাকর-দিগের একজনের তামাক খাইবার বিশেষ ইচ্ছা হওয়ায় কল্কেতে তামাক সাজিয়া অগ্নির জন্য সেখানে উপস্থিত হইল এবং ধুনির কাঠ টানিয়া অগ্নি লইতে লাগিল। গোঁসাইজী ঠাকুরের সহিত বাক্যালাপে ও অন্তরে অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দানুভবেই মগ্ন ছিলেন, ঐ লোকটির আগমন ও ধুনি হইতে অগ্নি লওয়ার বিষয় এতক্ষণ জানিতেই পারেন নাই। হঠাৎ এখন সেদিকে লক্ষ্য পড়ায় বিষম বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গালিগালাজ করিতে লাগিলেন—এমন কি চিম্‌টা তুলিয়া তাহাকে দুই এক ঘা দিবার মতও ভয় দেখাইতে লাগিলেন। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাগা সাধুরা ধুনিরূপী অগ্নিকে পূজা ও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

তোতাপুরীর ক্রোধত্যাগের কথা।

ঠাকুর পুরীজীর ঐরূপ ব্যবহারে অর্দ্ধবাহ্যদশায় হাস্যের রোল তুলিয়া তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন, "দুর্ শালা, দুর্ শালা!" ঐ কথা বার বার বলেন ও হাসিয়া গড়াগড়ি দেন। তোতা ঠাকুরের এই ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তুমি অমন করচ যে? লোকটির কি অন্যায় দেখ দেখি?" ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা ত বটে, সেই সঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টাও দেখচি। এই মুখে বল্‌ছিলে—ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তাই নেই, জগতে সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁরই প্রকাশ, আর পরক্ষণেই সব কথা ভুলে মানুষকে মার্‌তেই উঠেছ। তাই হাস্‌ছি যে, মায়ার কি প্রভাব!" তোতা ঐ কথা শুনিয়াই গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ, ক্রোধে সকল কথা বাস্তবিকই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ক্রোধ বড় পাজি জিনিস। আজ থেকে আর ক্রোধ কর্‌বো না, ক্রোধ পরিত্যাগ কর্‌লুম।" বাস্তবিকই স্বামীজিকে সেদিন হইতে আর ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই।

ঠাকুর বলিতেন, "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে—চোখ বুজে তুমি 'কাঁটা নেই, খোঁচা নেই' যতই কেন মনকে বুঝাও না, কাঁটায় হাত পড়লেই প্যাঁট করে বিঁধে গিয়ে উহু উহু করে উঠতে হয়; তেমনি, যতই কেন মনকে বুঝাও না—তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, পাপ নেই, পুণ্য নেই, শোক নেই, দুঃখ নেই, ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই—তুমি জন্ম-জরা-রহিত নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা, কিন্তু যাই শরীরে অসুস্থতা এল, যাই মন

মায়া কৃপা করিয়া পথ না ছাড়িলে মানবের ঈশ্বরলাভ হয় না

সংসারের রূপ-রসাদি প্রলোভনের সাম্‌নে পড়ল, যাই কাম-কাঞ্চনের আপাত সুখে ভুলে কোন একটা কুকাজ করে ফেল্লে, অমনি মোহ, যন্ত্রণা, দুঃখ সব উপস্থিত হয়ে বিচার-আচার ভুলিয়ে একেবারে তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌বে! সেজন্য ঈশ্বরের কৃপা না হলে, মায়া দোর ছেড়ে না দিলে কারুর আত্ম-জ্ঞানলাভ ও দুঃখের নিবৃত্তি হয় না—জান্‌বি। চণ্ডীতে আছে শুনিস নি?—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে' অর্থাৎ মা কৃপা করে পথ ছেড়ে না দিলে কিছুই হবার যো নেই।"

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের বনে পর্য্যটনের কথা।

"রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে যাচ্ছেন। বনের সরু পথ, এক জনের বেশী যাওয়া-আসা যায় না। রাম ধনুকহাতে আগে আগে চলেছেন; সীতা তাঁর পাছু পাছু চলেছেন; আর লক্ষ্মণ সীতার পাছু পাছু ধনুর্ব্বাণ নিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্মণের রামের উপর এমনি ভক্তি-ভালবাসা যে, সর্ব্বদা মনে মনে ইচ্ছা নবঘনশ্যাম রামরূপ দেখেন; কিন্তু সীতা মাঝখানে রয়েছেন, কাজেই চল্‌লে চল্‌তে রামচন্দ্রকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বুদ্ধিমতী সীতা তা বুঝতে পেরে তাঁর দুঃখে কাতর হয়ে চল্‌তে চল্‌তে একবার পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই ত্যাখ।' তবে লক্ষ্মণ প্রাণভরে একবার তাঁর ইষ্টমূর্ত্তি রামরূপ দেখতে পেলেন। সেই রকম জীব আর ঈশ্বরের মাঝখানে এই মায়ারূপিণী সীতা রয়েছেন। তিনি জীবরূপী লক্ষ্মণের দুঃখে ব্যথিতা হয়ে পথ ছেড়ে পাশ কাটিয়ে না দাঁড়ালে জীব তাঁকে দেখতে পায় না জান্‌বি। তিনি যাই কৃপা করেন,

অমনি জীবের রামরূপী নারায়ণের দর্শন হয় ও সে সব যন্ত্রণার হাত থেকে এড়ায়। নৈলে, হাজারই বিচার-আচার কর না কেন, কিছুতে কিছু হয় না। কথায় বলে—এক একটি জোয়ানের দানায় এক একশটি ভাত হজম করিয়ে দেয়, কিন্তু যখন পেটের অসুখ হয়, তখন একশটি জোয়ানের দানাও একটি ভাত হজম করাতে পারে না—সেই রকম জান্‌বি।”

তোতাপুরী স্বামীজি ৺জগদম্বার আজন্ম কৃপাপাত্র; সৎসংস্কার, সরল মন, যোগী মহাপুরুষের সঙ্গ, বলিষ্ঠ দৃঢ় শরীর বাল্যাবধিই লাভ করিয়াছিলেন। ভাগবতী মায়া তো তাঁহাকে কখন তাঁহার করাল, বিভীষিকাময়ী, মৃত্যুর ছায়ার ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি দেখান নাই—তাঁহার অবিদ্যারূপিণী মোহিনী মূর্ত্তির ফাঁদে তো কখন ফেলেন নাই, কাজেই গোঁসাইজীর নিকট পুরুষকার ও চেষ্টাসহায়ে অগ্রসর হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ, ঈশ্বরদর্শন, আত্মজ্ঞান সব সোজা কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে পথে অগ্রসর হইবার যত কিছু বিঘ্ন-বাধা, মা যে সে-সব নিজ হস্তে সরাইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—একথা তিনি বুঝিবেন কিরূপে? এতদিনে সে বিষয় পুরী স্বামীজিকে বুঝাইবার জগদম্বার ইচ্ছা হইল। এতদিনে তিনি মনের ঐ ভ্রম বুঝিবার অবসর পাইলেন।

জগদম্বার কৃপায় তাঁহার উচ্চাবস্থা—তোতা একথা বুঝেন নাই

পুরীজীর পশ্চিমী শরীর; রোগ, অজীর্ণ, শরীরে শতপ্রকার অসুস্থতা কাহাকে বলে তাহা কখন জানিতেন না। যাহা খাইতেন তাহাই হজম হইত; যেখানেই পড়িয়া থাকিতেন

সুনিদ্রার অভাব হইত না। আর ঈশ্বর-জ্ঞানে ও দর্শনে মনের উল্লাস ও শান্তি শতমুখে অবিরাম ধারে মনে প্রবাহিত থাকিত। কিন্তু বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার বাষ্পকণাপূরিত গুরুভার উত্তপ্ত বায়ুতে ঠাকুরের শ্রদ্ধাভালবাসায় মোহিত হইয়া কয়েক মাস বাস করিতে না করিতেই সে দৃঢ় শরীরে রোগ প্রবেশ করিল। পুরীজী কঠিন রক্তামাশয়-রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। দিবারাত্র পেটের মোচড় ও টন্‌টনানিতে পুরীজীর ধীর, স্থির, সমাধিস্থ মনও অনেক সময়ে ব্রহ্মসম্ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া শরীরের দিকে আসিয়া পড়িতে লাগিল। 'পঞ্চ ভূতের ফাঁদে' ব্রহ্ম পড়িয়াছেন, এখন সর্ব্বেশ্বরী জগদম্বিকার কৃপা ব্যতীত আর উপায় কি?

তোতাপুরীর অসুস্থতা

অসুস্থ হইবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সতর্ক ব্রহ্মনিষ্ঠ মন তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে, এখানে শরীর ভাল থাকিতেছে না, আর এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু ঠাকুরের অদ্ভুত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শরীরের মায়ায় তিনি চলিয়া যাইবেন? 'শরীর হাড়-মাসের খাঁচা'—রস-রক্তপূর্ণ, কৃমিকুলসঙ্কুল, দুই দিন মাত্র স্থায়ী দেহ—যেটার অস্তিত্বই বেদান্তশাস্ত্রে ভ্রম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতি মমতা-দৃষ্টি করিয়া তিনি কি না অশেষ-আনন্দ-প্রসূ এই দেব-মানবের সঙ্গ সহসা ত্যাগ করিয়া যাইবেন? যেখানে যাইবেন সেখানেও শরীরের রোগাদি ত হইতে পারে? আর রোগাদি হইলেই বা তাঁহার ভয় কি? শরীরটাই ভুগিবে, কৃশ হইবে, বড় জোর বিনষ্ট হইবে—তাহাতে তাঁহার কি আসে

তোতার নিজ মনের সঙ্কেত অগ্রাহ্য করা

যায়? তিনি তো প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন, দেখিয়াছেন—তিনি অসঙ্গ নির্ব্বিকার আত্মা, শরীরটার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধই নাই, তবে আবার ভয় কিসের? এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া পুরীজী মনকে ব্যস্ত হইতে দেন নাই।

তোতার ঠাকুরের নিকট বিদায় লইতে যাইয়াও না পারা ও রোগবৃদ্ধি

ক্রমে রোগের যখন সূত্রপাত ও কিছু কিছু যন্ত্রণার আরম্ভ হইল, তখন পুরীজীর স্থানত্যাগের ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে প্রবলতর হইতে লাগিল। ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় লইবেন ভাবিয়া কখন কখন তাঁহার নিকট উপস্থিতও হইলেন, কিন্তু অন্য সৎপ্রসঙ্গে মাতিয়া সে কথা বলিতে ভুলিয়াই যাইলেন। আবার যদি বা বিদায়ের কথা বলিতে মনে পড়িল তো তখন যেন কে ভিতর হইতে তাঁহার সে সময়ের জন্য বাক্য রুদ্ধ করিয়া দিল; বালতে বাধ বাধ করায় পুরীজী ভাবিলেন, 'আজ থাক্, কাল বলা যাইবে।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজি ঠাকুরের সহিত বেদান্তালাপ করিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া পঞ্চবটীতলে আসনে ফিরিলেন। দিন কাটিতে লাগিল। স্বামীজির শরীরও অধিকতর দুর্ব্বল এবং ক্রমে রোগ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর স্বামীজির শরীর ঐ প্রকার দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বিশেষ পথ্য ও সামান্য ঔষধাদি-সেবনের বন্দোবস্ত ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও ফলোদয় না হইয়া রোগ বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। ঠাকুরও মথুরকে বলিয়া তাঁহার আরোগ্যের জন্য ঔষধপথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য সেবা-যত্ন করিতে লাগিলেন। এখনও

পর্য্যন্ত স্বামীজি শরীরেই বিশেষ যন্ত্রণানুভব করিতেছিলেন, কিন্তু চিরনিয়মিত মনকে ইচ্ছামাত্রেই সমাধিমগ্ন করিয়া দেহের সকল যন্ত্রণার কথা এককালে ভুলিয়া শান্তিলাভ করিতেছিলেন।

রাত্রিকাল—আজ পেটের যন্ত্রণা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বামীজিকে স্থির হইয়া শয়ন পর্য্যন্ত করিয়া থাকিতে দিতেছে না। একটু শয়ন করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াই তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন। বসিয়াও সোয়াস্তি নাই। ভাবিলেন, মনকে ধ্যানমগ্ন করিয়া রাখি, শরীরে যাহা হইবার হউক। মনকে গুটাইয়া শরীর হইতে টানিয়া লইয়া স্থির করিতে না করিতে পেটের যন্ত্রণায় মন সেই দিকেই ছুটিয়া চলিল। আবার চেষ্টা করিলেন, আবার তদ্রূপ হইল। যেখানে শরীর ভুল হইয়া যায়, সেই সমাধি-ভূমিতে মন উঠিতে না উঠিতে যন্ত্রণায় নামিয়া পড়িতে লাগিল। যতবার চেষ্টা করিলেন, ততবারই চেষ্টা বিফল হইল। তখন স্বামীজি নিজের শরীরের উপর বিষম বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন —এ হাড়-মাসের খাঁচাটার জ্বালায় মনও আজ আমার বশে নাই। দূর হ'ক, জানিয়াছি তো শরীরটা কোনমতেই আমি নই, তবে এ পচা শরীরটার সঙ্গে আর কেন থাকিয়া যন্ত্রণা অনুভব করি? এটা আর রাখিয়া লাভ কি? এই গভীর রাত্রিকালে গঙ্গায় এটাকে বিসর্জ্জন দিয়া এখনি সকল যন্ত্রণার অবসান করিব। এই ভাবিয়া 'ল্যাংটা' বিশেষ যত্নে মনকে ব্রহ্মচিন্তায় স্থির রাখিয়া ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে গভীর

মনকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া তোতার গঙ্গায় শরীর বিসর্জ্জন করিতে যাওয়া ও বিশ্বরূপিণী জগদম্বার দর্শন

জলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু গভীর ভাগীরথী কি আজ সত্য সত্যই শুকা হইয়াছেন! অথবা তোতা তাঁহার মনের ভিতরের ছবির বহিঃপ্রকাশে ঐরূপ দেখিতেছেন? কে বলিবে? তোতা প্রায় পরপারে চলিয়া আসিলেন, তত্রাচ ডুব-জল পাইলেন না। ক্রমে যখন রাত্রির ঘনান্ধকারে অপর পারের বৃক্ষ ও বাটীসকল ছায়ার মত নয়নগোচর হইতে লাগিল, তখন তোতা অবাক হইয়া ভাবিলেন, 'একি দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার পর্য্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই! একি ঈশ্বরের অপূর্ব্ব লীলা!' অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল! তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মা; জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা - তুরীয়া, নির্গুণা মা!—এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা! শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী মূর্ত্তিতে অবস্থিত!—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ!

গভীর নিশীথে তোতা ভক্তিপূরিত চিত্তে জগদম্বার অচিন্ত্য অব্যক্ত বিরাট রূপের দর্শন করিতে করিতে গম্ভীর অম্বারবে

দিক্‌সকল মুখরিত করিয়া তুলিলেন এবং আপনাকে তৎপদে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়া পুনরায় যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি জল ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া চলিলেন! শরীরে যন্ত্রণা হইলেও এখন আর তাহার অনুভব নাই। প্রাণ সমাধি-স্মৃতির অপূর্ব্ব উল্লাসে উল্লসিত। ধীরে-ধীরে স্বামীজি পঞ্চবটীতলে ধুনির ধারে আসিয়া বসিয়া সমস্ত রাত্রি জগদম্বার নামে ও ধ্যানে কাটাইলেন।

তোতার পূর্ব্ব সংকল্প ত্যাগ

প্রভাত হইলেই ঠাকুর স্বামীজির শারীরিক কুশল-সংবাদ জানিতে আসিয়া দেখেন যেন সে মানুষই নয়! মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল, হাস্যপ্রস্ফুটিত অধর, শরীরে যেন কোন রোগই নাই! তোতা ঠাকুরকে ইঙ্গিতে পার্শ্বে বসিতে বলিয়া ধীরে ধীরে রাত্রের সকল ঘটনা বলিলেন। বলিলেন, রোগই আমার বন্ধুর কাজ করিয়াছে, কাল জগদম্বার দর্শন পাইয়াছি এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্তও হইয়াছি। এতদিন আমি কি অজ্ঞই ছিলাম! যাহা হউক, তোমার মাকে এখন বলিয়া-কহিয়া আমাকে এ স্থান হইতে যাইতে বিদায় দাও। আমি এখন বুঝিয়াছি, তিনিই আমাকে এই শিক্ষা দিবার জন্য এতদিন ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া আমাকে এখানে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। নতুবা আমি এখান হইতে অনেক কাল পূর্ব্বে চলিয়া যাইব ভাবিয়াছি, বিদায় লইবার জন্য তোমার কাছেও বার বার গিয়াছি, কিন্তু কে যেন প্রতিবারেই বিদায়ের কথা বলিতে দেয় নাই! অন্য প্রসঙ্গে ভুলাইয়া, ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া রাখিয়াছে। ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মাকে যে

অসুস্থতায় তোতার জ্ঞান —ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তি এক

আগে মানতে না, আমার সঙ্গে যে শক্তি মিথ্যা 'ঝুট্' বলে তর্ক করতে! এখন দেখলে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচে গেল! আমাকে তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়েছেন 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক নয়, তেমনি!'

অনন্তর প্রভাতী সুরে নহবৎ-ধ্বনি হইতেছে শুনিয়া শিব-রামের ন্যায় গুরুশিষ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ উভয় মহাপুরুষ উঠিয়া জগদম্বার মন্দিরে দর্শনার্থ যাইলেন এবং শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হইলেন। উভয়েই প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, মা তোতাকে এইবার এখান হইতে যাইতে প্রসন্ন মনে অনুমতি দিয়াছেন। ইহার কয়েক দিবস পরেই তোতা ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রওনা হইলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর ইহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ দর্শন—কারণ ইহার পর পুরী গোস্বামী আর কখনও এদিকে ফিরেন নাই।

তোতার জগদম্বাকে মানা ও বিদায়গ্রহণ

আর একটি কথা বলিলেই তোতাপুরীর সম্বন্ধে আমরা যত কথা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম, তাহার সকলই প্রায় পাঠককে বলা হয়। পুরী গোস্বামী 'কিমিয়া' বিদ্যায় বিশ্বাস করিতেন। শুধু যে বিশ্বাস করি-তেন তাহা নহে, ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন তিনি ঐ বিদ্যাপ্রভাবে তাম্রাদি ধাতুকে অনেকবার স্বর্ণে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তোতা বলিতেন, তাঁহাদের মণ্ডলীর প্রাচীন পরমহংসেরা উক্ত বিদ্যা অবগত আছেন এবং গুরুপরম্পরায় তিনি উহা পাইয়াছেন। আরও

তোতার 'কিমিয়া' বিদ্যায় অভিজ্ঞতা

বলিয়াছেন, 'ঐ বিদ্যাপ্রভাবে নিজের স্বার্থসাধন বা ভোগবিলাস করিতে একেবারে নিষেধ আছে, উহাতে গুরুর অভিসম্পাত আছে। তবে মণ্ডলীতে অনেক সাধু থাকে, উহাদের লইয়া কখন কখন মণ্ডলীশ্বরকে তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে গমনাগমন করিতে হয় এবং তাঁহাদের সকলের আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে হয়। গুরুর আদেশ—ঐ সময়েই অর্থের অনটন হইলে ঐ বিদ্যার প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের সেবার বন্দোবস্ত করিতে পার।'

উপসংহার

এইরূপে ঠাকুরের গুরুভাবসহায়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী নিজ নিজ গন্তব্য পথে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অন্যান্য শিক্ষাগুরুগণও যে তাঁহার সহায়ে এইরূপে আধ্যাত্মিক উদারতা লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ও আমরা ইহাতেই বেশ অনুমান করিতে পারি।

ওঁমিতি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাবপর্ব্বে

পূর্ব্বার্দ্ধ সম্পূর্ণ॥ ওঁ॥